রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

বিশ্বভারতী

৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

কথা ও কাহিনী

সূচনা

একদিন এল যখন আর-একটা ধারা বন্যার মতো মনের মধ্যে নামল। কিছুদিন ধরে দিল তাকে প্লাবিত করে। ইংরেজি অলংকারশাস্ত্রে এই শ্রেণীর ধারাকে বলে ন্যারেটিভ। অর্থাৎ কাহিনী। এর আনন্দবেগ যেন থামতে চাইল না। আমার কাব্যভূগোলে আর-একটা দ্বীপ তৈরি হয়ে উঠল। মনের সেই অবস্থায় কখনো কখনো কাহিনী বড়ো ধারায় উৎসারিত হয়ে নাট্যরূপ নিল।

এ-সব লেখার ভালোমন্দ বিচার করা অনাবশ্যক, চিন্তার বিষয় এর মনস্তত্ত্ব। রচনার প্রবৃত্তি অনেক থাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে, হঠাৎ কোনো-একটা প্রান্তে উদ্‌বোধিত হলে যারা ছিল অজ্ঞাতবাসে তারা যথোচিত সূত্রে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে কথার কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা। তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক-একটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য।

ছবির অভিমুখিতা বাইরের দিকে, নিরাবিল দৃষ্টিতে স্পষ্ট রেখায়। সেইজন্যে মনের মধ্যে এই ছবির প্রবর্তনা এমন বিষয়বস্তুকে স্বভাবত বেছে নেয় যার ভিত্তি বাস্তবে। এই সন্ধানে এক সময়ে গিয়ে পড়েছিলুম ইতিহাসের রাজ্যে। সেই সময়ে এই বহির্দৃষ্টির প্রেরণা কাব্যে ও নাট্যে ভিড় করে এসেছিল ইতিহাসের সঞ্চয় নিয়ে। এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।

উৎসর্গ

সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানাচার্য
করকমলেষু

সত্য রত্ন তুমি দিলে, পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।

শিলাইদহ
অগ্রহায়ণ ১৩০৬

কথা

কথা কও, কথা কও।
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও ?
কথা কও, কথা কও।
যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগরতলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে।
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কলকল ভাষ নীরব তাহার—
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন,
তুমি তারে কোথা লও !
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও।

কথা কও, কথা কও।
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও !
তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে !
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা-মাঝে
স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে
কথা কও, কথা কও।

কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাও নি তুমি,
সব তুমি তুলে লও—
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।

যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও।
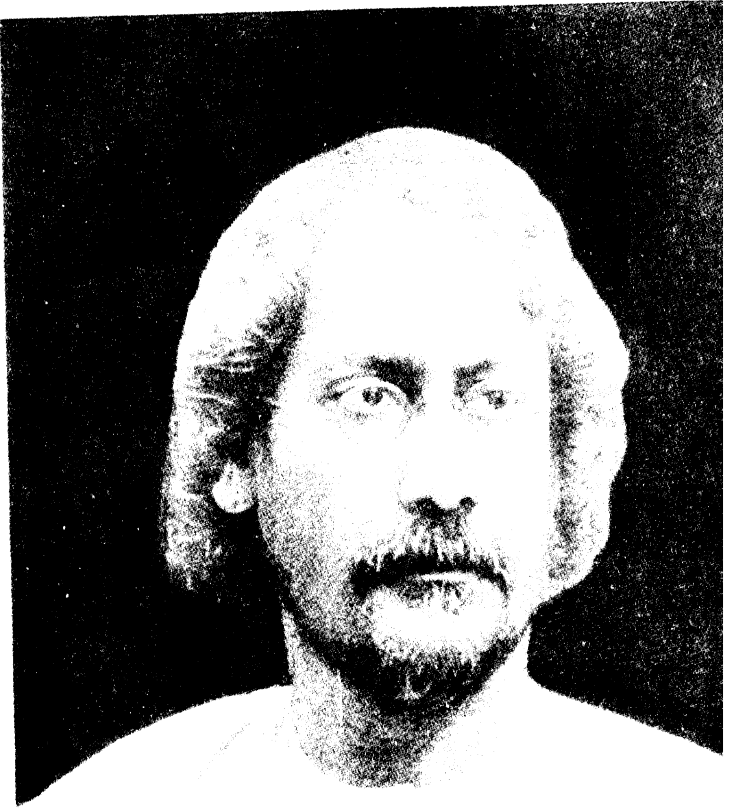
রবীন্দ্রনাথ

আনুমানিক ৪৫ বৎসর বয়সে

কথা

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

অবদানশতক

অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন

'প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী, কে রয়েছ জাগি'
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ
নিনাদে।
সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন
আলস্যে অরুণ সহাস্য লোচন
শ্রাবস্তীপুরীর গগনলগন
প্রাসাদে।
বৈতালিকদল সুপ্তিতে শয়ান
এখনো ধরে নি মাঙ্গলিক গান,
দ্বিধাভরে পিক মৃদু কুহুতান
কুহরে।
ভিক্ষু কহে ডাকি, 'হে নিদ্রিত পুর,
দেহো ভিক্ষা মোরে, করো নিদ্রা দূর'—
সুপ্ত পৌরজন শুনি সেই সুর
শিহরে।
সাধু কহে, 'শুন, মেঘ বরিষার
নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার,
সব ধর্মমাঝে ত্যাগধর্ম সার
ভুবনে।'
কৈলাসশিখর হতে দূরাগত
ভৈরবের মহাসংগীতের মতো
সে বাণী মন্দ্রিল সুখতন্দ্রারত
ভবনে।
রাজা জাগি ভাবে বৃথা রাজ্য ধন,
গৃহী ভাবে মিছা তুচ্ছ আয়োজন,
অশ্রু অকারণে করে বিসর্জন
বালিকা।

যে ললিত সুখে হৃদয় অধীর
মনে হল তাহা গত যামিনীর
স্খলিত দলিত শুষ্ক কামিনীর
মালিকা।
বাতায়ন খুলে যায় ঘরে ঘরে,
ঘুমভাঙা আঁখি ফুটে থরে থরে
অন্ধকার পথ কৌতূহলভরে
নেহারি।
'জাগো, ভিক্ষা দাও' সবে ডাকি ডাকি
সুপ্ত সৌধে তুলি নিদ্রাহীন আঁখি
শূন্য রাজবাটে চলেছে একাকী
ভিখারি।
ফেলি দিল পথে বণিকধনিকা
মুঠি মুঠি তুলি রতনকণিকা—
কেহ কণ্ঠহার, মাথার মণিকা
কেহ গো।
ধনী স্বর্ণ আনে থালি পুরে পুরে,
সাধু নাহি চাহে, পড়ে থাকে দূরে—
ভিক্ষু কহে, 'ভিক্ষা আমার প্রভুরে
দেহো গো।'
বসনে ভূষণে ঢাকি গেল ধূলি,
কনকে রতনে খেলিল বিজুলি,
সন্ন্যাসী ফুকারে লয়ে শূন্য ঝুলি
সঘনে—
'ওগো পৌরজন, করো অবধান,
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি বুদ্ধ ভগবান,
দেহো তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে।'
ফিরে যায় রাজা, ফিরে যায় শেঠ,
মিলে না প্রভুর যোগ্য কোনো ভেট,
বিশাল নগরী লাজে রহে হেঁট-
আননে।
রৌদ্র উঠে ফুটে, জেগে উঠে দেশ,
মহানগরীর পথ হল শেষ,
পুরপ্রান্তে সাধু করিলা প্রবেশ
কাননে।
দীন নারী এক ভূতলশয়ন
না ছিল তাহার অশন ভূষণ,
সে আসি নমিল সাধুর চরণ-
কমলে।

অরণ্য-আড়ালে রহি কোনোমতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে ।
ভিক্ষু ঊর্ধ্বভুজে করে জয়নাদ—
কহে, 'ধন্য মাতঃ, করি আশীর্বাদ,
মহাভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে ।'
চলিলা সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর
সঁপিতে বুদ্ধের চরণনখর-
আলোকে ।

৫ কার্তিক ১৩০৪

প্রতিনিধি

অ্যাক্‌ওয়ার্থ্ সাহেব কয়েকটি মারাঠি গাথার যে ইংরাজি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই ভূমিকা হইতে বর্ণিত ঘটনা গৃহীত । শিবাজির গেরুয়া পতাকা 'ভগোয়া ঝেণ্ডা' নামে খ্যাত ।

বসিয়া প্রভাতকালে সেতারার দুর্গভালে
শিবাজি হেরিলা এক দিন—
রামদাস গুরু তাঁর ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন ।
ভাবিলা, এ কী এ কাণ্ড ! গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড—
ঘরে যাঁর নাই দৈন্যলেশ !
সব যাঁর হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত,
তাঁরো নাই বাসনার শেষ !
এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে ।
কহিলা, 'দেখিতে হবে কতখানি দিলে তবে
ভিক্ষাঝুলি ভরে একেবারে ।'
তখনি লেখনী আনি কী লিখি দিলা কী জানি,
বালাজিরে কহিলা ডাকায়ে,
'গুরু যবে ভিক্ষা-আশে আসিবেন দুর্গ-পাশে
এই লিপি দিয়ো তাঁর পায়ে ।'

গুরু চলেছেন গেয়ে, সম্মুখে চলেছে ধেয়ে
কত পান্থ কত অশ্বরথ !—
'হে ভবেশ, হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ ।

অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার,
সুখে আছে সর্ব চরাচর—
মোরে তুমি, হে ভিখারি, মার কাছ হতে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর।'

সমাপন করি গান সারিয়া মধ্যাহ্নস্নান
দুর্গদ্বারে আসিলা যখন—
বালাজি নমিয়া তাঁরে দাঁড়াইল এক ধারে
পদমূলে রাখিয়া লিখন।
গুরু কৌতূহলভরে তুলিয়া লইলা করে,
পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি—
বন্দি তাঁর পাদপদ্ম শিবাজি সঁপিছে অদ্য
তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।

পরদিনে রামদাস গেলেন রাজার পাশ,
কহিলেন, 'পুত্র, কহো শুনি,
রাজ্য যদি মোরে দেবে কী কাজে লাগিবে এবে—
কোন্ গুণ আছে তব গুণী?'
'তোমারি দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান'
শিবাজি কহিলা নমি তাঁরে।
গুরু কহে, 'এই ঝুলি লহো তবে স্কন্ধে তুলি,
চলো আজি ভিক্ষা করিবারে।'

শিবাজি গুরুর সাথে ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে
ফিরিলেন পুরদ্বারে-দ্বারে।
নৃপে হেরি ছেলেমেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে,
ডেকে আনে পিতারে মাতারে।
অতুল ঐশ্বর্যে রত, তাঁর ভিখারির ব্রত!
এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা!
ভিক্ষা দেয় লজ্জাভরে, হস্ত কাঁপে থরথরে,
ভাবে ইহা মহতের লীলা।

দুর্গে দ্বিপ্রহর বাজে, ক্ষান্ত দিয়া কর্মকাজে
বিশ্রাম করিছে পুরবাসী।
একতারে দিয়ে তান রামদাস গাহে গান
আনন্দে নয়নজলে ভাসি,
'ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি,
কিছুই অভাব তব নাহি—
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির, প্রভু,
সবার সর্বস্বধন চাহি।'

অবশেষে দিবসান্তে নগরের এক প্রান্তে
নদীকূলে সন্ধ্যাস্নান সারি—
ভিক্ষা-অন্ন রাঁধি সুখে গুরু কিছু দিলা মুখে,
প্রসাদ পাইল শিষ্য তাঁরি।
রাজা তবে কহে হাসি, 'নৃপতির গর্ব নাশি
করিয়াছ পথের ভিক্ষুক—
প্রস্তুত রয়েছে দাস, আরো কিবা অভিলাষ—
গুরু-কাছে লব গুরু দুখ।'

গুরু কহে, 'তবে শোন্, করিলি কঠিন পণ,
অনুরূপ নিতে হবে ভার—
এই আমি দিনু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহো পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।'

'বৎস, তবে এই লহো মোর আশীর্বাদসহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস—
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো'
কহিলেন গুরু রামদাস।
নৃপশিষ্য নতশিরে বসি রহে নদীতীরে,
চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে।
থামিল রাখালবেণু, গোঠে ফিরে গেল ধেনু,
পরপারে সূর্য গেল পাটে।

পূরবীতে ধরি তান একমনে রচি গান
গাহিতে লাগিলা রামদাস,
'আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসারমাঝে
কে তুমি আড়ালে কর বাস!
হে রাজা, রেখেছি আনি তোমারি পাদুকাখানি,
আমি থাকি পাদপীঠতলে—
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, আর কত বসে রই!
তব রাজ্যে তুমি এসো চলে।'

৬ কার্তিক ১৩০৪

ব্রাহ্মণ

ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য ; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে ; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবনগোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে ; করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটিরপ্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি ; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মতো। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হয়ে ; মহর্ষি গৌতম
কহিলেন, 'বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
করো অবধান।'
হেনকালে অর্ঘ্য বহি
করপুট ভরি' পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক ; বন্দি ফলফুলদলে
ঋষির চরণপদ্ম, নমি ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,
'ভগবন্‌, ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী,
সত্যকাম নাম মোর।'
শুনি স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে,
'কুশল হউক সৌম্য। গোত্র কী তোমার ?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।'
বালক কহিলা ধীরে,
'ভগবন্‌, গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য, করো অনুমতি।'

এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি
গেল চলি সত্যকাম ঘন-অন্ধকার
বনবীথি দিয়া, পদব্রজে হয়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী ; বালুতীরে

সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননীকুটিরে
করিলা প্রবেশ।

ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা ;
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি ; হেরি তারে বক্ষে টানি
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণকুশল। শুধাইলা সত্যকাম,
'কহো গো জননী, মোর পিতার কী নাম,
কী বংশে জনম। গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে, গুরু কহিলেন মোরে—
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে। মাতঃ, কী গোত্র আমার ?'
শুনি কথা, মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী, 'যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি তাত।'

পরদিন
তপোবনতরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপসবালক
শিশিরসুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্তজটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি সমুজ্জ্বলকায়ে
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধ বটচ্ছায়ে
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গকাকলিগান,
মধুপগুঞ্জনগীতি, জলকলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর
শান্ত সামগীতি।

হেনকালে সত্যকাম
কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম—
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য আশিস করি শুধাইলা তবে,
'কী গোত্র তোমার সৌম্য, প্রিয়দরশন ?'
তুলি শির কহিলা বালক, 'ভগবন্,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে, কহিলেন তিনি, সত্যকাম,

বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি ।'

শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো— সবে বিস্ময়বিকল,
কেহ বা হাসিল কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার ।
উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন,
বাহু মেলি বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত ।
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত ।'

[শিলাইদহ]
৭ ফাল্গুন ১৩০১

মস্তকবিক্রয়

মহাবস্তুবদান

কোশলনৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি যশোগাথা ;
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাঁই,
দীনের তিনি পিতামাতা ।
সে কথা কাশীরাজ শুনিতে পেয়ে
জ্বলিয়া মরে অভিমানে—
'আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে
তাহারে বড়ো করি মানে !
আমার হতে যার আসন নীচে
তাহার দান হল বেশি !
ধর্ম দয়া মায়া সকলি মিছে,
এ শুধু তার রেষারেষি ।'
কহিলা, 'সেনাপতি, ধরো কৃপাণ,
সৈন্য করো সব জড়ো ।
আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান,
স্পর্ধা বাড়িয়াছে বড়ো !'
চলিলা কাশীরাজ যুদ্ধসাজে—
কোশলরাজ হারি রণে
রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুব্ধ লাজে
পলায়ে গেল দূর বনে ।

কাশীর রাজা হাসি কহে তখন
আপন সভাসদ্-মাঝে
'ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন
তারেই দাতা হওয়া সাজে ।'

সকলে কাঁদি বলে, 'দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরেও হানে !
লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু,
চাহে না ধর্মের পানে !'
'আমরা হইলাম পিতৃহারা'
কাঁদিয়া কহে দশ দিক—
'সকল জগতের বন্ধু যাঁরা
তাঁদের শত্রুরে ধিক্ !'
শুনিয়া কাশীরাজ উঠিল রাগি—
'নগরে কেন এত শোক !
আমি তো আছি, তবু কাহার লাগি
কাঁদিয়া মরে যত লোক !
আমার বাহুবলে হারিয়া তবু
আমারে করিবে সে জয় !
অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু
শাস্ত্রে এইমতো কয় ।
মন্ত্রী, রটি দাও নগরমাঝে,
ঘোষণা করো চারি ধারে—
যে ধরি আনি দিবে কোশলরাজে
কনক শত দিব তারে ।'
ফিরিয়া রাজদূত সকল বাটী
রটনা করে দিনরাত ;
যে শোনে আঁখি মুদি রসনা কাটি
শিহরি কানে দেয় হাত ।

রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে
মলিনচীর দীনবেশে,
পথিক একজন অশ্রুনীরে
একদা শুধাইল এসে,
'কোথা গো বনবাসী, বনের শেষ,
কোশলে যাব কোন্ মুখে ?'
শুনিয়া রাজা কহে, 'অভাগা দেশ,
সেথায় যাবে কোন্ দুখে !'
পথিক কহে, 'আমি বণিকজাতি,
ডুবিয়া গেছে মোর তরী ।

এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি
কেমনে রব প্রাণ ধরি !
করুণাপারাবার কোশলপতি
শুনেছি নাম চারি ধারে,
অনাথনাথ তিনি দীনের গতি,
চলেছে দীন তাঁরি দ্বারে ।'
শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে
রুধিলা নয়নের বারি,
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে
কহিলা নিশ্বাস ছাড়ি,
'পান্থ, যেথা তব বাসনা পুরে
দেখায়ে দিব তারি পথ—
এসেছ বহু দুখে অনেক দূরে,
সিদ্ধ হবে মনোরথ ।'

বসিয়া কাশীরাজ সভার মাঝে ;
দাঁড়ালো জটাধারী এসে ।
'হেথায় আগমন কিসের কাজে'
নৃপতি শুধাইল হেসে ।
'কোশলরাজ আমি বনভবন'
কহিলা বনবাসী ধীরে—
'আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহো তা মোর সাথিটিরে ।'
উঠিল চমকিয়া সভার লোকে,
নীরব হল গৃহতল ;
বর্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল ।
মৌন রহি রাজা ক্ষণেকতরে
হাসিয়া কহে, 'ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি !
তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে—
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ,
হৃদয় দিব তারি সনে ।'
জীর্ণ-চীর-পরা বনবাসীরে
বসালো নৃপ রাজাসনে,
মুকুট তুলি দিল মলিন শিরে—
ধন্য কহে পুরজনে ।

২১ কার্তিক ১৩০৪

পূজারিনী

অবদানশতক

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদনখকণা তাঁর ।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদকাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ
শিল্পশোভার সার ।

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনকপ্রদীপমালা ।

অজাতশত্রু রাজা হল যবে,
পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে—
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি ।

কহিল ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে,
'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ হবে ।'

সেদিন শারদ-দিবা-অবসান—
শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া,
পুষ্পপ্রদীপ থালায় বাহিয়া,
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়ালো আসি ।

শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা,
'এ কথা নাহি কি মনে,

অজাতশত্রু করেছে রটনা
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্বাসনে ?'

সেথা হতে ফিরি গেল চলি ধীরে
বধূ অমিতার ঘরে ।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
সীমন্তসীমা-'পরে

শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা,
কাঁপি গেল তার হাত—
কহিল, 'অবোধ, কী সাহস-বলে
এনেছিস পূজা ! এখনি যা চলে ।
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে
বিষম বিপদপাত ।'

অস্তরবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্যকাহিনী,
চমকি উঠিল শুনি কিংকিণী—
চাহিয়া দেখিল দ্বারে ।

শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে ।
কহে সাবধানে তার কানে কানে,
'রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমন ক'রে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে !'

দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্যথালি ।
'হে পুরবাসিনী', সবে ডাকি কয়,
'হয়েছে প্রভুর পূজার সময়'—
শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি ।

দিবসের শেষ আলোক মিলালো
নগরসৌধ-'পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ—
আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজদেবালয়-ঘরে।

শারদনিশির স্বচ্ছ তিমিরে
তারা অগণ্য জ্বলে।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
'মন্ত্রণাসভা হল সমাধান'
দ্বারী ফুকারিয়া বলে।

এমন সময়ে হেরিল চমকি
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কানন-মাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মতো!

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি
শুধালো, 'কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি!'
মধুর কণ্ঠে শুনিল, 'শ্রীমতী,
আমি বুদ্ধের দাসী।'

সেদিন শুভ্র পাষাণফলকে
পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা!

১৮ আশ্বিন ১৩০৬

অভিসার

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত—
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণগগনে
ঘন মেঘে অবলুপ্ত ।

কাহার নূপুরশিঞ্জিত পদ
সহসা বাজিল বক্ষে !
সন্ন্যাসীবর চমকি জাগিল,
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,
রূঢ় দীপের আলোক লাগিল
ক্ষমাসুন্দর চক্ষে ।

নগরীর নটী চলে অভিসারে
যৌবনমদে মত্তা ।
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরন,
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ—
সন্ন্যাসী-গায়ে পড়িতে চরণ
থামিল বাসবদত্তা ।

প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার
নবীন গৌরকান্তি—
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দুসমান
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি ।

কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে,
নয়নে জড়িত লজ্জা,
'ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর,
দয়া কর যদি গৃহে চলো মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর
এ নহে তোমার শয্যা ।'

সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে,
'অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,

এখনো আমার সময় হয় নি,
যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী,
সময় যেদিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।'

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায়
মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে
হাসিল অট্টহাস্য।

...

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ,
এসেছে চৈত্রসন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা।

অতি দূর হতে আসিছে পবনে
বাঁশির মদির মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে—
শূন্য নগরী নিরখি নীরবে
হাসিছে পূর্ণচন্দ্র।

নির্জন পথে জ্যোৎস্না-আলোতে
সন্ন্যাসী একা যাত্রী।
মাথার উপরে তরুবীথিকার
কোকিল কুহরি উঠে বারবার,
এতদিন পরে এসেছে কি তাঁর
আজি অভিসাররাত্রি?

নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী
বাহিরপ্রাচীরপ্রান্তে।
দাঁড়ালেন আসি পরিখার পারে—
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে
কে ওই রমণী প'ড়ে এক ধারে
তাঁহার চরণোপান্তে!

নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায়
ভরে গেছে তার অঙ্গ—

রোগমসীঢালা কালী তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুরপরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি' পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।

সন্ন্যাসী বসি আড়ষ্ট শির
তুলি নিল নিজ অঙ্কে—
ঢালি দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির-'পরে,
লেপি দিল দেহ আপনার করে
শীতচন্দনপঙ্কে।

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামত্তা।
'কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়'
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
'আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা!'

১৯ আশ্বিন ১৩০৬

পরিশোধ

মহাবস্তুবদান

'রাজকোষ হতে চুরি! ধরে আন চোর,
নহিলে নগরপাল, রক্ষা নাহি তোর—
মুণ্ড রহিবে না দেহে!' রাজার শাসনে
রক্ষীদল পথে পথে ভবনে ভবনে
চোর খুঁজে খুঁজে ফিরে। নগর-বাহিরে
ছিল শুয়ে বজ্রসেন বিদীর্ণ মন্দিরে
বিদেশী বণিক পান্থ তক্ষশিলাবাসী;
অশ্ব বেচিবার তরে এসেছিল কাশী,
দস্যুহস্তে খোয়াইয়া নিঃস্ব রিক্ত শেষে
ফিরিয়া চলিতেছিল আপনার দেশে
নিরাশ্বাসে— তাহারে ধরিল চোর বলি।
হস্তে পদে বাঁধি তার লোহার শিকলি
লইয়া চলিল বন্দীশালে।

সেই ক্ষণে
সুন্দরীপ্রধানা শ্যামা বসি বাতায়নে
প্রহর যাপিতেছিল আলস্যে কৌতুকে
পথের প্রবাহ হেরি— নয়নসম্মুখে

স্বপ্নসম লোকযাত্রা। সহসা শিহরি
কাঁপিয়া কহিল শ্যামা, 'আহা মরি মরি!
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে! শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি
শ্যামা ডাকিতেছে তারে, বন্দী সাথে লয়ে
একবার আসে যেন এ ক্ষুদ্র আলয়ে
দয়া করি!' শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে
উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে
রোমাঞ্চিত; সত্বর পশিল গৃহমাঝে,
পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে
আরক্তকপোল। কহে রক্ষী হাস্যভরে,
'অতিশয় অসময়ে অভাজন-'পরে
অযাচিত অনুগ্রহ! চলেছি সম্প্রতি
রাজকার্যে। সুদর্শনে, দেহো অনুমতি।'
বজ্রসেন তুলি শির সহসা কহিলা,
'একি লীলা, হে সুন্দরী, একি তব লীলা!
পথ হতে ধরে আনি কিসের কৌতুকে
নির্দোষ এ প্রবাসীর অবমানদুখে
করিতেছ অবমান!' শুনি শ্যামা কহে,
'হায় গো বিদেশী পান্থ, কৌতুক এ নহে,
আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ-অলংকার
সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজদেহে; তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।'
এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হতে। কহিল রক্ষীরে,
'আমার যা আছে লয়ে নির্দোষ বন্দীরে
মুক্ত করে দিয়ে যাও।' কহিল প্রহরী,
'তব অনুনয় আজি ঠেলিনু সুন্দরী,
এত এ অসাধ্য কাজ। হৃত রাজকোষ,
বিনা কারো প্রাণপাতে নৃপতির রোষ
শান্তি মানিবে না।' ধরি প্রহরীর হাত
কাতরে কহিল শ্যামা, 'শুধু দুটি রাত
বন্দীরে বাঁচায়ে রেখো এ মিনতি করি।'
'রাখিব তোমার কথা' কহিল প্রহরী।

দ্বিতীয় রাত্রির শেষে খুলি বন্দীশালা
রমণী পশিল কক্ষে, হাতে দীপ জ্বালা,

লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা যেথা বজ্রসেন
মৃত্যুর প্রভাত চেয়ে মৌনী জপিছেন
ইষ্টনাম। রমণীর কটাক্ষ-ইঙ্গিতে
রক্ষী আসি খুলি দিল শৃঙ্খল চকিতে।
বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে বন্দী নিরখিল
সেই শুভ্র সুকোমল কমল-উন্মীল
অপরূপ মুখ। কহিল গদ্‌গদস্বরে
'বিকারের বিভীষিকা-রজনীর 'পরে
করধৃতশুকতারা শুভ্র উষা-সম
কে তুমি উদিলে আসি কারাকক্ষে মম—
মুমূর্ষুর প্রাণরূপা, মুক্তিরূপা অয়ি,
নিষ্ঠুর নগরী-মাঝে লক্ষ্মী দয়াময়ী!'

'আমি দয়াময়ী!' রমণীর উচ্চহাসে
চকিতে উঠিল জাগি নবভয়ত্রাসে
ভয়ংকর কারাগার। হাসিতে হাসিতে
উন্মত্ত উৎকট হাস্য শোকাশ্রুরাশিতে
শতধা পড়িল ভাঙি। কাঁদিয়া কহিলা,
'এ পুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর!'
এত বলি দৃঢ়বলে ধরি হস্ত তার
বজ্রসেনে লয়ে গেল কারার বাহিরে।

তখন জাগিছে উষা বরুণার তীরে
পূর্ব বনান্তরে। ঘাটে বাঁধা আছে তরী।
'হে বিদেশী, এসো এসো' কহিল সুন্দরী
দাঁড়ায়ে নৌকার 'পরে, 'হে আমার প্রিয়,
শুধু এই কথা মোর স্মরণে রাখিয়ো—
তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
সকল বন্ধন টুটি হে হৃদয়স্বামী,
জীবনমরণপ্রভু!' নৌকা দিল খুলি।
দুই তীরে বনে বনে গাহে পাখিগুলি
আনন্দ-উৎসব-গান। প্রেয়সীর মুখ
দুই বাহু দিয়া তুলি ভরি নিজবুক
বজ্রসেন শুধাইল, 'কহো মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
সম্পূর্ণ জানিতে চাহি অয়ি বিদেশিনী,
এ দীনদরিদ্রজন তব কাছে ঋণী
কত ঋণে।' আলিঙ্গন ঘনতর করি
'সে কথা এখন নহে' কহিল সুন্দরী।

নৌকা ভেসে চলে যায় পূর্ণবায়ুভরে
তূর্ণস্রোতোবেগে। মধ্যগগনের 'পরে
উদিল প্রচণ্ড সূর্য। গ্রামবধূগণ
গৃহে ফিরে গেছে করি স্নান সমাপন
সিক্তবস্ত্রে, কাংস্যঘটে লয়ে গঙ্গাজল।
ভেঙে গেছে প্রভাতের হাট ; কোলাহল
থেমে গেছে দুই তীরে ; জনপদবাট
পান্থহীন। বটতলে পাষাণের ঘাট,
সেথায় বাঁধিল নৌকা স্নানাহার-তরে
কর্ণধার। তন্দ্রাঘন বটশাখা-'পরে
ছায়ামগ্ন পক্ষিনীড় গীতশব্দহীন।
অলস পতঙ্গ শুধু গুঞ্জে দীর্ঘ দিন।
পক্বশস্যগন্ধহারা মধ্যাহ্নের বায়ে
শ্যামার ঘোমটা যবে ফেলিল খসায়ে
অকস্মাৎ, পরিপূর্ণ প্রণয়পীড়ায়
ব্যথিত ব্যাকুল বক্ষ, কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়,
বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে,
'ক্ষণিকশৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আমারে
বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে। কী করিয়া
সাধিলে দুঃসাধ্য ব্রত কহো বিবরিয়া।
মোর লাগি কী করেছ জানি যদি প্রিয়ে,
পরিশোধ দিব তাহা এ জীবন দিয়ে
এই মোর পণ।' বস্ত্র টানি মুখ-'পরি
'সে কথা এখনো নহে' কহিল সুন্দরী।

গুটায়ে সোনার পাল সুদূরে নীরবে
দিনের আলোকতরী চলি গেল যবে
অস্ত-অচলের ঘাটে, তীর-উপবনে
লাগিল শ্যামার নৌকা সন্ধ্যার পবনে।
শুক্ল চতুর্থীর চন্দ্র অস্তগতপ্রায়,
নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে সুদীর্ঘ রেখায়
ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ আলো ; ঝিল্লিস্বনে
তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে
বীণার তন্ত্রীর মতো। প্রদীপ নিবায়ে
তরীবাতায়নতলে দক্ষিণের বায়ে
ঘননিশ্বসিতমুখে যুবকের কাঁধে
হেলিয়া বসেছে শ্যামা। পড়েছে অবাধে
উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশি সুকোমল
তরঙ্গিত তমোজালে ছেয়ে বক্ষতল
বিদেশীর, সুনিবিড় তন্দ্রাজালসম।
কহিল অস্ফুটকণ্ঠে শ্যামা, 'প্রিয়তম,

তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ
সুকঠিন, তারো চেয়ে সুকঠিন আজ
সে কথা তোমারে বলা। সংক্ষেপে সে কব ;
একবার শুনে মাত্র মন হতে তব
সে কাহিনী মুছে ফেলো।— বালক কিশোর
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ। এ জীবনে মম
সর্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্বোত্তম,
করেছি তোমার লাগি এ মোর গৌরব।'

ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত গেল। অরণ্য নীরব
শত শত বিহঙ্গের সুপ্তি বহি শিরে
দাঁড়ায়ে রহিল স্তব্ধ। অতি ধীরে ধীরে
রমণীর কটি হতে প্রিয়বাহুডোর
শিথিল পড়িল খসে ; বিচ্ছেদ কঠোর
নিঃশব্দে বসিল দোঁহামাঝে ; বাক্যহীন
বজ্রসেন চেয়ে রহে আড়ষ্ট কঠিন
পাষাণপুত্তলি ; মাথা রাখি তার পায়ে
ছিন্নলতাসম শ্যামা পড়িল লুটায়ে
আলিঙ্গনচ্যুতা ; মসীকৃষ্ণ নদীনীরে
তীরের তিমিরপুঞ্জ ঘনাইল ধীরে।
সহসা যুবার জানু সবলে বাঁধিয়া
বাহুপাশে, আর্তনারী উঠিল কাঁদিয়া
অশ্রুহারা শুষ্ককণ্ঠে, 'ক্ষমা করো নাথ,
এ পাপের যাহা দণ্ড সে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর—
তোমা লাগি যা করেছি তুমি ক্ষমা করো।'
চরণ কাড়িয়া লয়ে চাহি তার পানে
বজ্রসেন বলি উঠে, 'আমার এ প্রাণে
তোমার কী কাজ ছিল! এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত! কলঙ্কিনী,
ধিক্ এ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী!
ধিক্ এ নিমেষপাত প্রত্যেক নিমেষে।'

এত বলি উঠিল সবলে। নিরুদ্দেশে
নৌকা ছাড়ি চলি গেলা তীরে, অন্ধকারে
বনমাঝে। শুষ্কপত্ররাশি পদভারে
শব্দ করি অরণ্যেরে করিল চকিত

প্রতিক্ষণে। ঘনগুল্মগন্ধপুঞ্জীকৃত
বায়ুশূন্য বনতলে তরুকাণ্ডগুলি
চারি দিকে আঁকাবাঁকা নানা শাখা তুলি
অন্ধকারে ধরিয়াছে অসংখ্য আকার
বিকৃত বিরূপ। রুদ্ধ হল চারি ধার।
নিস্তব্ধনিষেধসম প্রসারিল কর
লতাশৃঙ্খলিত বন। শ্রান্তকলেবর
পথিক বসিল ভূমে। কে তার পশ্চাতে
দাঁড়াইল উপচ্ছায়াসম! সাথে সাথে
অন্ধকারে পদে পদে তারে অনুসরি
আসিয়াছে দীর্ঘ পথ মৌনী অনুচরী
রক্তসিক্তপদে। দুই মুষ্টি বদ্ধ করে
গর্জিল পথিক, 'তবু ছাড়িবি না মোরে?'
রমণী বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া পড়িয়া
বন্যার তরঙ্গ-সম দিল আবরিয়া
আলিঙ্গনে কেশপাশে স্রস্তবেশবাসে
আঘ্রাণে চুম্বনে স্পর্শে সঘন নিশ্বাসে
সর্ব অঙ্গ তার; আর্দ্রগদগদবচনা
কণ্ঠরুদ্ধপ্রায় 'ছাড়িব না' 'ছাড়িব না'
কহে বারম্বার— 'তোমা লাগি পাপ, নাথ,
তুমি শাস্তি দাও মোরে, করো মর্মঘাত,
শেষ করে দাও মোর দণ্ড পুরস্কার।'

অরণ্যের গ্রহতারাহীন অন্ধকার
অন্ধভাবে কী যেন করিল অনুভব
বিভীষিকা। লক্ষ লক্ষ তরুমূল সব
মাটির ভিতরে থাকি শিহরিল ত্রাসে।
বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে
অন্তিম কাকুতিস্বর, তারি পরক্ষণে
কে পড়িল ভূমি-'পরে অসাড় পতনে।

বজ্রসেন বন হতে ফিরিল যখন,
প্রথম উষার করে বিদ্যুৎবরন
মন্দিরত্রিশূলচূড়া জাহ্নবীর পারে।
জনহীন বালুতটে নদীধারে-ধারে
কাটাইল দীর্ঘ দিন ক্ষিপ্তের মতন
উদাসীন। মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত তপন
হানিল সর্বাঙ্গে তার অগ্নিময়ী কশা।
ঘটকক্ষে গ্রামবধূ হেরি তার দশা
কহিল করুণকণ্ঠে, 'কে গো গৃহছাড়া,
এসো আমাদের ঘরে।' দিল না সে সাড়া।

তৃষায় ফাটিল ছাতি, তবু স্পর্শিল না
সম্মুখের নদী হতে জল এক কণা।
দিনশেষে জ্বরতপ্ত দগ্ধ কলেবরে
ছুটিয়া পশিল গিয়া তরণীর 'পরে,
পতঙ্গ যেমন বেগে অগ্নি দেখে ধায়
উগ্র আগ্রহের ভরে। হেরিল শয্যায়
একটি নূপুর আছে পড়ি, শতবার
রাখিল বক্ষেতে চাপি— ঝংকার তাহার
শতমুখ শরসম লাগিল বর্ষিতে
হৃদয়ের মাঝে। ছিল পড়ি এক ভিতে
নীলাম্বর বস্ত্রখানি, রাশীকৃত করি
তারি 'পরে মুখ রাখি রহিল সে পড়ি—
সুকুমার দেহগন্ধ নিশ্বাসে নিঃশেষে
লইল শোষণ করি অতৃপ্ত আবেশে।
শুক্ল পঞ্চমীর শশী অস্তাচলগামী
সপ্তপর্ণতরুশিরে পড়িয়াছে নামি
শাখা-অন্তরালে। দুই বাহু প্রসারিয়া
ডাকিতেছে বজ্রসেন 'এসো এসো প্রিয়া'
চাহি অরণ্যের পানে। হেনকালে তীরে
বালুতটে ঘনকৃষ্ণ বনের তিমিরে
কার মূর্তি দেখা দিল উপচ্ছায়াসম।

'এসো এসো প্রিয়া!' 'আসিয়াছি প্রিয়তম!'
চরণে পড়িল শ্যামা, 'ক্ষম মোরে ক্ষম!
গেল না তো সুকঠিন এ পরান মম
তোমার করুণ করে!' শুধু ক্ষণতরে
বজ্রসেন তাকাইল তার মুখ-'পরে,
ক্ষণতরে আলিঙ্গন লাগি বাহু মেলি
চমকি উঠিল, তারে দূরে দিল ঠেলি—
গরজিল, 'কেন এলি, কেন ফিরে এলি!'
বক্ষ হতে নূপুর লইয়া দিল ফেলি,
জ্বলন্ত-অঙ্গার-সম নীলাম্বরখানি
চরণের কাছ হতে ফেলে দিল টানি;
শয্যা যেন অগ্নিশয্যা, পদতলে থাকি
লাগিল দহিতে তারে। মুদি দুই আঁখি
কহিল ফিরায়ে মুখ, 'যাও যাও ফিরে,
মোরে ছেড়ে চলে যাও!' নারী নতশিরে
ক্ষণতরে রহিল নীরবে। পরক্ষণে
ভূতলে রাখিয়া জানু যুবার চরণে
প্রণমিল, তার পরে নামি নদীতীরে
আঁধার বনের পথে চলি গেল ধীরে,

নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের অপূর্ব স্বপন
নিশার তিমির-মাঝে মিলায় যেমন ।

২৩ আশ্বিন ১৩০৬

সামান্য ক্ষতি

দিব্যাবদানমালা

বহে মাঘমাসে শীতের বাতাস,
স্বচ্ছসলিলা বরুণা ।
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে,
স্নানে চলেছেন শতসখীসনে
কাশীর মহিষী করুণা ।

সে পথ সে ঘাট আজি এ প্রভাতে
জনহীন রাজশাসনে ।
নিকটে যে ক'টি আছিল কুটির
ছেড়ে গেছে লোক, তাই নদীতীর
স্তব্ধ গভীর, কেবল পাখির
কূজন উঠিছে কাননে ।

আজি উতরোল উত্তর বায়ে
উতলা হয়েছে তটিনী ।
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে,
পুলকে উছলি ঢেউ ছলছলে—
লক্ষ মানিক ঝলকি আঁচলে
নেচে চলে যেন নটিনী ।

কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলি ।
মৃণালভুজের ললিত বিলাসে
চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে,
আলাপে প্রলাপে হাসি-উচ্ছ্বাসে
আকাশ উঠিল আকুলি ।

স্নান সমাপন করিয়া যখন
কূলে উঠে নারী সকলে
মহিষী কহিলা, 'উহু ! শীতে মরি,
সকল শরীর উঠিছে শিহরি,

জ্বেলে দে আগুন ওলো সহচরী—
শীত নিবারিব অনলে।’

সখীগণ সবে কুড়াইতে কুটা
চলিল কুসুমকাননে।
কৌতুকরসে পাগলপরানী
শাখা ধরি সবে করে টানাটানি,
সহসা সবারে ডাক দিয়া রানী
কহে সহাস্য আননে—

‘ওলো তোরা আয়! ওই দেখা যায়
কুটির কাহার অদূরে,
ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল,
তপ্ত করিব করপদতল—’
এত বলি রানী রঙ্গে বিভল
হাসিয়া উঠিল মধুরে।

কহিল মালতী সকরুণ অতি,
‘একি পরিহাস রানীমা!
আগুন জ্বালায়ে কেন দিবে নাশি?
এ কুটির কোন্ সাধু সন্ন্যাসী
কোন্ দীনজন কোন্ পরবাসী
বাঁধিয়াছে নাহি জানি মা!’

রানী কহে রোষে, ‘দূর করি দাও
এই দীনদয়াময়ীরে।’
অতি দুর্দাম কৌতুকরত
যৌবনমদে নিষ্ঠুর যত
যুবতীরা মিলি পাগলের মতো
আগুন লাগালো কুটিরে।

ঘন ঘোর ধূম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িল।
দেখিতে দেখিতে হুহু হুংকারি
ঝলকে ঝলকে উল্কা উগারি
শত শত লোল জিহ্বা প্রসারি
বহ্নি আকাশ জুড়িল।

পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিল যেন রে
জ্বালাময়ী যত নাগিনী।

ফণা নাচাইয়া অম্বরপানে
মাতিয়া উঠিল গর্জনগানে,
প্রলয়মত্ত রমণীর কানে
বাজিল দীপক রাগিণী।

প্রভাতপাখির আনন্দগান
ভয়ের বিলাপে টুটিল—
দলে দলে কাক করে কোলাহল,
উত্তরবায়ু হইল প্রবল,
কুটির হইতে কুটিরে অনল
উড়িয়া উড়িয়া ছুটিল।

ছোটো গ্রামখানি লেহিয়া লইল
প্রলয়লোলুপ রসনা।
জনহীন পথে মাঘের প্রভাতে
প্রমোদক্লান্ত শত সখী-সাথে
ফিরে গেল রানী কুবলয় হাতে
দীপ্ত-অরুণ-বসনা।

তখন সভায় বিচার-আসনে
বসিয়াছিলেন ভূপতি।
গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে,
দ্বিধাকম্পিত গদগদ ভাষে
নিবেদিল দুখ সংকোচে ত্রাসে
চরণে করিয়া বিনতি।

সভাসন ছাড়ি উঠি গেল রাজা
রক্তিমমুখ শরমে।
অকালে পশিলা রানীর আগার—
কহিলা, 'মহিষী, একি ব্যবহার!
গৃহ জ্বালাইলে অভাগা প্রজার
বলো কোন্ রাজধরমে!'

রুষিয়া কহিল রাজার মহিষী,
'গৃহ কহ তারে কী বোধে!
গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটির,
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর?
কত ধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে!'

কহিলেন রাজা উদ্যত রোষ
রুধিয়া দীপ্ত হৃদয়ে—

'যতদিন তুমি আছ রাজরানী
দীনের কুটিরে দীনের কী হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি—
বুঝাব তোমারে নিদয়ে ।'

রাজার আদেশে কিংকরী আসি
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া—
অরুণবরন অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে দিল টানি,
ভিখারি নারীর চীরবাস আনি
দিল রানীদেহে তুলিয়া ।

পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,
'মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে—
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে-ক'টি কুটির হল ছারখার
যত দিনে পার সে-ক'টি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে ।

'বৎসরকাল দিলেম সময়,
তার পরে ফিরে আসিয়া
সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতী
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
জীর্ণ কুটির নাশিয়া ।'

২৫ আশ্বিন ১৩০৬

মূল্যপ্রাপ্তি

অবদানশতক

অঘ্রানে শীতের রাতে নিষ্ঠুরশিশিরঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া—
সুদাস মালীর ঘরে কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কী করিয়া ।
তুলি লয়ে বেচিবারে গেল সে প্রাসাদদ্বারে,
মাগিল রাজার দরশন—
হেনকালে হেরি ফুল আনন্দে পুলকাকুল
পথিক কহিল একজন,
'অকালের পদ্ম তব আমি এটি কিনি লব,
কত মূল্য লইবে ইহার ?

বুদ্ধ ভগবান আজ এসেছেন পুরমাঝ
তাঁর পায়ে দিব উপহার।'
মালী কহে, 'এক মাষা স্বর্ণ পাব মনে আশা।'
পথিক চাহিল তাহা দিতে—
হেনকালে সমারোহে বহু পূজা-অর্ঘ্য বহে
নৃপতি বাহিরে আচম্বিতে।
রাজেন্দ্র প্রসেনজিৎ উচ্চারি মঙ্গলগীত
চলেছেন বুদ্ধদরশনে—
হেরি অকালের ফুল শুধালেন, 'কত মূল ?
কিনি দিব প্রভুর চরণে।'
মালী কহে, 'হে রাজন্, স্বর্ণমাষা দিয়ে পণ
কিনিছেন এই মহাশয়।'
'দশ মাষা দিব আমি' কহিলা ধরণীস্বামী,
'বিশ মাষা দিব' পান্থ কয়।
দোঁহে কহে 'দেহো দেহো', হার নাহি মানে কেহ—
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।
মালী ভাবে যাঁর তরে এ দোঁহে বিবাদ করে
তাঁরে দিলে আরো পাব কত !
কহিল সে করজোড়ে, 'দয়া করে ক্ষম মোরে—
এ ফুল বেচিতে নাহি মন।'
এত বলি ছুটিল সে যেথা রয়েছেন বসে
বুদ্ধদেব উজলি কানন।
বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর-'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।
সুদাস রহিল চাহি— নয়নে নিমেষ নাহি,
মুখে তার বাক্য নাহি সরে।
সহসা ভূতলে পড়ি পদ্মটি রাখিল ধরি
প্রভুর চরণপদ্ম-'পরে।
বরষি অমৃতরাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি,
'কহো বৎস, কী তব প্রার্থনা।'
ব্যাকুল সুদাস কহে, 'প্রভু, আর কিছু নহে,
চরণের ধূলি এক কণা।'

২৬ আশ্বিন ১৩০৬

নগরলক্ষ্মী

কল্পদ্রুমাবদান

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে,
বুদ্ধ নিজভক্তগণে শুধালেন জনে জনে,
'ক্ষুধিতেরে অন্নদানসেবা
তোমরা লইবে বলো কেবা ?'

শুনি তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট ।
কহিল সে কর জুড়ি, 'ক্ষুধার্ত বিশাল পুরী,
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি
এমন ক্ষমতা নাই স্বামী !'

কহিল সামন্ত জয়সেন,
'যে আদেশ প্রভু করিছেন
তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হ'ত কোনো কাজ—
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ !'

নিশ্বাসিয়া কহে ধর্মপাল,
'কী কব, এমন দগ্ধ ভাল,
আমার সোনার খেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত,
রাজকর জোগানো কঠিন—
হয়েছি অক্ষম দীনহীন ।'

রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারও উত্তর কিছু নাহি ।
নির্বাক সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি ।

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্রশিরে
অনাথপিণ্ডদসুতা বেদনায় অশ্রুপ্লুতা,
বুদ্ধের চরণরেণু লয়ে
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়ে—

'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া ।

কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা,
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।'

বিস্ময় মানিল সবে শুনি—
'ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী!
কোন্ অহংকারে মাতি লইলে মস্তক পাতি
এ-হেন কঠিন গুরু কাজ!
কী আছে তোমার কহো আজ।'

কহিল সে নমি সবা-কাছে,
'শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।
আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া—
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে।
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।'

২৭ আশ্বিন ১৩০৬

অপমান-বর

ভক্তমাল

ভক্ত কবীর সিদ্ধপুরুষ খ্যাতি রটিয়াছে দেশে।
কুটির তাহার ঘিরিয়া দাঁড়ালো লাখো নরনারী এসে।
কেহ কহে 'মোর রোগ দূর করি মন্ত্র পড়িয়া দেহো',
সন্তান লাগি করে কাঁদাকাটি বন্ধ্যা রমণী কেহ।
কেহ বলে 'তব দৈব ক্ষমতা চক্ষে দেখাও মোরে',
কেহ কয় 'ভবে আছেন বিধাতা বুঝাও প্রমাণ করে'।

কাঁদিয়া ঠাকুরে কাতর কবীর কহে দুই জোড়করে,
'দয়া করে হরি জন্ম দিয়েছ নীচ যবনের ঘরে—
ভেবেছিনু কেহ আসিবে না কাছে অপার কৃপায় তব,
সবার চোখের আড়ালে কেবল তোমায় আমায় রব।
একি কৌশল খেলেছ মায়াবী, বুঝি দিলে মোরে ফাঁকি।
বিশ্বের লোক ঘরে ডেকে এনে তুমি পালাইবে নাকি!'

ব্রাহ্মণ যত নগরে আছিল উঠিল বিষম রাগি—
লোক নাহি ধরে যবন জোলার চরণধুলার লাগি !
চারি পোওয়া কলি পুরিয়া আসিল পাপের বোঝায় ভরা,
এর প্রতিকার না করিলে আর রক্ষা না পায় ধরা ।
ব্রাহ্মণদল যুক্তি করিল নষ্ট নারীর সাথে—
গোপনে তাহারে মন্ত্রণা দিল, কাঞ্চন দিল হাতে ।

বসন বেচিতে এসেছে কবীর একদা হাটের বারে,
সহসা কামিনী সবার সামনে কাঁদিয়া ধরিল তারে ।
কহিল, 'রে শঠ, নিঠুর কপট, কহি নে কাহারও কাছে—
এমনি করে কি সরলা নারীরে ছলনা করিতে আছে !
বিনা অপরাধে আমারে ত্যজিয়া সাধু সাজিয়াছ ভালো,
অন্নবসন বিহনে আমার বরন হয়েছে কালো !'

কাছে ছিল যত ব্রাহ্মণদল করিল কপট কোপ,
'ভণ্ডতাপস, ধর্মের নামে করিছ ধর্মলোপ !
তুমি সুখে ব'সে ধুলা ছড়াইছ সরল লোকের চোখে,
অবলা অখলা পথে পথে আহা ফিরিছে অন্নশোকে !'
কহিল কবীর, 'অপরাধী আমি, ঘরে এসো নারী তবে—
আমার অন্ন রহিতে কেন বা তুমি উপবাসী রবে ?'

দুষ্টা নারীরে আনি গৃহমাঝে বিনয়ে আদর করি
কবীর কহিল, 'দীনের ভবনে তোমারে পাঠালো হরি ।'
কাঁদিয়া তখন কহিল রমণী লাজে ভয়ে পরিতাপে,
'লোভে পড়ে আমি করিয়াছি পাপ, মরিব সাধুর শাপে ।'
কহিল কবীর, 'ভয় নাই মাতঃ, লইব না অপরাধ—
এনেছ আমার মাথার ভূষণ অপমান অপবাদ ।'

ঘুচাইল তার মনের বিকার, করিল চেতনা দান—
সঁপি দিল তার মধুর কণ্ঠে হরিনামগুণগান ।
রটি গেল দেশে— কপট কবীর, সাধুতা তাহার মিছে ।
শুনিয়া কবীর কহে নতশির, 'আমি সকলের নীচে ।
যদি কূল পাই তরণী-গরব রাখিতে না চাহি কিছু—
তুমি যদি থাক আমার উপরে আমি রব সব-নিচু ।'

রাজার চিত্তে কৌতুক হল শুনিতে সাধুর গাথা ।
দূত আসি তাঁরে ডাকিল যখন সাধু নাড়িলেন মাথা ।
কহিলেন, 'থাকি সবা হতে দূরে আপন হীনতা-মাঝে ;
আমার মতন অভাজন জন রাজার সভায় সাজে !'
দূত কহে, 'তুমি না গেলে ঘটিবে আমাদের পরমাদ,
যশ শুনে তব হয়েছে রাজার সাধু দেখিবার সাধ ।'

রাজা বসে ছিল সভার মাঝারে, পারিষদ সারি সারি—
কবীর আসিয়া পশিল সেথায় পশ্চাতে লয়ে নারী।
কেহ হাসে কেহ করে ভুরুকুটি, কেহ রহে নতশিরে,
রাজা ভাবে— এটা কেমন নিলাজ রমণী লইয়া ফিরে !
ইঙ্গিতে তাঁর সাধুরে সভার বাহির করিল দ্বারী,
বিনয়ে কবীর চলিল কুটিরে সঙ্গে লইয়া নারী।

পথমাঝে ছিল ব্রাহ্মণদল, কৌতুকভরে হাসে—
শুনায়ে শুনায়ে বিদ্রূপবাণী কহিল কঠিন ভাষে।
তখন রমণী কাঁদিয়া পড়িল সাধুর চরণমূলে—
কহিল, 'পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে মোরে তুলে !
কেন অধমারে রাখিয়া দুয়ারে সহিতেছ অপমান !'
কহিল কবীর, 'জননী, তুমি যে আমার প্রভুর দান।'

২৮ আশ্বিন ১৩০৬

স্বামীলাভ

ভক্তমাল

একদা তুলসীদাস জাহ্নবীর তীরে
নির্জন শ্মশানে
সন্ধ্যায় আপন-মনে একা একা ফিরে
মাতি নিজগানে।
হেরিলেন মৃত পতি -চরণের তলে
বসিয়াছে সতী,
তারি সনে একসাথে এক চিতানলে
মরিবারে মতি।
সঙ্গীগণ মাঝে মাঝে আনন্দচীৎকারে
করে জয়নাদ,
পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা ঘেরি চারি ধারে
গাহে সাধুবাদ।

সহসা সাধুরে নারী হেরিয়া সম্মুখে
করিয়া প্রণতি
কহিল বিনয়ে, 'প্রভো, আপন শ্রীমুখে
দেহো অনুমতি।'
তুলসী কহিল, 'মাতঃ, যাবে কোন্‌খানে,
এত আয়োজন !'
সতী কহে, 'পতিসহ যাব স্বর্গপানে
করিয়াছি মন।'

'ধরা ছাড়ি কেন, নারী, স্বর্গ চাহ তুমি'
সাধু হাসি কহে--
'হে জননী, স্বর্গ যাঁর, এ ধরণীভূমি
তাঁহারি কি নহে ?'

বুঝিতে না পারি কথা নারী রহে চাহি
বিস্ময়ে অবাক্—
কহে করজোড় করি, 'স্বামী যদি পাই
স্বর্গ দূরে থাক্ ।'
তুলসী কহিল হাসি, 'ফিরে চলো ঘরে,
কহিতেছি আমি,
ফিরে পাবে আজ হতে মাসেকের পরে
আপনার স্বামী ।'
রমণী আশার বশে গৃহে ফিরে যায়
শ্মশান তেয়াগি—
তুলসী জাহ্নবীতীরে নিস্তব্ধ নিশায়
রহিলেন জাগি ।

নারী রহে শুদ্ধচিতে নির্জন ভবনে—
তুলসী প্রত্যহ
কী তাহারে মন্ত্র দেয় নারী একমনে
ধ্যায় অহরহ ।
এক মাস পূর্ণ হতে প্রতিবেশীদলে
আসি তার দ্বারে
শুধাইল, 'পেলে স্বামী ?' নারী হাসি বলে,
'পেয়েছি তাঁহারে ।'
শুনি ব্যগ্র কহে তারা, 'কহো তবে কহো
আছে কোন্ ঘরে ।'
নারী কহে, 'রয়েছেন প্রভু অহরহ
আমারি অন্তরে ।'

২৯ আশ্বিন ১৩০৬

স্পর্শমণি

ভক্তমাল

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম,
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম ।

শুধালেন সনাতন, 'কোথা হতে আগমন,
কী নাম ঠাকুর ?'
বিপ্র কহে, 'কিবা কব, পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি বহুদূর ।
জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম,
জিলা বর্ধমানে—
এতবড়ো ভাগ্যহত দীনহীন মোর মতো
নাই কোনোখানে ।
জমিজমা আছে কিছু, করে আছি মাথা নিচু,
অল্পস্বল্প পাই ।
ক্রিয়াকর্ম-যজ্ঞযাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে,
আজ কিছু নাই ।
আপন উন্নতি লাগি শিব-কাছে বর মাগি
করি আরাধনা ।
একদিন নিশিভোরে স্বপ্নে দেব কন মোরে—
পুরিবে প্রার্থনা—
যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধরো দুটি পায় !
তাঁরে পিতা বলি মেনো, তাঁরি হাতে আছে জেনো
ধনের উপায় ।'

শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন—
'কী আছে আমার !
যাহা ছিল সে সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি—
ভিক্ষামাত্র সার ।'
সহসা বিস্মৃতি ছুটে, সাধু ফুকারিয়া উঠে,
'ঠিক বটে ঠিক ।
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশমানিক ।
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে
পুঁতেছি বালুতে—
নিয়ে যাও হে ঠাকুর, দুঃখ তব হবে দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে ।'

বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি,
লোহার মাদুলি দুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি,
ছুঁইল যেমনি ।
ব্রাহ্মণ বালুর 'পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে—
ভাবে নিজে নিজে ।
যমুনা কল্লোলগানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কী যে !

নদীপারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে—
তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে
কহে অশ্রুজলে,
'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে।' এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মানিক।

২৯ আশ্বিন ১৩০৬

বন্দী বীর

পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্ম্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে গুরুজির জয়
ধ্বনিয়া তুলেছে দিক্।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্যের পানে
চাহিল নির্নিমিখ।

'অলখ নিরঞ্জন'
মহারব উঠে বন্ধন টুটে
করে ভয়ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে
অসি বাজে ঝন্‌ঝন।
পঞ্জাব আজি গরজি উঠিল,
'অলখ নিরঞ্জন!'

এসেছে সে এক দিন
লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারও ঋণ।
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য,
চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চনদীর ঘিরি দশ তীর
এসেছে সে এক দিন।

দিল্লিপ্রাসাদকূটে
হোথা বারবার বাদশাজাদার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে ।
কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে,
নিবিড় নিশীথ টুটে—
কাদের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফুটে !

পঞ্চনদীর তীরে
ভক্তদেহের রক্তলহরী
মুক্ত হইল কি রে !
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষীসমান
ছুটে যেন নিজনীড়ে ।
বীরগণ জননীরে
রক্ততিলক ললাটে পরালো
পঞ্চনদীর তীরে ।

মোগল-শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুইজনা দুইজনে ।
দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ
যুঝে ভুজঙ্গ-সনে ।
সেদিন কঠিন রণে
'জয় গুরুজির' হাঁকে শিখ বীর
সুগভীর নিঃস্বনে ।
মত্ত মোগল রক্তপাগল
'দীন্ দীন্' গরজনে ।

গুরুদাসপুর গড়ে
বন্দা যখন বন্দী হইল
তুরানি সেনার করে,
সিংহের মতো শৃঙ্খলগত
বাঁধি লয়ে গেল ধরে
দিল্লিনগর-'পরে ।
বন্দা সমরে বন্দী হইল
গুরুদাসপুর গড়ে ।

সম্মুখে চলে মোগল-সৈন্য
উড়ায়ে পথের ধূলি,

ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া
বর্শাফলকে তুলি ।
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে,
বাজে শৃঙ্খলগুলি ।
রাজপথ-'পরে লোক নাহি ধরে,
বাতায়ন যায় খুলি ।
শিখ গরজয়, 'গুরুজির জয়'
পরানের ভয় ভুলি ।
মোগলে ও শিখে উড়ালো আজিকে
দিল্লিপথের ধূলি ।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি ।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে
বন্দীরা সারি সারি
'জয় গুরুজির' কহি শত বীর
শত শির দেয় ডারি ।

সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি
বন্দার এক ছেলে ।
কহিল, 'ইহারে বধিতে হইবে
নিজহাতে অবহেলে ।'
দিল তার কোলে ফেলে
কিশোর কুমার, বাঁধা বাহু তার,
বন্দার এক ছেলে ।

কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা সুধীরে ছোটো ছেলেটিরে
লইল বক্ষে টানি ।
ক্ষণকালতরে মাথার উপরে
রাখে দক্ষিণ পাণি,
শুধু একবার চুম্বিল তার
রাঙা উষ্ণীষখানি ।

তার পরে ধীরে কটিবাস হতে
ছুরিকা খসায়ে আনি
বালকের মুখ চাহি
'গুরুজির জয়' কানে কানে কয়,
'রে পুত্র, ভয় নাহি ।'

নবীন বদনে অভয় কিরণ
জ্বলি উঠে উৎসাহি—
কিশোর কণ্ঠে কাঁপে সভাতল
বালক উঠিল গাহি
'গুরুজির জয়, কিছু নাহি ভয়'
বন্দার মুখ চাহি।

বন্দা তখন বামবাহুপাশ
জড়াইল তার গলে,
দক্ষিণ করে ছেলের বক্ষে
ছুরি বসাইল বলে—
'গুরুজির জয়' কহিয়া বালক
লুটালো ধরণীতলে।

সভা হল নিস্তব্ধ
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক
সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি'
একটি কাতর শব্দ।
দর্শকজন মুদিল নয়ন,
সভা হল নিস্তব্ধ।

৩০ আশ্বিন ১৩০৬

মানী

আরঙজেব ভারত যবে
করিতেছিল খান-খান
মারবপতি কহিলা আসি,
'করহ প্রভু অবধান,
গোপন রাতে অচলগড়ে
নহর যাঁরে এনেছে ধরে
বন্দী তিনি আমার ঘরে
সিরোহিপতি সুরতান।
কী অভিলাষ তাঁহার 'পরে
আদেশ মোরে করো দান।'

শুনিয়া কহে আরঙজেব,
'কী কথা শুনি অদ্ভুত !
এতদিনে কি পড়িল ধরা
অশনিভরা বিদ্যুৎ ?

পাহাড়ি লয়ে কয়েক শত
পাহাড়ে বনে ফিরিতে রত
মরুভূমির মরীচি-মতো
স্বাধীন ছিল রাজপুত !
দেখিতে চাহি, আনিতে তারে
পাঠাও কোনো রাজদূত ।'

মাড়োয়ারাজ যশোবন্ত
কহিলা তবে জোড়কর,
'ক্ষত্রকুলসিংহশিশু
লয়েছে আজি মোর ঘর—
বাদশা তাঁরে দেখিতে চান,
বচন আগে করুন দান
কিছুতে কোনো অসম্মান
হবে না কভু তাঁর 'পর ।
সভায় তবে আপনি তাঁরে
আনিব করি সমাদর ।'

আরঙজেব কহিলা হাসি,
'কেমন কথা কহ আজ !
প্রবীণ তুমি প্রবল বীর
মাড়োয়াপতি মহারাজ ।
তোমার মুখে এমন বাণী
শুনিয়া মনে শরম মানি,
মানীর মান করিব হানি
মানীরে শোভে হেন কাজ ?
কহিনু আমি, চিন্তা নাহি,
আনহ তাঁরে সভামাঝ ।'

সিরোহিপতি সভায় আসে
মাড়োয়ারাজে লয়ে সাথ,
উচ্চশির উচ্চে রাখি
সমুখে করে আঁখিপাত ।
কহিল সবে বজ্রনাদে
'সেলাম করো বাদশাজাদে'—
হেলিয়া যশোবন্ত-কাঁধে
কহিলা ধীরে নরনাথ,
'গুরুজনের চরণ ছাড়া
করি নে কারে প্রণিপাত ।'

কহিলা রোষে রক্ত-আঁখি
বাদশাহের অনুচর,

'শিখাতে পারি কেমনে মাথা
লুটিয়া পড়ে ভূমি-'পর।'
হাসিয়া কহে সিরোহিপতি,
'এমন যেন না হয় মতি
ভয়েতে কারে করিব নতি,
জানি নে কভু ভয়-ডর।'
এতেক বলি দাঁড়ালো রাজা
কৃপাণ-'পরে করি ভর।

বাদশা ধরি সুরতানেরে
বসায়ে নিল নিজপাশ—
কহিলা, 'বীর, ভারত-মাঝে
কী দেশ-'পরে তব আশ?'
কহিলা রাজা, 'অচলগড়
দেশের সেরা জগৎ-'পর।'
সভার মাঝে পরস্পর
নীরবে উঠে পরিহাস।
বাদশা কহে, 'অচল হয়ে
অচলগড়ে করো বাস।'

১ কার্তিক ১৩০৬

প্রার্থনাতীত দান

শিখের পক্ষে বেণীচ্ছেদন ধর্মপরিত্যাগের ন্যায় দূষণীয়

পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল
বন্দী শিখের দল—
সুহিদ্‌গঞ্জে রক্তবরন
হইল ধরণীতল।
নবাব কহিল, 'শুন তরুসিং,
তোমারে ক্ষমিতে চাই।'
তরুসিং কহে, 'মোরে কেন তব
এত অবহেলা ভাই?'
নবাব কহিল, 'মহাবীর তুমি,
তোমারে না করি ক্রোধ—
বেণীটি কাটিয়া দিয়ে যাও মোরে
এই শুধু অনুরোধ।'
তরুসিং কহে, 'করুণা তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা—
যা চেয়েছ তার কিছু বেশি দিব,
বেণীর সঙ্গে মাথা।'

২ কার্তিক ১৩০৬

রাজবিচার

রাজস্থান

বিপ্র কহে, 'রমণী মোর আছিল যেই ঘরে
নিশীথে সেথা পশিল চোর ধর্মনাশ-তরে।
বেঁধেছি তারে, এখন কহো চোরে কী দিব সাজা।'
'মৃত্যু' শুধু কহিলা তারে রতনরাও রাজা।

ছুটিয়া আসি কহিল দূত, 'চোর সে যুবরাজ—
বিপ্র তাঁরে ধরেছে রাতে, কাটিল প্রাতে আজ।
ব্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে, কী তারে দিব সাজা?'
'মুক্তি দাও' কহিলা শুধু রতনরাও রাজা।

৪ কার্তিক ১৩০৬

গুরু গোবিন্দ

'বন্ধু, তোমরা ফিরে যাও ঘরে
এখনো সময় নয়'—
নিশি অবসান, যমুনার তীর,
ছোটো গিরিমালা, বন সুগভীর,
গুরু গোবিন্দ কহিলা ডাকিয়া
অনুচর গুটি ছয়।

'যাও রামদাস, যাও গো লেহারি,
সাহু, ফিরে যাও তুমি।
দেখায়ো না লোভ, ডাকিয়ো না মোরে
ঝাঁপায়ে পড়িতে কর্মসাগরে—
এখনো পড়িয়া থাক্ বহু দূরে
জীবনরঙ্গভূমি।

'ফিরায়েছি মুখ, রুধিয়াছি কান,
লুকায়েছি বনমাঝে।
সুদূরে মানবসাগর অগাধ
চিরক্রন্দিত-ঊর্মি-নিনাদ,
হেথায় বিজনে রয়েছি মগন
আপন গোপন কাজে।

'মানবের প্রাণ ডাকে যেন মোরে
সেই লোকালয় হতে।

সুপ্ত নিশীথে জেগে উঠে তাই
চমকিয়া উঠে বলি 'যাই যাই',
প্রাণ মন দেহ ফেলে দিতে চাই
প্রবল মানবস্রোতে।

'তোমাদের হেরি চিত চঞ্চল,
উদ্দাম ধায় মন।
রক্ত-অনল শত শিখা মেলি
সর্পসমান করি উঠে কেলি,
গঞ্জনা দেয় তরবারি যেন
কোষমাঝে ঝন্ ঝন্।

'হায়, সেকি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি !

'তুরঙ্গসম অন্ধ নিয়তি,
বন্ধন করি তায়
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন ক'রে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

'সমুখে যে আসে সরে যায় কেহ,
পড়ে যায় কেহ ভূমে।
দ্বিধা হয়ে বাধা হতেছে ভিন্ন,
পিছে পড়ে থাকে চরণচিহ্ন,
আকাশের আঁখি করিছে খিন্ন
প্রলয়বহ্নিধূমে।

'শত বার করে মৃত্যু ডিঙায়ে
পড়ি জীবনের পারে।
প্রান্তগগনে তারা অনিমিখ
নিশীথতিমিরে দেখাইছে দিক,
লোকের প্রবাহ ফেনায়ে ফেনায়ে
গরজিছে দুই ধারে।

'কভু অমানিশা নীরব নিবিড়,
কভু বা প্রখর দিন।

কভু বা আকাশে চারি-দিক-ময়
বজ্র লুকায়ে মেঘ জড়ো হয়,
কভু বা ঝটিকা মাথার উপরে
ভেঙে পড়ে দয়াহীন ।

‘‘আয় আয় আয়’ ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে ।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখ সম্পদ মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে ।

‘সিন্ধুমাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চ নদীর জল,
আহ্বান শুনে কে কারে থামায়,
ভক্তহৃদয় মিলিছে আমায়,
পঞ্জাব জুড়ি উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল ।

‘কোথা যাবি ভীরু, গহনে গোপনে
পশিছে কণ্ঠ মোর ।
প্রভাতে শুনিয়া ‘আয় আয় আয়’
কাজের লোকেরা কাজ ভুলে যায়,
নিশীথে শুনিয়া ‘আয় তোরা আয়’
ভেঙে যায় ঘুমঘোর ।

‘যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক,
ভরে যায় ঘাট বাট ।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ ।

‘থাক্ ভাই, থাক্, কেন এ স্বপন—
এখনো সময় নয় ।
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গনি গনি
অনিমেষ চোখে পূর্ব গগনে
দেখিতে অরুণোদয় ।

‘এখনো বিহার কল্পজগতে,
অরণ্য রাজধানী—

এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী ।

'একা ফিরি তাই যমুনার তীরে
দুর্গমগিরিমাঝে ।
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদীকলরোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে,
যোগ্য হতেছি কাজে ।

'এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
আরো কতদিন হবে !
চারি দিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে !

'কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ !
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ !

''নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগু-পিছু ।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ—
নাই তার কাছে জীবন মরণ,
নাই নাই আর কিছু ।'

'হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মতো—
'উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখো কতদূর হতে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে ব'লে
আসে লোক কত শত ।

''ওই শোনো শোনো কল্লোলধ্বনি,
ছুটে হৃদয়ের ধারা ।

স্থির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি
প্রদীপের মতো আলস তেয়াগি,
এ নিশীথমাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।'

'ওই চেয়ে দেখো দিগন্ত-পানে
ঘনঘোর ঘটা অতি।
আসিতেছে ঝড় মরণেরে লয়ে—
তাই বসে বসে হৃদয়-আলয়ে
জ্বালাতেছি আলো, নিবিবে না ঝড়ে,
দিবে অনন্ত জ্যোতি।

'যাও তবে সাহু, যাও রামদাস,
ফিরে যাও সখাগণ।
এসো দেখি সবে যাবার সময়
বলো দেখি সবে 'গুরুজির জয়',
দুই হাত তুলি বলো 'জয় জয়
অলখ নিরঞ্জন'।'

বলিতে বলিতে প্রভাততপন
উঠিল আকাশ-'পরে।
গিরির শিখরে গুরুর মুরতি
কিরণছটায় প্রোজ্জ্বল অতি—
বিদায় মাগিল অনুচরগণ,
নমিল ভক্তিভরে।

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

শেষ শিক্ষা

একদিন শিখগুরু গোবিন্দ নির্জনে
একাকী ভাবিতেছিলা আপনার মনে
আপন জীবনকথা; যে সংকল্পলেখা
অখণ্ড সম্পূর্ণরূপে দিয়েছিল দেখা
যৌবনের স্বর্ণপটে, যে আশা একদা
ভারত গ্রাসিয়াছিল, সে আজি শতধা,
সে আজি সংকীর্ণ শীর্ণ সংশয়সংকুল,
সে আজি সংকটমগ্ন। তবে একি ভুল!
তবে কি জীবন ব্যর্থ! দারুণ দ্বিধায়
শ্রান্তদেহে ক্ষুব্ধচিত্তে আঁধার সন্ধ্যায়

গোবিন্দ ভাবিতেছিল ; হেনকালে এসে
পাঠান কহিল তাঁরে, 'যাব চলি দেশে,
ঘোড়া-যে কিনেছ তুমি দাও তার দাম।'
কহিল গোবিন্দ গুরু, 'শেখজি, সেলাম,
মূল্য কালি পাবে, আজি ফিরে যাও ভাই।'
পাঠান কহিল রোষে, 'মূল্য আজই চাই।'
এত বলি জোর করি ধরি তাঁর হাত—
চোর বলি দিল গালি। শুনি অকস্মাৎ
গোবিন্দ বিজুলি-বেগে খুলি নিল অসি,
পলকে সে পাঠানের মুণ্ড গেল খসি ;
রক্তে ভেসে গেল ভূমি। হেরি নিজকাজ
মাথা নাড়ি কহে গুরু, 'বুঝিলাম আজ
আমার সময় গেছে। পাপ তরবার
লঙ্ঘন করিল আজি লক্ষ্য আপনার
নিরর্থক রক্তপাতে। এ বাহুর 'পরে
বিশ্বাস ঘুচিয়া গেল চিরকালতরে।
ধুয়ে মুছে যেতে হবে এ পাপ, এ লাজ—
আজ হতে জীবনের এই শেষ কাজ।'

পুত্র ছিল পাঠানের বয়স নবীন,
গোবিন্দ লইল তারে ডাকি। রাত্রিদিন
পালিতে লাগিল তারে সন্তানের মতো
চোখে চোখে। শাস্ত্র আর শস্ত্রবিদ্যা যত
আপনি শিখালো তারে। ছেলেটির সাথে
বৃদ্ধ সেই বীর গুরু সন্ধ্যায় প্রভাতে
খেলিত ছেলের মতো। ভক্তগণ দেখি
গুরুরে কহিল আসি, 'একি প্রভু, একি!
আমাদের শঙ্কা লাগে। ব্যাঘ্রশাবকেরে
যত যত্ন কর, তার স্বভাব কি ফেরে?
যখন সে বড়ো হবে তখন নখর,
গুরুদেব, মনে রেখো হবে যে প্রখর।'
গুরু কহে, 'তাই চাই, বাঘের বাচ্ছারে
বাঘ না করিনু যদি কী শিখানু তারে?'

বালক যুবক হল গোবিন্দের হাতে
দেখিতে দেখিতে। ছায়া-হেন ফিরে সাথে,
পুত্র-হেন করে তাঁর সেবা। ভালোবাসে
প্রাণের মতন— সদা জেগে থাকে পাশে
ডান হস্ত যেন। যুদ্ধে হয়ে গেছে গত
শিখগুরু গোবিন্দের পুত্র ছিল যত—

আজি তাঁর প্রৌঢ়কালে পাঠানতনয়
জুড়িয়া বসিল আসি শূন্য সে হৃদয়
গুরুজির । বাজে-পোড়া বটের কোটরে
বাহির হইতে বীজ পড়ি বায়ুভরে
বৃক্ষ হয়ে বেড়ে বেড়ে কবে ওঠে ঠেলি,
বৃদ্ধ বটে ঢেকে ফেলে ডালপালা মেলি ।

একদা পাঠান কহে নমি গুরু-পায়,
'শিক্ষা মোর সারা হল চরণকৃপায়,
এখন আদেশ পেলে নিজভুজবলে
উপার্জন করি গিয়া রাজসৈন্যদলে ।'
গোবিন্দ কহিলা তার পিঠে হাত রাখি,
'আছে তব পৌরুষের এক শিক্ষা বাকি ।'

পরদিন বেলা গেলে গোবিন্দ একাকী
বাহিরিলা ; পাঠানেরে কহিলেন ডাকি,
'অস্ত্র হাতে এসো মোর সাথে ।' ভক্তদল
'সঙ্গে যাব' 'সঙ্গে যাব' করে কোলাহল—
গুরু কন, 'যাও সবে ফিরে ।'

দুই জনে
কথা নাই ধীরগতি চলিলেন বনে
নদীতীরে । পাথর-ছড়ানো উপকূলে
বরষার জলধারা সহস্র আঙুলে
কেটে গেছে রক্তবর্ণ মাটি । সারি সারি
উঠেছে বিশাল শাল, তলায় তাহারি
ঠেলাঠেলি ভিড় করে শিশু তরুদল
আকাশের অংশ পেতে । নদী হাঁটুজল
ফটিকের মতো স্বচ্ছ, চলে এক ধারে
গেরুয়া বালির কিনারায় । নদীপারে
ইশারা করিল গুরু ; পাঠান দাঁড়ালো ।
নিবে-আসা দিবসের দগ্ধ রাঙা আলো
বাদুড়ের পাখা-সম দীর্ঘ ছায়া জুড়ি
পশ্চিমপ্রান্তর-পারে চলেছিল উড়ি
নিঃশব্দ আকাশে । গুরু কহিলা পাঠানে,
'মামুদ, হেথায় এসো, খোঁড়ো এইখানে ।'
উঠিল সে বালু খুঁড়ি একখণ্ড শিলা
অঙ্কিত লোহিত রাগে । গোবিন্দ কহিলা,
'পাষাণে এই-যে রাঙা দাগ, এ তোমার
আপন বাপের রক্ত । এইখানে তার
মুণ্ড ফেলেছিনু কেটে, না শুধিয়া ঋণ,
না দিয়া সময় । আজ আসিয়াছে দিন,

রে পাঠান, পিতার সুপুত্র হও যদি
খোলো তরবার— পিতৃঘাতকেরে বধি
উষ্ণ রক্ত-উপহারে করিবে তর্পণ
তৃষাতুর প্রেতাত্মার।' বাঘের মতন
হুংকারিয়া লম্ফ দিয়া রক্তনেত্রে বীর
পড়িল গুরুর 'পরে ; গুরু রহে স্থির
কাঠের মূর্তির মতো। ফেলি অস্ত্রখান
তখনি চরণে তাঁর পড়িল পাঠান।
কহিল, 'হে গুরুদেব, লয়ে শয়তানে
কোরো না এমনতরো খেলা। ধর্ম জানে
ভুলেছিনু পিতৃরক্তপাত ; একাধারে
পিতা গুরু বন্ধু বলে জেনেছি তোমারে
এতদিন। ছেয়ে থাক্ মনে সেই স্নেহ,
ঢাকা পড়ে হিংসা যাক মরে। প্রভু, দেহো
পদধূলি।' এত বলি বনের বাহিরে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল, না চাহিল ফিরে,
না থামিল একবার। দুটি বিন্দু জল
ভিজাইল গোবিন্দের নয়নযুগল।

পাঠান সেদিন হতে থাকে দূরে দূরে।
নিরালা শয়নঘরে জাগাতে গুরুরে
দেখা নাহি দেয় ভোরবেলা। গৃহদ্বারে
অস্ত্র হাতে নাহি থাকে রাতে। নদীপারে
গুরু-সাথে মৃগয়ায় নাহি যায় একা।
নির্জনে ডাকিলে গুরু দেয় না সে দেখা।

একদিন আরম্ভিল শতরঞ্চ খেলা
গোবিন্দ পাঠান-সাথে। শেষ হল বেলা
না জানিতে কেহ। হার মানি বারে বারে
মাতিছে মামুদ। সন্ধ্যা হয়, রাত্রি বাড়ে।
সঙ্গীরা যে যার ঘরে চলে গেল ফিরে।
ঝাঁ ঝাঁ করে রাতি। একমনে হেঁটশিরে
পাঠান ভাবিছে খেলা। কখন হঠাৎ
চতুরঙ্গ বল ছুঁড়ি করিল আঘাত
মামুদের শিরে গুরু ; কহে অট্টহাসি,
'পিতৃঘাতকের সাথে খেলা করে আসি
এমন যে কাপুরুষ, জয় হবে তার !'
তখনি বিদ্যুৎ-হেন ছুরি খরধার
খাপ হতে খুলি লয়ে গোবিন্দের বুকে
পাঠান বিঁধিয়া দিল। গুরু হাসিমুখে

কহিলেন, ‘এতদিনে হল তোর বোধ
কী করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ।
শেষ শিক্ষা দিয়ে গেনু— আজি শেষবার
আশীর্বাদ করি তোরে হে পুত্র আমার।’

৬ কার্তিক ১৩০৬

নকল গড়

রাজস্থান

‘জলস্পর্শ করব না আর’
চিতোর-রানার পণ,
‘বুঁদির কেল্লা মাটির ’পরে
থাকবে যতক্ষণ।’
‘কী প্রতিজ্ঞা! হায় মহারাজ,
মানুষের যা অসাধ্য কাজ
কেমন ক’রে সাধবে তা আজ’
কহেন মন্ত্রিগণ।
কহেন রাজা, ‘সাধ্য না হয়
সাধব আমার পণ।’

বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে
যোজন-তিনেক দূর।
সেথায় হারাবংশী সবাই
মহা মহা শূর।
হামু রাজা দিচ্ছে থানা,
ভয় কারে কয় নাইকো জানা—
তাহার সদ্য প্রমাণ রানা
পেয়েছেন প্রচুর।
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি
যোজন-তিনেক দূর।

মন্ত্রী কহে যুক্তি করি,
‘আজকে সারারাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মতো
নকল কেল্লা পাতি।
রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙে ধূলির ’পরে,
নইলে শুধু কথার তরে
হবেন আত্মঘাতী।’

মন্ত্রী দিল চিতোর-মাঝে
নকল কেল্লা পাতি।

কুম্ভ ছিল রানার ভৃত্য
হারাবংশী বীর,
হরিণ মেরে আসছে ফিরে
স্কন্ধে ধনু তীর।
খবর পেয়ে কহে, 'কে রে
নকল বুঁদি কেল্লা মেরে
হারাবংশী রাজপুতেরে
করবে নতশির!
নকল বুঁদি রাখব আমি
হারাবংশী বীর।'

মাটির কেল্লা ভাঙতে আসেন
রানা মহারাজ।
'দূরে রহো' কহে কুম্ভ,
গর্জে যেন বাজ—
'বুঁদির নামে করবে খেলা
সইব না সে অবহেলা,
নকল গড়ের মাটির ঢেলা
রাখব আমি আজ।'
কহে কুম্ভ, 'দূরে রহো
রানা মহারাজ।'

ভূমির 'পরে জানু পাতি
তুলি ধনুঃশর
একা কুম্ভ রক্ষা করে
নকল বুঁদিগড়।
রানার সেনা ঘিরি তারে
মুণ্ড কাটে তরবারে,
খেলাঘরের সিংহদ্বারে
পড়ল ভূমি-'পর।
রক্তে তাহার ধন্য হল
নকল বুঁদিগড়।

৭ কার্তিক ১৩০৬

হোরিখেলা

রাজস্থান

পত্র দিল পাঠান কেসর খাঁ'রে
    কেতুন হতে ভূনাগ রাজার রানী—
'লড়াই করি আশ মিটেছে মিঞা ?
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া,
এসো তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া—
    হোরি খেলব আমরা রাজপুতানী।'
যুদ্ধে হারি কোটা শহর ছাড়ি
    কেতুন হতে পত্র দিল রানী।

পত্র পড়ি কেসর উঠে হাসি,
    মনের সুখে গোঁফে দিল চাড়া।
রঙিন দেখে পাগড়ি পরে মাথে,
সুর্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে,
গন্ধভরা রুমাল নিল হাতে—
    সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া।
পাঠান-সাথে হোরি খেলবে রানী,
    কেসর হাসি গোঁফে দিল চাড়া।

ফাগুন মাসে দখিন হতে হাওয়া
    বকুলবনে মাতাল হয়ে এল।
বোল ধরেছে আমের বনে বনে,
ভ্রমরগুলো কে কার কথা শোনে,
গুন্‌গুনিয়ে আপন-মনে-মনে
    ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো।
কেতুনপুরে দলে-দলে আজি
    পাঠান-সেনা হোরি খেলতে এল।

কেতুনপুরে রাজার উপবনে
    তখন সবে ঝিকিমিকি বেলা।
পাঠানেরা দাঁড়ায় বনে আসি,
মুলতানেতে তান ধরেছে বাঁশি—
এল তখন একশো রানীর দাসী
    রাজপুতানী করতে হোরিখেলা।
রবি তখন রক্তরাগে রাঙা,
    সবে তখন ঝিকিমিকি বেলা।

পায়ে পায়ে ঘাগরা উঠে দুলে,
    ওড়না ওড়ে দক্ষিনে বাতাসে।

ডাহিন হাতে বহে ফাগের থারি,
নীবিবন্ধে ঝুলিছে পিচকারি,
বামহস্তে গুলাব-ভরা ঝারি—
সারি সারি রাজপুতানী আসে।
পায়ে পায়ে ঘাগরা উঠে দুলে,
ওড়না ওড়ে দক্ষিনে বাতাসে।

আঁখির ঠারে চতুর হাসি হেসে
কেসর তবে কহে কাছে আসি,
'বেঁচে এলেম অনেক যুদ্ধ করি,
আজকে বুঝি জানে-প্রাণে মরি !'
শুনে রানীর শতেক সহচরী
হঠাৎ সবে উঠল অট্টহাসি।
রাঙা পাগড়ি হেলিয়ে কেসর খাঁ
রঙ্গভরে সেলাম করে আসি।

শুরু হল হোরির মাতামাতি,
উড়তেছে ফাগ রাঙা সন্ধ্যাকাশে।
নব বরন ধরল বকুল ফুলে,
রক্তরেণু ঝরল তরুমূলে—
ভয়ে পাখি কূজন গেল ভুলে
রাজপুতানীর উচ্চ উপহাসে।
কোথা হতে রাঙা কুজ্ঝটিকা
লাগল যেন রাঙা সন্ধ্যাকাশে।

চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা
মনে মনে ভাবছে কেসর খাঁ।
বক্ষ কেন উঠছে নাকো দুলি,
নারীর পায়ে বাঁকা নূপুরগুলি
কেমন যেন বলছে বেসুর বুলি,
তেমন ক'রে কাঁকন বাজছে না !
চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা
মনে মনে ভাবছে কেসর খাঁ।

পাঠান কহে, 'রাজপুতানীর দেহে
কোথাও কিছু নাই কি কোমলতা !
বাহুযুগল নয় মৃণালের মতো,
কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত—
বড়ো কঠিন শুষ্ক স্বাধীন যত
মঞ্জরীহীন মরুভূমির লতা।'
পাঠান ভাবে দেহে কিংবা মনে
রাজপুতানীর নাইকো কোমলতা।

তান ধরিয়া ইমন-ভূপালিতে
বাঁশি বেজে উঠল দ্রুত তালে।
কুণ্ডলেতে দোলে মুক্তামালা,
কঠিন হাতে মোটা সোনার বালা,
দাসীর হাতে দিয়ে ফাগের থালা
রানী বনে এলেন হেনকালে।
তান ধরিয়া ইমন-ভূপালিতে
বাঁশি তখন বাজছে দ্রুত তালে।

কেসর কহে, 'তোমারি পথ চেয়ে
দুটি চক্ষু করেছি প্রায় কানা!'
রানী কহে, 'আমারো সেই দশা।'
একশো সখী হাসিয়া বিবশা—
পাঠান-পতির ললাটে সহসা
মারেন রানী কাঁসার থালাখানা।
রক্তধারা গড়িয়ে পড়ে বেগে
পাঠান-পতির চক্ষু হল কানা।

বিনা মেঘে বজ্ররবের মতো
উঠল বেজে কাড়া-নাকাড়া।
জ্যোৎস্নাকাশে চমকে ওঠে শশী,
ঝন্‌ঝনিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে অসি,
সানাই তখন দ্বারের কাছে বসি
গভীর সুরে ধরল কানাড়া।
কুঞ্জবনের তরু-তলে-তলে
উঠল বেজে কাড়া-নাকাড়া।

বাতাস বেয়ে ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খসে ঘাগরা ছিল যত।
মন্ত্রে যেন কোথা হতে কে রে
বাহির হল নারী-সজ্জা ছেড়ে,
এক শত বীর ঘিরল পাঠানেরে
পুষ্প হতে একশো সাপের মতো।
স্বপ্নসম ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খসে ঘাগরা ছিল যত।

যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।
ফাগুন-রাতে কুঞ্জবিতানে
মত্ত কোকিল বিরাম না জানে,

কেতুনপুরে বকুল-বাগানে
    কেসর খাঁয়ের খেলা হল সারা।
যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
    সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।

৯ কার্তিক ১৩০৬

বিবাহ

রাজস্থান

প্রহর-খানেক রাত হয়েছে শুধু,
    ঘন ঘন বেজে ওঠে শাঁখ।
বরকন্যা যেন ছবির মতো
আঁচল-বাঁধা দাঁড়িয়ে আঁখি নত,
জানলা খুলে পুরাঙ্গনা যত
    দেখছে চেয়ে ঘোমটা করি ফাঁক।
বর্ষারাতে মেঘের গুরুগুরু—
    তারি সঙ্গে বাজে বিয়ের শাঁখ।

ঈশান কোণে থমকে আছে হাওয়া,
    মেঘে মেঘে আকাশ আছে ঘেরি।
সভাকক্ষে হাজার দীপালোকে
মণিমালায় ঝিলিক হানে চোখে—
সভার মাঝে হঠাৎ এল ও কে,
    বাহির-দ্বারে বেজে উঠল ভেরী!
চমকে ওঠে সভার যত লোকে,
    উঠে দাঁড়ায় বর-কনেরে ঘেরি।

টোপর-পরা মেত্রিরাজকুমারে
    কহে তখন মাড়োয়ারের দূত,
'যুদ্ধ বাধে বিদ্রোহীদের সনে,
রামসিংহ রানা চলেন রণে—
তোমরা এসো তাঁরি নিমন্ত্রণে
    যে যে আছ মর্তিয়া রাজপুত।'
'জয় রানা রাম সিঙের জয়'
    গর্জি উঠে মাড়োয়ারের দূত।

'জয় রানা রাম সিঙের জয়'
    মেত্রিপতি উর্ধ্বস্বরে কয়।
কনের বক্ষ কেঁপে ওঠে ডরে,
দুটি চক্ষু ছলো ছলো করে—

বরযাত্রী হাঁকে সমস্বরে,
　　'জয় রানা রাম সিঙের জয়।'
'সময় নাহি মৈত্রিরাজকুমার'
　　মহারানার দূত উচ্চে কয়।

বৃথা কেন ওঠে হুলুধ্বনি,
　　বৃথা কেন বেজে ওঠে শাঁখ!
বাঁধা আঁচল খুলে ফেলে বর,
মুখের পানে চাহে পরস্পর—
কহে, 'প্রিয়ে, নিলেম অবসর,
　　এসেছে ওই মৃত্যুসভার ডাক।'
বৃথা এখন ওঠে হুলুধ্বনি,
　　বৃথা এখন বেজে ওঠে শাঁখ।

বরের বেশে টোপর পরি শিরে
　　ঘোড়ায় চড়ি ছুটে রাজকুমার।
মলিন মুখে নম্র নতশিরে
কন্যা গেল অন্তঃপুরে ফিরে,
হাজার বাতি নিবল ধীরে ধীরে—
　　রাজার সভা হল অন্ধকার।
গলায় মালা, টোপর-পরা শিরে
　　ঘোড়ায় চড়ি ছুটে রাজকুমার।

মাতা কেঁদে কহেন, 'বধূবেশ
　　খুলিয়া ফেল্ হায় রে হতভাগী!'
শান্তমুখে কন্যা কহে মায়ে,
'কেঁদো না মা, ধরি তোমার পায়ে,
বধূসজ্জা থাক্ মা, আমার গায়ে—
　　মৈত্রিপুরে যাইব তাঁর লাগি।'
শুনে মাতা কপালে কর হানি
　　কেঁদে কহেন, 'হায় রে হতভাগী!'

গ্রহবিপ্র আশীর্বাদ করি
　　ধানদূর্বা দিল তাহার মাথে।
চড়ে কন্যা চতুর্দোলা-'পরে,
পুরনারী হুলুধ্বনি করে,
রঙিন বেশে কিংকরী কিংকরে
　　সারি সারি চলে বালার সাথে।
মাতা আসি চুমো খেলেন মুখে,
　　পিতা আসি হস্ত দিলেন মাথে।

নিশীথ-রাতে আকাশ আলো করি
কে এল রে মৈত্রিপুরদ্বারে !
'থামাও বাঁশি' কহে, 'থামাও বাঁশি—
চতুর্দোলা নামাও রে দাসদাসী ।
মিলেছি আজ মৈত্রিপুরবাসী
মৈত্রিপতির চিতা রচিবারে ।
মৈত্রিরাজা যুদ্ধে হত আজি,
দুঃসময়ে কারা এলে দ্বারে ?'

'বাজাও বাঁশি, ওরে, বাজাও বাঁশি'
চতুর্দোলা হতে বধূ বলে,
'এবার লগ্ন আর হবে না পার,
আঁচলে গাঁঠ খুলবে না তো আর—
শেষের মন্ত্র উচ্চারো এইবার
শ্মশান-সভায় দীপ্ত চিতানলে ।'
'বাজাও বাঁশি, ওরে, বাজাও বাঁশি'
চতুর্দোলা হতে বধূ বলে ।

বরের বেশে মোতির মালা গলে
মৈত্রিপতি চিতার 'পরে শুয়ে ।
দোলা হতে নামল আসি নারী,
আঁচল বাঁধি রক্তবাসে তাঁরি
শিয়র-'পরে বৈসে রাজকুমারী
বরের মাথা কোলের 'পরে থুয়ে ।
নিশীথ-রাতে মিলনসজ্জা-পরা
মৈত্রিপতি চিতার 'পরে শুয়ে ।

ঘন ঘন জাগল হুলুধ্বনি,
দলে দলে আসে পুরাঙ্গনা ।
কয় পুরোহিত 'ধন্য সুচরিতা'
গাহিছে ভাট 'ধন্য মৃত্যুজিতা',
ধূ ধূ করে জ্বলে উঠল চিতা—
কন্যা বসে আছেন যোগাসনা ।
জয়ধ্বনি উঠে শ্মশান-মাঝে,
হুলুধ্বনি করে পুরাঙ্গনা ।

১১ কার্তিক ১৩০৬

বিচারক

পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন -প্রণীত চরিতমালা হইতে গৃহীত। অ্যাক্‌ওআর্থ সাহেব -প্রণীত Ballads of the Marathas -নামক গ্রন্থে রঘুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাওয়ের হত্যা সম্বন্ধে প্রচলিত মারাঠি গাথার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

পুণ্য নগরে রঘুনাথ রাও
পেশোয়া-নৃপতি-বংশ
রাজাসনে উঠি কহিলেন বীর,
'হরণ করিব ভার পৃথিবীর—
মৈসুরপতি হৈদরালির
দর্প করিব ধ্বংস।'

দেখিতে দেখিতে পুরিয়া উঠিল
সেনানী আশি সহস্র।
নানা দিকে দিকে নানা পথে পথে
মারাঠার যত গিরিদরি হতে
বীরগণ যেন শ্রাবণের স্রোতে
ছুটিয়া আসে অজস্র।

উড়িল গগনে বিজয়পতাকা,
ধ্বনিল শতেক শঙ্খ।
হুলুরব করে অঙ্গনা সবে,
মারাঠা-নগরী কাঁপিল গরবে,
রহিয়া রহিয়া প্রলয়-আরবে
বাজে ভৈরব ডঙ্ক।

ধুলার আড়ালে ধ্বজ-অরণ্যে
লুকালো প্রভাতসূর্য।
রক্ত অশ্বে রঘুনাথ চলে,
আকাশ বধির জয়কোলাহলে—
সহসা যেন কী মন্ত্রের বলে
থেমে গেল রণতূর্য!

সহসা কাহার চরণে ভূপতি
জানালো পরম দৈন্য?
সমরোন্মাদে ছুটিতে ছুটিতে
সহসা নিমেষে কার ইঙ্গিতে
সিংহদুয়ারে থামিল চকিতে
আশি সহস্র সৈন্য?

ব্রাহ্মণ আসি দাঁড়ালো সমুখে
ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী।
দুই বাহু তাঁর তুলিয়া উধাও
কহিলেন ডাকি, 'রঘুনাথ রাও,
নগর ছাড়িয়া কোথা চলে যাও,
না লয়ে পাপের শাস্তি ?'

নীরব হইল জয়কোলাহল,
নীরব সমরবাদ্য।
'প্রভু, কেন আজি' কহে রঘুনাথ,
'অসময়ে পথ রুধিলে হঠাৎ !
চলেছি করিতে যবননিপাত,
জোগাতে যমের খাদ্য।'

কহিলা শাস্ত্রী, 'বধিয়াছ তুমি
আপন ভ্রাতার পুত্রে।
বিচার তাহার না হয় য'দিন
ততকাল তুমি নহ তো স্বাধীন,
বন্দী রয়েছ অমোঘ কঠিন
ন্যায়ের বিধানসূত্রে।'

রুষিয়া উঠিলা রঘুনাথ রাও,
কহিলা করিয়া হাস্য,
'নৃপতি কাহারও বাঁধন না মানে—
চলেছি দীপ্ত মুক্ত কৃপাণে,
শুনিতে আসি নি পথমাঝখানে
ন্যায়বিধানের ভাষ্য।'

কহিলা শাস্ত্রী, 'রঘুনাথ রাও,
যাও করো গিয়ে যুদ্ধ !
আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলাঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ।'

বাজিল শঙ্খ, বাজিল ডঙ্ক,
সেনানী ধাইল ক্ষিপ্র।
ছাড়ি দিয়া গেলা গৌরবপদ,
দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ,
গ্রামের কুটিরে চলি গেলা ফিরে
দীন দরিদ্র বিপ্র।

৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬

পণরক্ষা

'মারাঠা দস্যু আসিছে রে ওই,
করো করো সবে সাজ'
আজমীর গড়ে কহিলা হাঁকিয়া
দুর্গেশ দুমরাজ ।
বেলা দু'পহরে যে যাহার ঘরে
সেঁকিছে জোয়ারি রুটি,
দুর্গতোরণে নাকাড়া বাজিতে
বাহিরে আসিল ছুটি ।
প্রাকারে চড়িয়া দেখিল চাহিয়া
দক্ষিণে বহু দূরে
আকাশ জুড়িয়া উড়িয়াছে ধুলা
মারাঠি অশ্বখুরে ।
'মারাঠার যত পতঙ্গপাল
কৃপাণ-অনলে আজ
ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরে নাকো যেন'
গর্জিলা দুমরাজ ।

মাড়োয়ার হতে দূত আসি বলে,
'বৃথা এ সৈন্যসাজ,
হেরো এ প্রভুর আদেশপত্র
দুর্গেশ দুমরাজ !
সিন্দে আসিছে, সঙ্গে তাঁহার
ফিরিঙ্গি সেনাপতি—
সাদরে তাঁদের ছাড়িবে দুর্গ
আজ্ঞা তোমার প্রতি ।
বিজয়লক্ষ্মী হয়েছে বিমুখ
বিজয়সিংহ-'পরে—
বিনা সংগ্রামে আজমীর গড়
দিবে মারাঠার করে ।'
'প্রভুর আদেশে বীরের ধর্মে
বিরোধ বাধিল আজ'
নিশ্বাস ফেলি কহিলা কাতরে
দুর্গেশ দুমরাজ ।

মাড়োয়ার-দূত করিল ঘোষণা,
'ছাড়ো ছাড়ো রণসাজ ।'
রহিল পাষাণ-মুরতি-সমান
দুর্গেশ দুমরাজ ।

বেলা যায় যায়, ধূ ধূ করে মাঠ,
দূরে দূরে চরে ধেনু—
তরুতলছায়ে সকরুণ রবে
বাজে রাখালের বেণু।
'আজমীর গড় দিলা যবে মোরে
পণ করিলাম মনে,
প্রভুর দুর্গ শত্রুর করে
ছাড়িব না এ জীবনে।
প্রভুর আদেশে সে সত্য হায়
ভাঙিতে হবে কি আজ!'
এতেক ভাবিয়া ফেলে নিশ্বাস
দুর্গেশ দুমরাজ।

রাজপুত-সেনা সরোষে শরমে
ছাড়িল সমর-সাজ।
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল তোরণে
দুর্গেশ দুমরাজ।
গেরুয়া-বসনা সন্ধ্যা নামিল
পশ্চিম মাঠ-পারে;
মারাঠি সৈন্য ধুলা উড়াইয়া
থামিল দুর্গদ্বারে।
'দুয়ারের কাছে কে ওই শয়ান,
ওঠো ওঠো, খোলো দ্বার।'
নাহি শোনে কেহ— প্রাণহীন দেহ
সাড়া নাহি দিল আর।
প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে
বিরোধ মিটাতে আজ
দুর্গদুয়ারে ত্যজিয়াছে প্রাণ
দুর্গেশ দুমরাজ।

অগ্রহায়ণ ১৩০৬

কাহিনী

কত কী যে আসে কত কী যে যায়
বাহিয়া চেতনাবাহিনী,
আঁধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত
হেথা হোথা তারি পড়ে থাকে কত—
ছিন্ন সূত্র বাছি শত শত
তুমি গাঁথ বসে কাহিনী।
ওগো একমনা, ওগো অগোচরা,
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী !

তব ঘরে কিছু ফেলা নাহি যায়
ওগো হৃদয়ের গেহিনী !
কত সুখ দুখ আসে প্রতিদিন,
কত ভুলি কত হয়ে আসে ক্ষীণ—
তুমি তাই ল'য়ে বিরামবিহীন
রচিছ জীবনকাহিনী।
আঁধারে বসিয়া কী যে কর কাজ
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী !

কত যুগ ধরে এমনি গাঁথিছ
হৃদিশতদলশায়িনী !
গভীর নিভৃতে মোর মাঝখানে
কী যে আছে কী যে নাই কে বা জানে,
কী জানি রচিলে আমার পরানে
কত-না যুগের কাহিনী—
কত জনমের কত বিস্মৃতি
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী !

কাহিনী

গানভঙ্গ

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা, ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি,
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখি।
শানিত তরবারি গলাটি যেন নাচিয়া ফিরে দশ দিকে—
কখন কোথা যায় না পাই দিশা, বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।
আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল, আপনি কাটি দেয় তাহা—
সভার লোকে শুনে অবাক মানে, সঘনে বলে 'বাহা বাহা'।

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপ রায় কাঠের মতো বসি আছে,
বরজলাল ছাড়া কাহারও গান ভালো না লাগে তার কাছে।
বালকবেলা হতে তাহারি গীতে দিল সে এতকাল যাপি—
বাদল-দিনে কত মেঘের গান, হোলির দিনে কত কাফি।
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে, গেয়েছে বিজয়ার গান—
হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া গেছে দুনয়ান।
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে সভার গৃহ গেছে পুরে,
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা ভূপালি মূলতানি সুরে।
ঘরেতে বারবার এসেছে কত বিবাহ-উৎসবরাতি,
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস, জ্বলেছে শত শত বাতি—
বসেছে নব বর সলাজ মুখে পরিয়া মণি-আভরণ,
করিছে পরিহাস কানের কাছে সমবয়সী প্রিয়জন,
সামনে বসি তার বরজলাল ধরেছে শাহানার সুর—
সে-সব দিন আর সে-সব গান হৃদয়ে আছে পরিপূর।
সে ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই মর্মে গিয়ে নাহি লাগে,
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।
প্রতাপ রায় তাই দেখিছে শুধু কাশীর বৃথা মাথা নাড়া—
সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়, হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া।

থামিল গান যবে, ক্ষণেক-তরে বিরাম মাগে কাশীনাথ—
বরজলাল-পানে প্রতাপ রায় হাসিয়া করে আঁখিপাত।
কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ কহিল, 'ওস্তাদজি,
গানের মতো গান শুনায়ে দাও, এরে কি গান বলে! ছি!
এ যেন পাখি লয়ে বিবিধ ছলে শিকারী বিড়ালের খেলা।
সেকালে গান ছিল, একালে হায় গানের বড়ো অবহেলা।'

বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ, শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
বিনতি করি সবে সভার মাঝে আসন নিল ধীরে ধীরে।
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে তুলিয়া নিল তানপুর,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি ইমনকল্যাণ সুর।
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায় বৃহৎ সভাগৃহকোণে,
ক্ষুদ্র পাখি যথা ঝড়ের মাঝে উড়িতে নারে প্রাণপণে।
বসিয়া বাম পাশে প্রতাপ রায় দিতেছে শত উৎসাহ—
'আহাহা, বাহা বাহা!' কহিছে কানে, 'গলা ছাড়িয়া গান গাহ।'

সভার লোকে সবে অন্যমনা— কেহ বা কানাকানি করে,
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে, কেহ বা চলে যায় ঘরে।
'ওরে রে আয় লয়ে তামাকু পান' ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়।
সঘনে পাখা নাড়ি কেহ বা বলে, 'গরম আজি অতিশয়।'
করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক, ক্ষণেক নাহি রহে চুপ।
নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা শব্দ ওঠে শতরূপ।
বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়, তুফান-মাঝে ক্ষীণ তরী—
কেবল দেখা যায় তানপুরায় আঙুল কাঁপে থরথরি।
হৃদয়ে যেথা হতে গানের সুর উছসি উঠে নিজসুখে
হেলার কলরব শিলার মতো চাপে সে উৎসের মুখে।
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ দু দিকে ধায় দুই জনে,
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান বরজ গায় প্রাণপণে।
গানের এক পদ মনের ভ্রমে হারায়ে গেল কী করিয়া—
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে, লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে যায় পড়ে না মনে, শরমে মস্তক নাড়ি
আবার শুরু হতে ধরিল গান— আবার ভুলি দিল ছাড়ি।
দ্বিগুণ থরথরি কাঁপিছে হাত, স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন বাতাসে দীপ নেবে-নেবে।
গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া রাখিল সুরটুকু ধরি—
সহসা হাহারবে উঠিল কাঁদি গাহিতে গিয়া হা-হা করি।
কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা, কোথায় তাল গেল ভাসি,
গানের সুতা ছিঁড়ি পড়িল খসি অশ্রুমুকুতার রাশি।
কোলের সখী তানপুরার 'পরে রাখিল লজ্জিত মাথা—
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে বাল্যক্রন্দনগাথা।
নয়ন ছলছল, প্রতাপ রায় কর বুলায় তার দেহে—
'আইস হেথা হতে আমরা যাই' কহিল সকরুণ স্নেহে।
শতেক-দীপ-জ্বালা নয়ন-ভরা ছাড়ি সে উৎসবঘর
বাহিরে গেল দুটি প্রাচীন সখা ধরিয়া দুঁহু দোঁহা-কর।

বরজ করজোড়ে কহিল, 'প্রভু, মোদের সভা হল ভঙ্গ!
এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ!

জগতে আমাদের বিজন সভা, কেবল তুমি আর আমি—
সেথায় আনিয়ো না নূতন শ্রোতা মিনতি তব পদে স্বামী!
একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে—
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে—
যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।

বোট। শিলাইদহ
২৪ আষাঢ় ১৩০০

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর।
যা-কিছু হারায়, গিন্নি বলেন, 'কেষ্টা বেটাই চোর।'
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।
বড়ো প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ, চীৎকার করি 'কেষ্টা'—
যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে—
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক'রে আনে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা—
মহাকলরবে গালি দেই যবে 'পাজি হতভাগা গাধা'—
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে জ্বলে যায় পিত্ত!
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার— বড়ো পুরাতন ভৃত্য।

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, 'আর পারি নাকো!
রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো।
না মানে শাসন; বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেল! শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো।
গেলে সে বাজার সারা দিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার—
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর!'
শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধরে;
বলি তারে, 'পাজি, বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে!'
ধীরে চলে যায়, ভাবি গেল দায়; পরদিনে উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।
প্রসন্নমুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি-অকাতর চিত্ত!
ছাড়ালে না ছাড়ে, কী করিব তারে মোর পুরাতন ভৃত্য।

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়, বুঝায়ে বলিনু তারে
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে।
লয়ে রশারশি করি কষাকষি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধি
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,
'পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে।'
আমি কহিলাম 'আরে রাম রাম! নিবারণ সাথে যাবে।'

রেলগাড়ি ধায়; হেরিলাম হায় নামিয়া বর্ধমানে
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে।
স্পর্ধা তাহার হেনমতে আর কত বা সহিব নিত্য!
যত তারে দুষি তবু হনু খুশি হেরি পুরাতন ভৃত্য।
নামিনু শ্রীধামে, দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।
জন ছয় সাতে মিলি একসাথে পরমবন্ধুভাবে
করিলাম বাসা, মনে হল আশা আরামে দিবস যাবে।
কোথা ব্রজবালা! কোথা বনমালা! কোথা বনমালী হরি!
কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত! আমি বসন্তে মরি।
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ—
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ, 'কেষ্ট, আয় রে কাছে।
এত দিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।'
হেরি তার মুখ ভরে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত।
নিশিদিন ধরে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য।

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার, 'কর্তা, তোমার কোনো ভয় নাই, শুন,
যাবে দেশে ফিরে, মাঠাকুরানীরে দেখিতে পাইবে পুন।'
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম; তাহারে ধরিল জ্বরে—
নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ-'পরে।
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু দিন, বন্ধ হইল নাড়ী—
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে, এতদিনে গেল ছাড়ি।
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ—
আজ সাথে নেই চিরসাথি সেই মোর পুরাতন ভৃত্য।

[শিলাইদহ]
১২ ফাল্গুন ১৩০১

দুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।'
শুনি রাজা কহে, 'বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে।' কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, 'করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!'
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি—
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য!
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো-যোলো—
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হল।

নমোনমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল— নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে—
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে,
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

ধিক্ ধিক্ ওরে, শত ধিক্ তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি !
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কি জননী তুমি !
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্রমাতা
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফল ফুল শাক পাতা !
আজ কোন্ রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাসবেশ—
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ !
আমি তোর লাগি ফিরেছি বিবাগি গৃহহারা সুখহীন—
তুই হেথা বসি ওরে রাক্ষসী, হাসিয়া কাটাস দিন !
ধনীর আদরে গরব না ধরে ! এতই হয়েছ ভিন্ন
কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সেদিনের কোনো চিহ্ন !
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি !
যত হাসো আজ যত করো সাজ ছিলে দেবী, হলে দাসী !

বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি—
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আমগাছ, একি !
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক-কালের কথা ।
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম ।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন !
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস— শাখা দুলাইয়া গাছে,
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে ।
ভাবিলাম মনে বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা,
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা ।

হেনকালে হায় যমদূত-প্রায় কোথা হতে এল মালী,
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি ।
কহিলাম তবে, 'আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব—
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব !'
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ—
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ-সাথে ধরিতেছিলেন মাছ ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, 'মারিয়া করিব খুন !'
বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ ।
আমি কহিলাম, 'শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয় !'
বাবু কহে হেসে, 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয় !'
আমি শুনে হাসি আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে—
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে !

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

দেবতার গ্রাস

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসংগমে
তীর্থস্নান লাগি । সঙ্গীদল গেল জুটি
কত বালবৃদ্ধ নরনারী ; নৌকা দুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে ।

পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি, 'হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথি ।' বিধবা যুবতী,
দুখানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে— অনুরোধ তার
এড়ানো কঠিন বড়ো— 'স্থান কোথা আর'
মৈত্র কহিলেন তারে । 'পায়ে ধরি তব'
বিধবা কহিল কাঁদি, 'স্থান করি লব
কোনোমতে এক ধারে ।' ভিজে গেল মন,
তবু দ্বিধাভরে তারে শুধালো ব্রাহ্মণ,
'নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে ?'
উত্তর করিল নারী, 'রাখাল ? সে রবে
আপন মাসির কাছে । তার জন্মপরে
বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে,
বাঁচিব ছিল না আশা ; অন্নদা তখন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন
মানুষ করেছে যত্নে— সেই হতে ছেলে
মাসির আদরে আছে মার কোল ফেলে ।
দুরন্ত মানে না কারে, করিলে শাসন
মাসি আসি অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন
কোলে তারে টেনে লয় । সে থাকিবে সুখে
মার চেয়ে আপনার মাসিমার বুকে ।'
সম্মত হইল বিপ্র । মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল বাঁধি জিনিস-পত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে, সখীদলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের শোক-অশ্রুজলে ।
ঘাটে আসি দেখে— সেথা আগেভাগে ছুটি
রাখাল বসিয়া আছে তরী-'পরে উঠি
নিশ্চিন্ত নীরবে । 'তুই হেথা কেন ওরে'
মা শুধালো ; সে কহিল, 'যাইব সাগরে ।'
'যাইবি সাগরে ! আরে, ওরে দস্যু ছেলে,
নেমে আয় ।' পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে
সে কহিল দুটি কথা, 'যাইব সাগরে ।'

যত তার বাহু ধরি টানাটানি করে
রহিল সে তরণী আঁকড়ি। অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে,
'থাক্ থাক্ সঙ্গে যাক্।' মা রাগিয়া বলে,
'চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে!'
যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপবাণে
বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
'নারায়ণ নারায়ণ' করিল স্মরণ।
পুত্রে নিল কোলে তুলি, তার সর্বদেহে
করুণ কল্যাণহস্ত বুলাইল স্নেহে।
মৈত্র তারে ডাকি ধীরে চুপিচুপি কয়,
'ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।'

রাখাল যাইবে সাথে স্থির হল কথা—
অন্নদা লোকের মুখে শুনি সে বারতা
ছুটে আসি বলে, 'বাছা, কোথা যাবি ওরে!'
রাখাল কহিল হাসি, 'চলিনু সাগরে,
আবার ফিরিব মাসি!' পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি, 'ঠাকুরমশায়,
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,
কে তাহারে সামালিবে? জন্ম হতে তার
মাসি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকে নি কোথাও—
কোথা এরে নিয়ে যাবে, ফিরে দিয়ে যাও।'
রাখাল কহিল, 'মাসি, যাইব সাগরে,
আবার ফিরিব আমি।' বিপ্র স্নেহভরে
কহিলেন, 'যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি কোনো ভয় নাই।
এখন শীতের দিন শান্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ
কিছু নাই; যাতায়াতে মাস দুই কাল,
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।'
শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি নৌকা দিল ছাড়ি,
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাতশিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণীনদীতীরে।

যাত্রীদল ফিরে আসে; সাঙ্গ হল মেলা।
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্ণবেলা
জোয়ারের আশে। কৌতূহল অবসান,
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ

মাসির কোলের লাগি। জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামলকোমলা, যেথা যে-কেহই থাকে
অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
দিগন্তবিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ-পানে!

চঞ্চল বালক আসি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীর উৎসুক কণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে,
'ঠাকুর, কখন আজি আসিবে জোয়ার?'
সহসা স্তিমিত জলে আবেগসঞ্চার
দুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে।
ফিরিল তরীর মুখ, মৃদু আর্তনাদে
কাছিতে পড়িল টান, কলশব্দগীতে
সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে—
আসিল জোয়ার। মাঝি দেবতারে স্মরি
ত্বরিত উত্তর-মুখে খুলে দিল তরী।
রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে,
'দেশে পঁহুছিতে আর কত দিন আছে?'

সূর্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ দুই ছেড়ে
উত্তর-বায়ুর বেগ ক্রমে ওঠে বেড়ে।
রূপনারানের মুখে পড়ি বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীরে
উত্তাল উদ্দাম। 'তরণী ভিড়াও তীরে'
উচ্চকণ্ঠে বারংবার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর? চারি দিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা
অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা,

অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত -পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধতবিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম। তীব্র শীতপবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক্‌,
কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি ঊর্ধ্বডাক
ডাকি আত্মজনে। মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে
চক্ষু মুদি করে জপ। জননীর বুকে
রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে,
'বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ—
যা মেনেছে দেয় নাই, তাই এত ঢেউ,
অসময়ে এ তুফান! শুন এই বেলা,
করহ মানত রক্ষা; করিয়ো না খেলা
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।' যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা-কিছু জলে ফেলি দিল
না করি বিচার। তবু তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।
মাঝি কহে পুনর্বার, 'দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে লয়ে এই বেলা শোন!'
ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি, 'এই সে রমণী
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়।' 'দাও তারে ফেলে'
এক বাক্যে গর্জি উঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রী সবে। কহে নারী, 'হে দাদাঠাকুর,
রক্ষা করো, রক্ষা করো!' দুই দৃঢ় করে
রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরে।
ভর্ৎসিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ,
'আমি তোর রক্ষাকর্তা! রোষে নিশ্চেতন
মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে!
শোধ্‌ দেবতার ঋণ; সত্য ভঙ্গ করে
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে!'

মোক্ষদা কহিল, 'অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে— ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হল? সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝ নি ঠাকুর?

শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা ?
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা ?
বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি-দাঁড়ি
বল করি রাখালেরে নিল ছিঁড়ি কাড়ি
মার বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি
দন্তে দন্ত চাপি বলে। কে তারে সহসা
মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা,
দংশিল বৃশ্চিকদংশ। 'মাসি ! মাসি ! মাসি !'
বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি
নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।
চীৎকারি উঠিল বিপ্র, 'রাখ্ রাখ্, রাখ্ !'
চকিতে হেরিল চাহি মূর্ছি আছে প'ড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহূর্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গমাঝে মেলি আর্ত চোখ
'মাসি' বলি ফুকারিয়া মিলালো বালক
অনন্ততিমিরতলে ; শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুল বলে ঊর্ধ্ব-পানে উঠি
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে।
'ফিরায়ে আনিব তোরে' কহি ঊর্ধ্বশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্তমাঝে ঝাঁপ দিল জলে—
আর উঠিল না। সূর্য গেল অস্তাচলে।

১৩ কার্তিক ১৩০৪

নিষ্ফল উপহার

নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল—
দুই তীরে গিরিতট, উচ্চ শিলাতল।
সংকীর্ণ গুহার পথে মূর্ছি জলধার
উন্মত্ত প্রলাপে ওঠে গর্জি অনিবার।

এলায়ে জটিল বক্র নির্ঝরের বেণী
নীলাভ দিগন্তে ধায় নীল গিরিশ্রেণী।
স্থির তাহা, নিশিদিন তবু যেন চলে—
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি ইঙ্গিত বাড়ায়ে।

তৃণহীন সুকঠিন শতদীর্ণ ধরা,
রৌদ্রবর্ণ বনফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে—
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে
পথশূন্য, জনশূন্য, সাড়া-শব্দ-হীন।
ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উত্তরিলা
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন নমি চরণে তাঁহার,
'দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার।'

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশিসিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে মাণিক্যে গাঁথা বলয়-দুখানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি দুই পাণি।

ভূমিতল হতে বালা লইলেন তুলে,
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে অঙ্গুলে।
হীরকের সূচীমুখ শতবার ঘুরি
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,
আবার সে পুঁথি-'পরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

'আহা আহা' চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু হাত।
আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণমনকায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত অন্তরে তাঁর জাগে পাঠসুখ।
কালো জল কটাক্ষিয়া চলে ঘুরি ঘুরি,
যেন সে ছলনাভরা সুগভীর চুরি।

দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু
যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু।
সিক্তবস্ত্রে রিক্তহাতে শ্রান্তনতশিরে
রঘুনাথ গুরু-কাছে আসিলেন ফিরে।

'এখনো উঠাতে পারি' করজোড়ে যাচে,
'যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।'
দ্বিতীয় কঙ্কণখানি ছুঁড়ি দিয়া জলে
গুরু কহিলেন, 'আছে ওই নদীতলে।'

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

দীনদান

নিবেদিল রাজভৃত্য, 'মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নামসংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দরদর-উদ্‌বেলিত আনন্দধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গন ; ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলি
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসাভরে, সেইমতো নরনারীগণে
সোনার দেউল -পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার 'পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।'

শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে ; কহিলেন নমি তাঁর পায়ে,
'হেরো প্রভু, স্বর্ণশীর্ষ নৃপতিনির্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়, তারে কেন করিয়া বর্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে ?'

'সে মন্দিরে দেব নাই' কহে সাধু।

রাজা কহে রোষে,
'দেব নাই ! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্নসিংহাসন-'পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ—
শূন্য তাহা ?'

'শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ' সাধু কহে,
'আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।'

ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহে রাজা, 'বিংশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির অম্বর ভেদিয়া,

পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাই কোনো স্থান।'

শান্ত মুখে কহে সাধু, 'যে বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়,
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দিরপ্রাঙ্গণে, সে বৎসর
বিংশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণদৃপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে। সে দিন কহিলা ভগবান—
'আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্তনীলিমা-মাঝে ; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য, শান্তি, দয়া, প্রেম। দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গৃহ করে দান !' চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীন-সাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্র-মাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে,
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্‌বুদ্‌ !'

রাজা জ্বলি রোষানলে,
কহিলেন, 'রে ভণ্ড পামর, মোর রাজ্য ত্যাগ করে
এ মুহূর্তে চলি যাও।'

সন্ন্যাসী কহিলা শান্ত স্বরে,
'ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে
সেইখানে, মহারাজ, নির্বাসিত কর ভক্তজনে।'

২০ শ্রাবণ ১৩০৭

বিসর্জন

দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর-পর
বয়স না হতে হতে পুরা দু-বছর।
এবার ছেলেটি তার জন্মিল যখন
স্বামীরেও হারালো মল্লিকা। বন্ধুজন
বুঝাইল— পূর্বজন্মে ছিল বহু পাপ,
এ জনমে তাই হেন দারুণ সন্তাপ।
শোকানলদগ্ধ নারী একান্ত বিনয়ে
অজ্ঞাত জন্মের পাপ শিরে বহি লয়ে
প্রায়শ্চিত্তে দিল মন। মন্দিরে মন্দিরে
যেথা সেথা গ্রামে গ্রামে পূজা দিয়ে ফিরে,

ব্রত ধ্যান উপবাসে আহ্নিকে তর্পণে
কাটে দিন, ধূপে দীপে নৈবেদ্যে চন্দনে
পূজাগৃহে ; কেশে বাঁধি রাখিল মাদুলি
কুড়াইয়া শত ব্রাহ্মণের পদধূলি ;
শুনে রামায়ণ-কথা ; সন্ন্যাসী সাধুরে
ঘরে আনি আশীর্বাদ করায় শিশুরে ।
বিশ্বমাঝে আপনারে রাখি সর্বনীচে
সবার প্রসন্নদৃষ্টি অভাগী মাগিছে
আপন সন্তান লাগি । সূর্য চন্দ্র হতে
পশুপক্ষী পতঙ্গ অবধি কোনোমতে
কেহ পাছে কোনো অপরাধ লয় মনে,
পাছে কেহ করে ক্ষোভ, অজানা কারণে
পাছে কারো লাগে ব্যথা— সকলের কাছে
আকুল-বেদনা-ভরে দীন হয়ে আছে ।

যখন বছর দেড় বয়স শিশুর
যকৃতের ঘটিল বিকার ; জ্বরাতুর
দেহখানি শীর্ণ হয়ে আসে । দেবালয়ে
মানিল মানত মাতা, পদামৃত লয়ে
করাইল পান, হরিসংকীর্তন-গানে
কাঁপিল প্রাঙ্গণ । ব্যাধি শান্তি নাহি মানে ।
কাঁদিয়া শুধালো নারী, 'ব্রাহ্মণ ঠাকুর,
এত দুঃখে তবু পাপ নাহি হল দূর ?
দিনরাত্রি দেবতার মেনেছি দোহাই,
দিয়েছি এত যে পূজা তবু রক্ষা নাই ?
তবু কি নেবেন তাঁরা আমার বাছারে ?
এত ক্ষুধা দেবতার ? এত ভারে ভারে
নৈবেদ্য দিলাম খেতে বেচিয়া গহনা,
সর্বস্ব খাওয়ানু, তবু ক্ষুধা মিটিল না ?'
ব্রাহ্মণ কহিল, 'বাছা, এ যে ঘোর কলি !
অনেক করেছ বটে তবু এও বলি,
আজকাল তেমন কি ভক্তি আছে কারো ?
সত্যযুগে যা পারিত তা কি আজ পারো ?
দানবীর কর্ণ-কাছে ধর্ম যবে এসে
পুত্রেরে চাহিল খেতে ব্রাহ্মণের বেশে,
নিজহস্তে সন্তানে কাটিল ; তখনি সে
শিশুরে ফিরিয়া পেল চক্ষের নিমেষে ।
শিবিরাজা শ্যেনরূপী ইন্দ্রের মুখেতে
আপন বুকের মাংস কাটি দিল খেতে,
পাইল অক্ষয় দেহ । নিষ্ঠা এরে বলে ।
তেমন কি এ কালেতে আছে ভূমণ্ডলে ?

মনে আছে ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছি
মার কাছে— তাঁদের গ্রামের কাছাকাছি
ছিল এক বন্ধ্যা নারী, না পাইয়া পথ
প্রথম গর্ভের ছেলে করিল মানত
মা গঙ্গার কাছে ; শেষে পুত্রজন্ম-পরে
অভাগী বিধবা হল, গেল সে সাগরে,
কহিল সে নিষ্ঠাভরে মা গঙ্গারে ডেকে,
মা, তোমারি কোলে আমি দিলাম ছেলেকে—
এ মোর প্রথম পুত্র, শেষ পুত্র এই,
এ জন্মের তরে আর পুত্র-আশা নেই ।
যেমনি জলেতে ফেলা, মাতা ভাগীরথী
মকরবাহিনী-রূপে হয়ে মূর্তিমতী
শিশু লয়ে আপনার পদ্মকরতলে
মার কোলে সমর্পিল । নিষ্ঠা এরে বলে ।'

মল্লিকা ফিরিয়া এল নতশির করে,
আপনারে ধিক্কারিল— এতদিন ধরে
বৃথা ব্রত করিলাম, বৃথা দেবার্চনা,
নিষ্ঠাহীনা পাপিষ্ঠারে ফল মিলিল না ।

ঘরে ফিরে এসে দেখে শিশু অচেতন
জ্বরাবেশে । অঙ্গ যেন অগ্নির মতন ।
ঔষধ গিলাতে যায় যত বারবার
পড়ে যায়, কণ্ঠ দিয়া নামিল না আর ।
দন্তে দন্তে গেল আঁটি । বৈদ্য শির নাড়ি
ধীরে ধীরে চলি গেল রোগীগৃহ ছাড়ি ।
সন্ধ্যার আঁধারে শূন্য বিধবার ঘরে
একটি মলিন দীপ, শয়নশিয়রে
একা শোকাতুরা নারী । শিশু একবার
জ্যোতিহীন আঁখি মেলি যেন চারি ধার
খুঁজিল কাহারে । নারী কাঁদিল কাতর,
'ও মানিক, ওরে সোনা, এই-যে মা তোর,
এই-যে মায়ের কোল, ভয় কী রে বাপ !'
বক্ষে তারে চাপি ধরি তার জ্বরতাপ
চাহিল কাড়িয়া নিতে অঙ্গে আপনার
প্রাণপণে । সহসা বাতাসে গৃহদ্বার
খুলে গেল, ক্ষীণ দীপ নিবিল তখনি—
সহসা বাহির হতে কলকলধ্বনি
পশিল গৃহের মাঝে । চমকিল নারী ।
দাঁড়ায়ে উঠিল বেগে শয্যাতল ছাড়ি,

কহিল, 'মায়ের ডাক ওই শুনা যায়—
ও মোর দুঃখীর ধন, পেয়েছি উপায়,
তোর মার কোল চেয়ে সুশীতল কোল
আছে ওরে বাছা !'

জাগিয়াছে কলরোল
অদূরে জাহ্নবীজলে, এসেছে জোয়ার
পূর্ণিমায় । শিশুর তাপিত দেহভার
বক্ষে লয়ে মাতা, গেল শূন্যঘাট-পানে ।
কহিল, 'মা, মার ব্যথা যদি বাজে প্রাণে
তবে এ শিশুর তাপ দে গো মা জুড়ায়ে ।
একমাত্র ধন মোর দিনু তোর পায়ে
এক-মনে ।' এত বলি সমর্পিল জলে
অচেতন শিশুটিরে লয়ে করতলে
চক্ষু মুদি । বহুক্ষণ আঁখি মেলিল না ;
ধ্যানে নিরখিল বসি মকরবাহনা
জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি ক্ষুদ্র শিশুটিরে
কোলে ক'রে এসেছেন, রাখি তার শিরে
একটি পদ্মের দল ; হাসিমুখে ছেলে
অনিন্দিত কান্তি ধরি দেবী-কোল ফেলে
মার কোলে আসিবারে বাড়ায়েছে কর ।
কহে দেবী, 'রে দুঃখিনী, এই তুই ধর্,
তোর ধন তোরে দিনু ।' রোমাঞ্চিতকায়
নয়ন মেলিয়া কহে, 'কই মা !··· কোথায় !'
পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে বিহ্বলা রজনী ;
গঙ্গা বহি চলি যায় করি কলধ্বনি ।
চীৎকারি উঠিল নারী, 'দিবি নে ফিরায়ে ?'
মর্মরিল বনভূমি দক্ষিণের বায়ে ।

২৪ আশ্বিন ১৩০৬

কল্পনা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

সুহৃৎকরকমলে

বৈশাখ

১৩০৭

বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
'এসো এসো' সুরে করুণ মিনতি-মাখা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজরচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা-দিশা-হারা নিবিড়-তিমির-আঁকা—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

জোড়াসাঁকো
১৫ বৈশাখ ১৩০৪

বর্ষামঙ্গল

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে।
নিখিলচিত্তহরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ তড়িৎচকিতনয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা!
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা!

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা—
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী!

'কল্পনা'র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

কুঞ্জকুটিরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লার-রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী!

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া
স্মিতবিকশিত বয়নে,
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে,
শশিতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী—
কোথা তোরা পুরকামিনী!
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী—
শূন্যশয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী!

যূথীপরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জতিমিরে,
জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না—
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুমপরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে—
কোথা পুলকের তুলনা!
নীপশাখে সখী ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা—
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা—
শতশতগীতমুখরিত বনবীথিকা।

জোড়াসাঁকো
১৭ বৈশাখ ১৩০৪

চৌরপঞ্চাশিকা

ওগো সুন্দর চোর,
বিদ্যা তোমার কোন্ সন্ধ্যার
কনকচাঁপার ডোর !
কত বসন্ত চলি গেছে হায়,
কত কবি আজি কত গান গায়,
কোথা রাজবালা চিরশয্যায়—
ওগো সুন্দর চোর,
কোনো গানে আর ভাঙে না যে তার
অনন্ত ঘুমঘোর ।

ওগো সুন্দর চোর,
কত কাল হল কবে সে প্রভাতে
তব প্রেমনিশি ভোর !
কবে নিবে গেছে নাহি তাহা লিখা
তোমার বাসরে দীপানলশিখা,
খসিয়া পড়েছে সোহাগলতিকা—
ওগো সুন্দর চোর,
শিথিল হয়েছে নবীন প্রেমের
বাহুপাশ সুকঠোর ।

তবু সুন্দর চোর,
মৃত্যু হারায়ে কেঁদে কেঁদে ঘুরে
পঞ্চাশ শ্লোক তোর ।
পঞ্চাশ বার ফিরিয়া ফিরিয়া
বিদ্যার নাম ঘিরিয়া ঘিরিয়া
তীব্র ব্যথায় মর্ম চিরিয়া
ওগো সুন্দর চোর,
যুগে যুগে তারা কাঁদিয়া মরিছে
মূঢ় আবেগে ভোর ।

ওগো সুন্দর চোর,
অবোধ তাহারা, বধির তাহারা,
অন্ধ তাহারা ঘোর ।
দেখে না শোনে না কে আসে কে যায়,
জানে না কিছুই কারে তারা চায়,
শুধু এক নাম এক সুরে গায়—
ওগো সুন্দর চোর,
না জেনে না বুঝে ব্যর্থ ব্যথায়
ফেলিছে নয়নলোর ।

ওগো সুন্দর চোর,
এক সুরে বাঁধা পঞ্চাশ গাথা
শুনে মনে হয় মোর—
রাজভবনের গোপনে পালিত,
রাজবালিকার সোহাগে লালিত,
তব বুকে বসি শিখেছিল গীত
ওগো সুন্দর চোর,
পোষা শুক সারী মধুরকণ্ঠ
যেন পঞ্চাশ-জোড় ।

ওগো সুন্দর চোর,
তোমারি রচিত সোনার ছন্দ-
পিঞ্জরে তারা ভোর ।
দেখিতে পায় না কিছু চারি ধারে,
শুধু চিরনিশি গাহে বারে বারে
তোমাদের চির শয়নদুয়ারে—
ওগো সুন্দর চোর,
আজি তোমাদের দুজনের চোখে
অনন্ত ঘুমঘোর ।

২৩ বৈশাখ ১৩০৪
পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত :
৪ জ্যৈষ্ঠ । কলিকাতা

স্বপ্ন

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে ।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা ।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে ।

মহাকাল-মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে ।
জনশূন্য পণ্যবীথি, ঊর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্য-'পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা ।

প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেতস্তম্ভ-'পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভরে।

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড-'পরে।
হেনকালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।
দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের 'পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সন্ধ্যাতারা করে।
অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে— মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধালো শুধু, সকরুণ আঁখি,
'হে বন্ধু আছ তো ভালো ?' মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত— মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহা-পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

দুজনে ভাবিনু কত দ্বারতরুতলে !
নাহি জানি কখন কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো, মুখখানি তার
নতবৃন্তপদ্মসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে, ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

বোলপুর
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মদনভস্মের পূর্বে

একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে,
মরি মরি অনঙ্গদেবতা।
কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধু-পবনে,
পথিকবধূ চরণে প্রণতা।
ছড়াত পথে আঁচল হতে অশোক চাঁপা করবী
মিলিয়া যত তরুণ তরুণী,
বকুলবনে পবন হত সুরার মতো সুরভি—
পরান হত অরুণবরনী।

সন্ধ্যা হলে কুমারীদলে বিজন তব দেউলে
জ্বালায়ে দিত প্রদীপ যতনে,
শূন্য হলে তোমার তূণ বাছিয়া ফুলমুকুলে
সায়ক তারা গড়িত গোপনে।
কিশোর কবি মুগ্ধছবি বসিয়া তব সোপানে
বাজায়ে বীণা রচিত রাগিণী।
হরিণ-সাথে হরিণী আসি চাহিত দীন নয়ানে,
বাঘের সাথে আসিত বাঘিনী।

হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রণয়ভীরু ষোড়শী
চরণে ধরি করিত মিনতি।
পঞ্চশর গোপনে লয়ে কৌতূহলে উলসি
পরখছলে খেলিত যুবতী।
শ্যামল তৃণশয়নতলে ছড়ায়ে মধুমাধুরী
ঘুমাতে তুমি গভীর আলসে,
ভাঙাতে ঘুম লাজুক বধূ করিত কত চাতুরী—
নূপুর দুটি বাজাত লালসে।

কাননপথে কলস লয়ে চলিত যবে নাগরী
কুসুমশর মারিতে গোপনে,
যমুনাকূলে মনের ভুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগরি
রহিত চাহি আকুল নয়নে।

বাহিয়া তব কুসুমতরী সমুখে আসি হাসিতে,
শরমে বালা উঠিত জাগিয়া—
শাসনতরে বাঁকায়ে ভুরু নামিয়া জলরাশিতে
মারিত জল হাসিয়া রাগিয়া।

তেমনি আজো উদিছে বিধু, মাতিছে মধুযামিনী,
মাধবীলতা মুদিছে মুকুলে—
বকুলতলে বাঁধিছে চুল একেলা বসি কামিনী
মলয়ানিল-শিথিল-দুকূলে।
বিজন নদীপুলিনে আজো ডাকিছে চখা চখীরে,
মাঝেতে বহে বিরহবাহিনী।
গোপনব্যথা-কাতরা বালা বিরলে ডাকি সখীরে
কাঁদিয়া কহে করুণ কাহিনী।

এসো গো আজি অঙ্গ ধরি সঙ্গে করি সখারে,
বন্যমালা জড়ায়ে অলকে—
এসো গোপনে মৃদুচরণে বাসরগৃহদুয়ারে
স্তিমিতশিখা প্রদীপ-আলোকে।
এসো চতুর মধুর হাসি তড়িৎসম সহসা
চকিত করো বধূরে হরষে—
নবীন করো মানবঘর, ধরণী করো বিবশা
দেবতাপদ-সরস-পরশে।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মদনভস্মের পর

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতিবিলাপ-সংগীতে,
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুন মাসে নিমেষ-মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মুরছি পড়ে অবনী।

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়বীণাযন্ত্রে মহা পুলকে!
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।

কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুলতরুপল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা !
ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা !

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত
নয়ন কার নীরব নীল গগনে !
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত,
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে !
পরশ কার পুষ্পবাসে পরান মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে !
পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে ।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মার্জনা

ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি
মোরে দয়া করে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা ।
ভীরু পাখির মতন তব পিঞ্জরে এসেছি,
ওগো, তাই ব'লে দ্বার কোরো না রুদ্ধ কোরো না ।
মোর যাহা-কিছু ছিল কিছুই পারি নি রাখিতে,
মোর উতলা হৃদয় তিলেক পারি নি ঢাকিতে,
সখা, তুমি রাখো ঢাকো, তুমি করো মোরে করুণা—
ওগো, আপনার গুণে অবলারে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা ।

ওগো প্রিয়তম, যদি নাহি পারো ভালোবাসিতে
তবু ভালোবাসা কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা ।
তব দুটি আঁখিকোণ ভরি দুটি কণা হাসিতে
এই অসহায়া-পানে চেয়ো না, বন্ধু, চেয়ো না ।
আমি সম্বরি বাস ফিরে যাব দ্রুতচরণে,
আমি চকিত শরমে লুকাব আঁধার মরণে,
আমি দু হাতে ঢাকিব নগ্নহৃদয়বেদনা—
ওগো প্রিয়তম, তুমি অভাগীরে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা ।

ওগো প্রিয়তম, যদি চাহ মোরে ভালোবাসিয়া
মোর সুখরাশি কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা ।
যবে সোহাগের স্রোতে যাব নিরুপায় ভাসিয়া ।
তুমি দূর হতে বসি হেসো না গো সখা, হেসো না ।

যবে রানীর মতন বসিব রতন-আসনে,
যবে বাঁধিব তোমারে নিবিড় প্রণয়শাসনে,
যবে দেবীর মতন পুরাব তোমার বাসনা—
ওগো তখন, হে নাথ, গরবীরে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।

বোলপুর
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

চৈত্ররজনী

আজি উন্মাদ মধুনিশি ওগো
চৈত্রনিশীথশশী !
তুমি এ বিপুল ধরণীর পানে
কী দেখিছ একা বসি
চৈত্রনিশীথশশী !

কত নদীতীরে, কত মন্দিরে,
কত বাতায়নতলে,
কত কানাকানি, মন-জানাজানি,
সাধাসাধি কত ছলে !
শাখাপ্রশাখার, দ্বার-জানালার
আড়ালে আড়ালে পশি
কত সুখদুখ কত কৌতুক
দেখিতেছ একা বসি
চৈত্রনিশীথশশী !

মোরে দেখো চাহি, কেহ কোথা নাহি,
শূন্য ভবন-ছাদে
নৈশ পবন কাঁদে।
তোমারি মতন একাকী আপনি
চাহিয়া রয়েছি বসি
চৈত্রনিশীথশশী !

জোড়াসাঁকো
১৯ বৈশাখ ১৩০৪

স্পর্ধা

সে আসি কহিল, 'প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও।'
দূষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু, 'যাও !'
সখী ওলো সখী, সত্য করিয়া বলি,
তবু সে গেল না চলি।

দাঁড়ালো সমুখে ; কহিনু তাহারে, 'সরো !'
ধরিল দু হাত ; কহিনু, 'আহা কী কর !'
সখী ওলো সখী, মিছে না কহিব তোরে,
তবু ছাড়িল না মোরে ।

শ্রুতিমূলে মুখ আনিল সে মিছিমিছি ;
নয়ন বাঁকায়ে কহিনু তাহারে, 'ছি ছি !'
সখী ওলো সখী, কহিনু শপথ ক'রে
তবু সে গেল না সরে ।

অধরে কপোল পরশ করিল তবু ;
কাঁপিয়া কহিনু, 'এমন দেখি নি কভু !'
সখী ওলো সখী, একি তার বিবেচনা,
তবু মুখ ফিরালো না ।

আপন মালাটি আমারে পরায়ে দিল—
কহিনু তাহারে, 'মালায় কী কাজ ছিল !'
সখী ওলো সখী, নাহি তার লাজ ভয়,
মিছে তারে অনুনয় ।

আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে,
চাহি তার পানে রহিনু অবাক হয়ে ।
সখী ওলো সখী, ভাসিতেছি আঁখিনীরে—
কেন সে এল না ফিরে !

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

পিয়াসী

আমি তো চাহি নি কিছু ।
বনের আড়ালে দাঁড়ায়ে ছিলাম
নয়ন করিয়া নিচু ।
তখনো ভোরের আলস-অরুণ
আঁখিতে রয়েছে ঘোর,
তখনো বাতাসে জড়ানো রয়েছে
নিশির শিশির-লোর ।
নূতন তৃণের উঠিছে গন্ধ
মন্দ প্রভাতবায়ে—
তুমি একাকিনী কুটিরবাহিরে
বসিয়া অশথছায়ে
নবীননবনীনিন্দিত করে
দোহন করিছ দুগ্ধ,

আমি তো কেবল বিধুর বিভোল
দাঁড়ায়ে ছিলাম মুগ্ধ।

আমি তো কহি নি কথা।
বকুলশাখায় জানি না কী পাখি
কী জানালো ব্যাকুলতা।
আম্রকাননে ধরেছে মুকুল,
ঝরিছে পথের পাশে—
গুঞ্জনস্বরে দুয়েকটি করে
মৌমাছি উড়ে আসে।
সরোবরপারে খুলিছে দুয়ার
শিবমন্দিরঘরে,
সন্ন্যাসী গাহে ভোরের ভজন
শান্ত গভীর স্বরে।
ঘট লয়ে কোলে বসি তরুতলে
দোহন করিছ দুগ্ধ,
শূন্য পাত্র বহিয়া মাত্র
দাঁড়ায়ে ছিলাম লুব্ধ।

আমি তো যাই নি কাছে।
উতলা বাতাস অলকে তোমার
কী জানি কী করিয়াছে।
ঘণ্টা তখন বাজিছে দেউলে,
আকাশ উঠিছে জাগি,
ধরণী চাহিছে ঊর্ধ্বগগনে
দেবতা-আশিস মাগি।
গ্রামপথ হতে প্রভাত-আলোতে
উড়িছে গোখুরধূলি—
উছলিত ঘট বেড়ি কটিতটে
চলিয়াছে বধূগুলি।
তোমার কাঁকন বাজে ঘনঘন
ফেনায়ে উঠিছে দুগ্ধ,
পিয়াসী নয়নে ছিনু এক কোণে
পরান নীরবে ক্ষুব্ধ।

[১৪ জ্যৈষ্ঠ] ১৩০৪

পসারিনী

ওগো পসারিনী, দেখি আয়
কী রয়েছে তব পসরায়।
এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি
কোমল করুণ ক্লান্তকায়!
কোথা কোন্ রাজপুরে যাবে আরো কত দূরে
কিসের দুরূহ দুরাশায়!
সম্মুখে দেখো তো চাহি পথের যে সীমা নাহি,
তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে।
পসারিনী, কথা রাখো— দূর পথে যেয়ো নাকো
ক্ষণেক দাঁড়াও এইখানে।

হেথা দেখো শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল—
কূলে কূলে ভরা দিঘি, কাকচক্ষু জল।
ঢালু পাড়ি চারি পাশে কচি কচি কাঁচা ঘাসে
ঘনশ্যাম চিকনকোমল।
পাষাণের ঘাটখানি, কেহ নাই জনপ্রাণী,
আম্রবন নিবিড় শীতল।
থাক্ তব বিকি-কিনি— ওগো শ্রান্ত পসারিনী,
এইখানে বিছাও অঞ্চল।

ব্যথিত চরণ দুটি ধুয়ে নিবে জলে,
বনফুলে মালা গাঁথি পরি নিবে গলে।
আম্রমঞ্জরীর গন্ধ বহি আনি মৃদুমন্দ
বায়ু তব উড়াবে অলক—
ঘুঘু-ডাকে ঝিল্লিরবে কী মন্ত্র শ্রবণে কবে,
মুদে যাবে চোখের পলক।
পসরা নামায়ে ভূমে যদি ঢুলে পড় ঘুমে,
অঙ্গে লাগে সুখালসঘোর—
যদি ভুলে তন্দ্রাভরে ঘোমটা খসিয়া পড়ে,
তাহে কোনো শঙ্কা নাহি তোর।

যদি সন্ধ্যা হয়ে আসে, সূর্য যায় পাটে,
পথ নাহি দেখা যায় জনশূন্য মাঠে—
নাই গেলে বহু দূরে, বিদেশের রাজপুরে,
নাই গেলে রতনের হাটে।
কিছু না করিয়ো ডর, কাছে আছে মোর ঘর,
পথ দেখাইয়া যাব আগে।
শশীহীন অন্ধ রাত, ধরিয়ো আমার হাত
যদি মনে বড়ো ভয় লাগে।

শয্যা শুভ্রফেননিভ স্বহস্তে পাতিয়া দিব,
গৃহকোণে দীপ দিব জ্বালি—
দুগ্ধদোহনের রবে কোকিল জাগিবে যবে
আপনি জাগায়ে দিব কালি।

ওগো পসারিনী,
মধ্যদিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে,
দগ্ধ পথে উড়ে তপ্ত বালি—
দাঁড়াও, যেয়ো না আর, নামাও পসরাভার,
মোর হাতে দাও তব ডালি।

বোট। শিলাইদহ
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

ভ্রষ্ট লগ্ন

শয়নশিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিলরবে।
অলসচরণে বসি বাতায়নে এসে
নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে।
এমন সময়ে অরুণধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।
শুধালো কাতরে 'সে কোথায়! সে কোথায়!'
ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
'নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি!'

গোধূলিবেলায় তখনো জ্বলে নি দীপ,
পরিতেছিলাম কপালে সোনার টিপ—
কনকমুকুর হাতে লয়ে বাতায়নে
বাঁধিতেছিলাম কবরী আপনমনে।
হেনকালে এল সন্ধ্যাধূসর পথে
করুণনয়ন তরুণ পথিক রথে।
ফেনায় ঘর্মে আকুল অশ্বগুলি
বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি।
শুধালো কাতরে 'সে কোথায়! সে কোথায়!'
ক্লান্ত চরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
'শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি!'

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিন বাতাস মরিছে বুকের 'পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা সারী,
দুয়ার-সমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসরগেহ,
অগুরুগন্ধে আকুল সকল দেহ,
ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি
দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি,
রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি,
বাতায়নতলে বসেছি ধুলায় নামি—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি!'

বোলপুর
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

প্রণয়প্রশ্ন

এ কি তবে সবই সত্য
হে আমার চিরভক্ত?
আমার চোখের বিজুলি-উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে,
এ কি সত্য?
আমার মধুর অধর, বধূর
নবলাজসম রক্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য?

চিরমন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কি?
চরণে আমার বীণাঝংকার বাজে কি?
এ কি সত্য?
নিশির শিশির ঝরে কি আমারে হেরিয়া?
প্রভাত-আলোকে পুলক আমারে ঘেরিয়া,
এ কি সত্য?
তপ্তকপোলপরশে অধীর
সমীর মদিরমত্ত,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য?

কালো কেশপাশে দিবস লুকায় আঁধারে,
মরণবাঁধন মোর দুই ভুজে বাঁধা রে,
এ কি সত্য?

ভুবন মিলায় মোর অঞ্চলখানিতে,
বিশ্ব নীরব মোর কণ্ঠের বাণীতে,
এ কি সত্য ?
ত্রিভুবন লয়ে শুধু আমি আছি,
আছে মোর অনুরক্ত,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য ?

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া ?
এ কি সত্য ?
আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চিরজনমের বিরাম লভিলে পলকে,
এ কি সত্য ?
মোর সুকুমার ললাটফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য ?

রেলপথে
১৩ আশ্বিন ১৩০৪

আশা

এ জীবনসূর্য যবে অস্তে গেল চলি,
হে বঙ্গজননী মোর, 'আয় বৎস' বলি
খুলি দিলে অন্তঃপুরে প্রবেশদুয়ার,
ললাটে চুম্বন দিলে ; শিয়রে আমার
জ্বালিলে অনন্ত দীপ । ছিল কণ্ঠে মোর
একখানি কণ্টকিত কুসুমের ডোর
সংগীতের পুরস্কার, তারি ক্ষতজ্বালা
হৃদয়ে জ্বলিতেছিল— তুলি সেই মালা
প্রত্যেক কণ্টক তার নিজ হস্তে বাছি
ধূলি তার ধুয়ে ফেলি শুভ্র মাল্যগাছি
গলায় পরায়ে দিয়ে লইলে বরিয়া
মোরে তব চিরন্তন সন্তান করিয়া ।
অশ্রুতে ভরিয়া উঠি খুলিল নয়ন ;
সহসা জাগিয়া দেখি, এ শুধু স্বপন !

১৩০৫

বঙ্গলক্ষ্মী

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনে-ঘেরা সহস্র কুটিরে,
দোহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে ।

এ বিশ্বসমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোনো কাজে,
নাহি জান সে বারতা । তুমি শুধু, মা গো,
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগ
মলয় বীজন করি । রয়েছ, মা, ভুলি
তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাটশোভা সীমন্তরতন,
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে ।

নিত্যকর্মে রত শুধু, অয়ি মাতৃভূমি,
প্রত্যুষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,
মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি
রৌদ্র নিবারিছ, যবে আসে বিভাবরী
চারি দিক হতে তব যত নদনদী
ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি
ঘেরি ক্লান্ত গ্রামগুলি শত বাহুপাশে ।
শরৎ-মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে
হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোতকূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছ মাতঃ, প্রফুল্ল অধরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা ; স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়
ধৈর্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দিকময়
ক্ষমাপূর্ণ আশীর্বাদ করে বিকিরণ ।
হেরি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ,
মধুর মঙ্গলচ্ছবি মৌন অবিচল,
নতশির কবিচক্ষে ভরি আসে জল ।

শরৎ

আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর—
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল
তোমার কাননসভাতে !
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী,
শরৎকালের প্রভাতে।

জননী, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিকো তোমার—
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী, তোমার আহ্বানলিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীলবরনী।
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী।
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
দিশি দিশি হতে তরণী।
আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্নিগ্ধশীতল ধরণী।

বহিছে প্রথম শিশিরসমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে—
কুটিরে কুটিরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে।
দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন,
হাসিভরা মুখ তব পরিজন

ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে।
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে।

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া—
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।
ও পার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ও পাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়—
আয় তোরা সবে জুটিয়া।
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।

মাতার কণ্ঠে শেফালিমাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনককিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে
কুসুমভূষণজড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

মাতার আহ্বান

বারেক তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে
ফুকারিয়া ডাকো জননী!
প্রান্তরে তব সন্ধ্যা নামিছে,
আঁধারে ঘেরিছে ধরণী।
ডাকো 'চলে আয়, তোরা কোলে আয়',
ডাকো সকরুণ আপন ভাষায়—
সে বাণী হৃদয়ে করুণা জাগায়,
বেজে উঠে শিরা ধমনী,
হেলায় খেলায় যে আছে যেথায়
সচকিয়া উঠে অমনি।

আমরা প্রভাতে নদী পার হনু,
ফিরিনু কিসের দুরাশে।
পরের উঞ্ছ অঞ্চলে লয়ে
ঢালিনু জঠরহুতাশে।
খেয়া বহে নাকো, চাহি ফিরিবারে,
তোমার তরণী পাঠাও এ পারে,
আপনার খেত গ্রামের কিনারে
পড়িয়া রহিল কোথা সে !
বিজন বিরাট শূন্য সে মাঠ
কাঁদিছে উতলা বাতাসে !

কাঁপিয়া কাঁপিয়া দীপখানি তব
নিবু-নিবু করে পবনে—
জননী, তাহারে করিয়ো রক্ষা
আপন বক্ষোবসনে।
তুলি ধরো তারে দক্ষিণ করে,
তোমার ললাটে যেন আলো পড়ে—
চিনি দূর হতে, ফিরে আসি ঘরে
না ভুলি আলেয়া-ছলনে।
এ পারে দুয়ার রুদ্ধ, জননী,
এ পরপুরীর ভবনে।

তোমার বনের ফুলের গন্ধ
আসিছে সন্ধ্যাসমীরে।
শেষ গান গাহে তোমার কোকিল
সুদূরকুঞ্জতিমিরে।
পথে কোনো লোক নাহি আর বাকি,
গহন কাননে জ্বলিছে জোনাকি,
আকুল অশ্রু ভরি দুই আঁখি
উচ্ছ্বসি উঠে অধীরে।
'তোরা যে আমার' ডাকো একবার
দাঁড়ায়ে দুয়ার-বাহিরে।

নাগর নদী। আত্রাই পথে
৭ আষাঢ় ১৩০৫

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে,
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ।

বিদেশী জানে না তোরে অনাদরে তাই
করে অপমান,
মোরা তারি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই
আপন সন্তান।
তোমার যা দৈন্য, মাতঃ, তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি ?
পরধনে ধিক্ গর্ব, করি করজোড়
ভরি ভিক্ষাঝুলি !
পুণ্যহস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজহাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।
সেই সিংহাসন— যদি অঞ্চলটি পাত,
কর স্নেহ দান।
যে তোমারে তুচ্ছ করে সে আমারে, মাতঃ,
কী দিবে সম্মান !

১৩০৪

হতভাগ্যের গান

বিভাস। একতালা

বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে,
কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস !
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা
সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর
নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

আমরা সুখের স্ফীত বুকের
ছায়ার তলে নাহি চরি।
আমরা দুখের বক্র মুখের
চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য
বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে
ভিন্ন করব নীলাকাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী
তুমি দেবী অচঞ্চলা।
তোমার রীতি সরল অতি,
নাহি জান ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা
নাইকো তাহে প্রতারণা,
টান যখন মরণ-ফাঁসি
বল নাকো মিষ্টভাষ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

ধরার যারা সেরা সেরা
মানুষ তারা তোমার ঘরে।
তাদের কঠিন শয্যাখানি
তাই পেতেছ মোদের তরে।
আমরা বরপুত্র তব
যাহাই দিবে তাহাই লব,
তোমায় দিব ধন্যধ্বনি
মাথায় বহি সর্বনাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা,
লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা
তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধ ভালে প্রলয়-শিখা
দিক্, মা, এঁকে তোমার টিকা—
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা
জীর্ণকন্থা ছিন্নবাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

লুকোক তোমার ডঙ্কা শুনে
কপট সখার শূন্য হাসি।
পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে
মিথ্যে চাটু মক্কা কাশী।
আত্মপরের প্রভেদ-ভোলা
জীর্ণ দুয়োর নিত্য খোলা,
থাকবে তুমি থাকব আমি
সমান-ভাবে বারো মাস।

হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

শঙ্কা তরাস লজ্জা-শরম
চুকিয়ে দিলেম স্তুতি-নিন্দে।
ধুলো, সে তোর পায়ের ধুলো,
তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে।
আশারে কই, 'ঠাকুরানী,
তোমার খেলা অনেক জানি,
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি
তারেও ফাঁকি দিতে চাস!'
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

মৃত্যু যেদিন বলবে 'জাগো,
প্রভাত হল তোমার রাতি',
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের
চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি।
আমরা দোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি
চিরদিনের প্রতিবেশী,
বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর
জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ,
বিদায়-কালে অদৃষ্টেরে
করে যাব পরিহাস।

বড়ল নদী। ৭ আশ্বিন ১৩০৪
পরিবর্ধন : নাগর নদী। পতিসর
৭ আষাঢ় ১৩০৫

জুতা-আবিষ্কার

কহিলা হবু, 'শুন গো গোবুরায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারা রাত্র—
মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়
ধরণীমাঝে চরণ-ফেলা মাত্র?
তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি,
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি।
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মোর একি এ অনাসৃষ্টি!
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।'

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন,
  দারুণ ত্রাসে ঘর্ম বহে গাত্রে।
পণ্ডিতের হইল মুখ চুন,
  পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।
রান্নাঘরে নাহিকো চড়ে হাঁড়ি,
  কান্নাকাটি পড়িল বাড়িমধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
  কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে,
    'যদি না ধুলা লাগিবে তব পায়ে,
    পায়ের ধুলা পাইব কী উপায়ে!'

শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি,
  কহিল শেষে, 'কথাটা বটে সত্য—
কিন্তু আগে বিদায় করো ধূলি,
  ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব।
ধুলা-অভাবে না পেলে পদধুলা
  তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা
  উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে?
    আগের কাজ আগে তো তুমি সারো,
    পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো।'

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
  যতনভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানীগুণী
  দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।
বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি,
  ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য।
অনেক ভেবে কহিল, 'গেলে মাটি
  ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য?'
    কহিল রাজা, 'তাই যদি না হবে,
    পণ্ডিতেরা রয়েছ কেন তবে?'

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
  কিনিল ঝাঁটা সাড়ে সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধুলা এসে
  ভরিয়া দিল রাজার মুখ ও বক্ষ।
ধুলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,
  ধুলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য।
ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
  ধুলার মাঝে নগর হল উহ্য।

কহিল রাজা, 'করিতে ধুলা দূর,
জগত হল ধুলায় ভরপুর!'

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিকো চলে কিস্তি।
জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা—
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দিজ্বরে উজাড় হল দেশটা।
কহিল রাজা, 'এমনি সব গাধা
ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা!'

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে;
বসিল পুন যতেক গুণবন্ত—
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে,
ধুলার হায় নাহিকো পায় অন্ত।
কহিল, 'মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাশ পাতি করিব ধুলা বন্ধ।'
কহিল কেহ, 'রাজারে ঘরে রাখো,
কোথাও যেন না থাকে কোনো রন্ধ্র।
ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধুলা তো লাগে না।'

কহিল রাজা, 'সে কথা বড়ো খাঁটি,
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ,
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস রাতি রহিলে আমি বন্ধ।'
কহিল সবে, 'চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।
ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীর্তি।'
কহিল সবে, 'হবে সে অবহেলে,
যোগ্যমত চামার যদি মেলে।'

রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম।
যোগ্য-মতো চামার নাহি কোথা,
না মিলে তত উচিত-মতো চর্ম।

তখন ধীরে চামার-কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
'বলিতে পারি করিলে অনুমতি,
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।'

কহিল রাজা, 'এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশ-সুদ্ধ!'
মন্ত্রী কহে, 'বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ।'
রাজার পদ চর্ম-আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে।
মন্ত্রী কহে, 'আমারো ছিল মনে—
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।'
সেদিন হতে চলিল জুতো পরা—
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা।

১৩০৪

সে আমার জননী রে

ভৈরবী। রূপক

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে?
কে বৃথা আশাভরে
চাহিছে মুখ-'পরে?
সে যে আমার জননী রে!

কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি?
কাহার ভাষা হায়
ভুলিতে সবে চায়?
সে যে আমার জননী রে!

ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি
চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান
করিছে অপমান—
সে যে আমার জননী রে!

পুণ্য কুটিরে বিষণ্ণ
কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন?

সে স্নেহ-উপহার
রুচে না মুখে আর !
সে যে আমার জননী রে !

[১৩০৪]

জগদীশচন্দ্র বসু

বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে ।

বিদেশের মহোজ্জ্বল-মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিতসভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে ।
সে ধ্বনি গম্ভীরমন্দ্রে ছায় চারি ধার
হয়ে সিন্ধু পার ।

আজি মাতা পাঠাইছে— অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে ভ্রাতঃ ।
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে ।

১৩০৪

ভিখারি

ভৈরবী । একতালা

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই ?
ওগো ভিখারি, আমার ভিখারি, চলেছ
কী কাতর গান গাই' ?
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে
ভিখারি, আমার ভিখারি !

হায় পলকে সকলি সঁপেছি চরণে,
আর তো কিছুই নাই।
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই?

আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরানু বাস,
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি
তোমার পুরাতে আশ।
মম প্রাণমন যৌবন নব
করপুটতলে পড়ে আছে তব,
ভিখারি, আমার ভিখারি!
হায়, আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই।
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই?

পতিসর
১২ আশ্বিন [১৩০৪]

যাচনা

কীর্তনের সুর

ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো— তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরানে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো— তোমার
চরণমঞ্জীরে।

ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখিটি— তোমার
প্রাসাদপ্রাঙ্গণে।
মনে ক'রে সখী, বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখীটি— তোমার
কনককঙ্কণে।

আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া তুলিয়া রাখিয়ো— তোমার
অলকবন্ধনে।
আমার স্মরণ-শুভ-সিন্দূরে
একটি বিন্দু আঁকিয়ো— তোমার
ললাটচন্দনে।

আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো গো— তোমার
অঙ্গসৌরভে।
আমার আকুল জীবনমরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো গো— তোমার
অতুল গৌরবে।

সাহাজাদপুর। বোট
৮ আশ্বিন ১৩০৪

বিদায়

বিভাস

এবার চলিনু তবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
উচ্ছল জল করে ছলছল,
জাগিয়া উঠিছে কলকোলাহল,
তরণীপতাকা চলচঞ্চল
কাঁপিছে অধীর রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর
নির্মম আমি আজি।
আর নাহি দেরি, ভৈরবভেরী
বাহিরে উঠেছে বাজি!
তুমি ঘুমাইছ নিমীলনয়নে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহস্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

অরুণ তোমার তরুণ অধর,
করুণ তোমার আঁখি,
অমিয়রচন সোহাগবচন
অনেক রয়েছে বাকি।
পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার—
মহাকাশ হতে ওই বারে বার
আমারে ডাকিছে সবে।

সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর !
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর !
কিসেরি বা সুখ, ক' দিনের প্রাণ ?
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম গান,
অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

ইছামতী
৭ আশ্বিন ১৩০৪

লীলা

সিন্ধুভৈরবী

কেন বাজাও কাঁকন কনকন, কত
ছলভরে !
ওগো, ঘরে ফিরে চলো, কনককলসে
জল ভরে।
কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি
কর খেলা,
কেন চাহ খনে খনে চকিত নয়নে
কার তরে
কত ছলভরে !

হেরো যমুনা-বেলায় আলসে হেলায়
গেল বেলা,
যত হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি
কলস্বরে
কত ছলভরে।
হেরো নদীপরপারে গগনকিনারে
মেঘমেলা,
তারা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি
মুখ-'পরে
কত ছলভরে।

[ভাদ্র-আশ্বিন] ১৩০৪

নববিরহ

মল্লার

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে—
অধর করুণামাখা
মিনতি-বেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায়খনে
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।

ঝরো ঝরো ঝরে জল, বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরানপুটে
কোন্‌খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে
হৃদয়কোণে
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।

ইছামতী
৬ আশ্বিন ১৩০৪

লজ্জিতা

ভৈরবী

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে।
শরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে!
আলোকপরশে মরমে মরিয়া
হেরো গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোনোমতে আছে পরান ধরিয়া
কামিনী শিথিল সাজে।
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে।

নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ
উষার বাতাস লাগি।
রজনীর শশী গগনের কোণে
লুকায় শরণ মাগি।

পাখি ডাকি বলে 'গেল বিভাবরী',
বধূ চলে জলে লইয়া গাগরি,
আমি এ আকুল কবরী আবরি
কেমনে যাইব কাজে !
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে ।

যমুনা
৭ আশ্বিন ১৩০৪

কাল্পনিক

বেহাগ

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে—
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন
হতাশে ।
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে ।
কিছু বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা-
বাঁধনে ।
কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর
সাধনে ।
আপনার মনে বসিয়া একেলা
অনলশিখায় কী করিনু খেলা,
দিনশেষে দেখি ছাই হল সব
হুতাশে !
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে ।

বলেশ্বরী
৮ আশ্বিন ১৩০৪

মানসপ্রতিমা

ইমনকল্যাণ

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য-গগন-বিহারী !

আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম-গগন-বিহারী !

মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী !
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে
মম সুখদুখ ভাঙিয়া—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন-বিহারী !

মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব
নয়নে দিয়েছি পরায়ে,
অয়ি মুগ্ধ-নয়ন-বিহারী !
মম সংগীতে তব অঙ্গে অঙ্গে
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম জীবন-মরণ-বিহারী !

চলন বিল। ঝড়বৃষ্টি
৯ আশ্বিন ১৩০৪

সংকোচ

ছায়ানট

যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।
যদি শরম লাগে, মুখে
চাহিব না।
যদি বিরলে মালা গাঁথা
সহসা পায় বাধা,
তোমার ফুলবনে
যাইব না।
যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।

যদি থমকি থেমে যাও
পথমাঝে,

আমি চমকি চলে যাব
আন কাজে।
যদি তোমার নদীকূলে
ভুলিয়া ঢেউ তুলে,
আমার তরীখানি
বাহিব না।
যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।

চলন বিল
ঝড়। বোট টলমল
৯ আশ্বিন ১৩০৪

প্রার্থী

কালাংড়া

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা,
তব নবপ্রভাতের নবীনশিশির-ঢালা।
শরমে জড়িত কত-না গোলাপ
কত-না গরবী করবী
কত-না কুসুম ফুটেছে তোমার
মালঞ্চ করি আলা!
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

অমল শরত-শীতল-সমীর
বহিছে তোমার কেশে,
কিশোর অরুণ-কিরণ তোমার
অধরে পড়েছে এসে।
অঞ্চল হতে বনপথে ফুল
যেতেছে পড়িয়া ঝরিয়া—
অনেক কুন্দ অনেক শেফালি
ভরেছে তোমার ডালা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

নাগর নদী
১০ আশ্বিন ১৩০৪

সকরুণা

আলেয়া

সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে !
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে ।
যদি শুধায় কে দিল, কোন্ ফুলকাননে,
তোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে ।
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে !

সখী, তরুর তলায় বসে সে ধুলায় যে !
সেথা বকুলমালায় আসন বিছায়ে দে ।
সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে—
কেন কী বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে ।
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে !

নাগর নদী
মেঘবৃষ্টি । অমাবস্যা
১০ আশ্বিন ১৩০৪

বিবাহমঙ্গল

ঝিঁঝিট

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন
পাতিয়া বোসো হে হৃদয়নাথ !
কল্যাণকরে মঙ্গলডোরে
বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত ।
প্রাণেশ, তোমারি প্রেম অনন্ত
জাগাক জীবনে নববসন্ত,
যুগল প্রাণের নবীন মিলনে
করো হে করুণনয়নপাত ।
সংসারপথ দীর্ঘ দারুণ,
বাহিরিবে দুটি পান্থ তরুণ,
আজিকে তোমারি প্রসাদ-অরুণ
করুক উদয় নবপ্রভাত ।
তব মঙ্গল তব মহত্ত্ব
তোমারি মাধুরী তোমারি সত্য
দোঁহার চিত্তে রহুক নিত্য
নবনবরূপে দিবস-রাত ।

১৩০৪

ভারতলক্ষ্মী

ভৈরবী

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
জনকজননিজননী !
নীলসিন্ধুজল-ধৌত চরণতল,
অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্রতুষারকিরীটিনী !
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী !
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী !

পৌষ ১৩০৩

প্রকাশ

হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ তো কহে নি কথা—
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা,
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে,
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে,
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি,
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি !
এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে,
সে কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে !

না জানি সে কবি জগতের কোণে কোথা ছিল দিবানিশি,
লতাপাতা চাঁদ মেঘের সহিতে এক হয়ে ছিল মিশি !
ফুলের মতন ছিল সে মৌন মনের আড়ালে ঢাকা,
চাঁদের মতন চাহিতে জানিত নয়ন স্বপনমাখা,
বায়ুর মতন পারিত ফিরিতে অলক্ষ্য মনোরথে
ভাবনা-সাধনা-বেদনা-বিহীন বিফল ভ্রমণপথে—
মেঘের মতন আপনার মাঝে ঘনায়ে আপন ছায়া
একা বসি কোণে জানিত রচিতে ঘনগম্ভীর মায়া ।

দ্যুলোকে-ভূলোকে ভাবে নাই কেহ আছে সে কিসের খোঁজে,
হেন সংশয় ছিল না কাহারও সে যে কোনো কথা বোঝে।
বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে তাই ছিল নাকো সাবধানে,
ঘন ঘন তার ঘোমটা খসিত ভাবে ইঙ্গিতে গানে।
বাসরঘরের বাতায়ন যদি খুলিয়া যাইত কভু
দ্বারপাশে তারে বসিতে দেখিয়া রুধিয়া দিত না তবু।
যদি সে নিভৃত শয়নের পানে চাহিত নয়ন তুলি
শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ছুঁড়িত না ফুলধূলি।

শশী যবে নিত নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালোবাসা
এরে দেখি হেসে ভাবিত, এ লোক জানে না চোখের ভাষা।
নলিনী যখন খুলিত পরান চাহি তপনের পানে
ভাবিত, এজন ফুলগন্ধের অর্থ কিছু না জানে।
তড়িৎ যখন চকিত নিমেষে পালাত চুমিয়া মেঘে
ভাবিত, এ খ্যাপা কেমনে বুঝিবে কী আছে অগ্নিবেগে!
সহকারশাখে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিত মালতীলতা,
আমি জানি আর তরু জানে শুধু কলমর্মরকথা।

একদা ফাগুনে সন্ধ্যাসময়ে সূর্য নিতেছে ছুটি,
পূর্বগগনে পূর্ণিমা চাঁদ করিতেছে উঠি-উঠি,
কোনো পুরনারী তরু-আলবালে জল সেচিবার ভানে
ছল করে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছুপানে,
কোনো সাহসিকা দুলিছে দোলায় হাসির বিজুলি হানি—
না চাহে নামিতে, না চাহে থামিতে, না মানে বিনয়বাণী,
কোনো মায়াবিনী মৃগশিশুটিরে তৃণ দেয় একমনে—
পাশে কে দাঁড়ায়ে চিনেও তাহারে চাহে না চোখের কোণে।

হেনকালে কবি গাহিয়া উঠিল, 'নরনারী, শুন সবে,
কত কাল ধরে কী যে রহস্য ঘটিছে নিখিল ভবে!
এ কথা কে কবে স্বপনে জানিত, আকাশের চাঁদ চাহি
পাণ্ডুকপোল কুমুদীর চোখে সারা রাত নিদ নাহি।
উদয়-অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে যে জলে
এত কাল ধরে তাহার তত্ত্ব ছাপা ছিল কোন্ ছলে!
এত যে মন্ত্র পড়িল ভ্রমর নবমালতীর কানে
বড়ো বড়ো যত পণ্ডিতজনা বুঝিল না তার মানে!'

শুনিয়া তপন অস্তে নামিল শরমে গগন ভরি,
শুনিয়া চন্দ্র থমকি রহিল বনের আড়াল ধরি!
শুনে সরোবরে তখনি পদ্ম নয়ন মুদিল ত্বরা,
দখিন-বাতাস বলে গেল তারে— সকলি পড়েছে ধরা!

শুনে 'ছিছি' ব'লে শাখা নাড়ি নাড়ি শিহরি উঠিল লতা,
ভাবিল মুখর এখনি না জানি আরো কী রটাবে কথা !
ভ্রমর কহিল যূথীর সভায়, যে ছিল বোবার মতো
পরের কুৎসা রটাবার বেলা তারো মুখ ফোটে কত !

শুনিয়া তখনি করতালি দিয়ে হেসে উঠে নরনারী—
যে যাহারে চায় ধরিয়া তাহায় দাঁড়াইল সারি সারি ।
'হয়েছে প্রমাণ' 'হয়েছে প্রমাণ' হাসিয়া সবাই কহে—
'যে কথা রটেছে একটি বর্ণ বানানো কাহারও নহে ।'
বাহুতে বাহুতে বাঁধিয়া কহিল নয়নে নয়নে চাহি,
'আকাশে পাতালে মরতে আজি তো গোপন কিছুই নাহি ।'
কহিল হাসিয়া মালা হাতে লয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি,
'ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ি গেল তুমি আমি কোথা আছি !'

হায় কবি হায়, সে হতে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী—
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি ।
যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু
কোনোদিন কোনো গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু ।
শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে ;
মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কী ভাব ভরা—
হায় কবি, হায়, হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা ।

১৩০৪

উন্নতিলক্ষণ

১

ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী
জগৎব্যাপারে অজ্ঞ,
শুধাই তোমায় এ পুরশালায়
আজি এ কিসের যজ্ঞ ?
সিংহদুয়ারে পথের দু ধারে
রথের না দেখি অন্ত—
কার সম্মানে ভিড়েছে এখানে
যত উষ্ণীষবন্ত ?
বসেছেন ধীর অতি গম্ভীর
দেশের প্রবীণ বিজ্ঞ,
প্রবেশিয়া ঘরে সংকোচে ডরে
মরি আমি অনভিজ্ঞ ।

কোন্‌ শূরবীর জন্মভূমির
    ঘুচালো হীনতাপঙ্ক ?
ভারতের শুচি যশশশীরুচি
    কে করিল অকলঙ্ক ?
রাজা মহারাজ মিলেছেন আজ
    কাহারে করিতে ধন্য ?
বসেছেন এঁরা পূজ্যজনেরা
    কাহার পূজার জন্য ?

উত্তর

গেল যে সাহেব ভরি দুই জেব
    করিয়া উদর পূর্তি,
এঁরা বড়োলোক করিবেন শোক
    স্থাপিয়া তাহারি মূর্তি ॥

অভাগা কে ওই মাগে নাম সই,
    দ্বারে দ্বারে ফিরে খিন্ন,
তবু উৎসাহে রচিবারে চাহে
    কাহার স্মরণচিহ্ন ?
সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এসে হায়
    নয়ন অশ্রুসিক্ত,
হৃদয় ক্ষুণ্ণ খাতাটি শূন্য,
    থলি একেবারে রিক্ত !
যাহার লাগিয়া ফিরিছে মাগিয়া
    মুছি ললাটের ঘর্ম,
স্বদেশের কাছে কী সে করিয়াছে ?
    কী অপরাধের কর্ম ?

উত্তর

আর কিছু নহে, পিতাপিতামহে
    বসায়ে গেছে সে উচ্চে,
জন্মভূমিরে সাজায়েছে ঘিরে
    অমরপুষ্পগুচ্ছে ॥

২

দেবী দশভূজা, হবে তাঁরি পূজা,
    মিলিবে স্বজনবর্গ—
হেথা এল কোথা দ্বিতীয় দেবতা,
    নূতন পূজার অর্ঘ্য ?

কার সেবা-তরে আসিতেছে ঘরে
আয়ুহীন মেষবৎস ?
নিবেদিতে কারে আনে ভারে ভারে
বিপুল ভেট্‌কি মৎস্য ?
কী আছে পাত্রে যাহার গাত্রে
বসেছে তৃষিত মক্ষী ?
শলায় বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ
মনুনিষিদ্ধ পক্ষী।
দেবতার সেরা কী দেবতা এঁরা
পূজাভবনের পূজ্য—
যাঁহাদের পিছে পড়ে গেছে নীচে,
দেবী হয়ে গেছে উহ্য ?

উত্তর

ম্যাকে, ম্যাকিনন, অ্যালেন, ডিলন
দোকান ছাড়িয়া সদ্য
সরবে গরবে পূজার পরবে
তুলেছেন পাদপদ্ম ॥

—

এসেছিল দ্বারে পূজা দেখিবারে
দেবীর বিনীত ভক্ত,
কেন যায় ফিরে অবনতশিরে
অবমানে আঁখি রক্ত ?
উৎসবশালা, জ্বলে দীপমালা,
রবি চলে গেছে অস্তে—
কুতূহলীদলে কী বিধান-বলে
বাধা পায় দ্বারীহস্তে ?
ইহারা কি তবে অনাচারী হবে,
সমাজ হইতে ভিন্ন ?
পূজাদানধ্যানে ছেলেখেলা-জ্ঞানে
এরা মনে মানে ঘৃণ্য ?

উত্তর

না না, এরা সবে ফিরিছে
দীন প্রতিবেশীবৃন্দে—
সাহেব-সমাজ আসিবেন আজ,
এরা এলে হবে নিন্দে ॥

৩

লোকটি কে ইনি যেন চিনি চিনি,
বাঙালি মুখের ছন্দ—
ধরনে ধারণে অতি অকারণে
ইংরাজিতরো গন্ধ !
কালিয়া-বরন, অঙ্গে পরন
কালো হ্যাট কালো কুর্তি,
যদি নিজদেশী কাছে আসে ঘেঁষি
কিছু যেন কড়ামূর্তি !
ধুতি-পরা দেহ দেখা দিলে কেহ
অতিশয় লাগে লজ্জা,
বাংলা আলাপে রোষে সন্তাপে
জ্বলে ওঠে হাড় মজ্জা !
ইঁহারা কি শেষ ছাড়িবেন দেশ ?
এঁরা কি ভারতদ্বেষ্টা ?
এঁদের কি তবে দলে দলে সবে
বিজাতি হবার চেষ্টা ?

উত্তর

এঁরা সবে বীর, এঁরা স্বদেশীর
প্রতিনিধি বলে গণ্য—
কোট-পরা কায় সঁপেছেন হায়
শুধু স্বজাতির জন্য ॥

—

অনুরাগভরে ঘুচাবার তরে
বঙ্গভূমির দুঃখ
এ সভা মহতী, এর সভাপতি
সভ্যেরা দেশমুখ্য।
এরা দেশহিতে চাহিছে সঁপিতে
আপন রক্তমাংস—
তবে এ সভাকে ছেড়ে কেন থাকে
এ দেশের অধিকাংশ ?
কেন দলে দলে দূরে যায় চলে,
বুঝে না নিজের ইষ্ট,
যদি কুতূহলে আসে সভাতলে,
কেন বা নিদ্রাবিষ্ট ?
তবে কি ইহারা নিজ-দেশ-ছাড়া
রুধিয়া রয়েছে কর্ণ
দৈবের বশে পাছে কানে পশে
শুভকথা এক বর্ণ ?

উত্তর

না, না এঁরা হন জনসাধারণ,
জানে দেশভাষামাত্র,
স্বদেশসভায় বসিবারে হায়
তাই অযোগ্য পাত্র ॥

৪

বেশভূষা ঠিক যেন আধুনিক,
মুখ দাড়ি-সমাকীর্ণ,
কিন্তু বচন অতি পুরাতন,
ঘোরতর জরাজীর্ণ।
উচ্চ আসনে বসি একমনে
শূন্যে মেলিয়া দৃষ্টি
তরুণ এ লোক লয়ে মনুশ্লোক
করিছে বচনবৃষ্টি।
জলের সমান করিছে প্রমাণ
কিছু নহে উৎকৃষ্ট
শালিবাহনের পূর্ব সনের
পূর্বে যা নহে সৃষ্ট।
শিশুকাল থেকে গেছেন কি পেকে
নিখিল পুরাণতন্ত্রে?
বয়স নবীন করিছেন ক্ষীণ
প্রাচীন বেদের মন্ত্রে?
আছেন কি তিনি লইয়া পাণিনি,
পুঁথি লয়ে কীটদষ্ট?
বায়ুপুরাণের খুঁজি পাঠ-ফের
আয়ু করিছেন নষ্ট?
প্রাচীনের প্রতি গভীর আরতি
বচনরচনে সিদ্ধ—
কহ তো ম'শায়, প্রাচীন ভাষায়
কতদূর কৃতবিদ্য?

উত্তর

ঋজুপাঠ দুটি নিয়েছেন লুটি,
দু সর্গ রঘুবংশ—
মোক্ষমুলার হ'তে অধিকার
শাস্ত্রের বাকি অংশ ॥

—

পণ্ডিত ধীর মুণ্ডিতশির,
প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা—
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্মদীক্ষা।

কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য—
মূলে আছে তার কেমেস্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।
টিকিটা যে রাখা ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্ শক্তি—
তিলকরেখায় বৈদ্যুত ধায়,
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।
সন্ধ্যাটি হলে প্রাণপণবলে
বাজালে শঙ্খঘণ্টা
মথিত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে
সচেতন হয় মনটা।
এম. এ. ঝাঁকে ঝাঁক শুনিছে অবাক্
অপরূপ বৃত্তান্ত—
বিদ্যাভূষণ এমন ভীষণ
বিজ্ঞানে দুর্দান্ত!
তবে ঠাকুরের পড়া আছে ঢের—
অন্তত গ্যানো-খণ্ড,
হেল্‌ম্‌হৎস অতি বীভৎস
করেছে লণ্ডভণ্ড!

উত্তর

কিছু না, কিছু না, নাই জানাশুনা
বিজ্ঞান কানাকৌড়ি—
লয়ে কল্পনা লম্বা রসনা
করিছে দৌড়াদৌড়ি॥

১৩০৬

অশেষ

আবার আহ্বান?
যত-কিছু ছিল কাজ সাঙ্গ তো করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান।
জাগায়ে মাধবীবন চলে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যুষ নবীন,
প্রখর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি
গেছে মধ্যদিন।
মাঠের পশ্চিমশেষে অপরাহ্ণ ম্লান হেসে
হল অবসান,
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে—
আবার আহ্বান?

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা,
দিনের কল্লোল-'পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।
ও পারের কালো কূলে কালী ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমিরতলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা।
নয়নপল্লব-'পরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে,
থেমে যায় গান।
ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতি -সম—
এখনো আহ্বান ?

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে— শেষ নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী ?
জগতে সবারি কাছে সংসারসীমার কাছে
কোনোখানে শেষ—
কেন আসে মর্ম্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান—
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান ?

দক্ষিণসমুদ্রপারে তোমার প্রাসাদদ্বারে
হে জাগ্রত রানী,
বাজে না কি সন্ধ্যাকালে শান্ত সুরে ক্লান্ত তালে
বৈরাগ্যের বাণী ?
সেথায় কি মূক বনে ঘুমায় না পাখিগণে
আঁধার শাখায় ?
তারাগুলি হর্ম্যশিরে উঠে না কি ধীরে ধীরে
নিঃশব্দ পাখায় ?
লতাবিতানের তলে বিছায় না পুষ্পদলে
নিভৃত শয়ান ?
হে অশ্রান্ত শান্তিহীন, শেষ হয়ে গেল দিন,
এখনো আহ্বান ?

রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে,
আমার নিরালা—

মোর সন্ধ্যাদীপালোক, পথ-চাওয়া দুটি চোখ,
যত্নে গাঁথা মালা।
খেয়াতরী যাক বয়ে গৃহ-ফেরা লোক লয়ে
ও পারের গ্রামে,
তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী ধীরে পড়ে যাক খসি
কুটিরের বামে।
রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর,
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ—
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নতশিরে
তোমার আহ্বান।

বলো তবে কী বাজাব, ফুল দিয়ে কী সাজাব
তব দ্বারে আজ?
রক্ত দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী শিখিব,
কী করিব কাজ?
যদি আঁখি পড়ে ঢুলে, শ্লথ হস্ত যদি ভুলে
পূর্ব নিপুণতা,
বক্ষে নাহি পাই বল, চক্ষে যদি আসে জল,
বেধে যায় কথা,
চেয়ো নাকো ঘৃণাভরে, কোরো নাকো অনাদরে
মোর অপমান—
মনে রেখো হে নিদয়ে, মেনেছিনু অসময়ে
তোমার আহ্বান।

সেবক আমার মতো রয়েছে সহস্র শত
তোমার দুয়ারে,
তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায় সকলে জুটি
পথের দু ধারে।
শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাই নে দেবী,
ডাক' ক্ষণে ক্ষণে—
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে।
সেই গর্বে জাগি রব সারা রাত্রি দ্বারে তব
অনিদ্র-নয়ান,
সেই গর্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্যসম
তোমার আহ্বান।

হবে, হবে, হবে জয়— হে দেবী, করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমাময়ী।

কাঁপিবে না ক্লান্ত কর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা—
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি,
দীপ নিবিবে না।
কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে
করি যাব দান—
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।

২৫ বৈশাখ ১৩০৬

বিদায়

ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো,
হউক সুন্দরতর
বিদায়ের ক্ষণ।
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়,
নহে বিচ্ছেদের ভয়—
শুধু সমাপন।
শুধু সুখ হতে স্মৃতি,
শুধু ব্যথা হতে গীতি,
তরী হতে তীর,
খেলা হতে খেলাশ্রান্তি,
বাসনা হইতে শান্তি,
নভ হতে নীড়।

দিনান্তের নম্র কর
পড়ুক মাথার 'পর,
আঁখি-'পরে ঘুম,
হৃদয়ের পত্রপুটে
গোপনে উঠুক ফুটে
নিশার কুসুম।
আরতির শঙ্খরবে
নামিয়া আসুক তবে
পূর্ণপরিণাম—
হাসি নয়, অশ্রু নয়,
উদার বৈরাগ্যময়
বিশাল বিশ্রাম।

প্রভাতে যে পাখি সবে
গেয়েছিল কলরবে
থামুক এখন।

প্রভাতে যে ফুলগুলি
জেগেছিল মুখ তুলি
মদুক নয়ন।
প্রভাতে যে বায়ুদল
ফিরেছিল সচঞ্চল
যাক থেমে যাক।
নীরবে উদয় হোক
অসীম নক্ষত্রলোক
পরম নির্বাক।

হে মহাসুন্দর শেষ,
হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ,
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির.
মুছায়ে নয়ননীর
করো আশীর্বাদ।
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির,
পদতলে নমি শির
তব যাত্রাপথে,
নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি
নিঃশব্দে আরতি করি
নিস্তব্ধ জগতে।

১০ চৈত্র ১৩০৫

বর্ষশেষ

১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জনছায়া সঞ্চারিয়া
হানি দীর্ঘধারা।
বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান—
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান।

ধূসরপাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় উর্ধ্বমুখে,
ছুটে চলে চাষি।
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি।
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি—

বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখি।

বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝংকারঝঞ্ঝনা,
তোলো উচ্চসুর।
হৃদয় নির্দয়ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।
ধাও গান, প্রাণভরা ঝড়ের মতন ঊর্ধ্ববেগে
অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিশ্বাসে।

আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

মুক্ত করি দিনু দ্বার— আকাশের যত বৃষ্টিঝড়
আয় মোর বুকে,
শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে।
বিজয়গর্জনস্বনে অভ্রভেদ করিয়া উঠুক
মঙ্গলনির্ঘোষ,
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল
কঠিন সন্তোষ।

সে পূর্ণ উদাত্ত ধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্রসম
সরল গম্ভীর
সমস্ত অন্তর হতে মুহূর্তে অখণ্ডমূর্তি ধরি
হউক বাহির।
নাহি তাহে দুঃখসুখ পুরাতন তাপ-পরিতাপ,
কম্প লজ্জা ভয়—
শুধু তাহা সদ্যঃস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময়।

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে—

ব্যাপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোরস্তূপে ।
কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেকে দিক্‌ দিগন্তর
করি অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহো ক্ষণকাল ।

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,
তোমার সংগীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ুগর্জে আসে,
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে
বিদ্ধ করি হানে—
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে ।

এবার আস নি তুমি বসন্তের আবেশহিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি,
এবার আস নি তুমি মর্মরিত কূজনে গুঞ্জনে—
ধন্য ধন্য তুমি !
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজ-সম
গর্বিত নির্ভয়—
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম,
জয় তব জয় !

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল,
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ
প্রণমি তোমারে ।

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান ।
সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান ।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জ্বলদর্চিরেখা—
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্ধ্বমুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা ।

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরান।

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক—
গনিব না দিন ক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কারলাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভ-ক্ষতি-টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়—
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।
শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

তার পরে ফেলে দাও, চূর্ণ করো, যাহা ইচ্ছা তব—
ভগ্ন করো পাখা।
যেখানে নিক্ষেপ কর হৃত পত্র, চ্যুত পুষ্পদল,
ছিন্নভিন্ন শাখা,

ক্ষণিক খেলনা তব, দয়াহীন তব দস্যুতার
লুণ্ঠনাবশেষ,
সেথা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ততমিস্র সেই
বিস্মৃতির দেশ।

নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন,
মেঘের অন্তর-পথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে
চলে গেল দিন।
শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লিরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে,
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া
নিশীথগগনে।

৩০ চৈত্র ১৩০৫

ঝড়ের দিনে

আজি এই আকুল আশ্বিনে
মেঘে-ঢাকা দুরন্ত দুর্দিনে
হেমন্ত-ধানের খেতে বাতাস উঠেছে মেতে,
কেমনে চলিবে পথ চিনে?
আজি এই দুরন্ত দুর্দিনে!

দেখিছ না ওগো সাহসিকা,
ঝিকিমিকি বিদ্যুতের শিখা!
মনে ভেবে দেখো তবে এ ঝড়ে কি বাঁধা রবে
কবরীর শেফালিমালিকা!
ভেবে দেখো ওগো সাহসিকা!

আজিকার এমন ঝঞ্ঝায়
নূপুর বাঁধে কি কেহ পায়?
যদি আজি বৃষ্টিজল ধুয়ে দেয় নীলাঞ্চল
গ্রামপথে যাবে কি লজ্জায়
আজিকার এমন ঝঞ্ঝায়?

হে উতলা, শোনো কথা শোনো,
দুয়ার কি খোলা আছে কোনো?
এ বাঁকা পথের শেষে মাঠ যেথা মেঘে মেশে
বসে কেহ আছে কি এখনো
এ দুর্যোগে, শোনো ওগো শোনো!

আজ যদি দীপ জ্বালে দ্বারে
নিবে কি যাবে না বারে বারে?

আজ যদি বাজে বাঁশি গান কি যাবে না ভাসি
আশ্বিনের অসীম আঁধারে
ঝড়ের ঝাপটে বারে বারে ?

মেঘ যদি ডাকে গুরু গুরু,
নৃত্যমাঝে কেঁপে ওঠে উরু,
কাহারে করিবে রোষ, কার 'পরে দিবে দোষ
বক্ষ যদি করে দুরু দুরু—
মেঘ ডেকে ওঠে গুরু গুরু।

যাবে যদি, মনে ছিল না কি,
আমারে নিলে না কেন ডাকি ?
আমি তো পথেরি ধারে বসিয়া ঘরের দ্বারে
আনমনে ছিলাম একাকী—
আমারে নিলে না কেন ডাকি ?

কখন প্রহর গেছে বাজি,
কোনো কাজ নাহি ছিল আজি।
ঘরে আসে নাই কেহ, সারা দিন শূন্য গেহ,
বিলাপ করেছে তরুরাজি।
কোনো কাজ নাহি ছিল আজি।

যত বেগে গরজিত ঝড়,
যত মেঘে ছাইত অম্বর,
রাত্রে অন্ধকারে যত পথ অফুরান হত
আমি নাহি করিতাম ডর—
যত বেগে গরজিত ঝড়।

বিদ্যুতের চমকানি-কালে
এ বক্ষ নাচিত তালে তালে,
উত্তরী উড়িত মম উন্মুখ পাখার সম—
মিশে যেত আকাশে পাতালে
বিদ্যুতের চমকানি-কালে।

তোমায় আমায় একত্তর
সে যাত্রা হইত ভয়ংকর।
তোমার নূপুর আজি প্রলয়ে উঠিত বাজি,
বিজুলি হানিত আঁখি-'পর—
যাত্রা হত মত্ত ভয়ংকর।

কেন আজি যাও একাকিনী ?
কেন পায়ে বেঁধেছ কিঙ্কিণী ?

এ দুর্দিনে কী কারণে পড়িল তোমার মনে
বসন্তের বিস্মৃত কাহিনী ?
কোথা আজি যাও একাকিনী ?

১৩০৬

অসময়

হয়েছে কি তবে সিংহদুয়ার বন্ধ রে ?
এখনো সময় আছে কি, সময় আছে কি ?
দূরে কলরব ধ্বনিছে মন্দ মন্দ রে—
ফুরালো কি পথ, এসেছি পুরীর কাছে কি ?
মনে হয় সেই সুদূর মধুর গন্ধ রে
রহি রহি যেন ভাসিয়া আসিছে বাতাসে ।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে ।

ওই কি প্রদীপ দেখা যায় পুরমন্দিরে ?
ও যে দুটি তারা দূর পশ্চিমগগনে ।
ও কি শিঞ্জিত ধ্বনিছে কনকমঞ্জীরে ?
ঝিল্লির রব বাজে বনপথে সঘনে ।
মরীচিকালেখা দিগন্তপথ রঞ্জি রে
সারা দিন আজি ছলনা করেছে হতাশে ।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে ।

এত দিনে সেথা বনবনান্ত নন্দিয়া
নব বসন্তে এসেছে নবীন ভূপতি ।
তরুণ আশার সোনার প্রতিমা বন্দিয়া
নব আনন্দে ফিরিছে যুবক যুবতী ।
বীণার তন্ত্রী আকুল ছন্দে ক্রন্দিয়া
ডাকিছে সবারে আছে যারা দূর প্রবাসে ।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে ।

আজিকে সবাই সাজিয়াছে ফুলচন্দনে,
মুক্ত আকাশে যাপিবে জ্যোৎস্নাযামিনী ।
দলে দলে চলে বাঁধাবাঁধি বাহুবন্ধনে,
ধ্বনিছে শূন্যে জয়সংগীতরাগিণী ।
নূতন পতাকা নূতন প্রাসাদপ্রাঙ্গণে
দক্ষিণবায়ে উড়িছে বিজয়বিলাসে ।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে ।

সারা নিশি ধরে বৃথা করিলাম মন্ত্রণা,
　　শরৎ-প্রভাত কাটিল শূন্যে চাহিয়া।
বিদায়ের কালে দিতে গেনু কারে সান্ত্বনা,
　　যাত্রীরা হোথা গেল খেয়াতরী বাহিয়া।
আপনারে শুধু বৃথা করিলাম বঞ্চনা,
　　জীবন-আহুতি দিলাম কী আশাহুতাশে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
　　এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

প্রভাতে আমায় ডেকেছিল সবে ইঙ্গিতে,
　　বহুজনমাঝে লয়েছিল মোরে বাছিয়া—
যবে রাজপথ ধ্বনিয়া উঠিল সংগীতে
　　তখনো বারেক উঠেছিল প্রাণ নাচিয়া।
এখন কি আর পারিব প্রাচীর লঙ্ঘিতে,
　　দাঁড়ায়ে বাহিরে ডাকিব কাহারে বৃথা সে!
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
　　এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
　　অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে,
দীর্ঘ ভ্রমণ একদিন হবে অন্ত রে,
　　শান্তিসমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে।
দুয়ার-প্রান্তে দাঁড়ায়ে বাহির-প্রান্তরে
　　ভেরী বাজাইব মোর প্রাণপণ প্রয়াসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
　　এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিছে আকাশে।

১৩০৬

বসন্ত

অযুত বৎসর আগে হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে
　　　　মত্ত কুতূহলী,
প্রথম যেদিন খুলি নন্দনের দক্ষিণ-দুয়ার
　　　　মর্তে এলে চলি,
অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটিরপ্রাঙ্গণে
　　　　পীতাম্বর পরি,
উতলা উত্তরী হতে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে
　　　　মন্দারমঞ্জরী,
দলে দলে নরনারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি
　　　　লয়ে বীণা বেণু—
মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি
　　　　ছুঁড়ি পুষ্পরেণু।

সখা, সেই অতিদূর সদ্যোজাত আদি মধুমাসে
তরুণ ধরায়
এনেছিলে যে কুসম ডুবাইয়া তপ্ত কিরণের
স্বর্ণমদিরায়,
সেই পুরাতন সেই চিরন্তন অনন্ত প্রবীণ
নব পুষ্পরাজি
বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ— তাই লয়ে আজো পুনর্বার
সাজাইলে সাজি ।
তাই সে পুষ্পে লিখা জগতের প্রাচীন দিনের
বিস্মৃত বারতা,
তাই তার গন্ধে ভাসে ক্লান্ত লুপ্ত লোকলোকান্তের
কান্ত মধুরতা ।

তাই আজি প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জবন হতে
উঠিছে উচ্ছ্বাসি
লক্ষ দিনযামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা,
অশ্রু গান হাসি ।
যে মালা গেঁথেছি আজি তোমারে সঁপিতে উপহার
তারি দলে দলে
নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষাকাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে ।
সযত্নসেচনসিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন-ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে ।

আমার বসন্তরাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল
যে-কয়টি কথা,
তোমার কুসুমগুলি হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ
নিয়ে গেল কোথা ?
সে চম্পক, সে বকুল, সে চঞ্চল চকিত চামেলি
স্মিত শুভ্রমুখী,
তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক-উন্নমিতা,
একান্ত কৌতুকী,
কয়েক বসন্তে তারা আমার যৌবনকাব্যগাথা
লয়েছিল পড়ি ।
কণ্ঠে কণ্ঠে থাকি তারা শুনেছিল দুটি বক্ষোমাঝে
বাসনা-বাঁশরি ।

ব্যর্থ জীবনের সেই কয়খানি পরম অধ্যায়
ওগো মধুমাস,

তোমার কুসুমগন্ধে বর্ষে বর্ষে শূন্যে জলে স্থলে
হইবে প্রকাশ।
বকুলে চম্পকে তারা গাঁথা হয়ে নিত্য যাবে চলি
যুগে যুগান্তরে,
বসন্তে বসন্তে তারা কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিবে আকুলি
কুহুকলস্বরে।
অমর বেদনা মোর হে বসন্ত, রহি গেল তব
মর্মরনিশ্বাসে—
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্রসন্ধ্যাকাশে।

ভগ্ন মন্দির

ভাঙা দেউলের দেবতা,
তব বন্দনা রচিতে, ছিন্না
বীণার তন্ত্রী বিরতা।
সন্ধ্যাগগনে ঘোষে না শঙ্খ
তোমার আরতি-বারতা।
তব মন্দির স্থির গম্ভীর,
ভাঙা দেউলের দেবতা!

তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ
নববসন্তপবনে।
যে ফুলে রচে নি পূজার অর্ঘ্য,
রাখে নি ও রাঙা চরণে,
সে ফুল ফোটার আসে সমাচার
জনহীন ভাঙা ভবনে।

পূজাহীন তব পূজারি
কোথা সারা দিন ফিরে উদাসীন
কার প্রসাদের ভিখারি!
গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায়
চির-উপবাস-ভুখারি
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে
পূজাহীন তব পূজারি।

ভাঙা দেউলের দেবতা,
কত উৎসব হইল নীরব,
কত পূজানিশা বিগতা।

কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা
কত যায় কত কব তা—
শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন
ভাঙা দেউলের দেবতা।

বৈশাখ

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!
ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে!
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্তি তব অনুচর!

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।
রহি রহি দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণরেণুরাশ
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
পদ্মাসনে বস আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে
উদাসী প্রবাসী—
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী!

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা, লেহি লেহি বিরাট অম্বর,
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার।
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।

হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ।
হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।

সকরুণ তব মন্ত্রসাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-'পরে,
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্তস্বরে,
অশ্বত্থছায়াতে—
সকরুণ তব মন্ত্রসাথে।

দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকারক্ষুব্ধ ধুলা-সম উড়ুক গগনে,
ভ'রে দিক নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধসনে
আকুল আকাশ—
দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ।

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্তলে, বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল।
দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল।

ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ!
ভাঙিয়া মধ্যাহ্নতন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে রব প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্বাক্।
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

[শান্তিনিকেতন]
১৩০৬

রাত্রি

মোরে করো সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা!
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।
তোমার তিমিরতলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্‌যোগ
ভ্রমিতেছে জগতে জগতে
আমারে তুলিয়া লও সেই তার ধ্বজচক্রহীন
নীরবঘর্ঘর মহারথে।

তুমি একেশ্বরী রানী বিশ্বের অন্তর-অন্তঃপুরে
সুগম্ভীরা হে শ্যামাসুন্দরী,
দিবসের ক্ষয়ক্ষীণ বিরাট ভাণ্ডারে প্রবেশিয়া
নীরবে রাখিছ ভাণ্ড ভরি।

নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত নীলকান্ত সুপ্তিসিংহাসনে
তোমার মহান্ জাগরণ।
আমারে জাগায়ে রাখো সে নিস্তব্ধ জাগরণতলে
নির্নিমেষ পূর্ণ সচেতন।

কত নিদ্রাহীন চক্ষু যুগে যুগে তোমার আঁধারে
খুঁজেছিল প্রশ্নের উত্তর।
তোমার নির্বাক্ মুখে একদৃষ্টে চেয়েছিল বসি
কত ভক্ত জুড়ি দুই কর।
দিবস মুদিলে চক্ষু, ধীরপদে কৌতূহলীদল
অঙ্গনে পশিয়া সাবধানে
তব দীপহীন কক্ষে সুখদুঃখ জন্মমরণের
ফিরিয়াছে গোপন সন্ধানে।

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।
পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণাকাতর,
চকিতে বিদ্যুৎরেখাবৎ
তোমার নিখিললুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ!

জগতের সেই-সব যামিনীর জাগ্রূকদল
সঙ্গীহীন তব সভাসদ্
কে কোথা বসিয়া আছে আজি রাত্রে ধরণীর মাঝে,
গনিতেছে গোপন সম্পদ—
কেহ কারে নাহি জানে, আপনার স্বতন্ত্র আসনে
আসীন স্বাধীন স্তব্ধচ্ছবি—
হে শর্বরী, সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সভায়
মোরে করি দাও সভাকবি।

১৩০৬

অনবচ্ছিন্ন আমি

আজি মগ্ন হয়েছিনু ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে;
যখন মেলিনু আঁখি, হেরিনু আমারে।
ধরণীর বস্ত্রাঞ্চল দেখিলাম তুলি,
আমার নাড়ীর কম্পে কম্পমান ধূলি।
অনন্ত-আকাশ-তলে দেখিলাম নামি,
আলোক-দোলায় বসি দুলিতেছি আমি।

আজি গিয়েছিনু চলি মৃত্যুপরপারে,
সেথা বৃদ্ধ পুরাতন হেরিনু আমারে।
অবিচ্ছিন্ন আপনারে নিরখি ভুবনে
শিহরি উঠিনু কাঁপি আপনার মনে।
জলে স্থলে শূন্যে আমি যত দূরে চাই
আপনারে হারাবার নাই কোনো ঠাঁই।
জলস্থল দূর করি ব্রহ্ম অন্তর্যামী,
হেরিলাম তাঁর মাঝে স্পন্দমান আমি।

১৩০৬

জন্মদিনের গান

বেহাগ। চৌতাল

ভয় হতে তব অভয়মাঝারে
নূতন জনম দাও হে!
দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে,
সংশয় হতে সত্যসদনে,
জড়তা হইতে নবীন জীবনে
নূতন জনম দাও হে!

আমার ইচ্ছা হইতে হে প্রভু,
তোমার ইচ্ছা-মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে হে প্রভু,
তব মঙ্গল কাজে—
অনেক হইতে একের ডোরে,
সুখদুখ হতে শান্তিক্রোড়ে,
আমা হতে নাথ, তোমাতে মোরে
নূতন জনম দাও হে!

পূর্ণকাম

কীর্তনের সুর

সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি
আপনি সে মন নিয়েছ।
সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু, তুমি
দুখ বলে সুখ দিয়েছ।
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল
শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে,
বাঁধিলে ভক্তিবাঁধনে!

সুখ সুখ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে
কত দিকে কত খোঁজালে !
তুমি যে আমার কত আপনার
এবার সে কথা বোঝালে ।
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে !
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমারি দুয়ারে ।

পরিণাম

ভৈরবী । ঝাঁপতাল

জানি হে, যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর-কিনারে ।
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আমি তব অমৃত-দুয়ারে ।
জানি হে, তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে—
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে,
জীবন হতে নিয়েছ নবজীবনে ।
জানি হে নাথ, পুণ্যপাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ান-সমুখে—
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিন-রজনী
সকল পথে-বিপথে সুখে-অসুখে ।
জানি হে জানি, জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশভয়পাথারে—
এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মতো তুলিয়া লবে তাহারে ।

১৩০৬

ক্ষণিকা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত
সুহৃত্তমের প্রতি

ক্ষণিকারে দেখেছিলে
ক্ষণিক বেশে কাঁচা খাতায়,
সাজিয়ে তারে এনে দিলেম
ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায়।
আশা করি নিদেন-পক্ষে
ছ'টা মাস কি এক বছরই
হবে তোমার বিজন-বাসে
সিগারেটের সহচরী।
কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে
স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে—
কতকটা কী অগ্নিকণায়
ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে ?
কতকটা বা ছাইয়ের সঙ্গে
আপনি খসে পড়বে ধুলোয়,
তার পরে সে ঝেঁটিয়ে নিয়ে
বিদায় কোরো ভাঙা কুলোয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লোকেন্দ্রনাথ পালিত ও রবীন্দ্রনাথ
১২৯৭

ক্ষণিকা

উদ্‌বোধন

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে—
তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি বসে বসে গাঁথিস নে আর,
বাঁধিস নে স্মৃতিবাহিনী।
যা আসে আসুক, যা হবার হোক,
যাহা চলে যায় মুছে যাক শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক দ্যুলোক ভূলোক
প্রতি পলকের রাগিণী।
নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক শেষ
বহি নিমেষের কাহিনী।

ফুরায় যা, দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে যাস নেকো কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা চাই না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে,
পুরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে
তারি গহ্বর পুরাতে।
যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ,
ফুরাইলে দিস ফুরাতে।

ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি!
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দে রে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি।

যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মতো যাক যাক চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি।
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,
ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি!

শুধু অকারণে পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধরণীর 'পরে শিথিলবাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন
শিরীষ ফুলের অলকে।
মর্মরতানে ভরে ওঠ্ গানে
শুধু অকারণ পুলকে।

যথাসময়

ভাগ্য যবে কৃপণ হয়ে আসে,
বিশ্ব যবে নিঃস্ব তিলে তিলে,
মিষ্ট মুখে ভুবন-ভরা হাসি
ওষ্ঠে শেষে ওজন-দরে মিলে,
বন্ধুজনে বন্ধ করে প্রাণ,
দীর্ঘদিন সঙ্গীহীন একা,
হঠাৎ পড়ে ঋণশোধেরই পালা,
ঋণীজনের না যায় পাওয়া দেখা,
তখন ঘরে বন্ধ হ রে কবি,
খিলের পরে খিল লাগাও খিল।
কথার সাথে গাঁথো কথার মালা,
মিলের সাথে মিল মিলাও মিল।

কপাল যদি আবার ফিরে যায়,
প্রভাত-কালে হঠাৎ জাগরণে,
শূন্য নদী আবার যদি ভরে
শরৎ-মেঘে ত্বরিত বরিষনে,
বন্ধু ফিরে বন্দী করে বুকে,
সন্ধি করে অন্ধ অরিদল,
অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি,
কাজল-চোখে করুণ আঁখিজল,

তখন খাতা পোড়াও খ্যাপা কবি,
দিলের সাথে দিল লাগাও দিল।
বাহুর সাথে বাঁধো মৃণাল-বাহু,
চোখের সাথে চোখে মিলাও মিল।

মাতাল

ওরে মাতাল, দুয়ার ভেঙে দিয়ে
পথেই যদি করিস মাতামাতি,
থলিঝুলি উজাড় করে ফেলে
যা আছে তোর ফুরাস রাতারাতি,
অশ্লেষাতে যাত্রা করে শুরু
পাঁজিপুঁথি করিস পরিহাস,
অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যাস,
হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে
পালের 'পরে লাগাস ঝোড়ো হাওয়া,
আমিও ভাই, তোদের ব্রত লব—
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

পাড়ার যত জ্ঞানীগুণীর সাথে
নষ্ট হল দিনের পরে দিন—
অনেক শিখে পক্ক হল মাথা
অনেক দেখে দৃষ্টি হল ক্ষীণ,
কত কালের কত মন্দ ভালো
বসে বসে কেবল জমা করি,
ফেলাছড়া-ভাঙাছেঁড়ার বোঝা
বুকের মাঝে উঠছে ভরি ভরি,
গুঁড়িয়ে সে-সব উড়িয়ে ফেলে দিক
দিক্-বিদিকে তোদের ঝোড়ো হাওয়া।
বুঝেছি ভাই, সুখের মধ্যে সুখ
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

হোক রে সিধা কুটিল দ্বিধা যত,
নেশায় মোরে করুক দিশাহারা,
দানোয় এসে হঠাৎ কেশে ধরে
এক দমকে করুক লক্ষ্মীছাড়া।
সংসারেতে সংসারী তো ঢের
কাজের হাটে অনেক আছে কেজো,
মেলাই আছে মস্ত বড়ো লোক—
সঙ্গে তাঁদের অনেক সেজো মেজো।

থাকুন তাঁরা ভবের কাজে লেগে,
লাগুক মোরে সৃষ্টিছাড়া হাওয়া—
বুঝেছি ভাই, কাজের মধ্যে কাজ
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

শপথ করে দিলাম ছেড়ে আজই
যা আছে মোর বুদ্ধি বিবেচনা,
বিদ্যা যত ফেলব ঝেড়ে ঝুড়ে
ছেড়ে ছুড়ে তত্ত্ব-আলোচনা।
স্মৃতির ঝারি উপুড় করে ফেলে
নয়নবারি শূন্য করি দিব,
উচ্ছ্বসিত মদের ফেনা দিয়ে
অট্টহাসি শোধন করি নিব।
ভদ্রলোকের তকমা-তাবিজ ছিঁড়ে
উড়িয়ে দেবে মদোন্মত্ত হাওয়া,
শপথ করে বিপথ-ব্রত নেব—
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

যুগল

ঠাকুর, তব পায়ে নমোনমঃ,
পাপিষ্ঠ এই অক্ষমেরে ক্ষম,
আজ বসন্তে বিনয় রাখো মম—
বন্ধ করো শ্রীমদ্‌ভাগবত।
শাস্ত্র যদি নেহাত পড়তে হবে
গীত-গোবিন্দ খোলা হোক-না তবে।
শপথ মম, বোলো না এই ভবে
জীবনখানা শুধুই স্বপ্নবৎ।
একটা দিনের সন্ধি করিয়াছি,
বন্ধ আছে যমরাজের সমর—
আজকে শুধু এক বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর দোঁহে অমর।

স্বয়ং যদি আসেন আজি দ্বারে
মান্‌ব নাকো রাজার দারোগারে—
কেল্লা হতে ফৌজ সারে সারে
দাঁড়ায় যদি, ওঁচায় ছোরা-ছুরি,
বলব, 'রে ভাই, বেজার কোরো নাকো,

গোল হতেছে, একটু থেমে থাকো,
কৃপাণ-খোলা শিশুর খেলা রাখো
খ্যাপার মতো কামান-ছোঁড়াছুঁড়ি।
একটুখানি সরে গিয়ে করো
সঙের মতো সঙিন ঝম-ঝমর।
আজকে শুধু এক বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর দোঁহে অমর।'

বন্ধুজনে যদি পুণ্যফলে
করেন দয়া, আসেন দলে দলে,
গলায় বস্ত্র কব নয়নজলে,
'ভাগ্য নামে অতিবর্ষা-সম!
এক দিনেতে অধিক মেশামেশি
শ্রান্তি বড়োই আনে শেষাশেষি,
জান তো ভাই, দুটি প্রাণীর বেশি
এ কুলায়ে কুলায় নাকো মম।
ফাগুন-মাসে ঘরের টানাটানি—
অনেক চাঁপা, অনেকগুলি ভ্রমর।
ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী—
আমরা দুটি অমর, দুটি অমর।'

শাস্ত্র

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।
বনে এত বকুল ফোটে,
গেয়ে মরে কোকিল পাখি,
লতাপাতার অন্তরালে
বড়ো সরস ঢাকাঢাকি।
চাঁপার শাখে চাঁদের আলো,
সে সৃষ্টি কি কেবল মিছে?
এ-সব যারা বোঝে তারা
পঞ্চাশতের অনেক নীচে।
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

ঘরের মধ্যে বকাবকি,
নানান মুখে নানা কথা।
হাজার লোকে নজর পাড়ে,
একটুকু নাই বিরলতা।
সময় অল্প, ফুরায় তাও
অরসিকের আনাগোনায়—
ঘণ্টা ধরে থাকেন তিনি
সৎপ্রসঙ্গ-আলোচনায়।
হতভাগ্য নবীন যুবা
কাছেই থাকে বনের খোঁজে,
ঘরের মধ্যে মুক্তি যে নেই
এ কথা সে বিশেষ বোঝে।
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

আমরা সবাই নব্যকালের
সভ্য যুবা অনাচারী,
মনুর শাস্ত্র শুধরে দিয়ে
নতুন বিধি করব জারি—
বুড়ো থাকুন ঘরের কোণে,
পয়সাকড়ি করুন জমা,
দেখুন বসে বিষয়-পত্র,
চালান মামলা-মকদ্দমা,
ফাগুন-মাসে লগ্ন দেখে
যুবারা যাক বনের পথে,
রাত্রি জেগে সাধ্যসাধন
থাকুক রত কঠিন ব্রতে।
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

অনবসর

ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা,
হে পুরাতন সহচরী !
ইচ্ছা বটে বছর কতক
তোমার জন্য বিলাপ করি,
সোনার স্মৃতি গড়িয়ে তোমার
বসিয়ে রাখি চিত্ততলে,
একলা ঘরে সাজাই তোমায়
মাল্য গেঁথে অশ্রুজলে—

নিদেন কাঁদি মাসেক-খানেক
তোমায় চির-আপন জেনেই—
হায় রে আমার হতভাগ্য !
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

বর্ষে বর্ষে বয়স কাটে,
বসন্ত যায় কথায় কথায়,
বকুলগুলো দেখতে দেখতে
ঝ'রে পড়ে যথায় তথায়,
মাসের মধ্যে বারেক এসে
অস্তে পালায় পূর্ণ-ইন্দু,
শাস্ত্রে শাসায় জীবন শুধু
পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু—

তাঁদের পানে তাকাব না
তোমায় শুধু আপন জেনেই
সেটা বড়োই বর্বরতা—
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

এসো আমার শ্রাবণ-নিশি,
এসো আমার শরৎলক্ষ্মী,
এসো আমার বসন্তদিন
লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী,
তুমি এসো, তুমিও এসো,
তুমি এসো, এবং তুমি,
প্রিয়ে, তোমরা সবাই জান
ধরণীর নাম মর্তভূমি—

যে যায় চলে বিরাগভরে
তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ করে কাটাই, এমন
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

ইচ্ছে করে বসে বসে
পদ্যে লিখি গৃহকোনায়
'তুমিই আছ জগৎ জুড়ে'—
সেটা কিন্তু মিথ্যে শোনায়।
ইচ্ছে করে কোনোমতেই
সান্ত্বনা আর মান্‌ব না রে,
এমন সময় নতুন আঁখি
তাকায় আমার গৃহদ্বারে—

চক্ষু মুছে দুয়ার খুলি
তারেই শুধু আপন জেনেই,
কখন তবে বিলাপ করি ?
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

অতিবাদ

আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইকো পুষ্পে পাতায়,
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে।
ভুলিয়ে দিয়ে সত্যি মিথ্যে,
ঘুলিয়ে দিয়ে নিত্যানিত্যে,
দু ধারে সব উদারচিত্তে
বিধিবিধান ছাড়িয়ে চলে।
আমারো দ্বার মুক্ত পেয়ে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ
একটা রাতের রাজ্যাধিরাজ,
ভাণ্ডারে আজ করছে বিরাজ
সকল প্রকার অজস্রত্ব।
কেন রাখব কথার ওজন ?
কৃপণতায় কোন্‌ প্রয়োজন ?
ছুটুক বাণী যোজন যোজন
উড়িয়ে দিয়ে যত্ব ণত্ব।
চিত্তদুয়ার মুক্ত ক'রে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

হে প্রেয়সী স্বর্গদূতী,
আমার যত কাব্যপুঁথি
তোমার পায়ে পড়ে স্তুতি,
    তোমারি নাম বেড়ায় রটি ;
থাকো হৃদয়-পদ্মটিতে
এক দেবতা আমার চিতে—
চাই নে তোমায় খবর দিতে
    আরো আছেন তিরিশ কোটি।
        চিত্তদুয়ার মুক্ত ক'রে
            সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
        আজকে আমি কোনোমতেই
            বলব নাকো সত্য কথা।

ত্রিভুবনে সবার বাড়া
একলা তুমি সুধার ধারা,
উষার ভালে একটি তারা,
    এ জীবনে একটি আলো—
সন্ধ্যাতারা ছিলেন কে কে
সে-সব কথা যাব ঢেকে,
সময় বুঝে মানুষ দেখে
    তুচ্ছ কথা ভোলাই ভালো।
        চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
            সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
        আজকে আমি কোনোমতেই
            বলব নাকো সত্য কথা।

সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে,
জ্যামিতি আর বীজগণিতে
    কারো ইথে আপত্তি নেই—
কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে
এবং আমার কবির গানে
পঞ্চশরের পুষ্পবাণে
    মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই।
        চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
            সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
        আজকে আমি কোনোমতেই
            বলব নাকো সত্য কথা।

ওগো সত্য বেঁটেখাটো,
বীণার তন্ত্রী যতই ছাঁটো,

কণ্ঠ আমার যতই আঁটো,
বলব তবু উচ্চ সুরে—
আমার প্রিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টি
করছে ভুবন নূতন সৃষ্টি,
মুচকি হাসির সুধার বৃষ্টি
চলছে আজি জগৎ জুড়ে।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

যদি বল 'আর বছরে
এই কথাটাই এমনি করে
বলেছিলি, কিন্তু ওরে
শুনেছিলেন আরেক জনে'—
জেনো তবে মূঢ়মত্ত,
আর বসন্তে সেটাই সত্য,
এবারও সেই প্রাচীন তত্ত্ব
ফুটল নূতন চোখের কোণে।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

আজ বসন্তে বকুল ফুলে
যে গান বায়ু বেড়ায় বুলে
কাল সকালে যাবে ভুলে—
কোথায় বাতাস, কোথায় সে ফুল!
হে সুন্দরী, তেমনি কবে
এ-সব কথা ভুলব যবে
মনে রেখো আমায় তবে—
ক্ষমা কোরো আমার সে ভুল।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনোমতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

যথাস্থান

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোন্‌খানে তোর স্থান ?
পণ্ডিতেরা থাকেন যেথায়
বিদ্যেরত্ন-পাড়ায়—
নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে
কাহার সাধ্য দাঁড়ায়,
চলছে সেথায় সূক্ষ্ম তর্ক
সদাই দিবারাত্র
'পাত্রাধার কি তৈল কিম্বা
তৈলাধার কি পাত্র'।
পুঁথিপত্র মেলাই আছে
মোহধ্বান্তনাশন,
তারি মধ্যে একটি প্রান্তে
পেতে চাস কি আসন ?
গান তা শুনি গুঞ্জরিয়া
গুঞ্জরিয়া কহে—
নহে নহে নহে।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোন্ দিকে তোর টান ?
পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ-'পরে
আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি
পঞ্চ হাজার গ্রন্থ—
সোনার জলে দাগ পড়ে না,
খোলে না কেউ পাতা,
অ-স্বাদিতমধু যেমন
যূথী অনাঘ্রাতা।
ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে
যত্ন পুরা মাত্রা,
ওরে আমার ছন্দোময়ী,
সেথায় করবি যাত্রা ?
গান তা শুনি কর্ণমূলে
মর্মরিয়া কহে—
নহে নহে নহে।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি মান ?
নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে
এক্‌জামিনের পড়ায়,
মনটা কিন্তু কোথা থেকে
কোন্ দিকে যে গড়ায়,
অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব
সামনে আছে খোলা,
কর্তৃজনের ভয়ে কাব্য
কুলুঙ্গিতে তোলা—
সেইখানেতে ছেঁড়াছড়া
এলোমেলোর মেলা,
তারি মধ্যে ওরে চপল,
করবি কি তুই খেলা ?
গান তা শুনে মৌনমুখে
রহে দ্বিধার ভরে—
যাব-যাব করে।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি ত্রাণ ?
ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মী বধূ
যেথায় আছে কাজে,
ঘরে ধায় সে ছুটি পায় সে
যখন মাঝে মাঝে,
বালিশ-তলে বইটি চাপা
টানিয়া লয় তারে,
পাতাগুলিন ছেঁড়াখোঁড়া
শিশুর অত্যাচারে—
কাজল-আঁকা সিঁদুর-মাখা
চুলের-গন্ধে-ভরা
শয্যাপ্রান্তে ছিন্ন বেশে
চাস কি যেতে ত্বরা ?
বুকের 'পরে নিশ্বসিয়া
স্তব্ধ রহে গান—
লোভে কম্পমান।

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি প্রাণ ?

যেথায় সুখে তরুণ যুগল
পাগল হয়ে বেড়ায়,
আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে
সবার আঁখি এড়ায়,
পাখি তাদের শোনায় গীতি,
নদী শোনায় গাথা,
কত রকম ছন্দ শোনায়
পুষ্প লতা পাতা—
সেইখানেতে সরল হাসি
সজল চোখের কাছে
বিশ্ববাঁশির ধ্বনির মাঝে
যেতে কি সাধ আছে ?
হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া
কহে আমার গান—
সেইখানে মোর স্থান ।

বোঝাপড়া

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে ।
কেউ বা তোমায় ভালোবাসে
কেউ বা বাসতে পারে না যে,
কেউ বিকিয়ে আছে, কেউ বা
সিকি পয়সা ধারে না যে,
কতকটা যে স্বভাব তাদের
কতকটা বা তোমারো ভাই,
কতকটা এ ভবের গতিক—
সবার তরে নহে সবাই ।
তোমায় কতক ফাঁকি দেবে
তুমিও কতক দেবে ফাঁকি,
তোমার ভোগে কতক পড়বে
পরের ভোগে থাকবে বাকি,
মান্ধাতারই আমল থেকে
চলে আসছে এমনি রকম—
তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম !
মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে ।

অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে সুখের বন্দরেতে,
জলের তলে পাহাড় ছিল
লাগল বুকের অন্দরেতে,
মুহূর্তেকে পাঁজরগুলো
উঠল কেঁপে আর্তরবে—
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
ঝগড়া করে মরতে হবে ?
ভেসে থাকতে পার যদি
সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়,
না পার তো বিনা বাক্যে
টুপ করিয়া ডুবে যেয়ো।
এটা কিছু অপূর্ব নয়,
ঘটনা সামান্য খুবই—
শঙ্কা যেথায় করে না কেউ
সেইখানে হয় জাহাজ-ডুবি।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

তোমার মাপে হয় নি সবাই।
তুমিও হও নি সবার মাপে,
তুমি মর কারও ঠেলায়
কেউ বা মরে তোমার চাপে—
তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি ?
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে,
মধুর ঠেকে ভোরের আলো,
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।
যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

নিজের ছায়া মস্ত করে
অস্তাচলে বসে বসে

আঁধার করে তোল যদি
জীবনখানা নিজের দোষে,
বিধির সঙ্গে বিবাদ করে
নিজের পায়েই কুড়ুল মার,
দোহাই তবে এ কার্যটা
যত শীঘ্র পার সারো।
খুব খানিকটে কেঁদে কেটে
অশ্রু ঢেলে ঘড়া ঘড়া
মনের সঙ্গে এক রকমে
করে নে ভাই, বোঝাপড়া।
তাহার পরে আঁধার ঘরে
প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোলো—
ভুলে যা ভাই, কাহার সঙ্গে
কতটুকুন তফাত হল।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

অচেনা

কেউ যে কারে চিনি নাকো
সেটা মস্ত বাঁচন।
তা না হলে নাচিয়ে দিত
বিষম তুর্কি-নাচন।
বুকের মধ্যে মনটা থাকে
মনের মধ্যে চিন্তা—
সেইখানেতেই নিজের ডিমে
সদাই তিনি দিন তা।
বাইরে যা পাই সম্‌জে নেব
তারি আইন-কানুন,
অন্তরেতে যা আছে তা
অন্তর্যামীই জানুন।

চাই নে রে, মন চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে মন, তাই নে।

বাইরে থাকুক মধুর মূর্তি,
সুধামুখের হাস্য,

তরল চোখে সরল দৃষ্টি—
করব না তার ভাষ্য।
বাহু যদি তেমন করে
জড়ায় বাহুবন্ধ
আমি দুটি চক্ষু মুদে
রইব হয়ে অন্ধ—
কে যাবে ভাই, মনের মধ্যে
মনের কথা ধরতে ?
কীটের খোঁজে কে দেবে হাত
কেউটে সাপের গর্তে ?

চাই নে রে, মন চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে মন, তাই নে।

মন নিয়ে কেউ বাঁচে নাকো,
মন বলে যা পায় রে
কোনো জন্মে মন সেটা নয়
জানে না কেউ হায় রে।
ওটা কেবল কথার কথা,
মন কি কেহ চিনিস ?
আছে কারও আপন হাতে
মন ব'লে এক জিনিস ?
চলেন তিনি গোপন চালে,
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে—
কেই বা তাঁরে দিচ্ছে এবং
কেই বা তাঁরে নিচ্ছে !

চাই নে রে, মন চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে মন, তাই নে।

তথাপি

তুমি যদি আমায় ভালো না বাস
রাগ করি যে এমন আমার সাধ্য নাই—
এমন কথার দেব নাকো আভাসও,
আমারো মন তোমার পায়ে বাধ্য নাই।
নাইকো আমার কোনো গরব-গরিমা—
যেমন করেই কর আমায় বঞ্চিত
তুমি না রও তোমার সোনার প্রতিমা
রবে আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত।

কিন্তু তবু তুমিই থাকো, সমস্যা যাক ঘুচি।
স্মৃতির চেয়ে আসলটিতেই আমার অভিরুচি।

দৈবে স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া শক্ত নয়
সেটা কিন্তু বলে রাখাই সংগত।
তাহা ছাড়া যারা তোমার ভক্ত নয়
নিন্দা তারা করতে পারে অন্তত।
তাহা ছাড়া চিরদিন কি কষ্টে যায়?
আমারো এই অশ্রু হবে মার্জনা।
ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায়
সান্ত্বনার্থে হয়তো পাব চার জনা।

কিন্তু তবু তুমিই থাকো, সমস্যা যাক ঘুচি।
চারের চেয়ে একের 'পরেই আমার অভিরুচি।

কবির বয়স

ওরে কবি, সন্ধ্যা হয়ে এল,
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক।
বসে বসে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে
শুনতেছ কি পরকালের ডাক?
কবি কহে, 'সন্ধ্যা হল বটে,
শুনছি বসে লয়ে শ্রান্ত দেহ,
এ পারে ওই পল্লী হতে যদি
আজো হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ।
যদি হোথায় বকুলবনচ্ছায়ে
মিলন ঘটে তরুণ-তরুণীতে,
দুটি আঁখির 'পরে দুইটি আঁখি
মিলিতে চায় দুরন্ত সংগীতে—

কে তাহাদের মনের কথা লয়ে
বীণার তারে তুলবে প্রতিধ্বনি,
আমি যদি ভবের কূলে বসে
পরকালের ভালো-মন্দই গনি ।

'সন্ধ্যাতারা উঠে অস্তে গেল,
চিতা নিবে এল নদীর ধারে,
কৃষ্ণপক্ষে হলুদবর্ণ চাঁদ
দেখা দিল বনের একটি পারে,
শৃগালসভা ডাকে ঊর্ধ্বরবে
পোড়ো বাড়ির শূন্য আঙিনাতে—
এমন কালে কোনো গৃহত্যাগী
হেথায় যদি জাগতে আসে রাতে,
জোড়-হস্তে ঊর্ধ্বে তুলি মাথা
চেয়ে দেখে সপ্ত ঋষির পানে,
প্রাণের কূলে আঘাত করে ধীরে
সুপ্তিসাগর শব্দবিহীন গানে—

ত্রিভুবনের গোপন কথাখানি
কে জাগিয়ে তুলবে তাহার মনে
আমি যদি আমার মুক্তি নিয়ে
যুক্তি করি আপন গৃহকোণে ?

'কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পানে নজর এত কেন ?
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি একবয়সী জেনো ।
ওষ্ঠে কারও সরল সাদা হাসি
কারও হাসি আঁখির কোণে কোণে
কারও অশ্রু উছলে পড়ে যায়
কারও অশ্রু শুকায় মনে মনে,
কেউ বা থাকে ঘরের কোণে দোঁহে
জগৎ-মাঝে কেউ বা হাঁকায় রথ,
কেউ বা মরে একলা ঘরের শোকে
জনারণ্যে কেউ বা হারায় পথ—

সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন শুনি পরকালের ডাক ?
সবার আমি সমান-বয়সী যে
চুলে আমার যত ধরুক পাক ।'

বিদায়

তোমরা নিশি যাপন করো,
এখনো রাত রয়েছে ভাই,
আমায় কিন্তু বিদায় দেহো—
ঘুমোতে যাই, ঘুমোতে যাই।
মাথার দিব্য, উঠো না কেউ
আগ বাড়িয়ে দিতে আমায়—
চলছে যেমন চলুক তেমন,
হঠাৎ যেন গান না থামায়।
আমার যন্ত্রে একটি তন্ত্রী
একটু যেন বিকল বাজে,
মনের মধ্যে শুনছি যেটা
হাতে সেটা আসছে না যে।

একেবারে থামার আগে
সময় রেখে থামতে যে চাই—
আজকে কিছু শ্রান্ত আছি,
ঘুমোতে যাই, ঘুমোতে যাই।

আঁধার-আলোয় সাদায়-কালোয়
দিনটা ভালোই গেছে কাটি,
তাহার জন্যে কারও সঙ্গে
নাইকো কোনো ঝগড়াঝাঁটি।
মাঝে মাঝে ভেবেছিলুম
একটু-আধটু এটা-ওটা
বদল যদি পারত হতে
থাকত নাকো কোনো খোঁটা।
বদল হলে কখন মনটা
হয়ে পড়ত ব্যতিব্যস্ত
এখন যেমন আছে আমার
সেইটে আবার চেয়ে বসত।

তাই ভেবেছি দিনটা আমার
ভালোই গেছে, কিছু না চাই—
আজকে শুধু শ্রান্ত আছি,
ঘুমোতে যাই, ঘুমোতে যাই।

অপটু

যতবার আজ গাঁথনু মালা
পড়ল খসে খসে—
কী জানি কার দোষে !
তুমি হোথায় চোখের কোণে
দেখছ বসে বসে ।
চোখ-দুটিরে প্রিয়ে,
শুধাও শপথ নিয়ে
আঙুল আমার আকুল হল
কাহার দৃষ্টিদোষে !

আজ যে বসে গান শোনাব
কথাই নাহি জোটে,
কণ্ঠ নাহি ফোটে ।
মধুর হাসি খেলে তোমার
চতুর রাঙা ঠোঁটে ।
কেন এমন ত্রুটি
বলুক আঁখি-দুটি—
কেন আমার রুদ্ধ কণ্ঠে
কথাই নাহি ফোটে !

রেখে দিলাম মাল্য বীণা,
সন্ধ্যা হয়ে আসে ।
ছুটি দাও এ দাসে—
সকল কথা বন্ধ করে
বসি পায়ের পাশে ।
নীরব ওষ্ঠ দিয়ে
পারব যে কাজ প্রিয়ে
এমন কোনো কর্ম দেহো
অকর্মণ্য দাসে ।

উৎসৃষ্ট

মিথ্যে তুমি গাঁথলে মালা
নবীন ফুলে,
ভেবেছ কি কণ্ঠে আমার
দেবে তুলে ?
দাও তো ভালোই, কিন্তু জেনো
হে নির্মলে,

আমার মালা দিয়েছি ভাই
সবার গলে ।
যে-ক'টা ফুল ছিল জমা
অর্ঘ্যে মম
উদ্দেশেতে সবায় দিনু—
নমো নমঃ ।

কেউ বা তাঁরা আছেন কোথা
কেউ জানে না,
কারও বা মুখ ঘোমটা-আড়ে
আধেক চেনা ।
কেউ বা ছিলেন অতীত কালে
অবন্তীতে,
এখন তাঁরা আছেন শুধু
কবির গীতে ।
সবার তনু সাজিয়ে মাল্যে
পরিচ্ছদে
কহেন বিধি 'তুভ্যমহং
সম্প্রদদে' ।

হৃদয় নিয়ে আজ কি প্রিয়ে
হৃদয় দেবে ?
হায় ললনা, সে প্রার্থনা
ব্যর্থ এবে ।
কোথায় গেছে সেদিন আজি
যেদিন মম
তরুণ-কালে জীবন ছিল
মুকুলসম,
সকল শোভা সকল মধু
গন্ধ যত
বক্ষোমাঝে বন্ধ ছিল
বন্দীমত ।

আজ যে তাহা ছড়িয়ে গেছে
অনেক দূরে—
অনেক দেশে, অনেক বেশে,
অনেক সুরে ।
কুড়িয়ে তারে বাঁধতে পারে
একটিখানে
এমনতরো মোহন-মন্ত্র
কেই বা জানে !

নিজের মন তো দেবার আশা
চুকেই গেছে,
পরের মনটি পাবার আশায়
রইনু বেঁচে ।

ভীরুতা

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই ।
মনে মনে হাসবি কিনা
বুঝব কেমন করে ?
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
ঠাট্টা করে ওড়াই সখী,
নিজের কথাটাই ।
হাল্কা তুমি কর পাছে
হাল্কা করি ভাই,
আপন ব্যথাটাই ।

সত্য কথা সরলভাবে
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই ।
অবিশ্বাসে হাসবি কিনা
বুঝব কেমন করে ?
মিথ্যা ছলে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই,
উল্টা করে বলি আমি
সহজ কথাটাই ।
ব্যর্থ তুমি কর পাছে
ব্যর্থ করি ভাই,
আপন ব্যথাটাই ।

সোহাগ-ভরা প্রাণের কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই ।
সোহাগ ফিরে পাব কিনা
বুঝব কেমন করে ?
কঠিন কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই,
গর্বছলে দীর্ঘ করি
নিজের কথাটাই ।

ব্যথা পাছে না পাও তুমি
লুকিয়ে রাখি তাই
নিজের ব্যথাটাই।

ইচ্ছা করে নীরব হয়ে
রহিব তোর কাছে,
সাহস নাহি পাই।
মুখের 'পরে বুকের কথা
উথ্‌লে ওঠে পাছে
অনেক কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই,
কথার আড়ে আড়াল থাকে
মনের কথাটাই।
তোমায় ব্যথা লাগিয়ে শুধু
জাগিয়ে তুলি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

ইচ্ছা করি সুদূরে যাই,
না আসি তোর কাছে—
সাহস নাহি পাই।
তোমার কাছে ভীরুতা মোর
প্রকাশ হয় রে পাছে
কেবল এসে তাই
দেখা দিয়েই যাই,
স্পর্ধাতলে গোপন করি
মনের কথাটাই।
নিত্য তব নেত্রপাতে
জ্বালিয়ে রাখি ভাই,
আপন ব্যথাটাই।

পরামর্শ

সূর্য গেল অস্তপারে—
লাগল গ্রামের ঘাটে
আমার জীর্ণ তরী।
শেষ বসন্তের সন্ধ্যা-হাওয়া
শস্যশূন্য মাঠে
উঠল হাহা করি।
আর কি হবে নূতন যাত্রা
নূতন রানীর দেশে
নূতন সাজে সেজে ?

এবার যদি বাতাস উঠে
তুফান জাগে শেষে,
ফিরে আসবি নে যে।

অনেক বার তো হাল ভেঙেছে,
পাল গিয়েছে ছিঁড়ে
ওরে দুঃসাহসী।
সিন্ধুপানে গেছিস ভেসে
অকূল কালো নীরে
ছিন্ন-রশারশি।
এখন কি আর আছে সে বল?
বুকের তলা তোর
ভরে উঠছে জলে।
অশ্রু সেঁচে চলবি কত—
আপন ভারে ভোর
তলিয়ে যাবি তলে।

এবার তবে ক্ষান্ত হ রে
ওরে শ্রান্ত তরী,
রাখ্ রে আনাগোনা।
বর্ষশেষের বাঁশি বাজে
সন্ধ্যা-গগন ভরি,
ওই যেতেছে শোনা।
এবার ঘুমো কূলের কোলে
বটের ছায়াতলে
ঘাটের পাশে রহি,
ঘটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে
তারি আঘাত সহি।

ইচ্ছা যদি করিস তবে
এ পার হতে পারে
যাস রে খেয়া বেয়ে।
আনবে বহি গ্রামের বোঝা
ক্ষুদ্র ভারে ভারে
পাড়ার ছেলেমেয়ে।
ও পারেতে ধানের খোলা
এই পারেতে হাট,
মাঝে শীর্ণ নদী—
সন্ধ্যা সকাল করবি শুধু
এ-ঘাট ও-ঘাট
ইচ্ছা করিস যদি।

হায় রে মিছে প্রবোধ দেওয়া,
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।
কর্ণ ধরে বসেছে তার
যমদূতের সম
স্বভাব সর্বনেশে।
ঝড়ের নেশা ঢেউয়ের নেশা
ছাড়বে নাকো আর,
হায় রে মরণলুভী!
ঘাটে সে কি রইবে বাঁধা,
অদৃষ্টে যাহার
আছে নৌকাডুবি!

ক্ষতিপূরণ

তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী
হে প্রেয়সী!
বলছে— কবি তোমার ছবি
আঁকছে গানে,
প্রণয়গীতি গাচ্ছে নিতি
তোমার কানে,
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা
ঢাকছে শেষে বাংলাদেশে
উচ্চ কথা।

তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী
হে প্রেয়সী!

সে কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রানী!
ফেলুক মুছি হাস্যশুচি
তোমার লোচন
বিশ্বসুদ্ধ যতেক ক্রুদ্ধ
সমালোচন।
অনুরক্ত তব ভক্ত
নিন্দিতেরে
করো রক্ষে শীতল বক্ষে
বাহুর ঘেরে।

তাই কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রানী।

আমি নাবব মহাকাব্য-
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন-
কিংকিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।

আমি নাবব মহাকাব্য-
সংরচনে
ছিল মনে।

হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্নমত!
পুরাণচিত্র বীরচরিত্র
অষ্টসর্গ
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-খড়্গ।
রইল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবীকেলে
কীর্তিকলাপ।

হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্নমত!

সে-সব-ক্ষতি-পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি
হরিণ-আঁখি!
লোকের মনে সিংহাসনে
নাইকো দাবি—

তোমার মনোগৃহের কোনো
দাও তো চাবি।
মরার পরে চাই নে ওরে
অমর হতে,
অমর হব আঁখির তব
সুধার স্রোতে।

খ্যাতির ক্ষতি-পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি
হরিণ-আঁখি!

সেকাল

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে,
দৈবে হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে,
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে
কানন-ঘেরা বাড়ি।
রেবার তটে চাঁপার তলে
সভা বসত সন্ধ্যা হলে,
ক্রীড়াশৈলে আপন-মনে
দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি।
জীবনতরী বহে যেত
মন্দাক্রান্তা তালে,
আমি যদি জন্ম নিতাম
কালিদাসের কালে।

২

চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি
থাকত নাকো ত্বরা—
মৃদুপদে যেতেম, যেন
নাইকো মৃত্যু জরা।
ছটা ঋতু পূর্ণ করে
ঘটত মিলন স্তরে স্তরে,
ছটা সর্গে বার্তা তাহার
রইত কাব্যে গাঁথা।
বিচ্ছেদও সুদীর্ঘ হত,
অশ্রুজলের নদীর মতো

মন্দগতি চলত রচি
দীর্ঘ করুণ গাথা ।
আষাঢ় মাসে মেঘের মতন
মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাকত নাকো
কিছুমাত্র ত্বরা ।

৩

অশোক-কুঞ্জ উঠত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে,
বকুল হত ফুল্ল প্রিয়ার
মুখের মদিরাতে ।
প্রিয়সখীর নামগুলি সব
ছন্দ ভরি করিত রব,
রেবার কূলে কলহংসের
কলধ্বনির মতো ।
কোনো নামটি মন্দালিকা,
কোনো নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী
ঝংকারিত কত !
আসত তারা কুঞ্জবনে
চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে,
অশোক-শাখা উঠত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে ।

৪

কুরবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে,
লীলাকমল রইত হাতে
কী জানি কোন্ কাজে !
অলক সাজত কুন্দফুলে,
শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত
নবনীপের মালা ।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু
মাখত মুখে বালা ।
কালাগুরুর গুরু গন্ধ
লেগে থাকত সাজে,
কুরবকের পরত মালা
কালো কেশের মাঝে ।

৫

কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায়
বক্ষ রইত ঢাকা,
আঁচলখানির প্রান্তটিতে
হংসমিথুন আঁকা।
বিরহেতে আষাঢ় মাসে
চেয়ে রইত বঁধুর আশে,
একটি করে পূজার পুষ্পে
দিন গনিত ব'সে।
বক্ষে তুলি বীণাখানি
গান গাহিতে ভুলত বাণী,
রুক্ষ অলক অশ্রুচোখে
পড়ত খসে খসে।
মিলন-রাতে বাজত পায়ে
নূপুর-দুটি বাঁকা,
কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায়
বক্ষ রইত ঢাকা।

৬

প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে,
নাচিয়ে দিত ময়ূরটিরে
কঙ্কণঝংকারে।
কপোতটিরে লয়ে বুকে
সোহাগ করত মুখে মুখে,
সারসীরে খাইয়ে দিত
পদ্মকোরক বহি।
অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী
কথা কইত শৌরসেনী,
বলত সখীর গলা ধরে
'হলা পিয় সহি'।
জল সেচিত আলবালে
তরুণ সহকারে,
প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে।

৭

নবরত্নের সভার মাঝে
রইতাম একটি টেরে,
দূর হইতে গড় করিতাম
দিঙ্‌নাগাচার্যেরে।

আশা করি নামটা হত
ওরই মধ্যে ভদ্রমত—
বিশ্বসেন কি দেবদত্ত
কিম্বা বসুভূতি।
স্রগ্‌ধরা কি মালিনীতে
বিম্বাধরের স্তুতিগীতে
দিতাম রচি দুটি-চারটি
ছোটোখাটো পুঁথি।
ঘরে যেতাম তাড়াতাড়ি
শ্লোক-রচনা সেরে,
নবরত্নের সভার মাঝে
রইতাম একটি টেরে।

৮

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না জানি কোন্‌
মালবিকার জালে।
কোন্‌ বসন্ত-মহোৎসবে
বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের
গোপন অন্তরালে
কোন্‌ ফাগুনের শুক্লনিশায়
যৌবনেরই নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম
রাজার চিত্রশালে!
ছল করে তার বাধত আঁচল
সহকারের ডালে।
আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে।

৯

হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল!
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে
লয়ে তারিখ-সাল।
হারিয়ে গেছে সে-সব অব্দ,
ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ—
গেছে যদি আপদ গেছে,
মিথ্যা কোলাহল।
হায় রে গেল সঙ্গে তারি
সেদিনের সেই পৌরনারী

নিপুণিকা চতুরিকা
মালবিকার দল।
কোন্ স্বর্গে নিয়ে গেল
বরমাল্যের থাল!
হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল!

১০

যাদের সঙ্গে হয় নি মিলন
সে-সব বরাঙ্গনা
বিচ্ছেদেরই দুঃখে আমায়
করছে অন্যমনা।
তবু মনে প্রবোধ আছে—
তেমনি বকুল ফোটে গাছে
যদিও সে পায় না নারীর
মুখমদের ছিটা,
ফাগুন-মাসে অশোক-ছায়ে
অলস প্রাণে শিথিল গায়ে
দখিন হতে বাতাসটুকু
তেমনি লাগে মিঠা।
অনেক দিকেই যায় যে পাওয়া
অনেকটা সান্ত্বনা,
যদিও রে নাইকো কোথাও
সে-সব বরাঙ্গনা।

১১

এখন যাঁরা বর্তমানে
আছেন মর্তলোকে
মন্দ তারা লাগত না কেউ
কালিদাসের চোখে।
পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্তা
অন্য-দেশীর চালে,
তবু দেখো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে।
মরব না ভাই, নিপুণিকা
চতুরিকার শোকে—
তাঁরা সবাই অন্য নামে
আছেন মর্তলোকে।

১২

আপাতত এই আনন্দে
গর্বে বেড়াই নেচে—
কালিদাস তো নামেই আছেন,
আমি আছি বেঁচে।
তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ
আমি তো পাই মৃদুমন্দ,
আমার কালের কণামাত্র
পান নি মহাকবি।
বিদুষী এই আছেন যিনি
আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিল না তাঁর ছবি।
প্রিয়ে, তোমার তরুণ আঁখির
প্রসাদ যেচে যেচে
কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে
গর্বে বেড়াই নেচে।

প্রতিজ্ঞা

আমি হব না তাপস, হব না, হব না,
যেমনি বলুন যিনি।
আমি হব না তাপস নিশ্চয় যদি
না মেলে তপস্বিনী।
আমি করেছি কঠিন পণ
যদি না মিলে বকুলবন,
যদি মনের মতন মন
না পাই জিনি,
তবে হব না তাপস, হব না, যদি না
পাই সে তপস্বিনী।

আমি ত্যজিব না ঘর, হব না বাহির
উদাসীন সন্ন্যাসী,
যদি ঘরের বাহিরে না হাসে কেহই
ভুবন-ভুলানো হাসি।
যদি না উড়ে নীলাঞ্চল
মধুর বাতাসে বিচঞ্চল,
যদি না বাজে কাঁকন মল
রিনিক-ঝিনি—
আমি হব না তাপস, হব না, যদি না
পাই গো তপস্বিনী।

আমি হব না তাপস, তোমার শপথ,
যদি সে তপের বলে
কোনো নূতন ভুবন না পারি গড়িতে
নূতন হৃদয়-তলে।
যদি জাগায়ে বীণার তার
কারো টুটিয়া মরম-দ্বার,
কোনো নূতন আঁখির ঠার
না লই চিনি
আমি হব না তাপস, হব না, হব না,
না পেলে তপস্বিনী।

পথে

গাঁয়ের পথে চলেছিলেম
অকারণে,
বাতাস বহে বিকালবেলা
বেণুবনে।
ছায়া তখন আলোর ফাঁকে
লতার মতো জড়িয়ে থাকে,
একা একা কোকিল ডাকে
নিজমনে।
আমি কোথায় চলেছিলেম
অকারণে।

জলের ধারে কুটিরখানি
পাতা-ঢাকা,
দ্বারের 'পরে নুয়ে পড়ে
নিম্বশাখা।
ওই যে শুনি মাঝে মাঝে
না জানি কোন্ নিত্যকাজে
কোথায় দুটি কাঁকন বাজে
গৃহকোণে।
যেতে যেতে এলেম হেথা
অকারণে।

দিঘির জলে ঝলক ঝলে
মানিক হীরা,
সর্ষেখেতে উঠছে মেতে
মৌমাছিরা।

এ পথ গেছে কত গাঁয়ে
কত গাছের ছায়ে ছায়ে
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে।
আমি শুধু হেথায় এলেম
অকারণে।

আরেক দিন সে ফাগুন মাসে
বহু আগে
চলেছিলেম এই পথে সেই
মনে জাগে।
আমের বোলের গন্ধে অবশ
বাতাস ছিল উদাস অলস,
ঘাটের শানে বাজছে কলস
ক্ষণে ক্ষণে।
সে-সব কথা ভাবছি বসে
অকারণে।

দীর্ঘ হয়ে পড়ছে পথে
বাঁকা ছায়া,
গোষ্ঠঘরে ফিরছে ধেনু
শ্রান্তকায়া।
গোধূলিতে খেতের 'পরে
ধূসর আলো ধূ ধূ করে,
বসে আছে খেয়ার তরে
পান্থজনে।
আবার ধীরে চলছি ফিরে
অকারণে।

জন্মান্তর

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাই না হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।
আমি নাই বা গেলেম বিলাত,
নাই বা পেলেম রাজার খিলাত,
যদি পরজন্মে পাই রে হতে
ব্রজের রাখাল বালক
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক।

যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশীবটের তলে,
যারা গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে
পরে পরায় গলে,
যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শীতল কালো জলে—
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশীবটের তলে।

'ওরে বিহান হল, জাগো রে ভাই'
ডাকে পরস্পরে।
ওরে ওই-যে দধি-মন্থ-ধ্বনি
উঠল ঘরে ঘরে।
হেরো মাঠের পথে ধেনু
চলে উড়িয়ে গো-খুর-রেণু,
হেরো আঙিনাতে ব্রজের বধূ
দুগ্ধ দোহন করে।
'ওরে বিহান হল, জাগো রে ভাই'
ডাকে পরস্পরে।

ওরে শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল-মূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হল
কালিন্দীরই কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়া-তরীর 'পরে,
হেরো কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি তুলে।
ওরে শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল-মূলে।

মোরা নবনবীন ফাগুন রাতে
নীল নদীর তীরে
কোথা যাব চলি অশোকবনে
শিখিপুচ্ছ শিরে।
যবে দোলার ফুলরশি
দিবে নীপশাখায় কষি
যবে দখিন-বায়ে বাঁশির ধ্বনি
উঠবে আকাশ ঘিরে

মোরা রাখাল মিলে করব মেলা
নীল নদীর তীরে ।

আমি হব না ভাই নববঙ্গে
নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে
সুসভ্যতার আলোক ।
যদি ননি-ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে
আমি কোনো জন্মে পারি হতে
ব্রজের গোপবালক
তবে চাই না হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক ।

কর্মফল

পরজন্ম সত্য হলে
কী ঘটে মোর সেটা জানি—
আবার আমায় টানবে ধরে
বাংলাদেশের এ রাজধানী ।
গদ্য পদ্য লিখনু ফেঁদে,
তারাই আমায় আনবে বেঁধে,
অনেক লেখায় অনেক পাতক,
সে মহাপাপ করব মোচন—
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন ।

ততদিনে দৈবে যদি
পক্ষপাতী পাঠক থাকে
কর্ণ হবে রক্তবর্ণ
এমনি কটু বলব তাকে ।
যে বইখানি পড়বে হাতে
দগ্ধ করব পাতে পাতে,
আমার ভাগ্যে হব আমি
দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন—
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন ।

বলব, 'এ-সব কী পুরাতন !
আগাগোড়া ঠেকছে চুরি ।
মনে হচ্ছে, আমিও এমন
লিখতে পারি ঝুড়ি ঝুড়ি ।'

আরো যে-সব লিখব কথা
ভাবতে মনে বাজছে ব্যথা,
পরজন্মের নিষ্ঠুরতায়
এ জন্মে হয় অনুশোচন—
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

তোমরা, যাঁদের বাক্য হয় না
আমার পক্ষে মুখরোচক
তোমরা যদি পুনর্জন্মে
হও পুনর্বার সমালোচক—
আমি আমায় পাড়ব গালি,
তোমরা তখন ভাববে খালি
কলম ক'ষে ব'সে ব'সে
প্রতিবাদের প্রতি বচন।
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

লিখব, ইনি কবিসভায়
হংসমধ্যে বকো যথা!
তুমি লিখবে, কোন্ পাষণ্ড
বলে এমন মিথ্যা কথা!
আমি তোমায় বলব— মূঢ়,
তুমি আমায় বলবে— রূঢ়,
তার পরে যা লেখালেখি
হবে না সে রুচিরোচন।
তুমি লিখবে কড়া জবাব,
আমি কড়া সমালোচন।

৫ আষাঢ়

কবি

আমি যে বেশ সুখে আছি
অন্তত নই দুঃখে কৃশ,
সে কথাটা পদ্যে লিখতে
লাগে একটু বিসদৃশ।
সেই কারণে গভীর ভাবে
খুঁজে খুঁজে গভীর চিতে
বেরিয়ে পড়ে গভীর ব্যথা
স্মৃতি কিম্বা বিস্মৃতিতে।

কিন্তু সেটা এত সুদূর
  এতই সেটা অধিক গভীর
আছে কি না আছে তাহার
  প্রমাণ দিতে হয় না কবির।
মুখের হাসি থাকে মুখে,
  দেহের পুষ্টি পোষে দেহ,
প্রাণের ব্যথা কোথায় থাকে
  জানে না সেই খবর কেহ।

কাব্য প'ড়ে যেমন ভাব
  কবি তেমন নয় গো।
আঁধার ক'রে রাখে নি মুখ,
দিবারাত্র ভাঙছে না বুক,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
  হাস্যমুখেই বয় গো।

ভালোবাসে ভদ্রসভায়
  ভদ্র পোশাক পরতে অঙ্গে,
ভালোবাসে ফুল্ল মুখে
  কইতে কথা লোকের সঙ্গে।
বন্ধু যখন ঠাট্টা করে
  মরে না সে অর্থ খুঁজে,
ঠিক যে কোথায় হাসতে হবে
  একেক সময় দিব্যি বুঝে।
সামনে যখন অন্ন থাকে
  থাকে না সে অন্যমনে,
সঙ্গীদলের সাড়া পেলে
  রয় না বসে ঘরের কোণে।
বন্ধুরা কয় 'লোকটা রসিক',
  কয় কি তারা মিথ্যামিথ্যি ?
শত্রুরা কয় 'লোকটা হালকা',
  কিছু কি তার নাইকো ভিত্তি ?

কাব্য দেখে যেমন ভাব
  কবি তেমন নয় গো।
চাঁদের পানে চক্ষু তুলে
রয় না পড়ে নদীর কূলে,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
  মনের সুখেই বয় গো।

সুখে আছি লিখতে গেলে
  লোকে বলে, 'প্রাণটা ক্ষুদ্র !

আশাটা এর নয়কো বিরাট,
পিপাসা এর নয়কো রুদ্র।'
পাঠকদলে তুচ্ছ করে,
অনেক কথা বলে কঠোর—
বলে, 'একটু হেসে-খেলেই
ভরে যায় এর মনের জঠর।'
কবিরে তাই ছন্দে বন্ধে
বানাতে হয় দুখের দলিল।
মিথ্যা যদি হয় সে তবু
ফেলো পাঠক চোখের সলিল।
তাহার পরে আশিস কোরো
রুদ্ধকণ্ঠে ক্ষুব্ধবুকে,
কবি যেন আজন্মকাল
দুখের কাব্য লেখেন সুখে।

কাব্য যেমন কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো।
বুদ্ধি যেন একটু থাকে,
স্নানাহারের নিয়ম রাখে,
সহজ লোকের মতোই যেন
সরল গদ্য কয় গো।

৬ আষাঢ়

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার
কহো আমায় ধনী,
তাহা হলে সেই বাণিজ্যের
করব মহাজনি।

দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে
ছায়ার মতো চরণদেশে
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে
আর বসে না রইব—
এটা আমি স্থির বুঝেছি
ভিক্ষা নৈব নৈব।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি
কোন্ নগরে যাব, দিয়ে
কোন্ সাগরে পাড়ি।

কোন্ তারকা লক্ষ্য করি,
কূল-কিনারা পরিহরি,
কোন্ দিকে যে বাইব তরী
অকূল কালো নীরে—
মরব না আর ব্যর্থ আশায়
বালুমরুর তীরে।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

সাগর উঠে তরঙ্গিয়া,
বাতাস বহে বেগে,
সূর্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে।

দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই—
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই—
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশমনে
রইব না আর কভু।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।

নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,

ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগনদী—
সোনার রেণু আনব ভরি
সেথায় নামি যদি ।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই ।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই ।

অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্ছি অজানায়
আমি শুধু একলা নেয়ে
আমার শূন্য নায় ।

নব নব পবনভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে
অপূর্ব ধন যত ।
ভিখারি তোর ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মতো ।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই ।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই ।

বিদায়রীতি

হায় গো রানী, বিদায়বাণী
এমনি করে শোনে ?
ছি ছি, ওই-যে হাসিখানি
কাঁপছে আঁখিকোণে !
এতই বারে বারে কি রে
মিথ্যা বিদায় নিয়েছি রে,
ভাবছ তুমি মনে মনে
এ লোকটি নয় যাবার—
দ্বারের কাছে ঘুরে ঘুরে
ফিরে আসবে আবার ।

আমায় যদি শুধাও তবে
সত্য করেই বলি—
আমারো সেই সন্দেহ হয়
ফিরে আসব চলি।
বসন্তদিন আবার আসে,
পূর্ণিমা-রাত আবার হাসে,
বকুল ফোটে রিক্ত শাখায়—
এরাও তো নয় যাবার।
সহস্র বার বিদায় নিয়ে
এরাও ফেরে আবার।

একটুখানি মোহ তবু
মনের মধ্যে রাখো,
মিথ্যেটারে একেবারেই
জবাব দিয়ো নাকো।
ভ্রমক্রমে ক্ষণেক-তরে
এনো গো জল আঁখির 'পরে
আকুল স্বরে যখন কব
'সময় হল যাবার'।
তখন নাহয় হেসো, যখন
ফিরে আসব আবার।

নষ্ট স্বপ্ন

কালকে রাতে মেঘের গরজনে
রিমিঝিমি-বাদল-বরিষনে
ভাবিতেছিলাম একা একা—
স্বপ্ন যদি যায় রে দেখা
আসে যেন তাহার মূর্তি ধ'রে
বাদলা রাতে আধেক ঘুমঘোরে।

মাঠে মাঠে বাতাস ফিরে মাতি,
বৃথা স্বপ্নে কাটল সারা রাতি।
হায় রে, সত্য কঠিন ভারী,
ইচ্ছামত গড়তে নারি—
স্বপ্ন সেও চলে আপন মতে,
আমি চলি আমার শূন্য পথে।

কালকে ছিল এমন ঘন রাত,
আকুল ধারে এমন বারিপাত,

মিথ্যা যদি মধুর রূপে
আসত কাছে চুপে চুপে
তাহা হলে কাহার হত ক্ষতি—
স্বপ্ন যদি ধরত সে মুরতি ?

একটি মাত্র

গিরিনদী বালির মধ্যে
যাচ্ছে বেঁকে বেঁকে,
একটি ধারে স্বচ্ছ ধারায়
শীর্ণ রেখা এঁকে ।
মরু-পাহাড়-দেশে
শুষ্ক বনের শেষে
ফিরেছিলেম দুই প্রহরে
দগ্ধ চরণতল ।
বনের মধ্যে পেয়েছিলেম
একটি আঙুর ফল ।

রৌদ্র তখন মাথার 'পরে,
পায়ের তলায় মাটি
জলের তরে কেঁদে মরে
তৃষায় ফাটি ফাটি ।
পাছে ক্ষুধার ভরে
তুলি মুখের 'পরে
আকুল ঘ্রাণে নিই নি তাহার
শীতল পরিমল ।
রেখেছিলেম লুকিয়ে আমার
একটি আঙুর ফল ।

বেলা যখন পড়ে এল,
রৌদ্র হল রাঙা,
নিশ্বাসিয়া উঠল হু হু
ধূ ধূ বালুর ডাঙা—
থাকতে দিনের আলো
ঘরে ফেরাই ভালো,
তখন খুলে দেখনু চেয়ে
চক্ষে লয়ে জল
মুঠির মাঝে শুকিয়ে আছে
একটি আঙুর ফল ।

সোজাসুজি

হৃদয়-পানে হৃদয় টানে,
নয়ন-পানে নয়ন ছোটে,
দুটি প্রাণীর কাহিনীটা
এইটুকু বৈ নয়কো মোটে।
শুক্লসন্ধ্যা চৈত্র মাসে
হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে—
আমার বাঁশি লুটায় ভূমে,
তোমার কোলে ফুলের পুঁজি।
তোমার আমার এই-যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

বসন্তী-রঙ বসনখানি
নেশার মতো চক্ষে ধরে,
তোমার গাঁথা যূথীর মালা
স্তুতির মতো বক্ষে পড়ে।
একটু দেওয়া একটু রাখা,
একটু প্রকাশ একটু ঢাকা,
একটু হাসি একটু শরম—
দুজনের এই বোঝাবুঝি।
তোমার আমার এই-যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

মধুমাসের মিলন-মাঝে
মহান কোনো রহস্য নেই,
অসীম কোনো অবোধ কথা
যায় না বেধে মনে-মনেই।
আমাদের এই সুখের পিছু
ছায়ার মতো নাইকো কিছু,
দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে
নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি।
মধুমাসে মোদের মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে
খুঁজি নে ভাই ভাষাতীত,
আকাশ-পানে বাহু তুলে
চাহি নে ভাই আশাতীত।
যেটুকু দিই যেটুকু পাই
তাহার বেশি আর কিছু নাই—

সুখের বক্ষ চেপে ধরে
করি নে কেউ যোঝাযুঝি।
মধুমাসে মোদের মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

শুনেছিনু প্রেমের পাথার
নাইকো তাহার কোনো দিশা,
শুনেছিনু প্রেমের মধ্যে
অসীম ক্ষুধা অসীম তৃষা—
বীণার তন্ত্রী কঠিন টানে
ছিঁড়ে পড়ে প্রেমের তানে,
শুনেছিনু প্রেমের কুঞ্জে
অনেক বাঁকা গলিঘুঁজি।
আমাদের এই দোঁহার মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

অসাবধান

আমায় যদি মনটি দেবে
দিয়ো, দিয়ো মন—
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু
রেখো সারাক্ষণ।
খোলা আমার দুয়ারখানা,
ভোলা আমার প্রাণ—
কখন যে কার আনাগোনা
নইকো সাবধান।
পথের ধারে বাড়ি আমার,
থাকি গানের ঝোঁকে—
বিদেশী সব পথিক এসে
যেথা-সেথাই ঢোকে।
ভাঙে কতক, হারায় কতক
যা আছে মোর দামি—
এমনি ক'রে একে একে
সর্বস্বান্ত আমি।

আমায় যদি মনটি দেবে দিয়ো, দিয়ো মন—
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু রেখো সারাক্ষণ।

আমায় যদি মনটি দেবে
নিষেধ তাহে নাই,

কিছুর তরে আমায় কিন্তু
কোরো না কেউ দায়ী।
ভুলে যদি শপথ ক'রে
বলি কিছু কবে,
সেটা পালন না করি তো
মাপ করিতেই হবে।
ফাগুন মাসে পূর্ণিমাতে
যে নিয়মটা চলে
রাগ কোরো না চৈত্র মাসে
সেটা ভঙ্গ হলে।
কোনো দিন বা পূজার সাজি
কুসুমে হয় ভরা,
কোনো দিন বা শূন্য থাকে
মিথ্যা সে দোষ ধরা।

আমায় যদি মনটি দেবে নিষেধ তাহে নাই,
কিছুর তরে আমায় কিন্তু কোরো না কেউ দায়ী।

আমায় যদি মনটি দেবে
রাখিয়া যাও তবে,
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু
ভুলে থাকতে হবে।
দুটি চক্ষে বাজবে তোমার
নবরাগের বাঁশি,
কণ্ঠে তোমার উচ্ছ্বসিয়া
উঠবে হাসিরাশি।
প্রশ্ন যদি শুধাও কভু
মুখটি রাখি বুকে,
মিথ্যা কোনো জবাব পেলে
হেসো সকৌতুকে।
যে দুয়ারটা বন্ধ থাকে
বন্ধ থাকতে দিয়ো,
আপনি যাহা এসে পড়ে
তাহাই হেসে নিয়ো।

আমায় যদি মনটি দেবে, রাখিয়া যাও তবে—
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু ভুলে থাকতে হবে।

স্বল্পশেষ

অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই—
যা আছে তা এই গো শুধু এই,
শুধু এই।
যা ছিল তা শেষ করেছি
একটি বসন্তেই।
আজ যা কিছু বাকি আছে
সামান্য এই দান—
তাই নিয়ে কি রচি দিব
একটি ছোটো গান?

একটি ছোটো মালা তোমার
হাতের হবে বালা।
একটি ছোটো ফুল তোমার
কানের হবে দুল।
একটি তরুতলায় ব'সে
একটি ছোটো খেলায়
হারিয়ে দিয়ে যাবে মোরে
একটি সন্ধেবেলায়।
অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই।
যা আছে তা এই গো শুধু এই,
শুধু এই।
ঘাটে আমি একলা বসে রই,
ওগো আয়!
বর্ষানদী পার হবি কি ওই—
হায় গো হায়!
অকূল-মাঝে ভাসবি কে গো
ভেলার ভরসায়।

আমার তরীখান
সইবে না তুফান;
তবু যদি লীলাভরে
চরণ কর দান,
শান্ত তীরে তীরে তোমায়
বাইব ধীরে ধীরে।
একটি কুমুদ তুলে তোমার
পরিয়ে দেব চুলে।

ভেসে ভেসে শুনবে বসে
কত কোকিল ডাকে
কূলে কূলে কুঞ্জবনে
নীপের শাখে শাখে।

ক্ষুদ্র আমার তরীখানি—
সত্য করি কই,
হায় গো পথিক, হায়
তোমায় নিয়ে একলা নায়ে
পার হব না ওই
আকুল যমুনায়।

কূলে

আমাদের এই নদীর কূলে
নাইকো স্নানের ঘাট,
ধূধূ করে মাঠ।
ভাঙা পাড়ির গায়ে শুধু
শালিখ লাখে লাখে
খোপের মধ্যে থাকে।
সকালবেলা অরুণ আলো
পড়ে জলের 'পরে,
নৌকা চলে দু-একখানি
অলস বায়ু-ভরে।
আঘাটাতে বসে রইলে,
বেলা যাচ্ছে বয়ে—
দাও গো মোরে কয়ে
ভাঙন-ধরা কূলে তোমার
আর কিছু কি চাই?

সে কহিল, ভাই,
না ই, না ই, নাই গো আমার
কিছুতে কাজ নাই।

আমাদের এ নদীর কূলে
ভাঙা পাড়ির তল,
ধেনু খায় না জল।
দূর গ্রামের দু-একটি ছাগ
বেড়ায় চরি চরি
সারা দিবস ধরি।

জলের 'পরে বেঁকে-পড়া
খেজুর-শাখা হতে
ক্ষণে ক্ষণে মাছরাঙাটি
ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে।
ঘাসের 'পরে অশথতলে
যাচ্ছে বেলা বয়ে—
দাও আমারে কয়ে
আজকে এমন বিজন প্রাতে
আর কারে কি চাই ?

সে কহিল, ভাই,
না ই, না ই, নাই গো আমার
কারেও কাজ নাই।

যাত্রী

আছে, আছে স্থান !
একা তুমি, তোমার শুধু
একটি আঁটি ধান।
নাহয় হবে, ঘেঁষাঘেঁষি,
এমন কিছু নয় সে বেশি,
নাহয় কিছু ভারী হবে
আমার তরীখান—
তাই বলে কি ফিরবে তুমি
আছে, আছে স্থান !

এসো, এসো নায়ে !
ধুলা যদি থাকে কিছু
থাক্-না ধুলা পায়ে।
তনু তোমার তনুলতা,
চোখের কোণে চঞ্চলতা,
সজলনীল-জলদ-বরন
বসনখানি গায়ে—
তোমার তরে হবে গো ঠাঁই—
এসো এসো নায়ে।

যাত্রী আছে নানা,
নানা ঘাটে যাবে তারা
কেউ কারো নয় জানা।
তুমিও গো ক্ষণেক-তরে
বসবে আমার তরী-'পরে,

যাত্রা যখন ফুরিয়ে য্যবে,
মান্‌বে না মোর মানা—
এলে যদি তুমিও এসো,
যাত্রী আছে নানা।

কোথা তোমার স্থান ?
কোন্ গোলাতে রাখতে যাবে
একটি আঁটি ধান ?
বলতে যদি না চাও তবে
শুনে আমার কী ফল হবে,
ভাবব ব'সে খেয়া যখন
করব অবসান—
কোন্ পাড়াতে যাবে তুমি
কোথা তোমার স্থান ?

এক গাঁয়ে

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ,
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখি
তাহার গানে আমার নাচে বুক।

তাহার দুটি পালন-করা ভেড়া
চরে বেড়ায় মোদের বটমূলে,
যদি ভাঙে আমার খেতের বেড়া
কোলের 'পরে নিই তাহারে তুলে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচ জনে—
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

দুইটি পাড়ায় বড়োই কাছাকাছি,
মাঝে শুধু একটি মাঠের ফাঁক—
তাদের বনের অনেক মধুমাছি
মোদের বনে বাঁধে মধুর চাক।
তাদের ঘাটে পূজার জবামালা
ভেসে আসে মোদের বাঁধা ঘাটে,
তাদের পাড়ার কুসুম-ফুলের ডালা
বেচতে আসে মোদের পাড়ার হাটে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচ জনে—
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

আমাদের এই গ্রামের গলি-'পরে
আমের বোলে ভরে আমের বন,
তাদের খেতে যখন তিসি ধরে
মোদের খেতে তখন ফোটে শণ।
তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে।
তাদের বনে ঝরে শ্রাবণধারা,
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচ জনে—
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

দুই তীরে

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চকাচকীর ঘর।

যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশী সব
হাঁসের বসবাস।

কচ্ছপেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে,
দু-একখানি জেলের ডিঙি
সন্ধেবেলায় ভিড়ে।

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চকাচকীর ঘর।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

যেথায় বাঁকা গলি
নদীতে যায় চলি,
দুই ধারে তার বেণুবনের
শাখায় গলাগলি।

সকাল-সন্ধেবেলা
ঘাটে বধূর মেলা,
ছেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে ভাসায় ভেলা।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি।

আমি শুনি শুয়ে
বিজন বালু-ভুঁয়ে,
তুমি শোন কাঁখের কলস
ঘাটের 'পরে থুয়ে।

তুমি তাহার গানে
বোঝ একটা মানে,
আমার কূলে আরেক অর্থ
ঠেকে আমার কানে।

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি।

অতিথি

ওই শোনো গো, অতিথ বুঝি আজ
এল আজ ।
ওগো বধূ, রাখো তোমার কাজ
রাখো কাজ ।

শুনছ না কি তোমার গৃহদ্বারে
রিনিঠিনি শিকলটি কে নাড়ে,
এমন ভরা সাঁঝ !
পায়ে পায়ে বাজিয়ো নাকো মল,
ছুটো নাকো চরণ চঞ্চল,
হঠাৎ পাবে লাজ ।

ওই শোনো গো, অতিথ এল আজ
এল আজ ।
ওগো বধূ, রাখো তোমার কাজ
রাখো কাজ ।

নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়
কভু নয় ।
ওগো বধূ, মিছে কিসের ভয়
মিছে ভয় !

আঁধার কিছু নাইকো আঙিনাতে,
আজকে দেখো ফাগুন-পূর্ণিমাতে
আকাশ আলোময় ।
নাহয় তুমি মাথার ঘোমটা টানি
হাতে নিয়ো ঘরের প্রদীপখানি
যদি শঙ্কা হয় ।

নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়
কভু নয় ।
ওগো বধূ, মিছে কিসের ভয়
মিছে ভয় !

নাহয় কথা কোয়ো না তার সনে
পান্থ-সনে ।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে
দুয়ার-কোণে ।

প্রশ্ন যদি শুধায় কোনো-কিছু
নীরব থেকো মুখটি করে নিচু
নম্র দু-নয়নে।
কাঁকন যেন ঝংকারে না হাতে,
পথ দেখিয়ে আনবে যবে সাথে
অতিথিসজ্জনে।

নাহয় কথা কোয়ো না তার সনে
পান্থ-সনে।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে
দুয়ার-কোণে।

ওগো বধূ, হয় নি তোমার কাজ
গৃহ-কাজ ?
ওই শোনো কে অতিথ এল আজ
এল আজ।

সাজাও নি কি পূজারতির ডালা ?
এখনো কি হয় নি প্রদীপ জ্বালা
গোষ্ঠগৃহের মাঝ ?
অতি যত্নে সীমন্তটি চিরে
সিঁদুর-বিন্দু আঁক নাই কি শিরে ?
হয় নি সন্ধ্যাসাজ ?

ওগো বধূ, হয় নি তোমার কাজ
গৃহ-কাজ ?
ওই শোনো কে অতিথ এল আজ
এল আজ।

সম্বরণ

আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।
আজকে কেবল বউ-কথা-কও ডাকে
কৃষ্ণচূড়ার পুষ্প-পাগল শাখে—
আমি আছি তরুর তলায় পা মেলি,
সামনে অশোক টগর চাঁপা চামেলি।

আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

এমনিতরো বাতাস-বওয়া সকালে
নিজেরে মন হাজারো বার ঠকালে।
আপনারে হায় চিত-উদাস গানে
উড়িয়ে দিলে অজানিতের পানে,
চিরদিন যা ছিল নিজের দখলে
দিয়ে দিলে পথের পান্থ সকলে।

আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

ভেবেছি তাই আজকে কিছুই গাব না
গানের সঙ্গে গলিয়ে প্রাণের ভাবনা।
আপনা ভুলে ওরে ভাবোন্মাদ,
দিস নে ভেঙে তোর বেদনা-বাঁধ—
মনের সঙ্গে মনের কথা গাঁথা সে।
গাব না গান আজকে দখিন বাতাসে।

আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

শিলাইদহ
২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

বিরহ

তুমি যখন চলে গেলে
তখন দুই-পহর—
সূর্য তখন মাঝ-গগনে,
রৌদ্র খরতর।
ঘরের কর্ম সাঙ্গ করে
ছিলেম তখন একলা ঘরে,
আপন-মনে বসে ছিলেম
বাতায়নের 'পর।
তুমি যখন চলে গেলে
তখন দুই-পহর।

চৈত্র মাসের নানা খেতের
নানা গন্ধ নিয়ে
আসতেছিল তপ্ত হাওয়া
মুক্ত দুয়ার দিয়ে।
দুটি ঘুঘু সারাটা দিন
ডাকতেছিল শ্রান্তিবিহীন,

একটি ভ্রমর ফিরতেছিল
কেবল গুন্‌গুনিয়ে
চৈত্র মাসের নানা খেতের
নানা বার্তা নিয়ে।

তখন পথে লোক ছিল না,
ক্লান্ত কাতর গ্রাম।
ঝাউশাখাতে উঠতেছিল
শব্দ অবিশ্রাম।
আমি শুধু একলা প্রাণে
অতি সুদূর বাঁশির তানে
গেঁথেছিলেম আকাশ ভ'রে
একটি কাহার নাম।
তখন পথে লোক ছিল না,
ক্লান্ত কাতর গ্রাম।

ঘরে ঘরে দুয়ার দেওয়া,
আমি ছিলেম জেগে—
আবাঁধা চুল উড়তেছিল
উদাস হাওয়া লেগে।
তটতরুর ছায়ার তলে
ঢেউ ছিল না নদীর জলে,
তপ্ত আকাশ এলিয়ে ছিল
শুভ্র অলস মেঘে।
ঘরে ঘরে দুয়ার দেওয়া,
আমি ছিলেম জেগে।

তুমি যখন চলে গেলে
তখন দুই-পহর,
শুষ্ক পথে দগ্ধ মাঠে
রৌদ্র খরতর।
নিবিড়-ছায়া বটের শাখে
কপোত দুটি কেবল ডাকে
একলা আমি বাতায়নে—
শূন্য শয়ন-ঘর।
তুমি যখন গেলে তখন
বেলা দুই-পহর।

শিলাইদহ
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

ক্ষণেক দেখা

চলেছিলে পাড়ার পথে
কলস লয়ে কাঁখে,
একটুখানি ফিরে কেন
দেখলে ঘোমটা-ফাঁকে ?
ওইটুকু যে চাওয়া
দিল একটু হাওয়া
কোথা তোমার ও পার থেকে
আমার এ পার-'পরে।
অতি দূরের দেখাদেখি
অতি ক্ষণেক-তরে।

আমি শুধু দেখেছিলেম
তোমার দুটি আঁখি—
ঘোমটা-ফাঁদা আঁধার-মাঝে
ত্রস্ত দুটি পাখি।
তুমি এক নিমিখে
চেয়ে আমার দিকে
পথের একটি পথিকেরে
দেখলে কতখানি
একটুমাত্র কৌতূহলে
একটি দৃষ্টি হানি ?

যেমন ঢাকা ছিলে তুমি
তেমনি রইলে ঢাকা,
তোমার কাছে যেমন ছিনু
তেমনি রইনু ফাঁকা !
তবে কিসের তরে
থামলে লীলাভরে
যেতে যেতে পাড়ার পথে
কলস লয়ে কাঁখে ?
একটুখানি ফিরে কেন
দেখলে ঘোমটা-ফাঁকে ?

দার্জিলিং
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

অকালে

ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস,
পসরা লয়ে ?
সন্ধ্যা হল, ওই-যে বেলা
গেল রে বয়ে।

যে যার বোঝা মাথার 'পরে
ফিরে এল আপন ঘরে,
একাদশীর খণ্ড শশী
উঠল পল্লীশিরে।
পারের গ্রামে যারা থাকে
উচ্চকণ্ঠে নৌকা ডাকে,
হাহা করে প্রতিধ্বনি
নদীর তীরে তীরে।

কিসের আশে ঊর্ধ্বশ্বাসে
এমন সময়ে
ভাঙা হাটে তুই ছুটেছিস
পসরা লয়ে?
সুপ্তি দিল বনের শিরে
হস্ত বুলায়ে,
কা কা ধ্বনি থেমে গেল
কাকের কুলায়ে।

বেড়ার ধারে পুকুর-পাড়ে
ঝিল্লি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে,
বাতাস ধীরে পড়ে এল,
স্তব্ধ বাঁশের শাখা—
হেরো ঘরের আঙিনাতে
শ্রান্তজনে শয়ন পাতে,
সন্ধ্যাপ্রদীপ আলোক ঢালে
বিরাম-সুধা-মাখা।

সকল চেষ্টা শান্ত যখন
এমন সময়ে
ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস
পসরা লয়ে?

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

আষাঢ়

নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে।

বাদলের ধারা ঝরে ঝর-ঝর,
আউশের খেত জলে ভর-ভর,
কালি-মাখা মেঘে ও পারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ্ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে।

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি ?
রাখাল-বালক কী জানি কোথায়
সারাদিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।

শোনো শোনো ওই পারে যাবে ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল
ছলছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।

ওগো, আজ তোরা যাস নে গো তোরা
যাস নে ঘরের বাহিরে—
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর
নাহি রে।
ঝর-ঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন
পথপাশে দেখ্ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে।

[শিলাইদহ]
২০ জ্যৈষ্ঠ [১৩০৭]

দুই বোন

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে ?
দেখেছে কি তারা পথিক কোথায়
দাঁড়িয়ে পথের প্রান্তে ?
ছায়ায় নিবিড় বনে
যে আছে আঁধার কোণে
তারে যে কখন কটাক্ষে চায়
কিছু তো পারি নে জানতে।
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে ?

দুটি বোন তারা করে কানাকানি
কী না জানি জল্পনা !
গুঞ্জনধ্বনি দূর হতে শুনি,
কী গোপন মন্ত্রণা !
আসে যবে এইখানে
চায় দোঁহে দোঁহাপানে,
কাহারও মনের কোনো কথা তারা
করেছে কি কল্পনা ?
দুটি বোন তারা করে কানাকানি
কী না জানি জল্পনা !

এইখানে এসে ঘট হতে কেন
জল উঠে উচ্ছলি ?
চপল চক্ষে তরল তারকা
কেন উঠে উজ্জ্বলি ?
যেতে যেতে নদীপথে
জেনেছে কি কোনোমতে
কাছে কোথা এক আকুল হৃদয়
দুলে উঠে চঞ্চলি ?
এইখানে এসে ঘট হতে জল
কেন উঠে উচ্ছলি ?

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে ?
বটের ছায়ায় কেহ কি তাদের
পড়েছে চোখের প্রান্তে ?
কৌতুকে কেন ধায়
সচকিত দ্রুত পায় ?

কলসে কাঁকন ঝলকি ঝনকি
ভোলায় রে দিক্‌ভ্রান্তে।
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে ?

শিলাইদহ
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

নববর্ষা

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয়
নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ ;
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে !

গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে, গরজে
গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে, নয়নে
লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।

ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে, কবরী
এলায়ে ?

ওগো, নবঘন নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি ?
তড়িৎ-শিখার চকিত আলোকে
ওগো, কে ফিরিছে খেলায়ে ?
ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে ?

ওগো, নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে ব'সে অমল বসনে, শ্যামল
বসনে ?
সুদূর গগনে কাহারে সে চায় ?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায় ?
নবমালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।
ওগো, নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে ব'সে শ্যামল বসনে ?

ওগো, নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে, দোদুল
দুলিছে ?
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক—
কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো, নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে ?

বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে
কে বেঁধেছে তার তরণী, তরুণ
তরণী ?
রাশি রাশি তুলি শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল,
বাদলরাগিণী সজলনয়নে
গাহিছে পরানহরণী।
বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে
বেঁধেছে তরুণ তরণী।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয়
নাচে রে।

ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে।

শিলাইদহ
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

দুর্দিন

এতদিন পরে প্রভাতে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে।
ঝড় হয়ে গেছে কাল রজনীতে
রজনীগন্ধাবনে।
কাননের পথ ভেসে গেছে জলে,
বেড়াগুলি ভেঙে পড়েছে ভূতলে,
নব ফুটন্ত ফুলের দণ্ড
লুটায় তৃণের সনে।
এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে।

হেরো গো আজিও প্রভাত অরুণ
মেঘের আড়ালে হারা,
রহি রহি আজো ঘনায়ে ঘনায়ে
ঝরিছে বাদলধারা।
মাতাল বাতাস আজো থাকি থাকি
চেতিয়া চেতিয়া উঠে ডাকি ডাকি,
জড়িত পাখায় সিক্ত শাখায়
দোয়েল দেয় না সাড়া।
আজিও আঁধার প্রভাতে অরুণ
মেঘের আড়ালে হারা।

এ ভরা বাদলে আর্দ্র আঁচলে
একেলা এসেছ আজি,
এনেছ বহিয়া রিক্ত তোমার
পূজার ফুলের সাজি।
এত মধুমাস গেছে বার বার—
ফুলের অভাব ঘটে নি তোমার,
বন আলো করি ফুটেছিল যবে
রজনীগন্ধারাজি।

এ ভরা বাদলে আর্দ্র আঁচলে
একেলা এসেছ আজি ।

আজি তরুতলে দাঁড়ায়েছে জল,
কোথা বসিবার ঠাঁই ?
কাল যাহা ছিল সে ছায়া সে আলো
সে গন্ধগান নাই ।
তবু ক্ষণকাল রহো ত্বরাহীন,
ছিন্ন কুসুম পঙ্কে মলিন
ভূতল হইতে যতনে তুলিয়া
ধুয়ে ধুয়ে দিব তাই ।
আজি তরুতলে দাঁড়ায়েছে জল,
কোথা বসিবার ঠাঁই ?

এত দিন পরে তুমি যে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে ।
প্রভাত আজিকে অরুণবিহীন,
কুসুম লুটায় বনে ।
যাহা আছে লও প্রসন্ন করে,
ও সাজি তোমার ভরে কি না ভরে—
ওই যে আবার নামে বারিধার
ঝরঝর বরষনে ।
এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে ।

১ আষাঢ়

অবিনয়

হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে
করিয়ো ক্ষমা ।
এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত
কানন-'পরে—
নবকদম্ব মদিরগন্ধে
আকুল করে ।

হে নিরুপমা,
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ
করিয়ো ক্ষমা ।

হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে
বিজুলি চমকি ওঠে খনে খনে,
বাতায়নে তব দ্রুত কৌতুকে
মারিছে উঁকি—
বাতাস করিছে দুরন্তপনা
ঘরেতে ঢুকি।

হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান
করিয়ো ক্ষমা।
ঝরঝর ধারা আজি উতরোল,
নদীকূলে-কূলে উঠে কল্লোল,
বনে বনে গাহে মর্মরস্বরে
নবীন পাতা—
সজল পবন দিশে দিশে তুলে
বাদলগাথা।

হে নিরুপমা,
আজিকে আচারে ত্রুটি হতে পারে,
করিয়ো ক্ষমা।
দিবালোকহারা সংসারে আজ
কোনোখানে কারও নাহি কোনো কাজ,
জনহীন পথ ধেনুহীন মাঠ
যেন সে আঁকা—
বর্ষণঘন শীতল আঁধারে
জগৎ ঢাকা।

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে
করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দুখানি কালো আঁখি-'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা।
তোমারি ললাটে নববরষার
বরণডালা।

[শিলাইদহ]
১ আষাঢ় [১৩০৭]

কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে
ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটির হতে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশ-পানে হানি যুগল ভুরু
শুনলে বারেক মেঘের গুরুগুরু।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,
ধানের খেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে
আমিই জানি আর জানে সে মেয়ে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

এমনি করে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এমনি করে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল-বনে।
এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।

মাথার 'পরে দেয় নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায় নি অবকাশ।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

[শিলাইদহ]
৪ আষাঢ় [১৩০৭]

ভর্ৎসনা

মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে !
আমি তোমার পাড়ার প্রান্ত দিয়ে
চলেছিলেম আপন গৃহদ্বারে—
যেথা আমার বাঁধা ঘাটের কাছে
দুটি চাঁপায় ছায়া করে আছে,
জামের শাখা ফলে-আঁধার-করা
স্বচ্ছগভীর পদ্মদিঘির ধারে।
তুমি আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে !

আজ তো আমি মাটির পানে চেয়ে
দীনবেশে যাই নি তোমার ঘরে।
অতিথ হয়ে দিই নি দ্বারে সাড়া,
ভিক্ষাপাত্র নিই নি কাতর-করে।
আমি আমার পথে যেতে যেতে
তোমার ঘরের দ্বারের বাহিরেতে
ঘনশ্যামল তমাল-তরুমূলে
দাঁড়িয়েছি এই দণ্ড-দুয়ের তরে।
নতশিরে দুখানি হাত জুড়ি
দীনবেশে যাই নি তোমার ঘরে।

আমি তোমার ফুল্ল পুষ্পবনে
তুলি নাই তো যূথীর একটি দল।
আমি তোমার ফলের শাখা হতে
ক্ষুধাভরে ছিঁড়ি নাই তো ফল।
আছি শুধু পথের প্রান্তদেশে
দাঁড়ায় যেথা সকল পান্থ এসে,
নিয়েছি এই শুধু গাছের ছায়া—
পেয়েছি এই তরুণ তৃণতল।
আমি তোমার ফুল্ল পুষ্পবনে
তুলি নাই তো যূথীর একটি দল।

শ্রান্ত বটে আছে চরণ মম,
পথের পঙ্ক লেগেছে দুই পায়।
আষাঢ়-মেঘে হঠাৎ এল ধারা
আকাশ-ভাঙা বিপুল বরষায়।
ঝোড়ো হাওয়ার এলোমেলো তালে
উঠল নৃত্য বাঁশের ডালে ডালে,
ছুটল বেগে ঘন মেঘের শ্রেণী
ভগ্নরণে ছিন্নকেতুর প্রায়।
শ্রান্ত বটে আছে চরণ মম,
পথের পঙ্ক লেগেছে দুই পায়।

কেমন করে জানব মনে আমি
কী যে আমায় ভাবলে মনে মনে।
কাহার লাগি একলা ছিলে বসে
মুক্তকেশে আপন বাতায়নে।
তড়িৎশিখা ক্ষণিক দীপ্তালোকে
হানতেছিল চমক তোমার চোখে,
জানত কে বা দেখতে পাবে তুমি
আছি আমি কোথায় যে কোন্ কোণে।
কেমন করে জানব মনে আমি
আমায় কী যে ভাবলে মনে মনে।

বুঝি গো দিন ফুরিয়ে গেল আজি,
এখনো মেঘ আছে আকাশ ভরে।
থেমে এল বাতাস বেণুবনে,
মাঠের 'পরে বৃষ্টি এল ধরে।
তোমার ছায়া দিলেম তবে ছাড়ি,
লও গো তোমার ভূমি-আসন কাড়ি,
সন্ধ্যা হল— দুয়ার করো রোধ,
যাব আমি আপন পথ-'পরে।
বুঝি গো দিন ফুরিয়ে গেল আজি,
এখনো মেঘ আছে আকাশ ভরে।

মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে!
আছে আমার নতুন-ছাওয়া ঘর
পাড়ার পরে পদ্মদিঘির ধারে।
কুটিরতলে দিবস হলে গত
জ্বলে প্রদীপ ধ্রুবতারার মতো,

আমি কারো চাই নে কোনো দান
কাঙালবেশে কোনো ঘরের দ্বারে।
মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে !

শিলাইদহ
৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

সুখদুঃখ

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা—
সকাল থেকে বাদল হল,
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা
যত খুশি যতই নেশা
সবার চেয়ে আনন্দময়
ওই মেয়েটির হাসি—
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।

বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দস্বরে।
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে।

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি
লোকের নাহি শেষ,
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মতো,
ওই-যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান-পানে চাহি—
একটি রাঙা লাঠি কিনবে
একটি পয়সা নাহি।

চেয়ে আছে নিমেষহারা,
নয়ন অরুণ—
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

শিলাইদহ
৩১ জ্যৈষ্ঠ। স্নানযাত্রা

খেলা

মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে
ছেলেবেলা,
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।
বৃষ্টি পড়ে দিবস-রাতি,
ছিল না কেউ খেলার সাথি,
একলা বসে পেতেছিলেম
সাধের খেলা।
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।

হঠাৎ হল দ্বিগুণ আঁধার
ঝড়ের মেঘে,
হঠাৎ বৃষ্টি নামল কখন
দ্বিগুণ বেগে।
ঘোলা জলের স্রোতের ধারা
ছুটে এল পাগল-পারা
পাতার ভেলা ডুবল নালার
তুফান লেগে—
হঠাৎ বৃষ্টি নামল যখন
দ্বিগুণ বেগে।

সেদিন আমি ভেবেছিলেম
মনে মনে,
হতবিধির যত বিবাদ
আমার সনে।
ঝড় এল যে আচম্বিতে
পাতার ভেলা ডুবিয়ে দিতে,
আর কিছু তার ছিল না কাজ
ত্রিভুবনে।
হতবিধির যত বিবাদ
আমার সনে।

আজ আষাঢ়ে একলা ঘরে
কাটল বেলা,
ভাবতেছিলেম এত দিনের
নানান খেলা।
ভাগ্য-'পরে করিয়া রোষ
দিতেছিলেম বিধিরে দোষ—

পড়ল মনে, নালার জলে
পাতার ভেলা।
ভাবতেছিলেম এত দিনের
নানান খেলা।

৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

কৃতার্থ

এখনো ভাঙে নি ভাঙে নি মেলা,
নদীর তীরের মেলা।
এ শুধু আষাঢ়-মেঘের আঁধার,
এখনো রয়েছে বেলা।
ভেবেছিনু দিন মিছে গোঙালেম,
যাহা ছিল বুঝি সবই খোয়ালেম,
আছে আছে তবু, আছে ভাই, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে আজ ঘটে নাই
কেবলি ফাঁকি।

বেচিবার যাহা বেচা হয়ে গেছে
কিনিবার যাহা কেনা,
আমি তো চুকিয়ে দিয়েছি নিয়েছি
সকল পাওনা দেনা।
দিন না ফুরাতে ফিরিব এখন—
প্রহরী চাহিছ পসরার পণ?
ভয় নাই ওগো, আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
কেবলি ফাঁকি।

কখন বাতাস মাতিয়া আবার
মাথায় আকাশ ভাঙে!
কখন সহসা নামিবে বাদল,
তুফান উঠিবে গাঙে!
তাই ছুটাছুটি চলিয়াছি ধেয়ে—
পারানির কড়ি চাহ তুমি নেয়ে?
কিসের ভাবনা, আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
কেবলি ফাঁকি।

ধান-খেত বেয়ে বাঁকা পথখানি,
    গিয়েছে গ্রামের পারে ।
বৃষ্টি আসিতে দাঁড়ায়েছিলেম
    নিরালা কুটিরদ্বারে ।
থামিল বাদল, চলিনু এবার—
হে দোকানি, চাও মূল্য তোমার ?
ভয় নাই ভাই, আছে আছে, কিছু
    রয়েছে বাকি ।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
    সকলি ফাঁকি ।

পথের প্রান্তে বটের তলায়
    বসে আছ এইখানে—
হায় গো ভিখারি, চাহিছ কাতরে
    আমারো মুখের পানে !
ভাবিতেছ মনে বেচা-কেনা সেরে
কত লাভ করে চলিয়াছে কে রে !
আছে আছে বটে, আছে ভাই, কিছু
    রয়েছে বাকি ।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
    সকলি ফাঁকি ।

আঁধার রজনী, বিজন এ পথ,
    জোনাকি চমকে গাছে ।
কে তুমি আমার সঙ্গ ধরেছ,
    নীরবে চলেছ পাছে ?
এ ক'টি কড়ির মিছে ভার বওয়া,
তোমাদের প্রথা কেড়েকুড়ে লওয়া—
হবে না নিরাশ; আছে আছে, কিছু
    রয়েছে বাকি ।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
    কেবলি ফাঁকি ।

নিশি দু-পহর, পঁহুছিনু ঘর
    দু হাত রিক্ত করি,
তুমি আছ একা সজলনয়নে
    দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি ।
চোখে ঘুম নাই, কথা নাই মুখে,
ভীতপাখিসম এলে মোর বুকে—

আছে আছে বিধি, এখনো অনেক
রয়েছে বাকি ।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
সকলি ফাঁকি ।

২ আষাঢ় [১৩০৭]

স্থায়ী-অস্থায়ী

তুলেছিলেম কুসুম তোমার
হে সংসার, হে লতা !
পরতে মালা বিঁধল কাঁটা
বাজল বুকে ব্যথা,
হে সংসার, হে লতা !
বেলা যখন পড়ে এল,
আঁধার এল ছেয়ে,
দেখি তখন চেয়ে—
তোমার গোলাপ গেছে, আছে
আমার বুকের ব্যথা,
হে সংসার, হে লতা !

আরো তোমার অনেক কুসুম
ফুটবে যথা-তথা—
অনেক গন্ধ, অনেক মধু,
অনেক কোমলতা,
হে সংসার, হে লতা !
সে ফুল তোলার সময় তো আর
নাহি আমার হাতে ।
আজকে আঁধার রাতে
আমার গোলাপ গেছে, কেবল
আছে বুকের ব্যথা,
হে সংসার, হে লতা !

রেলগাড়ি । দার্জিলিং-পথে
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

উদাসীন

হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি,
ছুটি নে কাহারো পিছুতে ।
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই
কিছুতে ।

নির্ভয়ে ধাই সুযোগ-কুযোগ বিছুরি,
খেয়াল-খবর রাখি নে তো কোনো-কিছুরি—
উপরে চড়িতে যদি নাই পাই সুবিধা
সুখে পড়ে থাকি নিচুতেই, থাকি
নিচুতে।
হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি
ছুটি নে কাহারো পিছুতে—
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই
কিছুতে।

যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই—
ছাড়ি নেকো ভাই, ছাড়ি নে।
তাই ব'লে কিছু কাড়াকাড়ি ক'রে
কাড়ি নে।
যাহা যেতে চায় ছেড়ে দিই তারে তখুনি,
বকি নে কারেও, শুনি নে কাহারো বকুনি—
কথা যত আছে মনের তলায় তলিয়ে
ভুলেও কখনো সহসা তাদের
নাড়ি নে।
যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই—
ছাড়ি নেকো ভাই, ছাড়ি নে।
তাই ব'লে কিছু তাড়াতাড়ি ক'রে
কাড়ি নে।

মন-দে'য়া-নে'য়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে—
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে
চরণে।
আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে,
সাধিয়া মরেছি ইঁহারে তাঁহারে উঁহারে—
অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা,
রাঙিয়াছি তাহা হৃদয়-শোণিত-
বরনে।
মন-দে'য়া-নে'য়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে—
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে
চরণে।

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি,
মন ফেলে তাই ছুটেছি ;
তাড়াতাড়ি ক'রে খেলাঘরে এসে
জুটেছি।

বুকভাঙা বোঝা নেব না রে আর তুলিয়া,
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া—
যাঁর বেড়ি তাঁরে ভাঙা বেড়িগুলি ফিরায়ে
বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ
উঠেছি।
এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি
মন ফেলে তাই ছুটেছি।
তাড়াতাড়ি ক'রে খেলাঘরে এসে
জুটেছি।

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে—
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম
চয়নে।
মধুকরসম ছিনু সঞ্চয়প্রয়াসী ;
কুসুমকান্তি দেখি নাই, মধু-পিয়াসী—
বকুল কেবল দলিত করেছি আলসে
ছিলাম যখন নিলীন বকুল-
শয়নে।
কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে—
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম
চয়নে।

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি,
মন নাহি মোর কিছুতে ;
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি
পিছুতে।
সবলে কারেও ধরি নে বাসনা-মুঠিতে,
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে—
যখনি ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে
নিচুতে।
দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি,
মন নাহি মোর কিছুতে—
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি
পিছুতে।

[শিলাইদহ
১০ ?/ বৈশাখ ১৩০৭]

যৌবনবিদায়

ওগো যৌবনতরী,
এবার বোঝাই সাঙ্গ করে দিলেম বিদায় করি।
কতই খেয়া, কতই খেয়াল,
কতই-না দাঁড়-বাওয়া—
তোমার পালে লেগেছিল
কত দখিন হাওয়া!
কত ঢেউয়ের টল্‌মলানি
কত স্রোতের টান—
পূর্ণিমাতে সাগর হতে
কত পাগল বান!
এ পার হতে ও পার ছেয়ে
ঘন মেঘের সারি,
শ্রাবণ-দিনে ভরা গাঙে
দু-কূল-হারা পাড়ি।
অনেক খেলা, অনেক মেলা
সকলি শেষ ক'রে
চল্লিশেরই ঘাটের থেকে
বিদায় দিনু তোরে।

ওগো তরুণ তরী,
যৌবনেরি শেষ কটি গান দিনু বোঝাই করি।
সে-সব দিনের কান্না হাসি,
সত্য মিথ্যা ফাঁকি,
নিঃশেষিয়ে যাস রে নিয়ে
রাখিস নে আর বাকি।
নোঙর দিয়ে বাঁধিস নে আর
চাহিস নে আর পাছে—
ফিরে ফিরে ঘুরিস নে আর
ঘাটের কাছে কাছে।
এখন হতে ভাঁটার স্রোতে
ছিন্ন পালটি তুলে
ভেসে যা রে স্বপ্ন-সমান
অস্তাচলের কূলে।
সেথায় সোনা-মেঘের ঘাটে
নামিয়ে দিয়ো শেষে
বহুদিনের বোঝা তোমার
চিরনিদ্রার দেশে।

ওরে আমার তরী,
পারে যাবার উঠল হাওয়া, ছোট্‌ রে ত্বরা করি।

যেদিন খেয়া ধরেছিলেম
ছায়াবটের ধারে,
ভোরের সুরে ডেকেছিলেম
'কে যাবি আয় পারে'।
ভেবেছিলেম ঘাটে ঘাটে
করতে আনাগোনা
এমন চরণ পড়বে নায়ে
নৌকো হবে সোনা।
এতবারের পারাপারে,
এত লোকের ভিড়ে,
সোনা-করা দুটি চরণ
দেয় নি পরশ কি রে?
যদি চরণ পড়ে থাকে
কোনো একটি বারে
যা রে সোনার জন্ম নিয়ে
সোনার মৃত্যু-পারে।

শেষ হিসাব

সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার
সময় হল হিসাব নেবার।
যে দেব্‌তারে গড়েছিলেম,
দ্বারে যাঁদের পড়েছিলেম,
আয়োজনটা করেছিলেম
জীবন দিয়ে চরণ সেবার—
তাঁদের মধ্যের আজ সায়াহ্নে
কে বা আছেন এবং কে নেই,
কেই বা বাকি কেই বা ফাঁকি,
ছুটি নেব সেইটে জেনেই।

নাই বা জানলি হায় রে মূর্খ!
কী হবে তোর হিসাব সূক্ষ্ম!
সন্ধ্যা এল, দোকান তোলো,
পারের নৌকা তৈরি হল—
যত পার ততই ভোলো
বিফল সুখের বিরাট দুঃখ।
জীবনখানা খুললে তোমার
শূন্য দেখি শেষের পাতা—
কী হবে ভাই, হিসেব নিয়ে,
তোমার নয়কো লাভের খাতা।

আপনি আঁধার ডাকছে তোরে,
ঢাকছে তোমায় দয়া ক'রে।
তুমি তবে কেনই জ্বাল
মিট্‌মিটে ওই দীপের আলো!
চক্ষু মুদে থাকাই ভালো
শ্রান্ত, পথের প্রান্তে প'ড়ে।
জানাজানির সময় গেছে,
বোঝাপড়া কর্ রে বন্ধ।
অন্ধকারের স্নিগ্ধ কোলে
থাক্ রে হয়ে বধির অন্ধ।

যদি তোমায় কেউ না রাখে,
সবাই যদি ছেড়েই থাকে—
জনশূন্য বিশাল ভবে
একলা এসে দাঁড়াও তবে,
তোমার বিশ্ব উদার রবে
হাজার সুরে তোমায় ডাকে।
আঁধার রাতে নির্নিমেষে
দেখতে দেখতে যাবে দেখা,
তুমি একা জগৎ-মাঝে,
প্রাণের মাঝে আরেক একা।

ফুলের দিনে যে মঞ্জরী
ফলের দিন যাক সে ঝরি।
মরিস নে আর মিথ্যে ভেবে,
বসন্তেরই অন্তে এবে
যারা যারা বিদায় নেবে
একে একে যাক রে সরি।
হোক রে তিক্ত মধুর কণ্ঠ,
হোক রে রিক্ত কল্পলতা—
তোমার থাকুক পরিপূর্ণ
একলা থাকার সার্থকতা।

শেষ

থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে চলে
কালের পিছু পিছু।
অধিক দিন তো বইতে হয় না
শুধু একটি প্রাণ।

অনন্ত কাল একই কবি
গায় না একই গান ।
মালা বটে শুকিয়ে মরে—
যে জন মালা পরে
সেও তো নয় অমর, তবে
দুঃখ কিসের তরে ?
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না ভাই কিছু ।
সেই আনন্দে যাও রে চলে
কালের পিছু পিছু ।

সবই হেথায় একটা কোথাও
করতে হয় রে শেষ,
গান থামিলে তাই তো কানে
থাকে গানের রেশ ।
কাটলে বেলা সাধের খেলা
সমাপ্ত হয় ব'লে
ভাব্‌নাটি তার মধুর থাকে
আকুল অশ্রুজলে ।
জীবন অস্তে যায় চলি, তাই
রঙটি থাকে লেগে,
প্রিয়জনের মনের কোণে
শরৎ-সন্ধ্যা-মেঘে ।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না ভাই কিছু ।
সেই আনন্দে যাও রে ধেয়ে
কালের পিছু পিছু ।

ফুল তুলি তাই তাড়াতাড়ি,
পাছে ঝ'রেই পড়ে ।
সুখ নিয়ে তাই কাড়াকাড়ি,
পাছে যায় সে স'রে ।
রক্ত নাচে দ্রুতচ্ছন্দে,
চক্ষে তড়িৎ ভায়,
চুম্বনেরে কেড়ে নিতে
অধর ধেয়ে যায় ।
সমস্ত প্রাণ জাগে রে তাই,
বক্ষ-দোলায় দোলে—
বাসনাতে ঢেউ উঠে যায়
মত্ত আকুল রোলে ।

থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে চল্ রে ছুটে
কালের পিছু পিছু।

কোনো জিনিস চিনব যে রে,
প্রথম থেকে শেষ,
নেব যে সব বুঝে প'ড়ে—
নাই সে সময় লেশ।
জগৎটা যে জীর্ণ মায়া
সেটা জানার আগে
সকল স্বপ্ন কুড়িয়ে নিয়ে
জীবন-রাত্রি ভাগে।
ছুটি আছে শুধু দু দিন
ভালোবাসবার মতো—
কাজের জন্যে জীবন হলে
দীর্ঘজীবন হত।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে চল্ রে ছুটে
কালের পিছু পিছু।

আজ তোমাদের যেমন জানছি
তেমনি জানতে জানতে
ফুরায় যেন সকল জানা—
যাই জীবনের প্রান্তে।
এই যে নেশা লাগল চোখে
এইটুকু যেই ছোটে
অমনি যেন সময় আমার
বাকি না রয় মোটে।
জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিয়ে
যায় যদি যাক খুলি,
মর্তে যেন না ভেঙে যায়
মিথ্যে মায়াগুলি।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে চল্ রে ধেয়ে
কালের পিছু পিছু।

বিলম্বিত

অনেক হল দেরি,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

তখন ছিল দখিন হাওয়া
আধ-ঘুমো আধ-জাগা,
তখন ছিল সর্ষে-খেতে
ফুলের আগুন লাগা,
তখন আমি মালা গেঁথে
পদ্মপাতায় ঢেকে
পথে বাহির হয়েছিলেম
রুদ্ধ কুটির থেকে।

অনেক হল দেরি,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

বসন্তের সে মালা
আজ কি তেমন গন্ধ দেবে
নবীন-সুধা-ঢালা ?

আজকে বহে পুবে বাতাস,
মেঘে আকাশ জুড়ে—
ধানের খেতে ঢেউ উঠেছে
নব-নবাঙ্কুরে।
হাওয়ায় হাওয়ায় নাইকো রে হায়
হালকা সে হিল্লোল,
নাই বাগানে হাস্যে গানে
পাগল গণ্ডগোল।

অনেক হল দেরি,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

হল কালের ভুল
পুবে হাওয়ায় ধরে দিলেম
দখিন হাওয়ার ফুল।
এখন এল অন্য সুরে
অন্য গানের পালা,

এখন গাঁথো অন্য ফুলে
অন্য ছাঁদের মালা।
বাজছে মেঘের গুরু গুরু,
বাদল ঝরো ঝরো—
সজল বায়ে কদম্ববন
কাঁপছে থরোথরো।

অনেক হল দেরি,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

[শিলাইদহ]
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

মেঘমুক্ত

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয়—
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের
ভিজে পাতায়।
ঝিকিঝিকি করি কাঁপিতেছে বট,
ওগো ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট—
পথের দু ধারে শাখে শাখে আজি
পাখিরা গায়।
ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয়।

তোমাদের সেই ছায়া-ঘেরা দিঘি,
না আছে তল—
কূলে কূলে তার ছেপে ছেপে আজি
উঠেছে জল।
এ ঘাট হইতে ও ঘাটে তাহার
কথা-বলাবলি নাহি চলে আর
একাকার হল তীরে আর নীরে
তাল-তলায়।
আজ ভোর হতে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।

ঘাটে পইঠায় বসিবি বিরলে
ডুবায়ে গলা,
হবে পুরাতন প্রাণের কথাটি
নূতন বলা।

সে কথার সাথে রেখে রেখে মিল
থেকে থেকে ডেকে উঠিবে কোকিল,
কানাকানি করে ভেসে যাবে মেঘ
আকাশ-গায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।

তপন-আতপে আতপ্ত হয়ে
উঠেছে বেলা ;
খঞ্জন দুটি আলস্যভরে
ছেড়েছে খেলা।
কলস পাকড়ি আঁকড়িয়া বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে,
তিমিরনিবিড় ঘনঘোর ঘুমে
স্বপনপ্রায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।

মেঘ ছুটে গেল নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।
আজিকে সকালে শিথিল কোমল
বহিছে বায়।
পতঙ্গ যেন ছবিসম আঁকা
শৈবাল-'পরে মেলে আছে পাখা,
জলের কিনারে বসে আছে বক
গাছের ছায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।

শিলাইদহ
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

চিরায়মানা

যেমন আছ তেমনি এসো,
আর কোরো না সাজ।
বেণী নাহয় এলিয়ে রবে,
সিঁথে নাহয় বাঁকা হবে,
নাই বা হল পত্রলেখায়
সকল কারুকাজ।

কাঁচল যদি শিথিল থাকে
নাইকো তাহে লাজ ।
যেমন আছ তেমনি এসো,
আর কোরো না সাজ ।

এসো দ্রুত চরণ দুটি
তৃণের 'পরে ফেলে ।
ভয় কোরো না, অলক্তরাগ
মোছে যদি মুছিয়া যাক—
নূপুর যদি খুলে পড়ে
নাহয় রেখে এলে ।
খেদ কোরো না মালা হতে
মুক্তা খ'সে গেলে ।
এসো দ্রুত চরণ দুটি
তৃণের 'পরে ফেলে ।

হেরো গো, ওই আঁধার হল,
আকাশ ঢাকে মেঘে ।
ও পার হতে দলে দলে
বকের শ্রেণী উড়ে চলে,
থেকে থেকে শূন্য মাঠে
বাতাস ওঠে জেগে ।
ওই রে গ্রামের গোষ্ঠ-মুখে
ধেনুরা ধায় বেগে ।
হেরো গো, ওই আঁধার হল
আকাশ ঢাকে মেঘে ।

প্রদীপখানি নিবে যাবে,
মিথ্যা কেন জ্বাল ?
কে দেখতে পায় চোখের কাছে
কাজল আছে কি না আছে ?
তরল তব সজল দিঠি
মেঘের চেয়ে কালো ।
আঁখির পাতা যেমন আছে
এমনি থাকা ভালো ।
কাজল দিতে প্রদীপখানি
মিথ্যা কেন জ্বাল ?

এসো হেসে সহজ বেশে
আর কোরো না সাজ ।

গাঁথা যদি না হয় মালা
ক্ষতি তাহে নাই গো বালা,
ভূষণ যদি না হয় সারা
ভূষণে নাই কাজ।
মেঘে মগন পূর্ব-গগন
বেলা নাই রে আজ—
এসো হেসে সহজ বেশে,
নাই বা হল সাজ।

শিলাইদহ
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

আবির্ভাব

বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায় ;
এলে তুমি ঘন বরষায়।
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে
আজি নবঘন-বিপুল-মন্দ্রে
আমার পরানে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়
আজি জলভরা বরষায়।

দূরে একদিন দেখেছিনু তব
কনকাঞ্চল-আবরণ,
নবচম্পক-আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চলচপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ।
কোথা চম্পক-আভরণ!

সেদিন দেখেছি খনে খনে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,
নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল।
শুনেছিনু যেন মৃদু রিনি রিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিংকিণী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিশ্বাসপরিমল,
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল।

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয়সাগর-উপকূল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে বসে
গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার।
যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে,
বাজাতে শেখে নি সে গানের সুর
এ ছোটো বীণার ক্ষীণ তার—
এ নহে তোমার উপহার।

কে জানিত সেই ক্ষণিকা মুরতি
দূরে করি দিবে বরষন,
মিলাবে চপল দরশন ?
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ ?
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ,
বাসর-ঘরের দুয়ারে করালে
পূজার অর্ঘ্য-বিরচন—
একি রূপে দিলে দরশন।

ক্ষমা করো তবে ক্ষমা করো মোর
আয়োজনহীন পরমাদ,
ক্ষমা করো যত অপরাধ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটিরে
প্রদীপ-আলোকে এসো ধীরে ধীরে,
এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ—
ক্ষমা করো যত অপরাধ।

আস নাই তুমি নবফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায়,
এসো এসো ভরা বরষায়।
এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে,

এ পরান ভরি যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়
আজি জলভরা বরযায়।

[শিলাইদহ]
১০ আষাঢ় [১৩০৭]

কল্যাণী

বিরল তোমার ভবনখানি
পুষ্পকাননমাঝে,
হে কল্যাণী নিত্য আছ
আপন গৃহকাজে।
বাইরে তোমার আম্রশাখে
স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি
আকুল হর্ষভরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে,
পূজার সাজি ভরি,
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির
বরণডালা ধরি।
সদা তোমার ঘরের মাঝে
নীরব একটি শঙ্খ বাজে,
কাঁকন-দুটির মঙ্গলগীত
উঠে মধুর স্বরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

রূপসীরা তোমার পায়ে
রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায়
পরায় বরমালা!
ভালে তোমার আছে লেখা
পুণ্যধামের রশ্মিরেখা,
সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি
হাসে চোখের 'পরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

তোমার নাহি শীত বসন্ত,
জরা কি যৌবন—
সর্বঋতু সর্বকালে
তোমার সিংহাসন।
নিবে নাকো প্রদীপ তব,
পুষ্প তোমার নিত্য নব,
অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি
চির বিরাজ করে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

নদীর মতো এসেছিলে
গিরিশিখর হতে,
নদীর মতো সাগর-পানে
চল অবাধ স্রোতে।
একটি গৃহে পড়ছে লেখা
সেই প্রবাহের গভীর রেখা,
দীপ্ত শিরে পুণ্যশীতল
তীর্থসলিল ঝরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

তোমার শান্তি পান্থজনে
ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্যকুঞ্জবনে
কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল কত আকুল
মুকুল খসে পড়ে—
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে।

২৮ জ্যৈষ্ঠ

অন্তরতম

আমি যে তোমায় জানি, সে তো কেউ জানে না।
তুমি মোর পানে চাও, সে তো কেউ মানে না।
মোর মুখে পেলে তোমার আভাস
কত জনে কত করে পরিহাস,
পাছে সে না পারি সহিতে

নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়—
কেহ কিছু নারে কহিতে।

তোমার পথ যে তুমি চিনায়েছ
সে কথা বলি নে কাহারে।
সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তব দুয়ারে।
স্তব্ধ তোমার উদার আলয়,
বীণাটি বাজাতে মনে করি ভয়,
চেয়ে থাকি শুধু নীরবে।
চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
ফিরে আসি তবে গরবে।

প্রভাত না হতে কখন আবার
গৃহকোণ-মাঝে আসিয়া
বাতায়নে বসি বিহ্বল বীণা
বিজনে বাজাই হাসিয়া।
পথ দিয়ে যে বা আসে যে বা যায়
সহসা থমকি চমকিয়া চায়,
মনে করে তারে ডেকেছি—
জানে না তো কেহ কত নাম দিয়ে
এক নামখানি ঢেকেছি।

ভোরের গোলাপ সে গানে সহসা
সাড়া দেয় ফুলকাননে,
ভোরের তারাটি সে গানে জাগিয়া
চেয়ে দেখে মোর আননে।
সব সংসার কাছে আসে ঘিরে,
প্রিয়জন সুখে ভাসে আঁখিনীরে,
হাসি জেগে ওঠে ভবনে।
যে নামে যে ছলে বীণাটি বাজাই
সাড়া পাই সারা ভুবনে।

নিশীথে নিশীথে বিপুল প্রাসাদে
তোমার মহলে মহলে
হাজার হাজার সোনার প্রদীপ
জ্বলে অচপল অনলে।
মোর দীপে জ্বেলে তাহারি আলোক
পথ দিয়ে আসি, হাসে কত লোক,
দূরে যেতে হয় পালায়ে—
তাই তো সে শিখা ভবনশিখরে
পারি নে রাখিতে জ্বালায়ে।

বলি নে তো কারে, সকালে বিকালে
তোমার পথের মাঝেতে
বাঁশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি
বেড়াই ছদ্মসাজেতে।
যাহা মুখে আসে গাই সেই গান
নানা রাগিণীতে দিয়ে নানা তান,
এক গান রাখি গোপনে।
নানা মুখপানে আঁখি মেলি চাই,
তোমা-পানে চাই স্বপনে।

৩ আষাঢ়

সমাপ্তি

পথে যতদিন ছিনু ততদিন অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হল যেখানে সেথায় তুমি আর আমি একা।
নানা বসন্তে নানা বরষায়
অনেক দিবসে অনেক নিশায়
দেখেছি অনেক, সহেছি অনেক, লিখেছি অনেক লেখা—
পথে যতদিন ছিনু ততদিন অনেকের সনে দেখা।

কখন যে পথ আপনি ফুরালো, সন্ধ্যা হল যে কবে!
পিছনে চাহিয়া দেখিনু কখন চলিয়া গিয়াছে সবে।
তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
জানি না কখন পশিনু কেমনে।
অবাক রহিনু আপন প্রাণের নূতন গানের রবে।
কখন যে পথ আপনি ফুরালো, সন্ধ্যা হল যে কবে!

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে অশ্রুজলের রেখা?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী আছে কি ললাটে লেখা?
রুধিয়া দিয়েছ তব বাতায়ন,
বিছানো রয়েছে শীতল শয়ন,
তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ-আলোকে তুমি আর আমি একা।
নয়নে আমার অশ্রুজলের চিহ্ন কি যায় দেখা!

নৈবেদ্য

এই কাব্যগ্রন্থ

পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের

শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ

করিলাম

আষাঢ় ১৩০৮

শান্তিনিকেতনে সপ্তপর্ণতরুতলে রবীন্দ্রনাথ

নৈবেদ্য

১

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার বিচিত্র এ ভবসংসারে
কর্মপারাবারপারে হে,
নিখিলজগৎজনের মাঝারে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার এ ভবে মোর কাজ যবে
সমাপন হবে হে,
ওগো রাজরাজ, একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

২

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।
সব দুখশোক সার্থক হোক
লভিয়া তোমারি আলো।

কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার
মরুক ধন্য হয়ে,
তোমারি পুণ্য আলোকে বসিয়া
প্রিয়জনে বাসি ভালো।
আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।

পরশমণির প্রদীপ তোমার
অচপল তার জ্যোতি,
সোনা করে নিক পলকে আমার
সব কলঙ্ক কালো।
আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।

আমি যত দীপ জ্বালি শুধু তার
জ্বালা আর শুধু কালি,
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে
তোমারি কিরণ ঢালো।
আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।

৩

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে
ওগো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া
তোমারে হেরিব আমি,
ওগো অন্তরযামী।

জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে
তোমার চরণে নমিয়া পুলকে
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম
তোমারে সঁপিব স্বামী
ওগো অন্তরযামী।

দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে
ক্ষণে ক্ষণে ভাবি মনে
কর্ম-অন্তে সন্ধ্যাবেলায়
বসিব তোমার সনে।

সন্ধ্যাবেলায় ভাবি বসে ঘরে
তোমার নিশীথবিরামসাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা
নীরবে যাইবে নামি,
ওগো অন্তরযামী।

৪

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।

তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো।

তব নন্দনগন্ধমোদিত
ফিরি সুন্দর ভুবনে
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো।
তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।

সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গলমন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সংগীতছন্দে।

তব নির্মল নীরব হাস্য
হেরি অম্বর ব্যাপিয়া
তব গৌরবে সকল গর্ব
লাজে যেন সদা লাজে গো।
তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।

৫

যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে,
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

যদি কোনোদিন এ বীণার তারে
তব প্রিয়নাম নাহি ঝংকারে
দয়া ক'রে তুমি ক্ষণেক দাঁড়ায়ো,
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

তব আহ্বানে যদি কভু মোর
নাহি ভেঙে যায় সুপ্তির ঘোর
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমায়,
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

যদি কোনোদিন তোমার আসনে
আর-কাহারেও বসাই যতনে
চিরদিবসের হে রাজা আমার,
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

৬

সংসার যবে মন কেড়ে লয়,
জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো, হে নাথ, প্রণমি তোমায়
গাহি বসে তব গান।
অন্তরযামী, ক্ষমো সে আমার
শূন্যমনের বৃথা উপহার
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন
ভক্তিবিহীন তান—
সংসার যবে মন কেড়ে লয়,
জাগে না যখন প্রাণ।

ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে,
আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা
যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে
এই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান—
সংসার যবে মন কেড়ে লয়,
জাগে না যখন প্রাণ।

৭

জীবনে আমার যত আনন্দ
পেয়েছি দিবসরাত
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে
স্মরিব জীবননাথ।

যেদিন তোমার জগৎ নিরখি
হরষে পরান উঠেছে পুলকি
সেদিন আমার নয়নে হয়েছে
তোমারি নয়নপাত।
সব আনন্দ-মাঝারে তোমারে
স্মরিব জীবননাথ।

বার বার তুমি আপনার হাতে
স্বাদে গন্ধে ও গানে
বাহির হইতে পরশ করেছ
অন্তর-মাঝখানে।

পিতা মাতা ভ্রাতা প্রিয় পরিবার,
মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে হৃদয়ে প্রবেশি
তুমি আছ মোর সাথ।
সব আনন্দ-মাঝারে তোমারে
স্মরিব জীবননাথ।

৮

কাব্যের কথা বাঁধা পড়ে যথা
ছন্দের বাঁধনে,
পরানে তোমায় ধরিয়া রাখিব
সেইমতো সাধনে।
কাঁপায়ে আমার হৃদয়ের সীমা
বাজিবে তোমার অসীম মহিমা,
চিরবিচিত্র আনন্দরূপে
ধরা দিবে জীবনে,
কাব্যের কথা বাঁধা পড়ে যথা
ছন্দের বাঁধনে।

আমার তুচ্ছ দিনের কর্মে
তুমি দিবে গরিমা,
আমার তনুর অণুতে অণুতে
রবে তব প্রতিমা।
সকল প্রেমের স্নেহের মাঝারে
আসন সঁপিব হৃদয়রাজারে,
অসীম তোমার ভুবনে রহিয়া
রবে মম ভবনে,
কাব্যের কথা বাঁধা রহে যথা
ছন্দের বাঁধনে।

৯

না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।
অর্থের শেষ পাই না, তবুও
বুঝেছি তোমার বাণী।

নিশ্বাসে মোর নিমেষের পাতে
চেতনা বেদনা ভাবনা -আঘাতে
কে দেয় সর্বশরীরে ও মনে
তব সংবাদ আনি।
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।

তব রাজত্ব লোক হতে লোকে
সে বারতা আমি পেয়েছি পলকে,
হৃদি-মাঝে যবে হেরেছি তোমার
বিশ্বের রাজধানী।
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।

আপনার চিতে নিবিড় নিভৃতে
যেথায় তোমারে পেয়েছি জানিতে
সেথায় সকলি স্থির নির্বাক্
ভাষা পরাস্ত মানি।
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।

১০

যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক্,
তারা তো পাবে না জানিতে
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয়খানিতে।

যারা কথা বলে তাহারা বলুক,
আমি কাহারেও করি না বিমুখ—
তারা নাহি জানে ভরা আছে প্রাণ
তব অকথিত বাণীতে।
নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার
নীরব হৃদয়খানিতে।

তোমার লাগিয়া কারেও, হে প্রভু,
পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু—
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে
তোমা-পানে রবে টানিতে।
সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম
আমার হৃদয়খানিতে।

সবার সহিতে তোমার বাঁধন,
হেরি যেন সদা এ মোর সাধন,
সবার সঙ্গ পারে যেন মনে
তব আরাধনা আনিতে।
সবার মিলনে তোমার মিলন
জাগিবে হৃদয়খানিতে।

১১

আঁধারে আবৃত ঘন সংশয়
বিশ্ব করিছে গ্রাস,
তারি মাঝখানে সংশয়াতীত
প্রত্যয় করে বাস।

বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি
অন্ধবুদ্ধি ফিরিছে আকুলি ;
প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে—
নাহি তার কোনো ত্রাস।

সংসারপথে শত সংকট
ঘুরিছে ঘূর্ণবায়ে,
তারি মাঝখানে অচলা শান্তি
অমরতরুচ্ছায়ে।

নিন্দা ও ক্ষতি মৃত্যু বিরহ
কত বিষবাণ উড়ে অহরহ,
স্থির যোগাসনে চির আনন্দ—
তাহার নাহিকো নাশ।

১২

অমল কমল সহজে জলের কোলে
আনন্দে রহে ফুটিয়া—
ফিরিতে না হয় আলয় কোথায় ব'লে
ধুলায় ধুলায় লুটিয়া।

তেমনি সহজে আনন্দে হরষিত
তোমার মাঝারে রব নিমগ্নচিত,
পূজাশতদল আপনি সে বিকশিত
সব সংশয় টুটিয়া।

কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব কভু,
শুধাব না কোনো পথিকে।
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব, প্রভু,
যখন ফিরিব যে দিকে।

চলিব যখন তোমার আকাশগেহে
তব আনন্দপ্রবাহ লাগিবে দেহে,
তোমার পবন সখার মতন স্নেহে
বক্ষে আসিবে ছুটিয়া।

১৩

সকল গর্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব ছাড়িব না।
সবারে ডাকিয়া কহিব, যেদিন
পাব তব পদরেণুকণা।

তব আহ্বান আসিবে যখন
সে কথা কেমনে করিব গোপন ?
সকল বাক্যে সকল কর্মে
প্রকাশিবে তব আরাধনা।
সকল গর্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব ছাড়িব না।

যত মান আমি পেয়েছি যে কাজে
সেদিন সকলি যাবে দূরে।
শুধু তব মান দেহে মনে মোর
বাজিয়া উঠিবে এক সুরে।

পথের পথিক সেও দেখে যাবে
তোমার বারতা মোর মুখভাবে
ভবসংসারবাতায়নতলে
বসে রব যবে আনমনা।
সকল গর্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব ছাড়িব না।

১৪

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।

মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ,
দুঃখ সে হয় দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে স্বতন্ত্র হয়ে
আপনার পানে চাই।

হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে
যাহা-কিছু সব আছে আছে আছে—
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারি—
নিশিদিন কাঁদি তাই।

অন্তরগ্লানি সংসারভার
পলক ফেলিতে কোথা একাকার
তোমার স্বরূপ জীবনের মাঝে
রাখিবারে যদি পাই।

১৫

আঁধার আসিতে রজনীর দীপ
জ্বেলেছিনু যতগুলি
নিবাও, রে মন, আজি সে নিবাও
সকল দুয়ার খুলি।

আজি মোর ঘরে জানি না কখন
প্রভাত করেছে রবির কিরণ,
মাটির প্রদীপে নাই প্রয়োজন—
ধুলায় হোক সে ধূলি।
নিবাও, রে মন, রজনীর দীপ
সকল দুয়ার খুলি।

রাখো রাখো, আজ তুলিয়ো না সুর
ছিন্ন বীণার তারে।
নীরবে, রে মন, দাঁড়াও আসিয়া
আপন বাহির-দ্বারে।

শুন আজি প্রাতে সকল আকাশ
সকল আলোক সকল বাতাস
তোমার হইয়া গাহে সংগীত
বিরাট কণ্ঠ তুলি।
নিবাও নিবাও রজনীর দীপ
সকল দুয়ার খুলি।

১৬

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন, তুই জোড়-কর করি
কর্ তাহা দরশন।

মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি,
বহিয়া যেতেছে অমৃতলহরী,
ভূতলে মাথাটি রাখিয়া লহো রে
শুভাশিস-বরিষন।
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ।

ওই-যে আলোক পড়েছে তাঁহার
উদার ললাটদেশে,
সেথা হতে তারি একটি রশ্মি
পড়ুক মাথায় এসে ।

চারি দিকে তার শান্তিসাগর
স্থির হয়ে আছে ভরি চরাচর,
ক্ষণকাল তরে দাঁড়াও রে তীরে—
শান্ত করো রে মন ।
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ ।

১৭

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়—
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে
প্রাণ করে হায়-হায় ।

নদীতটসম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা ধায় ।
অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায় ।

যাহা যায় আর যাহা-কিছু থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে
তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয়
তব মহা মহিমায় ।

তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু,
কভু না হারায় অণু পরমাণু—
আমার ক্ষুদ্র হারাধনগুলি
রবে না কি তব পায় ?
অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায় ।

১৮

পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে,
তব আহ্বান করি সে বহন
পার হয়ে এল পারে ।

আজি এ রজনী তিমির-আঁধার,
ভয়ভারাতুর হৃদয় আমার,
তবু দীপ হাতে খুলি দিয়া দ্বার
নমিয়া লইব তারে ।
পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে ।

পূজিব তাহারে জোড়-কর করি
ব্যাকুল নয়নজলে,
পূজিব তাহারে পরানের ধন
সঁপিয়া চরণতলে ।

আদেশ পালন করিয়া তোমারি
যাবে সে আমার প্রভাত আঁধারি,
শূন্যভবনে বসি তব পায়ে
অর্পিব আপনারে ।
পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে ।

১৯

প্রতিদিন তব গাথা
গাব আমি সুমধুর,
তুমি মোরে দাও কথা
তুমি মোরে দাও সুর ।

তুমি যদি থাক মনে
বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি কর প্রাণ
তব প্রেমে পরিপূর—
প্রতিদিন তব গাথা
গাব আমি সুমধুর ।

তুমি যদি শোন গান
আমার সমুখে থাকি,
সুধা যদি করে দান
তোমার উদার আঁখি—

তুমি যদি দুখ-'পরে
রাখ হাত স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হতে
দম্ভ করহ দূর—
প্রতিদিন তব গাথা
গাব আমি সুমধুর ।

২০

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি।

আমি তাই চাই ভরিয়া পরান
দুঃখেরি সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মোর মাথার মানিক
সাথে যদি দাও ভকতি।

যত দিতে চাও কাজ দিয়ো, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে—
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জালজঞ্জালগুলিতে।

বাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে,
মুক্ত রাখিয়ো তোমা-পানে মোরে,
ধুলায় রাখিয়ো পবিত্র ক'রে
তোমার চরণধূলিতে।
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে,
তোমারে দিয়ো না ভুলিতে।

যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব,
যাই যেন তব চরণে।
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে
সকল-শ্রান্তি-হরণে।

দুর্গমপথ এ ভবগহন,
কত ত্যাগ শোক বিরহদহন—
জীবনে মরণ করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে।
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায়
নিখিলশরণ চরণে।

২১

ঘাটে বসে আছি আনমনা,
যেতেছে বহিয়া সুসময়।
এ বাতাসে তরী ভাসাব না
তোমা-পানে যদি নাহি বয়।

দিন যায় ওগো দিন যায়,
দিনমণি যায় অস্তে।
নাহি হেরি বাট, দূরতীরে মাঠ
ধূসর গোধূলিধূলিময়।

ঘরের ঠিকানা হল না গো,
মন করে তবু যাই-যাই।
ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগ'
সে দিকের পথ চিনি নাই।

এত দিন তরী বাহিলাম,
বাহিলাম তরী যে পথে,
শতবার তরী ডুবুডুবু করি
সে পথে ভরসা নাহি পাই।

তীর-সাথে হেরো শত ডোরে
বাঁধা আছে মোর তরীখান।
রশি খুলে দেবে কবে মোরে,
ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।

কোথা বুক-জোড়া খোলা হাওয়া,
সাগরের খোলা হাওয়া কই!
কোথা মহাগান ভরি দিবে কান,
কোথা সাগরের মহাগান!

২২

মধ্যাহ্নে নগর-মাঝে পথ হতে পথে
কর্মবন্যা ধায় যবে উচ্ছলিত স্রোতে
শত শাখা-প্রশাখায়, নগরের নাড়ী
উঠে স্ফীত তপ্ত হয়ে, নাচে সে আছাড়ি
পাষাণভিত্তির 'পরে— চৌদিক আকুলি
ধায় পান্থ, ছুটে রথ, উড়ে শুষ্ক ধূলি—

তখন সহসা হেরি মুদিয়া নয়ন
মহাজনারণ্য-মাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসনখানি— কোলাহল-মাঝে
তোমার নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধে বিরাজে।
সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্তে সব চিন্তা সব চেষ্টা-'পরে
যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা,
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা!

২৩

আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে।

জনশূন্য ক্ষেত্র-মাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার
রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্তপ্রসার
স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি। ক্ষীণ নদীরেখা
নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা
বালুকার তটে। দূরে দূরে পল্লী যত
মুদ্রিতনয়নে রৌদ্র পোহাইতে রত
নিদ্রায় অলসক্লান্ত।

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল

২৪

মাঝে মাঝে কতবার ভাবি কর্মহীন
আজ নষ্ট হল বেলা, নষ্ট হল দিন।

নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে-সকল ক্ষণ—
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্যামী দেব। অন্তরে অন্তরে
গোপনে প্রচ্ছন্ন রহি কোন্ অবসরে
বীজেরে অঙ্কুররূপে তুলেছ জাগায়ে,
মুকুলে প্রস্ফুটবর্ণে দিয়েছ রাঙায়ে,
ফুলেরে করেছ ফল রসে সুমধুর,
বীজে পরিণত গর্ভ।

আমি নিদ্রাতুর
আলস্যশয্যার 'পরে শ্রান্তিতে মরিয়া
ভেবেছিনু সব কর্ম রহিল পড়িয়া।

প্রভাতে জাগিয়া উঠি মেলিনু নয়ন,
দেখিনু ভরিয়া আছে আমার কানন।

২৫

আবার আমার হাতে বীণা দাও তুলি,
আবার আসুক ফিরে হারা গানগুলি।

সহসা কঠিন শীতে মানসের জলে
পদ্মবন মরে যায়, হংস দলে দলে
সারি বেঁধে উড়ে যায় সুদূর দক্ষিণে
জনহীন কাশফুল্ল নদীর পুলিনে ;
আবার বসন্তে তারা ফিরে আসে যথা
বহি লয়ে আনন্দের কলমুখরতা—

তেমনি আমার যত উড়ে-যাওয়া গান
আবার আসুক ফিরে, মৌন এ পরান
ভরি উতরোলে ; তারা শুনাক এবার
সমুদ্রতীরের তান, অজ্ঞাত রাজার
অগম্য রাজ্যের যত অপরূপ কথা,
সীমাশূন্য নির্জনের অপূর্ব বারতা ।

২৬

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্‌বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে ; সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে— বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যুসমুদ্রদোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায় ।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান ।

সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন ।

২৭

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
একি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার !

একি জ্যোতি, একি ব্যোম দীপ্ত দীপ-জ্বালা
দিবা আর রজনীর চিরনাট্যশালা !
একি শ্যাম বসুন্ধরা, সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্বতে কঠিন, তরুপল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার ! একি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল

আমার ইন্দ্রিয়যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ !
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ ।

তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত । ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ !

২৮

তুমি তবে এসো নাথ, বোসো শুভক্ষণে
দেহে মনে গাঁথা এই মহা সিংহাসনে ।

মোর দু নয়নে ব্যাপ্ত এই নীলাম্বরে
কোনো শূন্য রাখিয়ো না আর-কারো তরে,
আমার সাগরে শৈলে কান্তারে কাননে,
আমার হৃদয়ে দেহে, সজনে নির্জনে ।

জ্যোৎস্নাসুপ্ত নিশীথের নিস্তব্ধ প্রহরে
আনন্দে বিষাদে গাঁথা ছায়ালোক-'পরে
বোসো তুমি মাঝখানে । শান্তিরস দাও
আমার অশ্রুর জলে, শ্রীহস্ত বুলাও
সকল স্মৃতির 'পরে, প্রেয়সীর প্রেমে
মধুর মঙ্গলরূপে তুমি এসো নেমে ।

সকল সংসারবন্ধে বন্ধনবিহীন
তোমার মহান মুক্তি থাক্ রাত্রিদিন ।

২৯

ক্রমে ম্লান হয়ে আসে নয়নের জ্যোতি
নয়নতারায় ; বিপুলা এ বসুমতী
ধীরে মিলাইয়া আসে ছায়ার মতন
লয়ে তার সিন্ধু শৈল কান্তার কানন ।
বিচিত্র এ বিশ্বগান ক্ষীণ হয়ে বাজে
ইন্দ্রিয়বীণার সূক্ষ্ম শততন্ত্রী-মাঝে ;
বর্ণে বর্ণে সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্রখানি
ধীরে ধীরে মৃদু হস্তে লও তুমি টানি
সর্বাঙ্গ হৃদয় হতে ; দীপ্ত দীপাবলী
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে ছিল যা উজ্জ্বলি
দাও নিবাইয়া ; তার পরে অর্ধরাতে
যে নির্মল মৃত্যুশয্যা পাত নিজহাতে—

সে বিশ্বভুবনহীন নিঃশব্দ আসনে
একা তুমি বসো আসি পরম নির্জনে।

৩০

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

৩১

তোমার ভুবন-মাঝে ফিরি মুগ্ধসম
হে বিশ্বমোহন নাথ। চক্ষে লাগে মম
প্রশান্ত আনন্দঘন অনন্ত আকাশ ;
শরৎমধ্যাহ্নে পূর্ণ সুবর্ণ উচ্ছ্বাস
আমার শিরার মাঝে করিয়া প্রবেশ
মিশায় রক্তের সাথে আতপ্ত আবেশ।

ভুলায় আমারে সবে। বিচিত্র ভাষায়
তোমার সংসার মোরে কাঁদায় হাসায় ;
তব নরনারী সবে দিগ্‌বিদিকে মোরে
টেনে নিয়ে যায় কত বেদনার ডোরে,
বাসনার টানে। সেই মোর মুগ্ধ মন
বীণাসম তব অঙ্কে করিনু অর্পণ—
তার শত মোহতন্ত্রে করিয়া আঘাত
বিচিত্র সংগীত তব জাগাও হে নাথ।

৩২

নির্জন শয়ন-মাঝে কালি রাত্রিবেলা
ভাবিতেছিলাম আমি বসিয়া একেলা
গতজীবনের কত কথা ; হেন ক্ষণে
শুনিলাম তুমি কহিতেছ মোর মনে—

'ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্মভোলা,
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা ;
চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখশোক,
যত ভালোমন্দ, যত গীতগন্ধ লয়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে ।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্য বার এসেছিনু নামি ।

'দ্বার রুধি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম !'

৩৩

তখন করি নি, নাথ, কোনো আয়োজন ;
বিশ্বের সবার সাথে, হে বিশ্বরাজন্,
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে
কত শুভদিনে ; কত মুহূর্তের 'পরে
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ ! লই তুলি
তোমার স্বাক্ষর-আঁকা সেই ক্ষণগুলি—
দেখি তারা স্মৃতি-মাঝে আছিল ছড়ায়ে
কত-না ধূলির সাথে, আছিল জড়ায়ে
ক্ষণিকের কত তুচ্ছ সুখদুঃখ ঘিরে ।

হে নাথ, অবজ্ঞা করি যাও নাই ফিরে
আমার সে ধুলাস্তূপ খেলাঘর দেখে ।
খেলা-মাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণধ্বনি— আজ শুনি তাই বাজে
জগৎসংগীত-সাথে চন্দ্রসূর্য-মাঝে ।

৩৪

কারে দূর নাহি কর । যত করি দান
তোমারে হৃদয় মন, তত হয় স্থান
সবারে লইতে প্রাণে । বিদ্বেষ যেখানে
দ্বার হতে কারেও তাড়ায় অপমানে

তুমি সেই সাথে যাও ; যেথা অহংকার
ঘৃণাভরে ক্ষুদ্রজনে রুদ্ধ করে দ্বার
সেথা হতে ফির তুমি ; ঈর্ষা চিত্তকোণে
বসি বসি ছিদ্র করে তোমারি আসনে
তপ্ত শূলে । তুমি থাক, যেথায় সবাই
সহজে খুঁজিয়া পায় নিজ নিজ ঠাঁই ।

ক্ষুদ্র রাজা আসে যবে, ভৃত্য উচ্চরবে
হাঁকি কহে, 'সরে যাও, দূরে যাও সবে ।'
মহারাজ, তুমি যবে এস, সেই-সাথে
নিখিল জগৎ আসে তোমারি পশ্চাতে ।

৩৫

কালি হাস্যে পরিহাসে গানে আলোচনে
অর্ধরাত্রি কেটে গেল বন্ধুজন-সনে ;
আনন্দের নিদ্রাহারা শ্রান্তি বহে লয়ে
ফিরি আসিলাম যবে নিভৃত আলয়ে
দাঁড়াইনু আঁধার অঙ্গনে । শীতবায়
বুলালো স্নেহের হস্ত তপ্ত ক্লান্ত গায়
মুহূর্তে চঞ্চল রক্তে শান্তি আনি দিয়া ।

মুহূর্তেই মৌন হল স্তব্ধ হল হিয়া
নির্বাণপ্রদীপ রিক্ত নাট্যশালা-সম ।
চাহিয়া দেখিনু ঊর্ধ্ব-পানে ; চিত্ত মম
মুহূর্তেই পার হয়ে অসীম রজনী
দাঁড়ালো নক্ষত্রলোকে ।

হেরিনু তখনি—
খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিতমনে
তব স্তব্ধ প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে ।

৩৬

কোথা হতে আসিয়াছি নাহি পড়ে মনে
অগণ্য যাত্রীর সাথে তীর্থদরশনে
এই বসুন্ধরাতলে ; লাগিয়াছে তরী
নীলাকাশ-সমুদ্রের ঘাটের উপরি ।

শুনা যায় চারি দিকে দিবসরজনী
বাজিতেছে বিরাট সংসার-শঙ্খধ্বনি
লক্ষ লক্ষ জীবন-ফুৎকারে । এত বেলা
যাত্রী নরনারী-সাথে করিয়াছি মেলা

পুরীপ্রান্তে পান্থশালা-'পরে । স্নানে পানে
অপরাহ্ণ হয়ে এল গল্পে হাসিগানে—

এখন মন্দিরে তব এসেছি, হে নাথ,
নির্জনে চরণতলে করি প্রণিপাত
এ জন্মের পূজা সমাপিব । তার পর
নবতীর্থে যেতে হবে হে বসুধেশ্বর ।

৩৭

মহারাজ, ক্ষণেক দর্শন দিতে হবে
তোমার নির্জন ধামে । সেথা ডেকে লবে
সমস্ত আলোক হতে তোমার আলোতে
আমারে একাকী— সর্ব সুখদুঃখ হতে,
সর্ব সঙ্গ হতে, সমস্ত এ বসুধার
কর্মবন্ধ হতে । দেব, মন্দিরে তোমার
পশিয়াছি পৃথিবীর সর্বযাত্রীসনে,
দ্বার মুক্ত ছিল যবে আরতির ক্ষণে ।
দীপাবলি নিবাইয়া চলে যাবে যবে
নানা পথে নানা ঘরে পূজকেরা সবে,
দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে ; শান্ত অন্ধকার
আমারে মিলায়ে দিবে চরণে তোমার ।

একখানি জীবনের প্রদীপ তুলিয়া
তোমারে হেরিব একা ভুবন ভুলিয়া ।

৩৮

প্রভাতে যখন শঙ্খ উঠেছিল বাজি
তোমার প্রাঙ্গণতলে, ভরি লয়ে সাজি
চলেছিল নরনারী তেয়াগিয়া ঘর
নবীন শিশিরসিক্ত গুঞ্জনমুখর
স্নিগ্ধবনপথ দিয়ে । আমি অন্যমনে
সঘনপল্লবপুঞ্জ ছায়াকুঞ্জবনে
ছিনু শুয়ে তৃণাস্তীর্ণ তরঙ্গিণীতীরে
বিহঙ্গের কলগীতে সুমন্দ সমীরে ।

আমি যাই নাই দেব, তোমার পূজায়—
চেয়ে দেখি নাই পথে কারা চলে যায় ।
আজ ভাবি ভালো হয়েছিল মোর ভুল,
তখন কুসুমগুলি আছিল মুকুল—

হেরো তারা সারা দিনে ফুটিতেছে আজি ।
অপরাহ্ণে ভরিলাম এ পূজার সাজি ।

৩৯

হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন।

গণনা কেহ না করে, রাত্রি আর দিন
আসে যায়, ফুটে ঝরে যুগযুগান্তরা।
বিলম্ব নাহিক তব, নাহি তব ত্বরা—
প্রতীক্ষা করিতে জান। শতবর্ষ ধ'রে
একটি পুষ্পের কলি ফুটাবার তরে
চলে তব ধীর আয়োজন। কাল নাই
আমাদের হাতে ; কাড়াকাড়ি করে তাই
সবে মিলে ; দেরি কারো নাহি সহে কভু।

আগে তাই সকলের সব সেবা, প্রভু,
শেষ করে দিতে দিতে কেটে যায় কাল—
শূন্য পড়ে থাকে হায় তব পূজা-থাল।

অসময়ে ছুটে আসি, মনে বাসি ভয়—
এসে দেখি, যায় নাই তোমার সময়।

৪০

তোমার ইঙ্গিতখানি দেখি নি যখন
ধূলিমুষ্টি ছিল তারে করিয়া গোপন।

যখনি দেখেছি আজ, তখনি পুলকে
নিরখি ভুবনময় আঁধারে আলোকে
জ্বলে সে ইঙ্গিত ; শাখে শাখে ফুলে ফুলে
ফুটে সে ইঙ্গিত ; সমুদ্রের কূলে কূলে
ধরিত্রীর তটে তটে চিহ্ন আঁকি ধায়
ফেনাঙ্কিত তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
দ্রুত সে ইঙ্গিত ; শুভ্রশীর্ষ হিমাদ্রির
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঊর্ধ্বমুখে জাগি রহে স্থির
স্তব্ধ সে ইঙ্গিত।

তখন তোমার পানে
বিমুখ হইয়া ছিনু কী লয়ে কে জানে !

বিপরীত মুখে তারে পড়েছিনু, তাই
বিশ্বজোড়া সে লিপির অর্থ বুঝি নাই।

৪১

তব পূজা না আনিলে দণ্ড দিবে তারে,
যমদূত লয়ে যাবে নরকের দ্বারে—
ভক্তিহীনে এই বলি যে দেখায় ভয়
তোমার নিন্দুক সে যে, ভক্ত কভু নয়।

হে বিশ্বভুবনরাজ, এ বিশ্বভুবনে
আপনারে সব চেয়ে রেখেছ গোপনে
আপন মহিমা-মাঝে। তোমার সৃষ্টির
ক্ষুদ্র বালুকণাটুকু, ক্ষণিক শিশির
তারাও তোমার চেয়ে প্রত্যক্ষ আকারে
দিকে দিকে ঘোষণা করিছে আপনারে।

যা-কিছু তোমারি তাই আপনার বলি
চিরদিন এ সংসার চলিয়াছে ছলি—
তবু সে চোরের চৌর্য পড়ে না তো ধরা।

আপনারে জানাইতে নাই তব ত্বরা।

৪২

সেই তো প্রেমের গর্ব ভক্তির গৌরব।
সে তব অগম্যরুদ্ধ অনন্ত নীরব
নিস্তব্ধ নির্জন-মাঝে যায় অভিসারে
পূজার সুবর্ণথালি ভরি উপহারে।

তুমি চাও নাই পূজা, সে চাহে, পূজিতে—
একটি প্রদীপ হাতে রহে সে খুঁজিতে
অন্তরের অন্তরালে। দেখে সে চাহিয়া,
একাকী বসিয়া আছ ভরি তার হিয়া।

চমকি নিবায়ে দীপ দেখে সে তখন
তোমারে ধরিতে নারে অনন্ত গগন।
চিরজীবনের পূজা চরণের তলে
সমর্পণ করি দেয় নয়নের জলে।

বিনা আদেশের পূজা, হে গোপনচারী,
বিনা আহ্বানের খোঁজ— সেই গর্ব তারি।

৪৩

কত-না তুষারপুঞ্জ আছে সুপ্ত হয়ে
অভ্রভেদী হিমাদ্রির সুদূর আলয়ে

পাষাণপ্রাচীর-মাঝে। হে সিন্ধু মহান,
তুমি তো তাদের কারে কর না আহ্বান
আপন অতল হতে। আপনার মাঝে
আছে তারা অবরুদ্ধ, কানে নাহি বাজে
বিশ্বের সংগীত।
প্রভাতের রৌদ্রকরে
যে তুষার বয়ে যায়, নদী হয়ে ঝরে,
বন্ধ টুটি ছুটি চলে, হে সিন্ধু মহান,
সেও তো শোনে নি কভু তোমার আহ্বান।
সে সুদূর গঙ্গোত্রীর শিখরচূড়ায়
তোমার গম্ভীর গান কে শুনিতে পায়!

আপন স্রোতের বেগে কী গভীর টানে
তোমারে সে খুঁজে পায় সেই তাহা জানে।

৪৪

মর্তবাসীদের তুমি যা দিয়েছ প্রভু,
মর্তের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।

নদী ধায় নিত্যকাজে, সর্ব কর্ম সারি
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার।
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়—
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে।

কবি আপনার গানে যত কথা কহে
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি,
তোমা-পানে ধায় তার শেষ অর্থখানি।

৪৫

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ।

দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গলকলস
সংসারভবনদ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর, সর্ব কর্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্ব প্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব সুখে দীপ্তি
দাহহীন।

সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর।

৪৬

মাতৃস্নেহবিগলিত স্তন্যক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস—
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরসরাশি
কৈশোরে করেছি পান ; বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম সুরে, প্রকৃতির বুকে
লালনললিতচিত্ত শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে ; প্রভাত-শর্বরী-সন্ধ্যা-বধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা।

আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে—
কোনো দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে, দাও চিত্তে বল
দেখাও সত্যের মূর্তি কঠিন নির্মল।

৪৭

আঘাতসংঘাত-মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।

করো মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায় ; পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

৪৮

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এই চিরপেষণযন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার—

এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গলপ্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক-মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

৪৯

অন্ধকার গর্তে থাকে অন্ধ সরীসৃপ ;
আপনার ললাটের রতনপ্রদীপ
নাহি জানে, নাহি জানে সূর্যালোকলেশ।
তেমনি আঁধারে আছে এই অন্ধ দেশ
হে দণ্ডবিধাতা রাজা— যে দীপ্ত রতন
পরায়ে দিয়েছ ভালে তাহার যতন
নাহি জানে, নাহি জানে তোমার আলোক।

নিত্য বহে আপনার অস্তিত্বের শোক,
জনমের গ্লানি। তব আদর্শ মহান
আপনার পরিমাপে করি খান-খান
রেখেছে ধূলিতে। প্রভু, হেরিতে তোমায়
তুলিতে হয় না মাথা ঊর্ধ্ব-পানে হায়।

যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর
খণ্ড খণ্ড করি তারে তরিবে সাগর ?

৫০

তোমারে শতধা করি ক্ষুদ্র করি দিয়া
মাটিতে লুটায় যারা তৃপ্ত-সুপ্ত-হিয়া
সমস্ত ধরণী আজি অবহেলাভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।

মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি যারা সারাবেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজা-খেলা
মুগ্ধভাবভোগে, সেই বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুত্তল।
তোমারে আপন-সাথে করিয়া সমান
যে খর্ব বামনগণ করে অবমান
কে তাদের দিবে মান! নিজ মন্ত্রস্বরে
তোমারেই প্রাণ দিতে যারা স্পর্ধা করে
কে তাদের দিবে প্রাণ! তোমারেও যারা
ভাগ করে, কে তাদের দিবে ঐক্যধারা!

৫১

হে রাজেন্দ্র, তোমা-কাছে নত হতে গেলে
যে ঊর্ধ্বে উঠিতে হয়, সেথা বাহু মেলে
লহো ডাকি সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন
শৈলপথে; অগ্রসর করো প্রতিদিন
যে মহান পথে তব বরপুত্রগণ
গিয়াছেন পদে পদে করিয়া অর্জন
মরণ-অধিক দুঃখ।

ওগো অন্তর্যামী,
অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্বাণ আমি
দুঃখে তার লব আর দিব পরিচয়।
তারে যেন ম্লান নাহি করে কোনো ভয়,
তারে যেন কোনো লোভ না করে চঞ্চল।
সে যেন জ্ঞানের পথে রহে সমুজ্জ্বল,
জীবনের কর্মে যেন করে জ্যোতি দান,
মৃত্যুর বিশ্রাম যেন করে মহীয়ান।

৫২

দুর্গম পথের প্রান্তে পান্থশালা-'পরে
যাহারা পড়িয়া ছিল ভাবাবেশভরে
রসপানে হতজ্ঞান, যাহারা নিয়ত
রাখে নাই আপনারে উদ্যত জাগ্রত—

মুগ্ধ মূঢ় জানে নাই বিশ্বযাত্রীদলে
কখন চলিয়া গেছে সুদূর অচলে
বাজায়ে বিজয়শঙ্খ ! শুধু দীর্ঘ বেলা
তোমারে খেলনা করি করিয়াছে খেলা ।

কর্মেরে করেছে পঙ্গু নিরর্থ আচারে,
জ্ঞানেরে করেছে হত শাস্ত্রকারাগারে,
আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
করেছে সংকীর্ণ রুধি দ্বার-বাতায়ন—
তারা আজ কাঁদিতেছে । আসিয়াছে নিশা—
কোথা যাত্রী, কোথা পথ, কোথায় রে দিশা !

৫৩

তুমি সর্বাশ্রয়, এ কি শুধু শূন্যকথা ?
ভয় শুধু তোমা-'পরে বিশ্বাসহীনতা
হে রাজন্ ।

লোকভয় ? কেন লোকভয়
লোকপাল ? চিরদিবসের পরিচয়
কোন্ লোক সাথে ?

রাজভয় কার তরে
হে রাজেন্দ্র ? তুমি যার বিরাজ' অন্তরে
লভে সে কারার মাঝে ত্রিভুবনময়
তব ক্রোড়, স্বাধীন সে বন্দিশালে ।

মৃত্যুভয়
কী লাগিয়া হে অমৃত ? দুদিনের প্রাণ
লুপ্ত হলে তখনি কি ফুরাইবে দান—
এত প্রাণদৈন্য, প্রভু, ভাণ্ডারেতে তব ?
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রব ?

কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার !
তুমি নিত্য আছ, আমি নিত্য সে তোমার ।

৫৪

আমারে সৃজন করি যে মহাসম্মান
দিয়েছ আপন হস্তে, রহিতে পরান
তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি ।
যে আলোক জ্বালায়েছ দিবস-শর্বরী

তার ঊর্ধ্বশিখা যেন সর্ব-উচ্চে রাখি,
অনাদর হতে তারে প্রাণ দিয়া ঢাকি ।
মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর !

সেথায় যে পদক্ষেপ করে,
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে,
হোক-না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে
তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে
সর্বশক্তি লয়ে মোর । যাক আর সব,
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব ।

৫৫

তুমি মোরে অর্পিয়াছ যত অধিকার
ক্ষুণ্ণ না করিয়া কভু কণামাত্র তার
সম্পূর্ণ সঁপিয়া দিব তোমার চরণে
অকুণ্ঠিত রাখি তারে বিপদে মরণে ।
জীবন সার্থক হবে তবে ।

চিরদিন
জ্ঞান যেন থাকে মুক্ত, শৃঙ্খলবিহীন ।
ভক্তি যেন ভয়ে নাহি হয় পদানত
পৃথিবীর কারও কাছে । শুভচেষ্টা যত
কোনো বাধা নাহি মানে কোনো শক্তি হতে ।
আত্মা যেন দিবারাত্রি অবারিত স্রোতে
সকল উদ্যম লয়ে ধায় তোমা-পানে
সর্ব বন্ধ টুটি । সদা লেখা থাকে প্রাণে
'তুমি যা দিয়েছ মোরে অধিকারভার
তাহা কেড়ে নিতে দিলে অমান্য তোমার ।'

৫৬

ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি
অপমান অবিচার সহ্য করে যদি
তবে সেই দীন প্রাণে তব সত্য হায়
দণ্ডে দণ্ডে ম্লান হয় । দুর্বল আত্মায়
তোমারে ধরিতে নারে দৃঢ়নিষ্ঠাভরে ।
ক্ষীণপ্রাণ তোমারেও ক্ষুদ্রক্ষীণ করে
আপনার মতো— যত আদেশ তোমার
পড়ে থাকে, আবেশে দিবস কাটে তার ।

পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যা আসি গ্রাস করে তারে
চতুর্দিকে। মিথ্যা মুখে, মিথ্যা ব্যবহারে,
মিথ্যা চিত্তে, মিথ্যা তার মস্তক মাড়ায়ে—
না পারে তাড়াতে তারে উঠিয়া দাঁড়ায়ে।

অপমানে নতশির ভয়ে-ভীত জন
মিথ্যারে ছাড়িয়া দেয় তব সিংহাসন।

৫৭

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবনতরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্বচরাচরে,
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি।

যাঁরা সবল স্বাধীন
নির্ভয় সরলপ্রাণ, বন্ধনবিহীন
সদর্পে ফিরিয়াছে বীর্যজ্যোতিষ্মান
লঙ্ঘিয়া অরণ্য নদী পর্বত পাষাণ
তাঁরা এক মহান বিপুল সত্য-পথে
তোমারে লভিয়াছেন নিখিল জগতে।
কোনোখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সমস্ত বিশ্ব করেছেন ভেদ।

৫৮

তাঁহারা দেখিয়াছেন— বিশ্ব চরাচর
ঝরিছে আনন্দ হতে আনন্দনির্ঝর।
অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্মরিয়া করে যাতায়াত।
গিরি উঠিয়াছে ঊর্ধ্বে তোমারি ইঙ্গিতে,
নদী ধায় দিকে দিকে তোমারি সংগীতে।
শূন্যে শূন্যে চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা যত
অনন্ত প্রাণের মাঝে কাঁপিছে নিয়ত।

তাঁহারা ছিলেন নিত্য এ বিশ্ব-আলয়ে
কেবল তোমারি ভয়ে, তোমারি নির্ভয়ে—
তোমারি শাসনগর্বে দীপ্ততৃপ্তমুখে
বিশ্বভুবনেশ্বরের চক্ষুর সম্মুখে।

৫৯

আমরা কোথায় আছি, কোথায় সুদূরে
দীপহীন জীর্ণভিত্তি অবসাদপুরে
ভগ্নগৃহে, সহস্রের ভ্রূকুটির নীচে
কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে, সহস্রের পিছে
চলিয়াছি প্রভুত্বের তর্জনী-সংকেতে
কটাক্ষে কাঁপিয়া— লইয়াছি শির পেতে
সহস্রশাসনশাস্ত্র।

সংকুচিত-কায়া
কাঁপিতেছে রচি নিজ কল্পনার ছায়া।
সন্ধ্যার আঁধারে বসি নিরানন্দ ঘরে
দীন-আত্মা মরিতেছে শত লক্ষ ডরে।
পদে পদে ত্রস্তচিত্তে হয়ে লুণ্ঠ্যমান
ধূলিতলে, তোমারে যে করি অপ্রমাণ।
যেন মোরা পিতৃহারা ধাই পথে পথে
অনীশ্বর অরাজক ভয়ার্ত জগতে।

৬০

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ, কী আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে— 'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।'

আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্তে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্তা।

রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

৬১

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,

মৃত আবর্জনা। ওরে, জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে
এই কর্মধামে। দুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্মে বাধা, গতিপথে বাধা,
আচারে বিচারে বাধা, করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ।

সমস্ত তিমির
ভেদ করি দেখিতে হইবে ঊর্ধ্বশির
এক পূর্ণ জ্যোতির্ময়ে অনন্ত ভুবনে।
ঘোষণা করিতে হবে অসংশয়মনে—
'ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত,
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মতো।'

৬২

তব চরণের আশা, ওগো মহারাজ,
ছাড়ি নাই। এত যে হীনতা, এত লাজ,
তবু ছাড়ি নাই আশা। তোমার বিধান
কেমনে কী ইন্দ্রজাল করে যে নির্মাণ
সংগোপনে সবার নয়ন-অন্তরালে
কেহ নাহি জানে। তোমার নির্দিষ্ট কালে
মুহূর্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে
আপনারে ব্যক্ত করি আপন আলোতে
চিরপ্রতীক্ষিত চিরসম্ভবের বেশে।
আছ তুমি অন্তর্যামী এ লজ্জিত দেশে—
সবার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে হৃদয়ে
গৃহে গৃহে রাত্রিদিন জাগরূক হয়ে
তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ।
আমি ছাড়ি নাই আশা ওগো মহারাজ!

৬৩

পতিত ভারতে তুমি কোন্ জাগরণে
জাগাইবে, হে মহেশ, কোন্ মহাক্ষণে,
সে মোর কল্পনাতীত। কী তাহার কাজ,
কী তাহার শক্তি, দেব, কী তাহার সাজ,
কোন্ পথ তার পথ, কোন্ মহিমায়
দাঁড়াবে সে সম্পদের শিখরসীমায়
তোমার মহিমাজ্যোতি করিতে প্রকাশ
নবীন প্রভাতে!

আজি নিশার আকাশ
যে আদর্শে রচিয়াছে আলোকের মালা.
সাজায়েছে আপনার অন্ধকার-থালা,
ধরিয়াছে ধরিত্রীর মাথার উপর,
সে আদর্শ প্রভাতের নহে মহেশ্বর !
জাগিয়া উঠিবে প্রাচী যে অরুণালোকে
সে কিরণ নাই আজি নিশীথের চোখে ।

৬৪

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী । দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে ।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম— প্রলয়মন্থনক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে । লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায় ।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি ।

৬৫

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে । অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি -মাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কালঝঞ্ঝাঝংকারিত দুর্যোগ-আঁধারে ।
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান ।

স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে— বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায় । বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ—
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ ।

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।

৬৬

এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিমসমুদ্রতটে করিছে উদ্‌গার
বিস্ফুলিঙ্গ, স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।

এই শ্মশানের মাঝে শক্তির সাধনা
তব আরাধনা নহে হে বিশ্বপালক।
তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক
হয়তো লুকায়ে আছে পূর্বসিন্ধুতীরে
বহু ধৈর্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে
সর্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়
দীর্ঘকাল, ব্রাহ্ম মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।

৬৭

সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি,
হে ভারত, সর্বদুঃখে রহো তুমি জাগি
সরলনির্মলচিত্ত— সকল বন্ধনে
আত্মারে স্বাধীন রাখি, পুষ্প ও চন্দনে
আপনার অন্তরের মাহাত্ম্যমন্দির
সজ্জিত সুগন্ধি করি, দুঃখনম্রশির
তাঁর পদতলে নিত্য রাখিয়া নীরবে।

তাঁ' হতে বঞ্চিত করে তোমারে এ ভবে
এমন কেহই নাই— সেই গর্বভরে
সর্বভয়ে থাকো তুমি নির্ভয় অন্তরে
তাঁর হস্ত হতে লয়ে অক্ষয় সম্মান।
ধরায় হোক-না তব যত নিম্ন স্থান
তাঁর পাদপীঠ করো সে আসন তব
যাঁর পাদরেণুকণা এ নিখিল ভব।

৬৮

সে উদার প্রত্যুষের প্রথম অরুণ
যখনি মেলিবে নেত্র প্রশান্তকরুণ,

শুভ্রশির অভ্রভেদী উদয়শিখরে,
হে দুঃখী জাগ্রত দেশ, তব কণ্ঠস্বরে
প্রথম সংগীত তার যেন উঠে বাজি
প্রথম ঘোষণাধ্বনি।

তুমি থেকো সাজি
চন্দনচর্চিত স্নাত নির্মল ব্রাহ্মণ,
উচ্চশির ঊর্ধ্বে তুলি গাহিয়ো বন্দন—
'এসো শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা,
নিশাচর পিশাচের রক্তদীপশিখা
করিয়া লজ্জিত।' তব বিশাল সন্তোষ
বিশ্বলোক-ঈশ্বরের রত্নরাজকোষ।
তব ধৈর্য দৈববীর্য। নম্রতা তোমার
সমুচ্চ মুকুটশ্রেষ্ঠ, তাঁরি পুরস্কার।

৬৯

তাঁরি হস্ত হতে নিয়ো তব দুঃখভার,
হে দুঃখী, হে দীনহীন। দীনতা তোমার
ধরিবে ঐশ্বর্যদীপ্তি, যদি নত রহে
তাঁরি দ্বারে। আর কেহ নহে নহে নহে,
তিনি ছাড়া আর কেহ নাই ত্রিসংসারে
যার কাছে তব শির লুটাইতে পারে।

পিতৃরূপে রয়েছেন তিনি, পিতৃ-মাঝে
নমি তাঁরে। তাঁহারি দক্ষিণ হস্ত রাজে
ন্যায়দণ্ড-'পরে, নতশিরে লই তুলি
তাহার শাসন। তাঁরি চরণ-অঙ্গুলি
আছে মহত্ত্বের 'পরে, মহতের দ্বারে
আপনারে নম্র ক'রে পূজা করি তাঁরে।
তাঁরি হস্তস্পর্শরূপে করি অনুভব
মস্তকে তুলিয়া লই দুঃখের গৌরব।

৭০

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে। প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে। তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে।

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজস্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

৭১

ওরে মৌনমূক, কেন আছিস নীরবে
অন্তর করিয়া রুদ্ধ? এ মুখর ভবে
তোর কোনো কথা নাই রে আনন্দহীন?
কোনো সত্য পড়ে নাই চোখে? ওরে দীন,
কণ্ঠে নাই কোনো সংগীতের নব তান?

তোর গৃহপ্রান্ত চুম্বি সমুদ্র মহান
গাহিছে অনন্ত গাথা, পশ্চিমে পুরবে।
কত নদী নিরবধি ধায় কলরবে
তরলসংগীতধারা হয়ে মূর্তিমতী।
শুধু তুমি দেখ নাই সে প্রত্যক্ষ জ্যোতি
যাহা সত্যে যাহা গীতে আনন্দে আশায়
ফুটে উঠে নব নব বিচিত্র ভাষায়।
তব সত্য তব গান রুদ্ধ হয়ে রাজে
রাত্রিদিন জীর্ণশাস্ত্রে শুষ্কপত্র-মাঝে!

৭২

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—

নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

৭৩

আমি ভালোবাসি, দেব, এই বাঙালার
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য, মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবীগান, যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জন তটে বাজায় কিঙ্কিণী
তরল কল্লোলরোলে,
যে সরল স্নেহ
তরুচ্ছায়া-সাথে মিশি স্নিগ্ধপল্লীগেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে—

করো আশীর্বাদ,
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কার্যে আনন্দিতমনে
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

৭৪

এ নদীর কলধ্বনি যেথায় বাজে না
মাতৃকলকণ্ঠসম, যেথায় সাজে না
কোমলা উর্বরা ভূমি নবনবোৎসবে
নবীন-বরন বস্ত্রে যৌবনগৌরবে
বসন্তে শরতে বরষায়, রুদ্ধাকাশ
দিবস-রাত্রিরে যেথা করে না প্রকাশ
পূর্ণপ্রস্ফুটিতরূপে, যেথা মাতৃভাষা
চিত্ত-অন্তঃপুরে নাহি করে যাওয়া-আসা
কল্যাণী হৃদয়লক্ষ্মী, যেথা নিশিদিন
কল্পনা ফিরিয়া আসে পরিচয়হীন
পরগৃহদ্বার হতে পথের মাঝারে—

সেখানেও যাই যদি, মন যেন পারে
সহজে টানিয়া নিতে অন্তহীন স্রোতে
তব সদানন্দধারা সর্ব ঠাঁই হতে।

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক বিচিত্রিত প্রতিলিপি

নৈবেদ্য : ৭২

৭৫

আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ
লগ্ন হয়ে রহিয়াছে রজনী-দিবস
প্রাণেশ্বর, এই কথা নিত্য মনে আনি
রাখিব পবিত্র করি মোর তনুখানি।
মনে তুমি বিরাজিছ, হে পরম জ্ঞান,
এই কথা সদা স্মরি মোর সর্বধ্যান
সর্বচিন্তা হতে আমি সর্বচেষ্টা করি
সর্বমিথ্যা রাখি দিব দূরে পরিহরি।

হৃদয়ে রয়েছে তব অচল আসন
এই কথা মনে রেখে করিব শাসন
সকল কুটিল দ্বেষ, সর্ব অমঙ্গল—
প্রেমেরে রাখিব করি প্রস্ফুট নির্মল।
সর্ব কর্মে তব শক্তি এই জেনে সার
করিব সকল কর্মে তোমারে প্রচার।

৭৬

অচিন্ত্য এ ব্রহ্মাণ্ডের লোকলোকান্তরে
অনন্ত শাসন যাঁর চিরকালতরে
প্রত্যেক অণুর মাঝে হতেছে প্রকাশ,
যুগে যুগে মানবের মহা ইতিহাস
বহিয়া চলেছে সদা ধরণীর 'পর
যাঁর তর্জনীর ছায়া, সেই মহেশ্বর
আমার চৈতন্য-মাঝে প্রত্যেক পলকে
করিছেন অধিষ্ঠান ; তাঁহারি আলোকে
চক্ষু মোর দৃষ্টিদীপ্ত, তাঁহারি পরশে
অঙ্গ মোর স্পর্শময় প্রাণের হরষে।

যেথা চলি, যেথা রহি, যেথা বাস করি
প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর এই কথা স্মরি
আপন-মস্তক-'পরে সর্বদা সর্বথা
বহিব তাঁহার গর্ব, নিজের নম্রতা।

৭৭

না গনি মনের ক্ষতি ধনের ক্ষতিতে
হে বরেণ্য, এই বর দেহো মোর চিতে।
যে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ তোমার ভুবন
এই তৃণভূমি হতে সুদূর গগন
যে আলোকে, যে সংগীতে, যে সৌন্দর্যধনে,

তার মূল্য নিত্য যেন থাকে মোর মনে
স্বাধীন সবল শান্ত সরল সন্তোষ।

অদৃষ্টেরে কভু যেন নাহি দিই দোষ
কোনো দুঃখ কোনো ক্ষতি অভাবের তরে।
বিস্বাদ না জন্মে যেন বিশ্বচরাচরে
ক্ষুদ্রখণ্ড হারাইয়া। ধনীর সমাজে
না হয় না হোক স্থান, জগতের মাঝে
আমার আসন যেন রহে সর্ব ঠাঁই,
হে দেব, একান্তচিত্তে এই বর চাই।

৭৮

এ কথা স্মরণে রাখা কেন গো কঠিন
তুমি আছ সব চেয়ে, আছ নিশিদিন,
আছ প্রতি ক্ষণে— আছ দূরে, আছ কাছে,
যাহা-কিছু আছে তুমি আছ ব'লে আছে।

যেমনি প্রবেশ আমি করি লোকালয়ে,
যখনি মানুষ আসে স্তুতিনিন্দা লয়ে—
লয়ে রাগ, লয়ে দ্বেষ, লয়ে গর্ব তার
অমনি সংসার ধরে পর্বত-আকার
আবরিয়া ঊর্ধ্বলোক ; তরঙ্গিয়া উঠে
লাজভয় লোভক্ষোভ ; নরের মুকুটে
যে হীরক জ্বলে তারি আলোক-ঝলকে
অন্য আলো নাহি হেরি দ্যুলোকে ভূলোকে।
মানুষ সম্মুখে এলে কেন সেই ক্ষণে
তোমার সম্মুখে আছি নাহি পড়ে মনে ?

৭৯

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়,
বিত্ত হতে প্রিয়তর, যা-কিছু আত্মীয়
সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,
আত্মার অন্তরতর, তাদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার।
সে সরল শান্ত প্রেম গভীর উদার—
সে নিশ্চিত নিঃসংশয়, সেই সুনিবিড়
সহজ মিলনাবেগ, সেই চিরস্থির
আত্মার একাগ্র লক্ষ্য, সেই সর্ব কাজে
সহজেই সঞ্চরণ সদা তোমা-মাঝে

গম্ভীর প্রশান্ত চিত্তে, হে অন্তরযামী,
কেমনে করিব লাভ ? পদে পদে আমি
প্রেমের প্রবাহ তব সহজ বিশ্বাসে
অন্তরে টানিয়া লব নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

৮০

হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা-অতীত
সেথা হতে আনন্দের অব্যক্ত সংগীত
ঝরিয়া পড়িছে নামি, অদৃশ্য অগম
হিমাদ্রিশিখর হতে জাহ্নবীর সম।

সে ধ্যানাভ্রভেদী শৃঙ্গ, যেথা স্বর্ণলেখা
জগতের প্রাতঃকালে দিয়েছিল দেখা
আদি অন্ধকার-মাঝে, যেথা রক্তচ্ছবি
অস্ত যাবে জগতের শ্রান্ত সন্ধ্যারবি
নব নব ভুবনের জ্যোতির্বাষ্পরাশি
পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারিকা যার বক্ষে আসি
ফিরিছে সৃজনবেগে মেঘখণ্ডসম
যুগে যুগান্তরে— চিত্তবাতায়ন মম
সে অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাত্রিদিন
রাখিব উন্মুক্ত করি হে অন্তবিহীন।

৮১

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতি ক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারি ভিতে।
সেথা উষা ডান হাতে ধরি স্বর্ণথালা
নিয়ে আসে একখানি মাধুর্যের মালা
নীরবে পরায়ে দিতে ধরার ললাটে ;
সন্ধ্যা আসে নম্রমুখে ধেনুশূন্য মাঠে
চিহ্নহীন পথ দিয়ে লয়ে স্বর্ণঝারি
পশ্চিমসমুদ্র হতে ভরি শান্তিবারি।

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ,
অপার সঞ্চারক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস ;
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই— নাই নাই বাণী।

৮২

তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে
প্রিয়তম। তবু শুধু মাধুর্য-মাঝারে
চাহি না নিমগ্ন করে রাখিতে হৃদয়।
আপনি যেথায় ধরা দিলে, স্নেহময়,
বিচিত্র সৌন্দর্যডোরে, কত স্নেহে প্রেমে,
কত রূপে— সেথা আমি রহিব না থেমে
তোমার প্রণয়-অভিমানে। চিত্তে মোর
জড়ায়ে বাঁধিব নাকো সন্তোষের ডোর।

আমার অতীত তুমি যেথা, সেইখানে
অন্তরাত্মা ধায় নিত্য অনন্তের টানে
সকল বন্ধন-মাঝে— যেথায় উদার
অন্তহীন শান্তি আর মুক্তির বিস্তার।

তোমার মাধুর্য যেন বেঁধে নাহি রাখে,
তব ঐশ্বর্যের পানে টানে সে আমাকে।

৮৩

হে দূর হইতে দূর, হে নিকটতম,
যেথায় নিকটে তুমি সেথা তুমি মম,
যেথায় সুদূরে তুমি সেথা আমি তব।
কাছে তুমি নানা ভাবে নিত্য নব নব
সুখে দুঃখে জনমে মরণে। তব গান
জল স্থল শূন্য হতে করিছে আহ্বান
মোরে সর্ব কর্ম-মাঝে— বাজে গূঢ়স্বরে
প্রহরে প্রহরে চিত্তকুহরে-কুহরে
তোমার মঙ্গলমন্ত্র।

যেথা দূর তুমি
সেথা আত্মা হারাইয়া সর্ব তটভূমি
তোমার নিঃসীম-মাঝে পূর্ণানন্দভরে
আপনারে নিঃশেষিয়া সমর্পণ করে।
কাছে তুমি কর্মতট আত্মা-তটিনীর,
দূরে তুমি শান্তিসিন্ধু অনন্ত গভীর।

৮৪

মুক্ত করো, মুক্ত করো নিন্দা-প্রশংসার
দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল হতে। সে কঠিন ভার
যদি খসে যায় তবে মানুষের মাঝে
সহজে ফিরিব আমি সংসারের কাজে—

তোমারি আদেশ শুধু জয়ী হবে নাথ।
তোমার চরণপ্রান্তে করি প্রণিপাত
তব দণ্ড পুরস্কার অন্তরে গোপনে
লইব নীরবে তুলি—

নিঃশব্দ গমনে
চলে যাব কর্মক্ষেত্র-মাঝখান দিয়া
বহিয়া অসংখ্য কাজে একনিষ্ঠ হিয়া,
সঁপিয়া অব্যর্থ গতি সহস্র চেষ্টায়
এক নিত্য ভক্তিবলে, নদী যথা ধায়
লক্ষ লোকালয়-মাঝে নানা কর্ম সারি
সমুদ্রের পানে লয়ে বন্ধহীন বারি।

৮৫

দুর্দিন ঘনায়ে এল ঘন অন্ধকারে
হে প্রাণেশ। দিগ্‌বিদিক বৃষ্টিবারিধারে
ভেসে যায়, কুটিল কটাক্ষে হেসে যায়
নিষ্ঠুর বিদ্যুৎ-শিখা, উতরোল বায়
তুলিল উতলা করি অরণ্য কানন।

আজি তুমি ডাকো অভিসারে, হে মোহন,
হে জীবনস্বামী। অশ্রুসিক্ত বিশ্ব -মাঝে
কোনো দুঃখে, কোনো ভয়ে, কোনো বৃথা কাজে
রহিব না রুদ্ধ হয়ে। এ দীপ আমার
পিচ্ছিল তিমিরপথে যেন বারম্বার
নিবে নাহি যায়, যেন আর্দ্র সমীরণে
তোমার আহ্বান বাজে। দুঃখের বেষ্টনে
দুর্দিন রচিল আজি নিবিড় নির্জন,
হোক আজি তোমা-সাথে একান্ত মিলন।

৮৬

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল,
হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম। দিক্‌চক্রবাল
ভয়ংকর শূন্য হেরি, নাই কোনোখানে
সরস সজল রেখা— কেহ নাহি আনে
নববারিবর্ষণের শ্যামল সংবাদ।

যদি ইচ্ছা হয়, দেব, আনো বজ্রনাদ
প্রলয়মুখর হিংস্র ঝটিকার সাথে।
পলে পলে বিদ্যুতের বক্র কশাঘাতে
সচকিত করো মোর দিগ্‌দিগন্তর।

সংহরো সংহরো, প্রভো, নিস্তব্ধ প্রখর
এই রুদ্র, এই ব্যাপ্ত, এ নিঃশব্দ দাহ
নিঃসহ নৈরাশ্যতাপ। চাহো নাথ, চাহো
জননী যেমন চাহে সজল নয়ানে
পিতার ক্রোধের দিনে সন্তানের পানে।

৮৭

আমার এ মানসের কানন কাঙাল
শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি বহু দীর্ঘকাল
আছে ক্রুদ্ধ ঊর্ধ্ব-পানে চাহি। ওহে নাথ,
এ রুদ্র মধ্যাহ্ন-মাঝে কবে অকস্মাৎ
পথিক পবন কোন্ দূর হতে এসে
ব্যগ্র শাখাপ্রশাখায় চক্ষের নিমেষে
কানে কানে রটাইবে আনন্দমর্মর,
প্রতীক্ষায় পুলকিয়া বনবনান্তর।
গম্ভীর মাভৈঃমন্দ্র কোথা হতে ব'হে
তোমার প্রসাদপুঞ্জ ঘনসমারোহে
ফেলিবে আচ্ছন্ন করি নিবিড়চ্ছায়ায়।
তার পরে বিপুল বর্ষণ। তার পরে
পরদিন প্রভাতের সৌম্যরবিকরে
রিক্ত মালঞ্চের মাঝে পূজাপুষ্পরাশি
নাহি জানি কোথা হতে উঠিবে বিকাশি।

৮৮

এ কথা মানিব আমি, এক হতে দুই
কেমনে যে হতে পারে জানি না কিছুই।
কেমনে যে কিছু হয়, কেহ হয় কেহ,
কিছু থাকে কোনোরূপে, কারে বলে দেহ,
কারে বলে আত্মা মন, বুঝিতে না পেরে
চিরকাল নিরখিব বিশ্বজগতেরে
নিস্তব্ধ নির্বাক্ চিত্তে।

বাহিরে যাহার
কিছুতে নারিব যেতে আদি অন্ত তার,
অর্থ তার, তত্ত্ব তার, বুঝিব কেমনে
নিমেষের তরে? এই শুধু জানি মনে
সুন্দর সে, মহান্ সে, মহাভয়ংকর,
বিচিত্র সে, অজ্ঞেয় সে, মম মনোহর।

ইহা জানি, কিছুই না জানিয়া অজ্ঞাতে
নিখিলের চিত্তস্রোত ধাইছে তোমাতে।

৮৯

জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য সংসারের মহানিকেতনে,
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে
ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে
অর্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মতো ?

তবু তো প্রভাতে শির করিয়া উন্নত
যখনি নয়ন মেলি নিরখিনু ধরা
কনককিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা,
নিরখিনু সুখে-দুঃখে-খচিত সংসার,
তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষসম
নিতান্তই পরিচিত, একান্তই মম।

রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরেছে আমার কাছে জননী-মুরতি।

৯০

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।
সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি
দুই ভুজে।

ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম-মুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্বে ? মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

৯১

বাসনারে খর্ব করি দাও হে প্রাণেশ।
সে শুধু সংগ্রাম করে লয়ে এক লেশ

বৃহতের সাথে। পণ রাখিয়া নিখিল
জিনিয়া নিতে সে চাহে শুধু এক তিল।
বাসনার ক্ষুদ্র রাজ্য করি একাকার
দাও মোরে সন্তোষের মহা অধিকার।

অযাচিত যে সম্পদ অজস্র আকারে
উষার আলোক হতে নিশার আঁধারে
জলে স্থলে রচিয়াছে অনন্ত বিভব—
সেই সর্বলভ্য সুখ অমূল্য দুর্লভ
সব চেয়ে। সে মহা সহজ সুখখানি
পূর্ণশতদলসম কে দিবে গো আনি
জলস্থল-আকাশের মাঝখান হতে,
ভাসাইয়া আপনারে সহজের স্রোতে!

৯২

শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।
দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার।
যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে।

বস্তুভারহীন মন সর্ব জলে স্থলে
পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে। আজি তাহা নাশি
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।

৯৩

কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষসম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।

শুনো না কী বলে তারা ; তব শ্রেষ্ঠ ধন
থাকুক হৃদয়ে তব, থাক্ তাহা ঘরে,

থাক্ তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের 'পরে
অদৃশ্য মুকুট তব। দেখিতে যা বড়ো,
চক্ষে যাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়ো,
তারি কাছে অভিভূত হয়ে বারে বারে
লুটায়ো না আপনায়। স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে করো প্রতিষ্ঠিত
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি চিত।

৯৪

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসনভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।

ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

৯৫

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।

আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্ররুধিরপুষ্ট বিলাসলালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জে মুখরঘর্ঘর,
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্বর
রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্ধায়
নিঃসংকোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে, হায়,
নীরবগৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ
সুবিরল, নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টালেশ ?

কে রাখিবে ভরি নিজ অন্তর-আগার
আত্মার সম্পদরাশি মঙ্গল উদার ?

৯৬

অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে।
তাই মোরা লজ্জানত ; তাই সর্ব গায়ে
ক্ষুধার্ত দুর্ভর দৈন্য করিছে দংশন ;
তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরল বসন
সম্মান বহে না আর ; নাহি ধ্যানবল,
শুধু জপমাত্র আছে ; শুচিত্ব কেবল
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার।

সন্তোষের অন্তরেতে বীর্য নাহি আর,
কেবল জড়ত্বপুঞ্জ ; ধর্ম প্রাণহীন
ভারসম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন।
তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে
লুকাতে প্রাচীন দৈন্য। বৃথা চেষ্টা ভাই,
সব সজ্জা লজ্জা-ভরা চিত্ত যেথা নাই।

৯৭

শক্তি মোর অতি অল্প, হে দীনবৎসল,
আশা মোর অল্প নহে। তব জলস্থল
তব জীবলোক-মাঝে যেথা আমি যাই
যেথায় দাঁড়াই আমি সর্বত্রই চাই
আমার আপন স্থান। দানপত্রে তব
তোমার নিখিলখানি আমি লিখি লব।

আপনারে নিশিদিন আপনি বহিয়া
প্রতি ক্ষণে ক্লান্ত আমি। শ্রান্ত সেই হিয়া
তোমার সবার মাঝে করিব স্থাপন
তোমার সবারে করি আমার আপন।
নিজ ক্ষুদ্র দুঃখ সুখ জলঘটসম
চাপিছে দুর্ভর ভার মস্তকেতে মম।
ভাঙি তাহা ডুব দিব বিশ্বসিন্ধুনীরে,
সহজে বিপুল জল বহি যাবে শিরে।

৯৮

মাঝে মাঝে কভু যবে অবসাদ আসি
অন্তরের আলোক পলকে ফেলে গ্রাসি,

মন্দপদে যবে শ্রান্তি আসে তিল তিল
তোমার পূজার বৃন্ত করে সে শিথিল
ম্রিয়মাণ— তখনো না যেন করি ভয়,
তখনো অটল আশা যেন জেগে রয়
তোমা-পানে।

তোমা-'পরে করিয়া নির্ভর
সে শ্রান্তির রাত্রে যেন সকল অন্তর
নির্ভয়ে অর্পণ করি পথধূলিতলে
নিদ্রারে আহ্বান করি। প্রাণপণ বলে
ক্লান্ত চিত্তে নাহি তুলি ক্ষীণ কলরব
তোমার পূজার অতি দরিদ্র উৎসব।

রাত্রি এনে দাও তুমি দিবসের চোখে,
আবার জাগাতে তারে নবীন আলোকে।

৯৯

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর। বীর্য দেহো সুখের সহিতে,
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহো
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি। বীর্য দেহো ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহো চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।

বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।

১০০

সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রেখে দিয়ো তার একটি দুয়ার খুলিয়া।
মোর সব কাজে মোর সব অবসরে
সে দুয়ার রবে তোমারি প্রবেশ-তরে,

সেথা হতে বায়ু বহিবে হৃদয়-'পরে
চরণ হইতে তব পদরজ তুলিয়া।
সে দুয়ার খুলি আসিবে তুমি এ ঘরে,
আমি বাহিরিব সে দুয়ারখানি খুলিয়া।

আর যত সুখ পাই বা না পাই, তবু
এক সুখ শুধু মোর তরে তুমি রাখিয়ো।
সে সুখ কেবল তোমার আমার প্রভু,
সে সুখের 'পরে তুমি জাগ্রত থাকিয়ো।
তাহারে না ঢাকে আর যত সুখগুলি,
সংসার যেন তাহাতে না দেয় ধূলি,
সব কোলাহল হতে তারে তুমি তুলি
যতন করিয়া আপন অঙ্কে ঢাকিয়ো।
আর যত সুখে ভরুক ভিক্ষাঝুলি,
সেই এক সুখ মোর তরে তুমি রাখিয়ো।

যত বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে যায়, স্বামী,
এক বিশ্বাস রহে যেন চিতে লাগিয়া।
যে অনলতাপ যখনি সহিব আমি
দেয় যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া।
দুখ পশে যবে মর্মের মাঝখানে
তোমার লিখন-স্বাক্ষর যেন আনে,
রুক্ষ বচন যতই আঘাত হানে
সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া।
শত বিশ্বাস ভেঙে যদি যায় প্রাণে
এক বিশ্বাসে রহে যেন মন লাগিয়া।

স্মরণ

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯

রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী

স্মরণ

১

আজি প্রভাতেও শ্রান্ত নয়নে
রয়েছে কাতর ঘোর।
দুখশয্যায় করি জাগরণ
রজনী হয়েছে ভোর।
নবফুটন্ত ফুলকাননের
নব জাগ্রত শীতপবনের
সাথি হইবারে পারে নি আজিও
এ দেহ-হৃদয় মোর।

আজি মোর কাছে প্রভাত তোমার
করো গো আড়াল করো—
এ খেলা এ মেলা এ আলো এ গীত
আজি হেথা হতে হরো।
প্রভাতজগৎ হতে মোরে ছিঁড়ি
করুণ আঁধারে লহো মোরে ঘিরি,
উদাস হিয়ারে তুলিয়া বাঁধুক
তব স্নেহবাহুডোর।

২

সে যখন বেঁচে ছিল গো, তখন
যা দিয়েছে বারবার
তার প্রতিদান দিব যে এখন
সে সময় নাহি আর।
রজনী তাহার হয়েছে প্রভাত,
তুমি তারে আজি লয়েছ হে নাথ—
তোমারি চরণে দিলাম সঁপিয়া
কৃতজ্ঞ উপহার।

তার কাছে যত করেছিনু দোষ,
যত ঘটেছিল ত্রুটি,
তোমা-কাছে তার মাগি লব ক্ষমা
চরণের তলে লুটি।

তারে যাহা-কিছু দেওয়া হয় নাই,
তারে যাহা-কিছু সঁপিবারে চাই,
তোমারি পূজার থালায় ধরিনু
আজি সে প্রেমের হার।

৩

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার—
আর কভু আসিবে না।
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার,
তারি সাথে শেষ চেনা।
সে আসি প্রদীপ নিবাইয়া দিবে একদিন,
তুলি লবে মোরে রথে—
নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হতে কোন্ গৃহহীন
গ্রহতারকার পথে।

ততকাল আমি একা বসি রব খুলি দ্বার,
কাজ করি লব শেষ।
দিন হবে যবে আরেক অতিথি আসিবার
পাবে না সে বাধালেশ।
পূজা-আয়োজন সব সারা হবে একদিন,
প্রস্তুত হয়ে রব—
নীরবে বাড়ায়ে বাহু-দুটি সেই গৃহহীন
অতিথিরে বরি লব।

যে জন আজিকে ছেড়ে চলে গেল খুলি দ্বার
সেই বলে গেল ডাকি,
'মোছো আঁখিজল, আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকি।'
সেই বলে গেল, 'গাঁথা সেরে নিয়ো একদিন
জীবনের কাঁটা বাছি,
নবগৃহ-মাঝে বহি এনো, তুমি গৃহহীন,
পূর্ণ মালিকাগাছি।'

৪

তখন নিশীথরাত্রি ; গেলে ঘর হতে
যে পথে চল নি কভু সে অজানা পথে।
যাবার বেলায় কোনো বলিলে না কথা,
লইয়া গেলে না কারো বিদায়বারতা।
সুপ্তিমগ্ন বিশ্ব-মাঝে বাহিরিলে একা—
অন্ধকারে খুঁজিলাম, না পেলাম দেখা।
মঙ্গলমুরতি সেই চিরপরিচিত
অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তর্হিত।

গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে ?
এ ঘর হইতে কিছু নিলে না কি সাথে ?
বিশ বৎসরের তব সুখদুঃখভার
ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার !
প্রতিদিবসের প্রেমে কতদিন ধরে
যে ঘর বাঁধিলে তুমি সুমঙ্গল-করে
পরিপূর্ণ করি তারে স্নেহের সঞ্চয়ে,
আজ তুমি চলে গেলে কিছু নাহি লয়ে ?

তোমার সংসার-মাঝে, হায়, তোমা-হীন
এখনো আসিবে কত সুদিন-দুর্দিন—
তখন এ শূন্য ঘরে চিরাভ্যাস-টানে
তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে ?
আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে—
হে কল্যাণী, গেলে যদি, গেলে মোর আগে,
মোর লাগি কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যা-তরে ?

৫

আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই—
যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই।
আমার ঘরেতে নাথ, এইটুকু স্থান—
সেথা হতে যা হারায় মেলে না সন্ধান।
অনন্ত তোমার গৃহ, বিশ্বময় ধাম,
হে নাথ, খুঁজিতে তারে সেথা আসিলাম।
দাঁড়ালেম তব সন্ধ্যা-গগনের তলে,
চাহিলাম তোমা-পানে নয়নের জলে।
কোনো মুখ, কোনো সুখ, আশাতৃষা কোনো
যেথা হতে হারাইতে 'পারে না কখনো,
সেথায় এনেছি মোর পীড়িত এ হিয়া—
দাও তারে, দাও তারে, দাও ডুবাইয়া।
ঘরে মোর নাহি আর যে অমৃতরস
বিশ্ব-মাঝে পাই সেই হারানো পরশ।

৬

ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে
তোমার করুণাপূর্ণ সুধাকণ্ঠস্বরে।
আজ তুমি বিশ্ব-মাঝে চলে গেলে যবে
বিশ্ব-মাঝে ডাকো মোরে সে করুণ রবে।
খুলি দিয়া গেলে তুমি যে গৃহদুয়ার
সে দ্বার রুধিতে কেহ কহিবে না আর।

বাহিরের রাজপথ দেখালে আমায়,
মনে রয়ে গেল তব নিঃশব্দ বিদায় ।
আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে ।
নিখিল নক্ষত্র হতে কিরণের রেখা
সীমন্তে আঁকিয়া দিক সিন্দূরের লেখা ।
একান্তে বসিয়া আজি করিতেছি ধ্যান
সবার কল্যাণে হোক তোমার কল্যাণ ।

৭

যত দিন কাছে ছিলে বলো কী উপায়ে
আপনারে রেখেছিলে এমন লুকায়ে ?
ছিলে তুমি আপনার কর্মের পশ্চাতে
অন্তর্যামী বিধাতার চোখের সাক্ষাতে ।
প্রতি দণ্ড-মুহূর্তের অন্তরাল দিয়া
নিঃশব্দে চলিয়া গেছ নম্র-নত-হিয়া ।
আপন সংসারখানি করিয়া প্রকাশ
আপনি ধরিয়াছিলে কী অজ্ঞাতবাস !
আজি যবে চলি গেলে খুলিয়া দুয়ার
পরিপূর্ণ রূপখানি দেখালে তোমার ।
জীবনের সব দিন সব খণ্ড কাজ
ছিন্ন হয়ে পদতলে পড়ি গেল আজ ।
তব দৃষ্টিখানি আজি বহে চিরদিন
চির-জনমের দেখা পলকবিহীন ।

৮

মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমা-সনে
এ বিচ্ছেদবেদনার নিবিড় বন্ধনে ।
এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল ।
তোমারি নয়নে আজ হেরিতেছি সব,
তোমারি বেদনা বিশ্বে করি অনুভব ।
তোমার অদৃশ্য হাত হেরি মোর কাজে,
তোমারি কামনা মোর কামনার মাঝে ।
দুজনের কথা দোঁহে শেষ করি লব
সে রাত্রে ঘটে নি হেন অবকাশ তব ।
বাণীহীন বিদায়ের সেই বেদনায়
চারি দিকে চাহিয়াছি ব্যর্থ বাসনায় ।
আজি এ হৃদয়ে সর্ব-ভাবনার নীচে
তোমার আমার বাণী একত্রে মিলিছে ।

৯

হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর।
সরস্বতীরূপ আজি ধরেছ মধুর,
দাঁড়ায়েছ সংগীতের শতদলদলে।
মানসসরসী আজি তব পদতলে
নিখিলের প্রতিবিম্বে রঞ্জিছে তোমায়।
চিত্তের সৌন্দর্য তব বাধা নাহি পায়—
সে আজি বিশ্বের মাঝে মিশিছে পুলকে
সকল আনন্দে আর সকল আলোকে
সকল মঙ্গল-সাথে। তোমার কঙ্কণ
কোমল কল্যাণপ্রভা করেছে অর্পণ
সকল সতীর করে। স্নেহাতুর হিয়া
নিখিল নারীর চিত্তে গিয়েছে গলিয়া।
সেই বিশ্বমূর্তি তব আমারি অন্তরে
লক্ষ্মী-সরস্বতী-রূপে পূর্ণরূপ ধরে।

শান্তিনিকেতন
৪ পৌষ [১৩০৯]

১০

তোমার সকল কথা বল নাই, পার নি বলিতে,
আপনারে খর্ব করি রেখেছিলে তুমি, হে লজ্জিতে,
যতদিন ছিলে হেথা। হৃদয়ের গূঢ় আশাগুলি
যখন চাহিত তারা কাঁদিয়া উঠিতে কণ্ঠ তুলি,
তর্জনী-ইঙ্গিতে তুমি গোপনে করিতে সাবধান
ব্যাকুল সংকোচবশে, পাছে ভুলে পায় অপমান।
আপনার অধিকার নীরবে নির্মম নিজকরে
রেখেছিলে সংসারের সবার পশ্চাতে হেলাভরে।
লজ্জার অতীত আজি মৃত্যুতে হয়েছ মহীয়সী—
মোর হৃদিপদ্মদলে নিখিলের অগোচরে বসি
নতনেত্রে বলো তব জীবনের অসমাপ্ত কথা
ভাষাবাধাহীন বাক্যে। দেহমুক্ত তব বাহুলতা
জড়াইয়া দাও মোর মর্মের মাঝারে একবার—
আমার অন্তরে রাখো তোমার অন্তিম অধিকার।

শান্তিনিকেতন
৪ পৌষ [১৩০৯]

১১

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহমন্দিরে

নিঃশব্দ চরণপাতে। ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণস্নানে। অপরূপ নব রূপখানি
লভিয়াছ এ বিশ্বের লক্ষ্মীর অক্ষয় কৃপা হতে।
স্মিতস্নিগ্ধমুগ্ধমুখে এ চিত্তের নিভৃত আলোতে
নির্বাক্ দাঁড়ালে আসি। মরণের সিংহদ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া।
আজি বাজে নাই বাদ্য, ঘটে নাই জনতা-উৎসব,
জ্বলে নাই দীপমালা ; আজিকার আনন্দগৌরব
প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ বাক্যহারা অশ্রুনিমগন।
আজিকার এই বার্তা জানে নি, শোনে নি কোনোজন।
আমার অন্তর শুধু জ্বেলেছে প্রদীপ একখানি—
আমার সংগীত শুধু একা গাঁথে মিলনের বাণী।

শান্তিনিকেতন
৪ পৌষ [১৩০৯]

১২

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গৌরব
মুহূর্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে।
ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।
উঠেছ আমার শোকযজ্ঞহুতাশনে
নবীন নির্মল মূর্তি ; আজি তুমি, সতী,
ধরিয়াছ অনিন্দিত সতীত্বের জ্যোতি,
নাহি তাহে শোকদাহ, নাহি মলিনিমা—
ক্লান্তিহীন কল্যাণের বহিয়া মহিমা
নিঃশেষে মিশিয়া গেছ মোর চিত্ত-সনে।
তাই আজি অনুভব করি সর্বমনে—
মোর পুরুষের প্রাণ গিয়েছে বিস্তারি
নিত্য তাহে মিলি গিয়া মৃত্যুহীন নারী।

শান্তিনিকেতন
৫ পৌষ [১৩০৯]

১৩

তুমি মোর জীবনের মাঝে
  মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।
চিরবিদায়ের আভা দিয়া
রাঙায়ে গিয়েছ মোর হিয়া,
এঁকে গেছে সব ভাবনায়
  সূর্যাস্তের বরনচাতুরী।

জীবনের দিক্‌চক্রসীমা
লভিয়াছে অপূর্ব মহিমা,
অশ্রুধৌত হৃদয়-আকাশে
দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী।
তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।

তুমি, ওগো কল্যাণরূপিণী,
মরণেরে করেছ মঙ্গল।
জীবনের পরপার হতে
প্রতি ক্ষণে মর্তের আলোতে
পাঠাইছ তব চিত্তখানি
মৌনপ্রেমে সজলকোমল।
মৃত্যুর নিভৃত স্নিগ্ধ ঘরে
বসে আছ বাতায়ন-'পরে—
জ্বালায়ে রেখেছ দীপখানি
চিরন্তন আশায় উজ্জ্বল।
তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী,
মরণেরে করেছ মঙ্গল।

তুমি মোর জীবন মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া।
প্রাণ তব করি অনাবৃত
মৃত্যু-মাঝে মিলালে অমৃত,
মরণেরে জীবনের প্রিয়
নিজ হাতে করিয়াছ প্রিয়া।
খুলিয়া দিয়াছ দ্বারখানি,
যবনিকা লইয়াছ টানি,
জন্মমরণের মাঝখানে
নিস্তব্ধ রয়েছ দাঁড়াইয়া।
তুমি মোর জীবন মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া।

বোলপুর। শান্তিনিকেতন
২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

১৪

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি—
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু-চারিটি
স্মৃতির খেলেনা-ক'টি বহু যত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি রেখেছিলে ঘরে।

যে প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ধারা
ভাসাইয়া যায় কত রবিচন্দ্রতারা,
তারি কাছ হতে তুমি বহু ভয়ে ভয়ে
এই ক'টি তুচ্ছ বস্তু চুরি করে লয়ে
লুকায়ে রাখিয়াছিলে, বলেছিলে মনে,
'অধিকার নাই কারো আমার এ ধনে।'
আশ্রয় আজিকে তারা পাবে কার কাছে ?
জগতের কারো নয়, তবু তারা আছে।
তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ,
তোমারে তেমনি আজ রাখে নি কি কেহ ?

বোলপুর
২ পৌষ [১৩০৯]

১৫

এ সংসারে একদিন নববধূবেশে
তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে,
রাখিলে আমার হাতে কম্পমান হাত,
সে কি অদৃষ্টের খেলা, সে কি অকস্মাৎ ?
শুধু এক মুহূর্তের এ নহে ঘটনা,
অনাদিকালের এ আছিল মন্ত্রণা।
দোঁহার মিলনে মোরা পূর্ণ হব দোঁহে,
বহু যুগ আসিয়াছি এই আশা বহে।
নিয়ে গেছ কতখানি মোর প্রাণ হতে,
দিয়ে গেছ কতখানি এ জীবনস্রোতে!
কত দিনে কত রাত্রে কত লজ্জাভয়ে
কত ক্ষতিলাভে কত জয়ে পরাজয়ে
রচিতেছিলাম যাহা মোরা শ্রান্তিহারা
সাঙ্গ কে করিবে তাহা মোরা দোঁহে ছাড়া ?

শান্তিনিকেতন
২ পৌষ [১৩০৯]

১৬

স্বল্প-আয়ু এ জীবনে যে-কয়টি আনন্দিত দিন
কম্পিত-পুলকভরে, সংগীতের-বেদনা-বিলীন,
লাভ করেছিলে, লক্ষ্মী, সে কি তুমি নষ্ট করি যাবে ?
সে আজি কোথায় তুমি যত্ন করি রাখিছ কী ভাবে
তাই আমি খুঁজিতেছি। সূর্যাস্তের স্বর্ণমেঘস্তরে
চেয়ে দেখি একদৃষ্টে— সেথা কোন্ করুণ অক্ষরে

লিখিয়াছ সে জন্মের সায়াহ্নের হারানো কাহিনী !
আজি এই দ্বিপ্রহরে পল্লবের মর্মররাগিণী
তোমার সে কবেকার দীর্ঘশ্বাস করিছে প্রচার !
আতপ্ত শীতের রৌদ্রে নিজহস্তে করিছ বিস্তার
কত শীতমধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা !
আপনার পানে চেয়ে বসে বসে ভাবি এই কথা—
কত তব রাত্রিদিন কত সাধ মোরে ঘিরে আছে,
তাদের ক্রন্দন শুনি ফিরে ফিরে ফিরিতেছ কাছে।

শান্তিনিকেতন
৩ পৌষ ১৩০৯

১৭

বজ্র যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি
কে জানিত তব শোক সেইমত করি
আনি দিবে অকস্মাৎ জীবনে আমার
বাধাহীন মিলনের নিবিড় সঞ্চার !
মোর অশ্রুবিন্দুগুলি কুড়ায়ে আদরে
গাঁথিয়া সীমন্তে পরি ব্যর্থশোক-'পরে
নীরবে হানিছ তব কৌতুকের হাসি।
ক্রমে সবা হতে যত দূরে গেলে ভাসি
তত মোর কাছে এলে। জানি না কী করে
সবারে বঞ্চিয়া তব সব দিলে মোরে।
মৃত্যু-মাঝে আপনারে করিয়া হরণ
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন,
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—
এই কথা মনে জানি নাই মোর শোক।

শান্তিনিকেতন
৬ পৌষ [১৩০৯]

১৮

সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণী,
আমার জীবন আজি সাজাও তেমনি
নির্মল সুন্দর করে। ফেলি দাও বাছি
যেথা আছে যত ক্ষুদ্র তৃণকুটাগাছি—
অনেক আলস্যক্লান্ত দিনরজনীর
উপেক্ষিত ছিন্নখণ্ড যত। আনো নীর,
সকল কলঙ্ক আজি করো গো মার্জনা,
বাহিরে ফেলিয়া দাও যত আবর্জনা।
যেথা মোর পূজাগৃহ নিভৃত মন্দিরে
সেথায় নীরবে এসো দ্বার খুলি ধীরে—

মঙ্গলকনকঘটে পুণ্যতীর্থজল
সযত্নে ভরিয়া রাখো, পূজাশতদল
স্বহস্তে তুলিয়া আনো। সেথা দুইজনে
দেবতার সম্মুখেতে বসি একাসনে।

৭ পৌষ [১৩০৯]

১৯

পাগল বসন্তদিন কতবার অতিথির বেশে
তোমার আমার দ্বারে বীণা হাতে এসেছিল হেসে
লয়ে তার কত গীত, কত মন্ত্র মন ভুলাবার,
জাদু করিবার কত পুষ্পপত্র আয়োজনভার।—
কুহুতানে হেঁকে গেছে, 'খোলো ওগো, খোলো দ্বার খোলো
কাজকর্ম ভোলো আজি, ভোলো বিশ্ব, আপনারে ভোলো।'
এসে এসে কত দিন চলে গেছে দ্বারে দিয়ে নাড়া—
আমি ছিনু কোন্ কাজে, তুমি তারে দাও নাই সাড়া।
আজ তুমি চলে গেছ, সে এল দক্ষিণবায়ু বাহি—
আজ তারে ক্ষণকাল ভুলে থাকি হেন সাধ্য নাহি।
আনিছে সে দৃষ্টি তব, তোমার প্রকাশহীন বাণী,
মর্মরি তুলিছে কুঞ্জে তোমার আকুল চিত্তখানি।
মিলনের দিনে যারে কতবার দিয়েছিনু ফাঁকি
তোমার বিচ্ছেদ তারে শূন্যঘরে আনে ডাকি ডাকি।

শান্তিনিকেতন
২৫ পৌষ ১৩০৯

২০

এসো, বসন্ত, এসো আজ তুমি
আমারো দুয়ারে এসো।
ফুল তোলা নাই, ভাঙা আয়োজন,
নিবে গেছে দীপ, শূন্য আসন,
আমার ঘরের শ্রীহীন মলিন
দীনতা দেখিয়া হেসো।
তবু, বসন্ত, তবু আজ তুমি
আমারো দুয়ারে এসো।

আজিকে আমার সব বাতায়ন
রয়েছে, রয়েছে খোলা।
বাধাহীন দিন পড়ে আছে আজ,
নাই কোনো আশা, নাই কোনো কাজ,

আপনা-আপনি দক্ষিণবায়ে
দুলিছে চিত্তদোলা।
শূন্য ঘরের সব বাতায়ন
আজিকে রয়েছে খোলা।

কত দিবসের হাসি ও কান্না
হেথা হয়ে গেছে সারা।
ছাড়া পাক তারা তোমার আকাশে,
নিশ্বাস পাক তোমার বাতাসে,
নব নব রূপে লভুক জন্ম
বকুলে চাঁপায় তারা—
গত দিবসের হাসি ও কান্না
যত হয়ে গেছে সারা।

আমার বক্ষে বেদনার মাঝে
করো তব উৎসব।
আনো তব হাসি, আনো তব বাঁশি,
ফুলপল্লব আনো রাশি রাশি,
ফিরিয়া ফিরিয়া গান গেয়ে যাক
যত পাখি আছে সব।
বেদনা আমার ধ্বনিত করিয়া
করো তব উৎসব।

সেই কলরবে অন্তর-মাঝে
পাব, পাব আমি সাড়া।
দ্যুলোকে ভূলোকে বাঁধি এক দল
তোমরা করিবে যবে কোলাহল,
হাসিতে হাসিতে মরণের দ্বারে
বারে বারে দিবে নাড়া—
সেই কলরবে অন্তর-মাঝে
পাব, পাব আমি সাড়া।

শান্তিনিকেতন
২৮ পৌষ ১৩০৯

২১

বহুরে যা এক করে, বিচিত্রেরে করে যা সরস,
প্রভূতেরে করি আনে নিজ ক্ষুদ্র তর্জনীর বশ,
বিবিধপ্রয়াসক্ষুব্ধ দিবসেরে লয়ে আসে ধীরে
সুপ্তিসুনিবিড় শান্ত স্বর্ণময় সন্ধ্যার তিমিরে
ধ্রুবতারাদীপদীপ্ত সুতৃপ্ত নিভৃত অবসানে,
বহুবাক্যব্যাকুলতা ডুবায় যা একখানি গানে

বেদনার সুধারসে— সেই প্রেম হতে মোরে, প্রিয়া,
রেখো না বঞ্চিত করি ; প্রতিদিন থাকিয়ো জাগিয়া ;
আমার দিনান্ত-মাঝে কঙ্কণের কনককিরণ
নিদ্রার আঁধারপটে আঁকি দিবে সোনার স্বপন ;
তোমার চরণপাত মোর স্তব্ধ সায়াহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দে পড়িবে ধরা আরক্তিম অলক্ত-আভাসে ;
এ জীবন নিয়ে যাবে অনিমেষ নয়নের টানে
তোমার আপন কক্ষে পরিপূর্ণ মরণের পানে।

শান্তিনিকেতন
১৬ পৌষ [১৩০৯]

২২

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি
যে ভাবে সুন্দর তিনি সর্ব চরাচরে,
যে ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,
যে ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী,
যে ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,
যে ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান,
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান,
যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা,
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

শান্তিনিকেতন
১ মাঘ ১৩০৯

২৩

জ্বালো ওগো, জ্বালো ওগো, সন্ধ্যাদীপ জ্বালো—
হৃদয়ের এক প্রান্তে ওইটুকু আলো
স্বহস্তে জাগায়ে রাখো। তাহারি পশ্চাতে
আপনি বসিয়া থাকো আসন্ন এ রাতে
যতনে বাঁধিয়া বেণী সাজি রক্তাম্বরে
আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত কাড়িবার তরে
জীবনের জাল হতে। বুঝিয়াছি আজি
বহুকর্মকীর্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি
শুষ্ক বোঝা হয়ে থাকে, সব হয় মিছে
যদি সেই স্তূপাকার উদ্‌যোগের পিছে

রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবী
প্রমোদনাথ সেনের সৌজন্যে

না থাকে একটি হাসি ; নানা দিক হতে
নানা দর্প নানা চেষ্টা সন্ধ্যার আলোতে
এক গৃহে ফিরে যদি নাহি রাখে স্থির
একটি প্রেমের পায়ে শ্রান্ত নতশির।

১৪ পৌষ [১৩০৯]

২৪

গোধূলি নিঃশব্দে আসি আপন অঞ্চলে ঢাকে যথা
কর্মক্লান্ত সংসারের যত ক্ষত, যত মলিনতা,
ভগ্নভবনের দৈন্য, ছিন্নবসনের লজ্জা যত—
তব লাগি স্তব্ধ শোক স্নিগ্ধ দুই হাতে সেইমত
প্রসারিত করে দিক অবারিত উদার তিমির
আমার এ জীবনের বহু ক্ষুব্ধ দিনযামিনীর
স্খলন খণ্ডতা ক্ষতি ভগ্নদীর্ণ জীর্ণতার 'পরে—
সব ভালো-মন্দ নিয়ে মোর প্রাণ দিক এক ক'রে
বিষাদের একখানি স্বর্ণময় বিশাল বেষ্টনে।
আজ কোনো আকাঙ্ক্ষার কোনো ক্ষোভ নাহি থাক মনে,
অতীত অতৃপ্তি-পানে যেন নাহি চাই ফিরে ফিরে—
যাহা-কিছু গেছে যাক, আমি চলে যাই ধীরে ধীরে
তোমার মিলনদীপ অকম্পিত যেথায় বিরাজে
ত্রিভুবনদেবতার ক্লান্তিহীন আনন্দের মাঝে।

শান্তিনিকেতন
৩ জানুয়ারি ১৯০৩

২৫

জাগো রে জাগো রে চিত্ত   জাগো রে,
জোয়ার এসেছে অশ্রু-   সাগরে।
কূল তার নাহি জানে,
বাঁধ আর নাহি মানে,
তাহারি গর্জনগানে   জাগো রে।
তরী তোর নাচে অশ্রু-   সাগরে।

আজি এ উষার পুণ্য   লগনে
উঠেছে নবীন সূর্য   গগনে।
দিশাহারা বাতাসেই
বাজে মহামন্ত্র সেই।
অজানা যাত্রার এই   লগনে
দিক হতে দিগন্তের   গগনে।

জানি না উদার শুভ্র আকাশে
কী জাগে অরুণদীপ্ত আভাসে।
জানি না কিসের লাগি
অতল উঠেছে জাগি,
বাহু তোলে কারে মাগি আকাশে—
পাগল কাহার দীপ্ত আভাসে।

শূন্য মরুময় সিন্ধু- বেলাতে
বন্যা মাতিয়াছে রুদ্র খেলাতে।
হেথায় জাগ্রত দিন
বিহঙ্গের গীতহীন,
শূন্য এ বালুকালীন বেলাতে,
এই ফেন-তরঙ্গের খেলাতে।

দুলে রে দুলে রে অশ্রু দুলে রে
আঘাত করিয়া বক্ষ- কূলে রে।
সম্মুখে অনন্ত লোক,
যেতে হবে যেথা হোক—
অকূল আকুল শোক দুলে রে,
ধায় কোন্ দূর স্বর্ণ- কূলে রে।

আঁকড়ি থেকো না অন্ধ ধরণী,
খুলে দে খুলে দে বন্ধ তরণী।
অশান্ত পালের 'পরে
বায়ু লাগে হাহা করে
দূরে তোর থাক্ পড়ে ধরণী।
আর না রাখিস রুদ্ধ তরণী।

১১ পৌষ ১৩০৯

২৬

আজিকে তুমি ঘুমাও, আমি জাগিয়া রব দুয়ারে—
রাখিব জ্বালি আলো।
তুমি তো ভালো বেসেছ, আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হবে ভালো।
আমার লাগি তোমারে আর হবে না কভু সাজিতে,
তোমার লাগি আমি
এখন হতে হৃদয়খানি সাজায়ে ফুলরাজিতে
রাখিব দিনযামী।

তোমার বাহু কত-না দিন শ্রান্তি-দুখ ভুলিয়া
গিয়েছে সেবা করি,
আজিকে তারে সকল তার কর্ম হতে তুলিয়া
রাখিব শিরে ধরি।
এবার তুমি তোমার পূজা সাঙ্গ করি চলিলে
সঁপিয়া মনপ্রাণ,
এখন হতে আমার পূজা লহো গো আঁখিসলিলে—
আমার স্তবগান।

শান্তিনিকেতন
২৩ পৌষ ১৩০৯

২৭

ভালো তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা,
তোমার হাসিটি ছিল বড়ো সুখে ভরা
মিলি নিখিলের স্রোতে
জেনেছিলে খুশি হতে,
হৃদয়টি ছিল তাই হৃদিপ্রাণহরা।
তোমার আপন ছিল এই শ্যাম ধরা।

আজি এ উদাস মাঠে আকাশ বাহিয়া
তোমার নয়ন যেন ফিরিছে চাহিয়া।
তোমার সে হাসিটুক,
সে চেয়ে-দেখার সুখ
সবারে পরশি চলে বিদায় গাহিয়া
এই তালবন গ্রাম প্রান্তর বাহিয়া।

তোমার সে ভালো-লাগা মোর চোখে আঁকি
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি।
আজি আমি একা-একা
দেখি দু-জনের দেখা—
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি
আমার তারায় তব মুগ্ধদৃষ্টি আঁকি।

এই-যে শীতের আলো শিহরিছে বনে,
শিরীষের পাতাগুলি ঝরিছে পবনে—
তোমার আমার মন
খেলিতেছে সারাক্ষণ
এই ছায়া-আলোকের আকুল কম্পনে
এই শীতমধ্যাহ্নের মর্মরিত বনে।

আমার জীবনে তুমি বাঁচো, ওগো বাঁচো।
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচো—
যেন আমি বুঝি মনে
অতিশয় সংগোপনে।
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমারি জীবনে তুমি বাঁচো, ওগো বাঁচো।

১ পৌষ [১৩০৯]

নাটক ও প্রহসন

ব্যঙ্গকৌতুক

ভদ্রাসন-বাড়ি কিরকম হবে না জানি ! কড়িগুলো মাথায় ভেঙে না পড়লে বাঁচি । এই তো একখানি ভাঙা চৌকি আসবাবের মধ্যে । এ আমার ভর সইবে না । সেই অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হয়ে গেল— আর তো পারি নে— এই মাটিতেই বসা যাক ।

কোঁচা দিয়া ধুলা ঝাড়িয়া একটা খবরের কাগজ মাটিতে পাতিয়া
উপবেশন ও গুন্‌গুন্‌ স্বরে গান

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সায় ভোজ !
ডিশের পরে ডিশ
শুধু মটন কারি ফিশ,
সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা দু-চার রয়াল ডোজ !
পরের তহবিল
চোকায় উইল্‌সনের বিল—
থাকি মনের সুখে হাস্যমুখে কে কার রাখে খোঁজ !

কই রে ? তামাক এল ? ও কী রে ? শুধু কলকে ? হুঁকো কই ? এখানে ছ পয়সায় হুঁকো পাওয়া যায় না ? কলকেটার দাম দু আনা ? হ্যা দেখো বাপু চন্দ্রকান্ত, বাইরে থেকে আমাকে দেখে যতটা বোকা মনে হয় আমি ততটা নই । শরীরটা যত মোটা, বুদ্ধিটা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম । তোমার বাবু যে হুঁকোটা কলকেটা তামাকটা পর্যন্ত আয়রন্‌চেস্টে তুলে রেখে দেন, এতক্ষণে তার কারণ বোঝা গেল । কেবল তোমার মতো রত্নটিকে বাইরে রাখাই তাঁর ভুল হয়েছে । বোধ হয় বেশি দিন বাইরে থাকতেও হবে না । কোম্পানি-বাহাদুর একবার খবরটি পেলেই পাহারা বসিয়ে খুব হেপাজতের সঙ্গেই তোমাকে রাখবেন । যা হোক, তামাক না খেয়ে তো আর বাঁচি নে । (কলিকায় মুখ দিয়া তামাক টানিয়া কাশিতে কাশিতে) ওরে বাবা, এ কোথাকার তামাক ! এ যে উইল করে টানতে হয় । এর দু টান টানলে স্বয়ং বাবা ভোলানাথের মাথার চাঁদি ফট্‌ করে ফেটে যায়, নন্দীভৃঙ্গীর ভিরমি লাগে । কাজ নেই বাপু, থাক্‌ । বাবু আগে আসুন । কিন্তু, বাবুর আসবার জন্যে তো কোনোরকম তাড়া দেখছি নে । সে বোধ হয় প্যাটিগুলো একটি একটি করে শেষ করছে । এ দিকে আমার পেট এমনই জ্বলে উঠেছে যে, মনে হচ্ছে যেন এখনই কোঁচায় আগুন ধরে যাবে । তৃষ্ণাও পেয়েছে । কিন্তু, জল চাইলেই আমাদের চন্দ্রকান্ত বলে বসবেন গেলাস কিনে আনতে হবে, বাবু বন্ধ করে রেখে গেছেন । কাজ নেই, বাগানের ডাব খাওয়া যাক ।

ওহে বাপু চন্দ্র, একটি কাজ করতে পার ? বাগান থেকে চট করে একটি ডাব পেড়ে আনতে পার ? বড়ো তেষ্টা পেয়েছে ।

কেন ? ডাব পাওয়া যাবে না কেন ? বাগানে তো ডাব বিস্তর দেখে এলুম ।

সব গাছ জমা দেওয়া হয়েছে ? তা, হোক-না বাপু, একটি ডাবও মিলবে না ?

পয়সা চাই ? পয়সা তো আর নেই । তবে থাক্‌, বাবু আসুন, তার পরে দেখা যাবে ।— সঙ্গে মাইনের টাকা আছে, কিন্তু ওকে ভাঙাতে দিতে সাহস হয় না । এখনো কোম্পানির মুল্লুকে যে এতবড়ো একটি ডাকাত বাইরে ছাড়া আছে তা আমি জানতুম না— যাই হোক, এখন উদয় এলে যে বাঁচি ।

ঐ বুঝি আসছে । পায়ের শব্দ শুনছি । আঃ, বাঁচা গেল । ওহে উদয়, ওহে উদয় ! কই, না তো । তুমি কে হে ?

বাবু তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন ? তার চেয়ে নিজে এলেই তো ভালো করতেন । খিদেয় যে মারা গেলুম ।

হোটেলের বাবু ? কেরানিবাবু ? কই, তাঁর সঙ্গে আমার তো কোনো আত্মীয়তা নেই। কিছু খাবার পাঠিয়েছেন বলতে পার ? অয়স্টার প্যাটি ?

পাঠান নি ? বিল পাঠিয়েছেন ? কৃতার্থ করেছেন আর-কি। যে বাবুটির নামে বিল তিনি এখানে উপস্থিত নেই।

আরে, না রে না। আমি না। এও তো ভালো বিপদে পড়লুম।— আরে, মাইরি না। কী গেরো ! তোমাকে ঠকিয়ে আমার লাভ কী বাপু ? আমি নিমন্ত্রণ খেতে এসে তিন ঘণ্টা এখানে বসে আছি— তুমি হোটেল থেকে আসছ, তবু তোমাকে দেখেও অনেকটা তৃপ্তি হচ্ছে। বোধ হয় তোমার ঐ চাদরখানা সিদ্ধ করলে ওর থেকে নিদেন— ভয় নেই, আমি তোমার চাদর নেব না, কিন্তু বিলটিও চাই নে।

এ তো ভালো মুশকিল দেখছি। ওগো, না গো না। আমি উদয়বাবু নই, আমি অক্ষয়বাবু। কী গেরো ! আমার নাম আমি জানি নে, তুমি জান ! অত গোলে কাজ কী বাপু, তুমি নীচে গিয়ে একটু বোসো, উদয়বাবু এখনই আসবেন।

বিধাতা সকালবেলায় এইজন্যেই কি ডান চোখ নাচিয়েছিলে ? হোটেল থেকে ডিনার না এসে বিল এসে উপস্থিত !—

সখি, কী মোর করম ভেল !
পিয়াসা লাগিয়া জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল !

হে বিধি, তোমারই বিচারে সমুদ্রমন্থনে একজন পেলে সুধা, আর-একজন পেলে বিষ। হোটেল-মন্থনেও কি একজন পাবে মজা, আর-একজন পাবে তার বিল ! বিলটাও তো কম দিনের নয় দেখছি।

তুমি আবার কে হে ? বাবু পাঠিয়ে দিলে ? বাবুর যথেষ্ট অনুগ্রহ। কিন্তু, তিনি কি মনে করেছেন তোমার মুখখানি দেখেই আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হবে ? তোমার বাবু তো বড়ো ভদ্রলোক দেখছি হে।

কী বললে ? কাপড়ের দাম ? কার কাপড়ের দাম ?

উদয়বাবু কাপড় কিনবেন আর অক্ষয়বাবু তার দাম দেবে ? তোমার তো বিবেচনাশক্তি বেশ দেখছি।

সত্যি নাকি ? কিসে ঠাওরালে আমারই নাম উদয়বাবু ? কপালে কি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রেখেছি ? আমার অক্ষয়বাবু নামটা কি তোমার পছন্দ হল না ?

নাম বদলেছি ? আচ্ছা বাপু, শরীরটি তো বদলানো সহজ ব্যাপার নয়। উদয়বাবুর সঙ্গে কোন্‌খানটা মেলে, বলো দেখি।

উদয়বাবুকে কখনো চাক্ষুষ দেখ নি ? আচ্ছা, একটু সবুর করো, তোমার মনের আক্ষেপ মিটিয়ে দেব। বিস্তর দেরি হবে না, তিনি এলেন ব'লে।

আরে ম'ল ! আবার কে আসে ? মশায়ের কোত্থেকে আসা হল ? মশায়েরও এখানে নিমন্ত্রণ আছে বুঝি ?

বাড়িভাড়া ? কোন্ বাড়ির ভাড়া মশায় ? এই বাড়ির ? ভাড়াটা কত হিসাবে ?

মাসে সতেরো টাকা ? তা হলে হিসেব করুন দেখি সাড়ে তিন ঘণ্টায় কত ভাড়া হয়। ঠাট্টা করছি নে মশায়, মনের সেরকম প্রফুল্ল অবস্থা নয়। এ বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আমি সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল আছি। সেজন্যেও যদি ভাড়া দিতে হয় তো ন্যায্য হিসেব করে নিন। তামাকটা পর্যন্ত পয়সা দিয়ে খেয়েছি।

আজ্ঞে না, আপনি ঠিকটি অনুমান করতে পারেন নি— আপনার ঈষৎ ভুল হয়েছে— আমার নাম উদয় নয়, অক্ষয়। এরকম সামান্য ভুলে অন্য সময় বড়ো একটা কিছু আসে যায় না, কিন্তু বাড়িভাড়া-আদায়ের সময় বাপ-মায়ে যার যে নাম দিয়েছেন সেইটে বাঁচিয়ে কাজ করলেই সুবিধে হয়।

আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলছেন ? মাপ করবেন, ঐটি পারব না। সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে পেটের জ্বালায় মরছি, ঠিক যেই খাবারটি আসবার সময় হল অমনি আপনি গাল দিচ্ছেন বলেই যে বাড়ি ছেলে চলে যাব আমাকে তেমন গর্দভ ঠাওরাবেন না। আপনি ঐখানেই বসুন, যা যা বলবার অভিপ্রায় আছে বলে যান, আমি আহারান্তে বাড়ি ছেড়ে যাব।

বকে বকে আমার গলা শুকিয়ে এল, আর তো বাঁচি নে। খিদেয় নাড়িগুলো বেবাক হজম হয়ে গেল। ঐ-যে পায়ের শব্দ! ওহে উদয়, আমার অন্ধের নড়ি, আমার সাগর-সেঁচা সাত রাজার ধন মানিক, একবার উদয় হও হে! আর তো প্রাণ বাঁচে না।

তুমি আবার কে হে ? যদি গালমন্দ দেবার থাকে তো ঐখানে বসে আরম্ভ করে দাও। দোহার্কি করবার অনেকগুলি লোক উপস্থিত আছেন।

হরিবাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ? শুনে বড়ো সন্তোষ লাভ করলুম। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার পরম বন্ধু যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন তাঁদের কোনো দেখাসাক্ষাৎ নেই আর যাঁদের সঙ্গে আমার কোনো কালে কোনো পরিচয় নেই তাঁরা যে আজ প্রাতঃকাল থেকে আমাকে এত ঘন ঘন খাতির করছেন এর কারণ কি ? আচ্ছা মশায়, হরিবাবু-নামক কোনো একটি ভদ্রলোক আমাকে কেন এমন অসময়ে স্মরণ করলেন এবং হঠাৎ এতই অধৈর্য হয়ে উঠলেন বলতে পারেন কি ?

কী ! আমি আমার স্ত্রীর বালা গড়াবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে নমুনাস্বরূপ গহনা এনে ফিরিয়ে দিচ্ছি নে ? দেখো, এ সম্বন্ধে আমার অনেকগুলি কথা বলবার ছিল, কিন্তু আপাতত একটি বললেই যথেষ্ট হবে— আমি কারও কাছ থেকে কোনো গহনা আনি নি এবং আমার স্ত্রীই নেই। প্রধান প্রধান কথা আর যা বলবার ছিল সে আজকের মতো মাপ করবেন— গলা শুকিয়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরছি। আপনি আর আধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করুন, সমস্ত সমাচার অবগত হবেন। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে উদয়, ওরে উদো, ওরে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা পাজি ছুঁচো ড্যাম শুয়ার ইস্টুপিড— ওরে পেট যে জ্বলে গেল, গলা যে শুকিয়ে যায়, মাথা যে ফেটে যাচ্ছে— ওরে নরাধম, কুলাঙ্গার !

আরে না মশায় ! আপনাদের সম্ভাষণ করছি নে। আপনারা হঠাৎ চঞ্চল হবেন না। আমি পেটের জ্বালায়, মনের খেদে, আমার প্রাণের বন্ধুকে ডাকছি। আপনারা বসুন।

আর বসতে পারছেন না ? অনেক দেরি হয়ে গেছে ? সে কথা আর আমাকে বলতে হবে না। দেরি হয়েছে সন্দেহ নেই। তা হলে আপনাদের আর পীড়াপীড়ি করে ধরে রাখতে চাই নে। তবে আজকের মতো আপনারা আসুন। আপনাদের সঙ্গে মিষ্টালাপে এতক্ষণ সময়টা বেশ সুখে কেটেছিল।

কিন্তু, এখন যে-কথাগুলো বলছেন ওগুলো কিছু অধিক পরিমাণেই বলছেন। খুব পরম বন্ধুকেও মানুষ ভালোবেসে শ্যালক সম্ভাষণ করতে হঠাৎ কুণ্ঠিত হয়, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে অতি অল্পক্ষণের আলাপেই যে আপনারা এতটা বেশি ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা করছেন সেজন্যে আমি মনে মনে কিছু লজ্জাবোধ করছি। জানবেন আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক কোনোরকম অসদ্ভাব নেই, কিন্তু আপনারা আমার কাছে যতটা প্রত্যাশা করছেন আমি ততটা দিতে একেবারে অক্ষম।

মশায়রা আর বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনারা বোধ হয় দু বেলা নিয়মিত আহার করে থাকেন, খিদে পেলে মানুষের মেজাজটা কিরকম হয় ঠিক জানেন না, তাই আমাকে এমন অবস্থায় ঘাঁটাতে সাহস করছেন।

আবার ! ফের ! দেখো বাপু, আমার সঙ্গে পারবে না। শরীরটা দেখেই বুঝতে পারছ না ! বহু কষ্টে রাগ চেপে আছি, পাছে একটা খুনোখুনি কাণ্ড করে বসি। আচ্ছা, আমাকে রাগাও দেখি। দেখি তোমাদের কত ক্ষমতা। কিছুতেই রাগাতে পারবে না। এই দেখো আমি খুব গম্ভীর হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসলুম।

ও বাবা ! এরা যে সবাই মিলে মারধোর করবার জোগাড় করে ! খালি পেটে, খিদের উপর, মারটা সয় না দেখছি। আচ্ছা বাপু, তোমরা সবাই বোসো। তোমাদের কার কত পাওনা আছে বলো।—

ভাগ্যি মাইনের টাকাটা পকেটে ছিল, নইলে আজ নিতান্তই ধনঞ্জয়কে স্মরণ করে এক-পেট খিদেসুদ্ধ দৌড় মারতে হত। আপাতত প্রাণটা বাঁচাই, তার পর টাকাটা উদয়ের কাছ থেকে আদায় করে নিলেই হবে।

তোমার পাঁচ টাকা বৈ পাওয়া নয়, কিন্তু তুমি পঞ্চান্ন টাকার গাল পেড়ে নিয়েছ বাপু— এই নাও তোমার টাকা।

ওহে বাপু, তোমার হোটেলের বিল এই শুধে দিচ্ছি, যদি কখনো অসময়ে তোমাদের শরণাগত হতে হয় তা হলে স্মরণ রেখো।

তোমার তিন মাসের বাড়িভাড়া পাওনা? এক মাসের টাকাটা আজ দিচ্ছি, বাকি পরে নিয়ো। তুমি তো ভাই, তোমার গালমন্দ আমাকে ষোলো-আনাই চুকিয়ে দিয়েছ, তাতে বোধ করি তোমার মনটা কতকটা খোলসা হয়েছে, এখন আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যাও।

ওহে বাপু, তোমার গহনা ফিরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। যদি আমার স্ত্রী থাকতেন আর তোমার গহনা তাঁকে দিতুম তা হলেও ফিরিয়ে আনা শক্ত হত ; আর যখন তিনি বর্তমান নেই এবং তোমার গহনা তাঁকে দিই নি, তখন ফিরিয়ে আনা আরো কত কঠিন তা একটুখানি ভেবে দেখলে তুমিও হয়তো বুঝতে পারবে। তবু যদি পীড়াপীড়ি কর তা হলে কাজেই তোমার হরিবাবুর ওখানে আমাকে যেতে হবে, কিন্তু খাবারটা আসে কি না আর-একটু না দেখে যেতে পারছি নে।— উঃ! আর তো পারি নে। চন্দ্র, ওহে চন্দ্র! এখানে উদয়ের তো কোনো সম্পর্ক নেই, এখন তুমি সুদ্ধ অস্ত গেলে আমি যে অন্ধকার দেখি। চন্দ্র! ওহে চন্দ্রকান্ত! এই-যে এসেছ। চন্দ্র, তুমি তো তোমার বাবুকে চেন, সত্য করে বলো দেখি আজ কাল এবং পরশুর মধ্যে তিনি কি হোটেল থেকে ফিরবেন।

বোধ হয় ফিরবেন না? এতক্ষণ পরে তোমার এই কথাটি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে। যা হোক, বড্ড খিদে পেয়েছে, এখন আর গাল দেবার সময় নেই, এই আধুলিটি নিয়ে যদি চট করে কিছু খাবার কিনে আন তা হলে প্রাণ রক্ষে হয়।

লোকটা নবাবি করে বেড়ায় অথচ কাজকর্ম কিছু নেই, আমরা ভাবতুম চালায় কী করে! এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। কিন্তু, প্রত্যহ এতগুলি গাল হজম ক'রে, এতগুলি বিল ঠেকিয়ে, এতগুলো লোক খেদিয়ে রাখা তো কম কাণ্ড নয়। এতে মজুরি পোষায় না, এর চেয়ে ঘানি ঠেলেও সুখ আছে।

কী হে! শুধু মুড়ি নিয়ে এলে? আর কিছু পাওয়া গেল না? পয়সা কিছু ফিরেছে? না? আচ্ছা, তবে দাও মুড়িই দাও।

আহার

ওহে চন্দ্র, কী বলব, ক্ষুধার চোটে এই বাসি মুড়ি যেন সুধা ব'লে বোধ হচ্ছে। অনেক নিমন্ত্রণ খেয়েছি, কিন্তু এমন সুখ পাই নি। চন্দ্র, তুমিই সুধাকর বটে, কিন্তু আজকে কলঙ্কের ভাগটাই কিছু বেশি দেখা গেল। ডাবও একটা এনেছ দেখছি, এর জন্যেও স্বতন্ত্র কিছু দিতে হবে নাকি?

হবে না? শরীরে দয়ামায়া কিছু আছে বোধ হচ্ছে, এখন যদি একটি গাড়ি ডেকে দাও তো আস্তে আস্তে বিদায় হই।

গাড়ি এখানে পাওয়া যায় না? তবে তো বড়ো বিপদে ফেললে। আমি এখন না খেয়ে কাহিল শরীরে দেড় ক্রোশ রাস্তা হাঁটতে পারব না ; যখন সম্মুখে আহারের আশা ছিল তখন পেরেছিলুম।— কী করব! বেরিয়ে পড়া যাক।

কী সর্বনাশ! এই সময়ে আবার হরিবাবুর ওখানে যেতে হবে? চন্দ্র, তুমি আজ আমার বিস্তর উপকার করেছ, এখন আর কিছু করতে হবে না, এই ভদ্রলোকের ছেলেটিকে বুঝিয়ে দাও আমি উদয়বাবু নই, আমি আহিরীটোলার অক্ষয়বাবু।

ও তোমার কথা বিশ্বাস করবে না? সেজন্যে ওকে আমি বেশি দোষ দিতে পারি নে, বোধ হয় তোমাকে ও অনেক দিন থেকে চেনে। যা হোক, আর ঝগড়া করবার সামর্থ্য নেই, আস্তে আস্তে হরিবাবুর ওখানেই যাওয়া যাক। বাপু, যেরকম অবস্থা দেখছ পথে যদি একটা কিছু ঘটে দাহ করবার

ব্যয়টা তোমার স্কন্ধে পড়বে— আগে থাকতে বলে রাখলুম।

চন্দ্র, তুমি আবার হাত বাড়াও কেন হে! তোমাদের কল্যাণে যেরকম সস্তায় আজ নেমন্তন্ন খেয়ে গেলুম বহুকাল আমার আর খিদে থাকবে না। আরো কী চাও?

ও! বকশিশ! সেটা চুকিয়ে দেওয়াই ভালো। যখন এতই করলেম তখন সর্বশেষে ঐ খুঁতটুকু আর রাখব না। কিন্তু আমার কাছে আর একটিমাত্র টাকা বাকি আছে। তার মধ্যে বারো-আনা আমি গাড়িভাড়ার জন্যে রেখে দিতে চাই। তোমার কাছে খুচরো, যদি কিছু থাকে তা হলে ভাঙিয়ে—

খুচরো নেই? (পকেট উলটাইয়া শেষ টাকাটি দিয়া) তবে এই নাও বাপু। তোমাদের বাড়ি থেকে বেরোলুম একেবারে গজভুক্তকপিত্থবৎ।

কিন্তু এই-যে টাকাগুলি দিলুম, উদয়ের কাছ থেকে ফিরে আদায় করবার কী উপায় করা যায়! একটা দামি জিনিস যদি কিছু পাওয়া যায় তো আটক করে রাখি। দামি জিনিসের মধ্যে তো দেখছি ঐ চন্দ্রকান্ত; কিন্তু যেরকম দেখলুম ওঁকে সংগ্রহ করা আমার কর্ম নয়, আমাকে উনি ট্যাঁকে গুঁজে নিতে পারেন।

(কোণে একটা দেরাজ সবলে খুলিয়া) বাঃ, এই তো ঠিক হয়েছে। চেনটিও দিব্যি। তা হলে ঘড়িসুদ্ধ এইটি দখল করা যাক।

কী হে চন্দ্র, এত ব্যস্ত কেন?

পুলিস! পুলিস আসছে?

আমাকে পালাতে হবে? কেন, কী দুষ্কর্ম করেছি! কেবল এক ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি, তার যা শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে।

তাই তো সত্যিই দেখছি! চন্দ্র কোথায় গেল! হরিবাবুর সেই লোকটিকেও যে দেখছি নে! সবাই পালিয়েছে!

দেখো বাপু, গায়ে হাত দিয়ো না। ভালো হবে না। আমি ভদ্রলোক। চোর নই, জালিয়াত নই।

উঃ, কর কী! লাগে যে! বাবা, আজ সমস্ত দিন কেবল মুড়ি খেয়ে পথ চেয়ে আছি, আজ তোমাদের এ-সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগছে না।

পেয়াদা-বাবা, বরঞ্চ কিছু জলপানি নাও। (পকেটে হাত দিয়া) হায় হায়, একটি পয়সা নেই। দারোগা-সাহেব, যদি চোর ধরতে চাও, চলো আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। জেল সৃষ্টি হয়ে পর্যন্ত এতবড়ো চোর পৃথিবীতে দেখা দেয় নি।

কী করেছি বলো দেখি। জীবনবাবুর নাম সই করে হ্যামিল্‌টনের দোকান থেকে ঘড়ি এনেছি? পেয়াদা-সাহেব, ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোকের নামে ফস করে এতবড়ো অপবাদটা দিলে?

ও কী ও! ওটা ধরে টেনো না। ও আমার ঘড়ি নয়। শেষকালে যদি চেন-মেন ছিঁড়ে যায় তা হলে আবার মুশকিলে পড়তে হবে।

কী? এই সেই হ্যামিল্‌টনের ঘড়ি? ও বাবা, সত্যি নাকি! তা, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, এখনই নিয়ে যাও। কিন্তু, ঘড়ির সঙ্গে আমাকে সুদ্ধ টান কেন? আমি তো সোনার চেন নই। আমি সোনার অক্ষয় বটে, কিন্তু সেও কেবল বাপ-মায়ের কাছে।

তা, নিতান্তই যদি না ছাড়তে পার তো চলো। বাবা, আমাকে সবাই ভালোবাসে, আজ তার বিস্তর পরিচয় পেয়েছি, এখন তোমার ম্যাজিস্ট্রেটের ভালোবাসা কোনোমতে এড়াতে পারলে এ যাত্রা রক্ষে পাই।—

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সায় ভোজ।

পৌষ ১৩০০

নূতন অবতার

প্রথম অঙ্ক

নন্দকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(স্বগত) তুমি রুদ্‌দুর বক্‌শি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর পুষ্করিণীটি কেড়ে নিয়ে খিড়কির পুকুর করেছ। আচ্ছা, দেখা যাবে তুমি ভোগ কর কেমন করে। ঐ পুকুরে দু বেলা ছত্রিশ জাতকে স্নান করাব তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে। (সমাগত প্রতিবেশীবর্গের প্রতি) তা, তোমরা তো সব শুনেছ দেখছি। সে স্বপ্নের কথা মনে হলে এখনো গা শিউরে ওঠে। ভাই, উপরি-উপরি তিন রাত্তির স্বপ্ন দেখলুম— মা গঙ্গা মকরের উপর চড়ে আমার শিয়রের কাছে এসে বললেন, 'ওরে বেটা নন্দ, তোর কুবুদ্ধি ধরেছিল, তাই তুই রুদ্‌দুর বক্‌শির সঙ্গে পুষ্করিণী নিয়ে মামলা করতে গিয়েছিলি। রুদ্‌দুর বক্‌শি কে তা জানিস ? সত্যযুগে যে ছিল ভগীরথ সে-ই আজ বক্‌শির ঘরে আবির্ভাব করেছে। হুগলি পুলের উপর দিয়ে যেদিন থেকে গাড়ি চলেছে সেই দিন থেকে আমিও তোদের ঐ পুষ্করিণীতে এসে অধিষ্ঠান করেছি।' তখন আমার মনে হল, ওরে বাপ রে ! কী কাণ্ডই করেছি ! যিনি স্বয়ং কলিযুগের ভগীরথ তাঁরই সঙ্গে কিনা গঙ্গার দখল নিয়ে আদালতে মকদ্দমা ! এমন পাপও করে ! এখন বুঝতে পারছি মকদ্দমায় কেন হার হল এবং তোমরা পাড়ার সকলেই-বা আদালতে হলফ নিয়ে কেন পরিষ্কার মিথ্যে সাক্ষি দিয়ে এলে। এ-সমস্তই দেবতার কাণ্ড। তোমাদের মুখ দিয়ে অনর্গল মিথ্যে কথা একেবারে যেন গোমুখী থেকে গঙ্গাস্রোতের মতো বেরোতে লাগল ; আমি নিতান্ত মূঢ়মতি পাপিষ্ঠ বলে প্রকৃত তত্ত্ব তখনো বুঝতে পারলুম না— মায়াতে অন্ধ হয়ে রইলুম এবং টাকাগুলো কেবল উকিলে লুটে খেলে !

অশ্রুবিসর্জন। এবং ভক্তিবিহ্বল নরনারীগণের হরিধ্বনি-
সহকারে কলিযুগের ভগীরথ-দর্শনে গমন

দ্বিতীয় অঙ্ক

রুদ্রনারায়ণ বক্‌শি

(স্বগত) তাই বটে !— ছেলেবেলা থেকে বরাবর অকারণে কেমন আমার একটা ধারণা ছিল যে, আমি বড়ো কম লোক নই। এত দিনে তার কারণটা বোঝা যাচ্ছে। আর এও দেখেছি, ব্রাহ্মণের ঐ পুষ্করিণীটির প্রতি আমার অনেক দিন থেকে লোভ পড়েছিল ; থেকে থেকে আমার কেবলই মনে হত, ও পুকুরটা কোনোমতে ঘিরে না নিতে পারলে মেয়েছেলেদের ভারি অসুবিধে হচ্ছে। একেবারে সাফ মনেই ছিল না যে, আমি ভগীরথ, আর মা গঙ্গা এখনো আমাকে ভুলতে পারেন নি। উঃ, সে জন্মে যে তপিস্যেটা করেছিলুম এ জন্মেকার মিথ্যে মকদ্দমাগুলো তার কাছে লাগে কোথায় !

(ভক্তমণ্ডলীর প্রতি ঈষৎ সহাস্যে) তা কি আর আমি জানতেম না ! কিন্তু তোমাদের কাছে কিছু ফাঁস করি নি, কী জানি পাছে বিশ্বাস না কর। কলিকালে দেবতা-ব্রাহ্মণের প্রতি তো কারও ভক্তি নেই। তা ভয় নেই, আমি তোমাদের সব অপরাধ মাপ করলুম।— কে গো তুমি ? পায়ের ধুলো ? তা, এই নাও (পদপ্রসারণ)। তুমি কী চাও গা ? পাদোদক ? এসো, এসো। নিয়ে এসো তোমার বাটি— এই নাও— খেয়ে ফেলো। ভোরবেলা থেকে পাদোদক দিতে দিতে আমার সর্দি হয়ে মাথা ভার হয়ে এল।— বাছা, তোমরা সব এসো, কিছু ভয় নেই। এতদিন আমাকে চিনতে পার নি সে তো আর তোমাদের দোষ নয়। আমি মনে করেছিলুম কথাটা তোমাদের কাছে প্রকাশ করব না, যেমন চলছে এমনিই চলবে— তোমরা আমাকে তোমাদের মাধব বক্‌শির ছেলে রুদ্‌দুর বক্‌শি বলেই জানবে। (ঈষৎ হাস্য) কিন্তু মা গঙ্গা যখন স্বয়ং ফাঁস করে দিলেন তখন আর নুকোতে পারলুম না।

কথাটা সর্বত্রই রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ও আর কিছুতে ঢাকা রইল না। এই দেখো-না হিন্দুপ্রকাশে কী লিখেছে। ওরে তিনকড়ে, চট করে সেই কাগজখানা নিয়ে আয় তো। এই দেখো— 'কলিযুগের ভগীরথ এবং ফজুগঞ্জের ভাগীরথী'— লোকটার রচনাশক্তি দিব্য আছে। আর সেই পরশুদিনকার বঙ্গতোষিণীখানা আন্ দেখি, তাতেও বড়ো বড়ো দুখানা চিঠি বেরিয়েছে। কী ? খুঁজে পাচ্ছিস নে ? হারিয়েছিস বুঝি ? হারায় যদি তো তোর দুখানা হাড় আস্ত রাখব না, তা জানিস ! সেদিন যে তোর হাতে দিয়ে বলে দিলুম আলমারির ভিতর তুলে রেখে দিস ! পাজি বেটা ! নচ্ছার বেটা ! হারামজাদা বেটা ! কোথায় আমার কাগজ হারালি বের করে দে ! দে বের করে ! যেখান থেকে পাস নিয়ে আয়, নইলে তোকে পুঁতে ফেলব বেটা !— ওঃ, তাই বটে, আমার ক্যাশবাক্সের ভিতরে তুলে রেখেছিলুম। ওহে হরিভূষণ, পড়ে শুনিয়ে দাও তো, আমার আবার বাংলা পড়াটা ভালো অভ্যেস নেই।— কে গা ? মতি গয়লানী বুঝি ? তা, এসো এসো, আমি পায়ের ধুলো দিচ্ছি— দুধের দাম নিতে এসেছ ? এখনো শোন নি বুঝি ? নন্দ মুকুজ্জেকে মা গঙ্গা কী স্বপন দিয়েছেন সে-সব খবর রাখ না ? বেটি, তুই আমার পুকুরের জল দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে বিক্রি করেছিস, সে জলের মাহাত্ম্য জানিস ? কেমন, সবার কাছে কথাটা শুনলি তো ? এখন হিসেবটা রেখে পায়ের ধুলো নিয়ে আমার খিড়কির ঘাটে চট করে একটা ডুব দিয়ে আয় গে যা।

এই এখনই যাচ্ছি। বেলা হয়েছে সে কি আর জানি নে ? ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল ? তা, কী করব বলো। লোকজন সব অনেক দূর থেকে একটু পায়ের ধুলোর প্রত্যাশায় এসেছে, এরা কি সব নিরাশ হয়ে যাবে ! আচ্ছা, উঠি। ওরে তিনকড়ে, তুই এখানে হাজির থাকিস— যারা আমাকে দেখতে আসবে সব বসিয়ে রাখিস, আমি এলুম ব'লে। খবরদার ! দেখিস যেন কেউ দর্শন না পেয়ে ফিরে না যায়। বলিস ভগীরথ-ঠাকুরের ভোগ হচ্ছে। বুঝলি ? আমি দুটো ভাত মুখে দিয়েই এলুম ব'লে।

রেধো, তুই যে একেবারে সিধে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি ! তোর কি মাথা নোয় না নাকি ? তোর তো ভারি অহংকার দেখছি। বেটা, তোর ভক্তির লেশমাত্র নেই। পাজি বেটা, তোকে জুতো মেরে বিদায় করে দেব তা জানিস ? সবাই আমাকে ভক্তি করছে, আর তুই বেটা এতবড়ো খ্রীস্টান হয়েছিস যে, আমাকে দেখে প্রণাম করিস নে ! তোর পরকালের ভয় নেই ? বেরো আমার বাড়ি থেকে।

ছি বাবা উমেশ, তোমার এত বয়স হল, তবু কার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয় শিখলে না ? যে ভগীরথ মর্তে গঙ্গা এনেছিলেন তাঁর গল্প মহাভারতে পড়েছ তো ? ভুল করছ— ঐরাবত নয়, সে ভগীরথ। আমাকে সেই ভগীরথ বলে জেনো। বুঝেছ ? মনে থাকবে তো ? ভগীরথ, ঐরাবত নয়। সেই জায়গাটা মাস্টারের কাছে পড়ে নিয়ো। এসো বাবা, তোমার মাথায় পায়ের ধুলো দিয়ে দিই।

কই ? ভাত কই ? আমি আর সবুর করতে পারছি নে— দেশ-দেশান্তর থেকে সব লোক আসছে। কী গো গিন্নি, এত রাগ কিসের ? হয়েছে কী ? খিড়কির পুকুরে লোকজনের ভিড় হয়েছে ? নাওয়া, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, জল তোলা, সমস্ত বন্ধ হয়েছে ? কী করব বলো। আমি স্বয়ং ভগীরথ হয়ে গঙ্গা থেকে তো কাউকে বঞ্চিত করতে পারি নে। তা হলে আমি এত তপিস্যে করে এত কষ্ট করে গঙ্গা আনলুম কেন ? তোমাদের ময়লা কাপড় কাচবার জন্যে— বটে ! যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে মকদ্দমা করছিলুম তখন তোমরা সেই আশায় বসেছিলে, আসল কথাটা কেবল আমি জানতুম আর মা গঙ্গাই জানতেন।— কী ! এতবড়ো আস্পর্ধা— তুই বিশ্বাস করিস নে ! জানিস, তোকে বিয়ে করে তোর চোদ্দপুরুষকে উদ্ধার করেছি। বাপের বাড়ি যাবে ? যাও-না ! মরবার সময় আমার এই গঙ্গায় আসতে দেব না। সেটা মনে রেখো। ভাত আর আছে তো ? নেই ? আমি যে তোমাকে বেশি করে রাঁধতে বলে দিয়েছিলুম। আমার প্রসাদ নিয়ে যাবে বলে যে দেশ-বিদেশ থেকে লোক এসেছে। যা রেঁধেছ, এর একটা একটা ভাত খুঁটে দিলেও যে কুলোবে না। রান্নাঘরে যত ভাত আছে সব নিয়ে এসো— তোমরা সব চিঁড়ে আনতে দাও, পুকুর থেকে গঙ্গাজল এনে ভিজিয়ে খেয়ো। কী করব বলো। দূর থেকে নাম শুনে প্রসাদ নিতে এসেছে, তাদের ফেরাতে পারব না। কী বললে ? আমার হাতে পড়ে তোমার হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল ? কী বলব, তুমি মুর্খু মেয়েমানুষ, ঐ কথাটা একবার দেশের ভালো

ভালো পণ্ডিতদের কাছে বলো দেখি। তারা তখনই মুখের উপর শুনিয়ে দেবে, ষাট হাজার সগরসন্তান জ্ব'লে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল, সেই ভস্মে যিনি প্রাণ দিয়েছেন, তিনি যে তোমার হাড় জ্বালাবেন এ কথা কোনো শাস্ত্রের সঙ্গেই মিলছে না। তুমি গাল দাও, আমি আমার ভক্তদের কাছে চললুম।

(বাহিরে আসিয়া) দেরি হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে এঁয়ারা সব আবার কিছুতেই ছাড়েন না, পায়ের ধুলো নিয়ে পুজো করে বেলা করে দিলেন। আমি বলি, থাক্ থাক্, আর কাজ নেই— তারা কি ছাড়ে! এসো, তোমরা একে একে এসো, যার যার ধুলো নেবার আছে নিয়ে বাড়ি যাও— কী হে বিপিন? আজ মকদ্দমার দিন? তা তো যেতে পারছি নে। দর্শন করতে সব লোকজন আসছে। এক-তরফা ডিক্রি হবে? কী করব বলো। আমি উপস্থিত না থাকলে এখানেও যে এক-তরফা হয়। বিপ্নে, তুই যাবার সময় প্রণাম করে গেলি নে? এমনি করেই অধঃপাতে যাবে। আয়, এইখানে গড় কর, এই নে, ধুলো নে। যা।

তৃতীয় অঙ্ক

ওহে মুখুজ্জে, মা গঙ্গা ঠিক আমার এই খিড়কির কাছটায় না এসে আর রশি দুয়েক তফাতে এলেই ভালো করতেন। তুমি তো দাদা, স্বপ্ন দেখেই সারলে, আমাকে যে দিনরাত্তির অসহ্য ভোগ ভুগতে হচ্ছে। এক তো, পুকুরের জল দুধে বাতাসায় ডাবে আর পদ্মের পাতায় পচে দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছে, মাছগুলো মরে মরে ভেসে উঠছে, যেদিন দক্ষিণের বাতাস দেয় সেদিন মনে হয় যেন নরককুণ্ডুর দক্ষিণের জানলা-দরজাগুলো সব কে খুলে দিয়েছে— সাত জন্মের পেটের ভাত উঠে আসবার জো হয়। ছেলেগুলো যে ক'টা দিন ছিল কেবল ব্যামোয় ভুগেছে। কলিযুগের ভগীরথ হয়ে ডাক্তারের ফি দিতে দিতেই সর্বস্বান্ত হতে হল; তারা সব যমদূত, ভক্তির ধার ধারে না, স্বয়ং মা গঙ্গাকে দেখতে এলে পুরো ভিজিট আদায় করে ছাড়ে। সেও সহ্য হয়, কিন্তু খিড়কির ধারে ঐ-যে দেশ-বিদেশের মড়া পুড়তে আরম্ভ হয়েছে ঐটেতে আমাকে কিছু কাবু করেছে। অহর্নিশি চিতা জ্বলছে। কাছাকাছি যে-সমস্ত বসতি ছিল সে-সমস্তই উঠে গেছে; রাত্তিরে যখন হরিবোল হরিবোল শব্দ ওঠে এবং শেয়ালগুলো ডাকতে থাকে তখন রক্ত শুকিয়ে যায়। স্ত্রী তো বাপের বাড়ি চলে গেছেন। বাড়িতে চাকর-দাসী টিকতে পারে না। ভূতের ভয়ে দিনে-দুপুরে দাঁতকপাটি খেয়ে খেয়ে পড়ে। চারটি রেঁধে দেয় এমন লোক পাই নে। রাত্তিরে নিজের পায়ের শব্দ শুনলে বুকের মধ্যে দুড় দুড় করতে থাকে; বাড়িতে জনমানব নেই; গঙ্গাযাত্রীর ঘর থেকে কেবল থেকে থেকে তারক-ব্রহ্ম নাম শুনি, আর গা ছম্‌ছম্ করতে থাকে। আবার হয়েছে কী; ছেড়েও যেতে পারি নে। আমার ভগীরথ নাম চতুর্দিকেই রাষ্ট্র হয়ে গেছে; সকলেরই দর্শন করতে ইচ্ছা হয়— সেদিন পশ্চিম থেকে দুজন এসেছিল, তাদের কথাই বুঝতে পারি নে। বেটারা ভক্তি করলে বটে, কিন্তু আমার থালাবাটিগুলো চুরিও করে গেছে। এখান থেকে উঠে গেলে হয়তো ঠিকানা না পেয়ে অনেকে ফিরে যেতে পারে। এ দিকে আবার বিষয়কর্ম দেখতে সময় পাচ্ছি নে; আমার পত্তনি তালুকটার খাজনা বাকি পড়েছে, শুনেছি জমিদার অষ্টম করবে। শরীর ভয়ে অনিয়মে এবং ব্যামোয় রোজ শুকিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারে ভয় দেখাচ্ছে এ জায়গা না ছাড়লে আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। কী করি বলো তো দাদা? রুদ্দুর বক্‌শি ছিলুম, সুখে ছিলুম, কোনো ল্যাঠাই ছিল না; ভগীরথ হয়ে কোনো দিক সামলে উঠতে পারছি নে, আমার সোনার পুরী একেবারে শ্মশান হয়ে গেছে! আবার কাগজগুলো আজকাল আমার সঙ্গে লেগেছে; তারা বলে সব মিথ্যে। তাদের নামে লাইবেল আনবার জন্যে উকিলের পরামর্শ নিতে গিয়েছিলুম; উকিল বললেন, তুমিই যে ভগীরথ সেটা প্রমাণ করতে গেলে সত্যযুগ থেকে সাক্ষী তলব করতে হয়, স্বয়ং ব্যাসদেবের নামে সমন জারি করতে হয়। শুনে আমার ভরসা হল না। এখানকার লোকের মনেও ক্রমে সন্দেহ জন্মে গেছে। মতি গয়লানীর সঙ্গে একরকম ঠিক হয়েছিল আমি পাদোদক দেব আর সে দুধ দেবে, আজ দু দিন থেকে সে মাগী আবার তার হিসেব নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে;

ভাবে গতিকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি টাকার বদলে আমি তাকে পায়ের ধুলো দিতে গেলে সেও আমার উপরে পায়ের ধুলো ঝেড়ে যাবে। ভয়ে কিছু বলতে পারছি নে। পুকুরটা তো গেছেই, আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও ছেড়ে গেছে, চাকর-দাসীও পালিয়েছে, প্রতিবেশীরাও গ্রাম ছেড়ে নতুন বসতি করেছে, আমার ভগীরথ নামটাও টেঁকে কি না সন্দেহ, কেবল কি একা মা গঙ্গা আমাকে কিছুতেই ছাড়বেন না ? মা গঙ্গাকে নিয়ে কি আমার সংসার চলবে ? রাস্তায় বেরোলে আজকাল ছেলেগুলো ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছে যে, রুদ্দুর বক্‌শির গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে !— এই তো বিপদে পড়া গেছে। দাদা, আবার একবার তোমাকে স্বপন দেখতে হচ্ছে। দোহাই তোমার, দোহাই মা গঙ্গার, হুগলির পুলের নীচে যদি তাঁর বাসের অসুবিধে হয়, দেশে বড়ো বড়ো ঝিল খাল দিঘি রয়েছে, স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন। আমার ঐ পুকুরের জল যেরকম হয়ে এসেছে আর দু দিন বাদে তাঁর মকরটা তার শুঁড়সুদ্ধ মরে ভেসে উঠবে ; আমার মতো ভগীরথ ঢের মিলবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ঘরে অমন বাহন আর পাবেন না। এই নতুন গঙ্গার ধারে তাঁর স্নেহের ভগীরথও যে বেশিদিন টিকবে কোনো ডাক্তারেই এমন আশা দেয় না। সত্যযুগের নামটার জন্যে মায়া হয় বটে, কিন্তু আমি বেশ করে ভেবে দেখেছি, দাদা, এই কলিযুগের প্রাণটার মায়াও ছাড়তে পারি নে। তাই স্থির করেছি পুষ্করিণীটি তোমাকেই ফিরিয়ে দেব, কিন্তু গঙ্গা-মাতাকে এখান থেকে একটু দূরে বসত করতে হবে।

পৌষ ১৩০১

অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি

গোঁকুলনাথ দত্ত। ইন্দ্রলোক

গোকুলনাথ। (স্বগত) আমি দেখছি স্বর্গটি স্বাস্থ্যের পক্ষে দিব্য জায়গা হয়েছে। এ সম্বন্ধে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। অনেক উচ্চে থাকার দরুন অক্সিজেন বাষ্পটি বেশ বিশুদ্ধ পাওয়া যায়, এবং রাত্রিকাল না থাকাতে নন্দনবনের তরুলতাগুলি কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস পরিত্যাগ করবার সময় পায় না, হাওয়াটি বেশ পরিষ্কার। এ দিকে ধুলো নেই, তাতে করে একেবারে রোগের বীজই নষ্ট হয়েছে। কিন্তু এখানে বিদ্যাচর্চার যেরকম অবহেলা দেখছি তাতে আমি সন্দেহ করি ধুলোয় রোগের বীজ উড়ে বেড়ায় এ সংবাদ এখনো এঁদের কানে এসে পৌঁচেছে কি না। এঁরা সেই-যে এক সামবেদের গাথা নিয়ে পড়েছেন, এর বেশি আর ইন্টেলেক্‌চুয়াল মুভ্‌মেন্ট অগ্রসর হল না। পৃথিবী দ্রুতবেগে চলছে, কিন্তু স্বর্গ যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে, কনসার্ভেটিভ যত দূর হতে হয়।

(বৃহস্পতির প্রতি) আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, ঐ-যে সামবেদের গান হচ্ছে, আপনারা তো বসে বসে মুগ্ধ হয়ে শুনছেন, কিন্তু কোন্ সময়ে ওর প্রথম রচনা হয় তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছেন কি ? কী বললেন ? স্বর্গে আপনাদের ইতিহাস নেই ? আপনাদের সমস্তই নিত্য ? সুখের বিষয়। সুরবালকদের তারিখ মুখস্থ করতে হয় না ! কিন্তু, বিদ্যাচর্চা ওতে করে কি অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকে না ? ইতিহাসশিক্ষার উপযোগিতা চার প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।— প্রথম, ক—

মনোযোগ দিচ্ছেন কি ?— (স্বগত) গান শুনতেই মত্ত, তার আর মন দেবে কী করে ? পৃথিবী ছেড়ে অবধি এঁদের কাউকে যদি একটা কথা শোনাতে পেরে থাকি ! শুনছে কি না শুনছে মুখ দেখে কিছু বোঝবার জো নেই : একটা কথা বললে কেউ তার প্রতিবাদও করে না, এবং কারও কথার কোনো প্রতিবাদ করলে তার একটা জবাব পাওয়াই যায় না। শুনেছি এইখানেই আমাকে সাড়ে পাঁচ কোটি সাড়ে পনেরো লক্ষ বৎসর কাটাতে হবে। তা হলেই তো গেছি। আত্মহত্যা করে যে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে সে সুবিধাও নেই। এখানকার সাপ্তাহিক মৃত্যুতালিকা অন্বেষণ করতে গিয়ে শুনলুম,

এখানে মৃত্যু নেই। অশ্বিনীকুমার-নামক দুই বৈদ্য যে পদটি পেয়েছেন ওঁদের যদি বাঁধা খোরাক বরাদ্দ না থাকত তা হলে সমস্ত স্বর্গ ঝেঁটিয়ে এক পয়সা ভিজিট জুটত না। তবে কী করতে যে ওঁরা এখানে আছেন তা আমাদের মানুষের বুদ্ধিতে বুঝতে পারি নে। কাউকে তো খরচের হিসাব দিতে হয় না, যার যা খুশি তাই হচ্ছে। থাকত একটা ম্যুনিসিপ্যালিটি, এবং নিয়মমত কাজ হত, তা হলে আমি তো সর্বাগ্রে ঐ দুটি হেল্‌থ-অফিসারের পদ উঠিয়ে দেবার জন্যে লড়তুম। এই-যে রোজ সভার মধ্যে অমৃত ছড়াছড়ি যাচ্ছে, তার একটা হিসেব কোথাও আছে ? সেদিন তো শচীঠাকরুনকে স্পষ্টই মুখের উপর জিজ্ঞাসা করলুম, স্বর্গের সমস্ত ভাঁড়ার তো আপনার জিম্মায় আছে ; পাকা খাতায় হোক, খসড়ায় হোক, তার কোনো-একটা হিসেব রাখেন কি— হাতচিঠা কি রসিদ, কি কোনো রকমের একটা নিদর্শন রাখা হয় ? শচীঠাকরুন বোধ করি মনে মনে রাগ করলেন ; স্বর্গ সৃষ্টি হয়ে অবধি এরকম প্রশ্ন তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করে নি। যা পাব্লিকের জিনিস তার একটা রীতিমত জবাবদিহি থাকা চাই, সে বোধটা এঁদের কারও দেখতে পাই নে। অজস্র আছে বলেই কি অজস্র খরচ করতে হবে ! যদি আমাকে বেশিদিন এখানে থাকতেই হয় তা হলে স্বর্গের সমস্ত বন্দোবস্ত আগাগোড়া রিফর্ম্ না করে আমি নড়ছি নে। আমি দেখছি, গোড়ায় দরকার অ্যাজিটেশন— ঐ জিনিসটা স্বর্গে একেবারেই নেই ; সব দেবতাই বেশ সন্তুষ্ট হয়ে বসে আছেন। এঁদের এই তেত্রিশ কোটিকে একবার রীতিমত বিচলিত করে তুলতে পারলে কিছু কাজ হয়। এখানকার লোকসংখ্যা দেখেই আমার মনে হয়েছিল এখানে একটি বড়ো রকমের দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ বেশ চালানো যেতে পারে। আমি যদি সম্পাদক হই, তা হলে আর দুটি উপযুক্ত সাব-এডিটর পেলেই কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি। প্রথমত নারদকে দিয়ে খুব এক চোট বিজ্ঞাপন বিলি করতে হয়। তার পরে বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক চন্দ্রলোক সূর্যলোকে গুটিকতক নিয়মিত সংবাদদাতা নিযুক্ত করতে হয়। আহা, এই কাজটি যদি আমি করে যেতে পারি তা হলে স্বর্গের এ চেহারা আর থাকে না। যাঁরা-সব দেবতাদের ঘুষ দিয়ে দিয়ে স্বর্গে আসেন, প্রতি সংখ্যায় তাঁদের যদি একটি করে সংক্ষেপ-মর্তজীবনী বের করতে পারি তা হলে আমাদের স্বর্গীয় মহাত্মাদের মধ্যে একটা সেন্‌সেশন পড়ে যায়। একবার ইন্দ্রের কাছে আমার প্রস্তাবগুলো পেড়ে দেখতে হবে।

(ইন্দ্রের নিকট গিয়া) দেখুন মহেন্দ্র, আপনার সঙ্গে আমার গোপনে কিছু (অপ্সরাগণকে দেখিয়া) ও ! আমি জানতুম না এঁরা সব এখানে আছেন— মাপ করবেন— আমি যাচ্ছি। এ কী, শচীঠাকরুনও যে বসে আছেন ! আর, ঐ বুড়ো বুড়ো রাজর্ষি-দেবর্ষিগুলোই বা এখানে বসে কী দেখছে ! দেখুন মহেন্দ্র, স্বর্গে স্বায়ত্তশাসন-প্রথা প্রচলিত করেন নি বলে এখানকার কাজকর্ম তেমন ভালো রকম করে চলছে না। আপনি যদি কিছুকাল এই-সমস্ত নাচ-বাজনা বন্ধ করে দিয়ে আমার সঙ্গে আসেন তা হলে আমি আপনাকে হাতে হাতে দেখিয়ে দিতে পারি এখানকার কোনো কাজেরই বিলিব্যবস্থা নেই। কার ইচ্ছায় কী করে যে কী হচ্ছে কিছুই দন্তস্ফুট করবার জো নেই। কাজ এমনতরো পরিষ্কার ভাবে হওয়া উচিত যে, যন্ত্রের মতো চলবে এবং চোখ বুলিয়ে দেখবামাত্রই বোঝা যাবে। আমি সমস্ত নিয়ম নম্বরওয়ারি করে লিখে নিয়ে এসেছি ; আপনার সহস্র চক্ষুর মধ্যে একজোড়া চোখও যদি এ দিকে ফেরান তা হলে— আচ্ছা, তবে এখন থাক্, আপনাদের গান-বাজনাগুলো নাহয় হয়ে যাক, তার পরে দেখা যাবে।

(ভরত ঋষির প্রতি) আচ্ছা, অধিকারীমশায়, শুনেছি গান-বাজনায় আপনি ওস্তাদ, একটি প্রশ্ন আপনার কাছে আছে। গানের সম্বন্ধে যে ক'টি প্রধান অঙ্গ আছে, অর্থাৎ সপ্ত সুর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছনা— কী বললেন ? আপনারা এ-সমস্ত মানেন না ? আপনারা কেবল আনন্দটুকু জানেন ! তাই তো দেখছি— এবং যত দেখছি তত অবাক হয়ে যাচ্ছি। (কিয়ৎক্ষণ শুনিয়া) ভরতঠাকুর, ঐ-যে ভদ্রমহিলাটি— কী ওঁর নাম— রম্ভা ? উপাধি কী বলুন। উপাধি বুঝছেন না ? এই যেমন রম্ভা চাটুজ্জে কি রম্ভা ভট্টাচার্য, কিংবা ক্ষত্রিয় যদি হন তো রম্ভা সিংহ— এখানে আপনাদের ও-সব কিছু নেই বুঝি ? আচ্ছা, বেশ কথা, তা, শ্রীমতী রম্ভা যে গানটি গাইলেন আপনারা তো তার যথেষ্ট প্রশংসা

করলেন ; কিন্তু ওর রাগিণীটি আমাকে অনুগ্রহ করে বলে দেবেন ? একবার তো দেখছি ধৈবত লাগছে, আবার দেখি কোমল ধৈবতও লাগে, আবার গোড়ার দিকে— ওঃ, বুঝেছি, আপনাদের কেবল ভালোই লাগে, কিন্তু ভালো লাগবার কোনো নিয়ম নেই। আমাদের ঠিক তার উলটো, ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু নিয়মটা থাকবেই। আপনাদের স্বর্গে যেটি আবশ্যক সেটি নেই, যেটা না হলে চলে তার অনেক বাহুল্য। সমস্ত সপ্তস্বর্গ খুঁজে কায়ক্লেশে যদি আধখানা নিয়ম পাওয়া যায় তো তখনি তার হাজারখানা ব্যতিক্রম বেরিয়ে পড়ে। সকল বিষয়েই তাই দেখছি। ঐ দেখুন-না ষড়ানন বসে আছেন, ওঁর ছটার মধ্যে পাঁচটা মুণ্ডুর কোনোই অর্থ পাবার জো নেই। শরীরতত্ত্বের ক-খও যে জানে সেও বলে দিতে পারে একটা স্কন্ধের উপরে ছটা মুণ্ড নিতান্তই বাহুল্য। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! ওঁর ছয় মাতার স্তন পান করতে ওঁকে ছটা মুণ্ড ধারণ করতে হয়েছিল ? ওটা হল মাইথলজি, আমি ফিজিয়লজির কথা বলছিলুম। ছটা যেন মুণ্ডই ধারণ করলেন, পাকযন্ত্র তো একটার বেশি ছিল না। এই দেখুন-না, আপনাদের স্বর্গের বন্দোবস্তটা— আপনারা শরীর থেকে ছায়াটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সেটা আপনাদের কী অপরাধ করেছিল ? আপনারা স্বর্গের লোক, বললে হয়তো বিশ্বাস করেন না, আমি জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ ছায়াটাকে কখনো পশ্চাতে, কখনো সম্মুখে, কখনো দক্ষিণে, কখনো বামে সঙ্গে করে নিয়ে কাটিয়েছি, ওটাকে পুষতে একদিনের জন্যে সিকিপয়সা খরচ করতে হয় নি এবং অত্যন্ত শ্রান্তির সময়ও বহন করতে এক তিল ভার বোধ করি নি— ওটাকে আপনারা ছেঁটে দিলেন, কিন্তু ছটা মুণ্ড, চারটে হাত, হাজারটা চোখ, এতে খরচও আছে, ভারও আছে, অথচ সেটা সম্বন্ধে একটু ইকনমি করবার দিকে নজর নেই ! ছায়ার বেলাই টানাটানি, কিন্তু কায়ার বেলা মুক্তহস্ত ! সাধুবাদ দিচ্ছেন ? দেবতাদের মধ্যে আপনিই তা হলে আমার কথাটা বুঝেছেন ! সাধুবাদ আমাকে দিচ্ছেন না ? শ্রীমতী রম্ভাকে দিচ্ছেন ? ওঃ ! তা হলে আপনি বসুন, আমি কার্তিকের সঙ্গে আলাপ করে আসি।

(কার্তিকের পার্শ্বে বসিয়া) গুহ, আপনি ভালো আছেন তো ? আপনাদের এখানকার মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে আমার দুটো-একটা খবর নেবার আছে। আপনারা কিরকম নিয়মে— আচ্ছা, তা হলে এখন থাক্। আগে আপনাদের অভিনয়টা হয়ে যাক। কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই-যে নাটকটি অভিনয় হচ্ছে এর নাম তো শুনছি 'চিত্রলেখার বিরহ' ; এর উদ্দেশ্যটা কী আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। উদ্দেশ্য দু রকমের হতে পারে, এক জ্ঞানশিক্ষা, আর-এক নীতিশিক্ষা। কবি, হয় এই গ্রন্থের মধ্যে কোনো-একটা জাগতিক নিয়ম আমাদের সহজে বুঝিয়ে দিয়েছেন, নয় স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ভালো করলে ভালো হয়, মন্দ করলে মন্দই হয়ে থাকে। ভেবে দেখুন বিবর্তনবাদের নিয়ম-অনুসারে পরমাণুপুঞ্জ কিরকম করে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র জগতে পরিণত হল, কিংবা আমাদের ইচ্ছাশক্তি যে অংশে পূর্ববর্তী কর্মের ফল সেই অংশে বদ্ধ এবং যে অংশে পরবর্তী কর্মকে জন্ম দেয় সেই অংশে মুক্ত এই চিরস্থায়ী বিরোধের সামঞ্জস্য কোন্‌খানে— কাব্যে যখন সেই তত্ত্ব পরিস্ফুট হয় তখন কাব্যের উদ্দেশ্যটি হাতে হাতে পাওয়া যায়। চিত্রলেখার বিরহের মধ্যে এর কোন্‌টি আছে ? আপনি তো বিগলিতপ্রায় হয়ে এসেছেন ; যেরকম দেখছি দেবলোকে যদি ফিজিয়লজির নিয়ম বলে একটা কিছু থাকত তা হলে এখনই আপনার দ্বাদশ চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হত। যাই হোক কার্তিক, এ বড়ো দুঃখের বিষয়, স্বর্গে আপনাদের রাশি রাশি কাব্য-নাটকের ছড়াছড়ি যাচ্ছে, কিন্তু যাতে গবেষণা কিংবা চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় স্বর্গীয় গ্রন্থকারদের হাত থেকে এমন একটা কিছুই বেরোচ্ছে না। (ঈষৎ হাস্যসহকারে) দেখছি 'চিত্রলেখার বিরহ' নাটকখানা আপনার বড়োই ভালো লেগে গেছে, তা হলে অন্য প্রসঙ্গ থাক্, আপনি ঐটেই দেখুন।

(ইন্দ্রের নিকট গিয়া) দেখুন দেবরাজ, স্বর্গে পরস্পরের মতামত আলোচনার একটা স্থান না থাকাতে বড়োই অভাব বোধ করা যায়। আমার ইচ্ছা নন্দনকাননের পারিজাতকুঞ্জের মধ্যে যেখানে আপনাদের নৃত্যশালা আছে, সেইখানে একটা সভা স্থাপন করি, তার নাম দিই 'শতক্রতু ডিবেটিং ক্লাব'। তাতে আপনারও একটা নাম থাকবে আর স্বর্গেরও অনেক উপকার হবে। না, থাক্, মাপ করবেন— আমার অভ্যাস নেই— আমি অমৃত খাই নে— রাগ যদি না করেন তো বলি, ও অভ্যাসটা

আপনাদের ত্যাগ করা উচিত। আমি দেখেছি, দেবতাদের মধ্যে পানদোষটা কিছু প্রবল হয়েছে। অবশ্য, ওটাকে আপনারা সুরা বলেন না, কিন্তু বললে কিছু অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতেও দেখতুম অনেকে মদকে ওআইন বলে কিছু সন্তোষলাভ করতেন। সুরেন্দ্র, আপনি শ্রীমতী মেনকাকে এইমাত্র যে সম্বোধনটা করলেন ওটা কি ভালো শুনতে হল ? সংস্কৃত কাব্যে নাটকে দেখেছি বটে ঐ-সকল সম্বোধন প্রচলিত ছিল, কিন্তু আপনি যদি বিশ্বস্তসূত্রে খবর নেন তো জানতে পারবেন, ওগুলো এখন নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়েছে। আমরা কিরকম সম্বোধন করি জানতে চাচ্ছেন ? আমরা কখনো মাতৃসম্বোধনও করে থাকি, কখনো-বা বাছাও বলি, আবার সময়বিশেষে ভালোমানুষের মেয়ে বলেও সম্ভাষণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে কোনোটিই আপনি এই-সকল মহিলাদের প্রতি প্রয়োগ করতে ইচ্ছা করেন না ? তা না করুন, এটা স্বীকার করতেই হবে আপনারা ওঁদের সম্বন্ধে যে বিশেষণগুলি উচ্চারণ করে থাকেন, তাতে রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না। কী বললেন ? স্বর্গে সুরুচিও নেই, কুরুচিও নেই ? প্রথমটি যে নেই সে বিষয়ে সন্দেহ করি নে ; দ্বিতীয়টি যে আছে তা এখনই প্রমাণ করে দিতে পারি, কিন্তু আপনারা তো আমার কোনো আলোচনাতেই কর্ণপাত করেন না।

(শচীর নিকট গিয়া) দেখুন শচী, আপনার কি মনে হয় না, স্বর্গসমাজের ভিতরে যে-সমস্ত দোষ প্রবেশ করেছে সেগুলো দূর করবার জন্যে আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত ? আপনারা স্বর্গাঙ্গনারাও যদি এ-সকল বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করতে থাকেন তা হলে আপনাদের স্বামীদের চরিত্রের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হতে থাকবে। ওঁদের সম্বন্ধে যে-সকল অপযশের কথা প্রচলিত আছে সে আপনাদের অবিদিত নেই ; মধ্যে মধ্যে যদি সভা আহ্বান করে এ-সকল বিষয়ে আলোচনা হয়, আপনারা যদি সাহায্য করেন, তা হলে— কোথায় যান ? গৃহকর্ম আছে বুঝি ? (শচীকে উঠিতে দেখিয়া সকল দেবতার উত্থান এবং অকালে সভাভঙ্গ)। মহা মুশকিলে পড়া গেল ! কাউকে একটা কথা বললে কেউ শোনেও না, বুঝতেও পারে না। (ইন্দ্রের নিকট গিয়া কাতর স্বরে) ভগবন্ সহস্রলোচন শতক্রতো, আমার সাড়ে পাঁচ কোটি সাড়ে পনেরো লক্ষ বৎসরের মধ্যে আর কত দিন বাকি আছে ?

ইন্দ্র। (কাতর স্বরে) সাড়ে পাঁচ কোটি পনেরো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নয় শো নিরেনব্বই বৎসর।

গোকুলনাথ এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার একসঙ্গে সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস-পতন।

ভাদ্র ১৩০১

স্বর্গীয় প্রহসন

ইন্দ্রসভা

বৃহস্পতি। হে সৌম্য, তেত্রিশ কোটি দেবতাতেও কি ইন্দ্রলোক পূর্ণ হয় নাই ? আরো কি নূতন দেবতা আমন্ত্রণের আবশ্যক আছে ? হে প্রিয়দর্শন, স্মরণ রাখিয়ো, জন্মমৃত্যুর দ্বারা মর্তলোকে লোকসংখ্যা নিয়মশাসনে থাকে, কিন্তু স্বর্গলোকে মৃত্যুর অভাবে দেবসংখ্যা হ্রাস করিবার কোনো উপায় নাই ; অতএব সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার পূর্বে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

ইন্দ্র। হে সুরগুরো, স্বর্গের পথ দুর্গম করিবার জন্য স্বর্গাধিপতির চেষ্টার ত্রুটি নাই এ কথা সর্বজনবিদিত।

বৃহস্পতি। পাকশাসন নাকপতে, তবে কেন অধুনা দেবলোকে মনসা শীতলা ঘেঁটু -নামধারী অজ্ঞাতকুলশীল নব নব দেবতার অভিষেক হইতেছে ?

ইন্দ্র। দ্বিজোত্তম, আমরা দেবতাগণ ত্রিভুবনের কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু সে কেবল

ত্রিভুবনের সম্মতিক্রমে। এ কথা গুরুদেবের অগোচর নাই যে, মর্তলোকেই দেবতাদের নির্বাচন হইয়া থাকে। এক কালে আর্যাবর্তের সমস্ত ব্রাহ্মণ হোতাগণ আমাকেই স্বর্গের প্রধানপদ দিয়াছিলেন এবং তৎকালে সরস্বতী-দৃশদ্বতীতীরের প্রত্যেক যজ্ঞহুতাশনে আমার উদ্দেশে অহরহ যে হবি সমর্পিত হইত তাহার হোমধূমে আমার সহস্রলোচন হইতে নিরন্তর অশ্রু প্রবাহিত হইত। অদ্য নরলোকে হবিঘৃত কেবলমাত্র জঠরযজ্ঞে ক্ষুধাসুরের উদ্দেশেই উপহৃত হইয়া থাকে এবং শুনিতে পাই সে ঘৃতও বিশুদ্ধ নহে।

বৃহস্পতি। বৃত্রনিসূদন, সেই অপবিত্র বিমিশ্র ঘৃত-পানে, শুনিতে পাই, ক্ষুধাসুর মৃতপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। হে শক্র, দেবতাদের প্রতি দেবদেবের বিশেষ কৃপা আছে, সেইজন্যই নরলোকে হোমাগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে, নতুবা নব্য গব্য পরিপাক করিতে হইলে, ভো পাকশাসন, দেবজঠরের সমস্ত অমৃতরস সুতীব্র অম্লরসে পরিণত হইত, অগ্নিদেবের মন্দাগ্নি এবং বায়ুদেবের বায়ুপরিবর্তন আবশ্যক হইত, এবং সমস্ত দেবতার অমরবক্ষে অসহ্য শূলবেদনা অমর হইয়া বাস করিত।

ইন্দ্র। হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, উক্ত ঘৃতের গুণাগুণ আমার অবিদিত নাই, যেহেতু যমরাজের নিকট সর্বদাই তাহার বিবরণ শুনিতে পাই। অতএব হব্যপদার্থে আমার কিছুমাত্র লোভ নাই, এবং হোমাগ্নির তিরোধান সম্বন্ধেও আমি আক্ষেপ করিতেছি না। আমার বক্তব্য এই যে, যেমন পুষ্প হইতে সৌরভ উত্থিত হয় তেমনি মর্তের ভক্তি হইতেই স্বর্গ উর্ধ্বলোকে উদ্‌বাহিত হইতে থাকে ; সেই ভক্তিপুষ্প যদি শুষ্ক হইয়া যায় তবে, হে দ্বিজসত্তম, তেত্রিশ কোটি দেবতাও আমার এই পারিজাতমোদিত নন্দনবনবেষ্টিত স্বর্গলোক রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই কারণে, মর্তের সহিত যোগপ্রবাহ রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে নরলোকের নবনির্বাচিত দেবতাগুলিকে সাদরে স্বর্গে আবাহন করিয়া আনিতে হয়। হে ত্রিকালজ্ঞ, স্বর্গের ইতিহাসে এমন ঘটনা ইতিপূর্বেও ঘটিয়াছে।

বৃহস্পতি। মেঘবাহন, সে-সমস্ত ইতিহাস আমার অগোচর নাই। কিন্তু ইতিপূর্বে যে-সকল নূতন দেবতা মর্ত হইতে স্বর্গলোকে উন্নীত হইয়াছিলেন তাঁহারা অভিজাত দেবগণের সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত। সম্প্রতি ঘেঁটুপ্রমুখ যে-সমস্ত দেবতাগণ তোমার নিমন্ত্রণে স্বর্গে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহারা সুরসভার দিব্যজ্যোতি ম্লান করিয়া দিয়াছেন। অদিতিনন্দন, আমার প্রস্তাব এই যে, তাঁহাদের জন্য একটি উপদেবলোক সৃজন করিবার জন্য বিশ্বকর্মার প্রতি বিশেষ ভারার্পণ করা হয়।

ইন্দ্র। বুধপ্রবর, তাহা হইলে সেই উপস্বর্গই স্বর্গ হইয়া দাঁড়াইবে এবং স্বর্গ উপসর্গ হইবে মাত্র। একমাত্র বেদমন্ত্রের উপর আমাদের স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। জর্মন্‌দেশীয় পণ্ডিতগণের বহুল চেষ্টা সত্ত্বেও সে মন্ত্র এবং তাহার অর্থ সকলে বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আমাদের নূতন আমন্ত্রিত দেবদেবীগণ, সায়নাচার্যের ভাষ্য, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের পুরাতত্ত্ব অথবা তাঁহাদের প্রাচ্যশিষ্যবর্গের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিতেছেন না, তাঁহারা প্রতিদিনের সদ্য-আহরিত পূজা প্রাপ্ত হইয়া উপবাসী পুরাতন দেবতাদের অপেক্ষা অনেকগুণে প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে পাইলে আমরা নূতন বল লাভ করিতে পারিব। অতএব, গুরুদেব, প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের কণ্ঠে দেবমাল্য অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বর্গলোকে বরণ করিয়া লউন।

বৃহস্পতি। অহো দুর্বৃত্তা নিয়তি! মর্তলোকের প্রসাদলাভলালসায় কত পুরাতন দেবকুলপ্রদীপ ক্রমশ আপন দেবমর্যাদা বিসর্জন দিয়াছেন। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মবসন লম্বকচ্ছে কামিনীমনোমোহন নির্লজ্জ নাগরমূর্তি ধারণ করিয়াছেন! গম্ভীরপ্রকৃতি গণপতি কদলীতরুর সহিত গোপন-পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছেন এবং মহাযোগী মহেশ্বর গঞ্জিকা-ধুস্তুর-সিদ্ধি-পানে উন্মত্ত হইয়া মহাদেবীর সহিত অশ্রাব্য ভাষায় কলহ করিয়া নীচজাতীয় স্ত্রীপল্লীর মধ্যে আপন বিহারক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছেন। সে-সমস্তই যখন একে একে সহ্য করিতে পারিয়াছি তখন বোধ করি দেবাসনে উপদবেতাগণের অধিরোহণদৃশ্যও এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ধৈর্যকঠিন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে পারিবে না।

চন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। ভগবন্ উড়ুপতে, স্বর্গলোকে তো কৃষ্ণপক্ষের প্রভাব নাই, তবে অদ্য কেন তোমার সৌম্যসুন্দর প্রফুল্ল মুখচ্ছবি অন্ধকার দেখিতেছি ?

চন্দ্র। দেব সহস্রলোচন, স্বর্গে কৃষ্ণপক্ষ থাকিলে অমাবস্যার ছায়ায় আমি আনন্দে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতাম। দেবরাজ, দেবী শীতলার প্রসন্ন দৃষ্টি হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দান করো। তিনি স্বর্গে পদার্পণ করিয়া অবধি আমার প্রতি যে বিশেষ পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছেন, আমি একাকী তাহার যোগ্য নহি। তাঁহার সেই প্রচুর অনুগ্রহ দেবসাধারণের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হইলে কাহারও প্রতি অন্যায় হয় না।

ইন্দ্র। সুধাংশুমালিন্, সুহৃদ্‌গণের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিলে অধিকাংশ আনন্দই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু রমণীর অনুগ্রহ সে জাতীয় নহে।

চন্দ্র। ভগবন্, তবে সে আনন্দ তুমিই সম্পূর্ণ গ্রহণ করো। তুমি সুরশ্রেষ্ঠ, এ সুখাবেগ তুমি ব্যতীত আর-কেহ একাকী সংবরণ করিতে পারিবে না।

ইন্দ্র। প্রিয়সখে। অন্যের নিকট যাহা পাওয়া যায় তাহা বন্ধুকে দান করা কঠিন নহে, কিন্তু প্রেম সেরূপ সামগ্রী নহে। তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা তুমি অনাদরে ফেলিয়া দিতে পার, কিন্তু প্রিয়তম বন্ধুর অত্যাবশ্যক পূরণ করিবার জন্যও তাহা দান করিতে পার না।

চন্দ্র। যদি ফেলিয়া দিতে পারিতাম, তবে বিপন্নভাবে তোমার দ্বারস্থ হইতাম না। সুরপতে, অনেক সৌভাগ্য আছে যাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেও নিকটে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। শশলাঞ্ছন, তুমি কি অপযশের ভয় করিতেছ ?

চন্দ্র। সখে, সত্য বলিতেছি, কলঙ্কের ভয় আমার নাই।

ইন্দ্র। কলানাথ, তবে কি তুমি তোমার অন্তঃপুরলক্ষ্মী প্রিয়তমার অসূয়া আশঙ্কা করিতেছ ?

চন্দ্র। বন্ধো, তোমার অবিদিত নাই, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রনারী লইয়া আমার অন্তঃপুর। তাহারা প্রত্যেকেই সমস্ত রাত্রি অনিমেষ নেত্রে জাগ্রত থাকিয়া আমার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তথাপি এ পর্যন্ত নক্ষত্রলোকে কোনোরূপ অশান্তির কারণ ঘটে নাই। সপ্তবিংশতির উপর আর-একটি যোগ করিতে আমি ভীত নহি।

ইন্দ্র। সখে, ধন্য তোমার সাহস ! তবে তোমার ভয় কিসের ?

শশব্যস্ত হইয়া দেবদূতের প্রবেশ

দূত। জয়োস্তু ! দেবরাজ, বাণী বীণাপাণি স্বর্গপরিত্যাগের কল্পনা করিতেছেন।

ইন্দ্র। (সসম্ভ্রমে) কেন ? দেবগণ তাঁহার নিকট কী কারণে অপরাধী হইয়াছে ?

দূত। মনসা শীতলা মঙ্গলচণ্ডী -নাম্নী দেবীগণ সরস্বতীর কমলবনে চিঙ্গটি-নামক কর্দমচর ক্ষুদ্র মৎস্যের সন্ধানে গিয়াছিলেন। কৃতকার্য না হইয়া কমলকলিকায় অঞ্চল পূর্ণ করিয়া তিন্তিড়িসংযোগে কটুতৈলে অম্লব্যঞ্জন-রন্ধন-পূর্বক তীরে বসিয়া প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়াছেন, এবং পিত্তলস্থালী সরোবরের জলে মার্জনপূর্বক স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এ পর্যন্ত মানসসরোবরের পদ্মকলিকা দেব দানব কেহই ভক্ষ্যরূপে ব্যবহার করে নাই।

দেবগণের পরস্পর মুখাবলোকন

ঘেঁটু মনসা প্রভৃতি দেবদেবীগণের প্রবেশ

ইন্দ্র। (আসন ছাড়িয়া উঠিয়া) দেবগণ, দেবীগণ, স্বাগত ! আপনাদের কুশল ? স্বর্গলোকে আপনাদের কোনোরূপ অভাব নাই ? অনুচরগণ সমাহিত হইয়া সর্বদা আপনাদের আদেশ-পালনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে ? সিদ্ধগন্ধর্বগণ নৃত্যশালায় নৃত্যগীতাদির দ্বারা আপনাদের মনোরঞ্জন

করে ? কামধেনুর দুগ্ধ এবং অমৃতরস যথাকালে আপনাদের সম্মুখে আহরিত হইয়া থাকে ? নন্দনবনের সুগন্ধ সমীরণ আপনাদের ইচ্ছানুগামী হইয়া বাতায়নপথে প্রবাহিত হইতে থাকে ? আপনাদের লতানিকুঞ্জে পারিজাত সর্বদাই প্রস্ফুটিত থাকিয়া শোভাদান করে ?

দেবীগণের উচ্চহাস্য

মনসা। (ঘেঁটুর প্রতি) মিন্‌সে কী বকছে ভাই ?

ঘেঁটু। পুরুতঠাকুরের মতো মন্তর পড়ে যাচ্ছে। (ইন্দ্রের প্রতি) ওহে, তুমি বুঝি কর্তা ? তোমার মন্তর পড়া হয়ে থাকে তো গোটাকতক কথা বলি।

ইন্দ্র। হে ঘেঁটো ! আপনকার—

ঘেঁটু। ঘেঁটো কী ! আমি কি তোমার বাগানের মালী ? বাপের জন্মে এমন অভদ্দর মানুষ তো দেখি নি গা ! ঘেঁটো ! আমি যদি তোমাকে ইন্দির না বলে ইন্দিরে বলি ?

মনসা। তা হলেই চিত্তিরে হয় !

দেবীগণের উচ্চহাস্য

ইন্দ্র। (হাস্যে যোগদান করিবার চেষ্টা করিয়া) কুন্দাভদন্তি, বহু তপস্যা-দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন্ সুকৃতিফলে আপনার সকলের স্মিতদশনময়ূখে স্বর্গলোক অকস্মাৎ অতিমাত্র আলোকিত হইয়া উঠিল এখনো তাহা ধারণা করিতে পারিলাম না।

ঘেঁটু। আরে, রাখো, ও-সব বাজে কথা রাখো। তোমার পেয়াদাগুলো আমাকে সোনার ভাঁড়ে করে কী-সব এনে দেয় সে আমি ছুঁতে পারি নে। তোমার শচীগিন্নিকে বলে দিয়ো আমার জন্যে রোজ এক-থাল গোবরের লাড়ু তৈরি করে পাঠিয়ে দেন।

ইন্দ্র। তথাস্তু। স্বর্গে আমাদের কল্পধেনু আছেন। তিনি সকলের সকল কামনাই পূরণ করিয়া থাকেন। বোধ করি, আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য না হইতে পারে।

শীতলা। (চন্দ্রকে এক কোণে গুপ্তপ্রায় দেখিয়া নিকটে গিয়া) মাইরি ! তুমি এত ছলও জান ভাই। আমাকে আচ্ছা ভোগ ভুগিয়েছ যা হোক। আমি বলি, তুমি বুঝি অন্দরমহলে আছ। ঢুকে দেখি, অশ্লেষা আর মঘা নবাবপুত্রীর মতো বসে আছেন, আমাকে দেখে অবাক হয়ে রইলেন। আমার সহ্য হল না। আমি বললুম, বলি ও বড়োমানুষের ঝি, তোমাদের গতর খাটিয়ে খেতে হয় না বলে বুঝি দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না ! যা বলতে হয় তা বলেছি। ধুন্ধুমার বাধিয়ে দিয়ে এসেছি।

চন্দ্র। (জনান্তিকে ইন্দ্রের প্রতি) সপ্তবিংশতির উপর অষ্টবিংশতিতম যোগ হইলে কিরূপ দুর্যোগ উপস্থিত হইতে পারে তাহা, হে শচীপতে, সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। (শীতলার প্রতি) অয়ি অনবদ্যে—

শীতলা। (হাসিয়া অস্থির হইয়া) মা গো মা, তুমি এত হাসাতেও পার ! আদর করে বেশ নামটি দিয়েছ যা হোক। আনো বদ্যি ! কিন্তু বদ্যিতে করবে কী ভাই ! কত বদ্যির সাত পুরুষকে আমি সাত ঘাটের জল খাইয়ে এসেছি— আমি কি তেমনি মেয়ে !

ঘেঁটু। (ইন্দ্রের গায়ের কাছে গিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া) কী গো, ইন্দিরদা ? মুখে যে রা'টি নেই ! রেতের বেলা গিন্নির সঙ্গে বকাবকি চুলোচুলি হয়ে গেছে নাকি ?

ইন্দ্র। (সসংকোচে সরিয়া গিয়া দূরস্থ আসন-নির্দেশ-পূর্বক) দেব, আসন গ্রহণে অনুমতি হউক।

ঘেঁটু। এই-যে, এখানে ঢের জায়গা আছে। (ইন্দ্রের সহিত একাসনে উপবেশন) দাদা, আমার সঙ্গে তুমি নৌকোতা কোরো না। আজ থেকে তুমি আমার দাদা, আমি তোমার ছোটো ভাই ঘেঁটু।

বাহুদ্বারা ইন্দ্রের গলবেষ্টন এবং ইন্দ্রকর্তৃক অব্যক্ত কাতরধ্বনি উচ্চারণ

শীতলা। (চন্দ্রের প্রতি) তুমি যাও কোথায় ?

চন্দ্র। মনোজ্ঞে, অদ্য অন্তঃপুরে দেবীগণ ভর্তৃপ্রসাদনব্রতে তাঁহাদের এই সেবকাধমকে স্মরণ করিয়াছেন, অতএব যদি অনুমতি হয় তবে, হে হরিণশালীননয়নে—

শীতলা। কী বললে ? শালী ? তা ভাই, তাই সই। তোমার চাঁদমুখে সবই মিষ্টি লাগে। তা, শালী যদি বললে তবে কানমলাটিও খাও।

চন্দ্রের পার্শ্বে একাসনে বসিয়া চন্দ্রের কর্ণপীড়ন

ইন্দ্র। (চন্দ্রের প্রতি) ভগবন্ সিতকিরণমালিন্, তুমিই ধন্য। করুণস্পর্শে তরুণীকরকিসলয়ের অরুণরাগ এখনো তোমার কর্ণমূলে সংলগ্ন হইয়া আছে।

শীতলা। (মনসার প্রতি লক্ষ করিয়া স্বগত) মোলো মোলো ! আমাদের মন্‌সে হিংসেয় ফেটে মোলো। আমি চাঁদের পাশে বসেছি, এ আর ওঁর গায়ে সইল না। ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে দেখো-না। এতগুলো পুরুষমানুষের সামনে লজ্জাও নেই ! মাগী এবার পাড়ায় গিয়ে কত কানাঘুষোই করবে ! উনিও বড়ো কসুর করেন নি। কার্তিক-ঠাকুরটিকে নিয়ে যেরকম নিলজ্জপনা করেছে আমি দেখে লজ্জায় মরে যাই আর-কি। কার্তিক কোথায় নুকোবে ভেবে পায় না। ঐ তো চেহারা, ঐ নিয়ে এত ভঙ্গিও করে ! মাগো, মাগো, মাগো ! (প্রকাশ্যে) আ মর্ মাগী ! চাঁদের সামনে দিয়ে অমন বেহায়ার মতো আনাগোনা করছিস কেন ? যেন সাপ খেলিয়ে বেড়াচ্ছে ! কার্তিকের ওখানে ঠাঁই হল না নাকি ?

সুরসভার মধ্যে মনসার ও শীতলার গ্রাম্য ভাষায় তুমুল কলহ

ইন্দ্র। (শশব্যস্ত হইয়া একবার মনসা ও একবার শীতলার প্রতি) ক্রোধ সংবরণ করো ! ক্রোধ সংবরণ করো ! অয়ি অসূয়াতাম্রলোচনে, অয়ি গলদ্‌বেণীবন্ধে, অয়ি বিগলিতদুকূলবসনে, অয়ি কোকিলজিতকূজিতে, তারতর সপ্তম স্বরকে পঞ্চম স্বরে নম্র করিয়া আনো। অয়ি কোপনে—

ঘেঁটু। (উত্তরীয় ধরিয়া ইন্দ্রকে আসনে বসাইয়া) তুমি এত ব্যস্ত হও কেন দাদা ? ওদের এমন রোজ হয়ে থাকে। থাকত ওলাবিবি, তা হলে আরো জমত। তার কি খাবার গোল হয়েছে তাই সে শচীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেছে।

ইন্দ্র। (ব্যাকুলভাবে) হা সুরেন্দ্রবক্ষোবিহারিণী দেবী পৌলমী !

মনসার দ্রুতবেগে সভাত্যাগ এবং শীতলার পুনশ্চ চন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন

বীণাপাণির প্রবেশ

বীণাপাণি। দেবরাজ, কর্কশ কোলাহলে আমার দেববীণার স্বরস্খলন হইতেছে, আমার কমলবন শূন্যপ্রায়, আমি দেবলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। [প্রস্থান

বৃহস্পতি। আমিও জননী বাণীর অনুগমন করি। [প্রস্থান

অশ্লেষা ও মঘার সভাপ্রবেশ

অশ্লেষা ও মঘা। (চন্দ্রের একাসনে শীতলাকে দেখিয়া) আজ অপরূপ অভিনব সপ্তদশ কলায় দেব শশধরকে সমধিকতর শোভমান দেখিতেছি !

চন্দ্র। দেবীগণ, এই হতভাগ্যকে অকরুণ পরিহাসে বিড়ম্বিত করিবেন না। পুরুষ রাহু আমাকে কেবল ক্ষণমাত্রকাল পরাভব করিতে পারে সেই আক্রোশে ঈর্ষান্বিত ভগবান একটি স্ত্রী রাহু সৃজন করিয়াছেন, ইঁহার পূর্ণগ্রাস হইতে আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না।

অশ্লেষা। আর্যপুত্র, এই ভদ্রললনা অনতিপূর্বে তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক তোমার শ্বশুরকুলকে উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত অশ্রুতপূর্ব কুৎসা-দ্বারা লাঞ্ছিত করিয়া আসিয়াছেন। দেবীর সেই আশ্চর্য ব্যবহারকে আমরা অধিকারবহির্ভূত উপদ্রব জ্ঞান করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি সৌভাগ্যবতী তোমারই হস্তে সেই অবমাননের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন, আর্যপুত্রকে তাঁহার নবতর শ্বশুরকুলে বরণ করিয়া আমরা নক্ষত্রলোক হইতে বিচ্যুতিলাভের জন্য চলিলাম। (শীতলার প্রতি) ভদ্রে, কল্যাণী, তোমার সৌভাগ্য অক্ষয় হউক। [প্রস্থান

শচীর প্রবেশ

ইন্দ্র। (সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া) আর্যে, শুভ আগমন হউক।

ঘেঁটু। (উত্তরীয় ধরিয়া ইন্দ্রকে সবলে আসনে উপবেশন করাইয়া) ইস্‌! ভারি খাতির যে! মাইরি দাদা, ঢের ঢের পুরুষমানুষ দেখেছি, কিন্তু তোর মতো এমন স্ত্রৈণ আমি দেখি নি।

ঘেঁটুকে ইন্দ্রের বামপার্শ্বে শচীর নির্দিষ্ট স্থানে বসিতে দেখিয়া দূরে এক কোণে
শচীদেবী-কর্তৃক সামান্য এক আসন গ্রহণ

ঘেঁটু। (শচীর অনতিদূরে গমন করিয়া সহাস্যে) বউঠাকরুন, আমার দাদাকে কী মন্তর পড়ে দিয়েছ বলো দেখি! একেবারে শ্রীচরণের গোলাম করে রেখেছ! তুমি উঠলে ওঠে, তুমি বসলে বসে। বলি, একটা কথাই কও। (গান) 'কথা কইতে দোষ কি আছে বিধুমুখী!'

ইন্দ্র। দেব ঘেঁটো, কিঞ্চিৎ অবসর দিতে অনুমতি হউক। দেবীর নিকট কিছু নিবেদন আছে।

ঘেঁটু। ইস্‌! দেখো! দেখো! একটু কাছে এসে বসেছি, তোমার যে আর গায়ে সইল না! এতটা বাড়াবাড়ি কিছু নয়! কথায় বলে অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।— কাজ নেই ভাই, আবার শাপ দেবে! তোমরা দুজনে বোসো, আমি যাই।

বলপূর্বক ইন্দ্রকে শচীর আসনে বসাইবার চেষ্টা

ইন্দ্র। (ঘেঁটুকে দূরে অপসারণ করিয়া) দেব, তুমি আত্মবিস্মৃত হইতেছ।

ওলাবিবির প্রবেশ

ওলাবিবি। (শচীর প্রতি) তাই বলি যায় কোথায়! অমনি বুঝি সোয়ামির কাছে নাগাতে এসেছ? তা, নাগাও-না। তোমার সোয়ামিকে আমি ডরাই নে।

শচী। (আসন হইতে উঠিয়া ইন্দ্রের প্রতি) দেবরাজ, আমি জয়ন্তকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুলোকে কিছুকাল লক্ষ্মীদেবীর আলয়ে বাস করিবার সংকল্প করিয়াছি। বহুকাল দেবীদর্শন ঘটে নাই।

ইন্দ্র। আর্যে, আমিও দেবীর অনুসরণ করিতেছি। বহুকাল পূজার অনবসরক্রমে চক্রপাণির নিকটে অপরাধী হইয়া আছি।

[উভয়ের প্রস্থান

চন্দ্র। দেব সহস্রলোচন, বিষ্ণুলোকে আমারও বিশেষ আবশ্যক আছে— লক্ষ্মীদেবী— হায়, বিপৎকালে বান্ধবেরাও ত্যাগ করিয়া যায়।

শীতলা। অমন হাঁড়িপানা মুখ করে আছ কেন? অমন করে থাক তো ফের কানমলা খাবে।

চন্দ্র। স্ফুরৎকনকপ্রভে, বিষ্ণুলোকে আমার বিস্তর বিলম্ব হইবে না, যদি অনুমতি কর তো দাস—

শীতলা। ফের কানমলা খাবে।

কান মলিতে উদ্যত

মনসার পুনঃপ্রবেশ

শীতলার সহিত পুনরায় কলহারম্ভ। ঘেঁটু ওলা মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি
সকলের তাহাতে যোগদান

চন্দ্র। আপনারা তবে ততক্ষণ মিষ্টালাপ করুন, দাস বিষ্ণুলোক-অভিমুখে প্রয়াণ করিতে ইচ্ছা করে।

[দ্রুতপদে প্রস্থান

আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

বশীকরণ

প্রথম অঙ্ক

আশু ও অন্নদা

আশু। আচ্ছা অন্নদা, তুমি যেন ব্রাহ্মই হয়েছিলে, কিন্তু তাই বলে স্ত্রী-পরিত্যাগ করতে গেলে কেন? স্ত্রী তো তেত্রিশ কোটির মধ্যে একটিও নয়। ঐটুকু পৌত্তলিকতা, রাখলেও ক্ষতি ছিল না।

অন্নদা। সে তো ঠিক কথা। স্ত্রী-পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু স্ত্রীজাতি তো বিদায় হন না— স্ত্রীকে ছাড়লে স্ত্রীজাতি বিশ্বব্যাপী হয়ে দেখা দেন, স্ত্রীপূজার মাত্রা মনে মনে বেড়ে ওঠে।

আশু। তবে?

অন্নদা। তবে শোনো। আমার শাশুড়ি ছিলেন না, শ্বশুর ভয়ংকর হিন্দু ছিলেন। যখন শুনলেন আমি ব্রাহ্ম হয়েছি, আমার স্ত্রীকে বিধবার বেশ পরিয়ে ব্রহ্মচারিণী করে কাশীতে গিয়ে বাস করলেন। তার পরে শুনছি হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত দেবতাতেও তৃপ্তি হয় নি, তার উপরে অল্‌কট্‌, ব্লাভাট্‌স্কি, অ্যানি বেসান্ট, সূক্ষ্মশরীর, মহাত্মা, প্লান্‌চেট, ভূতপ্রেত কিছুই বাদ যায় নি—

আশু। কেবল তুমি ছাড়া।

অন্নদা। আমাকে ব্রহ্মদৈত্য বলে বাদ দিলে।

আশু। তুমি তার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছ?

অন্নদা। আশার অপরাধ নেই— তার পশ্চাতে এত বড়ো রেজিমেন্ট লেগেছে, সে আর টিকল না। শুনেছি আমার শ্বশুর মারা গেছেন, এবং আমার স্ত্রী এখন পতিত-উদ্ধার করে বেড়াচ্ছেন।

আশু। তুমি একবার চরণে পতিত হওগে-না, যদি উদ্ধার করেন।

অন্নদা। ঠিকানাও জানি নে, প্রবৃত্তিও নেই।

আশু। তুমি কি এইরকম উড়ে উড়ে বেড়াবে?

অন্নদা। না হে, সোনার খাঁচার সন্ধানে আছি।

আশু। খাঁচাওয়ালার অভাব নেই, তবে সোনা জিনিসটা দুর্লভ বটে।

অন্নদা। আচ্ছা, আমার আলোচনা পরে হবে, কিন্তু তোমার কী বলো দেখি। তোমার তো আইবড়োলোক-প্রাপ্তির বিধান কোনো শাস্ত্রেই লেখে না। তার বেলা চুপ। থিওসফিতে তোমাকে খেলে। মন্ত্রতন্ত্র প্রাণায়াম হঠযোগ সুষুম্না-ইড়া-পিঙ্গলা এ-সমস্তই তোমাকে ছাড়ে, যদি বিবাহ কর।

আশু। তুমি মনে কর, আমি সবই অন্ধভাবে বিশ্বাস করি— তা নয়। এ-সমস্ত বিশ্বাসের যোগ্য কি না তাই আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই। অবিশ্বাসকেও তো প্রমাণের উপর স্থাপন করতে হবে।

অন্নদা। বসে বসে তাই করো। মরীচিকা-স্থাপনের জন্য পাথরের ভিত্তি গাঁথো। আমি এখন চললেম।

আশু। কোথায় যাচ্ছ?

অন্নদা। শবসাধনায় নয়।

আশু। তা তো জানি।

অন্নদা। একটি সজীবের সন্ধান পেয়েছি।

আশু। তবে যাও, শুভকার্যে বাধা দেব না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

বাড়িওয়ালা ও তাহার স্ত্রী

স্ত্রী। মাতাজি যদি হবে, তবে অমন চেহারা কেন ?

বাড়িওয়ালা। দেখতে শুনতে তাড়কা-রাক্ষসীর মতো না হলেই বুঝি আর মাতাজি হয় না।

স্ত্রী। হবে না কেন ? কিন্তু তা হলে কি এই সমর্থবয়সে স্বামীর ঘরে না থেকে তোমার মতো বোকা ভোলাবার জন্যে মাতাজি-গিরি করতে বেরোত ? তা হলে কি পিতাজি তোমার মাতাজিকে ছাড়ত ? আর এত টাকাই বা পেলে কোথায় ?

বাড়িওয়ালা। ওগো, যারা যোগবিদ্যা জানে তাদের যদি টাকা না হবে, চেহারা না হবে, তবে কি তোমার হবে ? রোসো-না, ওঁর কাছে মন্তর-টন্তরগুলো শিখে নেওয়া যাক-না।

স্ত্রী। বুড়োবয়সে মন্তর শিখে হবে কী শুনি ? কাকে বশ করবে ?

বাড়িওয়ালা। যাঁকে কিছুতেই বশ মানাতে পারলেম না।

স্ত্রী। তিনি কে ?

বাড়িওয়ালা। আগে বশ মানাই, তার পরে সাহস করে নাম বলব।

মাতাজির প্রবেশ

মাতাজি। এ বাড়িতে আমার থাকার সুবিধা হচ্ছে না। এর চেয়ে বড়ো বাড়ি আমাকে দিতে হবে।

বাড়িওয়ালা। এ বাড়ি ছাড়া আমার আর একটিমাত্র বড়ো বাড়ি আছে। সেটা বড়ো বটে, কিন্তু—

মাতাজি। তা, ভাড়া বেশি দেব, কিন্তু সেই বাড়িতেই আমি কাল যেতে চাই।

বাড়িওয়ালা। সবে পরশু দিন সেখানে একটি ভাড়াটে এসেছে। একটি কোন্‌ সদরআলার বিধবা স্ত্রী— পশ্চিম থেকে মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজতে এসে আমার সেই উনপঞ্চাশ নম্বরের বাড়িতে উঠেছে।

মাতাজি। উনপঞ্চাশ নম্বর ! ঠিক আমি যা চাই। তোমার এ বাড়ির নম্বর ভালো নয়।

বাড়িওয়ালা। বাইশ নম্বর ভালো নয় মাতাজি ? কারণটা কী বুঝিয়ে বলুন।

মাতাজি। বুঝতে পারছ না— দুয়ের পিঠে দুই—

বাড়িওয়ালা। ঠিক বলেছেন মাতাজি, দুয়ের পিঠে দুইই তো বটে। এতদিন ওটা ভাবি নি।

মাতাজি। দুইয়েতে কিছু শেষ হয় না, তিন চাই। দেখো-না আমরা কথায় বলি, দু-তিন জন—

বাড়িওয়ালা। ঠিক ঠিক, তা তো বলেই থাকি।

মাতাজি। যদি দুই বললেই চুকে যেত, তা হলে তার সঙ্গে আবার তিন বলব কেন ? বুঝে দেখো।

বাড়িওয়ালা। আমাদের কী বা বুদ্ধি, তাই বুঝব। সবই জানতুম, তবু তো বুঝি নি।

মাতাজি। তাই, ঐ দুইয়ের পিঠে দুই বলেই আমার মন্ত্র কিছুই সফল হচ্ছে না।

স্ত্রী। (আত্মগত) বেঁচে থাক্‌ আমার দুয়ের পিঠে দুই। মন্ত্র সফল হয়ে কাজ নেই।

মাতাজি। উনপঞ্চাশের মতো এমন সংখ্যা আর হয় না।

বাড়িওয়ালা। (জনান্তিকে) শুনলে তো গিন্নি ?

স্ত্রী। (জনান্তিকে) শুনে হবে কী ? তোমার উনপঞ্চাশ যে অনেক কাল হল পেরিয়েছে।

বাড়িওয়ালা। কিন্তু মাতাজিকে কি কালই সে বাড়িতে যেতে হবে ?

মাতাজি। কাল উনত্রিশ তারিখে মঙ্গলবার পড়েছে। এমন দিন আর পাওয়া যাবে না।

বাড়িওয়ালা। ঠিক কথা। কাল উনত্রিশেও বটে, আবার মঙ্গলবারও বটে। কী আশ্চর্য ! তা হলে তো কালই যেতে হচ্ছে বটে। তা-ই ঠিক করে দেব। (মাতাজির প্রস্থান) এখন আমার এই নতুন ভাড়াটেদের ওঠাই কী বলে ? বিদেশ থেকে এসেছে, হঠাৎ তারা এখন বাড়িই বা পায় কোথায় ?

স্ত্রী। তাদের আপাতত এই বাড়িতে এনেই রাখো-না। আমরা নাহয় কিছুদিন ঝামাপুকুরে

জামাইবাড়ি গিয়েই থাকব। তোমার ঐ মন্তর-জানা মেয়েমানুষকে এখানে রেখে কাজ নেই। বিদেয় করে দাও। ছেলেপিলের ঘর, কার কখন অপরাধ হয়, বলা যায় কি ?

বাড়িওয়ালা। সেই ভালো। তাদের কোনোরকম করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আজকের মধ্যেই উনপঞ্চাশ নম্বর থেকে বাইশ নম্বরে এনে ফেলা যাক। বলি গে, পাড়ায় প্লেগ দেখা দিয়েছে, উনপঞ্চাশ নম্বরে প্লেগ হাঁসপাতাল বসবে।

তৃতীয় অঙ্ক

আশু ও অন্নদা

অন্নদা। তোমার ঐ টাটকা লঙ্কার ধোঁয়ায় নাকের জলে চোখের জলে করলে যে হে ! তোমার ঘরে আসা ছাড়তে হল।

আশু। টাটকা লঙ্কার ধোঁয়া তুমি কোথায় পেলে ?

অন্নদা। ঐ-যে তোমার তর্কালংকারের বকুনি। লোকটা তো বিস্তর টিকি নাড়লে, মাথামুণ্ডু কিছু পেলে কি ?

আশু। মাথামুণ্ডু নইলে শুধু টিকি নড়বে কোথায় ? কথাগুলো যদি শ্রদ্ধা করে শুনতে, তবে বুঝতে।

অন্নদা। যদি বুঝতেম, তবে শ্রদ্ধা করতেম। তুমি আশু, ফিজিকাল সায়ান্সে এম· এ· দিয়ে এলে— তুমি যে এত ঘন ঘন টিকি-নাড়া বরদাস্ত করছ এ যদি দেখতে পায় তবে প্রেসিডেন্সি কলেজের চুনকাম-করা দেওয়ালগুলো বিনি-খরচে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। আজ কথাটা কী হল বুঝিয়ে বলো দেখি।

আশু। পণ্ডিতমশায় পরিণয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন।

অন্নদা। তত্ত্বটা আমার জানা খুব দরকার হয়ে পড়েছে। তর্কালংকারমশায় বলছিলেন, বিবাহের পূর্বে কন্যার সঙ্গে জানাশুনার চেষ্টা না করাই কর্তব্য। যুক্তিটা কী দিচ্ছিলেন, ভালো বোঝা গেল না।

আশু। তিনি বলছিলেন, সকল জিনিসের আরম্ভের মধ্যে একটা গোপনতা আছে। বীজ মাটির নীচে অন্ধকারের মধ্যে থাকে, তার পরে অঙ্কুরিত হলে তখন সূর্য-চন্দ্র-জল-বাতাসের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করবার সময় আসে। বিবাহের পূর্বে কন্যার হৃদয়কে বিলাতি অনুকরণে বাইরে টানাটানি না করে তাকে আচ্ছন্ন আবৃত রাখাই কর্তব্য। তখন তার উপরে তাড়াতাড়ি দৃষ্টিক্ষেপ করতে যেয়ো না। সে যখন স্বভাবতই নিজে অঙ্কুরিত হয়ে তার অর্ধমুকুলিত সলজ্জ দৃষ্টিটুকু গোপনে তোমার দিকে অগ্রসর করতে থাকবে, তখনই তোমার অবসর।

অন্নদা। আমার অদৃষ্টে সে পরীক্ষা তো হয়ে গেছে। বিলাতি প্রথা-মতে বিবাহের পূর্বে কন্যার হৃদয় নিয়ে টানা-হেঁচড়া করি নি ; হৃদয়টা এত অন্ধকারের মধ্যে ছিল যে আমি তার কোনো খোঁজ পাই নি, তার পরে অঙ্কুরিত হল কি না হল তারও তো কোনো ঠিকানা পেলেম না। এবারে উলটোরকম পরীক্ষা করতে চলেছি, এবার আগে হৃদয়, তার পরে অন্য কথা।

আশু। পরীক্ষার দিন কবে ?

অন্নদা। কাল।

আশু। স্থান ?

অন্নদা। উনপঞ্চাশ নম্বর রাম বৈরাগীর গলি।

আশু। নম্বরটা তো ভালো শোনাচ্ছে না।

অন্নদা। কেন ? উনপঞ্চাশ বায়ুর কথা ভাবছ ? সে আমাকে টলাতে পারবে না— তুমি হলে বিপদ ঘটত।

আশু। পাত্র ?

অন্নদা। কন্যার বিধবা মা তাকে পশ্চিম থেকে সঙ্গে করে এনেছে। আমি ঘটককে বলে রেখেছি যে ভালো করে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ে তবে বিবাহের কথা হবে।

আশু। কিন্তু অন্নদা, শেষকালে বহুবিবাহে প্রবৃত্ত হলে ?

অন্নদা। তোমাদের মতো আমি নাম দেখে ভড়কাই নে। যে বহুবিবাহের মধ্যে আর সমস্ত আছে, কেবল বহুটুকুই নেই, তাকে দেখে চমকাও কেন ভাই ?

আশু। তবু একটা প্রিন্সিপল্ আছে তো ? বহুবিবাহকে বহুবিবাহ বলতেই হবে।

অন্নদা। আমার নামমাত্র স্ত্রী যেখানে আছে প্রিন্সিপল্ও সেইখানে আছে। সে স্ত্রীও আসছে না, প্রিন্সিপল্ও রইল ; অতএব এখন আমি ডঙ্কা মেরে বহুবিবাহ করব, প্রিন্সিপল্জুজুকে ডরাব না।

রাধাচরণের প্রবেশ

রাধাচরণ। আশুবাবু !

আশু। কী হে রাধে ?

রাধাচরণ। সেদিন আপনি আমার সঙ্গে মন্ত্র নিয়ে তর্ক করলেন— এক-একটা শব্দের যে এক-এক প্রকার বিশেষ ক্ষমতা আছে, আমার বোধ হল আপনি যেন তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না।

অন্নদা। বল কী রাধে ? তা হলে আশুর অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা এখনো সম্পূর্ণ লোপ হয় নি ! এখনো দুটো-একটা জায়গায় ঠেকছে !— শব্দের মধ্যে শক্তি আছে, এ কথা বাঙালির ছেলে বিশ্বাস কর না !

রাধাচরণ। বলুন তো অন্নদাবাবু ! তা হলে মারণ, উচাটন, বশীকরণ— এগুলো কি বেবাক গাঁজাখুরি !

অন্নদা। তাও কি কখনো হয় ? সংসারে কি এত গাঁজার চাষ হতে পারে ?

রাধাচরণ। পশ্চিম থেকে একজন যোগসিদ্ধ মাতাজি এসেছেন। শুনেছি তিনি মন্ত্রের বল একেবারে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে পারেন। দেখতে গিয়েছিলেম, কিন্তু সকলকে তিনি দেখা দেন না ; বলেছেন, যোগ্য লোক পেলে তাকে তিনি তাঁর সমস্ত বিদ্যে দেখিয়ে দেবেন। আশুবাবু, আপনি চেষ্টা করলে নিশ্চয় বিফল হবেন না।

আশু। তিনি থাকেন কোথায় ?

রাধাচরণ। বাইশ নম্বর ভেড়াতলায়।

অন্নদা। বাইশ নম্বরটা উনপঞ্চাশের চেয়ে ভালো হতে পারে, কিন্তু জায়গাটা ভালো ঠেকছে না। একে বশীকরণ-বিদ্যে, তার উপরে ভেড়াতলা। মাতাজির কাছে মুণ্ডুজিটি খুইয়ে এসো না।

আশু। আরে ছি ! কী বক তার ঠিক নেই। তাঁরা হলেন সাধু স্ত্রীলোক, সেখানে মুণ্ডুর ভাবনা ভাবতে হয় না। তুমি বুঝেসুঝে উনপঞ্চাশে পা বাড়িয়ো।

অন্নদা। তুমি ভাবছ বাইশ একেবারেই নির্বিষ। তা নয় হে। বিশের উপরের দুই মাত্রা চড়িয়ে তবে বাইশ। আপাদমস্তক জর্জর হয়ে ফিরবে।

চতুর্থ অঙ্ক

বাইশ নম্বরে কন্যার বিধবা মাতা শ্যামাসুন্দরী

শ্যামা। পেলেগ শুনে ভয়ে বাঁচি নে। তাড়াতাড়ি করে পালিয়ে তো এলুম। কিন্তু অন্নদা বলে ছেলেটির আজ যে সেই উনপঞ্চাশ নম্বরে আসবার কথা আছে, সে কি সেখান থেকে চিনে ঠিক এখানে আসতে পারবে ! এত ক'রে খাওয়াদাওয়ার জোগাড় করলেম, সব মাটি হবে না তো ! যে তাড়াটা লাগালে, একবার খবর দেবার সময় দিলে না। ঘটক বলেছে, ছেলেটি আমার নিরুপমাকে

ভালো করে দেখে-শুনে নিতে চায়, ওর পড়াশুনো গান-বাজনা সব পরীক্ষা করবে— তা করুক। কর্তা তো নিরুপমাকে সেইরকম করেই শিখিয়েছেন। বরাবর পশ্চিমে ছিলেন, আমাদের কখনো তো বন্ধ করে রাখেন নি। তবু কলকাতার ছেলে কী রকম জানি নে। ভয় হয়, আমাদের ধরন-ধারণ দেখে হয়তো অভদ্র মনে করবে। তারা মেয়ের সঙ্গে শেক্‌হ্যান্ড করে না কি, কে জানে! হয়তো ইংরেজিতে গুডমর্নিং বলে! শুনেছি তাদের নিজের হাতে চুরুট জ্বালিয়ে দিতে হয়— এ-সব তো পারব না। ঘটক বললে, ছেলেটি হ্যাট-কোট পরে। আমার মেয়ে আবার ফিরিঙ্গির সাজ দু চক্ষে দেখতে পারে না। কী রকম যে হবে, বুঝতে পারছি নে। মন্ত্র পড়ে বিয়ে করতে রাজি হবে তো?

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মাঠাকরুন, একটি বাবু এসেছেন। আমি তাঁকে বললেম বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ নেই। তিনি বললেন, তিনি মার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন।

শ্যামা। তবে ঠিক হয়েছে। সেই ছেলেটি এসেছে। ডেকে নিয়ে আয়। (ভৃত্যের প্রস্থান) ভয় হচ্ছে— কলকাতার ছেলে, তার সঙ্গে কিরকম করে চলতে হবে! কী জানোয়ারই মনে করবে!

আশুর প্রবেশ

শ্যামাসুন্দরীর পায়ের কাছে একটি গিনি রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

শ্যামা। (স্বগত) এ যে প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলে গো! এ তো শেক্‌হ্যান্ড করে না। বাঁচালে! লক্ষ্মী ছেলে! কেমন ধুতিচাদর পরে এসেছে!

আশু। মাতাজি, আমাকে যে আপনি দর্শন দেবেন, এ আমি আশা করি নি। বড়ো অনুগ্রহ করেছেন।

শ্যামা। (সস্নেহে সপুলকে) কেন বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো, তোমাকে দেখা দিতে দোষ কী!

আশু। স্নেহ রাখবেন। আশীর্বাদ করবেন, এই অনুগ্রহ থেকে কখনো বঞ্চিত না হই।

শ্যামা। বাবা, তোমার কথা শুনে আমার কান জুড়োল, আমি নিশ্চয়ই অনেক তপস্যা করেছিলেম, তাই—

আশু। মাতাজি, আপনি তপস্যার দ্বারা যে নিরুপমা-সম্পদ লাভ করেছেন, আমাকে তার—

শ্যামা। তোমাকে দেবার জন্যেই তো প্রস্তুত হয়ে এসেছি। অনেক সন্ধান করে যোগ্যপাত্র পেয়েছি, এখন দিতে পারলেই তো নিশ্চিন্ত হই।

আশু। (শ্যামার পদধূলি লইয়া) মাতাজি, আমাকে কৃতার্থ করলেন; এত সহজেই যে ফললাভ করব, এ আমি স্বপ্নেও জানতুম না।

শ্যামা। বল কী বাবা, তোমার আগ্রহ যত আমার আগ্রহ তার চেয়ে বেশি।

আশু। তা হলে যে কামনা করে এসেছিলেম, আজ কি তার কিছু পরিচয়—

শ্যামা। পরিচয় হবে বৈকি বাবা, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

আশু। আপত্তি নেই মাতাজি? শুনে বড়ো আরাম পেলেম—

শ্যামা। দেখাশুনা সমস্তই হবে বাবা, আগে কিছু খেয়ে নাও।

আশু। আবার খাওয়া! আপনি আমাকে যথার্থ জননীর মতোই স্নেহ দেখালেন।

শ্যামা। তুমিও আমাকে মার মতোই দেখবে, এই আমার প্রাণের ইচ্ছা। আমার তো ছেলে নেই, তুমিই আমার ছেলের মতো থাকবে।

আহার্য লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

আশু। করেছেন কী! এত আয়োজন!

শ্যামা। আয়োজন আর কি করলেম? আজই ঠিক আসতে পারবে কি না মনে একটু সন্দেহ ছিল— তাই—

আশু। সন্দেহ ছিল? আপনি কি জানতেন আমি আসব?

শ্যামা। তা জানতেম বৈকি।

আশু। (আত্মগত) কী আশ্চর্য! আমাকে না জেনেই আমার জন্যে পূর্ব হতেই অপেক্ষা করছিলেন? তবু অন্নদা যোগবলে বিশ্বাস করে না! তাকে বললে বোধ হয় ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দেবে।

আহারে প্রবৃত্ত

শ্যামা। (আত্মগত) ছেলেটি সোনার টুকরো। যেমন কার্তিকের মতো দেখতে তেমনি মধু-ঢালা কথা। আমাকে প্রথম থেকেই মাতাজি বলে ডাকছে। পশ্চিম থেকে এসেছি কিনা, তাই বোধ হয় মা না বলে মাতাজি বলছে। (প্রকাশ্যে) কিছুই খেলে না যে বাবা!

আশু। আমার যা সাধ্য, তার চেয়ে বরঞ্চ বেশিই খেয়েছি মাতাজি।

শ্যামা। তা হলে একটু বোসো আমি ডেকে নিয়ে আসি। [প্রস্থান

আশু। রাধে বলেছিল বটে, মাতাজি কুমারী কন্যার দ্বারা মন্ত্রের ফল দেখিয়ে থাকেন। বশীকরণ-বিদ্যায় আমার একটু বিশ্বাস জন্মাচ্ছে। এরই মধ্যে মাতাজির মাতৃস্নেহে আমার চিত্ত কেমন যেন আর্দ্র হয়ে এসেছে। আমার মা নেই, মনে হচ্ছে যেন মাকে পেলেম। এ কোন্ মন্ত্রবলে কে জানে! মাতাজি স্নিগ্ধ দৃষ্টি-দ্বারা আমার সমস্ত শরীর যেন অভিষিক্ত করে দিয়েছেন। প্রথম দেখাতেই উনি যে আমাকে তাঁর পুত্রস্থানীয় করে নিয়েছেন, এ যেন পূর্বজন্মের একটা সম্বন্ধের স্মৃতি।

নিরুপমাকে লইয়া শ্যামার প্রবেশ

আশু। (স্বগত) আহা, কী সুন্দর! মাতাজির বশীকরণ-বিদ্যা যেন মূর্তিমতী! এঁর মুখে কোনো মন্ত্রই বিফল হতে পারে না।

শ্যামা। যাও, লজ্জা কোরো না মা! উনি যা জিজ্ঞাসা করেন উত্তর দিয়ো।

আশু। লজ্জা করবেন না। মাতাজি আমার প্রতি যেরকম অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, আপনিও আমাকে আপনার লোকের মতোই দেখবেন। (আত্মগত) মেয়েটি কী লাজুক! আমার কথা শুনে আরো যেন লাল হয়ে উঠল।

শ্যামা। বাবা, তোমার ইচ্ছামত ওকে জিজ্ঞাসাপত্র করো।

আশু। আপনার কোন্ কোন্ বিদ্যায় অধিকার আছে, জানতে উৎসুক হয়ে আছি।

শ্যামা। বয়স অল্প, বিদ্যা কতই বা বেশি হবে— তবে—

আশু। যত অল্পই হোক মাতাজি, আমাদের মতো লোকের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

শ্যামা। (আত্মগত) বিদ্যার কোনো পরিচয় না পেয়েই যখন এত সন্তুষ্ট তখন মেয়েকে পছন্দ করেছে বলেই বোধ হচ্ছে। বাঁচা গেল, আমার বড়ো ভাবনা ছিল। (প্রকাশ্যে) নিরু, একটি গান শুনিয়ে দাও তো মা!

আশু। গান! এ আমার আশার অতীত। আপনি বোধ হয় পূর্বে থেকেই জানেন, গানের চেয়ে আমি কিছুই ভালোবাসি নে। (স্বগত) অন্নদার মতো এতবড়ো সন্দেহী, সে থাকলে আজ যোগের বল প্রত্যক্ষ করতে পারত। (প্রকাশ্যে নিরুপমার প্রতি) আপনারা আমাকে এক দিনেই চিরঋণী করেছেন, যদি গান করেন তবে বিক্রীত হয়ে থাকব।

নিরুপমার গান

আমি কী বলে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন!
চিত্তে এসে দয়া করি নিজে লহো অপহরি,
করো তারে আপনার ধন—
আমার হৃদয় প্রাণ মন।

শুধু ধূলি, শুধু ছাই, মূল্য যার কিছু নাই
মূল্য তারে করো সমর্পণ
তব স্পর্শে পরশরতন !
তোমার গৌরবে যবে আমার গৌরব হবে
একেবারে দিব বিসর্জন
চরণে হৃদয় প্রাণ মন।

আশু। (স্বগত) আর মন্ত্রের দরকার নেই। বশীকরণের আর কী বাকি রইল ! কন্যাটি দেবকন্যা। (প্রকাশ্যে) মাতাজি !

শ্যামা। কী বাবা ?

আশু। আমাকে আপনার পুত্র করেই রাখবেন, এমন সুধাসংগীত শোনবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না। যা পাওয়া গেল এই আমি পরম লাভ মনে করছি। মন্ত্রতন্ত্রের কথা ভুলেই গেছি। এখন বুঝতে পারছি, মন্ত্রের কোনো দরকার নেই।

শ্যামা। অমন কথা বোলো না বাবা ! মন্ত্রের দরকার আছে বৈকি। নইলে শাস্ত্রে—

আশু। সে তো ঠিক কথা। মন্ত্র আমি অগ্রাহ্য করি নে। আমি বলছিলেম মন্ত্র পড়লেই যে মন বশ হয় তা নয়, গানের মোহিনী শক্তির কাছে কিছুই লাগে না। (স্বগত) মেয়েটি আবার লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। ভারি লাজুক !

শ্যামা। (আত্মগত) ছেলেটি খুব ভালো। কিন্তু একটু যেন লজ্জা কম বলে বোধ হয়। মন বশ করার কথাগুলো শাশুড়ির সামনে না বললেই ভালো হত।

আশু। কিন্তু আপনি বিরক্ত হবেন না, আমার যা মনে উদয় হচ্ছে আমি বলি, তার পরে—

শ্যামা। তা বাবা, সে-সব কথা এখন থাক্। আগে—

আশু। আমি বলছিলেম, গানে যে মন বশ হয় সেও তো শব্দমাত্র ; মনের সঙ্গে তার যদি যোগ থাকে তা হলে মন্ত্রের শব্দশক্তিকেই বা না মানি কী বলে ?

শ্যামা। ঠিক কথা। মন্ত্রটা মানাই ভালো।

আশু। (সোৎসাহে) আপনার কাছে এ-সব কথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, কিন্তু শাব্দী শক্তির সঙ্গে আত্মার যে একটি নিগূঢ় যোগ আছে তার স্বরূপ নিরূপণ করা কঠিন, তর্কালংকারমশায় বলেন সে অনির্বচনীয়। শাস্ত্রে যে বলে শব্দ ব্রহ্ম, তার কারণ কী ? ব্রহ্মই যে শব্দ বা শব্দই যে ব্রহ্ম তা নয় ; কিন্তু ব্রহ্মের ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে শব্দস্বরূপেই ব্রহ্মের প্রকাশ যেন নিকটতম। (নিরুপমার প্রতি) আপনি তো এ-সকল বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন, আপনার কি মনে হয় না রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের চেয়ে শব্দই যেন আমাদের আত্মার অব্যবহিত প্রত্যক্ষের বিষয় ? সেইজন্যই এক আত্মার সঙ্গে আর-এক আত্মার মিলনসাধনের প্রধান উপায় শব্দ। আপনি কী বলেন ? (স্বগত) মেয়েটি ভারি লাজুক !

শ্যামা। বলো-না মা, যা জিজ্ঞাসা করছেন বলো। এত বিদ্যে শিখলে, এই কথাটার উত্তর দিতে পারছ না ?— বাবা, প্রথম দিন কিনা, তাই লজ্জা করছে। ও যে কিছু শেখে নি তা মনে কোরো না।

আশু। ওঁর বিদ্যার উজ্জ্বলতা মুখশ্রীতেই প্রকাশ পাচ্ছে। আমি কিছুমাত্র সন্দেহ করছি নে।

শ্যামা। নিরু, মা, একবার ও ঘরে যাও তো। [নিরুপমার প্রস্থান

দেখো বাবা, মেয়েটির বাপ নেই, সকল কথা আমাকেই কইতে হচ্ছে, তুমি কিছু মনে কোরো না।

আশু। মনে করব ! বলেন কী ! আপনার কথা শুনতেই তো এসেছিলেম— বাচালের মতো কেবল নিজেই কতকগুলো বকে গেলেম। আমাকে মাপ করবেন।

শ্যামা। তোমার যদি মত থাকে তা হলে একটা দিনস্থির করতে হচ্ছে তো ?

আশু। (স্বগত) আমি ভেবেছিলেম, আজই সমস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার, তাই বোধ হয় হল না। (প্রকাশ্যে) তা, আসছে রবিবারেই যদি স্থির করেন ?

শ্যামা। বল কী বাবা ? আজ বৃহস্পতিবার, মাঝে তো কেবল দুটো দিন আছে।

আশু। এর জন্যে কি অনেক আয়োজনের দরকার হবে?

শ্যামা। তা হবে বৈকি বাবা; যথাসাধ্য করতে হবে। তা ছাড়া, পাঁজি দেখে একটা শুভদিন স্থির করতে হবে তো।

আশু। তা বটে, শুভদিন দেখতে হবে বৈকি। আসল কথা, যত শীঘ্র হয়। আমার যেরকম আগ্রহ, ইচ্ছে হচ্ছে, এই মুহূর্তেই—

শ্যামা। তা, আমি অনর্থক দেরি করব না বাবা! আসছে অঘ্রান মাসেই হয়ে যাবে। মেয়েটিরও বিবাহযোগ্য বয়স হয়ে এসেছে, ওকেও তো আর রাখা যাবে না।

আশু। ওঁর বিবাহ হয়ে গেলেই বুঝি—

শ্যামা। তা হলে আবার আমি কাশীতে ফিরে যেতে পারি।

আশু। তা হলে তার আগেই আমাদের—

শ্যামা। সব ঠিক করে নিতে হবে।

আশু। তবে দিনক্ষণ দেখুন।

শ্যামা। তুমি তো রাজি আছ বাবা?

আশু। বিলক্ষণ! রাজি যদি না থাকব তো এখানে এলেম কেন! আপনাকে নিয়ে কি আমি পরিহাস করছি! আমার সেরকম স্বভাব নয়। আমি এখনকার ছেলেদের মতো এ-সকল বিষয় নিয়ে তামাশা করি নে।

শ্যামা। তোমার আর মত বদলাবে না?

আশু। কিছুতেই না। আপনার পদস্পর্শ করে আমি বলছি, আপনার কাছ থেকে যা সংগ্রহ করতে এসেছি তা আমি গ্রহণ করে তবে নিরস্ত হব।

শ্যামা। দেওয়া-থোওয়ার কথা কিছু হল না যে।

আশু। আপনি কী চান বলুন।

শ্যামা। আমি কী চাইব বাবা? তুমি কী চাও, সেইটে বলো।

আশু। আমি কেবল বিদ্যে চাই, আর কিছু চাই নে।

শ্যামা। (স্বগত) ছেলেটি কিন্তু বেহায়া, তা বলতেই হবে! ছি ছি ছি, বিদ্যেসুন্দরের কথা আমার কাছে পাড়লে কী করে? আমার নিরুকে বলে কিনা বিদ্যে! (প্রকাশ্যে) তা হলে পানপাত্রটার কথা কী বল বাবা?

আশু। (স্বগত) পানপাত্র! এঁর দেখছি সমস্তই শাক্তমতে। এ দিকে কুমারী কন্যা, তার পরে আবার পানপাত্র! এইটে আমার ভালো ঠেকছে না। (প্রকাশ্যে) তা, মাতাজি, আপনি কিছু মনে করবেন না— অবশ্য যে কাজের যা অঙ্গ তা করতেই হয়— কিন্তু ঐ-যে পানপাত্রের কথা বললেন, ওটা তো আমার দ্বারা হবে না।

শ্যামা। বাবা, তোমরা একালের ছেলে, তোমরা ওটাকে অসভ্যতা মনে কর, কিন্তু আমি তো ওতে কোনো দোষ দেখি নে—

আশু। আপনি ওতে কোনো দোষই দেখেন না! বলেন কী মাতাজি!

শ্যামা। তা, নাহয় পানপাত্র রইল, ওর জন্যে কিছু আটকাবে না, এখন বিবাহের কথা তো পাকা?

আশু। কার বিবাহের কথা?

শ্যামা। তুমি আমাকে অবাক করলে বাপু! এতক্ষণ কথাবার্তার পর জিজ্ঞাসা করছ কার বিবাহের কথা! তোমারই তো বিবাহের কথা হচ্ছিল; কেবল পানপাত্রের কথা শুনেই তুমি চমকে উঠলে। তা, পানপাত্র নাহয় নাই হল।

আশু। (হতবুদ্ধিভাবে) ও, হাঁ, তা বুঝেছি, তাই হচ্ছিল বটে! (স্বগত) মস্ত একটা কী ভুল হয়ে গেছে। না বুঝে একেবারে জড়িয়ে পড়েছি। কী করা যায়! (প্রকাশ্যে) কিন্তু, এত তাড়াতাড়ি কিসের, আর-এক দিন এ-সব কথা খোলসা করে আলোচনা করা যাবে। কী বলেন?

শ্যামা। খোলসার আর কী বাকি রেখেছ বাবা! আর-এক দিন এর চেয়ে আর কত খোলসা হবে! তাড়াতাড়ি তো তুমিই করছিলে। আসছে রবিবারেই তুমি দিন স্থির করতে চেয়েছিলে।

আশু। তা চেয়েছিলেম বটে।

শ্যামা। তুমি দেখাশুনা করতে চাইলে বলেই আমি মেয়েকে তোমার সাক্ষাতে বের করলুম, তার গানও শুনলে, এখন পানপাত্রের কথা শুনেই যদি বেঁকে দাঁড়াও তা হলে তো আমার আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না। তোমাকেই বা লোকে কী বলবে বাবা! ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার কি ভালো! আমার নিরু তোমার কাছে কী দোষ করেছিল যে—

ক্রন্দন

নিরুপমার দ্রুত প্রবেশ

নিরুপমা। মা, কী হয়েছে মা, অমন করে কাঁদছ কেন!

আশু। (স্বগত) কী সর্বনাশ! আমাকে এঁরা সবাই কী মনে করবেন না-জানি! (প্রকাশ্যে) কিছুই হয় নি, আমি সমস্তই ঠিক করে দিচ্ছি। আপনারা কান্নাকাটি করবেন না। শুভকর্মে ওতে অমঙ্গল হয়। (শ্যামার প্রতি) তা, আপনি একটা দিন স্থির করে দিন, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

শ্যামা। তা বাবা, যদি ভালো দিন হয়, তা হলে তুমি যা বলেছিলে আসছে রবিবারেই হয়ে যাক। আমার আয়োজনে কাজ নেই। এই কটা দিন তোমার মত স্থির থাকলে বাঁচি।

আশু। অমন কথা বলবেন না, আমার মতের কখনো নড়চড় হয় না।

শ্যামা। আমার পা ছুঁয়ে তো তাই বলেওছিলে, কিন্তু দশ মিনিট না যেতেই এক পানপাত্রের কথা শুনেই তোমার মত বদলে গেল।

আশু। তা বটে। পানপাত্রটা আমি আদবে পছন্দ করি না—

শ্যামা। কেন বলো তো বাবা?

আশু। তা ঠিক বলতে পারছি নে— ঐ আমার কেমন— বোধ হয়, ওটা— কী জানেন, পানপাত্রটা যেন— কে জানে ও কথাটাই কেমন— হঠাৎ শুনলে কী যেন— তা, এই বাড়িটার নম্বর কী বলুন দেখি।

শ্যামা। ওঃ, তাই বুঝি ভাবছ? আমরা তোমাকে ভাঁড়াচ্ছি নে বাবা। আমরাই উনপঞ্চাশ নম্বরে ছিলুম, কাল এই বাইশ নম্বরে উঠে এসেছি। যদি মনে কোনো সন্দেহ থাকে, উনপঞ্চাশ নম্বরে বরঞ্চ একবার খোঁজ করে আসতে পারো।

আশু। (স্বগত) উঃ, কী ভুলই করেছি! যা হোক, এখন একটা পরিত্রাণের রাস্তা পাওয়া গেছে। অন্নদাকে এনে দিলেই সমস্ত গোল মিটে যাবে। যা হোক, অন্নদার অদৃষ্ট ভালো। এক-একবার মনে হচ্ছে, ভুলটা শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

শ্যামা। কী বাবা? এত ভাবছ কেন? আমরা ভদ্রঘরের মেয়ে, তোমাকে ঠকাবার জন্যে পশ্চিম থেকে এখেনে আসি নি।

আশু। ও কথা বলবেন না, আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। এখন আমি যাচ্ছি, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব, আজকের দিনের মধ্যেই একটা সন্তোষজনক বন্দোবস্ত করবই— এ আমি আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করে যাচ্ছি।

শ্যামা। বাবা, ও শপথে কাজ নেই— পা ছুঁয়ে আরো একবার শপথ করেছিলে—

আশু। আচ্ছা, আমি আমার ইষ্টদেবতার শপথ করে যাচ্ছি, আজকের মধ্যেই সমস্ত পাকা করে তবে অন্য কথা।

শ্যামা। (স্বগত) ছেলেটি কথাবার্তায় বেশ, কিন্তু ওকে কিছুই বুঝবার জো নেই। কখনো-বা তাড়া দেয়, কখনো-বা ঢিল দেয়, অথচ মুখ দেখে ওর প্রতি অবিশ্বাসও হয় না।

আশু। তবে অনুমতি করেন তো এখন আসি।

শ্যামা। তা, এসো বাবা। [প্রণাম করিয়া আশুর প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

অন্নদা

অন্নদা। ব্যাপারখানা তো কিছুই বুঝতে পারলেম না। ঘটকের কথা শুনে এলেম কন্যা দেখতে। যিনি দেখা দিলেন, তাঁকে তো বয়স দেখে কোনোমতেই কন্যার মা বলে মনে হয় না, চেহারা দেখে বোধ হল অপ্সরী— যদিচ অপ্সরীর চেহারা কিরকম পূর্বে কখনো দেখি নি। শেক্‌হ্যান্ড করতে যেমনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি অমনি ফস্‌ করে আমার হাতে কড়ি-বাঁধা একগাছি লাল সুতো বেঁধে দিলে। আর-কেউ হলে গোলমাল করতেম ; কিন্তু যে সুন্দর চেহারা, গোলমাল করবার জো কী ! কিন্তু, এ-সমস্ত কোন্‌দেশী দস্তুর তা তো বুঝতে পারছি নে।

মাতাজির প্রবেশ

মাতাজি। (স্বগত) অনেক সন্ধান করে তবে পেয়েছি। আগে আমার গুরুদত্ত বশীকরণ-মন্ত্রটা খাটাই, তার পরে পরিচয় দেব। (অন্নদার কপালে নরকপাল ঠেকাইয়া) বলো, হুর্‌লিং।

অন্নদা। হুর্‌লিং।

মাতাজি। (অন্নদার গলায় জবার মালা পরাইয়া) বলো, কুড়বং কড়বং ক্‌ড়াং।

অন্নদা। (স্বগত) ছি ছি ! ভারি হাস্যকর হয়ে উঠছে। একে আমার কোটের উপর জবার মালা, তার উপরে আবার এই অদ্ভুত শব্দগুলো উচ্চারণ !

মাতাজি। চুপ করে রইলে যে ?

অন্নদা। বলছি। কী বলছিলেন বলুন।

মাতাজি। কুড়বং কড়বং ক্‌ড়াং।

অন্নদা। কুড়বং কড়বং ক্‌ড়াং। (স্বগত) রিডিক্লাস !

মাতাজি। মাথাটা নিচু করো। কপালে সিঁদুর দিতে হবে।

অন্নদা। সিঁদুর ! সিঁদুর কি এই বেশে আমাকে ঠিক মানাবে ?

মাতাজি। তা জানি নে, কিন্তু ওটা দিতে হবে।

অন্নদার কপালে সিঁদুর-লেপন

অন্নদা। ইস ! সমস্ত কপালে যে একেবারে লেপে দিলেন !

মাতাজি। বলো, বজ্রযোগিন্যৈ নমঃ। (অন্নদার অনুরূপ আবৃত্তি) প্রণাম করো। (অন্নদাকর্তৃক তথাকৃত) বলো কুড়বে কড়বে নমঃ। প্রণাম করো। বলো হুর্‌লিঙে ঘুর্‌লিঙে নমঃ। প্রণাম করো।

অন্নদা। (স্বগত) প্রহসনটা ক্রমেই জমে উঠছে।

মাতাজি। এইবার মাতা বজ্রযোগিনীর এই প্রসাদী বস্ত্রখণ্ড মাথায় বাঁধো।

অন্নদা। (স্বগত) এই শালুর টুকরোটা মাথায় বাঁধতে হবে ! ক্রমেই যে বাড়াবাড়ি হতে চলল। (প্রকাশ্যে) দেখুন, এর চেয়ে বরঞ্চ আমি পাগড়ি পরতেও রাজি আছি, এমন-কি, বাঙালিবাবুরা যে টুপি পরে তাও পরতে পারি—

মাতাজি। সে-সমস্ত পরে হবে, আপাতত এইটে জড়িয়ে দিই।

অন্নদা। দিন।

মাতাজি। এইবারে এই পিঁড়িটাতে বসুন।

অন্নদা। (স্বগত) মুশকিলে ফেললে। আমি আবার ট্রাউজার পরে এসেছি ! যাই হোক, কোনোমতে বসতেই হবে।

উপবেশন

মাতাজি। চোখ বোজো। বলো, খটকারিনী হঠবারিণী ঘটসারিণী নটতারিণী ক্রং। প্রণাম করো। (অন্নদার তথাকরণ) কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

অন্নদা। কিচ্ছু না।

মাতাজি। আচ্ছা, তা হলে পুবমুখো হয়ে বোসো, ডান কানে হাত দাও। বলো; খটকারিণী হঠবারিণী ঘটসারিণী নটতারিণী ক্রং। প্রণাম করো। এবার কিছু দেখতে পাচ্ছ?

অন্নদা। কিছুই না।

মাতাজি। আচ্ছা, তা হলে পিছন ফিরে বোসো। দুই কানে দুই হাত দাও। বলো, খটকারিণী হঠবারিণী ঘটসারিণী নটতারিণী ক্রং। কিছু দেখতে পাচ্ছ?

অন্নদা। কী দেখতে পাওয়া উচিত, আগে আমাকে বলুন।

মাতাজি। একটা গর্দভ দেখতে পাচ্ছ তো?

অন্নদা। পাচ্ছি বৈকি! অত্যন্ত নিকটেই দেখতে পাচ্ছি।

মাতাজি। তবে মন্ত্র ফলেছে। তার পিঠের উপরে—

অন্নদা। হাঁ হাঁ, তার পিঠের উপরে একজনকে দেখতে পাচ্ছি বৈকি।

মাতাজি। গর্দভের দুই কান হাতে চেপে ধরে—

অন্নদা। ঠিক বলেছেন, কষে চেপে ধরেছে—

মাতাজি। একটি সুন্দরী কন্যা—

অন্নদা। পরমা সুন্দরী—

মাতাজি। ঈশানকোণের দিকে চলেছেন—

অন্নদা। দিক্‌ভ্রম হয়ে গেছে, কোন্ কোণে যাচ্ছেন তা ঠিক বলতে পারছি নে। কিন্তু ছুটিয়ে চলেছেন বটে! গাধাটার হাঁফ ধরে গেল।

মাতাজি। ছুটিয়ে যাচ্ছেন না কি? তবে তো আর-একবার—

অন্নদা। না না, ছুটিয়ে যাবেন কেন— কিরকম যাওয়াটা আপনি স্থির করছেন বলুন দেখি।

মাতাজি। একবার এগিয়ে যাচ্ছেন, আবার পিছু হটে পিছিয়ে আসছেন।

অন্নদা। ঠিক তাই। এগোচ্ছেন আর পিছোচ্ছেন। গাধাটার জিভ বেরিয়ে পড়েছে।

মাতাজি। তা হলে ঠিক হয়েছে। এবার সময় হল। ওলো মাতঙ্গিনী, তোরা সবাই আয়।

হুলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে স্ত্রীদলের প্রবেশ

অন্নদার বামে মাতাজির উপবেশন ও তাহার হস্তে হস্তস্থাপন

অন্নদা। এটা বেশ লাগছে, কিন্তু ব্যাপারটা কী ঠিক বুঝতে পারছি নে।

রমণীগণের গান

এবার সখী, সোনার মৃগ
দেয় বুঝি দেয় ধরা।
আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা,
আয় সবে আয় ত্বরা।
ছুটেছিল পিয়াস-ভরে
মরীচিকা-বারির তরে,
ধ'রে তারে কোমল করে
কঠিন ফাঁসি পরা।
দয়ামায়া করিস নে গো,
ওদের নয় সে ধারা।
দয়ার দোহাই মানবে না গো
একটু পেলেই ছাড়া।

বাঁধন-কাটা বন্যটাকে
মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে,
ভুলাও তাকে বাঁশির ডাকে
বুদ্ধি-বিচার-হরা ॥

অন্নদা। বুদ্ধি-বিচার একেবারেই যায় নি। অতি সামান্যই বাকি আছে। তার থেকে মনে হচ্ছে, ঐ-যে যাকে জন্তু-জানোয়ার বলা হল সে সৌভাগ্যশালী আমি ছাড়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে, আর কেউ হতেই পারে না। গানটি ভালো, সুরটিও বেশ, কণ্ঠস্বরেরও নিন্দা করা যায় না, কিন্তু রূপক ভেঙে সাদা ভাষায় একটু স্পষ্ট করে সবটা খুলে বলুন দেখি— আমার সম্বন্ধে আপনারা কী করতে চান ? পালাব এমন আশঙ্কা করবেন না, আপনারা তাড়া দিলেও নয়। কিন্তু কোথায় এলুম, কেন এলুম, কোথায় যাব, এ-সকল গুরুতর প্রশ্ন মানবমনে স্বভাবতই উদয় হয়ে থাকে।

মাতাজি। তোমার স্ত্রীকে কি মাঝে মাঝে স্মরণ কর ?

অন্নদা। করে লাভ কী, কেবল সময় নষ্ট। তাঁকে স্মরণ করে যেটুকু সুখ, আপনাদের দর্শন করে তার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দ।

মাতাজি। তোমার স্ত্রী যদি তোমাকে স্মরণ করে সময় নষ্ট করেন ?

অন্নদা। তা হলে তাঁর প্রতি আমার উপদেশ এই যে, আর অধিক নষ্ট করা উচিত হয় না ; হয় বিস্মরণ করতে আরম্ভ করুন নয় দর্শন দিন— সময়টা মূল্যবান জিনিস।

মাতাজি। সেই উপদেশই শিরোধার্য। আমিই তোমার সেবিকা শ্রীমতী মহীমোহিনী দেবী।

অন্নদা। বাঁচালে ! মনে যেরকম ভাবোদ্রেক করেছিলে, নিজের স্ত্রী না হলে গলায় দড়ি দিতে হত। কিন্তু নিজের স্বামীর জন্যে এ-সমস্ত ব্যাপার কেন ?

মাতাজি। গুরুর কাছে যে বশীকরণ-মন্ত্র শিখেছিলেম আগে সেইটে প্রয়োগ করে তবে আত্মপরিচয় দিলেম, এখন আর তোমার নিষ্কৃতি নেই।

অন্নদা। আর-কারও উপর এ মন্ত্রের পরীক্ষা করা হয়েছে ?

মাতাজি। না, তোমার জন্যেই এতদিন এ মন্ত্র ধারণ করে রেখেছিলেম। আজ এর আশ্চর্য প্রত্যক্ষ ফল পেয়ে গুরুর চরণে মনে মনে শতবার প্রণাম করছি। অব্যর্থ মন্ত্র। মন্ত্রে তোমার কি বিশ্বাস হল না ?

অন্নদা। বশীকরণের কথা অস্বীকার করতে পারি নে। এখন তোমাকে একবার এই মন্ত্রগুলো পড়িয়ে নিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

দাসী-কর্তৃক সম্মুখে আহার্য-স্থাপন

এও বশীকরণের অঙ্গ। বন্যমৃগই হোক আর শহুরে গাধাই হোক পোষ মানাবার পক্ষে এটা খুব দরকারি।

আহারে প্রবৃত্ত

আশুর দ্রুত প্রবেশ

[মাতাজি প্রভৃতির প্রস্থান

আশু। ওহে অন্নদা, ভারি গোলমাল বেধে গেছে। বাঃ, তুমি যে দিব্যি আহার করতে বসেছ ! তোমার এ কী রকমের সাজ ! (উচ্চহাস্য) ব্যাপারখানা কী ? নরমুণ্ড, খাঁড়া, বাতি, জবার মালা ! তোমার বলিদান হবে নাকি ?

অন্নদা। হয়ে গেছে।

আশু। হয়ে গেছে কী রকম ?

অন্নদা। সে-সকল ব্যাখ্যা পরে করব। তোমার খবরটা আগে বলো।

আশু। তুমি বিবাহের জন্য যে কন্যাটিকে দেখবে বলে স্থির করেছিলে, তাঁরা হঠাৎ উনপঞ্চাশ নম্বর থেকে বাইশ নম্বরে উঠে গেছেন। আমি কন্যার বিধবা মাকে মাতাজি মনে করে বার বার এমন নির্বোধের মতো কথাবার্তা কয়ে গেছি যে, তাঁরা ঠিক করে নিয়েছেন, আমি মেয়েটিকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছি। এখন তুমি না গেলে তো আর উদ্ধার নেই।

অন্নদা। মেয়েটি দেখতে কেমন ?

আশু। দেবকন্যার মতো।

অন্নদা। তা হোক, বহুবিবাহ আমার মতবিরুদ্ধ।

আশু। বল কী ! সেদিন এত তর্ক করলে—

অন্নদা। সেদিনকার চেয়ে ঢের ভালো যুক্তি আজ পাওয়া গেছে—

আশু। একেবারে অখণ্ডনীয় ?

অন্নদা। অখণ্ডনীয়।

আশু। যুক্তিটা কিরকম দেখা যাক।

অন্নদা। তবে একটু বোসো। (প্রস্থান ও মাতাজিকে লইয়া প্রবেশ) ইনি আমার স্ত্রী শ্রীমতী মহীমোহিনী দেবী।

আশু। অ্যাঁ ! ইনি তোমার— আপনি আমাদের অন্নদার— কী আশ্চর্য ! তা হলে তো হতে পারে না।

অন্নদা। হতে পারে না কী বলছ ? হয়েছে, আবার হতে পারে না কী ? একবার হয়েছে, এই আবার দুবার হল, তুমি বলছ হতে পারে না !

আশু। না, আমি তা বলছি নে। আমি বলছি, সেই বাইশ নম্বরের কী করা যায় !

অন্নদা। সে আর শক্ত কী ! সহজ উপায় আছে।

আশু। কী বলো দেখি।

অন্নদা। বিয়ে করে ফেলো।

আশু। সমস্ত বিসর্জন দেব— আমার হঠযোগ, প্রাণায়াম, মন্ত্রসাধন—

অন্নদা। ভয় কী, তুমি যেগুলো ছাড়বে আমি সেগুলো গ্রহণ করব। সে যাই হোক, তোমার বশীকরণটা কিরকম হল ?

আশু। তা, নিতান্ত কম হয় নি। তোমার এই একটা ঠাট্টা করবার বিষয় হল।

অন্নদা। আর ঠাট্টা চলবে না।

আশু। কেন বলো দেখি।

অন্নদা। আমারও বশীকরণ হয়ে গেছে।

আশু। চললেম। এক ঘণ্টার মধ্যেই যাবার কথা আছে। কথাটা পাকা করে আসি গে।

অগ্রহায়ণ ১৩০৮

শারদোৎসব

পাত্রগণ

সন্ন্যাসী
ঠাকুরদাদা
লক্ষেশ্বর
উপনন্দ
রাজা
রাজদূত
অমাত্য
বালকগণ

রাগিণী ভৈরবী। তাল তেওরা

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,
আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।

ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে।
অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোক-পানে তুলে দে।

আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠ্‌ রে ফুটে,
চোখের 'পরে আলস-ভরে
রাখিস নে আর আঁচল টানি।

শারদোৎসব

প্রথম দৃশ্য

পথে বালকগণ

গান

বিভাস। একতালা

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,
বাদল গেছে টুটি—
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি!
কেয়া-পাতার নৌকো গড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে,
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব—
চলবে দুলে দুলে।
রাখাল-ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

লক্ষেশ্বর। (ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া) ছেলেগুলো তো জ্বালালে! ওরে চোবে! ওরে গিরিধারীলাল! ধর্ তো ছোঁড়াগুলোকে ধর্ তো।

ছেলেরা। (দূরে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া) ওরে লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে রে, লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। হনুমন্ত সিং, ওদের কান পাকড়ে আন্ তো; একটাকেও ছাড়িস নে।

একজন বালক। (চুপি চুপি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া কান হইতে কলম টানিয়া লইয়া)—

কাক লেগেছে লক্ষ্মীপেঁচা
লেজে ঠোকর খেয়ে চেঁচা।

লক্ষেশ্বর। হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া সব, আজ একটাকেও আস্ত রাখব না!

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। কী হয়েছে লখাদাদা ? মারমূর্তি কেন ?

লক্ষেশ্বর। আরে, দেখো-না ! সক্কালবেলা কানের কাছে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে।

ঠাকুরদাদা। আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না ? গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে ! হায় রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্ছেন !

লক্ষেশ্বর। গান গাবার বুঝি আর সময় নেই ! আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে। আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে।

ঠাকুরদাদা। তা ঠিক। হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা। ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের গরমিল হয়ে যায়।— ওরে বাঁদরগুলো, আয় তো রে ! চল্ তোদের পঞ্চাননতলার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি।— যাও দাদা, তোমার দপ্তর নিয়ে বোসো গে। আর হিসেবে ভুল হবে না।

ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া ছেলেদের নৃত্য

প্রথম। হাঁ ঠাকুরদাদা, চলো।

দ্বিতীয়। আমাদের আজ গল্প বলতে হবে।

তৃতীয়। না, গল্প না, বটতলায় ব'সে আজ ঠাকুর্দার পাঁচালি হবে।

চতুর্থ। বটতলায় না, ঠাকুর্দা, আজ পারুলডাঙায় চলো।

ঠাকুরদাদা। চুপ, চুপ, চুপ ! অমন গোলমাল লাগাস যদি তো লখাদাদা আবার ছুটে আসবে।

লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কোন্ পোড়ারমুখো আমার কলম নিয়েছে রে !

[কলম ফেলিয়া দিয়া সকলের প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কী রে, তোর প্রভু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে ? অনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ। কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে।

লক্ষেশ্বর। মৃত্যু ! মৃত্যু হলে চলবে কেন ? আমার টাকাগুলোর কী হবে ?

উপনন্দ। তাঁর তো কিছুই নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জন ক'রে তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র।

লক্ষেশ্বর। বীণাটি আছে মাত্র ! কী শুভসংবাদটাই দিলে !

উপনন্দ। আমি শুভসংবাদ দিতে আসি নি। আমি একদিন পথের ভিক্ষুক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহু দুঃখের অন্নের ভাগে আমাকে মানুষ করেছেন। তোমার কাছে দাসত্ব ক'রে আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। বটে ! তাই বুঝি তাঁর অভাবে আমার বহু দুঃখের অন্নে ভাগ বসাবার মতলব করেছ। আমি তত বড়ো গর্দভ নই।— আচ্ছা, তুই কী করতে পারিস বল দেখি।

উপনন্দ। আমি চিত্রবিচিত্র করে পুঁথি নকল করতে পারি। তোমার অন্ন আমি চাই নে। আমি নিজে উপার্জন করে যা পারি খাব— তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। আমাদের বীনকারটিও যেমন নির্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখছি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক-এক জনের ঐরকম মরাই স্বভাব !— আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়মমত টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ। নইলে আবার কী ! আমাকে ভয় দেখাচ্ছ মিছে। আমার কী আছে যে তুমি আমার কিছু

করবে ? আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করে ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেছি। আমাকে ভয় দেখিয়ো না বলছি।

লক্ষেশ্বর। না না, ভয় দেখাব না। তুমি লক্ষ্মীছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে ! টাকাটা ঠিকমত দিয়ো বাবা ! নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে, তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে— সেটাতে তোমারই পাপ হবে।

[উপনন্দের প্রস্থান

ঐ যে ! আমার ছেলেটা এইখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি কোন্‌খানে টাকা পুঁতে রাখি ও নিশ্চয়ই সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই তো আমাকে এক সুরঙ্গ হতে আর-এক সুরঙ্গে টাকা বদল করে বেড়াতে হয়।— ধনপতি, এখানে কেন রে ? তোর মতলবটা কী বল্‌ দেখি !

ধনপতি। ছেলেরা আজ সকলেই বেতসিনীর ধারে আমোদ করতে গেছে— আমাকে ছুটি দিলে আমিও যাই।

লক্ষেশ্বর। বেতসিনীর ধারে ! ঐ রে, খবর পেয়েছে বুঝি ! বেতসিনীর ধারেই তো আমি সেই গজমোতির কৌটো পুঁতে রেখেছি। (ধনপতির প্রতি) না, না, খবরদার বলছি, সে-সব না। চল্‌, শীঘ্র চল্‌, নামতা মুখস্থ করতে হবে।

ধনপতি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আজ এমন সুন্দর দিনটা !

লক্ষেশ্বর। দিন আবার সুন্দর কী রে ! এইরকম বুদ্ধি মাথায় ঢুকলেই ছোঁড়াটা মরবে আর-কি ! যা বলছি ঘরে যা।

[ধনপতির প্রস্থান

ভারি বিশ্রী দিন ! আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারি নে। মনে করছি মলয়দ্বীপে গিয়ে কিছু চন্দন জোগাড় করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়। যাই হোক, সে পরে হবে, আপাতত বেতসিনীর ধারটায় একবার ঘুরে আসতে হচ্ছে। ছোঁড়াগুলো খবর পায় নি তো ! ওদের যে ইঁদুরের স্বভাব ! সব জিনিস খুঁড়ে বের করে ফেলে— কোনো জিনিসের মূল্য বোঝে না, কেবল কেটেকুটে ছারখার করতেই ভালোবাসে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেতসিনীর তীর। বন

ঠাকুরদাদা ও বালকগণ

গান

বাউলের সুর

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা !

একজন বালক। ঠাকুর্দা, তুমি আমাদের দলে।

দ্বিতীয় বালক। না ঠাকুর্দা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।

ঠাকুরদাদা। না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই ; সে-সব হয়ে-বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর্‌।—

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখীর মেলা !

অন্য দল আসিয়া। ঠাকুর্দা, এই বুঝি ! আমাদের তুমি ডেকে আনলে না কেন ? তোমার সঙ্গে আড়ি ! জন্মের মতো আড়ি !

ঠাকুরদাদা। এতবড়ো দণ্ড ! নিজেরা দোষ করে আমাকে শাস্তি ! আমি তোদের ডেকে বের করব, না তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আনবি ! না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর্।—

ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই,
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।

প্রথম বালক। ঠাকুর্দা, ঐ দেখো, ঐ দেখো, সন্ন্যাসী আসছে।

দ্বিতীয় বালক। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেলব। আমরা সব চেলা সাজব।

তৃতীয় বালক। আমরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না।

ঠাকুরদাদা। আরে চুপ, চুপ.!

সকলে। সন্ন্যাসীঠাকুর ! সন্ন্যাসীঠাকুর !

ঠাকুরদাদা। আরে থাম্ থাম্। ঠাকুর রাগ করবে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালকগণ। সন্ন্যাসীঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে ? আজ আমরা সব তোমার চেলা হব।

সন্ন্যাসী। হা হা হা হা ! এ তো খুব ভালো কথা। তার পরে আবার তোমরা সব শিশু-সন্ন্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজব। এ বেশ খেলা, এ চমৎকার খেলা।

ঠাকুরদাদা। প্রণাম হই, আপনি কে ?

সন্ন্যাসী। আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা। আপনি ছাত্র ?

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা। ও ঠাকুর, বুঝেছি। বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হালকা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন !

সন্ন্যাসী। চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই।

ঠাকুরদাদা। বেশ বেশ ! আমাকেও একটু পায়ের ধুলো দেবেন। প্রভু, আপনার নাম বোধ করি শুনেছি— আপনি তো স্বামী অপূর্বানন্দ !

ছেলেরা। সন্ন্যাসীঠাকুর, ঠাকুরদাদা কী মিথ্যে বকছেন ! এমনি করে আমাদের ছুটি বয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ, বৎস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আসছে।

ছেলেরা। তোমার কত দিনের ছুটি?

সন্ন্যাসী। খুব অল্প দিনের। আমার গুরুমশায় তাড়া করে বেরিয়েছেন, তিনি বেশি দূরে নেই— এলেন বলে।

ছেলেরা। ও বাবা, তোমারও গুরুমশায়!

প্রথম বালক। সন্ন্যাসীঠাকুর, চলো আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চলো। তোমার যেখানে খুশি।

ঠাকুরদাদা। আমিও পিছনে আছি ঠাকুর, আমাকেও ভুলো না।

সন্ন্যাসী। আহা, ও ছেলেটি কে? গাছের তলায় এমন দিনে পুঁথির মধ্যে ডুবে রয়েছে!

বালকগণ। উপনন্দ।

প্রথম বালক। ভাই উপনন্দ, এসো ভাই! আমরা আজ সন্ন্যাসীঠাকুরের চেলা সেজেছি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তুমি হবে সর্দার চেলা।

উপনন্দ। না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা। কিচ্ছু কাজ নেই, তুমি এসো।

উপনন্দ। আমার পুঁথি নকল করতে অনেকখানি বাকি আছে।

ছেলেরা। সে বুঝি কাজ! ভারি তো কাজ!— ঠাকুর, তুমি ওকে বলো-না। ও আমাদের কথা শুনবে না। কিন্তু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সন্ন্যাসী। (পাশে বসিয়া) বাছা, তুমি কী কাজ করছ? আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ। (সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, পায়ের ধুলা লইয়া) আজ ছুটির দিন। কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি।

ঠাকুরদাদা। উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই?

উপনন্দ। ঠাকুরদাদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন, তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী— সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, তোমার মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণ শোধ করতে হয়! আর, এমন দিনেও ঋণশোধ!— ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ও পারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এ পারে ধানের খেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলিবন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরই মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে— এও কি চক্ষে দেখা যায়?

সন্ন্যাসী। বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে! ঐ ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে— চেয়ে দেখো তো! লেখো, লেখো বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ। তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হোক।

ঠাকুরদাদা। আছে আছে, চশমাটা ট্যাঁকে আছে, আমিও বসে যাই-না।

প্রথম বালক। ঠাকুর, আমরাও লিখব। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ, সে বেশ মজা হবে।

উপনন্দ। বল কী ঠাকুর, তোমাদের যে ভারি কষ্ট হবে।

সন্ন্যাসী। সেইজন্যেই বসে গেছি। আজ আমরা সব মজা করে কষ্ট করব। কী বল বাবা-সকল? আজ একটা-কিছু কষ্ট না করলে আনন্দ হচ্ছে না।

সকলে। (হাততালি দিয়া) হাঁ হাঁ, নইলে মজা কিসের!

প্রথম বালক। দাও দাও, আমাকে একটা পুঁথি দাও।

দ্বিতীয় বালক। আমাকেও একটা দাও-না।

উপনন্দ। তোমরা পারবে তো ভাই ?

প্রথম বালক। খুব পারব। কেন পারব না ?

উপনন্দ। শ্রান্ত হবে না তো ?

দ্বিতীয় বালক। কক্‌খনো না।

উপনন্দ। খুব ধরে ধরে লিখতে হবে কিন্তু।

প্রথম বালক। তা বুঝি পারি নে ! আচ্ছা, তুমি দেখো।

উপনন্দ। ভুল থাকলে চলবে না।

দ্বিতীয় বালক। কিচ্ছু ভুল থাকবে না।

প্রথম বালক। এ বেশ মজা হচ্ছে। পুঁথি শেষ করব তবে ছাড়ব।

দ্বিতীয় বালক। নইলে ওঠা হবে না।

তৃতীয় বালক। কী বল ঠাকুর্দা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো-বাচ করতে যাব। বেশ মজা !

ঠাকুরদাদা। গান

সিন্ধু ভৈরবী। তেওরা

আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান
দাঁড় ধ'রে আজ বোস্ রে সবাই, টান্ রে সবাই টান্।
বোঝা যত বোঝাই করি
করব রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি—
যায় যদি যাক প্রাণ।
কে ডাকে রে পিছন হতে, কে করে রে মানা ?
ভয়ের কথা কে বলে আজ, ভয় আছে সব জানা।
কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাকব বসে ?—
পালের রশি ধরব কষি,
চলব গেয়ে গান।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা !

ঠাকুরদাদা। (জিভ কাটিয়া) প্রভু, তুমিও আমাকে পরিহাস করবে ?

সন্ন্যাসী। তুমি যে জগতে ঠাকুর্দা হয়েই জন্মগ্রহণ করেছ, ঈশ্বর সকলের সঙ্গেই তোমার হাসির সম্বন্ধ পাতিয়ে দিয়ে বসেছেন, সে তো তুমি লুকিয়ে রাখতে পারবে না ! ছোটো ছোটো ছেলেগুলির কাছেও ধরা পড়েছ, আর আমাকেই ফাঁকি দেবে ?

ঠাকুরদাদা। ছেলে-ভোলানোই যে আমার কাজ— তা ঠাকুর, তুমিও যদি ছেলের দলেই ভিড়ে যাও তা হলে কথা নেই। তা, কী আজ্ঞা কর !

সন্ন্যাসী। আমি বলছিলেম ঐ-যে গানটা গাইলে, ওটা আজ ঠিক হল না। দুঃখ নিয়ে ঐ অত্যন্ত টানাটানির কথাটা, ওটা আমার কানে ঠিক লাগছে না। দুঃখ তো জগৎ ছেয়েই আছে, কিন্তু চার দিকে চেয়ে দেখো-না— টানাটানির তো কোনো চেহারা দেখা যায় না। তাই এই শরৎ-প্রভাতের মান রাখবার জন্যে আমাকে আর-একটা গান গাইতে হল।

ঠাকুরদাদা। তোমাদের সঙ্গ এইজন্যই এত দামি ; ভুল করলেও ভুলকে সার্থক করে তোল।

সন্ন্যাসী। গান

ললিত। আড়াঠেকা

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার।
চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলংকার।
ধন ধান্য তোমারি ধন,
কী করবে তা কও।
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়,
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস—
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস
এ মোর অহংকার।

বাবা উপনন্দ, তোমার প্রভুর কী নাম ছিল?

উপনন্দ। সুরসেন।

সন্ন্যাসী। সুরসেন! বীণাচার্য?

উপনন্দ। হাঁ ঠাকুর, তুমি তাঁকে জানতে?

সন্ন্যাসী। আমি তাঁর বীণা শুনব আশা করেই এখানে এসেছিলেম।

উপনন্দ। তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল?

ঠাকুরদাদা। তিনি কি এতবড়ো গুণী? তুমি তাঁর বাজনা শোনবার জন্যেই এ দেশে এসেছ? তবে তো আমরা তাঁকে চিনি নি!

সন্ন্যাসী। এখানকার রাজা?

ঠাকুরদাদা। এখানকার রাজা তো কোনোদিন তাঁকে ডাকেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তাঁর বীণা কোথায় শুনলে?

সন্ন্যাসী। তোমরা হয়তো জান না, বিজয়াদিত্য বলে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা। বল কী ঠাকুর! আমরা অত্যন্ত মূর্খ, গ্রাম্য, তাই বলে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না এও কি হয়? তিনি যে আমাদের চক্রবর্তী সম্রাট।

সন্ন্যাসী। তা হবে। তা, সেই লোকটির সভায় একদিন সুরসেন বীণা বাজিয়েছিলেন, তখন শুনেছিলেম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, এতবড়ো লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি নি!

সন্ন্যাসী। আদর কর নি তাতে তাঁকে কমাতে পার নি, আরো তাঁকে বড়ো করেছ। ভগবান তাঁকে নিজের সভায় ডেকে নিয়েছেন।— বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কী রকমে সম্বন্ধ হল?

উপনন্দ। ছোটো বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকালবেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এক কোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলেম। পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে

করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন ; বললেন, এসো বাবা, আমার ঘরে এসো। সেই দিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেছেন ; লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে, তিনি কান দেন নি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তা হলে কিছু কিছু উপার্জন করে আপনার হাতে দিতে পারব। তিনি বললেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয় ; আমার আর-এক বিদ্যা জানা আছে, তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে আমাকে রঙ দিয়ে চিত্র করে পুঁথি লিখতে শিখিয়েছেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জানত।

সন্ন্যাসী। সুরসেনের বীণা শুনতে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর-এক বীণা শুনে নিলুম, এর সুর কোনোদিন ভুলব না।— বাবা, লেখো, লেখো।

ছেলেরা। ঐ রে, ঐ আসছে! ঐ রে লখা, ঐ রে লক্ষ্মীপেঁচা!

দৌড়

লক্ষেশ্বর। আ সর্বনাশ! যেখানটিতে আমি কৌটো পুঁতে রেখেছিলুম ঠিক সেই জায়গাটিতেই যে উপনন্দ বসে গেছে? আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বুঝি, তাই পরের ঋণ শুধতে এসেছে! তা তো নয় দেখছি। পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যাবসা। আমার গজমোতির খবর পেয়েছে। একটা সন্ন্যাসীকেও কোথা থেকে জুটিয়ে এনেছে দেখছি। সন্ন্যাসী হাত চেলে জায়গাটা বের করে দেবে।— উপনন্দ।

উপনন্দ। কী?

লক্ষেশ্বর। ওঠ্, ওঠ্ ঐ জায়গা থেকে! এখানে কী করতে এসেছিস?

উপনন্দ। অমন করে চোখ রাঙাও কেন? এ কি তোমার জায়গা নাকি?

লক্ষেশ্বর। এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কী হে বাপু? ভারি সেয়ানা দেখছি! তুমি বড়ো ভালোমানুষটি সেজে আমার কাছে এসেছিলে! আমি বলি সত্যিই বুঝি প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেছে— কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ। আমি তো সেইজন্যেই এখানে পুঁথি লিখতে এসেছি।

লক্ষেশ্বর। সেইজন্যেই এসেছ বটে! আমার বয়স কত আন্দাজ করছ বাপু! আমি কি শিশু!

সন্ন্যাসী। কেন বাবা, তুমি কী সন্দেহ করছ?

লক্ষেশ্বর। কী সন্দেহ করছি! তুমি তা কিছু জান না! বড়ো সাধু! ভণ্ড সন্ন্যাসী কোথাকার!

ঠাকুরদাদা। আরে, কী বলিস লখা, আমার ঠাকুরকে অপমান!

উপনন্দ। এই রঙবাটা নোড়া দিয়ে তোমার মুখ গুঁড়িয়ে দেব-না! টাকা হয়েছে বলে অহংকার! কাকে কী বলতে হয় জান না!

সন্ন্যাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের লুক্কায়ন

সন্ন্যাসী। আরে, কর কী ঠাকুরদাদা! কর কী বাবা! লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি মানুষ চেনে। যেমনি দেখেছে অমনি ধরা পড়ে গেছে! ভণ্ড সন্ন্যাসী যাকে বলে! বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মানুষ ভুলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না।

লক্ষেশ্বর। না, ঠিক ঠাওরাতে পারছি নে। হয়তো ভালো করি নি। আবার শাপ দেবে কি কী করবে! তিনখানা জাহাজ এখনো সমুদ্রে আছে। (পায়ের ধুলা লইয়া) প্রণাম হই ঠাকুর! হঠাৎ চিনতে পারি নি। বিরূপাক্ষের মন্দিরে আমাদের ঐ বিকটানন্দ বলে একটা সন্ন্যাসী আছে, আমি বলি সেই ভণ্ডটাই বুঝি— ঠাকুর্দা, তুমি এক কাজ করো। সন্ন্যাসীঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও ; আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেব। আমি চললেম বলে। তোমরা এগোও।

ঠাকুরদাদা। তোমার বড়ো দয়া! তোমার ঘরের এক মুঠো চাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিন্ধু পেরিয়ে এসেছেন!

সন্ন্যাসী। বল কী ঠাকুর্দা! এক মুঠো চাল যেখানে দুর্লভ সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বৈকি! বাবা লক্ষেশ্বর, চলো তোমার ঘরে।

লক্ষেশ্বর। আমি পরে যাচ্ছি, তোমরা এগোও। উপনন্দ, তুমি আগে ওঠো। ওঠো, শীঘ্র ওঠো বলছি, তোলো তোমার পুঁথিপত্র।

উপনন্দ। আচ্ছা, তবে উঠলেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না।

লক্ষেশ্বর। না থাকলেই যে বাঁচি বাবা! আমার সম্বন্ধে কাজ কী! এতদিন তো আমার বেশ চলে যাচ্ছিল।

উপনন্দ। আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলেম তোমার কাছে এই অপমান সহ্য করেই তার থেকে মুক্তি গ্রহণ করলেম। বাস, চুকে গেল। [প্রস্থান

লক্ষেশ্বর। ওরে! সব ঘোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে! রাজা আমার গজমোতির খবর পেলে নাকি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভালো! এখন কী করি! (সন্ন্যাসীকে ধরিয়া) ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানটিতে বোসো— এই-যে এইখানে— আর-একটু বাঁ দিকে সরে এসো— এই হয়েছে! খুব চেপে বোসো। রাজাই আসুক আর সম্রাটই আসুক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না। তা হলে আমি তোমাকে খুশি করে দেব।

ঠাকুরদাদা। আরে, লখা করে কী! হঠাৎ খেপে গেল নাকি!

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, আমি তবে একটু আড়ালে যাই। আমাকে দেখলেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে যায়। শত্রুরা লাগিয়েছে আমি সব টাকা পুঁতে রেখেছি—শুনে অবধি রাজা যে কত জায়গায় কূপ খুঁড়তে আরম্ভ করেছেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, প্রজাদের জলদান করছেন। কোন দিন আমার ভিটেবাড়ির ভিত কেটে জলদানের হুকুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘুমুতে পারি নে। [প্রস্থান

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত। সন্ন্যাসীঠাকুর, প্রণাম হই। আপনিই তো অপূর্বানন্দ?

সন্ন্যাসী। কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই তো জানে।

রাজদূত। আপনার অসামান্য ক্ষমতার কথা চার দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্ন্যাসী। যখনই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনই আমাকে দেখতে পাবেন।

রাজদূত। আপনি তা হলে যদি একবার—

সন্ন্যাসী। আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রুত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে বসে থাকব। অতএব আমার মতো অকিঞ্চন অকর্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তা হলে তাঁকে এইখানেই আসতে হবে।

রাজদূত। রাজোদ্যান অতি নিকটেই, ঐখানেই তিনি অপেক্ষা করছেন—

সন্ন্যাসী। যদি নিকটেই হয় তবে তো তাঁর আসতে কোনো কষ্ট হবে না।

রাজদূত। যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাই গে।

[প্রস্থান

ঠাকুরদাদা। প্রভু, এখানে রাজসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল— আমি তবে বিদায় হই।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, তুমি আমার শিশু-বন্ধুগুলিকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখো, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা। রাজার উৎপাতই ঘটুক আর অরাজকতাই হোক, আমি প্রভুর চরণ ছাড়ছি নে।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, তুমিই অপূর্বানন্দ! তবে তো বড়ো অপরাধ হয়ে গেছে। আমাকে মাপ করতে হবে।

সন্ন্যাসী। তুমি আমাকে ভণ্ড তপস্বী বলেছ এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর। বাবাঠাকুর, শুধু মাপ করতে তো সকলেই পারে, সে ফাঁকিতে আমার কী হবে! আমাকে একটা-কিছু ভালোরকম বর দিতে হচ্ছে। যখন দেখা পেয়েছি তখন শুধু-হাতে ফিরছি নে।

সন্ন্যাসী। কী বর চাই?

লক্ষেশ্বর। লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কিনা আমার অল্পস্বল্প কিছু জমেছে— সে অতি যৎসামান্য— তাতে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা তো মিটছে না। শরৎকাল এসেছে, আর ঘরে বসে থাকতে পারছি নে; এখন বাণিজ্যে বেরোতে হবে। কোথায় গেলে সুবিধা হতে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি বলে দিতে হবে; আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়।

সন্ন্যাসী। আমিও তো সেই সন্ধানেই আছি।

লক্ষেশ্বর। বল কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। আমি সত্যই বলছি।

লক্ষেশ্বর। ওঃ, তবে সেই কথাটাই বলো। বাবা, তোমরা আমাদের চেয়েও সেয়ানা।

সন্ন্যাসী। তার সন্দেহ আছে!

লক্ষেশ্বর। (কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে) সন্ধান কিছু পেয়েছ?

সন্ন্যাসী। কিছু পেয়েছি বৈকি। নইলে এমন করে ঘুরে বেড়াব কেন?

লক্ষেশ্বর। (সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া) বাবাঠাকুর, আর-একটু খোলসা করে বলো। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না। কী খুঁজব বলো তো, আমি কাউকে বলব না।

সন্ন্যাসী। তবে শোনো। লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর। ও বাবা, সে তো কম কথা নয়! তা হলে যে একেবারে সকল ল্যাঠাই চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ তো তুমি আচ্ছা বুদ্ধি ঠাওরেছ! কোনো গতিকে পদ্মটি যদি জোগাড় করে আন তা হলে লক্ষ্মীকে আর তোমার খুঁজতে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন! এ নইলে আমাদের চঞ্চলা ঠাকরুনটিকে তো জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দুখানিই বাঁধা থাকবে। তা, তুমি সন্ন্যাসীমানুষ, একলা পেরে উঠবে? এতে তো খরচপত্র আছে। এক কাজ করো-না বাবা, আমরা ভাগে ব্যাবসা করি।

সন্ন্যাসী। তা হলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বহুকাল সোনা ছুঁতেই পাবে না।

লক্ষেশ্বর। সে যে শক্ত কথা।

সন্ন্যাসী। সব ব্যাবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যাবসা চলবে।

লক্ষেশ্বর। শেষকালে দু কূল যাবে না তো? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তা হলে তোমার তলপি বয়ে তোমার পিছন পিছন চলতে রাজি আছি। সত্যি বলছি ঠাকুর, কারো কথায় বড়ো সহজে বিশ্বাস করি নে; কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগছে। আচ্ছা! আচ্ছা রাজি! তোমার চেলাই হব!— ঐ রে, রাজা আসছে! আমি তবে একটু আড়ালে দাঁড়াই গে।

বন্দীগণের গান

মিশ্র কানাড়া। ঝাঁপতাল

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে!
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে!

দুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজনদর্পহর দীপ্ত তরবারি,
সংকটশরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী—
মুক্ত-অবরোধ তব অভ্যুদয় হে !

রাজার প্রবেশ

রাজা। প্রণাম হই ঠাকুর !

সন্ন্যাসী। জয় হোক ! কী বাসনা তোমার ?

রাজা। সে কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভু !

সন্ন্যাসী। তা হলে গোড়া থেকে শুরু করো। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও।

রাজা। পরিহাস নয় ঠাকুর ! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।

সন্ন্যাসী। রাজন্, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

রাজা। বল কী ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী। এক বর্ণও মিথ্যা বলছি নে। তাকে বশ করবার জন্যেই আমি মন্ত্রসাধনা করছি।

রাজা। তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ ?

সন্ন্যাসী। তাই বটে।

রাজা। মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হবে ?

সন্ন্যাসী। অসম্ভব নয়।

রাজা। তা হলে ঠাকুর, আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব। যদি সে বশ মানে তা হলে আমার কাছে যদি—

সন্ন্যাসী। তা বেশ, সেই চক্রবর্তী-সম্রাটকে আমি তোমার সভায় ধরে আনব।

রাজা। কিন্তু, বিলম্ব করতে ইচ্ছা করছে না। শরৎকাল এসেছে— সকালবেলা উঠে বেতসিনীর জলের উপর যখন আশ্বিনের রৌদ্র পড়ে তখন আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্বাদ কর তা হলে—

সন্ন্যাসী। কোনো প্রয়োজন নেই ; শরৎকালেই আমি তাকে তোমার কাছে সমর্পণ করব, এই তো উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কী করবে ?

রাজা। আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেব— তার অহংকার দূর করতে হবে।

সন্ন্যাসী। এ তো খুব ভালো কথা। যদি তার অহংকার চূর্ণ করতে পার তা হলে ভারি খুশি হব।

রাজা। ঠাকুর, চলো আমার রাজভবনে।

সন্ন্যাসী। সেটি পারছি নে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা ! আমার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না। তোমার মনের বাসনা যে আমাকে ব্যক্ত করে বলেছ এতে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। বিজয়াদিত্যের যে এত শত্রু জমে উঠেছে তা তো আমি জানতেম না।

রাজা। তবে বিদায় হই। প্রণাম !

[প্রস্থান

(পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া) আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো বিজয়াদিত্যকে জান, সত্য করে বলো দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য ?

সন্ন্যাসী। কিছুমাত্র না। লোকে তাকে একটা মস্ত রাজা বলে মনে করে— কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মতো। তার সাজসজ্জা দেখেই লোকে ভুলে গেছে।

রাজা। বল কী ঠাকুর, হা হা হা হা ! আমিও তাই ঠাউরেছিলেম। অ্যাঁ ! নিতান্তই সাধারণ মানুষ !

সন্ন্যাসী। আমার ইচ্ছে আছে আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেব। সে যে রাজার

পোশাক প'রে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা-কিছু বলে মনে করে আমি তার সেই ভুলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেব।

রাজা। তাই দিয়ো ঠাকুর, তাই দিয়ো।

সন্ন্যাসী। তার ভণ্ডামি আমার কাছে তো কিছু ঢাকা নেই। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টি হলে পর বীজ বোনবার আগে তার রাজ্যে একটা মহোৎসব হয়। সেদিন সব চাষি গৃহস্থেরা বনে গিয়ে সীতার পূজা ক'রে সকলে মিলে বনভোজন করে। সেই চাষাদের সঙ্গে একসঙ্গে পাত পেড়ে খাবার জন্যে বিজয়াদিত্যের প্রাণটা কাঁদে। রাজাই হোক আর যাই হোক, ভিতরে যে চাষাটা আছে সেটা যাবে কোথায়? সেবারে তো সে রাজবেশ ছেড়ে ওদের সঙ্গে বসে যাবার জন্যে খেপে উঠেছিল। কিন্তু ওর মন্ত্রী আর চাকর-বাকরদের মনে রাজাগিরির উচ্চ ভাব ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তারা হাতে পায়ে ধরে বললে, এ কখনোই হতে পারে না। অর্থাৎ, তাদের এই ভয়টা আছে যে, ঐ ছদ্মবেশটা খুলে ফেললেই আসল মানুটা ধরা পড়ে যাবে। এইজন্যে বিজয়াদিত্যকে নিয়ে তারা বড়ো ভয়ে ভয়েই থাকে— কোন্‌দিন তার সমস্ত ফাঁস হয়ে যায় এই এক বিষম ভাবনা।

রাজা। ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে দাও। ও যে মিথ্যে রাজা, ভুয়ো রাজা, সে যেন আর ছাপা না থাকে। ওর বড়ো অহংকার হয়েছে।

সন্ন্যাসী। আমি তো সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আমি সহজে ছাড়ব না।

রাজা। প্রণাম।

[প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর, আমার মনের ভার তো গেল না।

সন্ন্যাসী। কী হল বাবা?

উপনন্দ। মনে করেছিলেম, লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেছে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠল— অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল সে আমি বলতে পারি নে। সেই বীণার কাছে লুটিয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! ঠাকুর, এ তো আমার কোনোমতেই সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছা করছে, আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু-একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে, তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খুব আনন্দ হবে— মনে হবে, আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল।

সন্ন্যাসী। বাবা, তুমি যা বলছ সত্যই বলছ।

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছ, আমার মতো অকর্মণ্যকেও হাজার কার্ষাপণ দিয়ে কিনতে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন? তা হলেই ঋণটা শোধ হয়ে যায়। এ নগরে যদি চেষ্টা করি তা হলে বালক বলে, ছোটো জাত বলে, সকলে আমাকে খুব কম দাম দেবে।

সন্ন্যাসী। না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ বুঝবে না। আমি ভাবছি কী, যিনি তোমার প্রভুকে অত্যন্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য বলে রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয়।

উপনন্দ। বিজয়াদিত্য? তিনি যে আমাদের সম্রাট!

সন্ন্যাসী। তাই নাকি?

উপনন্দ। তুমি জান না বুঝি?

সন্ন্যাসী। তা, হবে। নাহয় তাই হল।

উপনন্দ। আমার মতো ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিনবেন?

সন্ন্যাসী। বাবা, বিনামূল্যে কেনবার মতো ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তা হলে বিনা মূল্যেই কিনবেন। কিন্তু তোমার ঋণটুকু শোধ করে না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জমবে যে তাঁর রাজভাণ্ডার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যই বলছি।

উপনন্দ। ঠাকুর, এও কি সম্ভব?

সন্ন্যাসী। বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব? তার চেয়ে বড়ো সম্ভাবনা কি আর-কিছুই নেই?

উপনন্দ। আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু আমি ততদিন পুঁথিগুলি নকল করে কিছু কিছু শোধ করতে থাকি; নইলে আমার মনে বড়ো গ্লানি হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। ঠিক কথা বলেছ বাবা। বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারও প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ো না।

উপনন্দ। তা হলে চললেম ঠাকুর। তোমার কথা শুনে আমি মনে কত যে বল পেয়েছি সে আমি বলে উঠতে পারি নে।

সন্ন্যাসী। তোমাকে দেখে আমিও যে কত বললাভ করেছি সে কথা কেমন করে বুঝবে? এক কাজ করো বাবা, আমার খেলার দলটি ভেঙে গিয়েছে, আবার তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে এসো গে।

উপনন্দ। তা আনছি। কিন্তু ঠাকুর, তোমার দলটিকে আমার পুঁথি নকল করার কাজে লাগালে চলবে না। তারা আমার সব নষ্ট করে দেয়; এত খুশি হয়ে করে যে বারণ করতেও পারি নে।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলেম— পারব না। তোমার চেলা হওয়া আমার কর্ম নয়। যা পেয়েছি তা অনেক দুঃখে পেয়েছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শেষকালে হায় হায় করে মরব! আমার বেশি আশায় কাজ নেই।

সন্ন্যাসী। সে কথাটা বুঝলেই হল।

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, এবার একটুখানি উঠতে হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া) তা হলে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল!

লক্ষেশ্বর। (মাটি ও শুষ্কপত্র সরাইয়া কৌটা বাহির করিয়া) ঠাকুর, এইটুকুর জন্যে আজ সকাল থেকে সমস্ত হিসাব-কিতাব ফেলে রেখে এই জায়গাটার চার দিকে ভূতের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। এই যে গজমোতি, এ আমি তোমাকেই আজ প্রথম দেখালেম; আজ পর্যন্ত কেবলই এটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি; তোমাকে দেখাতে পেরে মনটা তবু একটু হালকা হল। (সন্ন্যাসীর হাতের কাছে অগ্রসর করিয়াই, তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া)— না, হল না! তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তবু এ জিনিস একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই যে আলোতে এটাকে তুলে ধরেছি, আমার বুকের ভিতর যেন গুর্‌গুর্‌ করছে। আচ্ছা ঠাকুর, বিজয়াদিত্য কেমন লোক বলো তো। তাকে বিক্রি করতে গেলে সে তো দাম না দিয়ে এটা আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবে না? আমার ঐ এক মুশকিল হয়েছে। আমি এটা বেচতেও পারছি নে, রাখতেও পারছি নে, এর জন্যে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। বিজয়াদিত্যকে তুমি বিশ্বাস কর?

সন্ন্যাসী। সব সময়েই কি তাকে বিশ্বাস করা যায়?

লক্ষেশ্বর। সেই তো মুশকিলের কথা। আমি দেখছি এটা মাটিতেই পোঁতা থাকবে। হঠাৎ কোন্‌দিন মরে যাব, কেউ সন্ধানও পাবে না।

সন্ন্যাসী। রাজাও না, সম্রাটও না, ঐ মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে। তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে।

লক্ষেশ্বর। তা নিক গে! কিন্তু, আমার কেবলই ভাবনা হয়, আমি মরে গেলে পর কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয়তো খুঁড়তে খুঁড়তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হোক ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ঐ সোনার পদ্মর কথাটা আমার কাছে বড়ো ভালো লাগল। আমার কেমন মনে হচ্ছে, ওটা তুমি হয়তো খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু তা হোক গে, আমি তোমার চেলা হতে পারব না। প্রণাম।

[প্রস্থান

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, আজ অনেক দিন পরে একটি কথা খুব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি— সেটি তোমাকে খুলে না বলে থাকতে পারছি নে।

ঠাকুরদাদা। আমার প্রতি ঠাকুরের বড়ো দয়া।

সন্ন্যাসী। আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন। কিছুই ভেবে পাই নি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে। সেইজন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ! কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য!

ঠাকুরদাদা। এক দিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন, আর-এক দিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চলছে। সেই দুঃখের আনন্দ এবং সৌন্দর্য যে কী সে কথা তোমার কাছে পূর্বেই শুনেছি। প্রভু, কেবল এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অব্যবস্থা।

ঠাকুরদাদা। সেইখানেই যে এক পক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।

সন্ন্যাসী। লক্ষ্মী যখন মানবের মর্তলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনীবেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন; শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে, সে খবরটি আজ ঐ উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। তোমরা চুপি চুপি দুটিতে কী পরামর্শ করছ?

সন্ন্যাসী। আমাদের সেই সোনার পদ্মের পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর। অ্যাঁ! এরই মধ্যে ঠাকুর্দার কাছে সমস্ত ফাঁস করে বসে আছ? বাবা, তুমি এই ব্যাবসাবুদ্ধি নিয়ে সোনার পদ্মর আমদানি করবে? তবেই হয়েছে! তুমি যেই মনে করলে আমি রাজি হলেম না অমনি তাড়াতাড়ি অন্য অংশীদার খুঁজতে লেগে গেছ! কিন্তু, এ-সব কি ঠাকুর্দার কর্ম? ওঁর পুঁজিই বা কী?

সন্ন্যাসী। তুমি খবর পাও নি। কিন্তু, একেবারে পুঁজি নেই তা নয়। ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। (ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইয়া) সত্যি নাকি ঠাকুর্দা? বড়ো তো ফাঁকি দিয়ে আসছ। তোমাকে তো চিনতেম না। লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে তো স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না— তা হলে এত দিনে খানাতল্লাশি পড়ে যেত। আমি তো, দাদা, গুপ্তচরের ভয়ে ঘরে চাকর-বাকর রাখি নে।

ঠাকুরদাদা। তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় উর্ধ্বস্বরে চোবে-তেওয়ারি-গির্‌ধারিলালকে হাঁক পাড়ছিলে?

লক্ষেশ্বর। যখন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আসবে না, তখন উর্ধ্বস্বরের জোরেই আসর গরম করে তুলতে হয়। কিন্তু, বলে তো ভালো করলেম না। মানুষের সঙ্গে কথা কবার তো বিপদই ঐ। সেইজন্যেই কারও কাছে ঘেঁষি নে। দেখো দাদা, ফাঁস করে দিয়ো না।

ঠাকুরদাদা। ভয় নেই তোমার।

লক্ষেশ্বর। ভয় না থাকলেও তবু ভয় ঘোচে কই? যা হোক ঠাকুর, একা ঠাকুর্দাকে নিয়ে অতবড়ো কাজটা চলবে না। আমরা নাহয় তিন জনেই অংশীদার হব। ঠাকুর্দা আমাকে ফাঁকি দিয়ে জিতে নেবে সেটি হচ্ছে না। আচ্ছা ঠাকুর, তবে আমিও তোমার চেলা হতে রাজি হলেম।— ঐ-যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসছে। ঐ দেখছ না দূরে? আকাশে যে ধুলো উড়িয়ে দিয়েছে! সবাই খবর পেয়েছে স্বামী অপূর্বানন্দ এসেছেন। এবার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁটু পর্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হোক, তুমি যেরকম আলগা মানুষ দেখছি, সেই কথাটা আর কারও কাছে ফাঁস কোরো না— অংশীদার আর বাড়িয়ো না। কিন্তু ঠাকুর্দা, লাভ-লোকসানের ঝুঁকি তোমাকেও নিতে হবে; অংশীদার হলেই হয় না; সব কথা ভেবে দেখো।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, আর তো দেরি করলে চলবে না। লোকজন জুটতে আরম্ভ করেছে, 'পুত্র দাও' 'ধন দাও' করে আমাকে একেবারে মাটি করে দেবে। ছেলেগুলিকে এইবেলা ডাকো। তারা ধন চায় না, পুত্র চায় না, তাদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলেই পুত্রধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা। ছেলেদের আর ডাকতে হবে না। ঐ-যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এল বলে।

লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর। না বাবা, আমি পারব না। ভালো বুঝতে পারছি নে। ও-সব আমার কাজ নেই— আমার যা আছে সেই ভালো। কিন্তু, তুমি আমাকে কী যেন মন্ত্র করেছ! তোমার কাছ থেকে না পালালে আমার তো রক্ষে নেই। তুমি ঠাকুর্দাকে নিয়েই কারবার করো, আমি চললেম।

[দ্রুত প্রস্থান

ছেলেদের প্রবেশ

ছেলেরা। সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসীঠাকুর!

সন্ন্যাসী। কী বাবা!

ছেলেরা। তুমি আমাদের নিয়ে খেলো।

সন্ন্যাসী। সে কি হয় বাবা? আমার কি সে ক্ষমতা আছে? তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও।

ছেলেরা। কী খেলা খেলবে?

সন্ন্যাসী। আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

প্রথম বালক। সে বেশ হবে।

দ্বিতীয় বালক। সে বেশ মজা হবে।

তৃতীয় বালক। সে কী খেলা ঠাকুর?

চতুর্থ বালক। সে কেমন করে খেলতে হয়?

সন্ন্যাসী। তবে এক কাজ করো। ঐ কাশবন থেকে কাশ তুলে নিয়ে এসো। আঁচল ভরে ধানের মঞ্জরী আনতে হবে। আর তোমরা আজ শিউলিফুলের মালা গেঁথে ঐখানে ফেলে রেখে গেছ, সেগুলো নিয়ে এসো।

প্রথম বালক। কী করতে হবে ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। আমাকে তোমরা সাজিয়ে দেবে— আমি হব শারদোৎসবের পুরোহিত।

সকলে। (হাততালি দিয়া) হাঁ, হাঁ, হাঁ! সে বড়ো মজাই হবে।

কাশগুচ্ছ প্রভৃতি আনিয়া ছেলেরা সকলে মিলিয়া সন্ন্যাসীকে সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল

একদল লোকের প্রবেশ

প্রথম ব্যক্তি। ওরে ছোঁড়াগুলো, সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কই বাবা, সন্ন্যাসী কই?

বালকগণ। এই-যে আমাদের সন্ন্যাসী।

প্রথম ব্যক্তি। ও তো তোদের খেলার সন্ন্যাসী! সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন?

সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কি সহজে মেলে? আমি এই ছেলেদের সঙ্গে মিলে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী খেলছি।

প্রথম ব্যক্তি। ও তোমার কী রকম খেলা গা!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ওতে যে অপরাধ হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি। ফেলো ফেলো, তোমার জটা ফেলো।

চতুর্থ ব্যক্তি। দেখো-না, আবার গেরুয়া পরেছে!

সন্ন্যাসী। জটাও ফেলব, গেরুয়াও ছাড়ব, সবই হবে, খেলাটা সম্পূর্ণ হয়ে যাক।

প্রথম ব্যক্তি। তবে যে আমাদের কে একজন বললে কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেছে!

সন্ন্যাসী। যদি বা এসে থাকে তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কেন? সে ভণ্ড নাকি?

সন্ন্যাসী। তা নয় তো কী?

তৃতীয় ব্যক্তি। বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভালো। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু শিখেছ?

সন্ন্যাসী। শেখবার ইচ্ছা তো আছে, কিন্তু শেখায় কে?

তৃতীয় ব্যক্তি। একটি লোক আছে বাবা— সে থাকে ভৈরবপুরে, লোকটা বেতালসিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তার বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কী, সেই ছেলেটার প্রাণপুরুষকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান করে দিলে। বললে বিশ্বাস করবে না— ছেলেটা মোল বটে, কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্যি বেঁচে আছে। না, হাসছ কী? আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেছে। সেই নেকড়েটাকে মারতে গেলে বাপ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তাকে দু বেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফতুর হয়ে গেল। বিদ্যে যদি শিখতে চাও তো সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাও।

প্রথম ব্যক্তি। ওরে চল্ রে, বেলা হয়ে গেল। সন্ন্যাসী-ফন্ন্যাসী সব মিথ্যে। সে কথা আমি তো তখনই বলেছিলেম। আজকালকার দিনে কি আর সেরকম যোগবল আছে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে তো সত্যি। কিন্তু আমাকে যে কালুর মা বললে, তার ভাগনে নিজের চক্ষে দেখে এসেছে, সন্ন্যাসী এক টান গাঁজা টেনে কলকেটা যেমনি উপুড় করলে অমনি তার মধ্যে থেকে এক ভাঁড় মদ আর একটা আস্ত মড়ার মাথার খুলি বেরিয়ে পড়ল!

তৃতীয় ব্যক্তি। বল কী, নিজের চক্ষে দেখেছে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। হাঁ রে, নিজের চক্ষে বৈকি।

তৃতীয় ব্যক্তি। আছে রে আছে, সিদ্ধপুরুষ আছে। ভাগ্যে যদি থাকে, তবে তো দর্শন পাব। তা, চল্-না ভাই, কোন্ দিকে গেল একবার দেখে আসি গে।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী। (বালকদের প্রতি) বাবা, আজ যে তোমাদের সব সোনার রঙের কাপড় পরতে হবে।

ছেলেরা। সোনার রঙের কাপড় কেন ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েছে। তারই সঙ্গে আমাদেরও আজ অন্তরে বাইরে

মিলে যেতে হবে তো, নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারব কী করে ? আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিলব বলেই তো উৎসব।

ছেলেরা। সোনার রঙের কাপড় কোথায় পাব ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী। ঐ বেতসিনীর ধার দিয়ে যাও। যেখানে বটতলায় পোড়ো মন্দিরটা আছে সেই মন্দিরটায় সমস্ত সাজানো আছে। ঠাকুর্দা, তুমি এদের সাজিয়ে আনো গে।

ঠাকুরদাদা। তবে চলো সবাই। [প্রস্থান

সন্ন্যাসী। গান

রামকেলি। কাওয়ালি

নবকুন্দধবলদল-সুশীতলা
অতিসুনির্মলা সুখসমুজ্জ্বলা
শুভ-সুবর্ণ-আসনে-অচঞ্চলা !
স্মিত-উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী
পূর্ণসিতাংশু-বিভাস-বিকাশিনী
নন্দনলক্ষ্মী সুমঙ্গলা !

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। দেখো ঠাকুর, তোমার মন্তর যদি ফিরিয়ে না নাও তো ভালো হবে না বলছি ! কী মুশকিলেই ফেলেছ ! আমার হিসেবের খাতা মাটি হয়ে গেল ! একবার মনটা বলে যাই সোনার পদ্মর খোঁজে, আবার বলি থাক্ গে ও-সব বাজে কথা ! একবার মনে ভাবি এবার বুঝি তবে ঠাকুর্দাই জিতলে-বা, আবার ভাবি মরুক গে ঠাকুর্দা ! কিন্তু, এ তো ভালো কথা নয় ! চেলা-ধরা ব্যাবসা দেখছি তোমার। কিন্তু, সে হবে না, কোনোমতেই হবে না ! চুপ করে হাসছ কী ? আমি বলছি আমাকে পারবে না— আমার শক্ত হাড় ! লক্ষেশ্বর কোনোদিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড়বে না। [প্রস্থান

ফুল লইয়া ছেলেদের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এ যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি ! সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র ! বাবা, এইবার সব দাঁড়াও। একবার পূর্ব আকাশে দাঁড়িয়ে বেদমন্ত্র পড়ে নিই।

বেদমন্ত্র

অক্ষি দুঃখোত্থিতস্যৈব সুপ্রসন্নে কনীনিকে।
আংক্তে চাদ্‌গণং নাস্তি ঋভূনাং তন্নিবোধত।
কনকাভানি বাসাংসি অহতানি নিবোধত।
অন্নমশ্নীত মৃজ্মীত অহং বো জীবনপ্রদঃ।
এতা বাচঃ প্রযুজ্যন্তে শরদ্‌যত্রোপদৃশ্যতে।

এবারে সকলে মিলে তোমাদের শারদোৎসবের আবাহন-গানটি গাইতে গাইতে বনপথ প্রদক্ষিণ করে এসো। ঠাকুর্দা, তুমি গানটি ধরিয়ে দাও। তোমাদের উৎসবের গানে বনলক্ষ্মীদের জাগিয়ে দিতে হবে।

গান

মিশ্র রামকেলি। একতালা

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালিমালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরিপর্বতে।
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল-শিশির-ঢালা।
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝংকারে,
হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলককোণে।
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে—
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা।

সন্ন্যাসী। পৌঁচেছে, তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে! দ্বার খুলেছে তাঁর! দেখতে পাচ্ছ কি শারদা বেরিয়েছেন? দেখতে পাচ্ছ না? দূরে, দূরে, সে অনেক দূরে, বহু বহু দূরে! সেখানে চোখ যে যায় না! সেই জগতের সকল আরম্ভের প্রান্তে, সেই উদয়াচলে প্রথমতম শিখরটির কাছে! যেখানে প্রতিদিন উষার প্রথম পদক্ষেপটি পড়লেও তবু তাঁর আলো চোখে এসে পৌঁছয় না, অথচ ভোরের অন্ধকারের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে— সেই অনেক অনেক দূরে! সেইখানে হৃদয়টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকো, ধীরে ধীরে একটু একটু করে দেখতে পাবে। আমি ততক্ষণ আগমনীর গানটি গাইতে থাকি।

গান

ভৈরবী। একতালা

লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া।

দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া!
পিছনে ঝরিছে ঝরো ঝরো জল,
গুরু গুরু দেয়া ডাকে—
মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন—
ভেবে মরে মোর মন
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র,
কী মন্ত্র হবে গাওয়া!

এবারে আর দেখতে পাই নি বলবার জো নেই।

প্রথম বালক। কই ঠাকুর, দেখিয়ে দাও-না।

সন্ন্যাসী। ঐ-যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ, ভেসে আসছে।

তৃতীয় বালক। হাঁ, আমিও দেখেছি।

সন্ন্যাসী। ঐ-যে আকাশ ভরে গেল!

প্রথম বালক। কিসে?

সন্ন্যাসী। কিসে! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে! বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না?

দ্বিতীয় বালক। হাঁ, পাচ্ছি।

সন্ন্যাসী। তবে আর-কি! চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে! এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন! দেখছ না বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর, ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে! গাও গাও, ঠাকুর্দা, বরণের গানটা গাও!

ঠাকুরদাদা। গান

আলেয়া। একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!

সন্ন্যাসী। যাও বাবা, তোমরা সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে এসো গে।

[ছেলেদের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

ঠাকুরদাদা। প্রভু, আমি যে একেবারে ডুবে গিয়েছি। ডুবে গিয়ে তোমার এই পায়ের তলাটিতে এসে ঠেকেছি। এখান থেকে আর নড়তে পারব না।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। এ কী হল! লখা গেরুয়া ধরেছে যে!

লক্ষেশ্বর। সন্ন্যাসীঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার

গজমোতির কৌটো ; এই আমার মণিমাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো।

সন্ন্যাসী। তোমার এমন মতি কেন হল লক্ষেশ্বর ?

লক্ষেশ্বর। সহজে হয় নি প্রভু ! সম্রাট বিজয়াদিত্যের সৈন্য আসছে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছু থাকবে ? তোমার গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারবে না, এ-সমস্ত তোমার কাছেই রাখলেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা কোরো বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

রাজার প্রবেশ

রাজা। সন্ন্যাসীঠাকুর !

সন্ন্যাসী। বোসো বোসো, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েছ ! একটু বিশ্রাম করো।

রাজা। বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েছে— তাঁর সৈন্যদল আসছে।

সন্ন্যাসী। বল কী ! বোধ হয় শরৎকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টিকতে দেয় নি, তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন।

রাজা। কী সর্বনাশ ! রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন !

সন্ন্যাসী। বাবা, এতে দুঃখিত হলে চলবে কেন ? তুমিও তো রাজ্যবিস্তার করবার জন্যে বেরোবার উদ্‌যোগে ছিলে।

রাজা। না, সে হল স্বতন্ত্র কথা। তাই বলে আমার এই রাজ্যটুকুতে— তা, সে যাই হোক, আমি তোমার শরণাগত ! এই বিপদ হতে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোনো দুষ্টলোক তাঁর কাছে লাগিয়েছে যে আমি তাঁকে লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা করেছি ! তুমি তাঁকে বোলো সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা ! আমি কি এমনি উন্মত্ত ! আমার রাজচক্রবর্তী হবার দরকার কী ! আমার শক্তিই বা এমন কী আছে !

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা !

ঠাকুরদাদা। কী প্রভু ?

সন্ন্যাসী। দেখো, আমি কৌপীন প'রে এবং গুটিকতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলেম, আর ঐ চক্রবর্তী-সম্রাটটা তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উৎসব কেবল নষ্টই করতে পারে ! লোকটা কিরকম দুর্ভাগা দেখেছ !

রাজা। চুপ করো, চুপ করো ঠাকুর ! কে আবার কোন্ দিক থেকে শুনতে পাবে !

সন্ন্যাসী। ঐ বিজয়াদিত্যের 'পরে আমার—

রাজা। আরে চুপ, চুপ ! তুমি সর্বনাশ করবে দেখছি ! তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক্ সে তুমি মনেই রেখে দাও।

সন্ন্যাসী। তোমার সঙ্গে পূর্বেও তো সে বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়ে গেছে।

রাজা। কী মুশকিলেই পড়লেম ! সে-সব কথা কেন ঠাকুর ! সে এখন থাক্-না— ওহে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে বসে বসে কী শুনছ ! এখান থেকে যাও-না।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কী আছে ? একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেছে। যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সামনে আমি যে ইচ্ছাসুখে বসে থাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ

মন্ত্রী। জয় হোক মহারাজাধিরাজচক্রবর্তী বিজয়াদিত্য !

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

রাজা। আরে করেন কী ! করেন কী ! আমাকে পরিহাস করছেন নাকি ? আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী। মহারাজ, সময় তো অতীত হয়েছে, এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলুন।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, পূর্বেই তো বলেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েছি, কিন্তু গুরুমশায় পিছন পিছন তাড়া করেছেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু, এ কী কাণ্ড! আমি তো স্বপ্ন দেখছি নে!

সন্ন্যাসী। স্বপ্ন তুমিই দেখছ কী এঁরাই দেখছেন তা নিশ্চয় করে কে বলবে?

ঠাকুরদাদা। তবে কি—

সন্ন্যাসী। হাঁ, এঁরা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য বলেই তো জানেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু, আমিই তো তবে জিতেছি। এই কয় দণ্ডে আমি তোমার যে পরিচয়টি পেয়েছি তা এঁরা পর্যন্ত পান নি। কিন্তু বড়ো সংকটে ফেললে তো ঠাকুর!

লক্ষেশ্বর। আমিও বড়ো সংকটে পড়েছি মহারাজ! আমি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সন্ন্যাসীর হাতে ধরা দিয়েছি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পাচ্ছি নে।

রাজা। মহারাজ, দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন?

সন্ন্যাসী। না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম।

রাজা। (জোড়হস্তে) এই অপরাধীর প্রতি মহারাজের কী বিধান?

সন্ন্যাসী। বিশেষ কিছুই না। তোমার কাছে যে কয়টা বিষয়ে প্রতিশ্রুত আছি সে আমি সেরে দিয়ে যাব।

রাজা। আমার কাছে আবার প্রতিশ্রুত!

সন্ন্যাসী। তার মধ্যে একটা তো উদ্ধার করেছি। বিজয়াদিত্য যে তোমাদের সকলের সমান, সে যে নিতান্ত সাধারণ মানুষ, সেটা তো ফাঁস হয়েই গেছে। নিজের এই পরিচয়টুকু পাবার জন্যেই রাজতক্ত ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজে সকল লোকের মাঝখানে নেবে এসেছিলেম। এখন তোমার একটা-কিছু কাজ করে দিয়ে যাব এই প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করতে হবে। বিজয়াদিত্যকে তোমার সভায় আজই হাজির করে দেব— তাকে দিয়ে তোমার কোন্ কাজ করাতে চাও বলো।

রাজা। (নতশিরে) তাঁকে দিয়ে আমার অপরাধ মার্জনা করাতে চাই।

সন্ন্যাসী। তা, বেশ কথা। আমাকে যদি সম্রাট বলে মান তবে আমার সম্বন্ধে তোমার যা-কিছু অপরাধ সে রাজকার্যের ত্রুটি। সে-রকম যদি কিছু ঘটে থাকে তবে আমি কয়েকদিন তোমার রাজ্যে থেকে সে-সমস্তই স্বহস্তে মার্জনা করে দিয়ে যাব।

রাজা। মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ এমন হার আনন্দে হেরেছি, কোনো যুদ্ধে এমনটি ঘটতে পারত না। আমি যে আপনার অধীন এই গৌরবই আমার সকল যুদ্ধজয়ের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। কী করলে আমি রাজত্ব করবার উপযুক্ত হব সেই উপদেশটি চাই।

সন্ন্যাসী। উপদেশটি কথায় ছোটো, কাজে অত্যন্ত বড়ো। রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।

রাজা। উপদেশটি মনে রাখব, পেরে উঠব বলে ভরসা হয় না।

লক্ষেশ্বর। আমাকেও ঠাকুর— না না, মহারাজ, ঐ-রকম একটা কী উপদেশ দিয়েছিলেন, সে আমি পেরে উঠলেম না, বোধ করি মনে রাখতেও পারব না।

সন্ন্যাসী। উপদেশে বোধ করি তোমার বিশেষ প্রয়োজন নেই।

লক্ষেশ্বর। আজ্ঞা না।

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর! একি, রাজা যে! এরা সব কারা!

পলায়নোদ্যম

সন্ন্যাসী। এসো, এসো বাবা, এসো, কী বলছিলে বলো। (উপনন্দ নিরুত্তর) এঁদের সামনে বলতে লজ্জা করছ ? আচ্ছা, তবে সোমপাল, একটু অবসর নাও। তোমরাও—

উপনন্দ। সে কী কথা ! ইনি যে আমাদের রাজা, এঁর কাছে আমাকে অপরাধী কোরো না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলেম, এই কদিন পুঁথি লিখে আজ তার পারিশ্রমিক তিন কাহন পেয়েছি। এই দেখো।

সন্ন্যাসী। আমার হাতে দাও বাবা ! তুমি ভাবছ এই তোমার বহুমূল্য তিন কার্ষাপণ আমি লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্য দেব ? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেছি, এ আমার তারই দক্ষিণা। কী বল বাবা ?

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি নেবে !

সন্ন্যাসী। নেব বৈকি। তুমি ভাবছ সন্ন্যাসী হয়েছি বলেই আমার কিছুতে লোভ নেই ? এ-সব জিনিসে আমার ভারি লোভ।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ ! তবেই হয়েছে ! ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করে বসে আছি দেখছি !

সন্ন্যাসী। ওগো শ্রেষ্ঠী !

শ্রেষ্ঠী। আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী। এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুণে দাও।

শ্রেষ্ঠী। যে আদেশ।

উপনন্দ। তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন ?

সন্ন্যাসী। উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কী ! তুমি আমার।

উপনন্দ। (পা জড়াইয়া ধরিয়া) আমি কোন্ পুণ্য করেছিলেম যে আমার এমন ভাগ্য হল !

সন্ন্যাসী। ওগো সুভূতি !

মন্ত্রী। আজ্ঞা !

সন্ন্যাসী। আমার পুত্র নেই বলে তোমরা সর্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সন্ন্যাসধর্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ করেছি।

লক্ষেশ্বর। হায় হায়, আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে বলে কী সুযোগটাই পেরিয়ে গেল !

মন্ত্রী। বড়ো আনন্দ ! তা, ইনি কোন রাজগৃহে—

সন্ন্যাসী। ইনি যে গৃহে জন্মেছেন সে গৃহে জগতের অনেক বড়ো বড়ো বীর জন্মগ্রহণ করেছেন— পুরাণ-ইতিহাস খুঁজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেব। লক্ষেশ্বর !

লক্ষেশ্বর। কী আদেশ ?

সন্ন্যাসী। বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেছি ; এই তোমাকে ফিরে দিলেম।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তা হলেই যথার্থ রক্ষা করতেন, এখন রক্ষা করে কে !

সন্ন্যাসী। এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন, তোমার ভয় নেই। কিন্তু, তোমার কাছে আমার কিছু প্রাপ্য আছে।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ করলে !

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা সাক্ষী আছেন।

লক্ষেশ্বর। এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সন্ন্যাসী। আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুষ্টি কি ভরাতে পারবে ?

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর মুষ্টি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।

সন্ন্যাসী। তবে তোমার ভয় নেই, যাও।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী। এখনো দেরি আছে।

লক্ষেশ্বর। তবে প্রণাম হই। চার দিকে সকলেই কৌটোটার দিকে বড্ড তাকাচ্ছে।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী। রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

রাজা। সে কী কথা! সমস্তই মহারাজের, যে আদেশ করবেন—

সন্ন্যাসী। তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।

রাজা। যাকে ইচ্ছা নাম করুন, সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। নাহয় আমি নিজেই যাব।

সন্ন্যাসী। বশি দূরে পাঠাতে হবে না। (ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া) তোমার এই প্রজাটিকে চাই।

রাজা। কেবলমাত্র এঁকে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর স্মৃতিভূষণ আছেন তাঁকে আপনার সভায় নিয়ে যেতে পারেন।

সন্ন্যাসী। না, অত বড়ো লোককে নিয়ে আমার সুবিধা হবে না, আমি এঁকেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিস আছে, কেবল বয়স্য নেই।

ঠাকুরদাদা। বয়সে মিলবে না প্রভু, গুণেও না। তবে কিনা, ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভরিয়ে তুলতে পারব এই ভরসা আছে।

সন্ন্যাসী। ঠার্কুদা, সময় খারাপ হলে বন্ধুরা পালায়, তাই তো দেখছি! আমার উৎসবের বন্ধুরা এখন সব কোথায়? রাজদ্বারের গন্ধ পেয়েই দৌড় দিয়েছে নাকি?

ঠাকুরদাদা। কারও পালাবার পথ কি রেখেছ? আটঘাট ঘিরে ফেলেছ যে! ঐ আসছে।

বালকগণের প্রবেশ

সকলে। সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসীঠাকুর!

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এসো বাবা, সব এসো।

সকলে। এ কী! এ যে রাজা! আরে, পালা, পালা!

পলায়নোদ্যম

ঠাকুরদাদা। আরে, পালাস নে, পালাস নে।

সন্ন্যাসী। তোমরা পালাবে কী, উনিই পালাচ্ছেন। যাও সোমপাল, সভা প্রস্তুত করো গে, আমি যাচ্ছি।

রাজা। যে আদেশ।

[প্রস্থান

বালকেরা। আমরা বনে পথে সব জায়গায় গেয়ে গেয়ে এসেছি, এইবার এখানে গান শেষ করি।

ঠাকুরদাদা। হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে করে গান গা।

সকলের গান

আলেয়া। একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!
শিউলিতলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে!
আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,

ফুলগুলি ওই মুখে চেয়ে
    কী কথা কয় মনে মনে !
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ—
ওইটুকু ওই মেঘাবরণ
    দু হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে !
    নয়ন-ভুলানো এলে !
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
        শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি
আকাশবীণার তারে তারে
        জাগে তোমার আগমনী !
কোথায় সোনার নূপুর বাজে—
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে
সকল ভাবে সকল কাজে
        পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে !
        নয়ন-ভুলানো এলে !

৭ ভাদ্র ১৩১৫

মুকুট

বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা
অভিনীত হইবার উদ্দেশে 'বালক'
পত্রে প্রকাশিত 'মুকুট'-নামক
ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে
নাট্যীকৃত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

অমরমাণিক্য	মহারাজ
চন্দ্রমাণিক্য	যুবরাজ
ইন্দ্রকুমার	মধ্যম রাজকুমার
রাজধর	কনিষ্ঠ রাজকুমার
ধুরন্ধর	ঐ মামাতো ভাই
ইশা খাঁ	সেনাপতি
আরাকান-রাজ	
প্রতাপ	
নিশানধারী	
ভাট	
দূত	
সৈনিক প্রভৃতি	

মুকুট

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ত্রিপুরার সেনাপতি ইশা খাঁর কক্ষ

ত্রিপুরার কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর ও ইশা খাঁ

ইশা খাঁ অস্ত্র পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত

রাজধর। দেখো সেনাপতি, আমি বার বার বলছি তুমি আমার নাম ধরে ডেকো না।

ইশা খাঁ। তবে কী ধরে ডাকব? চুল ধরে না কান ধরে?

রাজধর। আমি বলে রাখছি, আমার সম্মান যদি তুমি না রাখ তোমার সম্মানও আমি রাখব না।

ইশা খাঁ। আমার সম্মান যদি তোমার হাতে থাকবার ভার থাকত তবে কানা কড়ার দরে তাকে হাটে বিকিয়ে আসতুম। নিজের সম্মান আমি নিজেই রাখতে পারব।

রাজধর। তাই যদি রাখতে চাও তা হলে ভবিষ্যতে আমার নাম ধরে ডেকো না।

ইশা খাঁ। বটে!

রাজধর। হাঁ।

ইশা খাঁ। হা হা হা হা! মহারাজাধিরাজকে কী বলে ডাকতে হবে? হজুর, জনাব, জাঁহাপনা!

রাজধর। আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার সে কথা তুমি ভুলে যাও।

ইশা খাঁ। সহজে ভুলি নি, তুমি যে রাজকুমার সে কথা মনে রাখা শক্ত করে তুলেছ।

রাজধর। তুমি যে আমার ওস্তাদ, সে কথাও মনে রাখতে দিলে না দেখছি।

ইশা খাঁ। বস্। চুপ।

দ্বিতীয় রাজকুমার ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার। খাঁ সাহেব, ব্যাপারখানা কী?

ইশা খাঁ। শোনো তো বাবা। বড়ো তামাশার কথা। তোমাদের মধ্যে এই যে ব্যক্তিটি সকলের কনিষ্ঠ এঁকে জাঁহাপনা শাহেন্‌শা বলে না ডাকলে ওঁর আর সম্মান থাকে না— ওঁর সম্মানের এত টানাটানি!

ইন্দ্রকুমার। বল কী! সত্যি নাকি! হা হা হা হা!

রাজধর। চুপ করো দাদা।

ইন্দ্রকুমার। তোমাকে কী বলে ডাকতে হবে? জাঁহাপনা! হা হা হা হা! শাহেন্‌শা!

রাজধর। দাদা, চুপ করো বলছি।

ইন্দ্রকুমার। জনাব, চুপ করে থাকা বড়ো শক্ত, হাসিতে যে পেট ফেটে যায় হজুর!

রাজধর। তুমি অত্যন্ত নির্বোধ।

ইন্দ্রকুমার। ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমারই থাক্, তার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই।

ইশা খাঁ। ওঁর বুদ্ধিটা সম্প্রতি বড়োই বেড়ে উঠেছে।

ইন্দ্রকুমার। নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না, মই লাগাতে হবে।

অনুচরসহ যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য ও মহারাজ অমরমাণিক্যের প্রবেশ

রাজধর। মহারাজের কাছে আমার নালিশ আছে।

মহারাজ। কী হয়েছে?

রাজধর। ইশা খাঁ পুনঃপুনঃ নিষেধসত্ত্বে আমার অসম্মান করেন। এর বিচার করতে হবে।

ইশা খাঁ। অসম্মান কেউ করে না, অসম্মান তুমি করাও। আরো তো রাজকুমার আছেন। তাঁরাও মনে রাখেন আমি তাঁদের গুরু, আমিও মনে রাখি তাঁরা আমার ছাত্র— সম্মান-অসম্মানের কোনো কথাই ওঠে না।

মহারাজ। সেনাপতি সাহেব, কুমারদের এখন বয়স হয়েছে, এখন ওঁদের মান রক্ষা করে চলতে হবে বৈকি।

ইশা খাঁ। মহারাজ যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করেছেন তখন মহারাজকে যেরকম সম্মান করেছি রাজকুমারদের তা অপেক্ষা কম করি নে।

রাজধর। অন্য কুমারদের কথা বলতে চাই নে, কিন্তু—

ইশা খাঁ। চুপ করো বৎস। আমি তোমার পিতার সঙ্গে কথা কচ্ছি। মহারাজ, মাপ করবেন, রাজবংশের এই কনিষ্ঠ পুত্রটি বড়ো হলে মুনশির মতো কলম চালাতে পারবে, কিন্তু তলোয়ার এর হাতে শোভা পাবে না। (যুবরাজ এবং ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া) চেয়ে দেখুন মহারাজ, এঁরাই তো রাজপুত্র, রাজগৃহ আলো করে আছেন।

মহারাজ। রাজধর, খাঁ সাহেব কী বলছেন! তুমি অস্ত্রশিক্ষায় ওঁকে সন্তুষ্ট করতে পার নি?

রাজধর। সে আমার ভাগ্যের দোষ, অস্ত্রশিক্ষার দোষ নয়। মহারাজ নিজে আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, এই আমার প্রার্থনা।

মহারাজ। আচ্ছা, উত্তম। কাল আমাদের অবসর আছে, কালই পরীক্ষা হবে। তোমাদের মধ্যে যে জিতবে তাকে আমার এই হীরে-বাঁধানো তলোয়ার পুরস্কার দেব।

[প্রস্থান

ইশা খাঁ। শাবাশ রাজধর, শাবাশ! আজ তুমি ক্ষত্রিয়সন্তানের মতো কথা বলেছ। অস্ত্রপরীক্ষায় যদি তুমি হার তাতেও তোমার গৌরব নষ্ট হবে না। হার-জিত তো আল্লার ইচ্ছা, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মনে স্পর্ধা থাকা চাই।

রাজধর। থাক সেনাপতি, তোমার বাহবা অন্য রাজকুমারদের জন্য জমা থাক; এত দিন তা না পেয়েও যদি চলে গিয়ে থাকে তবে আজও আমার কাজ নেই।

যুবরাজ। রাগ কোরো না ভাই রাজধর। সেনাপতি সাহেবের সরল ভর্ৎসনা ওঁর সাদা দাড়ির মতো সমস্তই কেবল ওঁর মুখে। কোনো একটি গুণ দেখলেই তৎক্ষণাৎ উনি সব ভুলে যান। অস্ত্রপরীক্ষায় যদি তোমার জিত হয় তা হলে দেখবে, খাঁ সাহেব তোমাকে যেমন মনের সঙ্গে পুরস্কৃত করবেন এমন আর কেউ নয়।

রাজধর। দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে, আজ রাত্রে যখন গোমতী নদীতে বাঘে জল খেতে আসবে তখন শিকার করতে গেলে হয় না?

যুবরাজ। বেশ কথা। তোমার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে তো যাওয়া যাবে।

ইন্দ্রকুমার। কী আশ্চর্য! রাজধরের যে শিকারে প্রবৃত্তি হল! এমন তো কখনো দেখা যায় নি।

ইশা খাঁ। ওঁর আবার শিকারে প্রবৃত্তি নেই! উনি সকলের চেয়ে বড়ো জীব শিকার করে বেড়ান। রাজসভায় দুই পা-ওয়ালা এমন একটি জীব নেই যিনি ওঁর কোনো-না-কোনো ফাঁদে আটকা না পড়েছেন।

যুবরাজ। সেনাপতি সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার জিহ্বাও তেমনি, দুইই খরধার— যার উপর গিয়ে পড়ে তার একেবারে মর্মচ্ছেদ না করে ফেরে না।

রাজধর। দাদা, তুমি আমার জন্যে ভেবো না। খাঁ সাহেব জিহ্বায় যতই শান দিন-না কেন আমার মর্মে আঁচড় কাটতে পারবেন না।

ইশা খাঁ। তোমার মর্ম পায় কে বাবা! বড়ো শক্ত।

ইন্দ্রকুমার। যেমন, হঠাৎ আজ রাত্রে তোমার শিকারে যাবার শখ হল, এর মর্ম ভালো বোঝা যাচ্ছে না।

যুবরাজ। আহা, ইন্দ্রকুমার! প্রত্যেক কথাতেই রাজধরকে আঘাত করাটা তোমার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।

রাজধর। সে আঘাতে বেদনা না পাওয়াও আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

ইন্দ্রকুমার। দাদা, আজ রাত্রে শিকারে যাওয়াই তোমার মত নাকি?

যুবরাজ। তোমার সঙ্গে, ভাই, শিকার করতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। নিতান্ত নিরামিষ শিকার করতে হয়। তুমি বনে গিয়ে বড়ো বড়ো জন্তু মেরে আন, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়ো কচু কাঁঠাল শিকার করেই মরি।

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া) যুবরাজ ঠিক বলেছেন পুত্র। তোমার তীর সকলের আগে ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়ে লাগে— তোমার সঙ্গে পেরে উঠবে কে!

ইন্দ্রকুমার। না দাদা, ঠাট্টা নয়। তুমি না গেলে কে শিকার করতে যাবে!

যুবরাজ। আচ্ছা, চলো। আজ রাজধরের ইচ্ছে হয়েছে, ওঁকে নিরাশ করব না।

ইন্দ্রকুমার। কেন দাদা, আমার ইচ্ছে হয়েছে বলে কি যেতে নেই?

যুবরাজ। সে কী কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই যাচ্ছি!

ইন্দ্রকুমার। তাই বুঝি পুরনো হয়ে গেছে?

যুবরাজ। আমার কথা অমন উলটো বুঝলে বড়ো ব্যথা লাগে।

ইন্দ্রকুমার। না দাদা, ঠাট্টা করছিলুম— চলো প্রস্তুত হই গে।

ইশা খাঁ। ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সইতে পারে, কিন্তু দাদার সামান্য অনাদরটুকু সইতে পারে না।

[অনুচরগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

অনুচরগণ

প্রথম। কথাটা তো ভালো ঠেকছে না হে। আমাদের ছোটো কুমারের ধনুর্বিদ্যার দৌড় তো সকলেরই জানা আছে, উনি মধ্যম কুমারের সঙ্গে অস্ত্রপরীক্ষায় এগোতে চান এর মানে কী?

দ্বিতীয়। কেউ বা তীর দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করে, কেউ বা বুদ্ধি দিয়ে।

প্রথম। সেই তো ভয়ের কথা। অস্ত্রপরীক্ষায় অস্ত্র না চালিয়ে যদি বুদ্ধি চালাও সেটা যে দুষ্টবুদ্ধি।

তৃতীয়। দেখো বংশী, অস্ত্রই চলুক আর বুদ্ধিই চলুক মাঝের থেকে তোমার ঐ জিভটিকে চালিয়ো না, আমার এই পরামর্শ। যদি টিকে থাকতে চাও তো চুপ করে থাকো।

দ্বিতীয়। বনমালী ঠিক কথাই বলেছে। ঐ ছোটো কুমারের কথা উঠলেই তুমি যা মুখে আসে তাই বলে ফেল। রাজার ছেলে— কে ভালো কে মন্দ সে বিচারের ভার আমাদের উপর নেই। তবে কিনা, আমাদের যুবরাজ বেঁচে থাকুন আর আমাদের মধ্যম কুমার ভাই লক্ষ্মণের মতো সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁকে রক্ষে করুন, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করো। ছোটো কুমারের কথা মুখে না আনাই ভালো।

প্রথম। ইচ্ছে ক'রে তো আনি নে। আমাদের মধ্যম কুমার সরল মানুষ, মনে তাঁর ভয়-ডরও নেই, পাক-চক্রও নেই— সর্বদাই ভয় হয় ঐ যাঁর নামটা করছি নে তিনি কখন তাঁকে কী ফেসাদে ফেলেন।

দ্বিতীয়। চল্‌ চল্‌, ঐ আসছেন।

প্রথম। ঐ-যে সঙ্গে ওঁর মামাতো ভাই ধুরন্ধরটিও আছেন— শনির সঙ্গে মঙ্গল এসে জুটেছেন।

[প্রস্থান

রাজধর ও ধুরন্ধর

রাজধর। অসহ্য হয়েছে।

ধুরন্ধর। কিন্তু সহ্য করতেও তো কসুর নেই। ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে তো প্রায় জন্মাবধিই এইরকম চলছে, কিন্তু অসহ্য হয়েছে এমন তো লক্ষণ দেখি নে।

রাজধর। লক্ষণ দেখিয়ে লাভ হবে কী! যখন দেখাব একেবারে কাজে দেখাব। একটা সুযোগ এসেছে। এইবার অস্ত্রপরীক্ষায় আমি লক্ষ্যভেদ করব।

ধুরন্ধর। ইন্দ্রকুমারের বক্ষে নাকি?

রাজধর। বক্ষে নয়, তার হৃদয়ে। এবারকার পরীক্ষায় আমি জিতব, ওঁর অহংকারটাকে বিঁধে এফোঁড় ওফোঁড় করব।

ধুরন্ধর। অস্ত্রপরীক্ষায় ইন্দ্রকুমারকে জিতবে এইটেকেই সুযোগ বলছ?

রাজধর। সুযোগ কি তীরের মুখে থাকে? সুযোগ বুদ্ধির ডগায়। তোমাকে কিন্তু একটি কাজ করতে হবে।

ধুরন্ধর। কাজ তো তোমার বরাবরই করে আসছি, ফল তো কিছু পাই নে।

রাজধর। ফল সবুরে পাওয়া যায়। কোনোরকম ফন্দিতে ইন্দ্রকুমার-দাদার অস্ত্রশালায় ঢুকে তাঁর তূণের প্রথম খোপটি থেকে তাঁর নাম-লেখা তীরটি তুলে নিয়ে আমার নাম-লেখা তীর বসিয়ে আসতে হবে। তার সঙ্গে আমার তীর বদল করতে হবে, ভাগ্যও বদল হবে।

ধুরন্ধর। সবই যেন বুঝলুম কিন্তু আমার প্রাণটি? সেটি গেলে তো কারও সঙ্গে বদল চলবে না।

রাজধর। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি আছি।

ধুরন্ধর। তুমি তো বরাবরই আছ, কিন্তু ভয়ও আছে। সেই যখন ইন্দ্রকুমারের রুপোর-পাত-দেওয়া ধনুকটার উপরে তুমি লোভ করলে আমিই তো সেটি সংগ্রহ করে তোমার ঘরে এনে লুকিয়ে রেখেছিলুম। শেষকালে যখন ধরা পড়লে ইন্দ্রকুমার ঘৃণা করে সে ধনুকটা তোমাকে দান করলেন, কিন্তু আমার যে অপমানটা করলেন সে আমার জীবন গেলেও যাবে না। তখন তো ভাই, তুমি ছিলে, রক্ষা যত করেছিলে সে আমার মনে আছে।

রাজধর। এবার তোমার সময় এসেছে, সেই অপমানের শোধ দেবার জোগাড় করো।

ধুরন্ধর। সময় কখন কার আসে সেটা যে পরিষ্কার বোঝা যায় না। দুর্বল লোকের পক্ষে অপমান পরিপাক করবার শক্তিটাই ভালো; শোধ তোলবার শখটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। ঐ-যে ওঁরা সব আসছেন। আমি পালাই। তোমার সঙ্গে আমাকে একত্রে দেখলেই ইন্দ্রকুমার যে কথাগুলি বলবেন তাতে মধুবর্ষণ করবে না, আর ইশা খাঁও যে তোমার চেয়ে আমার প্রতি বেশি ভালোবাসা প্রকাশ করবেন এমন ভরসা আমার নেই।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বারে

ইন্দ্রকুমার। কী হে প্রতাপ, ব্যাপারখানা কী? আমাকে হঠাৎ অস্ত্রশালার দ্বারে যে ডাক পড়ল?

প্রতাপ। মধ্যম বউরানীমা আপনাকে খবর দিতে বললেন যে, আপনার অস্ত্রশালার মধ্যে একটি জ্যান্ত অস্ত্র ঢুকেছেন, তিনি বায়ু-অস্ত্র না নাগপাশ না কী সেটা সন্ধান নেওয়া উচিত।

ইন্দ্রকুমার। বল কী প্রতাপ, কলিযুগেও এমন ব্যাপার ঘটে নাকি?

প্রতাপ। আজ্ঞে, কুমার, কলিযুগেই ঘটে, সত্যযুগে নয়। দরজাটা খুললেই সমস্ত বুঝতে পারবেন।

ইন্দ্রকুমার। তাই তো বটে, পায়ের শব্দ শুনি যে! (দ্বার খুলিতেই রাজধরের নিক্রমণ) একি! রাজধর যে! হা হা হা হা, তোমাকে অস্ত্র বলে কেউ ভুল করেছিল নাকি! হা হা হা হা!

রাজধর। মেজবউরানী তামাশা করে আমাকে এখানে বন্ধ করে রেখেছিলেন।

ইন্দ্রকুমার। এ ঘরটা তো সহজ তামাশার ঘর না, এখানকার তামাশা যে ভয়ংকর ধারালো তামাশা— এখানে তোমার আগমন হল যে!

রাজধর। আজ রাত্রে শিকারে যাব বলে অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে দেখলুম আমার অস্ত্রগুলোতে সব মর্চে পড়ে রয়েছে। কালকের অস্ত্রপরীক্ষার জন্যে সেগুলোকে সমস্ত সাফ করতে দিয়ে এসেছি। তাই বউরানীর কাছে এসেছিলুম তোমার কিছু অস্ত্র ধার নেবার জন্যে।

ইন্দ্রকুমার। তাই তিনি বুঝি সমস্ত অস্ত্রশালাসুদ্ধই তোমাকে ধার দিয়ে বসে আছেন! হা হা হা হা! তা বেরিয়ে এলে কেন? যাও, ঢুকে পড়ো। ধারের মেয়াদ ফুরিয়েছে নাকি? হা হা হা হা!

রাজধর। হাসো, হাসো। এ তামাশায় আমিও হাসব। কিন্তু এখন নয়। চললুম দাদা, আজ আর শিকারে যাচ্ছি নে।

[প্রস্থান

প্রতাপ। ছোটোকুমারকে নিয়ে আপনাদের এ-সমস্ত ঠাট্টা আমার ভালো বোধ হয় না।

ইন্দ্রকুমার। ঠাট্টা নিয়ে ভয় কিসের? উনিও ঠাট্টা করুন-না।

প্রতাপ। ওঁর ঠাট্টা বড়ো সহজ হবে না।

তৃতীয় দৃশ্য

পরীক্ষাভূমি

রাজা, রাজকুমারগণ, ইশা খাঁ, নিশানধারী ও ভাট

ইন্দ্রকুমার। দাদা, আজ তোমাকে জিততেই হবে, নইলে চলবে না।

যুবরাজ। চলবে না তো কী! আমার তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও জগৎসংসার যেমন চলছিল ঠিক তেমনিই চলবে। আর, যদি বা নাই চলত তবু আমার জেতবার কোনো সম্ভাবনা দেখছি নে।

ইন্দ্রকুমার। দাদা, তুমি যদি হারো তবে আমি ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।

যুবরাজ। না ভাই, ছেলেমানুষি কোরো না। ওস্তাদের নাম রাখতে হবে।

ইশা খাঁ। যুবরাজ, সময় হয়েছে, ধনুক গ্রহণ করো। মনোযোগ কোরো। দেখো, হাত ঠিক থাকে যেন।

যুবরাজের তীর-নিক্ষেপ

ইশা খাঁ। যাঃ! ফসকে গেল।

যুবরাজ। মনোযোগ করেছিলুম খাঁ সাহেব, তীরযোগ করতেই পারলুম না।

ইন্দ্রকুমার। কখনো না। মন দিলে তুমি নিশ্চয়ই পারতে। দাদা, তুমি কেবল উদাসীন হয়ে সব জিনিস ঠেলে ফেলে দাও, এতে আমার ভারি কষ্ট হয়।

ইশা খাঁ। তোমার দাদার বুদ্ধি তীরের মুখে কেন খেলে না, তা জান! বুদ্ধিটা তেমন সূক্ষ্ম নয়।

ইন্দ্রকুমার। সেনাপতি সাহেব, তুমি অন্যায় বলছ।

ইশা খাঁ। (রাজধরের প্রতি) কুমার, এবার তুমি লক্ষ্য ভেদ করো, মহারাজ দেখুন।

রাজধর। আগে দাদার হোক।

ইশা খাঁ। এখন উত্তর করবার সময় নয়, আমার আদেশ পালন করো।

রাজধরের তীর-নিক্ষেপ

ইশা খাঁ। যাক, তোমার তীরও তোমার দাদার তীরেরই অনুসরণ করেছে— লক্ষ্যের দিকে লক্ষও করে নি।

যুবরাজ। ভাই, তোমার বাণ অনেকটা নিকট দিয়েই গেছে, আর-একটু হলেই লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারত।

রাজধর। লক্ষ্য বিদ্ধ তো হয়েছে! দূর থেকে তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ না। ঐ-যে বিদ্ধ হয়েছে।

যুবরাজ। না, রাজধর, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হয়েছে— লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নি।

রাজধর। আমার ধনুর্বিদ্যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস নেই বলেই তোমরা দেখেও দেখতে পাচ্ছ না। আচ্ছা, কাছে গেলেই প্রমাণ হবে।

ইন্দ্রকুমারের ধনুক-গ্রহণ

যুবরাজ। (ইন্দ্রকুমারের প্রতি) ভাই আমি অক্ষম, সেজন্যে আমার উপর তোমার রাগ করা উচিত না। তুমি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হও তা হলে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করবে এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

ইন্দ্রকুমারের তীর-নিক্ষেপ

নেপথ্যে জনতা। জয়, কুমার ইন্দ্রকুমারের জয়!

বাদ্য বাজিয়া উঠিল। যুবরাজ ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন

ইশা খাঁ। পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো। মহারাজ, মধ্যমকুমার পুরস্কারের পাত্র। যেরূপ প্রতিশ্রুত আছেন তা পালন করুন।

রাজধর। না মহারাজ, পুরস্কার আমারই প্রাপ্য। আমারই তীর লক্ষ্যভেদ করেছে।

মহারাজ। কখনোই না।

রাজধর। সেনাপতি সাহেব পরীক্ষা করে আসুন কার তীর লক্ষ্যে বিঁধে আছে।

ইশা খাঁ। আচ্ছা, আমি দেখে আসি।

[প্রস্থান

তীর হাতে লইয়া ইশা খাঁর পুনঃপ্রবেশ

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের প্রতি) বাবা, আমি বুড়োমানুষ, চোখে তো ভুল দেখছি নে? এই তীরের ফলায় যেন রাজধরের নাম দেখা যাচ্ছে।

ইন্দ্রকুমার। হাঁ, রাজধরেরই নাম।

মহারাজ। দেখি। তাই তো! একসঙ্গে আমাদের সকলেরই ভুল হল!

রাজধর। আজ নয় মহারাজ, আমার প্রতি বরাবরই ভুল হয়ে আসছে!

ইশা খাঁ। কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ইন্দ্রকুমার। আমি বুঝেছি।

রাজধর। মহারাজ, আজ বিচার করুন।

ইন্দ্রকুমার। (জনান্তিকে) বিচার! তুমি বিচার চাও! তা হলে যে মুখে চুনকালি পড়বে! বংশের লজ্জা প্রকাশ করব না, অন্তর্যামী তোমার বিচার করবেন।

ইশা খাঁ। কী হয়েছে বাবা? এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। শিলা কখনো জলে ভাসে না, বানরে কখনো সংগীত গায় না। বাবা ইন্দ্রকুমার, ঠিক কথা বলো তো কী হয়েছে। তূণ বদল হয় নি তো?

রাজধর। কখনোই না। পরীক্ষা করে দেখো।

ইশা খাঁ। তাই তো দেখছি— তূণ তো ঠিকই আছে। আচ্ছা, বাবা ইন্দ্রকুমার, সত্য করে বলো, এর

মধ্যে তোমার অস্ত্রশালায় কেউ কি প্রবেশ করেছিল ?

ইন্দ্রকুমার। সে কথায় প্রয়োজন নেই খাঁ সাহেব।

ইশা খাঁ। ঠিক করে বলো বাবা, তুমি নিশ্চয় জান কেউ তোমার অস্ত্রশালায় গিয়ে তোমার সঙ্গে তীর বদল করেছে।

ইন্দ্রকুমার। চুপ করো খাঁ সাহেব। ও কথা থাক্।

ইশা খাঁ। তা হলে তুমি হার মানছ ?

ইন্দ্রকুমার। হাঁ, আমি হার মানছি।

ইশা খাঁ। শাবাস বাবা, শাবাশ ! তুমি রাজার ছেলে বটে। মহারাজ, কোথাও একটা-কিছু অন্যায় হয়ে গেছে, সে কথাটা প্রকাশ হচ্ছে না। আর-এক বার পরীক্ষা না হলে ঠিকমত মীমাংসা হতে পারবে না।

রাজধর। খাঁ সাহেব, অন্যায় আর কিছু নয়, আমার জেতাই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আবার পরীক্ষার অপমান আমি স্বীকার করতে পারব না। আমার জিত হওয়া যদি অন্যায় হয়ে থাকে সে অন্যায়ের সহজ প্রতিকার আছে। আমি পুরস্কার চাই নে, মধ্যম কুমারকেই পুরস্কার দেওয়া হোক।

মহারাজ। সে কথা আমি বলতে পারি নে— তীরে যখন তোমার নাম লেখা আছে তখন তোমাকে পুরস্কার দিতেই আমি বাধ্য। এই তুমি নাও।

তলোয়ার প্রদান

রাজধর। পুরস্কার আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি, কিন্তু আমার এই সৌভাগ্যে কারও মন যখন প্রসন্ন হচ্ছে না তখন এই তলোয়ার আমি দাদা ইন্দ্রকুমারকেই দিলুম।

ইন্দ্রকুমারের দিকে তলোয়ার অগ্রসর-করণ

ইন্দ্রকুমার। (তলোয়ার মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া) ধিক্ ! তোমার হাত থেকে এ পুরস্কারের অপমান গ্রহণ করবে কে ?

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া) কী ? ইন্দ্রকুমার, মহারাজের দত্ত তলোয়ার তুমি মাটিতে ফেলে দিতে সাহস কর ! তোমার এই অপরাধের সমুচিত শাস্তি হওয়া চাই।

ইন্দ্রকুমার। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ কোরো না।

ইশা খাঁ। পুত্র, একি পুত্র ! তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হয়েছ।

ইন্দ্রকুমার। সেনাপতি সাহেব, আমাকে ক্ষমা করো। আমি যথার্থই আত্মবিস্মৃত হয়েছি। আমাকে শাস্তি দাও।

যুবরাজ। ক্ষান্ত হও ভাই, ঘরে ফিরে চলো।

ইন্দ্রকুমার। (মহারাজের পদধূলি লইয়া) পিতা, অপরাধ মার্জনা করুন। আজ সকল রকমেই আমার হার হয়েছে।

ইশা খাঁ। মহারাজ, আমার একটি নিবেদন আছে। খেলার পরীক্ষা তো চুকেছে, এবার কাজের পরীক্ষা হোক। দেখা যাবে তাতে আপনার কোন্ পুত্র পুরস্কার আনতে পারে।

মহারাজ। কোন্ কাজের কথা বলছ সেনাপতি।

ইশা খাঁ। আরাকান-রাজের সঙ্গে মহারাজের যুদ্ধের মতলব আছে। সৈন্যও তো প্রস্তুত হয়েছে। এইবার কুমারদের সেই যুদ্ধে পাঠানো হোক।

মহারাজ। ভালো কথাই বলেছ সেনাপতি। খবর পেয়েছি আরাকানের রাজা চট্টগ্রামের সীমানার কাছে এসেছেন। বার বার শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু মূর্খের শিক্ষার শেষ তো কিছুতেই হয় না, যমরাজের পাঠশালায় না পাঠালে গতি নেই। কী বল বৎসগণ ! আমাদের সেই চিরশত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে যাত্রা করে ক্ষাত্রচর্যে দীক্ষা গ্রহণ করতে রাজি আছ কি ?

ইন্দ্রকুমার। রাজি। দাদাও যাবেন।

রাজধর। আমিও যাব না মনে করছ নাকি ?

মহারাজ। তবে ইশা খাঁ, তুমি সৈন্যাধ্যক্ষ হয়ে এঁদের সকলকে শত্রুবিজয়ে নিয়ে যাও। ত্রিপুরেশ্বরী তোমাদের সহায় হোন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজধরের শিবির

রাজধর ও ধুরন্ধর

ধুরন্ধর। তুমি পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে তফাতে থাকবে না কি ?

রাজধর। হাঁ— ইশা খাঁর কাছে আমি এই প্রস্তাব পাঠিয়েছিলুম।

ধুরন্ধর। সে তো আমি জানি ; আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলুম। তাই নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়ে গেল।

রাজধর। কিরকম ?

ধুরন্ধর। প্রথমেই তো ইন্দ্রকুমার অট্টহাস্য করে উঠলেন। তিনি বললেন, রাজধরের যুদ্ধপ্রণালীটাই ঐরকম, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে থেকেই তিনি যুদ্ধ করতে ভালোবাসেন।

রাজধর। সে কথা ঠিক। ক্ষেত্র হতে যুদ্ধ করে মজুররা, দূরে থেকে যে যুদ্ধ করতে পারে সেই যোদ্ধা। ইশা খাঁ কী বললেন ?

ধুরন্ধর। তোমার উপর তাঁর বিশ্বাস কিরকম সে তো তুমি জানই। তুমি যদি পায়ে ধরতে যাও তা হলেও তিনি সন্দেহ করেন নিশ্চয় জুতোজোড়াটা তোমার সরাবার মতলব আছে। তাই, ইশা খাঁ বললেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধর তফাতে থাকতে চান সেটা তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়, কিন্তু পাঁচ হাজার সৈন্য সঙ্গে রাখতে চান সেইটে আমার ভালো ঠেকছে না।

রাজধর। যুবরাজ কিছু বললেন না ?

ধুরন্ধর। যুবরাজ কাউকে যে সন্দেহ করবেন সে পরিমাণ বুদ্ধি ভগবান তাঁকে দেন নি— এমন-কি, তুমি যে তুমি, তোমার উপরেও তাঁর সন্দেহ হয় না।

রাজধর। দেখো ধুরন্ধর, দাদার কথা তুমি অমন করে বোলো না।

ধুরন্ধর। ওঃ, ঐ জায়গাটা তোমার একটু নরম আছে সেটা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। যা হোক, তিনি বললেন, না, না, রাজধরের প্রতি তোমরা অন্যায় অবিচার করছ। তাঁর প্রস্তাবটা তো আমার ভালোই ঠেকছে। যুদ্ধে যদি সংকট উপস্থিত হয় তা হলে তিনি তাঁর সৈন্য নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। যুবরাজের অনুরোধেই তো ইশা খাঁ তোমার প্রস্তাবে রাজি হলেন, নইলে তাঁর বড়ো ইচ্ছে ছিল না। যাই হোক, কিন্তু আমি তোমার আলাদা থাকবার মতলব ভালো বুঝতে পারছি নে।

রাজধর। ওঁদের সঙ্গে একত্রে মিলে যুদ্ধ করে আমার লাভ কী ? জিত হলে সে জিতকে কেউ আমার জিত বলবে না তো।

ধুরন্ধর। তবু ভুলেও কেউ তোমার নাম করতে পারে, কিন্তু তফাতে বসে থাকলে যুদ্ধে জয় হলেও তোমার অপযশ, হারলে তো কথাই নেই।

রাজধর। আমার এই পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়েই আমি যুদ্ধে জিতব এবং আমি একলাই জিতব।

দূতের প্রবেশ

রাজধর। কী রে, যুদ্ধের খবর কী ?

দূত। আজ্ঞে, লড়াই তো সমস্ত দিন ধরেই চলেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত এঁরা শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করতে

পারেন নি। সূর্য অস্ত যাবার আর তো বেশি দেরি নেই, অন্ধকার হয়ে এলে বোধ হয় যুদ্ধ আজকের মতো বন্ধ রাখতে হবে।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ

রাজধর। কে তুমি?

দ্বিতীয় দূত। আজ্ঞে আমি ব্যোমকেশ, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন— সেও প্রায় দুই প্রহর হয়ে গেল— আপনার যেখানে সৈন্য নিয়ে থাকবার কথা ছিল সেখানে আপনার কোনো চিহ্ন না পেয়ে বহু সন্ধানে এখানে এসেছি।

রাজধর। যুবরাজের আদেশ কী?

দূত। শত্রুসৈন্যের সংখ্যা আমরা যেরকম অনুমান করেছিলুম তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধ খুব কঠিন হয়ে এসেছে। কুমার ইন্দ্রকুমার তাঁর অশ্বারোহী-দল নিয়ে শত্রুসৈন্যের উত্তর দিক আক্রমণ করেছিলেন, আর কিছুক্ষণ সময় পেলেই তিনি সে দিক থেকে শত্রুসৈন্যকে একেবারে নদীর কিনারা পর্যন্ত হঠিয়ে আনতে পারতেন।

রাজধর। সত্যি নাকি! সময় পেলে কী করতে পারতেন সে কথা কল্পনা করে বিশেষ লাভ দেখি নে, কিন্তু সময় পান নি বলেই বোধ হচ্ছে।

দূত। শত্রুসৈন্যকে যখন প্রায় টলিয়ে এনেছেন এমন সময় খবর পেলেন যে যুবরাজ সংকটে পড়েছেন, শত্রু তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। ইশা খাঁ তখন অন্য দিকে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি খবর পেয়ে বললেন, যুবরাজকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি এখানে আসি নি, আমাকে যুদ্ধে জিততে হবে ; আমি এখান থেকে নড়তে গেলেই শত্রুরা সুবিধা পাবে।

রাজধর। দাদা কি তবে—

দূত। না, তাঁর কোনো বিপদ এখনো ঘটে নি। ইন্দ্রকুমার সৈন্য নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু এই গোলেমালে যুদ্ধে আমাদের অসুবিধা ঘটল। আপনাকে সন্ধান করবার জন্যে নানা দিকে দূত গিয়েছে। আপনার সাহায্য না হলে বিপদ ঘটতেও পারে, অতএব আপনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব করবেন না।

রাজধর। না, কিছুমাত্র বিলম্ব করব না। যাও, বিশ্রাম করো গে যাও— আমি প্রস্তুত হচ্ছি।

[দূতের প্রস্থান

ধুরন্ধর। তুমি যাচ্ছ নাকি?

রাজধর। যাচ্ছি বটে, কিন্তু ও দিকে নয়, অন্য দিকে।

ধুরন্ধর। বাড়ির দিকে?

রাজধর। তুমিও কি ইশা খাঁর কাছ থেকে বিদ্রূপ অভ্যেস করেছ! বীরত্ব যাঁর খুশি তিনি দেখান, কিন্তু যুদ্ধে জয় করে যদি কেউ বাড়ি ফেরে তো সে রাজধর। ধুরন্ধর, যাও তুমি— দেখো গে আমার শিবিরে কোথাও যেন কেউ আগুন না জ্বালে, একটি প্রদীপও যেন না জ্বলতে পায়।

ধুরন্ধর। আচ্ছা আমি সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছি, কিন্তু কী তোমার অভিপ্রায় খুলেই বলো-না— তুমি যদি আমাকে আর আমি যদি তোমাকে সন্দেহ করি তা হলে পৃথিবীতে আমাদের দুটির তো কোথাও ভর দেবার জায়গা থাকবে না।

রাজধর। আজ রাত্রের অন্ধকারে আমি সৈন্য নিয়ে গোপনে নদী পার হয়ে যাব। হঠাৎ আরাকান-রাজের শিবিরে উপস্থিত হয়ে তাকে বন্দী করতে হবে।

ধুরন্ধর। এখানে কোথায় পার হবে? ঘাট তো নেই।

রাজধর। পথঘাট আমি সমস্তই সন্ধান করে ঠিক করে রেখেছি। সূর্য তো অস্ত গেল। আজ আড়াই প্রহর রাত্রে চাঁদ উঠবে, তার পূর্বেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে। অতএব আর বড়ো বেশি দেরি নেই— তুমি যাও, প্রস্তুত হও গে। আর-একটি কাজ করো— যুবরাজের দূত যেন ফিরে যেতে না পারে, তাকে বন্দী করে রাখো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইশা খাঁর শিবির

ইন্দ্রকুমার ও ইশা খাঁ

ইন্দ্রকুমার। সেনাপতি সাহেব, আপনি দাদার উপর রাগ করবেন না। আজ রাত্রে সৈন্যেরা বিশ্রাম করুক, কাল আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করব।

ইশা খাঁ। দেখো ইন্দ্রকুমার, আগুন যত শীঘ্র নেবানো যায় ততই মঙ্গল ; তাকে সময় দিলে কিসের থেকে কী ঘটে কিছুই বলা যায় না। আজই আমরা জিতে আসতুম, কেবল তোমার দাদা নিতান্ত নির্বোধের মতো শত্রুদের মাঝখানে নিজেকে খামকা জড়িয়ে বসলেন ; আমাদের সমস্ত পণ্ড হয়ে গেল।

ইন্দ্রকুমার। নির্বোধের মতো কেন বলছ খাঁ সাহেব, বলো বীরের মতো— তিনি সামান্য কয়জন সৈন্য নিয়ে—

ইশা খাঁ। যেখানে গিয়ে পড়েছিলেন সেখানে কেবল নির্বোধই যেতে পারে—

ইন্দ্রকুমার। (উত্তেজিত স্বরে) না, সেখানে বীর না হলে কেউ প্রবেশ করতে সাহস করতে পারে না।

ইশা খাঁ। আচ্ছা বাবা, তোমার কথা মানছি। কিন্তু শুধু বীর নয়, নির্বোধ বীর না হলে সে দিকে কেউ যেত না।

ইন্দ্রকুমার। কিন্তু তাতে তোমার লড়াইয়ের তো কোনো ব্যাঘাত হয় নি।

ইশা খাঁ। খুব ব্যাঘাত হয়েছিল। আমার সৈন্যেরা খবর পেয়ে সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠল, তাদের কি আর লড়াইয়ে মন ছিল ? আমাদের সৈন্যের মধ্যে একজনও নেই যুবরাজের বিপদের খবর শুনে যে স্থির থাকতে পারে।

ইন্দ্রকুমার। কিন্তু সেনাপতি সাহেব, আমাদের রাজধরের খবর কী ?

ইশা খাঁ। আমি চার দিকেই দূত পাঠিয়েছিলুম ; একজন ছাড়া সব দূতই ফিরে এসেছে, কোথাও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্রকুমার। হা হা হা হা, সে নিশ্চয় পালিয়েছে।

ইশা খাঁ। হাসির কথা নয় বাবা।

ইন্দ্রকুমার। তা কী করব সেনাপতি সাহেব, আমি খুশি হয়েছি। আমরা যুদ্ধ করে মরতুম, আর ও যে আমাদের খ্যাতিতে ভাগ বসাত সে আমার কিছুতে সহ্য হত না ; তার চেয়ে ও ভেগে গেছে সে ভালোই হয়েছে। এবারকার অস্ত্রপরীক্ষায় তো ফাঁকি চলবে না।

ইশা খাঁ। কিন্তু সেবার কী হয়েছিল তুমি আমার কাছে বল নি।

ইন্দ্রকুমার। সে বলবার কথা না খাঁ সাহেব ; সে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না, সেবার আমি হেরেছিলুম।

ইশা খাঁ। তীর ছুঁড়ে হারো নি বাবা, রাগ করে হেরেছিলে।

তৃতীয় দৃশ্য

আরাকান-রাজের শিবির

আরাকান-রাজ ও রাজধর

আরাকান। দেখুন রাজকুমার, আমাকে বন্দী করে আপনাদের কোনো লাভ নেই।

রাজধর। কেন লাভ নেই রাজন ? এই যুদ্ধের মধ্যে আপনাকে লাভ করাই তো সব চেয়ে বড়ো লাভ।

আরাকান। তাতে যুদ্ধের অবসান হবে না। আমার ভাই হামচু রয়েছে, সৈন্যেরা তাকেই রাজা করবে, যুদ্ধ যেমন চলছিল তেমনি চলবে।

রাজধর। আপনাকে মুক্তিই দেব, কিন্তু সেটা তো একেবারে বিনা মূল্যে দেওয়া চলবে না।

আরাকান। সে আমি জানি, মূল্য দিতে হবে। আমি আপনার কাছে পরাজয় স্বীকার করে সন্ধিপত্র লিখে দিতে রাজি আছি।

রাজধর। শুধু সন্ধিপত্র দিলে তো হবে না মহারাজ। আপনি যে পরাজয় স্বীকার করলেন তার কিছু নিদর্শন তো দেশে নিয়ে যেতে হবে।

আরাকান। আপনাকে পাঁচ শত ব্রহ্মদেশের ঘোড়া ও তিনটি হাতি উপহার দেব।

রাজধর। সে উপহারে আমার প্রয়োজন নেই ; মহারাজের মাথার মুকুট আমাকে দিতে হবে।

আরাকান। তার চেয়ে প্রাণ দেওয়া সহজ ছিল।

রাজধর। প্রাণ দিলেও মুকুটটি তো বাঁচাতে পারবেন না, মাঝের থেকে প্রাণটাই বৃথা যাবে।

আরাকান। তবে মুকুট নিন, কিন্তু এই মুকুটের সহিত আরাকানের চিরস্থায়ী শত্রুতা আপনি ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন। এই মুকুট যতদিন না আবার ফিরে পাব ততদিন আমার রাজবংশে শান্তি থাকবে না।

রাজধর। এই তো রাজার মতো কথা। আমরাও তো শান্তি চাই নে মহারাজ, আমরা ক্ষত্রিয়। আর-একটি কর্তব্য বাকি আছে। শীঘ্র যুদ্ধ নিবারণ করে এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠিয়ে দিন, ও পারে এতক্ষণ যুদ্ধের উদ্যোগ হচ্ছে।

আরাকান। এখনই আমার আদেশ নিয়ে দূত যাবে।

রাজধর। তবে চলুন, সন্ধিপত্র লেখার ব্যবস্থা করা যাক।

চতুর্থ দৃশ্য

রণক্ষেত্র

যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার

যুবরাজ। আজকের যুদ্ধে গতিকটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে আমাদের সৈন্যেরা কালকের ব্যাপারে আজও নিরুৎসাহ হয়ে রয়েছে, ওরা যেন ভালো করে লড়ছে না। ইশা খাঁ কোন্ দিকে ?

ইন্দ্রকুমার। ঐ-যে পূর্বকোণে তাঁর নিশান দেখা যাচ্ছে।

যুবরাজ। ভাই, তুমি কেন আজ আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ ? তোমার বোধ হয় ঐ উত্তরের দিকে যাওয়াই কর্তব্য।

ইন্দ্রকুমার। না, আমার এই জায়গাই ভালো।

যুবরাজ। ইন্দ্রকুমার, তুমি তোমার দাদাকে আজ নির্বুদ্ধিতা থেকে বাঁচাবার জন্যে সতর্ক হয়ে কাছে কাছে ফিরছ। খাঁ সাহেব যে আবার কোনো সুযোগে আমার বুদ্ধির দোষ ধরবেন এটা তোমার ভালো লাগছে না। কিন্তু ভাই, আমারও নির্বুদ্ধিতার সীমা আছে, আমি আজ বোধ হয় সাবধানে কাজ করতে পারব। ঐ দেখো, চেয়ে দেখো, আমার কিন্তু ভালো বোধ হচ্ছে না। ঐ দেখো, ঐ পাশে আমাদের সৈন্যেরা যেন টলছে, এখনই পালাতে আরম্ভ করবে ; তুমি না হলে কেউ ওদের ঠেকাতে পারবে না। ইন্দ্রকুমার, দেরি কোরো না, আমার জন্যে তোমার কোনো ভয় নেই। একি ! একি ! একি !

ইন্দ্রকুমার। তাই তো, একি ! শত্রুসৈন্যেরা হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ করলে যেন !

যুবরাজ। ঐ-যে সন্ধির নিশান উড়িয়েছে ! ওদের তো পরাজয়ের কোনো লক্ষণ ছিল না, তবে কেন এমন ঘটল ? আমার তো মনে হচ্ছিল আজকের যুদ্ধে আমাদের সৈন্যেরাই টল্‌মল্ করছে।

দূতের প্রবেশ

দূত। যুবরাজ, শত্রুপক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়েছে।

যুবরাজ। সে তো দেখতে পাচ্ছি। এর কারণ কী?

দূত। কারণ এখনো জানতে পারি নি, কিন্তু শুনতে পেয়েছি আরাকান-রাজ আর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না বলে সংবাদ পাঠিয়েছেন।

যুবরাজ। সুসংবাদ। আমার কেবল মনে একটি বেদনা বাজছে।

ইন্দ্রকুমার। কিসের বেদনা দাদা?

যুবরাজ। রাজধর কেন সৈন্য নিয়ে চলে গেল! সে যদি থাকত তা হলে কী আনন্দের সঙ্গে আমরা তিন ভাই জয়োৎসব করতে পারতুম। আজকের আমাদের জয়গৌরবের মধ্যে এই একটি মস্ত অভাব রয়ে গেল— রাজধর যুদ্ধে যোগ না দিয়ে আমাকে বড়ো দুঃখ দিয়েছে।

ইন্দ্রকুমার। জয়ের ভাগ না নিয়েই সে যদি পালিয়ে থাকে তাতে এমনি কী ক্ষতি হয়েছে দাদা!

যুবরাজ। না ভাই, আমরা তিন ভাই একত্রে বেরিয়েছি, বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ আমরা ভাগ করে ভোগ না করতে পারলে আমার তো মনে দুঃখ থেকে যাবে। রাজধর যদি মাথা হেঁট করে বাড়ি ফেরে, আমাদের সৌভাগ্যে যদি তার মুখ বিমর্ষ হয়, তা হলে এই কীর্তি আমাকে কিছুমাত্র সুখ দেবে না।— ঐ-যে ঘোড়া ছুটিয়ে সেনাপতি সাহেব আসছেন।

ইশা খাঁর প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার। খাঁ সাহেব, শত্রুসৈন্য হঠাৎ যুদ্ধ থামিয়ে দিলে কেন তার কোনো খবর পেয়েছ?

ইশা খাঁ। পেয়েছি বৈকি। রাজধর আরাকান-রাজকে বন্দী করেছে।

ইন্দ্রকুমার। রাজধর! মিথ্যা কথা!

ইশা খাঁ। যা মিথ্যা হওয়া উচিত ছিল এক-এক সময় তাও সত্য হয়ে ওঠে। আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লার দূতেরা এক-এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে, শয়তান তখন সমস্ত হিসাব উলটা করে দিয়ে যায়।

ইন্দ্রকুমার। শয়তানও কি রাজধরকে জিতিয়ে দিতে পারে!

ইশা খাঁ। একবার তো জিতিয়েছিল সেই অস্ত্রপরীক্ষার সময়— এবারও সেই শয়তান জিতিয়েছে।

যুবরাজ। সেনাপতি সাহেব, তুমি রাজধরের উপর রাগ কোরো না। সে যদি জিতে থাকে তাতে তো আমাদেরই জিত। কখন সে যুদ্ধ করলে, কখন বা বন্দী করলে, আমরা তো জানতে পারি নি।

ইশা খাঁ। কাল সন্ধ্যার পরে আমরা যখন যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে শিবিরে ফিরে এলেম তখন সে অন্ধকারে গোপনে নদী পার হয়ে হঠাৎ আরাকান-রাজের শিবির আক্রমণ করে তাঁকে বন্দী করেছে। আমাদের সাহায্য করবার জন্যে আমি তাকে যেখানে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলুম সেখানে সে ছিলই না। আমি সেনাপতি, আমার আদেশ সে মান্যই করে নি।

ইন্দ্রকুমার। অসহ্য! এজন্যে তার শাস্তি পাওয়া উচিত।

ইশা খাঁ। শুধু তাই! যুবরাজ উপস্থিত থাকতে সে কিনা নিজের ইচ্ছামত সন্ধিপত্র রচনা করেছে!

ইন্দ্রকুমার। এর শাস্তি না দিলে অন্যায় হবে।

ইশা খাঁ। তোমার দাদাকে এই সহজ কথাটি বুঝিয়ে দাও দেখি।

রাজধরের প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার। রাজধর! তুমি কাপুরুষতা প্রকাশ করেছ।

রাজধর। তোমার মতো যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পুরুষকার প্রকাশ করতে আমি এত দূরে আসি নি— আমি যুদ্ধ জয় করতে এসেছিলুম।

ইন্দ্রকুমার। তুমি যুদ্ধ করেছ? এবং জয় করেছ! জয়লক্ষ্মীর মুখ যে লজ্জায় লাল করে তুলেছ!

রাজধর। তা হতে পারে, সেটা প্রণয়ের লজ্জা। কিন্তু তিনি যে আমাকে বরণ করেছেন তার সাক্ষী এই।

ইন্দ্রকুমার। এ মুকুট কার?

রাজধর। এ মুকুট আমার। এ আমার জয়ের পুরস্কার।

ইন্দ্রকুমার। যুদ্ধ থেকে পালিয়েছ তুমি, তুমি পুরস্কার পাবে কিসের! এ মুকুট যুবরাজ পরবেন।

রাজধর। আমি জিতে এনেছি, আমিই পরব।

যুবরাজ। রাজধর ঠিক কথাই বলছেন। ওঁর জয়ের ধন তো উনিই পরবেন।

ইশা খাঁ। সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করে উনি অন্ধকারে শৃগালবৃত্তি অবলম্বন করলেন— আর, উনি পরবেন মুকুট! ভাঙা হাঁড়ির কানা পরে যদি দেশে যান তবেই ওঁকে সাজবে।

রাজধর। আমি যদি না থাকতুম ভাঙা হাঁড়ির কানা তোমাদের পরতে হত। এতক্ষণ থাকতে কোথায়?

ইন্দ্রকুমার। যেখানেই থাকি তোমার মতো পালিয়ে থাকতুম না।

যুবরাজ। ইন্দ্রকুমার, তুমি অন্যায় বলছ ভাই। সত্য বলতে কি, রাজধর না থাকলে আজ আমাদের বিপদ হত।

ইন্দ্রকুমার। কিচ্ছু বিপদ হত না। রাজধর সৈন্য লুকিয়ে রেখেই আমাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। রাজধর না থাকলে এ মুকুট আমি যুদ্ধ করে আনতুম। রাজধর চুরি করে এনেছে। দাদা, এ মুকুট এনে আমি তোমাকেই পরাতুম, নিজে পরতুম না।

যুবরাজ। (রাজধরের প্রতি) ভাই, তুমিই আজ জিতেছ। তুমি না থাকলে অল্প সৈন্য নিয়ে আমাদের কী বিপদ হত বলা যায় না। এ মুকুট আমি তোমাকেই পরিয়ে দিচ্ছি।

ইন্দ্রকুমার। (রুদ্ধকণ্ঠে) রাজধর ক্ষাত্রধর্ম লঙ্ঘন করেছে ব'লে তোমার কাছ থেকে আজ পুরস্কার পেলে, আর আমি-যে প্রাণকে তুচ্ছ করে বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলুম তোমার মুখ থেকে একটা প্রশংসার কথাও শুনতে পেলুম না! এমন কথা তোমার মুখ থেকে আজ শুনতে হল যে, রাজধর না থাকলে কেউ তোমাকে বিপদ হতে উদ্ধার করতে পারত না! কেন দাদা, আমি কি প্রত্যুষ থেকে আর সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করি নি! আমি কি রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছিলুম! আমি কি শত্রুসৈন্যের বেষ্টন ছিন্ন করে তোমার সাহায্যের জন্যে আসি নি! কী দেখে তুমি বললে তোমার স্নেহের রাজধর ছাড়া কেউ তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারত না!

যুবরাজ। ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলছি নে।

ইন্দ্রকুমার। থাক্ দাদা, থাক্। আর কিছুই বলতে হবে না। রাজধরের মতো এমন অসাধারণ বীরকে যখন তুমি সহায় পেয়েছ তখন আমার আর প্রয়োজন নেই— আমি চললেম।

যুবরাজ। ভাই, আবার! আবার তুমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছ!

ইন্দ্রকুমার। যেখানে আমার প্রয়োজন নেই সেখানে আমার পক্ষে থাকাই অপমান!

[প্রস্থান

ইশা খাঁ। যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাউকে দেবার অধিকার নেই। আমি সেনাপতি, আমি যাকে দেব এ তারই হবে।

রাজধরের মাথা হইতে মুকুট লইয়া যুবরাজকে পরাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন

যুবরাজ। (সরিয়া গিয়া) না, এ মুকুট আমি নিতে পারি নে।

ইশা খাঁ। তবে থাক্। এ মুকুট কেউ পাবে না। এ কর্ণফুলির জলে যাক। (মুকুট নিক্ষেপ) রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন, উনি শাস্তির যোগ্য।

রাজধর। দাদা, তুমি সাক্ষী রইলে। এ আমি ভুলব না।

যুবরাজ। এইটেই কি সকলের চেয়ে মনে রাখবার কথা! মুকুটটাও যদি জলে গিয়ে থাকে তবে ওর সমস্ত লাঞ্ছনাও যাক। তোমারও যা ভোলবার ভোলো, আমাদেরও যা ভোলবার ভুলে যাই।— দেখি, ইন্দ্রকুমার সত্যিই রাগ করে আমাদের ছেড়ে চলে গেল কি না।

পঞ্চম দৃশ্য

শিবির

রাজধর ও ধুরন্ধর

রাজধর। ধুরন্ধর, আমার মুকুট যেখানে গিয়েছে আমাদের যুদ্ধজয়কেও সেই কর্ণফুলির জলে জলাঞ্জলি দেব।

ধুরন্ধর। আবার হারবে নাকি?

রাজধর। হাঁ, এবার হেরে জিতব। ইন্দ্রকুমারের অহংকারকে ধুলোয় না লুটিয়ে দিয়ে আমি ফিরব না। আমার হাতের জিতকে তিনি গ্রহণ করবেন না! দেখি, এবার নিজে তিনি কেমন জিততে পারেন।

ধুরন্ধর। অত বেশি নিশ্চিন্ত হোয়ো না, দৈবাৎ জিতে যেতেও পারে। সত্যি কথায় রাগ করলে চলবে না, যুদ্ধবিদ্যাটা ইন্দ্রকুমার একটু শিখেছে।

রাজধর। আচ্ছা, সে-সব তর্ক পরে হবে। এখন তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। আরাকান-রাজ সৈন্য নিয়ে কাল প্রাতেই যাত্রা করবেন। কথা আছে যতদিন না তিনি চট্টগ্রামের সীমানা পেরিয়ে যাবেন ততদিন তাঁর সেনাপতিরা আমার শিবিরে বন্দী থাকবেন। তিনি শিবির তোলবার পূর্বেই আজ রাত্রে গোপনে তাঁর কাছে তুমি আমার এই চিঠিখানি নিয়ে যাবে।

ধুরন্ধর। চিঠিতে কী আছে সেটা তো আমার জানা ভালো। কেননা, যদি দুটো-একটা কথা বলবার দরকার হয় তা হলে ব'লে কাজটা চুকিয়ে আসতে পারব।

রাজধর। আমি লিখেছি আমি অপমানিত হয়েছি, এইজন্য আমার ভাইদের কাছ থেকে আমি অবসর নিলুম। আমার পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি গৃহে ফেরবার ছলে দূরে চলে যাব, ইন্দ্রকুমারও দাদার উপর অভিমান করে চলে গেছে, সৈন্যেরাও যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে জেনে ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে— এই অবকাশে যদি আরাকান-রাজ সহসা আক্রমণ করেন তা হলে ত্রিপুরার সৈন্যদের নিশ্চয় হার হবে।

ধুরন্ধর। হার তো হবে। তার পরে? তুমি-সুদ্ধ শেষে হায় হায় করে মরবে না তো! আগুন যদি লাগাতে হয় তো নিজের ঘরের চালটা সামলে লাগাতে হবে।

রাজধর। আমাকে সাবধান করে দেবার জন্যে আর-কারও বুদ্ধির প্রয়োজন হবে না। তুমি প্রস্তুত হও গে— দেখো, কেউ যেন জানতে না পারে। আমার সৈন্যেরা যদি কোনোমতে সন্দেহ করে তা হলে সমস্তই পণ্ড হবে।

ধুরন্ধর। দেখো রাজধর, আমাকে সাবধান করে দেবার জন্যেও আর-কারও বুদ্ধির প্রয়োজন হবে না— তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রণক্ষেত্র

ইশা খাঁ ও যুবরাজ

ইশা খাঁ। যুবরাজ, আল্লাকে স্মরণ করো। আজ বড়ো শক্ত সময় এসেছে।

যুবরাজ। শক্তটা কিসের খাঁ সাহেব! ভগবানের যখন ইচ্ছা হয় তখন মরাও শক্ত নয়, বাঁচাও শক্ত নয়— সবই সহজ।

ইশা খাঁ। মহারাজ আমার হাতে তোমাদের দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেইজন্যেই মনে আক্ষেপ হচ্ছে। নইলে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু তো বিবাহশয্যায় নিদ্রা। যুবরাজ, তুমি পালাবার চেষ্টা করো— যুদ্ধের ভার আমার উপর রইল।

যুবরাজ। তুমি আমাদের অস্ত্রগুরু, তোমার মুখে এ উপদেশ সাজে না। তা ছাড়া পথই বা কোথায়? আজ মরবার যেমন চমৎকার সুযোগ হয়েছে পালাবার তেমন নয়।

ইশা খাঁ। কিন্তু বাবা, মনের মধ্যে একটা আগুন জ্বলছে। ইন্দ্রকুমার যে অভিমান করে দূরে চলে গেল, তার এই অপরাধের শাস্তি দেবার জন্যে আমি হয়তো বেঁচে থাকব না।

যুবরাজ। যদি বেঁচে না থাক সেনাপতি, তা হলে তার শাস্তি আরো ঢের বেশি হবে। সে-যে তোমাকে পিতার মতো জানে।

ইশা খাঁ। আল্লা! সে কথা সত্য। বাবা, আজ বুঝছি আমার সময় হবে না। কিন্তু যদি তোমার সুযোগ হয় তবে তাকে বোলো, যদি ইশা খাঁ বেঁচে থাকত তবে তাকে শাস্তি দিত, কিন্তু মরবার আগে তাকে ক্ষমা করে মরেছে। বাস, আর সময় নেই— চললুম বাবা। এসো, একবার আলিঙ্গন করে যাই। আল্লার হাতে দিয়ে গেলুম, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।

যুবরাজ। খাঁ সাহেব, কতদিন কত অপরাধ করেছি, আজ সমস্ত মার্জনা করে যাও।

ইশা খাঁ। বাবা, জন্মকাল থেকে তোমাকে দেখছি, কোনোদিন কোনো অপরাধ তুমি জমতে দাও নি; হাতে হাতে সমস্তই নিকাশ করে দিয়েছ— আজ মার্জনা করব এমন তো কিছুই রাখ নি। তোমার নির্মল প্রাণ আজ আল্লা যদি নেন তবে তাঁর স্বর্গোদ্যানের কোনো ফুলের কাছেই সে ম্লান হবে না।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণক্ষেত্র

সৈন্যদল

প্রথম সৈনিক। এ কি সত্যি?

দ্বিতীয় সৈনিক। কী জানি, ভাই, শুনছি তো!

প্রথম। তবে তো সর্বনাশ হবে।

[দ্রুত প্রস্থান

দ্বিতীয় দলের প্রবেশ

প্রথম। কে বললে রে, কে বললে?

দ্বিতীয়। আমাদের উমেশ বললে।

প্রথম। কী জানি ভাই, শুনে যেন মাথায় বজ্রাঘাত হল, ভালো করে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না।

দ্বিতীয়। চল্‌, ভালো করে খোঁজ করে আসি গে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দলের প্রবেশ

প্রথম। আমরা তাঁর হাতিকে দেখেছি— হাওদা খালি, মাহুত নেই। প্রভুকে হারিয়ে সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দ্বিতীয়। আমাদেরও যে সেই দশা হয়েছে।

তৃতীয়। কোন্‌ দিকে পড়েছেন কেউ দেখে নি?

প্রথম। তা তো কেউ বলতে পারে না।

দ্বিতীয়। আমাদের শিবু বলছিল, যুবরাজকে যখন বাণ এসে লাগল তখন মাহুত তাঁর হাতি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছিল, পালাবার সময় মাহুত মারা যায়— তার পরে যুবরাজ যে সেই হাতির উপর থেকে কোন্‌খানে পড়ে গিয়েছেন তা তো কেউ বলতে পারে না।

আর-এক দলের প্রবেশ

চতুর্থ। ওরে, সর্বনাশ হয়ে গেল যে রে! কুমার ইন্দ্রকুমারকে কি কেউ খবর দিতে ছোটে নি?

তৃতীয়। অনেকক্ষণ গিয়েছে, আরাকানের ফৌজ আমাদের ফাঁকি দিয়ে আক্রমণ করতেই তখনই লোক গেছে— তাঁকে খুঁজে পেলে তো হয়।

দ্বিতীয়। কুমার রাজধর কি এখনো খবর পান নি?

চতুর্থ। তিনি কোথায় আছেন খবরই পাওয়া গেল না, বোধ করি ত্রিপুরার দিকে চলে গেছেন। যুবরাজের সংবাদ জানতে পেলে এতক্ষণে তিনিও দৌড়ে ছুটে আসতেন।

প্রথম। আমরা কোন্‌ মুখে দেশে ফিরব!

তৃতীয়। ফিরব কেন, মরা যাক।

চতুর্থ। যুদ্ধই ফুরিয়ে গেল তো মরব কী করে!

অপর ব্যক্তির প্রবেশ

অপর। ওরে, করছিস কী! সর্বনাশ হল যে— একবার খোঁজ করবি চল্‌।

চতুর্থ। হাঁ রে, চল্‌— আমরা ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাই।

তৃতীয়। আমাদের ভাগ্যে তিনি কি বেঁচে আছেন!

দ্বিতীয়। আমি ভাবছি, ইন্দ্রকুমার যখন এ খবর শুনবেন তখন তিনি কি প্রাণ রাখতে পারবেন!

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণক্ষেত্র

ইন্দ্রকুমার ও সৈনিক

ইন্দ্রকুমার। কোথায়— কোথায়— কোথায়? ওরে, দাদা কোথায়?

সৈনিক। তাঁকেই তো খুঁজছি প্রভু।

ইন্দ্রকুমার। আর, ইশা খাঁ?

সৈনিক। আজ বেলা চার প্রহরের সময় যুবরাজ স্বহস্তে ইশা খাঁর কবরে মাটি দিয়েছেন, সেই মাটিতে তাঁর নিজেরও রক্ত তখন মিশছিল।

ইন্দ্রকুমার। ধিক্ ধিক্ ধিক্ ইন্দ্রকুমার ! ধিক্ তোকে ! ধিক্ তোর চণ্ডাল রাগকে ! দাদা ! দাদা ! এই নরাধমকে একবার মাপ চাইতেও সময় দেবে না ? (উচ্চৈঃস্বরে) দাদা ! সাড়া দাও। কেবল এক মুহূর্তের জন্যেও সাড়া দাও। ওরে, আর কেউ নেই নাকি ? যে যেখানে আছিস সকলে মিলে তাঁকে খোঁজ— আজ আমার দাদাকে চাইই যে।

দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ

দ্বিতীয়। এই দিকে চলুন কুমার। তাঁর দেখা পেয়েছি।
ইন্দ্রকুমার। কোথায় ? কোথায় ?
দ্বিতীয়। কর্ণফুলির তীরে সেই অর্জুন গাছের তলায়।
ইন্দ্রকুমার। সত্য করে বল্, তিনি কি—
দ্বিতীয়। তিনি বেঁচে আছেন, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে রয়েছেন।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণফুলির তীর। তরুতলে জ্যোৎস্নার ক্ষীণালোকে

যুবরাজ। ওরে, সরিয়ে দে রে, একটু সরিয়ে দে। গাছের ডালগুলো একটু সরিয়ে দে, আজ আকাশের চাঁদকে একটু দেখে নিই। কেউ নেই ! এ কি গাছেরই ছায়া ! না আমার চোখের উপরে ছায়া পড়ে আসছে ! এখনো কর্ণফুলির স্রোতের শব্দ তো শুনতে পাচ্ছি ! এই শব্দটিতেই কি পৃথিবীর শেষ বিদায়সম্ভাষণ শুনব ! ইন্দ্রকুমার ! ভাই ইন্দ্রকুমার ! এখনো তোমার রাগ গেল না !

ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ

ইন্দ্রকুমার। দাদা ! দাদা !
যুবরাজ। আঃ, বাঁচলুম ভাই ! তুমি আসবে জেনেই এত দেরি করেই বেঁচে ছিলুম। তুমি অভিমান করে গিয়েছিলে বলেই আমি যেতে পাচ্ছিলুম না। কিন্তু, অনেক রাত হয়ে গেছে ভাই, এবার তবে ঘুমোই, মা কোল পেতেছেন।
ইন্দ্রকুমার। দাদা ! মার্জনা করলে কি ?
যুবরাজ। সমস্তই, সমস্তই ! এখানকার যা-কিছু ছিল এই রক্ত দিয়ে মার্জনা করে গেলুম। কিছুই বাকি রাখি নি। কেবল একটি দুঃখ রইল, মহারাজের কাছে খবর পাঠাতে হবে আমার পরাজয় হয়েছে।
ইন্দ্রকুমার। পরাজয় তোমার হয় নি দাদা, আমারই পরাজয় হয়েছে।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। কুমার রাজধর যুবরাজের পদধূলি নেবার জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে পাঠিয়েছেন।
ইন্দ্রকুমার। কখনো না ! কিছুতেই না !
যুবরাজ। ডাকো, ডাকো তাকে, ডাকো !
ইন্দ্রকুমার। (রাগিয়া) দাদা— রাজধরকে—
যুবরাজ। আবার ভাই ! আবার !
ইন্দ্রকুমার। না, না, না, আর নয়। আমার আর রাগ নেই।

রাজধরের প্রবেশ ও প্রণাম

রাজধর। আমি নরাধম। এ মুকুট তোমার পায়ে রাখলুম। এ তোমারই।
যুবরাজ। আমার সময় নেই। ইন্দ্রকুমারকে দাও ভাই।
রাজধর। দাদার আদেশ মাথায় করলেম। এ মুকুট তুমি নাও।
ইন্দ্রকুমার। আমি পরাজিত, এ মুকুট আমার নয়। এ আমি তোমাকেই পরিয়ে দিলুম।— দাদা!

উপন্যাস ও গল্প

চতুরঙ্গ

এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ।
'জ্যাঠামশায়' 'শচীশ' 'দামিনী' ও
'শ্রীবিলাস' ইহার চারি অংশ।

চতুরঙ্গ

জ্যাঠামশায়

আমি পাড়াগাঁ হইতে কলিকাতায় আসিয়া কলেজে প্রবেশ করিলাম। শচীশ তখন বি· এ· ক্লাসে পড়িতেছে। আমাদের বয়স প্রায় সমান হইবে।

শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক— তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম; তাই এক মুহূর্তে তাহাকে ভালোবাসিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, শচীশের সঙ্গে যারা পড়ে তাদের অনেকেরই তার উপরে একটা বিষম বিদ্বেষ। আসল কথা, যাহারা দশের মতো, বিনা কারণে দশের সঙ্গে তাহাদের বিরোধ বাধে না। কিন্তু মানুষের ভিতরকার দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা ভেদ করিয়া যখন দেখা দেয় তখন অকারণে কেহ-বা তাহাকে প্রাণপণে পূজা করে, আবার অকারণে কেহ-বা তাহাকে প্রাণপণে অপমান করিয়া থাকে।

আমার মেসের ছেলেরা বুঝিয়াছিল, আমি শচীশকে মনে মনে ভক্তি করি। এটাতে সর্বদাই তাহাদের যেন আরামের ব্যাঘাত করিত। তাই আমাকে শুনাইয়া শচীশের সম্বন্ধে কটু কথা বলিতে তাহাদের একদিনও কামাই যাইত না। আমি জানিতাম, চোখে বালি পড়িলে রগড়াইতে গেলেই বাজে বেশি; কথাগুলো যেখানে কর্কশ সেখানে জবাব না করাই ভালো। কিন্তু, একদিন শচীশের চরিত্রের উপর লক্ষ করিয়া এমন-সব কুৎসা উঠিল, আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার মুশকিল, আমি শচীশকে জানিতাম না। অপর পক্ষে কেহ-বা তার পাড়াপড়শি, কেহ-বা তার কোনো-একটা সম্পর্কে কিছু-একটা। তারা খুব তেজের সঙ্গে বলিল, এ একেবারে খাঁটি সত্য; আমি আরো তেজের সঙ্গে বলিলাম, আমি এর সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না। তখন মেসসুদ্ধ সকলে আস্তিন গুটাইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি তো ভারি অভদ্র লোক হে!

সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া আমার কান্না আসিল। পরদিন ক্লাসের একটা ফাঁকে শচীশ যখন গোলদিঘির ছায়ায় ঘাসের উপর আধ-শোওয়া অবস্থায় একটা বই পড়িতেছে আমি বিনা পরিচয়ে তার কাছে আবোল-তাবোল কী যে বকিলাম তার ঠিক নাই। শচীশ বই মুড়িয়া আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার চোখ যারা দেখে নাই তারা বুঝিবে না এই দৃষ্টি যে কী।

শচীশ বলিল, যারা নিন্দা করে তারা নিন্দা ভালোবাসে বলিয়াই করে, সত্য ভালোবাসে বলিয়া নয়। তাই যদি হইল, তবে কোনো একটা নিন্দা যে সত্য নয় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিয়া লাভ কী?

আমি বলিলাম, তবু দেখুন, মিথ্যাবাদীকে—

শচীশ বাধা দিয়া বলিল, ওরা তো মিথ্যাবাদী নয়। আমাদের পাড়ায় পক্ষাঘাতে একজন কলুর ছেলের গা-হাত কাঁপে, সে কাজ করিতে পারে না, শীতের দিনে আমি তাকে একটা দামি কম্বল দিয়াছিলাম। সেইদিন আমার চাকর শিবু রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে আসিয়া বলিল, বাবু, ও বেটার কাঁপুনি-টাপুনি সমস্ত বদমায়েশি!— আমার মধ্যে কিছু ভালো আছে এ কথা যারা উড়াইয়া দেয় তাদের সেই শিবুর দশা। তারা যা বলে তা সত্যই বিশ্বাস করে। আমার ভাগ্যে একটা-কোনো দামি কম্বল অতিরিক্ত জুটিয়াছিল, রাজ্যসুদ্ধ শিবুর দল নিশ্চয় স্থির করিয়াছে, সেটাতে আমার অধিকার নাই। আমি তা লইয়া তাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে লজ্জা বোধ করি।

ইহার কোনো উত্তর না দিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, এরা যে বলে আপনি নাস্তিক, সে কি সত্য ?

শচীশ বলিল, হাঁ, আমি নাস্তিক।

আমার মাথা নিচু হইয়া গেল। আমি মেসের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিলাম যে, শচীশ কখনোই নাস্তিক হইতে পারে না।

শচীশ সম্বন্ধে গোড়াতেই আমি দুইটা মস্ত ঘা খাইয়াছি। আমি তাহাকে দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম, সে ব্রাহ্মণের ছেলে। মুখখানি যে দেবমূর্তির মতো সাদা-পাথরে কোঁদা। তার উপাধি শুনিয়াছিলাম মল্লিক ; আমাদেরও গাঁয়ে মল্লিক-উপাধিধারী এক ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু জানিয়াছি, শচীশ সোনার-বেনে। আমাদের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর— জাতি-হিসাবে সোনার-বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি। আর, নাস্তিককে নরঘাতকের চেয়ে, এমন-কি, গো-খাদকের চেয়েও পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতাম।

কোনো কথা না বলিয়া শচীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তখনো দেখিলাম মুখে সেই জ্যোতি, যেন অন্তরের মধ্যে পূজার প্রদীপ জ্বলিতেছে।

কেহ কোনোদিন মনে করিতে পারিত না আমি কোনো জন্মে সোনার-বেনের সঙ্গে একসঙ্গে আহার করিব এবং নাস্তিক্যে আমার গোঁড়ামি আমার গুরুকে ছাড়াইয়া উঠিবে ! ক্রমে আমার ভাগ্যে তাও ঘটিল।

উইল্‌কিন্‌স্ আমাদের কালেজের সাহিত্যের অধ্যাপক। যেমন তাঁর পাণ্ডিত্য, ছাত্রদের প্রতি তেমনি তাঁর অবজ্ঞা। এদেশী কালেজে বাঙালি ছেলেকে সাহিত্য পড়ানো শিক্ষকতার কুলিমজুরি করা, ইহাই তাঁর ধারণা। এইজন্য মিলটন-শেক্‌স্‌পীয়র পড়াইবার ক্লাসেও তিনি ইংরেজি বিড়াল শব্দের প্রতিশব্দ বলিয়া দিতেন : মার্জারজাতীয় চতুষ্পদ, a quadruped of feline species। কিন্তু নোট লওয়া সম্বন্ধে শচীশের মাপ ছিল। তিনি বলিতেন, শচীশ, তোমাকে এই ক্লাসে বসিতে হয় সে লোকসান আমি পূরণ করিয়া দিব, তুমি আমার বাড়ি যাইয়ো, সেখানে তোমার মুখের স্বাদ ফিরাইতে পারিবে।

ছাত্রেরা রাগ করিয়া বলিত, শচীশকে সাহেব যে এত পছন্দ করে তার কারণ ওর গায়ের রঙ কটা, আর ও সাহেবের মন ভোলাইবার জন্য নাস্তিকতা ফলাইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো বুদ্ধিমান আড়ম্বর করিয়া সাহেবের কাছ হইতে পজিটিভিজ্‌ম্ সম্বন্ধে বই ধার চাহিতে গিয়াছিল ; সাহেব বলিয়াছিলেন, তোমরা বুঝিবে না। তারা যে নাস্তিকতা-চর্চারও অযোগ্য এই কথায় নাস্তিকতা এবং শচীশের বিরুদ্ধে তাহাদের ক্ষোভ কেবল বাড়িয়া উঠিতেছিল।

২

মত এবং আচরণ সম্বন্ধে শচীশের জীবনে নিন্দার কারণ যাহা যাহা আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া আমি লিখিলাম। ইহার কিছু আমার সঙ্গে তার পরিচয়ের পূর্বেকার অংশ, কিছু অংশ পরের।

জগমোহন শচীশের জ্যাঠা। তিনি তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়, তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধজাহাজের কাপ্তেনের যেমন জাহাজ চালানোর চেয়ে জাহাজ ডোবানোই বড়ো ব্যাবসা, তেমনি যেখানে সুবিধা সেইখানেই আস্তিক্যধর্মকে ডুবাইয়া দেওয়াই জগমোহনের ধর্ম ছিল। ঈশ্বরবিশ্বাসীর সঙ্গে তিনি এই পদ্ধতিতে তর্ক করিতেন—

ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া ;

সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে, ঈশ্বর নাই ;

অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে, ঈশ্বর নাই ;

অথচ, তোমরা তাঁর মুখের উপর জবাব দিয়া বলিতেছ যে, ঈশ্বর আছেন। এই পাপের শাস্তিস্বরূপে তেত্রিশ কোটি দেবতা তোমাদের দুই কান ধরিয়া জরিমানা আদায় করিতেছে।

বালক-বয়সে জগমোহনের বিবাহ হইয়াছিল। যৌবনকালে যখন তাঁর স্ত্রী মারা যান তার পূর্বেই তিনি ম্যাল্‌থস পড়িয়াছিলেন ; আর বিবাহ করেন নাই।

তাঁর ছোটো ভাই হরিমোহন ছিলেন শচীশের পিতা। তিনি তাঁর বড়ো ভাইয়ের এমনি উলটা প্রকৃতির যে, সে কথা লিখিতে গেলে গল্প সাজানো বলিয়া লোকে সন্দেহ করিবে। কিন্তু গল্পই লোকের বিশ্বাস কাড়িবার জন্য সাবধান হইয়া চলে, সত্যের সে দায় নাই বলিয়া সত্য অদ্ভুত হইতে ভয় করে না। তাই, সকাল এবং বিকাল যেমন বিপরীত, সংসারের বড়ো ভাই এবং ছোটো ভাই তেমনি বিপরীত— এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

হরিমোহন শিশুকালে অসুস্থ ছিলেন। তাগাতাবিজ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, সন্ন্যাসীর জটা-নিংড়ানো জল, বিশেষ বিশেষ পীঠস্থানের ধুলা, অনেক জাগ্রত ঠাকুরের প্রসাদ ও চরণামৃত, গুরু-পুরোহিতের অনেক টাকার আশীর্বাদে তাঁকে যেন সকল অকল্যাণ হইতে গড়বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

বড়ো বয়সে তার আর ব্যামো ছিল না, কিন্তু তিনি যে বড়োই কাহিল, সংসার হইতে এ সংস্কার ঘুচিল না। কোনোক্রমে তিনি বাঁচিয়া থাকুন, এর বেশি তাঁর কাছে কেহ কিছু দাবি করিত না। তিনিও এ সম্বন্ধে কাহাকেও নিরাশ করিলেন না, দিব্য বাঁচিয়া রহিলেন। কিন্তু শরীরটা যেন গেল-গেল এই ভাব করিয়া সকলকে শাসাইয়া রাখিলেন। বিশেষত তাঁর পিতার অল্প বয়সে মৃত্যুর নজিরের জোরে মা-মাসির সমস্ত সেবাযত্ন তিনি নিজের দিকে টানিয়া লইলেন। সকলের আগে তাঁর আহার, সকলের হইতে তাঁর আহারের আয়োজন স্বতন্ত্র, সকলের চেয়ে তাঁর কাজ কম, সকলের চেয়ে তাঁর বিশ্রাম বেশি। কেবল মা-মাসির নয়, তিনি যে তিন-ভুবনের সমস্ত ঠাকুর-দেবতার বিশেষ জিম্মায় এ তিনি কখনো ভুলিতেন না। কেবল ঠাকুর-দেবতা নয়, সংসারে যেখানে যার কাছে যে পরিমাণে সুবিধা পাওয়া যায় তাকে তিনি সেই পরিমাণেই মানিয়া চলিতেন ; থানার দারোগা, ধনী প্রতিবেশী, উচ্চপদের রাজপুরুষ, খবরের কাগজের সম্পাদক, সকলকেই যথোচিত ভয়ভক্তি করিতেন— গো-ব্রাহ্মণের তো কথাই নাই।

জগমোহনের ভয় ছিল উলটা দিকে। কারও কাছে তিনি লেশমাত্র সুবিধা প্রত্যাশা করেন এমন সন্দেহমাত্র পাছে কারও মনে আসে, এই ভয়ে ক্ষমতাশালী লোকদিগকে তিনি দূরে রাখিয়া চলিতেন। তিনি যে দেবতা মানিতেন না, তার মধ্যেও তাঁর ঐ ভাবটা ছিল। লৌকিক বা অলৌকিক কোনো শক্তির কাছে তিনি হাতজোড় করিতে নারাজ।

যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পূর্বে, হরিমোহনের বিবাহ হইয়া গেল। তিন মেয়ে, তিন ছেলের পরে শচীশের জন্ম। সকলেই বলিল, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে শচীশের চেহারার আশ্চর্য মিল। জগমোহনও তাকে এমনি করিয়া অধিকার করিয়া বসিলেন যেন সে তাঁরই ছেলে।

ইহাতে যেটুকু লাভ ছিল হরিমোহন প্রথমটা সেইটুকুর হিসাব খতাইয়া খুশি ছিলেন। কেননা, জগমোহন নিজে শচীশের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। ইংরেজি-ভাষায় অসামান্য ওস্তাদ বলিয়া জগমোহনের খ্যাতি। কাহারও মতে তিনি বাংলার মেকলে, কাহারও মতে বাংলার জন্‌সন্‌। শামুকের খোলার মতো তিনি যেন ইংরেজি বই দিয়া ঘেরা। নুড়ির রেখা ধরিয়া পাহাড়ে-ঝর্নার পথ যেমন চেনা যায় তেমনি বাড়ির মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ অংশে তাঁর চলাফেরা তাহা মেজে হইতে কড়ি পর্যন্ত ইংরেজি বইয়ের বোঝা দেখিলেই বুঝা যাইত।

হরিমোহন তাঁর বড়ো ছেলে পুরন্দরকে স্নেহের রসে একেবারে গলাইয়া দিয়াছেন। সে যাহা চাহিত তাহাতে তিনি না করিতে পারিতেন না। তার জন্য সর্বদাই তাঁর চোখে যেন জল ছল্‌ছল্‌ করিত। তাঁর মনে হইত, কোনো কিছুতে বাধা দিলে সে যেন বাঁচিবে না। পড়াশুনা কিছু তার হইলই না, সকাল সকাল বিবাহ হইয়া গেল এবং সেই বিবাহের চতুঃসীমানার মধ্যে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। হরিমোহনের পুত্রবধূ ইহাতে উদ্যমের সহিত আপত্তি প্রকাশ করিত এবং হরিমোহন তাঁর পুত্রবধূর উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিতেন, ঘরে তার উৎপাতেই তাঁর ছেলেকে বাহিরে সান্ত্বনার পথ খুঁজিতে হইতেছে।

এই-সকল কাণ্ড দেখিয়াই পিতৃস্নেহের বিষম বিপত্তি হইতে শচীশকে বাঁচাইবার জন্য জগমোহন তাহাকে নিজের কাছ হইতে একটুও ছাড়া দিলেন না। শচীশ দেখিতে দেখিতে অল্প বয়সেই ইংরেজি লেখায় পড়ায় পাকা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেইখানেই তো থামিল না। তার মগজের মধ্যে মিল-বেন্থামের অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া সে যেন নাস্তিকতার মশালের মতো জ্বলিতে লাগিল।

জগমোহন শচীশের সঙ্গে এমন চালে চলিতেন যেন সে তার সমবয়সী। গুরুজনকে ভক্তি করাটা তাঁর মতে একটা ঝুঁটা সংস্কার; ইহাতে মানুষের মনকে গোলামিতে পাকা করিয়া দেয়। বাড়ির কোনো-এক নূতন জামাই তাঁকে 'শ্রীচরণেষু' পাঠ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিল। তাহাকে তিনি নিম্নলিখিত প্রণালীতে উপদেশ দিয়াছিলেন : মাইডিয়ার নরেন, চরণকে শ্রী বলিলে যে কী বলা হয় তা আমিও জানি না, তুমিও জান না, অতএব ওটা বাজে কথা; তার পরে, আমাকে একেবারে বাদ দিয়া আমার চরণে তুমি কিছু নিবেদন করিয়াছ, তোমার জানা উচিত আমার চরণটা আমারই এক অংশ, যতক্ষণ ওটা আমার সঙ্গে লাগিয়া আছে ততক্ষণ উহাকে তফাত করিয়া দেখা উচিত না; তার পরে, ঐ অংশটা হাতও নয়, কানও নয়, ওখানে কিছু নিবেদন করা পাগলামি; তার পরে শেষ কথা এই যে আমার চরণসম্বন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করিলে ভক্তিপ্রকাশ করা হইতে পারে, কারণ কোনো কোনো চতুষ্পদ তোমাদের ভক্তিভাজন, কিন্তু ইহাতে আমার প্রাণিতত্ত্বঘটিত পরিচয় -সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতা সংশোধন করিয়া দেওয়া আমি উচিত মনে করি।

এমন-সকল বিষয়ে শচীশের সঙ্গে জগমোহন আলোচনা করিতেন যাহা লোকে সচরাচর চাপা দিয়া থাকে। এই লইয়া কেহ আপত্তি করিলে তিনি বলিতেন, বোলতার বাসা ভাঙিয়া দিলেই তবে বোলতা তাড়ানো যায়, তেমনি এ-সব কথায় লজ্জা করাটা ভাঙিয়া দিলেই লজ্জার কারণটাকে খেদানো হয়; শচীশের মন হইতে আমি লজ্জার বাসা ভাঙিয়া দিতেছি।

৩

লেখাপড়া-শেখা সারা হইল। এখন হরিমোহন শচীশকে তার জ্যাঠার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু বঁড়শি তখন গলায় বাধিয়াছে, বিঁধিয়াছে; তাই এক পক্ষের টান যতই বাড়িল অপর পক্ষের বাঁধনও ততই আঁটিল। ইহাতে হরিমোহন ছেলের চেয়ে দাদার উপরে বেশি রাগ করিতে লাগিলেন; দাদার সম্বন্ধে রঙ-বেরঙের নিন্দায় পাড়া ছাইয়া দিলেন।

শুধু যদি মত-বিশ্বাসের কথা হইত হরিমোহন আপত্তি করিতেন না; মুর্গি খাইয়া লোকসমাজে সেটাকে পাঁঠা বলিয়া পরিচয় দিলেও তিনি সহ্য করিতেন। কিন্তু ইহারা এত দূর গিয়াছিলেন যে, মিথ্যার সাহায্যেও ইহাদিগকে ত্রাণ করিবার উপায় ছিল না। যেটাতে সব চেয়ে বাধিল সেটা বলি :

জগমোহনের নাস্তিকধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা। সেই ভালো-করার মধ্যে অন্য যে-কোনো রস থাক্ একটা প্রধান রস এই ছিল যে, নাস্তিকের পক্ষে লোকের ভালো করার মধ্যে নিছক নিজের লোকসান ছাড়া আর কিছুই নাই— তাহাতে না আছে পুণ্য না আছে পুরস্কার, না আছে কোনো দেবতা বা শাস্ত্রের বক্‌শিশের বিজ্ঞাপন বা চোখ-রাঙানি। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনে আপনার গরজটা কী' তিনি বলিতেন, কোনো গরজ নাই, সেইটেই আমার সব চেয়ে বড়ো গরজ। তিনি শচীশকে বলিতেন, দেখ্ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।

'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনের' প্রধান চেলা ছিল তাঁর শচীশ। পাড়ায় চামড়ার গোটাকয়েক বড়ো আড়ত। সেখানকার যত মুসলমান ব্যাপারী এবং চামারদের লইয়া জ্যাঠায় ভাইপোয় মিলিয়া এমনি ঘনিষ্ঠ-রকমের হিতানুষ্ঠানে লাগিয়া গেলেন যে, হরিমোহনের ফোঁটাতিলক আগুনের শিখার মতো জ্বলিয়া তাঁর মগজের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইবার জো করিল। দাদার কাছে শাস্ত্র

বা আচারের দোহাই পাড়িলে উলটা ফল হইবে, এইজন্য তাঁর কাছে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অন্যায় অপব্যয়ের নালিশ তুলিলেন। দাদা বলিলেন, তুমি পেট-মোটা পুরুতপাণ্ডার পিছনে যে টাকাটা খরচ করিয়াছ আমার খরচের মাত্রা আগে সেই পর্যন্ত উঠুক তার পরে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হইবে।

বাড়ির লোক একদিন দেখিল, বাড়ির যে মহলে জগমোহন থাকেন সেই দিকে একটা বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইতেছে। তার পাচক এবং পরিবেশকের দল সব মুসলমান। হরিমোহন রাগে অস্থির হইয়া শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই নাকি যত তোর চামার বাবাদের ডাকিয়া এই বাড়িতে আজ খাওয়াইবি ?

শচীশ কহিল, আমার সম্বল থাকিলে খাওয়াইতাম, কিন্তু আমার তো পয়সা নাই। জ্যাঠামশায় উহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

পুরন্দর রাগিয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতেছিল। সে বলিতেছিল, কেমন উহারা এ বাড়িতে আসিয়া খায় আমি দেখিব।

হরিমোহন দাদার কাছে আপত্তি জানাইলে জগমোহন কহিলেন, তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ, আমি কথা কই না। আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব, ইহাতে বাধা দিয়ো না।

তোমার ঠাকুর !

হাঁ, আমার ঠাকুর।

তুমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছ ?

ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মান, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি ; তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়, তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।

তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা ?

হাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা। তাহাদের আশ্চর্য এই এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোনো দেবতা তাহা পারে না। আমি সেই আশ্চর্য রহস্য দেখিতে ভালোবাসি, তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি। দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে তুমি খুশি হইতে।

পুরন্দর তার জ্যাঠার কাছে গিয়া খুব চড়া গলায় কড়া কড়া কথা বলিল এবং জানাইল, আজ সে একটা বিষম কাণ্ড করিবে।

জগমোহন হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাঁদর, আমার দেবতা যে কতবড়ো জাগ্রত দেবতা তাহা তাঁর গায়ে হাত দিতে গেলেই বুঝিবি, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না।

পুরন্দর যতই বুক ফুলাইয়া বেড়াক সে তার বাবার চেয়েও ভিতু। যেখানে তার আবদার সেখানেই তার জোর। মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘাঁটাইতে সে সাহস করিল না, শচীশকে আসিয়া গালি দিল। শচীশ তার আশ্চর্য দুই চক্ষু দাদার মুখের দিকে তুলিয়া চাহিয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না। সেদিনকার ভোজ নির্বিঘ্নে চুকিয়া গেল।

৪

এইবার হরিমোহন দাদার সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। যাহা লইয়া ইঁহাদের সংসার চলে সেটা দেবত্র সম্পত্তি। জগমোহন বিধর্মী, আচারভ্রষ্ট, এবং সেই কারণে সেবায়েত হইবার অযোগ্য, এই বলিয়া জেলাকোর্টে হরিমোহন নালিশ রুজু করিয়া দিলেন। মাতব্বর সাক্ষীর অভাব ছিল না ; পাড়াসুদ্ধ লোক সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত।

অধিক কৌশল করিতে হইল না। জগমোহন আদালতে স্পষ্টই কবুল করিলেন, তিনি দেবদেবী মানেন না ; খাদ্য-অখাদ্য বিচার করেন না ; মুসলমান ব্রহ্মার কোন্‌খান হইতে জন্মিয়াছে তাহা তিনি জানেন না এবং তাহাদের সঙ্গে তাঁর খাওয়াদাওয়া চলার কোনো বাধা নাই।

মুনসেফ জগমোহনকে সেবায়েত-পদের অযোগ্য বলিয়া রায় দিলেন। জগমোহনের পক্ষের আইনজ্ঞরা আশা দিলেন এ রায় হাইকোর্টে টিকিবে না। জগমোহন বলিলেন, আমি আপিল করিব না। যে-ঠাকুরকে আমি মানি না তাহাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। দেবতা মানিবার মতো বুদ্ধি যাহাদের, দেবতাকে বঞ্চনা করিবার মতো ধর্মবুদ্ধিও তাহাদেরই।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিল, খাইবে কী ?

তিনি বলিলেন, কিছু না খাবার জোটে তো খাবি খাইব।

এই মকদ্দমা জয় লইয়া আস্ফালন করা হরিমোহনের ইচ্ছা ছিল না। তাঁর ভয় ছিল পাছে দাদার অভিশাপের কোনো কুফল থাকে। কিন্তু পুরন্দর একদিন চামারদের বাড়ি হইতে তাড়াইতে পারে নাই, সেই আগুন তার মনে জ্বলিতেছিল। কার দেবতা যে জাগ্রত এইবার সেটা তো প্রত্যক্ষ দেখা গেল। তাই পুরন্দর ভোরবেলা হইতে ঢাক-ঢোল আনাইয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিল। জগমোহনের কাছে তাঁর এক বন্ধু আসিয়াছিল, সে কিছু জানিত না। সে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারখানা কী হে ? জগমোহন বলিলেন, আজ আমার ঠাকুরের ধুম করিয়া ভাসান হইতেছে, তারই এই বাজনা। দুই দিন ধরিয়া পুরন্দর নিজে উদ্‌যোগ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দিল। পুরন্দর যে এই বংশের কুলপ্রদীপ, সকলে তাহা ঘোষণা করিতে লাগিল।

দুই ভাইয়ে ভাগাভাগি হইয়া কলিকাতার ভদ্রাসন-বাটীর মাঝামাঝি প্রাচীর উঠিয়া গেল।

ধর্ম সম্বন্ধে যেমনি হউক, খাওয়াপরা টাকাকড়ি সম্বন্ধে মানুষের একটা স্বাভাবিক সুবুদ্ধি আছে বলিয়া মানবজাতির প্রতি হরিমোহনের একটা শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিশ্চয় ঠাওরাইয়াছিলেন তাঁর ছেলে এবার নিঃস্ব জগমোহনকে ছাড়িয়া অন্তত আহারের গন্ধে তাঁর সোনার খাঁচাকলের মধ্যে ধরা দিবে। কিন্তু বাপের ধর্মবুদ্ধি ও কর্মবুদ্ধি কোনোটাই পায় নাই, শচীশ তার পরিচয় দিল। সে তার জ্যাঠার সঙ্গেই রহিয়া গেল।

জগমোহনের চিরকাল শচীশকে এমনি নিতান্তই আপনার বলিয়া জানা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে আজ এই ভাগাভাগির দিনে শচীশ যে তাঁরই ভাগে পড়িয়া গেল ইহাতে তাঁর কিছুই আশ্চর্য বোধ হইল না।

কিন্তু হরিমোহন তাঁর দাদাকে বেশ চিনিতেন। তিনি লোকের কাছে রটাইতে লাগিলেন যে শচীশকে আটকাইয়া জগমোহন নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবার কৌশল খেলিতেছেন। তিনি অত্যন্ত সাধু হইয়া প্রায় অশ্রুনেত্রে সকলকে বলিলেন, দাদাকে কি আমি খাওয়াপরার কষ্ট দিতে পারি ? কিন্তু তিনি আমার ছেলেকে হাতে রাখিয়া এই-যে শয়তানি চাল চালিতেছেন ইহা আমি কোনোমতেই সহিব না। দেখি তিনি কতবড়ো চালাক।

কথাটা বন্ধুপরম্পরায় জগমোহনের কানে যখন পৌঁছিল তখন তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। এমন কথা যে উঠিতে পারে তাহা তিনি ভাবেন নাই বলিয়া নিজেকে নির্বোধ বলিয়া ধিক্‌কার দিলেন। শচীশকে বলিলেন, গুডবাই শচীশ !

শচীশ বুঝিল, যে বেদনা হইতে জগমোহন এই বিদায়বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তার উপরে আর কথা চলিবে না। আজ আঠারো বৎসর আজন্মকালের নিরবচ্ছিন্ন সংস্রব হইতে শচীশকে বিদায় লইতে হইল।

শচীশ যখন তার বাক্স ও বিছানা গাড়ির মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাঁর কাছ হইতে চলিয়া গেল জগমোহন দরজা বন্ধ করিয়া তাঁর ঘরের মধ্যে মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তাঁর পুরাতন চাকর ঘরে আলো দিবার জন্য দরজায় ঘা দিল— তিনি সাড়া দিলেন না।

হায় রে, প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন ! মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটে না।

মাথা গণনায় যে মানুষটি কেবল এক, হৃদয়ের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত। শচীশকে কি এক দুই তিনের কোঠায় ফেলা যায় ? সে যে জগমোহনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছাইয়া ফেলিল।

শচীশ কেন গাড়ি আনাইয়া তার উপরে আপনার জিনিস-পত্র তুলিল জগমোহন তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না। বাড়ির যে বিভাগে তার বাপ থাকেন শচীশ সে দিকে গেল না, সে তার এক বন্ধুর মেসে গিয়া উঠিল। নিজের ছেলে যে কেমন করিয়া এমন পর হইয়া যাইতে পারে তাহা স্মরণ করিয়া হরিমোহন বারংবার অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল।

বাড়ি ভাগ হইয়া যাইবার পর পুরন্দর জেদ করিয়া তাহাদের অংশে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করাইল এবং সকালে সন্ধ্যায় শাঁখঘণ্টার আওয়াজে জগমোহনের কান ঝালাপালা হইয়া উঠিতেছে ইহাই কল্পনা করিত এবং সে লাফাইতে থাকিত।

শচীশ প্রাইভেট টুইশনি লইল এবং জগমোহন একটা এন্‌ট্রেন্স স্কুলের হেড্‌মাস্টারি জোগাড় করিলেন। হরিমোহন এবং পুরন্দর এই নাস্তিক শিক্ষকের হাত হইতে ভদ্রঘরের ছেলেদিগকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৫

কিছুকাল পরে শচীশ একদিন দোতলায় জগমোহনের পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত। ইহাদের মধ্যে প্রণাম করিবার প্রথা ছিল না। জগমোহন শচীশকে আলিঙ্গন করিয়া চৌকিতে বসাইলেন। বলিলেন, খবর কী ?

একটা বিশেষ খবর ছিল।

ননিবালা তার বিধবা মায়ের সঙ্গে তার মামার বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিল। যতদিন তার মা বাঁচিয়া ছিল কোনো বিপদ ঘটে নাই। অল্পদিন হইল মা মরিয়াছে। মামাতো ভাইগুলো দুশ্চরিত্র। তাহাদেরই এক বন্ধু ননিবালাকে তার আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন বাদে ননির 'পরে তার সন্দেহ হইতে থাকে এবং সেই ঈর্ষায় তাহাকে অপমানের একশেষ করে। যে বাড়িতে শচীশ মাস্টারি করে তারই পাশের বাড়িতে এই কাণ্ড। শচীশ এই হতভাগিনীকে উদ্ধার করিতে চায়। কিন্তু তার না আছে অর্থ, না আছে ঘর-দুয়ার, তাই সে তার জ্যাঠার কাছে আসিয়াছে। এ দিকে মেয়েটির সন্তান-সম্ভাবনা।

জগমোহন তো একেবারে আগুন। সেই পুরুষটাকে পাইলে এখনই তার মাথা গুঁড়া করিয়া দেন এমনি তাঁর ভাব। তিনি এ-সব ব্যাপারে শান্ত হইয়া সকল দিক চিন্তা করিবার লোক নন। একেবারে বলিয়া বসিলেন, তা বেশ তো, আমার লাইব্রেরি-ঘর খালি আছে ; সেইখানে আমি তাকে থাকিতে দিব।

শচীশ আশ্চর্য হইয়া কহিল, লাইব্রেরি-ঘর ! কিন্তু, বইগুলো ?

যতদিন কাজ জোটে নাই কিছু কিছু বই বিক্রি করিয়া জগমোহন দিন চালাইয়াছেন। এখন অল্প যা বই বাকি আছে তা শোবার ঘরেই ধরিবে।

জগমোহন বলিলেন, মেয়েটিকে এখনই লইয়া এসো।

শচীশ কহিল, তাকে আনিয়াছি, সে নীচের ঘরে বসিয়া আছে।

জগমোহন নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, সিঁড়ির পাশের ঘরে একখানা কাপড়ের পুঁটুলির মতো জড়োসড়ো হইয়া মেয়েটি এক কোণে মাটির উপরে বসিয়া আছে।

জগমোহন ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাঁর মেঘগম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিলেন, এসো, আমার মা এসো। ধুলায় কেন বসিয়া !

মেয়েটি মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জগমোহনের চোখে সহজে জল আসে না ; তাঁর চোখ ছলছল্ করিয়া উঠিল। তিনি শচীশকে

বলিলেন, শচীশ, এই মেয়েটি আজ যে লজ্জা বহন করিতেছে সে যে আমার লজ্জা, তোমার লজ্জা। আহা; ওর উপরে এতবড়ো বোঝা কে চাপাইল!

মা, আমার কাছে তোমার লজ্জা খাটিবে না। আমাকে আমার ইস্কুলের ছেলেরা পাগলা জগাই বলিত, আজও আমি সেই পাগল আছি।— বলিয়া জগমোহন নিঃসংকোচে মেয়েটির দুই হাত ধরিয়া মাটি হইতে তাকে দাঁড় করাইলেন; মাথা হইতে তার ঘোমটা খসিয়া পড়িল।

নিতান্ত কচিমুখ, অল্প বয়স, সে মুখে কলঙ্কের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই। ফুলের উপরে ধুলা লাগিলেও যেমন তার আন্তরিক শুচিতা দূর হয় না তেমনি এই শিরীষ-ফুলের মতো মেয়েটির ভিতরকার পবিত্রতার লাবণ্য তো ঘোচে নাই। তার দুই কালো চোখের মধ্যে আহত হরিণীর মতো ভয়, তার সমস্ত দেহলতাটির মধ্যে লজ্জার সংকোচ, কিন্তু এই সরল সকরুণতার মধ্যে কালিমা তো কোথাও নাই।

ননিবালাকে জগমোহন তাঁর উপরের ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, মা, এই দেখো আমার ঘরের শ্রী। সাত জন্মে ঝাঁট পড়ে না; সমস্ত উলটাপালটা; আর আমার কথা যদি বল, কখন নাই, কখন খাই, তার ঠিকানা নাই। তুমি আসিয়াছ, এখন আমার ঘরের শ্রী ফিরিবে, আর পাগলা জগাইও মানুষের মতো হইয়া উঠিবে।

মানুষ যে মানুষের কতখানি তা আজকের পূর্বে ননিবালা অনুভব করে নাই, এমন-কি, মা থাকিতেও না। কেননা মা তো তাকে মেয়ে বলিয়া দেখিত না, বিধবা মেয়ে বলিয়া দেখিত; সেই সম্বন্ধের পথ যে আশঙ্কার ছোটো ছোটো কাঁটায় ভরা ছিল। কিন্তু, জগমোহন সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও ননিবালাকে তার সমস্ত ভালোমন্দর আবরণ ভেদ করিয়া এমন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন কী করিয়া!

জগমোহন একটি বুড়ি ঝি রাখিয়া দিলেন এবং ননিবালাকে কোথাও কিছু সংকোচ করিতে দিলেন না। ননির বড়ো ভয় ছিল জগমোহন তার হাতে খাইবেন কি না, সে যে পতিতা। কিন্তু এমনি ঘটিল জগমোহন তার হাতে ছাড়া খাইতেই চান না; সে নিজে রাঁধিয়া কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে তিনি খাইবেন না, এই তাঁর পণ।

জগমোহন জানিতেন, এইবার আর-একটা মস্ত নিন্দার পালা আসিতেছে। ননিও তাহা বুঝিত, এবং সেজন্য তার ভয়ের অন্ত ছিল না। দু-চার দিনের মধ্যেই শুরু হইল। ঝি আগে মনে করিয়াছিল, ননি জগমোহনের মেয়ে; সে একদিন আসিয়া ননিকে কী-সব বলিল এবং ঘৃণা করিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিয়া গেল। জগমোহনের কথা ভাবিয়া ননির মুখ শুকাইয়া গেল। জগমোহন কহিলেন, মা, আমার ঘরে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, তাই নিন্দায় কোটালের বান ডাকিবার সময় আসিল; কিন্তু ঢেউ যতই ঘোলা হউক, আমার জ্যোৎস্নায় তো দাগ লাগিবে না।

জগমোহনের এক পিসি হরিমোহনের মহল হইতে আসিয়া কহিলেন, ছি ছি, এ কী কাণ্ড জগাই! পাপ বিদায় করিয়া দে।

জগমোহন কহিলেন, তোমরা ধার্মিক, তোমরা এমন কথা বলিতে পার, কিন্তু পাপ যদি বিদায় করি তবে এই পাপিষ্ঠের গতি কী হইবে?

কোনো এক সম্পর্কের দিদিমা আসিয়া বলিলেন, মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দে, হরিমোহন সমস্ত খরচ দিতে রাজি আছে।

জগমোহন কহিলেন, মা যে! টাকার সুবিধা হইয়াছে বলিয়াই খামকা মাকে হাসপাতালে পাঠাইব? হরিমোহনের এ কেমন কথা!

দিদিমা গালে হাত দিয়া কহিলেন, মা বলিস কাকে রে!

জগমোহন কহিলেন, জীবকে যিনি গর্ভে ধারণ করেন তাঁকে। যিনি প্রাণসংশয় করিয়া ছেলেকে জন্ম দেন তাঁকে। সেই ছেলের পাষণ্ড বাপকে তো আমি বাপ বলি না। সে বেটা কেবল বিপদ বাধায়, তার তো কোনো বিপদই নাই।

হরিমোহনের সর্বশরীর ঘৃণায় যেন ক্লেদসিক্ত হইয়া গেল। গৃহস্থের ঘরের দেওয়ালের ও পাশেই

বাপ-পিতামহের ভিটায় একটা ভ্রষ্টা মেয়ে এমন করিয়া বাস করিবে, ইহা সহ্য করা যায় কী করিয়া !

এই পাপের মধ্যে শচীশ ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত আছে এবং তার নাস্তিক জ্যাঠা ইহাতে তাকে প্রশ্রয় দিতেছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে হরিমোহনের কিছুমাত্র বিলম্ব বা দ্বিধা হইল না। বিষম উত্তেজনার সঙ্গে সে কথা তিনি সর্বত্র রটাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এই অন্যায় নিন্দা কিছুমাত্র কমে সেজন্য জগমোহন কোনো চেষ্টাই করিলেন না। তিনি বলিলেন, আমাদের নাস্তিকের ধর্মশাস্ত্রে ভালো কাজের জন্য নিন্দার নরকভোগ বিধান। জনশ্রুতি যতই নূতন নূতন রঙে নূতন নূতন রূপ ধরিতে লাগিল শচীশকে লইয়া ততই তিনি উচ্চহাস্যে আনন্দসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এমন কুৎসিত ব্যাপার লইয়া নিজের ভাইপোর সঙ্গে এমন কাণ্ড করা হরিমোহন বা তাঁর মতো অন্য কোনো ভদ্রশ্রেণীর লোক কোনোদিন শোনেন নাই।

জগমোহন বাড়ির যে অংশে থাকেন, ভাগ হওয়ার পর হইতে পুরন্দর তার ছায়া মাড়ায় নাই। সে প্রতিজ্ঞা করিল, মেয়েটাকে পাড়া হইতে তাড়াইবে তবে অন্য কথা।

জগমোহন যখন ইস্কুলে যাইতেন তখন তাঁর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবার সকল রাস্তাই বেশ ভালো করিয়া বন্ধসন্ধ করিয়া যাইতেন এবং যখন একটুমাত্র ছুটির সুবিধা পাইতেন একবার করিয়া দেখিয়া যাইতে ছাড়িতেন না।

একদিন দুপুরবেলায় পুরন্দর নিজেদের দিকের ছাদের পাঁচিলের উপরে মই লাগাইয়া জগমোহনের অংশে লাফ দিয়া পড়িল। তখন আহারের পর ননিবালা তার ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছিল ; দরজা খোলাই ছিল।

পুরন্দর ঘরে ঢুকিয়া নিদ্রিত ননিকে দেখিয়া বিস্ময়ে এবং রাগে গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, তাই বটে ! তুই এখানে !

জাগিয়া উঠিয়া পুরন্দরকে দেখিয়া ননির মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে পলাইবে কিংবা একটা কথা বলিবে এমন শক্তি তার রহিল না। পুরন্দর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ডাকিল, ননি !

এমন সময় জগমোহন পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিলেন, বেরো ! আমার ঘর থেকে বেরো !

পুরন্দর ক্রুদ্ধ বিড়ালের মতো ফুলিতে লাগিল। জগমোহন কহিলেন, যদি না যাও আমি পুলিস ডাকিব।

পুরন্দর একবার ননির দিকে অগ্নিকটাক্ষ ফেলিয়া চলিয়া গেল। ননি মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

জগমোহন বুঝিলেন ব্যাপারটা কী। তিনি শচীশকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন, শচীশ জানিত পুরন্দরই ননিকে নষ্ট করিয়াছে ; পাছে তিনি রাগ করিয়া গোলমাল করেন এইজন্য তাঁকে কিছু বলে নাই। শচীশ মনে জানিত, কলিকাতা শহরে আর-কোথাও পুরন্দরের উৎপাত হইতে ননির নিস্তার নাই, একমাত্র জ্যাঠার বাড়িতে সে কখনো পারতপক্ষে পদার্পণ করিবে না।

ননি একটা ভয়ের হাওয়ায় কয়দিন যেন বাঁশপাতার মতো কাঁপিতে লাগিল। তার পরে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিল।

পুরন্দর একদিন লাথি মারিয়া ননিকে অর্ধরাত্রে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। তার পরে অনেক খোঁজ করিয়া তাহাকে পায় নাই। এমন সময়ে জ্যাঠার বাড়িতে তাহাকে দেখিয়া ঈর্ষার আগুনে তার পা হইতে মাথা পর্যন্ত জ্বলিতে লাগিল। তার মনে হইল, একে তো শচীশ নিজের ভোগের জন্য ননিকে তার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছে, তার পরে পুরন্দরকেই বিশেষভাবে অপমান করিবার জন্য তাহাকে একেবারে তার বাড়ির পাশেই রাখিয়াছে। এ তো কোনোমতেই সহ্য করিবার নয়।

কথাটা হরিমোহন জানিতে পারিলেন। ইহা হরিমোহনকে জানিতে দিতে পুরন্দরের কিছুমাত্র লজ্জা ছিল না। পুরন্দরের এই-সমস্ত দুষ্কৃতির প্রতি তাঁর এক প্রকার স্নেহই ছিল।

শচীশ যে নিজের দাদা পুরন্দরের হাত হইতে এই মেয়েটাকে ছিনাইয়া লইবে, ইহা তাঁর কাছে বড়োই অশাস্ত্রীয় এবং অস্বাভাবিক বোধ হইল। পুরন্দর এই অসহ্য অপমান ও অন্যায় হইতে আপন

প্রাপ্য উদ্ধার করিয়া লইবে, এই তাঁর একান্ত মনের সংকল্প হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিজে টাকা সাহায্য করিয়া ননির একটা মিথ্যা মা খাড়া করিয়া জগমোহনের কাছে নাকী কান্না কাঁদিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। জগমোহন তাকে এমন ভীষণ মূর্তি ধরিয়া তাড়া করিলেন যে, সে আর সে দিকে ঘেঁষিল না।

ননি দিনে দিনে ম্লান হইয়া যেন ছায়ার মতো হইয়া মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। তখন ক্রিস্ট্‌মাসের ছুটি। জগমোহন এক মুহূর্ত ননিকে ছাড়িয়া বাহিরে যান না।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি তাকে স্কটের একটা গল্প বাংলা করিয়া পড়িয়া শুনাইতেছেন, এমন সময়ে ঘরের মধ্যে পুরন্দর আর-একজন যুবককে লইয়া ঝড়ের মতো প্রবেশ করিল। তিনি যখন পুলিস ডাকিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে সেই যুবকটি বলিল, আমি ননির ভাই, আমি উহাকে লইতে আসিয়াছি।

জগমোহন তার কোনো উত্তর না করিয়া পুরন্দরকে ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত লইয়া গিয়া এক ধাক্কায় নীচের দিকে রওনা করিয়া দিলেন।

অন্য যুবকটিকে বলিলেন, পাষণ্ড, লজ্জা নাই তোমার ? ননিকে রক্ষা করিবার বেলা তুমি কেহ্ নও, আর সর্বনাশ করিবার বেলা তুমি ননির ভাই ?

সে লোকটি প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিল না, কিন্তু দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, পুলিসের সাহায্যে সে তার বোনকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে। এ লোকটা সত্যই ননির ভাই বটে। শচীশই যে ননির পতনের কারণ সেই কথা প্রমাণ করিবার জন্য পুরন্দর তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল।

ননি মনে মনে বলিতে লাগিল, ধরণী, দ্বিধা হও।

জগমোহন শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, ননিকে লইয়া আমি পশ্চিমে কোনো-একটা শহরে চলিয়া যাই ; সেখানে যা-হয় একটা জুটাইয়া লইব ; যেরূপ উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে এখানে থাকিলে ও মেয়েটা আর বাঁচিবে না।

শচীশ কহিল, দাদা যখন লাগিয়াছেন তখন যেখানে যাও উৎপাত সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।

তবে উপায় ?

উপায় আছে। আমি ননিকে বিবাহ করিব।

বিবাহ্ করিবে ?

হাঁ, সিভিল বিবাহের আইন-মতে।

জগমোহন শচীশকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁর চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন অশ্রুপাত তাঁর বয়সে আর কখনো তিনি করেন নাই।

৬

বাড়ি-বিভাগের পর হরিমোহন একদিনও জগমোহনকে দেখিতে আসেন নাই। সেদিন উস্কোখুস্কো আলুথালু হইয়া আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, দাদা, এ কী সর্বনাশের কথা শুনিতেছি ?

জগমোহন কহিলেন, সর্বনাশের কথাই ছিল, এখন তাহা হইতে রক্ষার উপায় হইতেছে।

দাদা, শচীশ তোমার ছেলের মতো— তার সঙ্গে ঐ পতিতা মেয়ের তুমি বিবাহ দিবে ?

শচীশকে আমি ছেলের মতো করিয়াই মানুষ করিয়াছি ; আজ তা আমার সার্থক হইল, সে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।

দাদা, আমি তোমার কাছে হার মানিতেছি— আমার আয়ের অর্ধ অংশ আমি তোমার নামে লিখিয়া দিতেছি ; আমার উপরে এমন ভয়ানক করিয়া শোধ তুলিয়ো না।

জগমোহন চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বটে ! তুমি তোমার এঁটো পাতের অর্ধেক আমাকে দিয়া কুকুর ভুলাইতে আসিয়াছ ! আমি তোমার মতো ধার্মিক নই, আমি নাস্তিক, সে কথা মনে রাখিয়ো। আমি রাগের শোধও লই না, অনুগ্রহের ভিক্ষাও লই না।

হরিমোহন শচীশের মেসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন, এ কী শুনি! তোর কি মরিবার আর জায়গা জুটিল না? এমন করিয়া কুলে কলঙ্ক দিতে বসিলি!

শচীশ বলিল, কুলের কলঙ্ক মুছিবার জন্যই আমার এই চেষ্টা, নহিলে বিবাহ করিবার শখ আমার নাই।

হরিমোহন কহিলেন, তোর কি ধর্মজ্ঞান একটুও নাই? ঐ মেয়েটা তোর দাদার স্ত্রীর মতো, উহাকে তুই—

শচীশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, স্ত্রীর মতো! এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিবেন না।

ইহার পরে হরিমোহন যা মুখে আসিল তাই বলিয়া শচীশকে গাল পাড়িতে লাগিলেন। শচীশ কোনো উত্তর করিল না।

হরিমোহনের বিপদ ঘটিয়াছে এই যে, পুরন্দর নির্লজ্জের মতো বলিয়া বেড়াইতেছে যে, শচীশ যদি ননিকে বিবাহ করে তবে সে আত্মহত্যা করিয়া মরিবে। পুরন্দরের স্ত্রী বলিতেছে, তাহা হইলে তো আপদ চোকে, কিন্তু সে তোমার ক্ষমতায় কুলাইবে না। হরিমোহন পুরন্দরের এই শাসানি সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করেন তা নয়, অথচ তাঁর ভয়ও যায় না।

শচীশ এতদিন ননিকে এড়াইয়া চলিত; একলা তো একদিনও দেখা হয় নাই, তার সঙ্গে দুটা কথা হইয়াছে কি না সন্দেহ। বিবাহের কথা যখন পাকাপাকি ঠিক হইয়া গেছে তখন জগমোহন শচীশকে বলিলেন, বিবাহের পূর্বে নিরালায় একদিন ননির সঙ্গে ভালো করিয়া কথাবার্তা কহিয়া লও, একবার দুজনের মন-জানাজানি হওয়া দরকার।

শচীশ রাজি হইল।

জগমোহন দিন ঠিক করিয়া দিলেন। ননিকে বলিলেন, মা, আমার মনের মতো করিয়া আজ কিন্তু তোমাকে সাজিতে হইবে।

ননি লজ্জায় মুখ নিচু করিল।

না মা, লজ্জা করিলে চলিবে না, আমার বড়ো মনের সাধ, আজ তোমার সাজ দেখিব— এ তোমাকে পুরাইতে হইবে।

এই বলিয়া চুমকি-দেওয়া বেনারসি শাড়ি, জামা ও ওড়না, যা তিনি নিজে পছন্দ করিয়া কিনিয়া আনিয়াছিলেন, ননির হাতে দিলেন।

ননি গড় হইয়া পায়ের ধুলা লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া পা সরাইয়া লইয়া কহিলেন, এতদিনে তবু তোমার ভক্তি ঘোচাইতে পারিলাম না! আমি নাহয় বয়সেই বড়ো হইলাম, কিন্তু মা, তুমি যে মা বলিয়া আমার বড়ো। এই বলিয়া তার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, ভবতোষের বাড়ি আমার নিমন্ত্রণ আছে, ফিরিতে কিছু রাত হইবে।

ননি তাঁর হাত ধরিয়া বলিল, বাবা, তুমি আজ আমাকে আশীর্বাদ করো।

মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি বুড়ো বয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্বাদে সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ঐ মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।

বলিয়া চিবুক ধরিয়া ননির মুখটি তুলিয়া কিছুক্ষণ নীরবে তার দিকে চাহিয়া রহিলেন; ননির দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় ভবতোষের বাড়ি লোক ছুটিয়া গিয়া জগমোহনকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, বিছানার উপর ননির দেহ পড়িয়া আছে; তিনি যে কাপড়গুলি দিয়াছিলেন সেইগুলি পরা, হাতে একখানি চিঠি, শিয়রের কাছে শচীশ দাঁড়াইয়া। জগমোহন চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন:

বাবা, পারিলাম না, আমাকে মাপ করো। তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাঁকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই। তোমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম।

—পাপিষ্ঠা ননিবালা

শচীশ

১

নাস্তিক জগমোহন মৃত্যুর পূর্বে ভাইপো শচীশকে বলিলেন, যদি শ্রাদ্ধ করিবার শখ থাকে বাপের করিস, জ্যাঠার নয়।

তাঁর মৃত্যুর বিবরণটা এই:

যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল তখন প্লেগের চেয়ে তার রাজ-তক্‌মা-পরা চাপরাসির ভয়ে লোক ব্যস্ত হইয়াছিল। শচীশের বাপ হরিমোহন ভাবিলেন, তাঁর প্রতিবেশী চামারগুলোকে সকলের আগে প্লেগে ধরিবে, সেইসঙ্গে তাঁরও গুষ্টিসুদ্ধ সহমরণ নিশ্চিত। ঘর ছাড়িয়া পালাইবার পূর্বে তিনি একবার দাদাকে গিয়া বলিলেন, দাদা, কালনায় গঙ্গার ধারে বাড়ি পাইয়াছি, যদি—

জগমোহন বলিলেন, বিলক্ষণ! এদের ফেলিয়া যাই কী করিয়া?

কাদের?

ঐ-যে চামারদের।

হরিমোহন মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। শচীশকে তাঁর মেসে গিয়া বলিলেন, চল্‌।

শচীশ বলিল, আমার কাজ আছে।

পাড়ার চামারগুলোর মুর্দফরাশির কাজ?

আজ্ঞা হাঁ, যদি দরকার হয় তবে তো—

'আজ্ঞা হাঁ' বৈকি! যদি দরকার হয় তবে তুমি তোমার চোদ্দ পুরুষকে নরকস্থ করিতে পার। পাজি! নচ্ছার! নাস্তিক!

ভরা কলির দুর্লক্ষণ দেখিয়া হরিমোহন হতাশ হইয়া বাড়ি ফিরিলেন। সেদিন তিনি খুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখিয়া দিস্তাখানেক বালির কাগজ ভরিয়া ফেলিলেন।

হরিমোহন চলিয়া গেলেন। পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাসপাতালে ধরিয়া লইয়া যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না। জগমোহন স্বয়ং প্লেগ-হাসপাতাল দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, ব্যামো হইয়াছে বলিয়া তো মানুষ অপরাধ করে নাই।

তিনি চেষ্টা করিয়া নিজের বাড়িতে প্রাইভেট হাসপাতাল বসাইলেন। শচীশের সঙ্গে আমরা দুই-এক জন ছিলাম শুশ্রূষাব্রতী; আমাদের দলে একজন ডাক্তারও ছিলেন।

আমাদের হাসপাতালে প্রথম রোগী জুটিল একজন মুসলমান, সে মরিল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন, তিনিও বাঁচিলেন না। শচীশকে বলিলেন, এতদিন যে ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিশ চুকাইয়া লইলাম— কোনো খেদ রহিল না।

শচীশ জীবনে তার জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করে নাই, মৃত্যুর পর আজ প্রথম ও শেষবারের মতো তাঁর পায়ের ধুলা লইল।

ইহার পর শচীশের সঙ্গে যখন হরিমোহনের দেখা হইল তিনি বলিলেন, নাস্তিকের মরণ এমনি করিয়াই হয়।

শচীশ সগর্বে বলিল, হাঁ।

২

এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিলে তার আলো যেমন হঠাৎ চলিয়া যায় জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ তেমনি করিয়া কোথায় যে গেল জানিতেই পারিলাম না।

জ্যাঠামশায়কে শচীশ যে কতখানি ভালোবাসিত আমরা তা কল্পনা করিতে পারি না। তিনি

শচীশের বাপ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন, আবার ছেলেও ছিলেন বলিতে পারা যায়। কেননা নিজের সম্বন্ধে তিনি এমন ভোলা এবং সংসার সম্বন্ধে এমন অবুঝ ছিলেন যে, তাঁকে সকল মুশকিল হইতে বাঁচাইয়া চলা শচীশের এক প্রধান কাজ ছিল। এমনি করিয়া জ্যাঠামশাইয়ের ভিতর দিয়াই শচীশ আপনার যাহা-কিছু পাইয়াছে এবং তাঁর মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা-কিছু দিয়াছে। তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের শূন্যতা প্রথমটা শচীশের কাছে যে কেমনতরো ঠেকিয়াছিল তা ভাবিয়া ওঠা যায় না। সেই অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবলই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনোই হইতে পারে না ; সত্য নাই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথাও নাই ; এক ভাবে যাহা 'না' আর-এক ভাবে তাহা যদি 'হাঁ' না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।

দুই বছর ধরিয়া শচীশ দেশে দেশে ফিরিল, তার কোনো খোঁজ পাইলাম না। আমাদের দলটিকে লইয়া আমরা আরো জোরের সঙ্গে কাজ চালাইতে লাগিলাম। যারা ধর্ম নাম দিয়া কোনো একটা-কিছু মানে আমরা গায়ে পড়িয়া তাহাদিগকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইতে লাগিলাম, এবং বাছিয়া বাছিয়া এমন-সকল ভালো কাজে লাগিয়া গেলাম যাহাতে দেশের ভালোমানুষের ছেলে আমাদিগকে ভালো কথা না বলে। শচীশ ছিল আমাদের ফুল, সে যখন সরিয়া দাঁড়াইল তখন নিতান্ত কেবল আমাদের কাঁটাগুলো উগ্র এবং উলঙ্গ হইয়া উঠিল।

৩

দুই বছর শচীশের কোনো খবর পাইলাম না। শচীশকে একটুও নিন্দা করিতে আমার মন সরে না, কিন্তু মনে মনে এ কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, যে সুরে শচীশ বাঁধা ছিল এই নাড়া খাইয়া তাহা নামিয়া গেছে। একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া একবার জ্যাঠামশায় বলিয়াছিলেন ; সংসার মানুষকে পোদ্দারের মতো বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া। যাদের সুর দুর্বল পোদ্দার তাহাদিগকে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয় ; এই বৈরাগীগুলো সেই ফেলিয়া-দেওয়া মেকি টাকা, জীবনের কারবারে অচল। অথচ এরা জাঁক করিয়া বেড়ায় যে এরাই সংসার ত্যাগ করিয়াছে। যার কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে সংসার হইতে তার কোনোমতে ফসকাইবার জো নাই। শুকনো পাতা গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে, গাছ তাকে ঝরাইয়া ফেলে বলিয়াই— সে যে আবর্জনা।

এত লোক থাকিতে শেষকালে শচীশই কি সেই আবর্জনার দলে পড়িল ? শোকের কালো কষ্টিপাথরে এই কথাটা কি লেখা হইয়া গেল যে, জীবনের হাটে শচীশের কোনো দর নাই ?

এমন সময় শোনা গেল চাটগাঁয়ের কাছে কোন্-এক জায়গায় শচীশ— আমাদের শচীশ— লীলানন্দস্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

একদিন কোনোমতে ভাবিয়া পাই নাই শচীশের মতো মানুষ কেমন করিয়া নাস্তিক হইতে পারে, আজ কিছুতে বুঝিতে পারিলাম না লীলানন্দস্বামী তাহাকে কেমন করিয়া নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়।

এ দিকে, আমরা মুখ দেখাই কেমন করিয়া ? শত্রুর দল যে হাসিবে ! শত্রু তো এক-আধ জন নয়।

দলের লোক শচীশের উপর ভয়ংকর চটিয়া গেল। অনেকেই বলিল, তারা প্রথম হইতেই স্পষ্ট জানিত শচীশের মধ্যে বস্তু কিছুই নাই, কেবল ফাঁকা ভাবুকতা।

আমি যে শচীশকে কতখানি ভালোবাসি এবার তাহা বুঝিলাম। আমাদের দলকে সে যে এমন করিয়া মৃত্যুবাণ হানিল, তবু কিছুতে তার উপর রাগ করিতে পারিলাম না।

৪

গেলাম লীলানন্দস্বামীর খোঁজে। কত নদী পার হইলাম, মাঠ ভাঙিলাম, মুদির দোকানে রাত কাটাইলাম, অবশেষে এক গ্রামে গিয়া শচীশকে ধরিলাম। তখন বেলা দুটো হইবে।

ইচ্ছা ছিল শচীশকে একলা পাই। কিন্তু জো কী ! যে শিষ্যবাড়িতে স্বামীজি আশ্রয় লইয়াছেন তার

দাওয়া আঙিনা লোকে লোকারণ্য। সমস্ত সকাল কীর্তন হইয়া গেছে। যে-সব লোক দূর হইতে আসিয়াছে তাহাদের আহারের জোগাড় চলিতেছে।

আমাকে দেখিয়া শচীশ ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। আমি অবাক হইলাম। শচীশ চিরদিন সংযত, তার স্তব্ধতার মধ্যে তার হৃদয়ের গভীরতার পরিচয়। আজ মনে হইল শচীশ নেশা করিয়াছে।

স্বামীজি ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। দরজার একটা পাল্লা একটু খোলা ছিল। আমাকে দেখিতে পাইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন, শচীশ!

ব্যস্ত হইয়া শচীশ ঘরে গেল। স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কে?

শচীশ বলিল, শ্রীবিলাস, আমার বন্ধু।

তখনই লোকসমাজে আমার নাম রটিতে শুরু হইয়াছিল। আমার ইংরেজি বক্তৃতা শুনিয়া কোনো একজন বিদ্বান ইংরেজ বলিয়াছিলেন, ও লোকটা এমন— থাক্‌, সে-সব কথা লিখিয়া অনর্থক শত্রুবৃদ্ধি করিব না। আমি যে ধুরন্ধর নাস্তিক এবং ঘণ্টায় বিশ-পঁচিশ মাইল বেগে আশ্চর্য কায়দায় ইংরেজি বুলির চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া চলিতে পারি, এ কথা ছাত্রসমাজ হইতে শুরু করিয়া ছাত্রদের পিতৃসমাজ পর্যন্ত রাষ্ট্র হইয়াছিল।

আমার বিশ্বাস, আমি আসিয়াছি জানিয়া স্বামীজি খুশি হইলেন। তিনি আমাকে দেখিতে চাহিলেন। ঘরে ঢুকিয়া একটা নমস্কার করিলাম; সে নমস্কারে কেবলমাত্র দুইখানা হাত খাঁড়ার মতো আমার কপাল পর্যন্ত উঠিল, মাথা নিচু হইল না। আমরা জ্যাঠামশায়ের চেলা, আমাদের নমস্কার গুণহীন ধনুকের মতো নমো অংশটা ত্যাগ করিয়া বিষম খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বামীজি সেটা লক্ষ্য করিলেন এবং শচীশকে বলিলেন, তামাকটা সাজিয়া দাও তো হে শচীশ।

শচীশ তামাক সাজিতে বসিল। তার টিকা যেমন ধরিতে লাগিল আমিও তেমনি জ্বলিতে লাগিলাম। কোথায় যে বসি ভাবিয়া পাইলাম না। আসবাবের মধ্যে এক তক্তপোশ, তার উপরে স্বামীজির বিছানা পাতা। সেই বিছানার এক পাশে বসাটা অসংগত মনে করি না— কিন্তু কী জানি— সে ঘটিয়া উঠিল না, দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দেখিলাম, স্বামীজি জানেন আমি রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের বৃত্তিওয়ালা। বলিলেন, বাবা, ডুবুরি মুক্তা তুলিতে সমুদ্রের তলায় গিয়া পৌঁছায়, কিন্তু সেখানেই যদি টিকিয়া যায় তবে রক্ষা নাই— মুক্তির জন্য তাকে উপরে উঠিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয়। বাঁচিতে চাও যদি বাপু, তবে এবার বিদ্যাসমুদ্রের তলা হইতে ডাঙার উপরে উঠিতে হইবে। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের বৃত্তি তো পাইয়াছ, এবার প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের নিবৃত্তিটা একবার দেখো।

শচীশ তামাক সাজিয়া তাঁর হাতে দিয়া তাঁর পায়ের দিকে মাটির উপরে বসিল। স্বামী তখনই শচীশের দিকে তাঁর পা ছড়াইয়া দিলেন। শচীশ ধীরে ধীরে তাঁর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

দেখিয়া আমার মনে এতবড়ো একটা আঘাত বাজিল যে ঘরে থাকিতে পারিলাম না। বুঝিয়াছিলাম, আমাকে বিশেষ করিয়া ঘা দিবার জন্যই শচীশকে দিয়া এই তামাক-সাজানো, এই পা-টেপানো।

স্বামী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অভ্যাগত সকলের খিচুড়ি খাওয়া হইল। বেলা পাঁচটা হইতে আবার কীর্তন শুরু হইয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত চলিল।

রাত্রে শচীশকে নিরালা পাইয়া বলিলাম, শচীশ, জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কী বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে? জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু কি এতবড়ো মৃত্যু?

আমার শ্রীবিলাস নামের প্রথম দুটো অক্ষরকে উলটাইয়া দিয়া শচীশ কিছু-বা স্নেহের কৌতুকে কিছু-বা আমার চেহারার গুণে আমাকে বিশ্রী বলিয়া ডাকিত। সে বলিল, বিশ্রী, জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে,

ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে মুক্তি তো ভোগ করিয়াছি, এখন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই বা ছাড়ি কেন? এ দুটো ব্যাপারই সেই আমার এক জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড এ তুমি নিশ্চয় জানিয়ো।

আমি বলিলাম, যাই বল, এই তামাক-সাজানো পা-টেপানো এ-সমস্ত উপসর্গ জ্যাঠামশায়ের ছিল না— মুক্তির এ চেহারা নয়।

শচীশ কহিল, সে যে ছিল ডাঙার উপরকার মুক্তি, তখন কাজের ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায় আমার হাত-পা'কে সচল করিয়া দিয়াছিলেন। আর এ যে রসের সমুদ্র, এখানে নৌকার বাঁধনই যে মুক্তির রাস্তা। তাই তো গুরু আমাকে এমন করিয়া চারি দিক হইতে সেবার মধ্যে আটকাইয়া ধরিয়াছেন; আমি পা টিপিয়া পার হইতেছি।

আমি বলিলাম, তোমার মুখে এ কথা মন্দ শোনায় না, কিন্তু যিনি তোমার দিকে এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন তিনি—

শচীশ কহিল, তাঁর সেবার দরকার নাই বলিয়াই এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন, যদি দরকার থাকিত তবে লজ্জা পাইতেন। দরকার যে আমারই।

বুঝিলাম, শচীশ এমন-একটা জগতে আছে আমি যেখানে একেবারে নাই। মিলনমাত্র যে-আমাকে শচীশ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল সে-আমি শ্রীবিলাস নয়, সে-আমি 'সর্বভূত'; সে-আমি একটা আইডিয়া।

এই ধরনের আইডিয়া জিনিসটা মদের মতো; নেশার বিহ্বলতায় মাতাল যাকে-তাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে, তখন আমিই কী আর অন্যই কী। কিন্তু এই বুকে-জড়ানোতে মাতালের যতই আনন্দ থাক্, আমার তো নাই; আমি তো ভেদজ্ঞানবিলুপ্ত একাকারতা-বন্যার একটা ঢেউমাত্র হইতে চাই না— আমি যে আমি।

বুঝিলাম, তর্কের কর্ম নয়। কিন্তু শচীশকে ছাড়িয়া যাওয়া আমার সাধ্য ছিল না; শচীশের টানে এই দলের স্রোতে আমিও গ্রাম হইতে গ্রামে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে নেশায় আমাকেও পাইল; আমিও সবাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম, অশ্রুবর্ষণ করিলাম, গুরুর পা টিপিয়া দিতে লাগিলাম এবং একদিন হঠাৎ কী-এক আবেশে শচীশের এমন একটি অলৌকিক রূপ দেখিতে পাইলাম যাহা বিশেষ কোনো-একজন দেবতাতেই সম্ভব!

৫

আমাদের মতো এতবড়ো দুটো দুর্ধর্ষ ইংরেজিওয়ালা নাস্তিককে দলে জুটাইয়া লীলানন্দস্বামীর নাম চারি দিকে রটিয়া গেল। কলিকাতাবাসী তাঁর ভক্তেরা এবার তাঁকে শহরে আসিয়া বসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

তিনি কলিকাতায় আসিলেন।

শিবতোষ বলিয়া তাঁর একটি পরম ভক্ত শিষ্য ছিল। কলিকাতায় থাকিতে স্বামী তারই বাড়িতে থাকিতেন; সমস্ত দলবল -সমেত তাঁহাকে সেবা করাই তার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল।

সে মরিবার সময় অল্পবয়সের নিঃসন্তান স্ত্রীকে জীবনস্বত্ব দিয়া তার কলিকাতার বাড়ি ও সম্পত্তি গুরুকে দিয়া যায়; তার ইচ্ছা ছিল এই বাড়িই কালক্রমে তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থল হইয়া উঠে। এই বাড়িতেই ওঠা গেল।

গ্রামে গ্রামে যখন মাতিয়া বেড়াইতেছিলাম সে এক রকম ভাবে ছিলাম, কলিকাতায় আসিয়া সে নেশা জমাইয়া রাখা আমার পক্ষে শক্ত হইল। এতদিন একটা রসের রাজ্যে ছিলাম, সেখানে বিশ্বব্যাপিনী নারীর সঙ্গে চিত্তব্যাপী পুরুষের প্রেমের লীলা চলিতেছিল; গ্রামের গোরু-চরা মাঠ, খেয়াঘাটের বটচ্ছায়া, অবকাশের আবেশে ভরা মধ্যাহ্ন এবং ঝিল্লিরবে আকম্পিত সন্ধ্যাবেলাকার

নিস্তব্ধতা তাহারই সুরে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। যেন স্বপ্নে চলিতেছিলাম, খোলা আকাশে বাধা পাই নাই— কঠিন কলিকাতায় আসিয়া মাথা ঠুকিয়া গেল, মানুষের ভিড়ের ধাক্কা খাইলাম— চট্‌কা ভাঙিয়া গেল। একদিন যে এই কলিকাতার মেসে দিনরাত্রি সাধনা করিয়া পড়া করিয়াছি, গোলদিঘিতে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া দেশের কথা ভাবিয়াছি, রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনীতে ভলান্‌টিয়ারি করিয়াছি, পুলিসের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া জেলে যাইবার জো হইয়াছে ; এইখানে জ্যাঠামশায়ের ডাকে সাড়া দিয়া ব্রত লইয়াছি যে, সমাজের ডাকাতি প্রাণ দিয়া ঠেকাইব, সকল রকম গোলামির জাল কাটিয়া দেশের লোকের মনটাকে খালাস করিব ; এইখানকার মানুষের ভিতর দিয়া আত্মীয়-অনাত্মীয় চেনা-অচেনা সকলের গালি খাইতে খাইতে পালের নৌকা যেমন করিয়া উজান জলে বুক ফুলাইয়া চলিয়া যায় যৌবনের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত তেমনি করিয়া চলিয়াছি ; ক্ষুধাতৃষ্ণা সুখদুঃখ ভালোমন্দের বিচিত্র সমস্যায় পাক-খাওয়া মানুষের ভিড়ের সেই কলিকাতায় অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন রসের বিহ্বলতা জাগাইয়া রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্ষণে ক্ষণে মনে হইতে লাগিল, আমি দুর্বল, আমি অপরাধ করিতেছি, আমার সাধনার জোর নাই। শচীশের দিকে তাকাইয়া দেখি, কলিকাতা শহরটা যে দুনিয়ার ভূবৃত্তান্তে কোনো-একটা জায়গায় আছে এমন চিহ্নই তার মুখে নাই, তার কাছে এ সমস্তই ছায়া।

৬

শিবতোষের বাড়িতে গুরুর সঙ্গেই একত্র আমরা দুই বন্ধু বাস করিতে লাগিলাম। আমরাই তাঁর প্রধান শিষ্য, তিনি আমাদিগকে কাছছাড়া করিতে চাহিলেন না।

গুরুকে লইয়া গুরুভাইদের লইয়া দিনরাত রসের ও রসতত্ত্বের আলোচনা চলিল। সেই-সব গভীর দুর্গম কথার মাঝখানে হঠাৎ এক-একবার ভিতরের মহল হইতে একটি মেয়ের গলার উচ্চহাসি আসিয়া পৌঁছিত। কখনো কখনো শুনিতে পাইতাম একটি উচ্চসুরের ডাক— 'বামি'। আমরা ভাবের যে আশমানে মনটাকে বুঁদ করিয়া দিয়াছিলাম তার কাছে এগুলি অতি তুচ্ছ, কিন্তু হঠাৎ মনে হইত অনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমাদের দেয়ালের পাশের অদৃশ্যলোক হইতে ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মতো জীবনের ছোটো ছোটো পরিচয় যখন আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইত তখন আমি মুহূর্তের মধ্যে বুঝিতাম, রসের লোক তো ঐখানেই— যেখানে সেই বামির আঁচলে ঘরকন্নার চাবির গোচ্ছা বাজিয়া ওঠে, যেখানে রান্নাঘর হইতে রান্নার গন্ধ উঠিতে থাকে, যেখানে ঘর ঝাঁট দিবার শব্দ শুনিতে পাই, যেখানে সব তুচ্ছ কিন্তু সব সত্য, সব মধুরে তীব্রে স্থূলে সূক্ষ্মে মাখামাখি— সেইখানেই রসের স্বর্গ।

বিধবার নাম ছিল দামিনী। তাকে আড়ালে-আবডালে ক্ষণে ক্ষণে চকিতে দেখিতে পাইতাম। আমরা দুই বন্ধু গুরুর এমন একাত্ম ছিলাম যে অল্পকালের মধ্যেই আমাদের কাছে দামিনীর আর আড়াল-আবডাল রহিল না।

দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠিতেছে।

শচীশের ডায়ারিতে এক জায়গায় আছে :

ননিবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি— অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি ; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে ; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ ; সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।

দামিনী সম্বন্ধে গোড়াকার দিকের কথাটা বলিয়া লই। পাটের ব্যবসায়ে একদিন যখন তার বাপ অন্নদাপ্রসাদের তহবিল মুনফার হঠাৎ-প্লাবনে উপচিয়া পড়িল সেই সময়ে শিবতোষের সঙ্গে দামিনীর বিবাহ। এতদিন কেবলমাত্র শিবতোষের কুল ভালো ছিল, এখন তার কপাল ভালো হইল। অন্নদা জামাইকে কলিকাতায় একটি বাড়ি এবং যাহাতে খাওয়া-পরার কষ্ট না হয় এমন সংস্থান করিয়া দিলেন। ইহার উপরে গহনাপত্র কম দেন নাই।

শিবতোষকে তিনি আপন আপিসে কাজ শিখাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবতোষের স্বভাবতই সংসারে মন ছিল না। একজন গণৎকার তাহাকে একদিন বলিয়া দিয়াছিল কোন্‌-এক বিশেষ যোগে বৃহস্পতির কোন্‌-এক বিশেষ দৃষ্টিতে সে জীবন্মুক্ত হইয়া উঠিবে। সেই দিন হইতে জীবন্মুক্তির প্রত্যাশায় সে কাঞ্চন এবং অন্যান্য রমণীয় পদার্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে বসিল। ইতিমধ্যে লীলানন্দস্বামীর কাছে সে মন্ত্র লইল।

এ দিকে ব্যবসায়ের উলটা হাওয়ার ঝাপটা খাইয়া অন্নদার ভরা পালের ভাগ্যতরী একেবারে কাত হইয়া পড়িল। এখন বাড়িঘর সমস্ত বিক্রি হইয়া আহার চলা দায়।

একদিন শিবতোষ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির ভিতরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, স্বামীজি আসিয়াছেন, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন, কিছু উপদেশ দিবেন। দামিনী বলিল, না, এখন আমি যাইতে পারিব না। আমার সময় নাই।

সময় নাই! শিবতোষ কাছে আসিয়া দেখিল, দামিনী অন্ধকার ঘরে বসিয়া গহনার বাক্স খুলিয়া গহনাগুলি বাহির করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, এ কী করিতেছ? দামিনী কহিল, আমি গহনা গুছাইতেছি।

এইজন্যই সময় নাই! বটে! পরদিন দামিনী লোহার সিন্ধুক খুলিয়া দেখিল তার গহনার বাক্স নাই। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার গহনা? স্বামী বলিল, সে তো তুমি তোমার গুরুকে নিবেদন করিয়াছ। সেইজন্যই তিনি ঠিক সেই সময়ে তোমাকে ডাকিয়াছিলেন, তিনি যে অন্তর্যামী; তিনি তোমার কাঞ্চনের লোভ হরণ করিলেন।

দামিনী আগুন হইয়া কহিল, দাও আমার গহনা।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কী করিবে?

দামিনী কহিল, আমার বাবার দান, সে আমি আমার বাবাকে দিব।

শিবতোষ কহিল, তার চেয়ে ভালো জায়গায় পড়িয়াছে। বিষয়ীর পেট না ভরাইয়া ভক্তের সেবায় তাহার উৎসর্গ হইয়াছে।

এমনি করিয়া ভক্তির দস্যুবৃত্তি শুরু হইল। জোর করিয়া দামিনীর মন হইতে সকল প্রকার বাসনা-কামনার ভূত ঝাড়াইবার জন্য পদে পদে ওঝার উৎপাত চলিতে লাগিল। যে সময়ে দামিনীর বাপ এবং তার ছোটো ছোটো ভাইরা উপবাসে মরিতেছে সেই সময়ে বাড়িতে প্রত্যহ ষাট-সত্তর জন ভক্তের সেবার অন্ন তাকে নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া তরকারিতে সে নুন দেয় নাই, ইচ্ছা করিয়া দুধ ধরাইয়া দিয়াছে— তবু তার তপস্যা এমনি করিয়া চলিতে লাগিল।

এমন সময় তার স্বামী মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল। সমস্ত সম্পত্তি -সমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল।

৭

ঘরের মধ্যে অবিশ্রাম ভক্তির ঢেউ উঠিতেছে। কত দূর হইতে কত লোক আসিয়া গুরুর শরণ লইতেছে। আর দামিনী বিনা চেষ্টায় ইঁহার কাছে আসিতে পারিল, অথচ সেই দুর্লভ সৌভাগ্যকে সে দিনরাত অপমান করিয়া খেদাইয়া রাখিল!

গুরু যেদিন তাকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতে ডাকিতেন সে বলিত, আমার মাথা ধরিয়াছে।

যেদিন তাঁহাদের সন্ধ্যাবেলাকার আয়োজনে কোনো বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া তিনি দামিনীকে প্রশ্ন করিতেন সে বলিত, আমি থিয়েটারে গিয়াছিলাম। এ উত্তরটা সত্য নহে, কিন্তু কটু। ভক্ত মেয়ের দল আসিয়া দামিনীর কাণ্ড দেখিয়া গালে হাত দিয়া বসিত। একে তো তার বেশভূষা বিধবার মতো নয়, তার পরে গুরুর উপদেশবাক্যের সে কাছ দিয়া যায় না, তার পরে এতবড়ো মহাপুরুষের এত কাছে থাকিলে আপনিই যে একটি সংযমে শুচিতায় শরীর মন আলো হইয়া ওঠে এর মধ্যে তার কোনো লক্ষণ নাই। সকলেই বলিল, ধন্যি বটে! ঢের ঢের দেখিয়াছি কিন্তু এমন মেয়েমানুষ দেখি নাই।

স্বামীজি হাসিতেন। তিনি বলিতেন, যার জোর আছে ভগবান তারই সঙ্গে লড়াই করিতে ভালোবাসেন। একদিন এ যখন হার মানিবে তখন এর মুখে আর কথা থাকিবে না।

তিনি অত্যন্ত বেশি করিয়া ইহাকে ক্ষমা করিতে লাগিলেন। সেই রকমের ক্ষমা দামিনীর কাছে আরো বেশি অসহ্য হইতে লাগিল, কেননা তাহা যে শাসনের নামান্তর। গুরু দামিনীর সঙ্গে ব্যবহারে অতিরিক্ত ভাবে যে মাধুর্য প্রকাশ করিতেন একদিন হঠাৎ শুনিতে পাইলেন দামিনী কোনো-এক সঙ্গিনীর কাছে তারই নকল করিয়া হাসিতেছে।

তবু তিনি বলিলেন, যা অঘটন তা ঘটিবে এবং সেইটে দেখাইবার জন্যই দামিনী বিধাতার উপলক্ষ হইয়া আছে—ও বেচারার দোষ নাই।

আমরা প্রথম আসিয়া কয়েক দিন দামিনীর এই অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তার পরে অঘটন ঘটিতে শুরু হইল।

আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না—লেখাও কঠিন। জীবনের পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে বেদনার যে জাল বোনা হইতে থাকে তার নকশা কোনো শাস্ত্রের নয়, ফর্মাশের নয়— তাই তো ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া এত ঘা খাইতে হয়, এত কান্না ফাটিয়া পড়ে।

বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা কোন্ ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল, আত্মোৎসর্গের ফুলটি উপরের দিকে শিশির-ভরা মুখটি তুলিয়া ধরিল। দামিনীর সেবা এখন এমন সহজে এমন সুন্দর হইয়া উঠিল যে, তার মাধুর্যে ভক্তদের সাধনার উপরে ভক্তবৎসলের যেন বিশেষ একটি বর আসিয়া পৌঁছিল।

এমনি করিয়া দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে শচীশ তার শোভা দেখিতে লাগিল। কিন্তু আমি বলিতেছি শচীশ কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না।

শচীশের বসিবার ঘরে চীনামাটির ফলকের উপর লীলানন্দস্বামীর ধ্যানমূর্তির একটি ফোটোগ্রাফ ছিল। একদিন সে দেখিল, তাহা ভাঙিয়া মেজের উপরে টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়া আছে। শচীশ ভাবিল, তার পোষা বিড়ালটা এই কাণ্ড করিয়াছে। মাঝে মাঝে আরো এমন অনেক উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল যা বন্য বিড়ালেরও অসাধ্য।

চারি দিকের আকাশে একটা চঞ্চলতার হাওয়া উঠিল। একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎ ভিতরে ভিতরে খেলিতে লাগিল। অন্যের কথা জানি না, ব্যথায় আমার মনটা টন্‌টন্ করিতে থাকিত। এক-একবার ভাবিতাম, দিনরাত্রি এই রসের তরঙ্গ আমার সহিল না— ইহার মধ্য হইতে একেবারে এক ছুটে দৌড় দিব; সেই যে চামারদের ছেলেগুলাকে লইয়া সর্বপ্রকার রসবর্জিত বাংলা বর্ণমালার যুক্ত-অক্ষরের আলোচনা চলিত সে আমার বেশ ছিল।

একদিন শীতের দুপুরবেলায় গুরু যখন বিশ্রাম করিতেছেন এবং ভক্তেরা ক্লান্ত, শচীশ কী একটা কারণে অসময়ে তার শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাটের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।

ভয়ে শচীশের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল।

৮

গুরুজি প্রতি বছরে একবার করিয়া কোনো দুর্গম জায়গায় নির্জনে বেড়াইতে যাইতেন। মাঘ মাসে সেই তাঁর সময় হইয়াছে। শচীশ বলিল, আমি সঙ্গে যাইব।

আমি বলিলাম, আমিও যাইব। রসের উত্তেজনায় আমি একেবারে মজ্জায় মজ্জায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। কিছুদিন ভ্রমণের ক্লেশ এবং নির্জনে বাস আমার নিতান্ত দরকার ছিল।

স্বামীজি দামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইব। অন্যবারে এই সময়ে যেমন তুমি তোমার মাসির বাড়ি গিয়া থাকিতে, এবারেও সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিই।

দামিনী বলিল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।

স্বামীজি কহিলেন, পারিবে কেন? সে যে বড়ো শক্ত পথ।

দামিনী বলিল, পারিব। আমাকে লইয়া কিছু ভাবিতে হইবে না।

স্বামী দামিনীর এই নিষ্ঠায় খুশি হইলেন। অন্য অন্য বছর এই সময়টাই দামিনীর ছুটির দিন ছিল, সম্বৎসর ইহার জন্য তার মন পথ চাহিয়া থাকিত। স্বামী ভাবিলেন, এ কী অলৌকিক কাণ্ড! ভগবানের রসের রসায়নে পাথরকে নবনী করিয়া তোলে কেমন করিয়া!

কিছুতে ছাড়িল না, দামিনী সঙ্গে গেল।

৯

সেদিন প্রায় ছয় ঘণ্টা রৌদ্রে হাঁটিয়া আমরা যে জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম সেটা সমুদ্রের মধ্যে একটা অন্তরীপ! একেবারে নির্জন নিস্তব্ধ; নারিকেলবনের পল্লববীজনের সঙ্গে শান্তপ্রায় সমুদ্রের অলস কল্লোল মিশিতেছিল। ঠিক মনে হইল, যেন ঘুমের ঘোরে পৃথিবীর একখানি ক্লান্ত হাত সমুদ্রের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। সেই হাতের তেলোর উপরে একটি নীলাভ সবুজ রঙের ছোটো পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে অনেক কালের খোদিত এক গুহা আছে। সেটি বৌদ্ধ কি হিন্দু, তার গায়ে যে-সব মূর্তি তাহা বুদ্ধের না বাসুদেবের, তার শিল্পকলায় গ্রীকের প্রভাব আছে কি নাই, এ লইয়া পণ্ডিতমহলে গভীর একটা অশান্তির কারণ ঘটিয়াছে।

কথা ছিল গুহা দেখিয়া আমরা লোকালয়ে ফিরিব। কিন্তু সে সম্ভাবনা নাই। দিন তখন শেষ হয়, তিথি সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। গুরুজি বলিলেন, আজ এই গুহাতেই রাত কাটাইতে হইবে।

আমরা সমুদ্রের ধারে বনের তলায় বালুর 'পরে তিন জনে বসিলাম। সমুদ্রের পশ্চিম প্রান্তে সূর্যাস্তটি আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখে দিবসের শেষ প্রণামের মতো নত হইয়া পড়িল। গুরুজি গান ধরিলেন— আধুনিক কবির গানটা তাঁর চলে—

পথে যেতে তোমার সাথে
  মিলন হল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে সাঁঝের আলো
  মিলিয়ে গেল এক নিমিষে।

সেদিন গানটি বড়ো জমিল। দামিনীর চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্বামীজি অন্তরা ধরিলেন—

দেখা তোমায় হোক বা না হোক
তাহার লাগি করব না শোক,
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও— তোমার
চরণ ঢাকি এলোকেশে।

স্বামী যখন থামিলেন সেই আকাশ-ভরা সমুদ্র-ভরা সন্ধ্যার স্তব্ধতা নীরব সুরের রসে একটি সোনালি রঙের পাকা ফলের মতো ভরিয়া উঠিল। দামিনী মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল— অনেকক্ষণ মাথা তুলিল না, তার চুল এলাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

১০

শচীশের ডায়ারিতে লেখা আছে :

গুহার মধ্যে অনেকগুলি কামরা। আমি তার মধ্যে একটাতে কম্বল পাতিয়া শুইলাম।

সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো— তার ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল সে যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু ; তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে ; সে অনন্ত কাল এই গুহার মধ্যে বন্দী ; তার মন নাই— সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যথা আছে— সে নিঃশব্দে কাঁদে।

ক্লান্তি একটা ভারের মতো আমার সমস্ত শরীরকে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু কোনোমতেই ঘুম আসিল না। একটা কী পাখি, হয়তো বাদুড় হইবে, ভিতর হইতে বাহিরে কিংবা বাহির হইতে ভিতরে ঝপ্‌ঝপ্‌ ডানার শব্দ করিতে করিতে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে চলিয়া গেল। আমার গায়ে তার হাওয়া দিতে সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

মনে করিলাম, বাহিরে গিয়া শুইব। কোন্‌ দিকে যে গুহার দ্বার তা ভুলিয়া গেছি। গুঁড়ি মারিয়া এক দিকে চলিতে চেষ্টা করিয়া মাথা ঠেকিয়া গেল, আর-এক দিকে মাথা ঠুকিলাম, আর-এক দিকে একটা ছোটো গর্তের মধ্যে পড়িলাম— সেখানে গুহার ফাটল-চোঁয়ানো জল জমিয়া আছে।

শেষে ফিরিয়া আসিয়া কম্বলটার উপর শুইলাম। মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার রস জারক রস, তাহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে।

ঘুমাইতে পারিলে বাঁচি ; আমার জাগ্রৎচৈতন্য এত বড়ো সর্বনাশা অন্ধকারের নিবিড় আলিঙ্গন সহিতে পারে না, এ কেবল মৃত্যুরই সহে।

জানি না কতক্ষণ পরে—সেটা বোধ করি ঠিক ঘুম নয়— অসাড়তার একটা পাতলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা!

তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁয়া আছে—এর রোঁয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই— তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ!

ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে—ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে—সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম।

অবশেষে আমার ঘোরটা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম। তার গায়ে রোঁয়া নাই, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না?

দামিনী

১

গুহা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। গ্রামে মন্দিরের কাছে গুরুজির কোনো শিষ্যবাড়ির দোতলার ঘরগুলিতে আমাদের বাসা ঠিক হইয়াছিল।

গুহা হইতে ফেরার পর হইতে দামিনীকে আর বড়ো দেখা যায় না। সে আমাদের জন্য রাঁধিয়া-বাড়িয়া দেয় বটে, কিন্তু পারতপক্ষে দেখা দেয় না। সে এখানকার পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে, সমস্ত দিন তাদেরই মধ্যে এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়।

গুরুজি কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, মাটির বাসার দিকেই দামিনীর টান, আকাশের দিকে নয়। কিছুদিন যেমন সে দেবপূজার মতো করিয়া আমাদের সেবায় লাগিয়াছিল এখন তাহাতে ক্লান্তি দেখিতে পাই, ভুল হয়, কাজের মধ্যে তার সেই সহজ শ্রী আর দেখা যায় না।

গুরুজি আবার তাকে মনে মনে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দামিনীর ভুরুর মধ্যে কয়দিন হইতে একটা ভ্রূকুটি কালো হইয়া উঠিতেছে এবং তার মেজাজের হাওয়াটা কেমন যেন এলোমেলো বহিতে শুরু করিয়াছে।

দামিনীর এলোখোঁপাবাঁধা ঘাড়ের দিকে, ঠোঁটের মধ্যে, চোখের কোণে এবং ক্ষণে ক্ষণে হাতের একটা আক্ষেপে একটা কঠোর অবাধ্যতার ইশারা দেখা যাইতেছে।

আবার গুরুজি গানে কীর্তনে বেশি করিয়া মন দিলেন। ভাবিলেন, মিষ্টগন্ধে উড়ো ভ্রমরটা আপনি ফিরিয়া আসিয়া মধুকোষের উপর স্থির হইয়া বসিবে। হেমন্তের ছোটো ছোটো দিনগুলো গানের মদে ফেনাইয়া যেন উপ্‌চিয়া পড়িল।

কিন্তু কই, দামিনী তো ধরা দেয় না! গুরুজি ইহা লক্ষ্য করিয়া একদিন হাসিয়া বলিলেন, ভগবান শিকার করিতে বাহির হইয়াছেন, হরিণী পালাইয়া এই শিকারের রস আরো জমাইয়া তুলিতেছে; কিন্তু মরিতেই হইবে।

প্রথমে দামিনীর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় তখন সে ভক্তমণ্ডলীর মাঝে প্রত্যক্ষ ছিল না, কিন্তু সেটা আমরা খেয়াল করি নাই। এখন সে যে নাই সেইটেই আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। তাকে না দেখিতে পাওয়াটাই ঝোড়ো হাওয়ার মতো আমাদিগকে এ-দিক ও-দিক হইতে ঠেলা দিতে লাগিল। গুরুজি তার অনুপস্থিতিটাকে অহংকার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, সুতরাং সেটা তাঁর অহংকারে কেবলই ঘা দিতে থাকিত। আর আমি— আমার কথাটা বলিবার প্রয়োজন নাই।

একদিন গুরুজি সাহস করিয়া দামিনীকে যথাসম্ভব মৃদুমধুর সুরে বলিলেন, দামিনী, আজ বিকালের দিকে তোমার কি সময় হইবে? তা হইলে—

দামিনী কহিল, না।

কেন বলো দেখি।

পাড়ায় নাড়ু কুটিতে যাইব।

নাড়ু কুটিতে? কেন?

নন্দীদের বাড়ি বিয়ে।

সেখানে কি তোমার নিতান্তই—

হাঁ, আমি তাদের কথা দিয়াছি।

আর কিছু না বলিয়া দামিনী একটা দমকা হাওয়ার মতো চলিয়া গেল। শচীশ সেখানে বসিয়াছিল, সে তো অবাক। কত মানী গুণী ধনী বিদ্বান তার গুরুর কাছে মাথা নত করিয়াছে, আর ঐ একটুখানি মেয়ে ওর কিসের এমন অকুণ্ঠিত তেজ!

আর-একদিন সন্ধ্যার সময় দামিনী বাড়ি ছিল। সেদিন গুরু একটু বিশেষভাবে একটা বড়ো

রকমের কথা পাড়িলেন। খানিক দূর এগোতেই তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া একটা যেন ফাঁকা কিছু বুঝিলেন। দেখিলেন, আমরা অন্যমনস্ক। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দামিনী যেখানে বসিয়া জামায় বোতাম লাগাইতেছিল সেখানে সে নাই। বুঝিলেন, আমরা দুইজনে ঐ কথাটাই ভাবিতেছি যে, দামিনী উঠিয়া চলিয়া গেল। তাঁর মনে ভিতরে ভিতরে ঝুমঝুমির মতো বার বার বাজিতে লাগিল যে দামিনী শুনিল না, তাঁর কথা শুনিতেই চাহিল না। যাহা বলিতেছিলেন তার খেই হারাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আর থাকিতে পারিলেন না। দামিনীর ঘরের কাছে আসিয়া বলিলেন, দামিনী, এখানে একলা কী করিতেছ? ও ঘরে আসিবে না?

দামিনী কহিল, না, একটু দরকার আছে।

গুরু উঁকি মারিয়া দেখিলেন, খাঁচার মধ্যে একটা চিল। দিন দুই হইল কেমন করিয়া টেলিগ্রাফের তারে ঘা খাইয়া চিলটা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, সেখানে কাকের দলের হাত হইতে দামিনী তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে, তার পর হইতে শুশ্রূষা চলিতেছে।

এই তো গেল চিল। আবার দামিনী একটা কুকুরের বাচ্ছা জোটাইয়াছে, তার রূপও যেমন কৌলীন্যও তেমনি। সে একটা মূর্তিমান রসভঙ্গ। করতালের একটু আওয়াজ পাইবামাত্র সে আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বিধাতার কাছে আর্তস্বরে নালিশ করিতে থাকে; সে নালিশ বিধাতা শোনেন না বলিয়াই রক্ষা, কিন্তু যারা শোনে তাদের ধৈর্য থাকে না।

একদিন যখন ছাদের কোণে একটা ভাঙা হাঁড়িতে দামিনী ফুলগাছের চর্চা করিতেছে এমন সময় শচীশ তাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজকাল তুমি ওখানে যাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছ কেন?

কোন্‌খানে?

গুরুজির কাছে।

কেন, আমাকে তোমাদের কিসের প্রয়োজন?

প্রয়োজন আমাদের কিছু নাই, কিন্তু তোমার তো প্রয়োজন আছে।

দামিনী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কিছু না, কিছু না।

শচীশ স্তম্ভিত হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, দেখো, তোমার মন অশান্ত হইয়াছে, যদি শান্তি পাইতে চাও তবে—

তোমরা আমাকে শান্তি দিবে? দিনরাত্রি মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া পাগল হইয়া আছ, তোমাদের শান্তি কোথায়? জোড়হাত করি তোমাদের, রক্ষা করো আমাকে— আমি শান্তিতেই ছিলাম। আমি শান্তিতেই থাকিব।

শচীশ বলিল, উপরে ঢেউ দেখিতেছ বটে, কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া ভিতরে তলাইতে পারিলে দেখিবে সেখানে সমস্ত শান্ত।

দামিনী দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, ওগো, দোহাই তোমাদের, আমাকে আর তলাইতে বলিয়ো না। আমার আশা তোমরা ছাড়িয়া দিলে তবেই আমি বাঁচিব।

২

নারীর হৃদয়ের রহস্য জানিবার মতো অভিজ্ঞতা আমার হইল না। নিতান্তই উপর হইতে, বাহির হইতে, যেটুকু দেখিলাম তাহাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যেখানে মেয়েরা দুঃখ পাইবে সেইখানেই তারা হৃদয় দিতে প্রস্তুত। এমন পশুর জন্য তারা আপনার বরণমালা গাঁথে যে লোক সেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভৎস করিতে পারে; আর তা যদি না হইল তবে এমন কারও দিকে তারা লক্ষ করে যার কণ্ঠে তাদের মালা পৌঁছায় না, যে মানুষ ভাবের সূক্ষ্মতায় এমনি মিলাইয়াছে যেন নাই বলিলেই হয়। মেয়েরা স্বয়ম্বরা হইবার বেলায় তাদেরই বর্জন করে যারা আমাদের মতো মাঝারি মানুষ, যারা স্থূলে সূক্ষ্মে মিশাইয়া তৈরি— নারীকে যারা নারী বলিয়াই জানে, অর্থাৎ, এটুকু জানে যে,

তারা কাদায় তৈরি খেলার পুতুল নয়, আবার সুরে তৈরি বীণার ঝংকারমাত্রও নহে। মেয়েরা আমাদের ত্যাগ করে, কেননা আমাদের মধ্যে না আছে লুব্ধ লালসার দুর্দান্ত মোহ, না আছে বিভোর ভাবুকতার রঙিন মায়া ; আমরা প্রবৃত্তির কঠিন পীড়নে তাদের ভাঙিয়া ফেলিতেও পারি না, আবার ভাবের তাপে গলাইয়া আপন কল্পনার ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেও জানি না ; তারা যা, আমরা তাদের ঠিক তাই বলিয়াই জানি— এইজন্য তারা যদি-বা আমাদের পছন্দ করে, ভালোবাসিতে পারে না। আমরাই তাদের সত্যকার আশ্রয়, আমাদেরই নিষ্ঠার উপর তারা নির্ভর করিতে পারে, আমাদের আত্মোৎসর্গ এতই সহজ যে তার কোনো দাম আছে সে কথা তারা ভুলিয়াই যায়। আমরা তাদের কাছে এইটুকুমাত্র বকশিশ পাই যে, তারা দরকার পড়িলেই নিজের ব্যবহারে আমাদের লাগায়, এবং হয়তো-বা আমাদের শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু— যাক, এ-সব খুব সম্ভব ক্ষোভের কথা, খুব সম্ভব এ-সমস্ত সত্য নয়, খুব সম্ভব আমরা যে কিছুই পাই না সেইখানেই আমাদের জিত— অন্তত, সেই কথা বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া থাকি।

দামিনী গুরুজির কাছে ঘেঁষে না তাঁর প্রতি তার একটা রাগ আছে বলিয়া ; দামিনী শচীশকে কেবলই এড়াইয়া চলে তার প্রতি তার মনের ভাব ঠিক উলটা রকমের বলিয়া। কাছাকাছি আমিই একমাত্র মানুষ যাকে লইয়া রাগ বা অনুরাগের কোনো বালাই নাই। সেইজন্য দামিনী আমার কাছে তার সেকালের কথা, একালের কথা, পাড়ায় কবে কী দেখিল কী হইল সেই-সমস্ত সামান্য কথা, সুযোগ পাইলেই অনর্গল বকিয়া যায়। আমাদের দোতলার ঘরের সামনে যে খানিকটা ঢাকা ছাদ আছে সেইখানে বসিয়া জাঁতি দিয়া সুপারি কাটিতে কাটিতে দামিনী যাহা-তাহা বকে— পৃথিবীর মধ্যে এই অতি সামান্য ঘটনাটা যে আজকাল শচীশের ভাবে-ভোলা চোখে এমন করিয়া পড়িবে তাহা আমি মনে করিতে পারিতাম না। ঘটনাটা হয়তো সামান্য না হইতে পারে, কিন্তু আমি জানিতাম, শচীশ যে মুল্লুকে বাস করে সেখানে ঘটনা বলিয়া কোনো উপসর্গই নাই ; সেখানে হ্লাদিনী ও সন্ধিনী ও যোগমায়া যাহা ঘটাইতেছে সে একটা নিত্যলীলা, সুতরাং তাহা ঐতিহাসিক নহে— সেখানকার চিরযমুনাতীরের চিরধীর সমীরের বাঁশি যারা শুনিতেছে তারা যে আশপাশের অনিত্য ব্যাপার চোখে কিছু দেখে বা কানে কিছু শোনে হঠাৎ তাহা মনে হয় না। অন্তত গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পূর্বে শচীশের চোখ-কান ইহা অপেক্ষা অনেকটা বোজা ছিল।

আমারও একটু ত্রুটি ঘটিতেছিল। আমি মাঝে মাঝে আমাদের রসালোচনার আসরে গরহাজির হইতে শুরু করিয়াছিলাম। সেই ফাঁক শচীশের কাছে ধরা পড়িতে লাগিল। একদিন সে আসিয়া দেখিল, গোয়ালাবাড়ি হইতে এক ভাঁড় দুধ কিনিয়া আনিয়া দামিনীর পোষা বেজিকে খাওয়াইবার জন্য তার পিছনে ছুটিতেছি। কৈফিয়তের হিসাবে এ কাজটা নিতান্তই অচল, সভাভঙ্গ পর্যন্ত এটা মুলতুবি রাখিলে লোকসান ছিল না, এমন-কি, বেজির-ক্ষুধানিবৃত্তির ভার স্বয়ং বেজির 'পরে রাখিলে জীবে দয়ার অত্যন্ত ব্যত্যয় হইত না অথচ নামে রুচির পরিচয় দিতে পারিতাম। তাই হঠাৎ শচীশকে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইতে হইল। ভাঁড়টা সেইজন্য রাখিয়া আত্মমর্যাদা-উদ্ধারের পন্থায় সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম।

কিন্তু, আশ্চর্য দামিনীর ব্যবহার। সে একটুও কুণ্ঠিত হইল না ; বলিল, কোথায় যান শ্রীবিলাসবাবু ?

আমি মাথা চুলকাইয়া বলিলাম, একবার—

দামিনী বলিল, উঁহাদের গান এতক্ষণে শেষ হইয়া গেছে। আপনি বসুন-না।

শচীশের সামনে দামিনীর এই প্রকার অনুরোধে আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

দামিনী কহিল, বেজিটাকে লইয়া মুশকিল হইয়াছে— কাল রাত্রে পাড়ার মুসলমানদের বাড়ি হইতে ও একটা মুরগি চুরি করিয়া খাইয়াছে। উহাকে ছাড়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীবিলাসবাবুকে বলিয়াছি একটা বড়ো দেখিয়া ঝুড়ি কিনিয়া আনিতে, উহাকে চাপা দিয়া রাখিতে হইবে।

বেজিকে দুধ খাওয়ানো, বেজির ঝুড়ি কিনিয়া আনা প্রভৃতি উপলক্ষে শ্রীবিলাসবাবুর আনুগত্যটা

শচীশের কাছে দামিনী যেন একটু উৎসাহ করিয়াই প্রচার করিল। যেদিন গুরুজি আমার সামনে শচীশকে তামাক সাজিতে বলিয়াছিলেন সেই দিনের কথাটা মনে পড়িল। জিনিসটা একই।

শচীশ কোনো কথা না বলিয়া কিছু দ্রুত চলিয়া গেল। দামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, শচীশ যে দিকে চলিয়া গেল সেই দিকে তাকাইয়া তার চোখ দিয়া বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়িল— সে মনে মনে কঠিন হাসি হাসিল।

কী যে সে বুঝিল তা সেই জানে কিন্তু ফল হইল এই, নিতান্ত সামান্য ছুতা করিয়া দামিনী আমাকে তলব করিতে লাগিল। আবার, এক-একদিন নিজের হাতে কোনো-একটা মিষ্টান্ন তৈরি করিয়া বিশেষ করিয়া আমাকেই সে খাওয়াইতে বসিল। আমি বলিলাম, শচীশদাকে—

দামিনী বলিল, তাঁকে খাইতে ডাকিলে বিরক্ত করা হইবে।

শচীশ মাঝে মাঝে দেখিয়া গেল আমি খাইতে বসিয়াছি।

তিন জনের মধ্যে আমার দশাটাই সব চেয়ে মন্দ। এই নাট্যের মুখ্য পাত্র যে দুটি তাদের অভিনয়ের আগাগোড়াই আত্মগত— আমি আছি প্রকাশ্যে, তার একমাত্র কারণ, আমি নিতান্তই গৌণ। তাহাতে এক-একবার নিজের ভাগ্যের উপরে রাগও হয়, অথচ উপলক্ষ সাজিয়া যেটুকু নগদ বিদায় জোটে সেটুকুর লোভও সামলাইতে পারি না। এমন মুশকিলেও পড়িয়াছি!

৩

কিছুদিন শচীশ পূর্বের চেয়ে আরো অনেক বেশি জোরের সঙ্গে করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিয়া বেড়াইল। তার পরে একদিন সে আসিয়া আমাকে বলিল, দামিনীকে আমাদের মধ্যে রাখা চলিবে না।

আমি বলিলাম, কেন?

সে বলিল, প্রকৃতির সংসর্গ আমাদের একেবারে ছাড়িতে হইবে।

আমি বলিলাম, তা যদি হয় তবে বুঝিব আমাদের সাধনার মধ্যে মস্ত একটা ভুল আছে।

শচীশ আমার মুখের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, তুমি যাহাকে প্রকৃতি বলিতেছ সেটা তো একটা প্রকৃত জিনিস; তুমি তাকে বাদ দিতে গেলেও সংসার হইতে সে তো বাদ পড়ে না। অতএব, সে যেন নাই এমন ভাবে যদি সাধনা করিতে থাক তবে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হইবে; একদিন সে ফাঁকি এমন ধরা পড়িবে তখন পালাইবার পথ পাইবে না।

শচীশ কহিল, ন্যায়ের তর্ক রাখো। আমি বলিতেছি কাজের কথা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে মেয়েরা প্রকৃতির চর, প্রকৃতির হুকুম তামিল করিবার জন্যই নানা সাজে সাজিয়া তারা মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে। চৈতন্যকে আবিষ্ট করিতে না পারিলে তারা মনিবের কাজ হাসিল করিতে পারে না। সেইজন্য চৈতন্যকে খোলসা রাখিতে হইলে প্রকৃতির এই-সমস্ত দূতীগুলিকে যেমন করিয়া পারি এড়াইয়া চলা চাই।

আমি কী-একটা বলিতে যাইতেছিলাম, আমাকে বাধা দিয়া শচীশ বলিল, ভাই বিশ্রী, প্রকৃতির মায়া দেখিতে পাইতেছ না, কেননা সেই মায়ার ফাঁদে আপনাকে জড়াইয়াছ। যে সুন্দর রূপ দেখাইয়া আজ তোমাকে সে ভুলাইয়াছে, প্রয়োজনের দিন ফুরাইয়া গেলেই সেই রূপের মুখোশ সে খসাইয়া ফেলিবে; যে তৃষ্ণার চশমায় ঐ রূপকে তুমি বিশ্বের সমস্তের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছ সময় গেলেই সেই তৃষ্ণাকে সুদ্ধ একেবারে লোপ করিয়া দিবে। যেখানে মিথ্যার ফাঁদ এমন স্পষ্ট করিয়া পাতা, দরকার কী সেখানে বাহাদুরি করিতে যাওয়া?

আমি বলিলাম, তোমার কথা সবই মানিতেছি ভাই, কিন্তু আমি এই বলি, প্রকৃতির বিশ্বজোড়া ফাঁদ আমি নিজের হাতে পাতি নাই এবং সেটাকে সম্পূর্ণ পাশ কাটাইয়া চলি এমন জায়গা আমি জানি না।

ইহাকে বেকবুল করা যখন আমাদের হাতে নাই তখন সাধনা তাহাকেই বলি, যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারা যায়। যাই বল ভাই, আমরা সে রাস্তায় চলিতেছি না, তাই সত্যকে আধখানা ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য এত বেশি ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরি।

শচীশ বলিল, তুমি কী রকম সাধনা চালাইতে চাও আর-একটু স্পষ্ট করিয়া বলো শুনি।

আমি বলিলাম, প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে, স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব ; সমস্যা এই যে, তরী কী হইলে ডুবিবে না, চলিবে। সেইজন্যই হালের দরকার।

শচীশ বলিল, তোমরা গুরু মান না বলিয়াই জান না যে, গুরুই আমাদের সেই হাল। সাধনাকে নিজের খেয়ালমত গড়িতে চাও ? শেষকালে মরিবে।

এই কথা বলিয়া শচীশ গুরুর ঘরে গেল এবং তাঁর পায়ের কাছে বসিয়া পা টিপিতে শুরু করিয়া দিল। সেইদিন শচীশ গুরুর জন্য তামাক সাজিয়া দিয়া তাঁর কাছে প্রকৃতির নামে নালিশ রুজু করিল।

এক দিনের তামাকে কথাটা শেষ হইল না। অনেক দিন ধরিয়া গুরু অনেক চিন্তা করিলেন। দামিনীকে লইয়া তিনি বিস্তর ভুগিয়াছেন। এখন দেখিতেছেন, এই একটিমাত্র মেয়ে তাঁর ভক্তদের একটানা ভক্তিস্রোতের মাঝখানে বেশ একটি ঘূর্ণির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু, শিবতোষ বাড়ি-ঘর-সম্পত্তি সমেত দামিনীকে তাঁর হাতে এমন করিয়া সঁপিয়া গেছে যে, তাকে কোথায় সরাইবেন তা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। তার চেয়ে কঠিন এই যে, গুরু দামিনীকে ভয় করেন।

এ দিকে শচীশ উৎসাহের মাত্রা দ্বিগুণ চৌগুণ চড়াইয়া এবং ঘন ঘন গুরুর পা টিপিয়া, তামাক সাজিয়া, কিছুতেই এ কথা ভুলিতে পারিল না যে, প্রকৃতি তার সাধনার রাস্তায় দিব্য করিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে।

একদিন পাড়ায় গোবিন্দজির মন্দিরে একদল নামজাদা বিদেশী কীর্তনওয়ালার কীর্তন চলিতেছিল। পালা শেষ হইতে অনেক রাত হইবে। আমি গোড়ার দিকেই ফস্‌ করিয়া উঠিয়া আসিলাম ; আমি যে নাই তা সেই ভিড়ের মধ্যে কারও কাছে ধরা পড়িবে মনে করি নাই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দামিনীর মন খুলিয়া গিয়াছিল। যে-সব কথা ইচ্ছা করিলেও বলিয়া ওঠা যায় না, বাধিয়া যায়, তাও সেদিন বড়ো সহজে এবং সুন্দর করিয়া তার মুখ দিয়া বাহির হইল। বলিতে বলিতে সে যেন নিজের মনের অনেক অজানা অন্ধকার কুঠরি দেখিতে পাইল। সেদিন নিজের সঙ্গে মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইবার একটা সুযোগ দৈবাৎ তার জুটিয়াছিল।

এমন সময়ে কখন যে শচীশ পিছন দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল, আমরা জানিতেও পাই নাই। তখন দামিনীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। অথচ, কথাটা বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু সেদিন তার সকল কথাই একটা চোখের জলের গভীরতার ভিতর দিয়া বহিয়া আসিতেছিল।

শচীশ যখন আসিল তখনো নিশ্চয়ই কীর্তনের পালা শেষ হইতে অনেক দেরি ছিল। বুঝিলাম, ভিতরে এতক্ষণ তাকে কেবলই ঠেলা দিয়াছে। দামিনী শচীশকে হঠাৎ সামনে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া পাশের ঘরের দিকে চলিল। শচীশ কাঁপা গলায় কহিল, শোনো দামিনী, একটা কথা আছে।

দামিনী আস্তে আস্তে আবার বসিল। আমি চলিয়া যাইবার জন্য উস্‌খুস্‌ করিতেই সে এমন করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল যে, আমি আর নড়িতে পারিলাম না।

শচীশ কহিল, আমরা যে প্রয়োজনে গুরুজির কাছে আসিয়াছি তুমি তো সে প্রয়োজনে আস নাই।

দামিনী কহিল, না।

শচীশ কহিল, তবে কেন তুমি এই ভক্তদের মধ্যে আছ ?

দামিনীর দুই চোখ যেন দপ্‌ করিয়া জ্বলিল ; সে কহিল, কেন আছি ! আমি কি সাধ করিয়া আছি ! তোমাদের ভক্তরা যে এই ভক্তিহীনাকে ভক্তির গারদে পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিয়াছে। তোমরা কি আমার আর-কোনো রাস্তা রাখিয়াছ ?

শচীশ বলিল, আমরা ঠিক করিয়াছি, তুমি যদি কোনো আত্মীয়ার কাছে গিয়া থাক তবে আমরা খরচপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

তোমরা ঠিক করিয়াছ ?

হাঁ।

আমি ঠিক করি নাই।

কেন, ইহাতে তোমার অসুবিধাটা কী ?

তোমাদের কোনো ভক্ত-বা এক মতলবে এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোনো ভক্ত-বা আর-এক মতলবে আর-এক বন্দোবস্ত করিবেন— মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ-পঁচিশের ঘুঁটি ?

শচীশ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

দামিনী কহিল, আমাকে তোমাদের ভালো লাগিবে বলিয়া নিজের ইচ্ছায় তোমাদের মধ্যে আমি আসি নাই। আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না।

বলিতে বলিতে মুখের উপর দুই হাত দিয়া তার আঁচল চাপিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সেদিন শচীশ আর কীর্তন শুনিতে গেল না। সেই ছাদে মাটির উপরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন দক্ষিণহাওয়ায় দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল। আমি বাহির হইয়া গিয়া অন্ধকারে গ্রামের নির্জন রাস্তার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

৪

গুরুজি আমাদের দুজনকে যে রসের স্বর্গলোকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, আজ মাটির পৃথিবী তাহাকে ভাঙিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিল। এতদিন তিনি রূপকের পাত্রে ভাবের মদ কেবলই আমাদিগকে ভরিয়া ভরিয়া পান করাইয়াছেন, এখন রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকি হইয়া পাত্রটা মাটির উপরে কাত হইয়া পড়িবার জো হইয়াছে। আসন্ন বিপদের লক্ষণ তাঁর অগোচর রহিল না।

শচীশ আজকাল কেমন-এক-রকম হইয়া গেছে। যে ঘুড়ির লখ ছিঁড়িয়া গেছে তারই মতো এখনো হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে, কিন্তু পাক খাইয়া পড়িল বলিয়া, আর দেরি নাই। জপে তপে অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই, কিন্তু চোখ দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তার পা টলিতেছে।

আর, দামিনী আমার সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করিবার রাস্তা রাখে নাই। সে যতই বুঝিল গুরুজি মনে মনে ভয় এবং শচীশ মনে মনে ব্যথা পাইতেছে ততই সে আমাকে লইয়া আরো বেশি টানাটানি করিতে লাগিল। এমন হইল যে, হয়তো আমি শচীশ এবং গুরুজি বসিয়া কথা চলিতেছে এমন সময় দরজার কাছে আসিয়া দামিনী ডাক দিয়া গেল, শ্রীবিলাসবাবু, একবার আসুন তো। শ্রীবিলাসবাবুকে কী যে তার দরকার তাও বলে না। গুরুজি আমার মুখের দিকে চান, শচীশ আমার মুখের দিকে চায়, আমি উঠি কি না উঠি করিতে করিতে দরজার দিকে তাকাইয়া ধাঁ করিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া যাই। আমি চলিয়া গেলেও খানিকক্ষণ কথাটা চালাইবার একটু চেষ্টা চলে, কিন্তু চেষ্টাটা কথাটার চেয়ে বেশি হইয়া উঠে, তার পরে কথাটা বন্ধ হইয়া যায়। এমনি করিয়া ভারি একটা ভাঙাচোরা এলোমেলো কাণ্ড হইতে লাগিল, কিছুতেই কিছু আর আঁট বাঁধিতে চাহিল না।

আমরা দুজনেই গুরুজির দলের দুই প্রধান বাহন, ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা বলিলেই হয়— কাজেই আমাদের আশা তিনি সহজে ছাড়িতে পারেন না। তিনি আসিয়া দামিনীকে বলিলেন, মা দামিনী, এবার কিছু দূর ও দুর্গম জায়গায় যাইব। এখান হইতেই তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কোথায় যাইব ?

তোমার মাসির ওখানে।

সে আমি পারিব না।

কেন ?

প্রথম, তিনি আমার আপন মাসি নন ; তার পরে, তাঁর কিসের দায় যে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে রাখিবেন ?

যাতে তোমার খরচ তাঁর না লাগে আমরা 'তার—

দায় কি কেবল খরচের ? তিনি যে আমার দেখাশোনা খবরদারি করিবেন সে ভার তাঁর উপরে নাই।

আমি কি চিরদিনই সমস্তক্ষণ তোমাকে আমার সঙ্গে রাখিব ?

সে জবাব কি আমার দিবার ?

যদি আমি মরি তুমি কোথায় যাইবে ?

সে কথা ভাবিবার ভার আমার উপর কেহ দেয় নাই। আমি ইহাই খুব করিয়া বুঝিয়াছি, আমার মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই ; আমার বাড়ি নাই, কড়ি নাই, কিছুই নাই। সেইজন্যই আমার ভার বড়ো বেশি ; সে ভার আপনি সাধ করিয়াই লইয়াছেন ; এ আপনি অন্যের ঘাড়ে নামাইতে পারিবেন না।

এই বলিয়া দামিনী সেখান হইতে চলিয়া গেল। গুরুজি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, মধুসূদন !

একদিন আমার প্রতি দামিনীর হুকুম হইল, তার জন্য ভালো বাংলা বই কিছু আনাইয়া দিতে। বলা বাহুল্য, ভালো বই বলিতে দামিনী ভক্তিরত্নাকর বুঝিত না, এবং আমার 'পরে তার কোনো রকম দাবি করিতে কিছুমাত্র বাধিত না। সে একরকম করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল যে দাবি করাই আমার প্রতি সব চেয়ে অনুগ্রহ করা। কোনো কোনো গাছ আছে যাদের ডালপালা ছাঁটিয়া দিলেই থাকে ভালো—দামিনীর সম্বন্ধে আমি সেই জাতের মানুষ।

আমি যে লেখকের বই আনাইয়া দিলাম সে লোকটা একেবারে নির্জলা আধুনিক। তার লেখায় মনুর চেয়ে মানবের প্রভাব অনেক বেশি প্রবল। বইয়ের প্যাকেটটা গুরুজির হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি ভুরু তুলিয়া বলিলেন, কী হে শ্রীবিলাস, এ-সব বই কিসের জন্য ?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি দুই-চারিটি পাতা উলটাইয়া বলিলেন, এর মধ্যে সাত্ত্বিকতার গন্ধ তো বড়ো পাই না। লেখকটিকে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

আমি ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, একটু যদি মনোযোগ করিয়া দেখেন তো সত্যের গন্ধ পাইবেন।

আসল কথা, ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ জমিতেছিল। ভাবের নেশার অবসাদে আমি একেবারে জর্জরিত। মানুষকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সুদ্ধমাত্র মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলাকে লইয়া দিনরাত্রি এমন করিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে আমার যতদূর অরুচি হইবার তা হইয়াছে।

গুরুজি আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, আচ্ছা, তবে একবার মনোযোগ করিয়া দেখা যাক। বলিয়া বইগুলা তাঁর বালিশের নীচে রাখিলেন। বুঝিলাম, এ তিনি ফিরাইয়া দিতে চান না।

নিশ্চয় দামিনী আড়াল হইতে ব্যাপারখানার আভাস পাইয়াছিল। দরজার কাছে আসিয়া সে আমাকে বলিল, আপনাকে যে বইগুলা আনাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম সে কি এখনো আসে নাই ?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি বলিলেন, মা, সে বইগুলি তো তোমার পড়িবার যোগ্য নয়।

দামিনী কহিল, আপনি বুঝিবেন কী করিয়া ?

গুরুজি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, তুমিই বা বুঝিবে কী করিয়া ?

আমি পূর্বেই পড়িয়াছি, আপনি বোধ হয় পড়েন নাই।

তবে আর প্রয়োজন কী?

আপনার কোনো প্রয়োজনে তো কোথাও বাধে না, আমারই কিছুতে বুঝি প্রয়োজন নাই?

আমি সন্ন্যাসী, তা তুমি জান।

আমি সন্ন্যাসিনী নই তা আপনি জানেন, আমার ও বইগুলি পড়িতে ভালো লাগে। আপনি দিন।

গুরুজি বালিশের নীচে হইতে বইগুলি বাহির করিয়া আমার হাতের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। আমি দামিনীকে দিলাম।

ব্যাপারটি যে ঘটিল তার ফল হইল, দামিনী যে-সব বই আপনার ঘরে বসিয়া একলা পড়িত তাহা আমাকে ডাকিয়া পড়িয়া শুনাইতে বলে। বারান্দায় বসিয়া আমাদের পড়া হয়, আলোচনা চলে। শচীশ সমুখ দিয়া বার বার আসে আর যায়, মনে করে 'বসিয়া পড়ি', অনাহূত বসিতে পারে না।

একদিন বইয়ের মধ্যে ভারি একটা মজার কথা ছিল, শুনিয়া দামিনী খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমরা জানিতাম সেদিন মন্দিরে মেলা, শচীশ সেইখানে গিয়াছে। হঠাৎ দেখি পিছনের ঘরের দরজা খুলিয়া শচীশ বাহির হইয়া আসিল এবং আমাদের সঙ্গেই বসিয়া গেল।

সেই মুহূর্তেই দামিনীর হাসি একেবারে বন্ধ, আমিও থতমত খাইয়া গেলাম। ভাবিলাম, শচীশের সঙ্গে যা হয় একটা কিছু বলি, কিন্তু কোনো কথাই ভাবিয়া পাইলাম না, বইয়ের পাতা কেবলই নিঃশব্দে উলটাইতে লাগিলাম। শচীশ যেমন হঠাৎ আসিয়া বসিয়াছিল তেমনি হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। তার পরে সেদিন আমাদের আর পড়া হইল না। শচীশ বোধ করি বুঝিল না যে, দামিনী ও আমার মাঝখানে যে আড়ালটা নাই বলিয়া সে আমাকে ঈর্ষা করিতেছে সেই আড়ালটা আছে বলিয়াই আমি তাকে ঈর্ষা করি।

সেইদিনই শচীশ গুরুজিকে গিয়া বলিল, প্রভু, কিছুদিনের জন্য একলা সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া আসিতে চাই। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।

গুরুজি উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, খুব ভালো কথা, তুমি যাও।

শচীশ চলিয়া গেল। দামিনী আমাকে আর পড়িতেও ডাকিল না, আমাকে তার অন্য কোনো প্রয়োজনও হইল না। তাকে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিতে যাইতেও দেখি না। ঘরেই থাকে, সে ঘরের দরজা বন্ধ।

কিছুদিন যায়। একদিন গুরুজি দুপুরবেলা ঘুমাইতেছেন, আমি ছাদের বারান্দায় বসিয়া চিঠি লিখিতেছি, এমন সময়ে শচীশ হঠাৎ আসিয়া আমার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দামিনীর বন্ধ দরজায় ঘা মারিয়া বলিল, দামিনী! দামিনী!

দামিনী তখনই দরজা খুলিয়া বাহির হইল। শচীশের এ কী চেহারা! প্রচণ্ড-ঝড়ের-ঝাপ্‌টা-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা; চোখ দুটো কেমনতরো, চুল উস্কোখুস্কো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।

শচীশ বলিল, দামিনী, তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম— আমার ভুল হইয়াছিল, আমাকে মাপ করো।

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, ও কী কথা আপনি বলিতেছেন?

না, আমাকে মাপ করো। আমাদেরই সাধনার সুবিধার জন্য তোমাকে ইচ্ছামত ছাড়িতে বা রাখিতে পারি এত বড়ো অপরাধের কথা আমি কখনো আর মনেও আনিব না। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, সে তোমাকে রাখিতেই হইবে।

দামিনী তখনই নত হইয়া শচীশের দুই পা ছুঁইয়া বলিল, আমাকে হুকুম করো তুমি।

শচীশ বলিল, আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাত হইয়া থাকিয়ো না।

দামিনী কহিল, তাই যোগ দিব, আমি কোনো অপরাধ করিব না। এই বলিয়া সে আবার নত হইয়া পা ছুঁইয়া শচীশকে প্রণাম করিল, এবং আবার বলিল, আমি কোনো অপরাধ করিব না।

৫

পাথর আবার গলিল। দামিনীর যে অসহ্য দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না। পূজায় অর্চনায় সেবায় মাধুর্যের ফুল ফুটিয়া উঠিল। যখন কীর্তনের আসর জমিত, গুরুজি আমাদের লইয়া যখন আলোচনায় বসিতেন, যখন তিনি গীতা বা ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, দামিনী কখনো একদিনের জন্য অনুপস্থিত থাকিত না। তার সাজসজ্জারও বদল হইয়া গেল। আবার সে তার তসরের কাপড়খানি পরিল ; দিনের মধ্যে যখনই তাকে দেখা গেল মনে হইল সে যেন এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে।

গুরুজির সঙ্গে ব্যবহারেই তার সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা। সেখানে সে যখন নত হইত তখন তার চোখের কোণে আমি একটা রুদ্র তেজের ঝলক দেখিতে পাইতাম। আমি বেশ জানি, গুরুজির কোনো হুকুম সে মনের মধ্যে একটুও সহিতে পারে না, কিন্তু তাঁর সব কথা সে এতদূর একান্ত করিয়া মানিয়া লইল যে, একদিন তিনি তাকে বাংলার সেই বিষম আধুনিক লেখকের দুর্বিষহ রচনার বিরুদ্ধে সাহস করিয়া আপত্তি জানাইতে পারিলেন। পরের দিন দেখিলেন, তাঁর দিনে বিশ্রাম করিবার বিছানার কাছে কতকগুলা ফুল রহিয়াছে, ফুলগুলি সেই লোকটার বইয়ের ছেঁড়া পাতার উপরে সাজানো।

অনেক বার দেখিয়াছি গুরুজি শচীশকে যখন নিজের সেবায় ডাকিতেন সেইটেই দামিনীর কাছে সব চেয়ে অসহ্য ঠেকিত। সে কোনোমতে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া শচীশের কাজ নিজে করিয়া দিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সব সময়ে তাহা সম্ভব হইত না। তাই শচীশ যখন গুরুজির কলিকায় ফুঁ দিতে থাকিত তখন দামিনী প্রাণপণে মনে মনে জপিত, অপরাধ করিব না, অপরাধ করিব না।

কিন্তু শচীশ যাহা ভাবিয়াছিল তার কিছুই হইল না। আর-একবার দামিনী যখন এমনি করিয়াই নত হইয়াছিল তখন শচীশ তার মধ্যে কেবল মাধুর্যকেই দেখিয়াছিল, মধুরকে দেখে নাই। এবারে স্বয়ং দামিনী তার কাছে এমনি সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ সমস্তকে ঠেলিয়া সে দেখা দেয়, কিছুতেই তাকে চাপা দেওয়া চলে না। শচীশ তাকে এতই স্পষ্ট দেখিতে পায় যে, তার ভাবের ঘোর ভাঙিয়া যায়। এখন সে তাকে কোনোমতেই একটা ভাবরসের রূপকমাত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না। এখন দামিনী গানগুলিকে সাজায় না, গানগুলিই দামিনীকে সাজাইয়া তোলে।

এখানে এই সামান্য কথাটুকু বলিয়া রাখি, এখন আমাকে দামিনীর আর কোনো প্রয়োজন নাই। আমার 'পরে তার সমস্ত ফর্মাশ হঠাৎ একেবারে বন্ধ। আমার যে কয়েকটি সহযোগী ছিল তার মধ্যে চিলটা মরিয়াছে, বেজিটা পালাইয়াছে, কুকুর-ছানাটার অনাচারে গুরুজি বিরক্ত বলিয়া সেটাকে দামিনী বিলাইয়া দিয়াছে। এইরূপে আমি বেকার ও সঙ্গীহীন হইয়া পড়াতে পুনশ্চ গুরুজির দরবারে পূর্বের মতো ভর্তি হইলাম, যদিচ সেখানকার সমস্ত কথাবার্তা গানবাজনা আমার কাছে একেবারে বিশ্রী রকমের বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল।

৬

একদিন শচীশ কল্পনার খোলা-ভাঁটিতে পূর্ব ও পশ্চিমের, অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্র চোলাইয়া একটা অপূর্ব আরক বানাইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ দামিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো, তোমরা একবার শীঘ্র এসো।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম, কী হইয়াছে ?

দামিনী কহিল, নবীনের স্ত্রী বোধ হয় বিষ খাইয়াছে।

নবীন আমাদের গুরুজির একজন চেলার আত্মীয়— আমাদের প্রতিবেশী, সে আমাদের কীর্তনের দলের একজন গায়ক। গিয়া দেখিলাম, তার স্ত্রী তখন মরিয়া গেছে। খবর লইয়া জানিলাম, নবীনের স্ত্রী তার মাতৃহীনা বোনকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল। ইহারা কুলীন, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া দায়। মেয়েটিকে দেখিতে ভালো। নবীনের ছোটো ভাই তাকে বিবাহ করিবে বলিয়া পছন্দ করিয়াছে।

সে কলিকাতায় কালেজে পড়ে, আর কয়েক মাস পরে পরীক্ষা দিয়া আগামী আষাঢ় মাসে সে বিবাহ করিবে এইরকম কথা। এমন সময়ে নবীনের স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িল যে তার স্বামীর ও তার বোনের পরস্পর আসক্তি জন্মিয়াছে। তখন তার বোনকে বিবাহ করিবার জন্য সে স্বামীকে অনুরোধ করিল। খুব বেশি পীড়াপীড়ি করিতে হইল না। বিবাহ চুকিয়া গেলে পর নবীনের প্রথমা স্ত্রী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

তখন আর কিছু করিবার ছিল না। আমরা ফিরিয়া আসিলাম। গুরুজির কাছে অনেক শিষ্য জুটিল, তারা তাঁকে কীর্তন শুনাইতে লাগিল— তিনি কীর্তনে যোগ দিয়া নাচিতে লাগিলেন।

প্রথম রাত্রে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। ছাদের যে কোণটার দিকে একটা চালতা গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সেইখানটার ছায়া-আলোর সংগমে দামিনী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শচীশ তার পিছন দিকের ঢাকা বারান্দার উপরে আস্তে আস্তে পায়চারি করিতেছে। আমার ডায়ারি লেখা রোগ, ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া লিখিতেছি।

সেদিন কোকিলের আর ঘুম ছিল না। দক্ষিনে হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো যেন কথা বলিয়া উঠিতে চায়, আর তার উপরে চাঁদের আলো ঝিল্‌মিল্ করিয়া উঠে। হঠাৎ এক সময়ে শচীশের কী মনে হইল, সে দামিনীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। দামিনী চমকিয়া মাথায় কাপড় দিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। শচীশ ডাকিল, দামিনী!

দামিনী থমকিয়া দাঁড়াইল। জোড়হাত করিয়া কহিল, প্রভু, আমার একটা কথা শোনো।

শচীশ চুপ করিয়া তার মুখের দিকে চাহিল। দামিনী কহিল, আমাকে বুঝাইয়া দাও, তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন? তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে?

আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। দামিনী কহিল, তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?

আমি থাকিতে পারিলাম না; বলিয়া উঠিলাম, আমরা স্ত্রীলোককে আমাদের চতুঃসীমানা হইতে দূরে খেদাইয়া রাখিয়া নিরাপদে রসের চর্চা করিবার ফন্দি করিয়াছি।

আমার কথায় একেবারেই কান না দিয়া দামিনী শচীশকে কহিল, আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্ত শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেবানো যায় না। তোমার গুরু যে-পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে-পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই। ঐ যে মেয়েটা মরিল, রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কী তার কুৎসিত চেহারা সে তো দেখিলে! প্রভু, জোড়হাত করিয়া বলি, ঐ রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে তো সে তুমি।

ক্ষণকালের জন্য আমরা তিন জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। চারি দিক এমনি স্তব্ধ হইয়া উঠিল যে আমার মনে হইল, যেন ঝিল্লির শব্দে পাণ্ডুবর্ণ আকাশটার সমস্ত গা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া আসিতেছে।

শচীশ বলিল, বলো আমি তোমার কী করিতে পারি।

দামিনী বলিল, তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ-সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস— যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইয়ো না।

শচীশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাই হইবে।

দামিনী শচীশের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। গুন্ গুন্ করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু! আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও।

পরিশিষ্ট

আবার একদিন কানাকানি এবং কাগজে কাগজে গালাগালি চলিল যে, ফের শচীশের মতের বদল হইয়াছে। একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম ; তার পরে আর-একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁওয়া স্নান-তর্পণ যোগযাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না। তার পরে আর-একদিন এই-সমস্তই মানিয়া-লওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল— কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল আগেকার মতো আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে, কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়াবিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।

আর-একটা কথা লইয়া কাগজে বিস্তর বিদ্রূপ ও কটূক্তি হইয়া গেছে। আমার সঙ্গে দামিনীর বিবাহ হইয়াছে— এই বিবাহের রহস্য কী তা সকলে বুঝিবে না, বোঝার প্রয়োজনও নাই।

শ্রীবিলাস

১

এখানে এক সময়ে নীলকুঠি ছিল। তার সমস্ত ভাঙিয়াচুরিয়া গেছে, কেবল গুটিকতক ঘর বাকি। দামিনীর মৃতদেহ দাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় এই জায়গাটা আমার পছন্দ হইল, তাই কিছুদিনের জন্য এখানে রহিয়া গেলাম।

নদী হইতে কুঠি পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল তার দুই ধারে শিশুগাছের সারি। বাগানে ঢুকিবার ভাঙা গেটের দুটা থাম আর পাঁচিলের এক দিকের খানিকটা আছে, কিন্তু বাগান নাই। থাকিবার মধ্যে এক কোণে কুঠির কোন্-এক মুসলমান গোমস্তার গোর; তার ফাটলে ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিফুলের এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, একেবারে ফুলে-ভরা— বাসরঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিনা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে। দিঘির পাড় ভাঙিয়া জল শুকাইয়া গেছে; তার তলায় ধোনের সঙ্গে মিলাইয়া চাষিরা ছোলার চাষ করিয়াছে; আমি যখন সকালবেলায় শেৎলা-পড়া ইটের ঢিবিটার উপরে শিশুর ছায়ায় বসিয়া থাকি তখন ধোনেফুলের গন্ধে আমার মগজ ভরিয়া যায়।

বসিয়া বসিয়া ভাবি, এই নীলকুঠি, যেটা আজ গো-ভাগাড়ে গোরুর হাড়-কখানার মতো পড়িয়া আছে সে যে একদিন সজীব ছিল। সে আপনার চারি দিকে সুখদুঃখের যে ঢেউ তুলিয়াছিল মনে হইয়াছিল সে তুফান কোনোকালে শান্ত হইবে না। যে প্রচণ্ড সাহেবটা এইখানে বসিয়া হাজার হাজার গরিব চাষার রক্তকে নীল করিয়া তুলিয়াছিল, তার কাছে আমি সামান্য বাঙালির ছেলে কে-ই বা! কিন্তু পৃথিবী কোমরে আপন সবুজ আঁচলখানি আঁটিয়া বাঁধিয়া অনায়াসে তাকে-সুদ্ধ তার নীলকুঠি-সুদ্ধ সমস্ত বেশ করিয়া মাটি দিয়া নিছিয়া পুঁছিয়া নিকাইয়া দিয়াছে— যা একটু-আধটু সাবেক দাগ দেখা যায় আরো এক পোঁচ লেপ পড়িলেই একেবারে সাফ হইয়া যাইবে।

কথাটা পুরানো, আমি তার পুনরুক্তি করিতে বসি নাই। আমার মন বলিতেছে, না গো, প্রভাতের পর প্রভাতে এ কেবলমাত্র কালের উঠান-নিকানো নয়। এই নীলকুঠির সাহেবটা আর তার নীলকুঠির বিভীষিকা একটুখানি ধুলার চিহ্নের মতো মুছিয়া গেছে বটে— কিন্তু আমার দামিনী!

আমি জানি, আমার কথা কেহ মানিবে না। শংকরাচার্যের মোহমুদ্গর কাহাকেও রেহাই করে না। মায়াময়মিদমখিলং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শংকরাচার্য ছিলেন সন্ন্যাসী— কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ এ-সব কথা তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু এর মানে বুঝেন নাই। আমি সন্ন্যাসী নই, তাই আমি বেশ করিয়া জানি দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা নয়।

কিন্তু শুনিতে পাই— গৃহীরাও এমন বৈরাগ্যের কথা বলে। তা হইবে। তারা কেবলমাত্র গৃহী, তারা হারায় তাদের গৃহিণীকে। তাদের গৃহও মায়া বটে, তাদের গৃহিণীও তাই। ও-সব যে হাতে-গড়া জিনিস, ঝাঁট পড়িলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।

আমি তো গৃহী হইবার সময় পাইলাম না; আর সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই, সেই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে?

দামিনীকে যদি আমি কেবলমাত্র ঘরের গৃহিণী করিয়াই জানিতাম তবে অনেক কথা লিখিতাম না। তাকে আমি সেই সম্বন্ধের চেয়ে বড়ো করিয়া এবং সত্য করিয়া জানিয়াছি বলিয়াই সব কথা খোলসা করিয়া লিখিতে পারিলাম, লোকে যা বলে বলুক।

মায়ার সংসারে মানুষ যেমন করিয়া দিন কাটায় তেমনি করিয়া দামিনীকে লইয়া যদি আমি পুরামাত্রায় ঘরকন্না করিতে পারিতাম তবে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে পান চিবাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম, তবে দামিনীর মৃত্যুর পরে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতাম 'সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ', এবং

সংসারের বৈচিত্র্য আবার একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কোনো একজন পিসি বা মাসির অনুরোধ শিরোধার্য করিয়া লইতাম। কিন্তু পুরাতন জুতাজোড়াটার মধ্যে পা যেমন ঢোকে তেমন অতি সহজে আমি আমার সংসারের মধ্যে প্রবেশ করি নাই। গোড়া হইতেই সুখের প্রত্যাশা ছাড়িয়াছিলাম। না, সে কথা ঠিক নয়— সুখের প্রত্যাশা ছাড়িব এত বড়ো অমানুষ আমি নই। সুখ নিশ্চয়ই আশা করিতাম, কিন্তু সুখ দাবি করিবার অধিকার আমি রাখি নাই।

কেন রাখি নাই ? তার কারণ, আমিই দামিনীকে বিবাহ করিতে রাজি করাইয়াছিলাম। কোনো রাঙা চেলির ঘোমটার নীচে শাহানা রাগিণীর তানে তো আমাদের শুভদৃষ্টি হয় নাই ! দিনের আলোতে সব দেখিয়া-শুনিয়া জানিয়া-বুঝিয়াই এ কাজ করিয়াছি।

লীলানন্দস্বামীকে ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিলাম তখন চালচুলার কথা ভাবিবার সময় আসিল। এতদিন যেখানে যাই খুব ঠাসিয়া গুরুর প্রসাদ খাইলাম, ক্ষুধার চেয়ে অজীর্ণের পীড়াতেই বেশি ভোগাইল। পৃথিবীতে মানুষকে ঘর তৈরি করিতে, ঘর রক্ষা করিতে, অন্তত ঘর ভাড়া করিতে হয়, সে কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছিলাম ; আমরা কেবল জানিতাম যে, ঘরে বাস করিতে হয়। গৃহস্থ যে কোন্‌খানে হাত-পা গুটাইয়া একটুখানি জায়গা করিয়া লইবে সে কথা আমরা ভাবি নাই, কিন্তু আমরা যে কোথায় দিব্য হাত-পা ছড়াইয়া আরাম করিয়া থাকিব গৃহস্থেরই মাথায় মাথায় সেই ভাবনা ছিল।

তখন মনে পড়িল জ্যাঠামশায় শচীশকে তাঁর বাড়ি উইলে লিখিয়া দিয়াছেন। উইলটা যদি শচীশের হাতে থাকিত তবে এতদিনে ভাবের স্রোতে রসের ঢেউয়ে কাগজের নৌকাখানার মতো সেটা ডুবিয়া যাইত। সেটা ছিল আমার কাছে, আমিই ছিলাম এক্‌জিক্যুটর। উইলে কতকগুলি শর্ত ছিল, সেগুলা যাহাতে চলে সেটার ভার আমার উপরে। তার মধ্যে প্রধান তিনটা এই, কোনোদিন এ বাড়িতে পূজা-অর্চনা হইতে পারিবে না, নীচের তলায় পাড়ার মুসলমান চামার ছেলেদের জন্য নাইট্‌স্কুল বসিবে, আর শচীশের মৃত্যুর পর সমস্ত বাড়িটাই ইহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য দান করিতে হইবে। পৃথিবীতে পুণ্যের উপরে জ্যাঠামশায়ের সব চেয়ে রাগ ছিল ; তিনি বৈষয়িকতার চেয়ে এটাকে অনেক বেশি নোংরা বলিয়া ভাবিতেন, পাশের বাড়ির ঘোরতর পুণ্যের হাওয়াটাকে কাটাইয়া দিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইংরাজিতে তিনি ইহাকে বলিতেন স্যানিটারি প্রিকশন্‌স্।

শচীশকে বলিলাম, চলো এবার সেই কলিকাতার বাড়িতে।

শচীশ বলিল, এখনো তার জন্য ভালো করিয়া তৈরি হইতে পারি নাই।

তার কথা বুঝিতে পারিলাম না। সে বলিল, একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলে আমি শহরে ফিরিতে সাহস করি না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কী করিতে হইবে বলো।

শচীশ বলিল, তোমরা দুজনে যাও, আমি কিছুদিন একলা ফিরিব। একটা যেন কিনারার মতো দেখিতেছি, এখন যদি তার দিশা হারাই তবে আর খুঁজিয়া পাইব না।

আড়ালে আসিয়া দামিনী আমাকে বলিল, সে হয় না। একলা ফিরিবেন, উঁহার দেখাশুনা করিবে কে ? সেই যে একবার একলা বাহির হইয়াছিলেন, কী চেহারা লইয়া ফিরিয়াছিলেন সে কথা মনে করিলে আমার ভয় হয়।

সত্য কথা বলিব ? দামিনীর এই উদ্‌বেগে আমার মনে যেন একটা রাগের ভিমরুল হুল ফুটাইয়া দিল, জ্বালা করিতে লাগিল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর শচীশ তো প্রায় দু বছর একলা ফিরিয়াছিল, মারা তো পড়ে নাই। মনের ভাব চাপা রহিল না, একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলিয়া ফেলিলাম।

দামিনী বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, মানুষের মরিতে অনেক সময় লাগে সে আমি জানি। কিন্তু একটুও দুঃখ পাইতে দিব কেন, আমরা যখন আছি।

আমরা ! বহুবচনের অন্তত আধখানা অংশ এই হতভাগা শ্রীবিলাস। পৃথিবীতে এক দলের

লোককে দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য আর-এক দলকে দুঃখ পাইতে হইবে। এই দুই জাতের মানুষ লইয়া সংসার। আমি যে কোন্ জাতের দামিনী তাহা বুঝিয়া লইয়াছে। যাক, দলে টানিল এই আমার সুখ।

শচীশকে গিয়া বলিলাম, বেশ তো, শহরে এখনই নাই গেলাম। নদীর ধারে ঐ যে পোড়ো বাড়ি আছে ওখানে কিছুদিন কাটানো যাক। বাড়িটাতে ভূতের উৎপাত আছে বলিয়া গুজব, অতএব মানুষের উৎপাত ঘটিবে না।

শচীশ বলিল, আর তোমরা?

আমি বলিলাম, আমরা ভূতের মতোই যতটা পারি গা-ঢাকা দিয়া থাকিব।

শচীশ দামিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। সে চাহনিতে হয়তো একটু ভয় ছিল।

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, তুমি আমার গুরু। আমি যত পাপিষ্ঠা হই আমাকে সেবা করিবার অধিকার দিয়ো।

২

যাই বল, আমি শচীশের এই সাধনার ব্যাকুলতা বুঝিতে পারি না। একদিন তো এ জিনিসটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি; এখন আর যাই হোক হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। আলেয়ার আলো নয়, এ যে আগুন। শচীশের মধ্যে ইহার দাহটা যখন দেখিলাম তখন ইহাকে লইয়া জ্যাঠামশায়ের চেলাগিরি করিতে আর সাহস হইল না। কোন্ ভূতের বিশ্বাসে ইহার আদি এবং কোন্ অদ্ভুতের বিশ্বাসে ইহার অন্ত তাহা লইয়া হার্বার্ট্ স্পেন্সরের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া কী হইবে— স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা এক দিক হইতে আর-এক দিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

এতদিন সে নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া গুরুর সেবা করিয়া দিনরাত অস্থির ছিল, সে একরকম ছিল ভালো। মনের সমস্ত চেষ্টা প্রত্যেক মুহূর্তে ফুঁকিয়া দিয়া একেবারে সে নিজেকে দেউলে করিয়া দিত। এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর ভাবসম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।

আমি একদিন আর থাকিতে পারিলাম না; বলিলাম, দেখো শচীশ, আমার বোধ হয় তোমার একজন কোনো গুরুর দরকার, যার উপরে ভর করিয়া তোমার সাধনা সহজ হইবে।

শচীশ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, চুপ করো বিশ্রী, চুপ করো— সহজকে কিসের দরকার? ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন।

আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, সত্যকে পাইবার জন্যই তো পথ দেখাইবার—

শচীশ অধীর হইয়া বলিল, ওগো, এ তোমার ভূগোলবিবরণের সত্য নয়, আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন— গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।

এই এক শচীশের মুখ দিয়া কতবার যে কত উলটা কথাই শোনা গেল! আমি শ্রীবিলাস, জ্যাঠামশায়ের চেলা বটে, কিন্তু তাঁকে গুরু বলিলে তিনি আমাকে চেলাকাঠ লইয়া মারিতে আসিতেন। সেই-আমাকে দিয়া শচীশ গুরুর পা টিপাইয়া লইল, আবার দুদিন না যাইতেই সেই আমাকেই এই বক্তৃতা! আমার হাসিতে সাহস হইল না, গম্ভীর হইয়া রহিলাম।

শচীশ বলিল, আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ কথাটার অর্থ কী। আর-সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন; যদি তাঁকে পাই তো আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।

তর্ক করা আমার স্বভাব, আমি সহজে ছাড়িবার পাত্র নই; আমি বলিলাম, যে কবি সে মনের

ভিতর হইতে কবিতা পায়, যে কবি নয় সে অন্যের কাছ হইতে কবিতা নেয়।

শচীশ অম্লান মুখে বলিল, আমি কবি।

বাস্— চুকিয়া গেল, চলিয়া আসিলাম।

শচীশের খাওয়া নাই, শোওয়া নাই, কখন কোথায় থাকে হুঁশ থাকে না। শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি-শান-দেওয়া ছুরির মতো সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিলে মনে হইত আর সহিবে না। তবু আমি তাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিতাম না। কিন্তু দামিনী সহিতে পারিত না। ভগবানের উপরে সে বিষম রাগ করিত— যে তাঁকে ভক্তি করে না তার কাছে তিনি জব্দ, আর ভক্তের উপর দিয়াই এমন করিয়া তার শোধ তুলিতে হয় গা? লীলানন্দস্বামীর উপর রাগ করিয়া দামিনী মাঝে মাঝে সেটা বেশ শক্ত করিয়া জানান দিত, কিন্তু ভগবানের নাগাল পাইবার উপায় ছিল না।

তবু শচীশকে সময়মত নাওয়ানো-খাওয়ানোর চেষ্টা করিতে সে ছাড়িত না। এই খাপছাড়া মানুষটাকে নিয়মে বাঁধিবার জন্য সে যে কতরকম ফিকিরফন্দি করিত তার আর সংখ্যা ছিল না।

অনেক দিন শচীশ ইহার স্পষ্ট কোনো প্রতিবাদ করে নাই। একদিন সকালেই নদী পার হইয়া ওপারে বালুচরে সে চলিয়া গেল। সূর্য মাঝ আকাশে উঠিল, তার পরে সূর্য পশ্চিমের দিকে হেলিল, শচীশের দেখা নাই। দামিনী অভুক্ত থাকিয়া অপেক্ষা করিল, শেষে আর থাকিতে পারিল না। খাবারের থালা লইয়া হাঁটুজল ভাঙিয়া সে ওপারে গিয়া উপস্থিত।

চারি দিকে ধূ ধূ করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি; তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি; যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

কোন্ দিকে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ বালির উপরে পায়ের দাগ চোখে পড়িল। সেই দাগ ধরিয়া চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া সে পৌঁছিল সেখানে একটা জলা। তার ধারে ধারে ভিজা মাটির উপরে অসংখ্য পাখির পদচিহ্ন। সেইখানে বালির পাড়ির ছায়ায় শচীশ বসিয়া। সামনের জলটি একেবারে নীলে নীল, ধারে ধারে চঞ্চল কাদাখোঁচা লেজ নাচাইয়া সাদা-কালো ডানার ঝলক দিতেছে। কিছু দূরে চখা-চখীর দল ভারি গোলমাল করিতে করিতে কিছুতেই পিঠের পালক পুরাপুরি মনের মতো সাফ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দামিনী পাড়ির উপর দাঁড়াইতেই তারা ডাকিতে ডাকিতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

দামিনীকে দেখিয়া শচীশ বলিয়া উঠিল, এখানে কেন?

দামিনী বলিল, খাবার আনিয়াছি।

শচীশ বলিল, খাইব না।

দামিনী বলিল, অনেক বেলা হইয়া গেছে।

শচীশ কেবল বলিল, না।

দামিনী বলিল, আমি নাহয় একটু বসি, তুমি আর-একটু পরে—

শচীশ বলিয়া উঠিল, আহা কেন আমাকে তুমি—

হঠাৎ দামিনীর মুখ দেখিয়া সে থামিয়া গেল। দামিনী আর কিছু বলিল না, থালা হাতে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। চারি দিকে শূন্য বালি রাত্রিবেলাকার বাঘের চোখের মতো ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল।

দামিনীর চোখে আগুন যত সহজে জ্বলে, জল তত সহজে পড়ে না। কিন্তু সেদিন যখন তাকে দেখিলাম, দেখি সে মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া; চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া তার কান্না যেন বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিয়া পড়িল। আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল। আমি এক পাশে বসিলাম।

একটু সে সুস্থ হইলে আমি তাকে বলিলাম, শচীশের শরীরের জন্য তুমি এত ভাব কেন?

দামিনী বলিল, আর কিসের জন্য আমি ভাবিতে পারি বলো। আর-সব ভাবনা তো উনি আপনিই ভাবিতেছেন। আমি কি তার কিছু বুঝি, না আমি তার কিছু করিতে পারি?

আমি বলিলাম, দেখো, মানুষের মন যখন অত্যন্ত জোরে কিছু একটাতে গিয়া ঠেকে তখন আপনিই তার শরীরের সমস্ত প্রয়োজন কমিয়া যায়। সেইজন্যই বড়ো দুঃখে কিংবা বড়ো আনন্দে মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। এখন শচীশের যেরকম মনের অবস্থা তাতে ওর শরীরের দিকে যদি মন না দাও ওর ক্ষতি হইবে না।

দামিনী বলিল, আমি যে স্ত্রীজাত— ঐ শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম। ও যে একেবারে মেয়েদের নিজের কীর্তি। তাই যখন দেখি শরীরটা কষ্ট পাইতেছে তখন এত সহজে আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে।

আমি বলিলাম, তাই যারা কেবল মন লইয়া থাকে শরীরের অভিভাবক তোমাদের তারা চোখেই দেখিতে পায় না।

দামিনী দৃপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, পায় না বৈকি! তারা আবার এমন করিয়া দেখে যে সে একটা অনাসৃষ্টি।

মনে মনে বলিলাম, সেই অনাসৃষ্টিটার 'পরে তোমাদের লোভের সীমা নাই। ওরে ও শ্রীবিলাস, জন্মান্তরে যেন সৃষ্টিছাড়ার দলে জন্ম নিতে পারিস এমন পুণ্য কর্।

৩

সেদিন নদীর চরে শচীশ দামিনীকে অমন একটা শক্ত ঘা দিয়া তার ফল হইল, দামিনীর সেই কাতর দৃষ্টি শচীশ মন হইতে সরাইতে পারিল না। তার পর কিছুদিন সে দামিনীর 'পরে একটু বিশেষ যত্ন দেখাইয়া অনুতাপের ব্রত যাপন করিতে লাগিল। অনেক দিন সে তো আমাদের সঙ্গে ভালো করিয়া কথাই কয় নাই, এখন সে দামিনীকে কাছে ডাকিয়া তার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। যে-সব তার অনেক ধ্যানের অনেক চিন্তার কথা সেই ছিল তার আলাপের বিষয়।

দামিনী শচীশের ঔদাসীন্যকে ভয় করিত না, কিন্তু এই যত্নকে তার বড়ো ভয়। সে জানিত এতটা সহিবে না, কেননা এর দাম বড়ো বেশি। একদিন হিসাবের দিকে যেই শচীশের নজর পড়িবে, দেখিবে খরচ বড়ো বেশি পড়িতেছে, সেইদিনই বিপদ। শচীশ অত্যন্ত ভালো ছেলের মতো বেশ নিয়মমত স্নানাহার করে, ইহাতে দামিনীর বুক দুর্‌দুর্ করে, কেমন তার লজ্জা বোধ হয়। শচীশ অবাধ্য হইলে সে যেন বাঁচে। সে মনে মনে বলে, সেদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলে, ভালোই করিয়াছ। আমাকে যত্ন এ যে তোমার আপনাকে শাস্তি দেওয়া। এ আমি সহিব কী করিয়া? দামিনী ভাবিল, দূর হোক গে ছাই, এখানেও দেখিতেছি মেয়েদের সঙ্গে সই পাতাইয়া আবার আমাকে পাড়া ঘুরিতে হইবে।

একদিন রাত্রে হঠাৎ ডাক পড়িল, বিশ্রী! দামিনী! তখন রাত্রি একটাই হইবে কি দুটাই হইবে শচীশের সে খেয়ালই নাই। রাত্রে শচীশ কী কাণ্ড করে তা জানি না— কিন্তু এটা নিশ্চয়, তার উৎপাতে এই ভুতুড়ে বাড়িতে ভূতগুলা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা ঘুম হইতে ধড়্ ফড়্ করিয়া জাগিয়া বাহির হইয়া দেখি, শচীশ বাড়ির সামনে বাঁধানো চাতালটার উপর অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিয়া উঠিল, আমি বেশ করিয়া বুঝিয়াছি। মনে একটুও সন্দেহ নাই।

দামিনী আস্তে আস্তে চাতালটার উপরে বসিল, শচীশও তার অনুকরণ করিয়া অন্যমনে বসিয়া পড়িল। আমিও বসিলাম।

শচীশ বলিল, যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উলটা মুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে।

আমি চুপ করিয়া তার জ্বল্‌জ্বল্‌-করা চোখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে যা বলিল রেখাগণিত-হিসাবে সে কথাটা ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটা কী?

শচীশ বলিয়া চলিল, তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বদ্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।

তারাগুলা যেমন নিস্তব্ধ আমরা তেমনি নিস্তব্ধ হইয়াই রহিলাম। শচীশ বলিল, দামিনী, বুঝিতে পারিতেছ না? গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর-একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে তো দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিতেছেন আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।

দামিনী শচীশের কথা বুঝিতে পারিল কি না জানি না, কিন্তু শচীশকে বুঝিতে পারিল। কোলের উপর হাত জোড় করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শচীশ বলিল, এতক্ষণ আমি অন্ধকারের এই কোণটিতে চুপ করিয়া বসিয়া সেই ওস্তাদের গান শুনিতেছিলাম, শুনিতে শুনিতে হঠাৎ সমস্ত বুঝিলাম। আর থাকিতে পারিলাম না, তাই তোমাদের ডাকিয়াছি। এতদিন আমি তাঁকে আপনার মতো করিয়া বানাইতে গিয়া কেবল ঠকিলাম। ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব— চিরকাল ধরিয়া! বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোনো বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্ত কালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।

'অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার' এই বলিতে বলিতে শচীশ উঠিয়া অন্ধকারে নদীর পাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

৪

সেই রাত্রির পর আবার শচীশ সাবেক চাল ধরিল, তার নাওয়া-খাওয়ার ঠিক্‌ঠিকানা রহিল না। কখন যে তার মনের ঢেউ আলোর দিকে উঠে, কখন যে তাহা অন্ধকারের দিকে নামিয়া যায় তাহা ভাবিয়া পাই না। এমন মানুষকে ভদ্রলোকের ছেলেটির মতো বেশ খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া রাখিবার ভার যে লইয়াছে ভগবান তার সহায় হোন।

সেদিন সমস্ত দিন গুমট করিয়া হঠাৎ রাত্রে ভারী একটা ঝড় আসিল। আমরা তিনজনে তিনটা ঘরে শুই, তার সামনের বারান্দায় কেরোসিনের একটা ডিবা জ্বলে। সেটা নিবিয়া গেছে। নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ঢেউয়ের ছলচ্ছল আর আকাশের জলের ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝমাঝম করতাল বাজাইতে লাগিল। জমাট অন্ধকারের গর্ভের মধ্যে কী যে নড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথচ তার নানারকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মতো ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আমবাগানের মধ্যে ডালপালাগুলার ঝপাঝপ্‌ শব্দ, দূরে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ি ভাঙিয়া হুড়্‌মুড়্‌ দুড়্‌দুড়্‌ করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের

জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বার বার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলই একটা জন্তুর মতো হু হু করিয়া চিৎকার করিতেছে।

এইরকম রাতে আমাদের মনের জানলা-দরজার ছিটকিনিগুলা নড়িয়া যায়, ভিতরে ঝড় ঢুকিয়া পড়ে, ভদ্র আসবাবগুলাকে উলটপালট করিয়া দেয়, পর্দাগুলা ফর্‌ফর্‌ করিয়া কে কোন্‌ দিকে যে অদ্ভুত রকম করিয়া উড়িতে থাকে তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। আমার ঘুম হইতেছিল না। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কী-সব কথা ভাবিতেছিলাম তাহা এখানে লিখিয়া কী হইবে। এই ইতিহাসে সেগুলো জরুরি কথা নয়।

এমন সময়ে শচীশ একবার তার ঘরের অন্ধকারের মধ্যে বলিয়া উঠিল, কেও!

উত্তর শুনিল, আমি দামিনী। তোমার জানলা খোলা, ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে। বন্ধ করিয়া দিই।

বন্ধ করিতে করিতে দেখিল, শচীশ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্তকালের জন্য যেন দ্বিধা করিয়া তার পরে বেগে ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল। বিদ্যুৎ চমক দিতে লাগিল এবং একটা চাপা বজ্র গর্‌গর্‌ করিয়া উঠিল।

দামিনী অনেকক্ষণ নিজের ঘরের চৌকাঠের 'পরে বসিয়া রহিল। কেহই ফিরিয়া আসিল না। দমকা হাওয়ার অধৈর্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

দামিনী আর থাকিতে পারিল না, বাহির হইয়া পড়িল। বাতাসে দাঁড়ানো দায়। মনে হইল, দেবতার পেয়াদাগুলা তাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ঠেলা দিয়া লইয়া চলিয়াছে। অন্ধকার আজ সচল হইয়া উঠিল। বৃষ্টির জল আকাশের সমস্ত ফাঁক ভরাট করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে। এমনি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডুবাইয়া কাঁদিতে পারিলে দামিনী বাঁচিত।

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ অন্ধকারটাকে আকাশের এক ধার হইতে আর-এক ধার পর্যন্ত পড়্‌পড়্‌ শব্দ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেই ক্ষণিক আলোকে দামিনী দেখিতে পাইল, শচীশ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া। দামিনী প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া পড়িয়া এক দৌড়ে একেবারে তার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল; বাতাসের চিৎকারশব্দকে হার মানাইয়া বলিয়া উঠিল, এই তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি, তোমার কাছে অপরাধ করি নাই, কেন তবে আমাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছ?

শচীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দামিনী বলিল, আমাকে লাথি মারিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাও তো ফেলিয়া দাও, কিন্তু তুমি ঘরে চলো।

শচীশ বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল, যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার— আর-কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।

দামিনী একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পরে বলিল, তাই আমি যাইব।

৫

পরে আমি দামিনীর কাছে আগাগোড়া সকল কথাই শুনিয়াছি, কিন্তু সেদিন কিছুই জানিতাম না। তাই বিছানা হইতে যখন দেখিলাম এরা দুজনে সামনের বারান্দা দিয়া আপন আপন ঘরের দিকে গেল তখন মনে হইল, আমার দুর্ভাগ্য বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিতেছে। ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিলাম, সে রাত্রে আমার ঘুম হইল না।

পরের দিন সকালে দামিনীর সে কী চেহারা! কাল রাত্রে ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য পৃথিবীর মধ্যে কেবল যেন এই মেয়েটির উপরেই আপনার সমস্ত পদচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেছে। ইতিহাসটা কিছুই না জানিয়াও শচীশের উপর আমার ভারি রাগ হইতে লাগিল।

দামিনী আমাকে বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, তুমি আমাকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবে চলো।

এটা যে দামিনীর পক্ষে কতবড়ো কঠিন কথা সে আমি বেশ জানি, কিন্তু আমি তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভারী একটা বেদনার মধ্যেও আমি আরাম পাইলাম। দামিনীর এখান হইতে যাওয়াই ভালো। পাহাড়টার উপর ঠেকিতে ঠেকিতে নৌকাটি চুরমার হইয়া গেল।

বিদায় লইবার সময় দামিনী শচীশকে প্রণাম করিয়া বলিল, শ্রীচরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো।

শচীশ মাটির দিকে চোখ নামাইয়া বলিল, আমিও অনেক অপরাধ করিয়াছি, সমস্ত মাজিয়া ফেলিয়া ক্ষমা লইব।

দামিনীর মধ্যে একটা প্রলয়ের আগুন জ্বলিতেছে, কলিকাতার পথে আসিতে আসিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তারই তাপ লাগিয়া আমারও মনটা যেদিন বড়ো বেশি তাতিয়া উঠিয়াছিল সেদিন আমি শচীশকে উদ্দেশ করিয়া কিছু কড়া কথা বলিয়াছিলাম। দামিনী রাগিয়া বলিল, দেখো, তুমি তাঁর সম্বন্ধে আমার সামনে অমন কথা বলিয়ো না। তিনি আমাকে কী বাঁচান বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কী জান? তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও, আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সে দিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে। বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, খুব ভালো হইয়াছে— বলিয়া দামিনী বুকে দম্‌ দম্‌ করিয়া কিল মারিতে লাগিল। আমি তার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

কলিকাতায় সন্ধ্যার সময় আসিয়া তখনই দামিনীকে তার মাসির বাড়ি দিয়া আমি আমার এক পরিচিত মেসে উঠিলাম। আমার জানা লোকে যে আমাকে দেখিল চমকিয়া উঠিল; বলিল, এ কী! তোমার অসুখ করিয়াছে না কি?

পরদিন প্রথম ডাকেই দামিনীর চিঠি পাইলাম, আমাকে লইয়া যাও, এখানে আমার স্থান নাই।

মাসি দামিনীকে ঘরে রাখিবে না। আমাদের নিন্দায় নাকি শহরে টীটি পড়িয়া গেছে। আমরা দল ছাড়ার অল্পকাল পরে সাপ্তাহিক কাগজগুলির পূজার সংখ্যা বাহির হইয়াছে; সুতরাং আমাদের হাড়কাঠ তৈরি ছিল, রক্তপাতের ত্রুটি হয় নাই। শাস্ত্রে স্ত্রীপশু-বলি নিষেধ, কিন্তু মানুষের বেলায় ঐটেতেই সব চেয়ে উল্লাস। কাগজে দামিনীর স্পষ্ট করিয়া নাম ছিল না, কিন্তু বদনামটা কিছুমাত্র অস্পষ্ট যাতে না হয় সে কৌশল ছিল। কাজেই দূর সম্পর্কের মাসির বাড়ি দামিনীর পক্ষে ভয়ংকর আঁট হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে দামিনীর বাপ মা মারা গেছে, কিন্তু ভাইরা কেহ-কেহ আছে বলিয়াই জানি। দামিনীকে তাদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ঘাড় নাড়িল; বলিল, তারা বড়ো গরিব।

আসল কথা, দামিনী তাদের মুশকিলে ফেলিতে চায় না। ভয় ছিল, ভাইরাও পাছে জবাব দেয় 'এখানে জায়গা নাই'। সে আঘাত যে সহিবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, তা হইলে কোথায় যাইবে?

দামিনী বলিল, লীলানন্দস্বামীর কাছে।

লীলানন্দস্বামী! খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অদৃষ্টের এ কী নিদারুণ লীলা!

বলিলাম, স্বামীজি কি তোমাকে লইবেন?

দামিনী বলিল, খুশি হইয়া লইবেন।

দামিনী মানুষ চেনে। যারা দলচরের জাত মানুষকে পাইলে সত্যকে পাওয়ার চেয়ে তারা বেশি খুশি হয়। লীলানন্দস্বামীর ওখানে দামিনীর জায়গার টানাটানি হইবে না এটা ঠিক— কিন্তু—

ঠিক এমন সংকটের সময় বলিলাম, দামিনী, একটি পথ আছে, যদি অভয় দাও তো বলি।

দামিনী বলিল, বলো, শুনি।

আমি বলিলাম, যদি আমার মতো মানুষকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে—

দামিনী আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, ও কী কথা বলিতেছ শ্রীবিলাসবাবু? তুমি কি পাগল হইয়াছ?

আমি বলিলাম, মনে করো-না পাগলই হইয়াছি। পাগল হইলে অনেক কঠিন কথা অতি সহজে মীমাংসা করিবার শক্তি জন্মায়। পাগলামি আরব্য-উপন্যাসের সেই জুতা যা পায়ে দিলে সংসারের হাজার হাজার বাজে কথাগুলো একেবারে ডিঙাইয়া যাওয়া যায়।

বাজে কথা! কাকে তুমি বল বাজে কথা?

এই যেমন, লোকে কী বলিবে, ভবিষ্যতে কী ঘটিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

দামিনী বলিল, আর, আসল কথা?

আমি বলিলাম, কাকে বল তুমি আসল কথা?

এই যেমন আমাকে বিবাহ করিলে তোমার কী দশা হইবে।

এইটেই যদি আসল কথা হয় তবে আমি নিশ্চিন্ত। কেননা, আমার দশা এখন যা আছে তার চেয়ে খারাপ হইবে না। দশাটাকে সম্পূর্ণ ঠাঁই-বদল করাইতে পারিলেই বাঁচিতাম, অন্ততপক্ষে পাশ ফিরাইতে পারিলেও একটুখানি আরাম পাওয়া যায়।

আমার মনের ভাব সম্বন্ধে দামিনী কোনোরকম তারে-খবর পায় নাই, সে কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু, এতদিন সে খবরটা তার কাছে দরকারি খবর ছিল না; অন্তত, তার কোনোরকম জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ছিল। এতদিন পরে একটা জবাবের দাবি উঠিল।

দামিনী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আমি বলিলাম, দামিনী, আমি সংসারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন— এমন-কি, তার চেয়েও কম, আমি তুচ্ছ। আমাকে বিবাহ করাও যা না-করাও তা, অতএব তোমার ভাবনা কিছুই নাই।

দামিনীর চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। সে বলিল, তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।

আরো খানিকক্ষণ ভাবিয়া দামিনী আমাকে বলিল, তুমি তো আমাকে জান?

আমি বলিলাম, তুমিও তো আমাকে জান।

এমনি করিয়াই কথাটা পাড়া হইল। যে-সব কথা মুখে বলা হয় নাই তারই পরিমাণ বেশি।

পূর্বেই বলিয়াছি, একদিন আমার ইংরেজি বক্তৃতায় অনেক মন বশ করিয়াছি। এতদিন ফাঁক পাইয়া তাদের অনেকেরই নেশা ছুটিয়াছে। কিন্তু, নরেন এখনো আমাকে বর্তমান যুগের একটা দৈবলব্ধ জিনিস বলিয়াই জানিত। তার একটা বাড়িতে ভাড়াটে আসিতে মাস-দেড়েক দেরি ছিল। আপাতত সেইখানে আমরা আশ্রয় লইলাম।

প্রথম দিনে আমার প্রস্তাবটা চাকা ভাঙিয়া যে মৌনের গর্তটার মধ্যে পড়িল, মনে হইয়াছিল এইখানেই বুঝি হাঁ এবং না দুইয়েরই বাহিরে পড়িয়া সেটা আটক খাইয়া গেল— অন্তত অনেক মেরামত এবং অনেক হেঁইহুঁই করিয়া যদি ইহাকে টানিয়া তোলা যায়। কিন্তু, অভাবনীয় পরিহাসে মনোবিজ্ঞানকে ফাঁকি দিবার জন্যই মনের সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তার সেই আনন্দের উচ্চহাস্য এবারকার ফাল্গুনে এই ভাড়াটে বাড়ির দেয়ালক'টার মধ্যে বার বার ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল।

আমি যে একটা-কিছু, দামিনী এতদিন সে কথা লক্ষ করিবার সময় পায় নাই; বোধ করি আর-কোনো দিক হইতে তার চোখে বেশি একটা আলো পড়িয়াছিল। এবারে তার সমস্ত জগৎ সংকীর্ণ হইয়া সেইটুকুতে আসিয়া ঠেকিল যেখানে আমিই কেবল একলা। কাজেই আমাকে সম্পূর্ণ চোখ মেলিয়া দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমার ভাগ্য ভালো, তাই ঠিক এই সময়টাতেই দামিনী আমাকে যেন প্রথম দেখিল।

অনেক নদীপর্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের ঝড়ে রসের তানে বাতাসে আগুন লাগিয়াছে। 'তোমার চরণে আমার পরানে লাগিল প্রেমের ফাঁসি' এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে। তবু পর্দা পুড়িয়া যায় নাই।

কিন্তু, কলিকাতার এই গলিতে এ কী হইল! ঘেঁষাঘেঁষি ঐ বাড়িগুলো চারি দিকে যেন পারিজাতের ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিল। বিধাতা তাঁর বাহাদুরি দেখাইলেন বটে! এই ইঁটকাঠগুলোকে তিনি তাঁর

গানের সুর করিয়া তুলিলেন। আর, আমার মতো সামান্য মানুষের উপর তিনি কী পরশমণি ছোঁয়াইয়া দিলেন আমি এক মুহূর্তে অসামান্য হইয়া উঠিলাম।

যখন আড়াল থাকে তখন অনন্তকালের ব্যবধান, যখন আড়াল ভাঙে তখন সে এক নিমেষের পাল্লা। আর দেরি হইল না। দামিনী বলিল, আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম, কেবল এই একটা ধাক্কার অপেক্ষা ছিল। আমার সেই-তুমি আর এই-তুমির মাঝখানে ওটা কেবল একটা ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বার বার প্রণাম করি, তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।

আমি দামিনীকে বলিলাম, দামিনী, তুমি অত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়ো না। বিধাতার এই সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য নয় সে তুমি পূর্বে একদিন যখন আবিষ্কার করিয়াছিলে তখন সহিয়াছিলাম, কিন্তু এখন সহ্য করা ভারি শক্ত হইবে।

দামিনী কহিল, বিধাতার ঐ সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য, আমি সেইটেই আবিষ্কার করিতেছি।

আমি কহিলাম, ইতিহাসে তোমার নাম থাকিবে। উত্তরমেরুর মাঝখানটাতে যে দুঃসাহসিক আপনার নিশান গাড়িবে তার কীর্তিও এর কাছে তুচ্ছ। এ তো দুঃসাধ্যসাধন নয়, এ যে অসাধ্যসাধন।

ফাল্গুন মাসটা এমন অত্যন্ত ছোটো তাহা ইহার পূর্বে কখনো এমন নিঃসংশয়ে বুঝি নাই। কেবলমাত্র ত্রিশটা দিন, দিনগুলাও চব্বিশ ঘণ্টার এক মিনিট বেশি নয়। বিধাতার হাতে কাল অনন্ত, তবু এমনতরো বিশ্রী রকমের কৃপণতা কেন আমি তো বুঝিতে পারি না।

দামিনী বলিল, তুমি যে এই পাগলামি করিতে বসিলে তোমার ঘরের লোক—

আমি বলিলাম, তারা আমার সুহৃদ। এবার তারা আমাকে ঘর থেকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে।

তার পর?

তার পরে তোমায় আমায় মিলিয়া একেবারে বুনিয়াদ হইতে আগাগোড়া নূতন করিয়া ঘর বানাইব, সে কেবল আমাদের দুজনের সৃষ্টি।

দামিনী কহিল, আর, সেই ঘরের গৃহিণীকে একেবারে গোড়া হইতে বানাইয়া লইতে হইবে। সেও তোমারই হাতের সৃষ্টি হোক, পুরানো কালের ভাঙাচোরা তার কোথাও কিছু না থাক্।

চৈত্রমাসে দিন ফেলিয়া একটা বিবাহের বন্দোবস্ত করা গেল। দামিনী আবদার করিল, শচীশকে আনাইতে হইবে।

আমি বলিলাম, কেন?

তিনি সম্প্রদান করিবেন।

সে পাগলা যে কোথায় ফিরিতেছে তার সন্ধান নাই। চিঠির পর চিঠি লিখি, জবাবই পাই না। নিশ্চয়ই এখনো সেই ভুতুড়ে বাড়িতেই আছে, নহিলে চিঠি ফেরত আসিত। কিন্তু সে কারও চিঠি খুলিয়া পড়ে কি না সন্দেহ।

আমি বলিলাম, দামিনী, তোমাকে নিজে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে হইবে, 'পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ— ত্রুটি মার্জনা' এখানে চলিবে না। একলাই যাইতে পারিতাম, কিন্তু আমি ভিতু মানুষ। সে হয়তো এতক্ষণে নদীর ও পারে গিয়া চক্রবাকদের পিঠের পালক সাফ করা তদারক করিতেছে, সেখানে তুমি ছাড়া যাইতে পারে এমন বুকের পাটা আর কারো নাই।

দামিনী হাসিয়া কহিল, সেখানে আর কখনো যাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম, আহার লইয়া যাইবে না এই প্রতিজ্ঞা; আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া যাইবে না কেন?

এবারে কোনোরকম দুর্ঘটনা ঘটিল না। দুইজনে দুই হাত ধরিয়া শচীশকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়া আনিলাম। ছোটো ছেলে খেলার জিনিস পাইলে যেমন খুশি হয় শচীশ আমাদের বিবাহের ব্যাপার লইয়া তেমনি খুশি হইয়া উঠিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম চুপচাপ করিয়া সারিব, শচীশ কিছুতেই তা হইতে দিল না। বিশেষত জ্যাঠামশায়ের সেই মুসলমানপাড়ার দল যখন খবর পাইল তখন তারা এমনি হল্লা করিতে লাগিল যে, পাড়ার লোকে ভাবিল কাবুলের আমির আসিয়াছে বা অন্তত হাইদ্রাবাদের নিজাম।

আরো ধুম হইল কাগজে। পরবারের পূজার সংখ্যায় জোড়া বলি হইল। আমরা অভিশাপ দিব না। জগদম্বা সম্পাদকের তহবিল বৃদ্ধি করুন এবং পাঠকদের নররক্তের নেশায় অন্তত এবারকার মতো কোনো বিঘ্ন না ঘটুক।

শচীশ বলিল, বিশ্রী, তোমরা আমার বাড়িটা ভোগ করো'সে।

আমি বলিলাম, তুমিও আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দাও, আবার আমরা কাজে লাগিয়া যাই।

শচীশ বলিল, না, আমার কাজ অন্যত্র।

দামিনী বলিল, আমাদের বউভাতের নিমন্ত্রণ না সারিয়া যাইতে পারিবে না।

বউভাতের নিমন্ত্রণে আহূতদের সংখ্যা অসম্ভব রকম অধিক ছিল না। ছিল ঐ শচীশ।

শচীশ তো বলিল 'আমাদের বাড়িটা আসিয়া ভোগ করো', কিন্তু ভোগটা যে কী সে আমরাই জানি। হরিমোহন সে বাড়ি দখল করিয়া ভাড়াটে বসাইয়া দিয়াছেন। নিজেই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু পারলৌকিক লাভ-লোকসান সম্বন্ধে যারা তাঁর মন্ত্রী তারা ভালো বুঝিল না— ওখানে প্লেগে মুসলমান মরিয়াছে। যে ভাড়াটে আসিবে তারও তো একটা— কিন্তু কথাটা তার কাছে চাপিয়া গেলেই হইবে।

বাড়িটা কেমন করিয়া হরিমোহনের হাত হইতে উদ্ধার করা গেল সে অনেক কথা। আমার প্রধান সহায় ছিল পাড়ার মুসলমানরা। আর কিছু নয়, জগমোহনের উইলখানা একবার তাদের দেখাইয়াছিলাম। আমাকে আর উকিলবাড়ি হাঁটাহাঁটি করিতে হয় নাই।

এ পর্যন্ত বাড়ি হইতে বরাবর কিছু সাহায্য পাইয়াছি, সেটা বন্ধ হইয়াছে। আমরা দুই জনে মিলিয়া বিনা সহায়ে ঘর করিতে লাগিলাম, সেই কষ্টেই আমাদের আনন্দ। আমার ছিল রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের মার্কা; প্রোফেসারি সহজেই জুটিল। তার উপরে এক্‌জামিন-পাসের পেটেণ্ট্‌ ঔষধ বাহির করিলাম— পাঠ্যপুস্তকের মোটা মোটা নোট। আমাদের অভাব অল্পই, এত করিবার দরকার ছিল না। কিন্তু দামিনী বলিল, শচীশকে যেন তার জীবিকার জন্য ভাবিতে না হয় এটা আমাদের দেখা চাই। আর-একটা কথা দামিনী আমাকে বলিল না, আমিও তাকে বলিলাম না— চুপিচুপি কাজটা সারিতে হইল। দামিনীর ভাইঝি দুটির সৎপাত্রে যাহাতে বিবাহ হয় এবং ভাইপো কয়টা পড়াশুনা করিয়া মানুষ হয়, সেটা দেখিবার শক্তি দামিনীর ভাইদের ছিল না। তারা আমাদের ঘরে ঢুকিতে দেয় না, কিন্তু অর্থসাহায্য জিনিসটার জাতিকুল নাই, বিশেষত সেটাকে যখন গ্রহণমাত্র করাই দরকার— স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

কাজেই আমার অন্য কাজের উপর একটা ইংরেজি কাগজের সাব-এডিটারি লইতে হইল। আমি দামিনীকে না বলিয়া একটা উড়েবামুন বেহারা এবং একটা চাকরের বন্দোবস্ত করিলাম। দামিনীও আমাকে না বলিয়া পরদিনেই সব ক'টাকে বিদায় করিয়া দিল। আমি আপত্তি করিতেই সে বলিল, তোমরা কেবলই উলটা বুঝিয়া দয়া কর। তুমি খাটিয়া হয়রান হইতেছ, আর আমি যদি না খাটিতে পাই তবে আমার সে দুঃখ আর সে লজ্জা বহিবে কে?

বাহিরে আমার কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ, এই দুইয়ে যেন গঙ্গাযমুনার স্রোত মিলিয়া গেল। ইহার উপরে দামিনী পাড়ার ছোটো ছোটো মুসলমান মেয়েদের সেলাই শেখাইতে লাগিয়া গেল। কিছুতেই সে আমার কাছে হার মানিবে না, এই তার পণ।

কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্বশক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।

আরো একটা ফাল্গুন কাটিল। তার পর আর কাটিল না।

সেবারে গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হইয়াছিল, সেই ব্যথার কথা সে কাহাকেও বলে নাই। যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য?

ডাক্তারেরা এ ব্যামোর একোজনা একোরকমের নামকরণ করিতে লাগিল। তাদের কারও প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের সঙ্গে কারও মিল হইল না। শেষকালে ভিজিট ও দাওয়াইখানার দেনার আগুনে আমার সঞ্চিত স্বর্ণটুকু ছাই করিয়া তারা লঙ্কাকাণ্ড সমাধা করিল এবং উত্তরকাণ্ডে মন্ত্রণা দিল, হাওয়া বদল করিতে হইবে। তখন হাওয়া ছাড়া আমার আর বস্তু কিছুই বাকি ছিল না।

দামিনী বলিল, যেখান হইতে ব্যথা বহিয়া আনিয়াছি আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও— সেখানে হাওয়ার অভাব নাই।

যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারে ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।

ঘরে-বাইরে

শ্রীমান্ প্রথমনাথ চৌধুরী
কল্যাণীয়েষু

ঘরে-বাইরে

বিমলার আত্মকথা

মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, সেই লাল-পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ— শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই-যে উষাসতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?

আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে যে নীল। আমার মায়ের বর্ণ ছিল শামলা, তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের। তাঁর রূপ রূপের গর্বকে লজ্জা দিত।

আমি মায়ের মতো দেখতে এই কথা সকলে বলে। তা নিয়ে ছেলেবেলায় একদিন আয়নার উপর রাগ করেছি। মনে হত আমার সর্বাঙ্গে এ যেন একটা অন্যায়— আমার গায়ের রঙ, এ যেন আমার আসল রঙ নয়, এ যেন আর-কারও জিনিস, একেবারে আগাগোড়া ভুল।

সুন্দরী তো নই, কিন্তু মায়ের মতো যেন সতীর যশ পাই দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম। বিবাহের সম্বন্ধ হবার সময় আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে দৈবজ্ঞ এসে আমার হাত দেখে বলেছিল, এ মেয়েটি সুলক্ষণা সতীলক্ষ্মী হবে। মেয়েরা সবাই বললে, তা হবেই তো, বিমলা যে ওর মায়ের মতো দেখতে।

রাজার ঘরে আমার বিয়ে হল। তাঁদের কোন্ কালের বাদশাহের আমলের সম্মান। ছেলেবেলায় রূপকথার রাজপুত্রের কথা শুনেছি, তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিল। রাজার ঘরের ছেলে, দেহখানি যেন চামেলি ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া, যুগযুগান্তর যে-সব কুমারী শিবপূজা করে এসেছে তাদেরই একাগ্র মনের কামনা দিয়ে সেই মুখ যেন তিলে তিলে তৈরি। সে কী চোখ, কী নাক! তরুণ গোঁফের রেখা ভ্রমরের দুটি ডানার মতো, যেমন কালো, তেমনি কোমল।

স্বামীকে দেখলুম, তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এমন-কি, তাঁর রঙ দেখলুম আমারই মতো। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সংকোচ ছিল সেটা কিছু ঘুচল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল। নিজের জন্যে লজ্জায় নাহয় মরেই যেতুম, তবু মনে মনে যে রাজপুত্রটি ছিল তাকে একবার চোখে চোখে দেখতে পেলুম না কেন?

কিন্তু রূপ যখন চোখের পাহারা এড়িয়ে লুকিয়ে অন্তরে দেখা দেয় সেই বুঝি ভালো। তখন সে যে ভক্তির অমরাবতীতে এসে দাঁড়ায়, সেখানে তাকে কোনো সাজ করে আসতে হয় না। ভক্তির আপন সৌন্দর্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে সে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। মা যখন বাবার জন্যে বিশেষ করে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জলখাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ করে কেওড়া-জলের-ছিটে-দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় আলাদা জড়িয়ে রাখতেন, তিনি খেতে বসলে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন, তাঁর সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর, তাঁর হৃদয়ের সেই সুধারসের ধারা কোন্ অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত সে যে আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম।

সেই ভক্তির সুরটি কি আমার মনের মধ্যে ছিল না ? ছিল। তর্ক না, ভালোমন্দের তত্ত্বনির্ণয় না, সে কেবলমাত্র একটি সুর ! সমস্ত জীবনকে যদি জীবনবিধাতার মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি স্তবগান করে বাজিয়ে যাবার কোনো সার্থকতা থাকে, তবে সেই প্রভাতের সুরটি আপনার কাজ আরম্ভ করেছিল।

মনে আছে, ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথের সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন তিনি হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বললেন, ও কি বিমল, করছ কী ! আমার সে লজ্জা ভুলতে পারব না। তিনি হয়তো ভাবলেন, আমি লুকিয়ে পুণ্য অর্জন করছি। কিন্তু, নয়, নয়, সে আমার পুণ্য নয়— সে আমার নারীর হৃদয়, তার ভালোবাসা আপনিই পূজা করতে চায়।

আমার শ্বশুর-পরিবার সাবেক নিয়মে বাঁধা। তার কতক কায়দা-কানুন মোগলপাঠানের, কতক বিধিবিধান মনুপরাশরের। কিন্তু আমার স্বামী একেবারে একেলে। এ বংশে তিনিই প্রথম রীতিমত লেখাপড়া শেখেন আর এম· এ· পাস করেন। তাঁর বড়ো দুই ভাই মদ খেয়ে অল্প বয়সে মারা গেছেন ; তাঁদের ছেলেপুলে নেই। আমার স্বামী মদ খান না, তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই ; এ বংশে এটা এত খাপছাড়া যে সকলে এতটা পছন্দ করে না, মনে করে যাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই অত্যন্ত নির্মল হওয়া তাদেরই সাজে। কলঙ্কের প্রশস্ত জায়গা তারার মধ্যে নেই, চাঁদের মধ্যেই আছে।

বহুকাল হল আমার শ্বশুর-শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে। আমার দিদিশাশুড়িই ঘরের কর্ত্রী। আমার স্বামী তাঁর বক্ষের হার, তাঁর চক্ষের মণি। এইজন্যেই আমার স্বামী কায়দার গণ্ডি ডিঙিয়ে চলতে সাহস করতেন। এইজন্যেই তিনি যখন মিস গিল্‌বিকে আমার সঙ্গিনী আর শিক্ষক নিযুক্ত করলেন তখন ঘরে বাইরে যত রসনা ছিল তার সমস্ত রস বিষ হয়ে উঠল, তবু আমার স্বামীর জেদ বজায় রইল।

সেই সময়েই তিনি বি· এ· পাস করে এম· এ· পড়ছিলেন। কলেজে পড়বার জন্যে তাঁকে কলকাতায় থাকতে হত। তিনি প্রায় রোজই আমাকে একটি করে চিঠি লিখতেন, তার কথা অল্প, তার ভাষা সাদা, তাঁর হাতের সেই গোটা গোটা গোল গোল অক্ষরগুলি যেন স্নিগ্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত।

একটি চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে আমি তাঁর চিঠিগুলি রাখতুম আর রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে সেগুলি ঢেকে দিতুম। তখন আমার সেই রূপকথার রাজপুত্র অরুণালোকে চাঁদের মতো মিলিয়ে গেছে। সেদিন আমার সত্যকার রাজপুত্র বসেছে আমার হৃদয়-সিংহাসনে। আমি তাঁর রানী, তাঁর পাশে আমি বসতে পেরেছি ; কিন্তু তার চেয়ে আনন্দ, তাঁর পায়ের কাছে আমার যথার্থ স্থান।

আমি লেখাপড়া করেছি, সুতরাং এখনকার কালের সঙ্গে আমার এখনকার ভাষাতেই পরিচয় হয়ে গেছে। আমার আজকের এই কথাগুলো আমার নিজের কাছেই কবিত্বের মতো শোনাচ্ছে। এ কালের সঙ্গে যদি কোনো-একদিন আমার মোকাবিলা না হত তা হলে আমার সেদিনকার সেই ভাবটাকে সোজা গদ্য বলেই জানতুম— মনে জানতুম মেয়ে হয়ে জন্মেছি এ যেমন আমার ঘর-গড়া কথা নয় তেমনি মেয়েমানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে এও তেমনি সহজ কথা, এর মধ্যে বিশেষ কোনো-একটা অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য আছে কি না সেটা এক মুহূর্তের জন্যে ভাববার দরকার নেই।

কিন্তু সেই কিশোর বয়স থেকে আজ এই যৌবনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতে আর-এক যুগে এসে পড়েছি। যেটা নিশ্বাসের মতো সহজ ছিল এখন সেটাকে কাব্যকলার মতো করে গড়ে তোলবার উপদেশ আসছে। এখনকার ভাবুক পুরুষেরা সধবার পাতিব্রত্যে এবং বিধবার ব্রহ্মচর্যে যে কী অপূর্ব কবিত্ব আছে, সে কথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে চড়িয়ে বলছেন। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে জীবনের এই জায়গায় কেমন করে সত্যে আর সুন্দরে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন কি কেবলমাত্র সুন্দরের দোহাই দিলে আর সত্যকে ফিরে পাওয়া যাবে ?

মেয়েমানুষের মন সবই যে এক-ছাঁচে-ঢালা তা আমি মনে করি নে। কিন্তু এটুকু জানি, আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিসটি ছিল, সেই ভক্তি করবার ব্যগ্রতা। সে যে আমার সহজ ভাব তা আজকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি যখন সেটা বাইরের দিক থেকে আর সহজ নেই।

এমনি আমার কপাল, আমার স্বামী আমাকে সেই পূজার অবকাশ দিতে চাইতেন না। সেই ছিল তাঁর মহত্ত্ব। তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্যে কাড়াকাড়ি করে, কেননা সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি করে থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের একশেষ।

কিন্তু, এত সেবা আমার জন্যে কেন? সাজসজ্জা দাসদাসী জিনিসপত্রের মধ্য দিয়ে যেন আমার দুই কূল ছাপিয়ে তাঁর আদরের বান ডেকে বইল। এই-সমস্তকে ঠেলে আমি নিজেকে দান করব কোন্ ফাঁকে! আমার পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের দরকার অনেক বেশি ছিল। প্রেম যে স্বভাববৈরাগী; সে যে পথের ধারে ধুলার 'পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়, সে তো বৈঠকখানার চীনের টবে আপনার ঐশ্বর্য মেলতে পারে না।

আমাদের অন্তঃপুরে যে-সমস্ত সাবেক দস্তুর চলিত ছিল আমার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ ঠেলতে পারতেন না। দিনে-দুপুরে যখন-তখন অবাধে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারত না। আমি জানতুম ঠিক কখন তিনি আসবেন; তাই যেমন-তেমন এলোমেলো হয়ে আমাদের মিলন ঘটতে পারত না। আমাদের মিলন যেন কবিতার মিল; সে আসত ছন্দের ভিতর দিয়ে, যতির ভিতর দিয়ে। দিনের কাজ সেরে, গা ধুয়ে, যত্ন করে চুল বেঁধে, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে, কোঁচানো শাড়িটি প'রে, ছড়িয়ে-পড়া দেহ-মনকে সমস্ত সংসার থেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে এনে একজনের কাছে একটি বিশেষ সময়ের সোনার থালায় নিবেদন করে দিতুম। সেই সময়টুকু অল্প, কিন্তু অল্পের মধ্যে সে অসীম।

আমার স্বামী বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ। এ নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কোনোদিন তর্ক করি নি। কিন্তু আমার মন বলে, ভক্তিতে মানুষকে সমান হবার বাধা দেয় না। ভক্তিতে মানুষকে উপরের দিকে তুলে সমান করতে চায়। তাই সমান হতে থাকবার আনন্দ তাতে বরাবর পাওয়া যায়, কোনোদিন তা চুকে গিয়ে হেলার জিনিস হয়ে ওঠে না। প্রেমের থালায় ভক্তি পূজা আরতির আলোর মতো— পূজা যে করে এবং যাকে পূজা করা হয় দুয়ের উপরেই সে আলো সমান হয়ে পড়ে। আমি আজ নিশ্চয় জেনেছি, স্ত্রীলোকের ভালোবাসা পূজা করেই পূজিত হয়— নইলে সে ধিক্ ধিক্। আমাদের ভালোবাসার প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে— প্রদীপের পোড়া তেলই নীচের দিকে পড়তে পারে।

প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাও নি সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলে ভালো করতে। তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছ, শিখিয়ে ভালোবেসেছ, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাই নি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, আমার ভালোবাসায় তোমার চোখে পাতা পড়ে নি তা দেখেছি, আমার ভালোবাসায় তোমার লুকিয়ে নিশ্বাস পড়েছে তা দেখেছি। আমার দেহকে তুমি এমন করে ভালোবেসেছ যেন সে স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এমনি করে ভালোবেসেছ যেন সে তোমার সৌভাগ্য! এতে আমার মনে গর্ব আসে, আমার মনে হয় এ আমারই ঐশ্বর্য যার লোভে তুমি এমন করে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ। তখন রানীর সিংহাসনে বসে মানের দাবি করি; সে দাবি কেবল বাড়তেই থাকে, কোথাও তার তৃপ্তি হয় না। পুরুষকে বশ করবার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ? ভক্তির মধ্যে সেই গর্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা। শংকর তো ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু এই ভিক্ষার রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা সইতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্যে তপস্যা না করতেন?

আজ মনে পড়ছে সেদিন আমার সৌভাগ্যে সংসারে কত লোকের মনে কত ঈর্ষার আগুন ধিকিধিকি জ্বলেছিল। ঈর্ষা হবারই তো কথা— আমি যে অমনি পেয়েছি, ফাঁকি দিয়ে পেয়েছি। কিন্তু ফাঁকি তো বরাবর চলে না। দাম দিতেই হবে। নইলে বিধাতা সহ্য করেন না— দীর্ঘকাল ধরে প্রতিদিন সৌভাগ্যের ঋণ শোধ করতে হয়, তবেই স্বত্ব ধ্রুব হয়ে ওঠে। ভগবান আমাদের দিতেই পারেন, কিন্তু নিতে যে হয় নিজের গুণে। পাওয়া জিনিসও আমরা পাই নে এমনি আমাদের পোড়া কপাল।

আমার সৌভাগ্যে কত কন্যার পিতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল। আমার কি তেমনি রূপ, তেমনি গুণ, আমি কি এই ঘরের যোগ্য, এমন কথা পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে উঠেছে। আমার দিদিশাশুড়ি শাশুড়ি সকলেরই অসামান্য রূপের খ্যাতি ছিল। আমার দুই বিধবা জায়ের মতো এমন সুন্দরী দেখা যায় না। পরে পরে যখন তাঁদের দুজনেরই কপাল ভাঙল তখন আমার দিদিশাশুড়ি পণ করে বসলেন যে, তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট নাতির জন্যে তিনি আর রূপসীর খোঁজ করবেন না। আমি কেবলমাত্র সুলক্ষণের জোরে এই ঘরে প্রবেশ করতে পারলুম, নইলে আমার আর-কোনো অধিকার ছিল না।

আমাদের ঘরে এই ভোগের সংসারে খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু সেটাই নাকি এখানকার নিয়ম, তাই মদের ফেনা আর নটীর নূপুরনিক্কণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড়ো ঘরের ঘরনীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন। অথচ আমার স্বামী মদও ছুঁলেন না, আর নারীমাংসের লোভে পাপের পণ্যশালার দ্বারে দ্বারে মনুষ্যত্বের থলি উজাড় করে ফিরলেন না, এ কি আমার গুণে? পুরুষের উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত মনকে বশ করবার মতো কোন্ মন্ত্র বিধাতা আমাকে দিয়েছিলেন? কেবলমাত্রই কপাল, আর-কিছুই না! আর তাঁদের বেলাতেই কি পোড়া বিধাতার হুঁশ ছিল না, সকল অক্ষরই বাঁকা হয়ে উঠল! সন্ধ্যা হতে না হতেই তাঁদের ভোগের উৎসব মিটে গেল, কেবল রূপযৌবনের বাতিগুলো শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধরে মিছে জ্বলতে লাগল! কোথাও সংগীত নেই, কেবলমাত্রই জ্বলা!

আমার স্বামীর পৌরুষকে তাঁর দুই ভাজ অবজ্ঞা করবার ভান করতেন। এমন মানী সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো! কথায় কথায় তাঁদের কত খোঁটাই খেয়েছি। আমি যেন আমার স্বামীর সোহাগ কেবল চুরি করে করে নিচ্ছি। কেবল ছলনা, তার সমস্তই কৃত্রিম— এখনকার কালের বিবিয়ানার নির্লজ্জতা! আমার স্বামী আমাকে হাল-ফেশানের সাজে-সজ্জায় সাজিয়েছেন— সেই-সমস্ত রঙবেরঙের জ্যাকেট-শাড়ি-শেমিজ-পেটিকোটের আয়োজন দেখে তাঁরা জ্বলতে থাকতেন। রূপ নেই, রূপের ঠাট! দেহটাকে যে একেবারে দোকান করে সাজিয়ে তুললে গো, লজ্জা করে না!

আমার স্বামী সমস্তই জানতেন। কিন্তু মেয়েদের উপর যে তাঁর হৃদয় করুণায় ভরা। তিনি আমাকে বার বার বলতেন, রাগ কোরো না। মনে আছে আমি একবার তাঁকে বলেছিলুম, মেয়েদের মন বড়োই ছোটো, বড়ো বাঁকা। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, চীন-দেশের মেয়েদের পা যেমন ছোটো, যেমন বাঁকা। সমস্ত সমাজ যে চারি দিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোটো করে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলছে— দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে?

আমার জা'রা তাঁদের দেওরের কাছে যা দাবি করতেন তাই পেতেন। তাঁদের দাবি ন্যায্য কি অন্যায্য তিনি তার বিচারমাত্র করতেন না। আমার মনের ভিতরটা জ্বলতে থাকত যখন দেখতুম তাঁরা এর জন্যে একটুও কৃতজ্ঞ ছিলেন না। এমন-কি, আমার বড়ো জা, যিনি জপে তপে ব্রতে উপবাসে ভয়ংকর সাত্ত্বিক, বৈরাগ্য যার মুখে এত বেশি খরচ হত যে মনের জন্যে সিকি পয়সার বাকি থাকত না, তিনি বার বার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন যে তাঁকে তাঁর উকিল দাদা বলেছেন, যদি আদালতে তিনি নালিশ করে তা হলে তিনি— সে কত কী, সে আর ছাই কী লিখব! আমার স্বামীকে কথা দিয়েছি যে, কোনোদিন কোনো কারণেই আমি এঁদের কথার জবাব করব না, তাই জ্বালা আরো আমার অসহ্য হত। আমার মনে হত, ভালো হবার একটা সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়। আমার স্বামী বলতেন, আইন কিংবা সমাজ তাঁর ভাজেদের স্বপক্ষ নয়, কিন্তু একদিন স্বামীর অধিকারে যেটাকে নিজের বলেই তাঁরা নিশ্চিত জেনেছিলেন আজ সেটাকেই ভিক্ষুকের মতো পরের মন জুগিয়ে চেয়ে-চিন্তে নিতে হচ্ছে এ অপমান যে বড়ো কঠিন। এর উপরেও আবার কৃতজ্ঞতা দাবি করা! মার খেয়ে আবার বখশিশ দিতে হবে!— সত্য কথা বলব? অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি, আর-একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।

আমার মেজো জা অন্য ধরনের ছিলেন। তাঁর বয়স অল্প, তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং করতেন না। বরঞ্চ তাঁর কথাবার্তা-হাসিঠাট্টায় কিছু রসের বিকার ছিল। যে-সব যুবতী দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাদের রকম-সকম একেবারেই ভালো নয়। তা নিয়ে কেউ আপত্তি করবার লোক ছিল না, কেননা এ বাড়ির ঐরকমই দস্তুর। আমি বুঝতুম আমার স্বামী যে অকলঙ্ক আমার এই বিশেষ সৌভাগ্য তাঁর কাছে অসহ্য। তাই তাঁর দেওরের যাতায়াতের পথে ঘাটে নানারকম ফাঁদ পেতে রাখতেন। এই কথাটা কবুল করতে আমার সব চেয়ে লজ্জা হয় যে, আমার অমন স্বামীর জন্যেও মাঝে মাঝে আমার মনে ভয়-ভাবনা ঢুকত। এখানকার হাওয়াটাই যে ঘোলা, তার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ জিনিসকেও স্বচ্ছ বোধ হয় না। আমার মেজো জা মাঝে মাঝে এক-এক দিন নিজে রেঁধে-বেড়ে দেওরকে আদর করে খেতে ডাকতেন। আমার ভারি ইচ্ছে হত, তিনি যেন কোনো ছুতো করে বলেন, না, আমি যেতে পারব না।— যা মন্দ তার তো একটা শাস্তি পাওনা আছে ? কিন্তু, ফি বারেই যখন তিনি হাসিমুখে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতেন আমার মনের মধ্যে একটু কেমন— সে আমার অপরাধ— কিন্তু কী করব, আমার মন মানত না— মনে হত এর মধ্যে পুরুষমানুষের একটু চঞ্চলতা আছে। সে সময়টাতে আমার অন্য সহস্র কাজ থাকলেও কোনো একটা ছুতো করে আমার মেজো জায়ের ঘরে গিয়ে বসতুম। মেজো জা হেসে হেসে বলতেন, বাস্‌ রে, ছোটোরানীর একদণ্ড চোখের আড়াল হবার জো নেই— একেবারে কড়া পাহারা ! বলি, আমাদেরও তো একদিন ছিল, কিন্তু এত করে আগলে রাখতে শিখি নি।

আমার স্বামী এঁদের দুঃখটাই দেখতেন, দোষ দেখতে পেতেন না। আমি বলতুম, আচ্ছা, নাহয় যত দোষ সবই সমাজের, কিন্তু অত বেশি দয়া করবার দরকার কী ? মানুষ নাহয় কিছু কষ্টই পেলে, তাই বলেই কি— কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারবার জো নেই। তিনি তর্ক না করে একটুখানি হাসতেন। বোধ হয় আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি কাঁটা ছিল সেটুকু তাঁর অজানা ছিল না। আমার রাগের সত্যিকার ঝাঁজটুকু সমাজের উপরেও না, আর-কারও উপরেও না, সে কেবল— সে আর বলব না।

স্বামী একদিন আমাকে বোঝালেন— তোমার এই যে-সমস্তকে ওরা মন্দ বলছে যদি সত্যিই এগুলিকে মন্দ জানত তা হলে এতে ওদের এত রাগ হত না।

তা হলে এমন অন্যায় রাগ কিসের জন্যে ?

অন্যায় বলব কেমন করে ? ঈর্ষা জিনিসটার মধ্যে একটি সত্য আছে, সে হচ্ছে এই যে, যা-কিছু সুখের সেটি সকলেরই পাওয়া উচিত ছিল।

তা, বিধাতার সঙ্গে ঝগড়া করলেই হয়, আমার সঙ্গে কেন ?

বিধাতাকে যে হাতের কাছে পাওয়া যায় না।

তা ওঁরা যা পেতে চান তা নিলেই হয়। তুমি তো বঞ্চিত করতে চাও না। পরুন-না শাড়ি-জ্যাকেট গয়না জুতো-মোজা, মেমের কাছে পড়তে চান তো সে তো ঘরেই আছে, আর বিয়েই যদি করতে চান তুমি তো বিদ্যাসাগরের মতো অমন সাতটা সাগর পেরোতে পার তোমার এমন সম্বল আছে।

ঐ তো মুশকিল— মন যা চায় তা হাতে তুলে দেবার জো নেই।

তাই বুঝি কেবল ন্যাকামি করতে হয়, যেন যেটা পাই নি সেটা মন্দ, অথচ অন্য কেউ পেলে সর্বশরীর জ্বলতে থাকে।

যে মানুষ বঞ্চিত এমনি করেই সে আপনার বঞ্চনার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে চায়— ঐ তার সান্ত্বনা।

যাই বল তুমি, মেয়েরা বড়ো ন্যাকা। ওরা সত্যি কথাকে কবুল করতে চায় না, ছল করে।

তার মানে ওরা সব চেয়ে বঞ্চিত।

এমনি করে উনি যখন বাড়ির মেয়েদের সব রকম ক্ষুদ্রতাই উড়িয়ে দিতেন আমার রাগ হত। সমাজ কী হলে কী হতে পারত সে-সব কথা কয়ে তো কোনো লাভ নেই, কিন্তু পথে ঘাটে চারি দিকে এই-যে কাঁটা গজিয়ে রইল, এই-যে বাঁকা কথার টিটকারী, এই-যে পেটে এক মুখে এক, একে দয়া করতে পারা যায় না।

সে কথা শুনে তিনি বললেন, যেখানে তোমার নিজের একটু কোথাও বাজে সেইখানেই বুঝি তোমার যত দয়া, আর যেখানে ওদের জীবনের এপিঠ-ওপিঠ ফুঁড়ে সমাজের শেল বিঁধেছে সেখানে দয়া করবার কিছু নেই ? যারা পেটেও খাবে না তারাই পিঠেও সইবে ?

হবে, হবে, আমারই মন ছোটো। আর সকলেই ভালো, কেবল আমি ছাড়া। রাগ করে বললুম, তোমাকে তো ভিতরে থাকতে হয় না, সব কথা জান না— এই বলে আমি তাঁকে ও-মহলের একটা বিশেষ খবর দেবার চেষ্টা করতেই তিনি উঠে পড়লেন, বললেন চন্দ্রনাথবাবু অনেকক্ষণ বাইরে বসে আছেন।

আমি বসে বসে কাঁদতে লাগলুম। স্বামীর কাছে এমন ছোটো প্রমাণ হয়ে গেলে বাঁচি কী করে ? আমার ভাগ্য যদি বঞ্চিত হত তা হলেও আমি যে কখনো ওদের মতো এমনতরো হতুম না সে তো প্রমাণ করবার জো নেই।

দেখো, আমার এক-একবার মনে হয় রূপের অভিমানের সুযোগ বিধাতা যদি মেয়েদের দেন, তবে অন্য অনেক অভিমানের দুর্গতি থেকে তারা রক্ষা পায়। হীরে-জহরতের অভিমান করাও চলত, কিন্তু রাজার ঘরে তার কোনো অর্থই নেই। তাই আমার অভিমান ছিল সতীত্বের। সেখানে আমার স্বামীকেও হার মানতে হবে এটা আমার মনে ছিল। কিন্তু যখনই সংসারের কোনো খিটিমিটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে গেছি তখনই বারবার এমন ছোটো হয়ে গেছি যে, সে আমাকে মেরেছে। তাই তখন আমি তাঁকেই উলটে ছোটো করতে চেয়েছি। মনে মনে বলেছি, তোমার এ-সব কথাকে ভালো বলে মানব না, এ কেবলমাত্র ভালোমানুষি। এ তো নিজেকে দেওয়া নয়, এ অন্যের কাছে ঠকা।

আমার স্বামীর বড়ো ইচ্ছা ছিল আমাকে বাইরে বের করবেন। একদিন আমি তাঁকে বললুম, বাইরেতে আমার দরকার কী ?

তিনি বললেন, তোমাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে।

আমি বললুম, এতদিন যদি তার চলে গিয়ে থাকে আজও চলবে, সে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে না।

মরে তো মরুক-না, সেজন্য আমি ভাবছি নে— আমি আমার জন্যে ভাবছি।

সত্যি নাকি, তোমার আবার ভাবনা কিসের ?

আমার স্বামী হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। আমি তাঁর ধরন জানি, তাই বললুম, না, অমন চুপ করে ফাঁকি দিয়ে গেলে চলবে না, এ কথাটা তোমার শেষ করে যেতে হবে।

তিনি বললেন, কথা কি মুখের কথাতেই শেষ হয় ? সমস্ত জীবনে কত কথা শেষ হয় না।

না, তুমি হেঁয়ালি রাখো, বলো।

আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনাপাওনা বাকি আছে।

কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হল কোথায় ?

এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে— তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।

খুব জানি গো খুব জানি।

মনে করছ জানি, কিন্তু জান কি না তাও জান না।

দেখো, তোমার এই কথাগুলো সইতে পারি নে।

সেইজন্যেই তো বলতে চাই নি।

তোমার চুপ করে থাকা আরও সইতে পারি নে।

তাই তো আমার ইচ্ছে, আমি কথাও কইব না, চুপও করব না, তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরনাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হও নি, আমিও হই নি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের

ভালোবাসা সার্থক হবে।

পরিচয় তোমার হয়তো বাকি থাকতে পারে, কিন্তু আমার কিছুই বাকি নেই।

বেশ তো, আমারই যদি বাকি থাকে সেটুকু পূরণ করেই দাও-না কেন?

এ কথা নানা রকম আকারে বার বার উঠেছে। তিনি বলতেন, যে পেটুক মাছের ঝোল ভালোবাসে সে মাছকে কেটেকুটে সাঁৎলে সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে নিজের মনের মতোটি করে নেয়, কিন্তু যে লোক মাছকেই সত্য ভালোবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভর্তি করতে চায় না— সে তাকে ছাড়া জলের মধ্যেই বশ করতে পারে তো ভালো, না পারে তো ডাঙায় বসে অপেক্ষা করে— তার পরে যখন ঘরে ফেরে তখন এইটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাই নি, কিন্তু নিজের শখের বা সুবিধার জন্য তাকে ছেঁটে ফেলে নষ্ট করি নি। আস্ত পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।

এ-সব কথা আমার একেবারেই ভালো লাগত না, কিন্তু সেইজন্যেই যে তখন বের হই নি তা নয়। আমার দিদিশাশুড়ি তখন বেঁচে ছিলেন। তাঁর অমতে আমার স্বামী বিংশ শতাব্দীর প্রায় বিশ-আনা দিয়েই ঘর ভর্তি করে তুলেছিলেন, তিনিও সয়েছিলেন; রাজবাড়ির বউ যদি পর্দা ঘুচিয়ে বাইরে বেরোত তা হলেও তিনি সইতেন; তিনি নিশ্চয় জানতেন এটাও একদিন ঘটবে, কিন্তু আমি ভাবতুম এটা এতই কি জরুরি যে তাঁকে কষ্ট দিতে যাব। বইয়ে পড়েছি আমরা খাঁচার পাখি, কিন্তু অন্যের কথা জানি নে, এই খাঁচার মধ্যে আমার এত ধরেছে যে বিশ্বেও তা ধরে না। অন্তত তখন তো সেইরকমই ভাবতুম।

আমার দিদিশাশুড়ি যে আমাকে এত ভালোবাসতেন তার গোড়ার কারণটা এই যে, তাঁর বিশ্বাস আমি আমার স্বামীর ভালোবাসা টানতে পেরেছিলুম সেটা যেন কেবল আমারই গুণ, কিংবা আমার গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্ত। কেননা, পুরুষমানুষের ধর্মই হচ্ছে রসাতলে তলিয়ে যাওয়া। তাঁর অন্য কোনো নাতিকে তাঁর নাতবউরা সমস্ত রূপযৌবন নিয়েও ঘরের দিকে টানতে পারে নি, তাঁরা পাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন, কেউ তাঁদের বাঁচাতে পারলে না। তাঁদের ঘরে পুরুষমানুষের এই মরণের আগুন আমিই নেবালুম এই ছিল তাঁর ধারণা। সেইজন্যেই তিনি আমাকে যেন বুকে করে রেখেছিলেন; আমার একটু অসুখবিসুখ হলে তিনি ভয়ে কাঁপতেন। আমার স্বামী সাহেবের দোকান থেকে যে-সমস্ত সাজসজ্জা এনে সাজাতেন সে তাঁর পছন্দসই ছিল না। কিন্তু তিনি ভাবতেন পুরুষমানুষের এমন কতকগুলো শখ থাকবেই যা নিতান্ত বাজে, তাতে কেবলই লোকসান। তাকে ঠেকাতে গেলেও চলবে না, অথচ সে যদি সর্বনাশ পর্যন্ত না পৌঁছয় তবেই রক্ষে। আমার নিখিলেশ বউকে যদি না সাজাত আর-কাউকে সাজাতে যেত। এইজন্যে ফি বারে যখন আমার জন্যে কোনো নতুন কাপড় আসত তিনি তাই নিয়ে আমার স্বামীকে ডেকে কত ঠাট্টা কত আমোদ করতেন। হতে হতে শেষকালে তাঁরও পছন্দর রঙ ফিরেছিল। কলিযুগের কল্যাণে অবশেষে তাঁর এমন দশা হয়েছিল যে নাতবউ তাঁকে ইংরিজি বই থেকে গল্প না বললে তাঁর সন্ধ্যা কাটত না।

দিদিশাশুড়ির মৃত্যুর পর আমার স্বামীর ইচ্ছা হল আমরা কলকাতায় গিয়ে থাকি। কিন্তু কিছুতেই আমার মন উঠল না। এ যে আমার শ্বশুরের ঘর, দিদিশাশুড়ি কত দুঃখ কত বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে কত যত্নে একে এতকাল আগলে এসেছেন, আমি সমস্ত দায় একেবারে ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কলকাতায় চলে যাই তবে যে আমাকে অভিশাপ লাগবে—এই কথাই বার বার আমার মনে হতে লাগল। দিদিশাশুড়ির শূন্য আসন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সাধ্বী আট বছর বয়সে এই ঘরে এসেছেন, আর উনআশি বছরে মারা গেছেন। তাঁর সুখের জীবন ছিল না। ভাগ্য তাঁর বুকে একটার পর একটা কত বাণই হেনেছে, কিন্তু প্রত্যেক আঘাতেই তাঁর জীবন থেকে অমৃত উছলে উঠেছে। এই বৃহৎ সংসার সেই চোখের জলে গলানো পুণ্যের ধারায় পবিত্র। এ ছেড়ে আমি কলকাতার জঞ্জালের মধ্যে গিয়ে কী করব।

আমার স্বামী মনে করেছিলেন, এই সুযোগে আমার দুই জায়ের উপর এখানকার সংসারের কর্তৃত্ব

দিয়ে গেলে তাতে তাঁদের মনেও সান্ত্বনা হত, আর আমাদেরও জীবনটা কলকাতায় একটু ডালপালা মেলবার জায়গা পেত।

আমার ঐখানেই গোল বেধেছিল। ওঁরা যে এতদিন আমাকে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছেন, আমার স্বামীর ভালো ওঁরা কখনো দেখতে পারেন নি— আজ কি তারই পুরস্কার পাবেন?

আর, রাজসংসার তো এইখানেই। আমাদের সমস্ত প্রজা-আমলা, আশ্রিত-অভ্যাগত আত্মীয়, সমস্তই এখানকার এই বাড়িকে চারি দিকে আঁকড়ে। কলকাতায় আমরা কে তা জানি নে, অন্য কজন লোকই বা জানে! আমাদের মান-সম্মান-ঐশ্বর্যের পূর্ণ মূর্তিই এখানে। এ সমস্তই ওঁদের হাতে দিয়ে সীতা যেমন নির্বাসনে গিয়েছিলেন তেমনি করে চলে যাব! আর, ওঁরা পিছন থেকে হাসবেন? ওঁরা কি আমার স্বামীর এ দাক্ষিণ্যের মর্যাদা বোঝেন, না তার যোগ্য ওঁরা?

তার পরে যখন কোনোদিন এখানে ফিরে আসতে হবে তখন আমার আসনটি কি আর ফিরে পাব? আমার স্বামী বলতেন, দরকার কী তোমার ঐ আসনের? ও ছাড়াও তো জীবনের আরো অনেক জিনিস আছে, তার দাম অনেক বেশি।

আমি মনে মনে বললুম, পুরুষমানুষ এ-সব কথা ঠিক বোঝে না। সংসারটা যে কতখানি তা ওদের সম্পূর্ণ জানা নেই, সংসারের বাহির-মহলে যে ওদের বাসা। এ জায়গায় মেয়েদের বুদ্ধিমতেই ওদের চলা উচিত।

সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, একটা তেজ থাকা চাই তো। যাঁরা চিরদিন এমন শত্রুতা করে এসেছেন তাঁদের হাতে সমস্ত দিয়ে-থুয়ে চলে যাওয়া যে পরাভব। আমার স্বামী যদি বা তা মানতে চান আমি তো মানতে দিতে পারব না। আমি মনে মনে জানলুম, এ আমার সতীত্বের তেজ।

আমার স্বামী আমাকে জোর করে কেন নিয়ে গেলেন না? আমি জানি কেন। তাঁর জোর আছে বলেই জোর করেন নি। তিনি আমাকে বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রী বলেই যে তুমি আমাকে কেবলই মেনে চলবে তোমার উপর আমার এ দৌরাত্ম্য আমার নিজেরই সইবে না। আমি অপেক্ষা করে থাকব আমার সঙ্গে যদি তোমার মেলে তো ভালো, যদি না মেলে তো উপায় কী!

কিন্তু তেজ বলে একটা জিনিস আছে— সেদিন আমার মনে হয়েছিল ঐ জায়গায় আমি যেন আমার— না, এ কথা আর মুখে আনাও চলবে না।

রাত্রির সঙ্গে দিনের যে তফাত সেটাকে যদি ঠিক হিসাবমত ক্রমে ক্রমে ঘোচাতে হত তা হলে সে কি কোনো যুগে ঘুচত? কিন্তু সূর্য উঠে পড়ে, অন্ধকার চুকে যায়, অসীম কালের হিসাব মুহূর্তকালে মেটে।

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশীর যুগ এসেছিল, কিন্তু সে যে কেমন করে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তার আগেকার সঙ্গে এ যুগের মাঝখানকার ক্রম যেন নেই। বোধ করি সেইজন্যেই নূতন যুগ একেবারে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো আমাদের ভয়-ভাবনা চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কী হল, কী হবে, তা বোঝবার সময় পাই নি।

পাড়ায় বর আসছে, তার বাঁশি বাজছে, তার আলো দেখা দিয়েছে, অমনি মেয়েরা যেমন ছাতে বারান্দায় জানলায় বেরিয়ে পড়ে, তাদের আবরণের দিকে আর মন থাকে না, তেমনি সেদিন সমস্ত দেশের বর আসবার বাঁশি যেমনি শোনা গেল মেয়েরা কি আর ঘরের কাজ নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে? হুলু দিতে দিতে, শাঁক বাজাতে বাজাতে, তারা যেখানে দরজা জানলা দেয়ালের ফাঁক পেলে সেইখানেই মুখ বাড়িয়ে দিলে।

সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিত্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবিরে লাল হয়ে উঠেছিল। এতদিন মন যে জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্মকর্ম আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা যে সীমাটুকুর মধ্যে বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগে ছিল সেদিনও তার বেড়া ভাঙে নি বটে, কিন্তু সেই বেড়ার উপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তের ডাক শুনলুম স্পষ্ট

তার মানে বুঝতে পারলুম না, কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল।

আমার স্বামী যখন কলেজে পড়তেন তখন থেকেই তিনি দেশের প্রয়োজনের জিনিস দেশেই উৎপন্ন করবেন বলে নানারকম চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের জেলায় খেজুর গাছ অজস্র— কী করে অনেক গাছ থেকে একটি নলের সাহায্যে একসঙ্গে এক জায়গায় রস আদায় করে সেইখানেই জ্বাল দিয়ে সহজে চিনি করা যেতে পারে সেই চেষ্টায় তিনি অনেক দিন কাটালেন। শুনেছি উপায় খুব সুন্দর উদ্ভাবন হয়েছিল, কিন্তু তাতে রসের তুলনায় টাকা এত বেশি গলে পড়তে লাগল যে কারবার টিকল না। চাষের কাজে নানারকম পরীক্ষা করে তিনি যে-সব ফসল ফলিয়েছিলেন সে অতি আশ্চর্য, কিন্তু তাতে যে টাকা খরচ করেছিলেন সে আরো বেশি আশ্চর্য। তাঁর মনে হল আমাদের দেশে বড়ো বড়ো কারবার যে সম্ভবপর হয় না তার প্রধান কারণ আমাদের ব্যাঙ্ক নেই। সেই সময় তিনি আমাকে পোলিটিক্যাল ইকনমি পড়াতে লাগলেন। তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাঁর মনে হল সব-প্রথমে দরকার ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয় করবার অভ্যাস ও ইচ্ছা আমাদের জনসাধারণের মনে সঞ্চার করে দেওয়া। একটা ছোটো গোছের ব্যাঙ্ক খুললেন। ব্যাঙ্কে টাকা জমাবার উৎসাহ গ্রামের লোকের খুব জেগে উঠল, কারণ সুদের হার খুব চড়া ছিল। কিন্তু যে কারণে লোকের উৎসাহ বাড়তে লাগল সেই কারণেই ঐ মোটা সুদের ছিদ্র দিয়ে ব্যাঙ্ক গেল তলিয়ে। এই-সকল কাণ্ড দেখে তাঁর পুরাতন আমলারা অত্যন্ত বিরক্ত ও উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠত, শত্রুপক্ষ ঠাট্টাবিদ্রূপ করত। আমার বড়ো জা একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, তাঁর বিখ্যাত উকিল খুড়তুত ভাই তাঁকে বলেছেন যদি জজের কাছে দরবার করা যায় তবে এই পাগলের হাত থেকে এই বনেদি বংশের মানসম্ভ্রম বিষয়সম্পত্তি এখনো রক্ষা হবার উপায় হতে পারে।

সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল আমার দিদিশাশুড়ির মনে বিকার ছিল না। তিনি আমাকে ডেকে কতবার ভর্ৎসনা করেছেন ; বলেছেন, কেন তোরা ওকে সবাই মিলে বিরক্ত করছিস ? বিষয়-সম্পত্তির কথা ভাবছিস ? আমার বয়সে আমি তিনবার এ সম্পত্তি রিসীভরের হাতে যেতে দেখেছি। পুরুষেরা কি মেয়েমানুষের মতো ? ওরা যে উড়নচণ্ডী, ওরা ওড়াতেই জানে। নাতবউ, তোর কপাল ভালো যে সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও উড়ছে না। দুঃখ পাস নি বলেই সে কথা মনে থাকে না।

আমার স্বামীর দানের লিস্ট্‌ ছিল খুব লম্বা। তাঁতের কল কিংবা ধান ভানার যন্ত্র কিংবা ঐরকম একটা-কিছু যে-কেউ তৈরি করবার চেষ্টা করেছে তাকে তার শেষ নিষ্ফলতা পর্যন্ত তিনি সাহায্য করেছেন। বিলাতি কোম্পানির সঙ্গে টক্কর দিয়ে পুরীযাত্রার জাহাজ চালাবার স্বদেশী কোম্পানি উঠল ; তার একখানা জাহাজও ভাসে নি, কিন্তু আমার স্বামীর অনেকগুলি কোম্পানির কাগজ ডুবেছে।

সব চেয়ে আমার বিরক্ত লাগত সন্দীপবাবু যখন দেশের নানা উপকারের ছুতোয় তাঁর টাকা শুষে নিতেন। তিনি খবরের কাগজ চালাবেন, স্বাদেশিকতা প্রচার করতে যাবেন, ডাক্তারের পরামর্শমতে তাঁকে কিছুদিনের জন্য উটকামন্দে যেতে হবে— নির্বিচারে আমার স্বামী তার খরচ জুগিয়েছেন। এ ছাড়া সংসার-খরচের জন্য নিয়মিত তাঁর মাসিক বরাদ্দ আছে। অথচ আশ্চর্য এই যে, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর যে মতের মিল আছে তাও নয়। আমার স্বামী বলতেন, দেশের খনিতে যে পণ্যদ্রব্য আছে তাকে উদ্ধার করতে না পারলে যেমন দেশের দারিদ্র্য, তেমনি দেশের চিত্তে যেখানে শক্তির রত্নখনি আছে তাকে যদি আবিষ্কার এবং স্বীকার না করা যায় তবে সে দারিদ্র্য আরো গুরুতর। আমি তাঁকে একদিন রাগ করে বলেছিলুম, এরা তোমাকে সবাই ফাঁকি দিচ্ছে। তিনি হেসে বললেন, আমার গুণ নেই, অথচ কেবলমাত্র টাকা দিয়ে গুণের অংশীদার হচ্ছি— আমিই তো ফাঁকি দিয়ে লাভ করে নিলুম।

এই পূর্বযুগের পরিচয় কিছু বলে রাখা গেল, নইলে নবযুগের নাটটা স্পষ্ট বোঝা যাবে না।

এই যুগের তুফান যেই আমার রক্তে লাগল আমি প্রথমেই স্বামীকে বললুম, বিলিতি জিনিসে তৈরি আমার সমস্ত পোশাক পুড়িয়ে ফেলব।

স্বামী বললেন, পোড়াবে কেন ? যতদিন খুশি ব্যবহার না করলেই হবে।

কী তুমি বলছ 'যতদিন খুশি' ! ইহজীবনে আমি কখনো—

বেশ তো, ইহজীবনে তুমি নাহয় ব্যবহার করবে না। ঘটা করে নাই পোড়ালে?

কেন এতে তুমি বাধা দিচ্ছ?

আমি বলছি, গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।

এই উত্তেজনাতেই গড়ে তোলবার সাহায্য হয়।

তাই যদি বল তবে বলতে হয় ঘরে আগুন না লাগালে ঘর আলো করা যায় না। আমি প্রদীপ জ্বালবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্যে ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে দুর্বলতার গোঁজামিলন।

আমার স্বামী বললেন, দেখো, বুঝছি আমার কথা আজ তোমার মনে নিচ্ছে না, তবু আমি এ কথাটি তোমাকে বলছি— ভেবে দেখো। মা যেমন নিজের গয়না দিয়ে তার প্রত্যেক মেয়েকে সাজিয়ে দেয়, আজ তেমনি এমন একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। আজ আমাদের খাওয়াপরা চলাফেরা ভাবাচিন্তা সমস্তই সমস্ত-পৃথিবীর যোগে। আমি তাই মনে করি এটা প্রত্যেক জাতিরই সৌভাগ্যের যুগ— এই সৌভাগ্যকে অস্বীকার করা বীরত্ব নয়।

তার পরে আর-এক ল্যাঠা। মিস গিল্‌বি যখন আমাদের অন্তঃপুরে এসেছিল তখন তাই নিয়ে কিছুদিন খুব গোলমাল চলেছিল। তার পরে অভ্যাসক্রমে সেটা চাপা পড়ে গেছে। আবার সমস্ত ঘুলিয়ে উঠল। মিস গিল্‌বি ইংরেজ কি বাঙালি অনেক দিন সে কথা আমারও মনে হয় নি, কিন্তু মনে হতে শুরু হল। আমি স্বামীকে বললুম, মিস গিল্‌বিকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। স্বামী চুপ করে রইলেন। আমি সেদিন তাঁকে যা মুখে এল তাই বলেছিলুম, তিনি ম্লান মুখ করে চলে গেলেন। আমি খুব খানিকটা কাঁদলুম। কেঁদে যখন আমার মনটা একটু নরম হল তিনি রাত্রে এসে বললেন, দেখো, মিস গিল্‌বিকে কেবলমাত্র ইংরেজ বলে ঝাপসা করে দেখতে আমি পারি নে। এতদিনের পরিচয়েও কি ঐ নামের বেড়াটা ঘুচবে না? ও যে তোমাকে ভালোবাসে।

আমি একটুখানি লজ্জিত হয়ে অথচ নিজের অভিমানের অল্প একটু ঝাঁজ বজায় রেখে বললুম, আচ্ছা, থাক্‌-না, ওকে কে যেতে বলছে?

মিস গিল্‌বি রয়ে গেল। একদিন গির্জেয় যাবার সময় পথের মধ্যে আমাদেরই একজন দূরসম্পর্কের আত্মীয় ছেলে তাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে অপমান করলে। আমার স্বামীই এতদিন সেই ছেলেকে পালন করেছিলেন; তিনি তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। এই নিয়ে ভারি একটা গোল উঠল। সেই ছেলে যা বললে সবাই তাই বিশ্বাস করলে। লোকে বললে, মিস গিল্‌বিই তাকে অপমান করেছে এবং তার সম্বন্ধে বানিয়ে বলেছে। আমারও কেমন মনে হল, সেটা অসম্ভব নয়। ছেলেটার মা নেই, তার খুড়ো এসে আমাকে ধরলে। আমি তার হয়ে অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোনো ফল হল না।

সেদিনকার দিনে আমার স্বামীর এই ব্যবহার কেউ ক্ষমা করতে পারলে না। আমিও না। আমি মনে মনে তাঁকে নিন্দাই করলুম। এইবার মিস গিল্‌বি আপনিই চলে গেল। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে জল পড়ল, কিন্তু আমার মন গলল না। আহা, মিথ্যা করে ছেলেটার এমন সর্বনাশ করে গেল গো! আর, অমন ছেলে! স্বদেশীর উৎসাহে তার নাওয়া-খাওয়া ছিল না। আমার স্বামী নিজের গাড়ি করে মিস গিল্‌বিকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। সেটা আমার বড়ো বাড়াবাড়ি বোধ হল। এই কথাটা নিয়ে নানা ডালপালা দিয়ে কাগজে যখন গাল দিলে আমার মনে হল, এই শাস্তি ওঁর পাওনা ছিল।

ইতিপূর্বে আমি আমার স্বামীর জন্যে অনেকবার উদ্‌বিগ্ন হয়েছি, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর জন্যে একদিনও লজ্জা বোধ করি নি। এবার লজ্জা হল। মিস গিল্‌বির প্রতি নরেন কী অন্যায় করেছে না-করেছে সে আমি জানি নে, কিন্তু আজকের দিনে তা নিয়ে সদ্‌বিচার করতে পারাটাই লজ্জার কথা। যে ভাবের থেকে নরেন ইংরেজ মেয়ের প্রতি ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে আমি তাকে কিছুতেই দমিয়ে দিতে চাই নে। এই কথাটা আমার স্বামী যে কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না, আমার মনে হল

সেটা তাঁর পৌরুষের অভাব। তাই আমার মনে লজ্জা হল।

শুধু তাই নয়, আমার সব চেয়ে বুকে বিঁধেছিল যে, আমাকে হার মানতে হয়েছে। আমার তেজ কেবল আমাকেই দগ্ধ করলে, কিন্তু আমার স্বামীকে উজ্জ্বল করলে না। এই তো আমার সতীত্বের অপমান।

অথচ স্বদেশী কাণ্ডর সঙ্গে যে আমার স্বামীর যোগ ছিল না বা তিনি এর বিরুদ্ধ ছিলেন তা নয়। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলতেন, দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।

এমন সময়ে সন্দীপবাবু স্বদেশী প্রচার করবার জন্যে তাঁর দলবল নিয়ে আমাদের ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। বিকেলবেলায় আমাদের নাটমন্দিরে সভা হবে। আমরা মেয়েরা দালানের এক দিকে চিক ফেলে বসে আছি। 'বন্দে মাতরম্' শব্দের সিংহনাদ ক্রমে ক্রমে কাছে আসছে, আমার বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ করে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ পাগড়ি-বাঁধা গেরুয়া-পরা যুবক ও বালকের দল খালি পায়ে আমাদের প্রকাণ্ড আঙিনার মধ্যে, মরা নদীতে প্রথম বর্ষার গেরুয়া বন্যার ধারার মতো, হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ল। লোকে লোকে ভরে গেল। সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একটা বড়ো চৌকির উপর বসিয়ে দশ-বারো জন ছেলে সন্দীপবাবুকে কাঁধে করে নিয়ে এল। বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! আকাশটা যেন ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়বে মনে হল।

সন্দীপবাবুর ফোটোগ্রাফ পূর্বেই দেখেছিলুম। তখন যে ঠিক ভালো লেগেছিল তা বলতে পারি নে। কুশ্রী দেখতে নয়, এমন-কি, রীতিমত সুশ্রীই। তবু জানি না কেন আমার মনে হয়েছিল উজ্জ্বলতা আছে বটে, কিন্তু চেহারাটা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে গড়া— চোখে আর ঠোঁটে কী-একটা আছে যেটা খাঁটি নয়। সেইজন্যেই আমার স্বামী যখন বিনা দ্বিধায় তাঁর সকল দাবি পূরণ করতেন আমার ভালো লাগত না। অপব্যয় আমি সইতে পারতুম, কিন্তু আমার কেবলই মনে হত বন্ধু হয়ে এ লোকটা আমার স্বামীকে ঠকাচ্ছে। কেননা, ভাবখানা তো তপস্বীর মতো নয়, গরিবের মতোও নয়, দিব্যি বাবুর মতো। ভিতরে আরামের লোভ আছে, অথচ— এইরকম নানা কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল। আজ সেই-সব কথা মনে উঠছে— কিন্তু থাক্।

কিন্তু, সেদিন সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর এই বৃহৎ সভার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে ভেসে যাবার জো হল তখন তাঁর সে এক আশ্চর্য মূর্তি দেখলুম। বিশেষত এক সময় সূর্য ক্রমে নেমে এসে ছাদের নীচে দিয়ে তাঁর মুখের উপর যখন হঠাৎ রৌদ্র ছড়িয়ে দিলে তখন মনে হল, তিনি যে অমর-লোকের মানুষ এই কথাটা দেবতা সেদিন সমস্ত নরনারীর সামনে প্রকাশ করে দিলেন। বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক কথায় যেন ঝড়ের দমকা হাওয়া। সাহসের অন্ত নেই। আমার চোখের সামনে যেটুকু চিকের আড়াল ছিল সে আমি সইতে পারছিলুম না। কখন নিজের অগোচরে চিক খানিকটা সরিয়ে ফেলে মুখ বের করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলুম আমার মনে পড়ে না। সমস্ত সভায় এমন একটি লোক ছিল না আমার মুখ দেখবার যার একটু অবকাশ ছিল। কেবল এক সময় দেখলুম কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল। কিন্তু আমার হুঁশ ছিল না। আমি কি তখন রাজবাড়ির বউ? আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি আর তিনি বাংলাদেশের বীর। যেমন আকাশের সূর্যের আলো তাঁর ঐ ললাটের উপর পড়েছে, তেমনি দেশের নারীচিত্তের অভিষেক যে চাই। নইলে তাঁর রণযাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কী করে?

আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারলুম, আমার মুখের দিকে চাওয়ার পর থেকে তাঁর ভাষার আগুন আরো জ্বলে উঠল। ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা তখন আর রাশ মানতে চাইল না— বজ্রের উপর বজ্রের গর্জন, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চম্‌কানি। আমার মন বললে, আমারই চোখের শিখায় এই আগুন ধরিয়ে

দিলে। আমরা কি কেবল লক্ষ্মী, আমরাই তো ভারতী।

সেদিন একটা অপূর্ব আনন্দ এবং অহংকারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আর-এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করতে লাগল গ্রীসের বীরাঙ্গনার মতো আমার চুল কেটে দিই ঐ বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্য, আমার এই আজানুলম্বিত চুল। যদি ভিতরকার চিত্তের সঙ্গে বাইরেকার গয়নার যোগ থাকত তা হলে আমার কণ্ঠী, আমার গলার হার, আমার বাজুবন্ধ উল্কাবৃষ্টির মতো সেই সভায় ছুটে ছুটে খসে খসে পড়ে যেত। নিজের অত্যন্ত একটা ক্ষতি করতে পারলে তবেই যেন সেই আনন্দের উৎসাহবেগ সহ্য করা সম্ভব হতে পারত।

সন্ধ্যাবেলায় আমার স্বামী যখন ঘরে এলেন আমার ভয় হতে লাগল পাছে তিনি সেদিনকার বক্তৃতার দীপক রাগিণীর সঙ্গে তান না মিলিয়ে কোনো কথা বলেন, পাছে তাঁর সত্যপ্রিয়তায় কোনো জায়গায় ঘা লাগাতে তিনি একটুও অসম্মতি প্রকাশ করেন— তা হলে সেদিন আমি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা করতে পারতুম।

কিন্তু, তিনি আমাকে কোনো কথাই বললেন না। সেটাও আমাকে ভালো লাগল না। তাঁর উচিত ছিল বলা, আজ সন্দীপের কথা শুনে আমার চৈতন্য হল এ-সব বিষয়ে আমার অনেক দিনের ভুল ভেঙে গেল। আমার কেমন মনে হল তিনি কেবল জেদ করে চুপ ক'রে আছেন, জোর করেই উৎসাহ প্রকাশ করছেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, সন্দীপবাবু আর কতদিন এখানে আছেন?

স্বামী বললেন, তিনি কাল সকালেই রংপুরে রওনা হবেন।

কাল সকালেই?

হ্যাঁ, সেখানে তাঁর বক্তৃতার সময় স্থির হয়ে গেছে।

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলুম। তার পরে বললুম, কোনোমতে কালকের দিনটা থেকে গেলে হয় না?

সে তো সম্ভব নয়, কিন্তু কেন বলো দেখি।

আমার ইচ্ছা আমি নিজে উপস্থিত থেকে তাঁকে খাওয়াব।

শুনে আমার স্বামী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এর পূর্বে অনেক দিন অনেক বার তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে আমাকে বের হবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। আমি কিছুতেই রাজি হই নি।

আমার স্বামী আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে একরকম করে চাইলেন, আমি তার মানেটা ঠিক বুঝলুম না। ভিতরে হঠাৎ একটু কেমন লজ্জা বোধ হল। বললুম, না না, সে কাজ নেই।

তিনি বললেন, কেনই বা কাজ নেই? আমি সন্দীপকে বলব, যদি কোনোরকমে সম্ভব হয় তা হলে কাল সে থেকে যাবে।

দেখলুম সম্ভব হল।

আমি সত্য কথা বলব। সেদিন আমার মনে হচ্ছিল ঈশ্বর কেন আমাকে আশ্চর্য সুন্দর করে গড়লেন না? কারও মন হরণ করবার জন্যে যে, তা নয়। কিন্তু, রূপ যে একটা গৌরব। আজ এই মহাদিনে দেশের পুরুষেরা দেশের নারীর মধ্যে দেখুক একবার জগদ্ধাত্রীকে। কিন্তু, বাইরের রূপ না হলে তাদের চোখ যে দেবীকে দেখতে পায় না। সন্দীপবাবু কি আমার মধ্যে দেশের সেই জাগ্রত শক্তিকে দেখতে পাবেন? না, মনে করবেন, এ একজন সামান্য মেয়েমানুষ, তাঁর এই বন্ধুর ঘরের গৃহিণীমাত্র?

সেদিন সকালে মাথা ঘষে আমার সুদীর্ঘ এলোচুল একটি লাল রেশমের ফিতে দিয়ে নিপুণ করে জড়িয়েছিলুম। দুপুরবেলায় খাবার নিমন্ত্রণ, তাই ভিজে চুল তখন খোঁপা করে বাঁধবার সময় ছিল না। গায়ে ছিল জরির পাড়ের একটি সাদা মাদ্রাজী শাড়ি, আর জরির একটুখানি পাড়-দেওয়া হাত-কাটা জ্যাকেট।

আমি ঠিক করেছিলুম এ খুব সংযত সাজ এর চেয়ে সাদাসিধা আর-কিছু হতে পারে না। এমন সময় আমার মেজো জা এসে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তার পরে ঠোঁটদুটো খুব টিপে একটু হাসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, দিদি, তুমি হাসলে যে ?

তিনি বললেন, তোর সাজ দেখছি।

আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললুম, এমনিই কি সাজ দেখলে ?

তিনি আর-একবার একটুখানি বাঁকা হাসি হেসে বললেন, মন্দ হয় নি ছোটোরানী, বেশ হয়েছে। কেবল ভাবছি সেই তোমার বিলিতি দোকানের বুক-কাটা জামাটা পরলেই সাজটা পুরোপুরি হত।

এই বলে তিনি কেবল তাঁর মুখ-চোখ নয়, তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহের ভঙ্গি হাসিতে ভরে ঘর থেকে চলে গেলেন। খুব রাগ হল এবং মনে হল সমস্ত-ছেড়েছুড়ে আটপৌরে মোটাগোছের একটা শাড়ি পরি। কিন্তু, সে ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত কেন যে পালন করতে পারলুম না তা ঠিক জানি নে। মনে মনে বললুম, আমি যদি বেশ ভদ্ররকম সাজ না করেই সন্দীপবাবুর সামনে বেরোই তা হলে আমার স্বামী রাগ করবেন— মেয়েরা যে সমাজের শ্রী।

ভেবেছিলুম, সন্দীপবাবু একেবারে খেতে যখন বসবেন তখন তাঁর সামনে বেরোব। সেই খাওয়ানো-কর্মটার আড়ালে প্রথম-দেখার সংকোচ অনেকটা কেটে যাবে। কিন্তু, খাবার তৈরি হতে আজ দেরি হচ্ছে, প্রায় একটা বেজে গেছে। তাই আমার স্বামী আলাপ করবার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ঘরে ঢুকে প্রথমটা তাঁর মুখের দিকে চাইতে ভারি লজ্জা ঠেকছিল। কোনোমতে সেটা কাটিয়ে জোর করে বলে ফেললুম, আজ খেতে আপনার দেরি হয়ে গেল।

তিনি অসংকোচে আমার পাশের চৌকিতে এসে বললেন, দেখুন, অন্ন তো রোজই একরকম জোটে, কিন্তু অন্নপূর্ণা থাকেন আড়ালে। আজ অন্নপূর্ণা এলেন, অন্ন নাহয় আড়ালেই রইল।

যেমন জোর তাঁর বক্তৃতায় তেমনি ব্যবহারে। একটুও দ্বিধা নেই। সব জায়গাতেই আপন আসনটি অবিলম্বে জিতে নেওয়াই যেন তাঁর অভ্যাস। কেউ কিছু মনে করতে পারে এ-সব তর্ক তাঁর নয়। খুব কাছে এসে বসবার স্বাভাবিক দাবি যেন তাঁর আছে, অতএব এতে যে দোষ দিতে পারে দোষ তারই।

আমার লজ্জা হতে লাগল, পাছে সন্দীপবাবু মনে করেন আমি নেহাৎ একটা সেকেলে জড়পদার্থ। মুখের কথা বেশ জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে উঠবে, কোথাও বাধবে না, এক-একটা জবাব শুনে তিনি মনে মনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, এ আমার কিছুতেই ঘটে উঠল না। ভিতরে ভিতরে ভারি কষ্ট হতে লাগল ; নিজেকে হাজার বার ভর্ৎসনা করে বললুম, কেন ওঁর সামনে এমন হঠাৎ বের হতে গেলুম!

কোনোরকম করে খাওয়ানোটা হয়ে গেলেই আমি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলুম ; তিনি আবার তেমনি নিঃসংকোচে দরজার কাছে এসে আমার পথ আগলে বললেন, আমাকে পেটুক ঠাওরাবেন না, আমি খাওয়ার লোভে এখানে আসি নি। আমার লোভ কেবল আপনি ডেকেছেন বলে। যদি খাওয়ার পরে অমনি পালান তা হলে অতিথিকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

এমন-সব কথা অত্যন্ত সহজে অত্যন্ত জোরে না বললে ভারি বদসুর লাগত। আমার স্বামী যে ওঁর পরম বন্ধু, আমি যে ওঁর ভাজের মতো। আমি যখন নিজের সঙ্গে লড়াই করে সন্দীপবাবুর প্রবল আত্মীয়তার সমোচ্চ ক্ষেত্রে ওঠবার চেষ্টা করছি, আমার স্বামী আমার বিভ্রাট দেখে আমাকে বললেন, আচ্ছা, তুমি তা হলে তোমার খাওয়া সেরে চলে এসো।

সন্দীপবাবু বললেন, কিন্তু কথা দিয়ে যান ফাঁকি দেবেন না।

আমি একটু হেসে বললুম, আমি এখনই আসছি।

তিনি বললেন, আপনাকে কেন বিশ্বাস করি নে তা বলি। আজ ন বছর হল নিখিলেশের বিয়ে হয়েছে। এই নটি বছর আপনি আমাকে ফাঁকি দিয়ে এসেছেন। আবার ফের যদি ন বছর করেন তা হলে আর দেখা হবে না।

আমিও আত্মীয়তা শুরু করে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললুম, কেন, তা হলেই বা দেখা হবে না কেন ?

তিনি বললেন, আমার কুষ্ঠীতে আছে আমি অল্প বয়সে মরব। আমার বাপ দাদা কেউ ত্রিশের

রোম যখন নিজের পাপের জবাবদিহি করছিল তখন তা কেউ দেখতে পায় নি। তখন তার ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। বড়ো বড়ো ডাকাত-সভ্যতারও জবাবদিহির দিন কখন আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু একটা জিনিস কি দেখতে পাচ্ছ না— ওদের পলিটিক্সের ঝুলি-ভরা মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেস্টিজ্‌ রক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান, এই যে-সব পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে এর ভার কি কম? আর, এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে না? দেশের উপরেও যারা ধর্মকে মানছে না, আমি বলছি, তারা দেশকেও মানছে না।

আমার স্বামীকে আমি কোনোদিন বাইরের লোকের সঙ্গে তর্ক করতে শুনি নি। আমার সঙ্গে তিনি তর্ক করেছেন, কিন্তু আমার প্রতি তাঁর এমন গভীর করুণা যে, আমাকে হার মানাতে তাঁর কষ্ট হত। আজ দেখলুম তাঁর অস্ত্রচালনা।

আমার স্বামীর কথাগুলোতে কোনোমতেই আমার মন সায় দিচ্ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, এর উপযুক্ত উত্তর আছে, উপস্থিতমত সে আমার মনে জোগাচ্ছিল না। মুশকিল এই যে, ধর্মের দোহাই দিলে চুপ করে যেতে হয়; এ কথা বলা শক্ত ধর্মকে অতটা দূর পর্যন্ত মানতে রাজি নই। এই তর্ক সম্বন্ধে ভালোরকম জবাব দিয়ে আমি একটা লিখব এবং সেটা সন্দীপবাবুর হাতে দেব আমার মনে এই সংকল্প ছিল। তাই আজকের কথাবার্তাগুলো ঘরে ফিরে এসেই আমি নোট করে নিয়েছি।

এক সময়ে সন্দীপবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কী বলেন?

আমি বললুম, আমি বেশি সূক্ষ্মে যেতে চাই নে, আমি মোটা কথাই বলব। আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ করব; আমি কিছু চাই যা আমি কাড়ব-কুড়ব। আমার রাগ আছে, আমি দেশের জন্যে রাগ করব; আমি কাউকে চাই যাকে কাটব-কুটব, যার উপরে আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব। আমার মোহ আছে, আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব; আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব— যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। আমি মানুষ, আমি দেবতা নই।

সন্দীপবাবু চৌকি থেকে উঠে আকাশে দক্ষিণ হাত আস্ফালন করে বলে উঠলেন, হুরা! হুরা! পরক্ষণেই সংশোধন করে বললেন, বন্দে মাতরং! বন্দে মাতরং!

আমার স্বামীর অন্তরের একটি গভীর বেদনা তাঁর মুখের উপর ছায়া ফেলে চলে গেল। তিনি খুব মৃদুস্বরে বললেন, আমিও দেবতা না, আমি মানুষ, আমি সেইজন্যেই বলছি, আমার যা-কিছু মন্দ কিছুতেই সে আমি আমার দেশকে দেব না, দেব না, দেব না।

সন্দীপবাবু বললেন, দেখো নিখিল, সত্য-জিনিসটা মেয়েদের মধ্যে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে এক হয়ে আছে। আমাদের সত্যে রঙ নেই, রস নেই, প্রাণ নেই, শুধু কেবল যুক্তি। মেয়েদের হৃদয় রক্তশতদল, তার উপরে সত্য রূপ ধরে বিরাজ করে, আমাদের তর্কের মতো তা বস্তুহীন নয়। এইজন্যে মেয়েরাই যথার্থ নিষ্ঠুর হতে জানে, পুরুষ তেমন জানে না, কেননা ধর্মবুদ্ধি পুরুষকে দুর্বল করে দেয়; মেয়েরা সর্বনাশ করতে পারে অনায়াসে, পুরুষেও পারে, কিন্তু তাদের মনে চিন্তার দ্বিধা এসে পড়ে; মেয়েরা ঝড়ের মতো অন্যায় করতে পারে— সে অন্যায় ভয়ংকর সুন্দর— পুরুষের অন্যায় কুশ্রী, কেননা তার ভিতরে ভিতরে ন্যায়বুদ্ধির পীড়া আছে। তাই আমি তোমাকে বলে রাখছি আজকের দিনে আমাদের মেয়েরাই আমাদের দেশকে বাঁচাবে। আজ আমাদের ধর্মকর্ম-বিচারবিবেকের দিন নয়, আজ আমাদের নির্বিচার নির্বিকার হয়ে নিষ্ঠুর হতে হবে, অন্যায় করতে হবে, আজ পাপকে রক্তচন্দন পরিয়ে দিয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করে নিতে হবে। আমাদের কবি কী বলেছে মনে নেই?—

এসো পাপ, এসো সুন্দরী!
তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে
ফিরুক সঞ্চরি।

অকল্যাণের বাজুক শঙ্খ,
ললাটে লেপিয়া দাও কলঙ্ক,
নির্লাজ কালো কলুষপঙ্ক
বুকে দাও প্রলয়ংকরী !

আজ ধিক্ থাক্ সেই ধর্মকে যা হাসতে হাসতে সর্বনাশ করতে জানে না।

এই বলে তিনি মেজের উপর দু-বার জোরে লাথি মারলেন— কার্পেট থেকে অনেকখানি নিদ্রিত ধুলো চমকে উপরে উঠে পড়ল। দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ যা-কিছুকে বড়ো বলে মেনেছে এক মুহূর্তে তিনি তাকে অপমান করে এমন গৌরবে মাথা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আবার হঠাৎ গর্জে উঠলেন, যে আগুন ঘরকে পোড়ায়, যে আগুন বাহিরকে জ্বালায় আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি সেই আগুনের সুন্দরী দেবতা, তুমি আজ আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জয় তেজ দাও, আমাদের অন্যায়কে সুন্দর করো।

এই শেষ কটি কথা তিনি যে কাকে বললেন তা ঠিক বোঝা গেল না। মনে করা যেতে পারত তিনি যাকে বন্দে মাতরং বলে বন্দনা করেন তাকে, কিংবা দেশের যে নারী সেই দেশলক্ষ্মীর প্রতিনিধিরূপে তখন সেখানে বর্তমান ছিল তাকে। মনে করা যেতে পারত কবি বাল্মীকি যেমন পাপবুদ্ধির বিরুদ্ধে করুণার আঘাতে এক নিমেষে হঠাৎ প্রথম অনুষ্টুপ উচ্চারণ করেছিলেন তেমনি সন্দীপবাবুও ধর্মবুদ্ধির বিরুদ্ধে নিষ্কারুণ্যের আঘাতে এই কথাগুলি হঠাৎ বলে উঠলেন— কিংবা জনসাধারণের মনোহরণ-ব্যবসায়ে চিরাভ্যস্ত অভিনয়কুশলতার এই একটি আশ্চর্য পরিচয় দিলেন।

আরো কিছু বোধ হয় বলতেন, এমন সময়ে আমার স্বামী উঠে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, সন্দীপ, চন্দ্রনাথবাবু এসেছেন।

হঠাৎ চমক ভেঙে ফিরে দেখি সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকবেন কি না ভাবছেন। অস্তোন্মুখ সন্ধ্যাসূর্যের মতো তাঁর মুখের জ্যোতি নম্রতায় পরিপূর্ণ। আমাকে আমার স্বামী এসে বললেন, ইনি আমার মাস্টারমশায়। এঁর কথা অনেকবার তোমাকে বলেছি, এঁকে প্রণাম করো।

আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আশীর্বাদ করলেন, মা, ভগবান চিরদিন তোমাকে রক্ষা করুন।

ঠিক সেই সময়ে আমার সেই আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল।

নিখিলেশের আত্মকথা

একদিন আমার মনে বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর আমাকে যা দেবেন আমি তা নিতে পারব। এ পর্যন্ত তার পরীক্ষা হয় নি। এবার বুঝি সময় এল।

মনকে যখন মনে মনে যাচাই করতুম অনেক দুঃখ কল্পনা করেছি। কখনো ভেবেছি দারিদ্র্য, কখনো জেলখানা, কখনো অসম্মান, কখনো মৃত্যু। এমন-কি, কখনো বিমলের মৃত্যুর কথাও ভাবতে চেষ্টা করেছি। এ-সমস্তই নমস্কার করে মাথায় করে নেব এ কথা যখন বলেছি বোধ হয় মিথ্যা বলি নি।

কেবল একটা কথা কোনোদিন মনে কল্পনাও করতে পারি নি। আজ সেই কথাটা নিয়ে সমস্ত দিন বসে বসে ভাবছি, এও কি সইবে ?

মনের ভিতরে কোন্ জায়গায় একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে। কাজকর্ম করছি, কিন্তু বেদনার অবসান নেই। বোধ হয় যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন সেই একটা ব্যথা পাঁজর কাটতে থাকে। সকালে জেগে উঠেই দেখি দিনের আলোর লাবণ্য শুকিয়ে গেছে। কী ? এ কী ? কী হয়েছে ? এ কালো কিসের কালো ? কোথা দিয়ে আমার সমস্ত পূর্ণচাঁদের উপর ছায়া ফেলতে এল ?

আমার মনের বোধশক্তি হঠাৎ এমন ভয়ানক বেড়ে উঠেছে যে, যে দুঃখ আমার অতীতের বুকের ভিতর সুখের ছদ্মবেশ পরে লুকিয়ে বসে ছিল তার সমস্ত মিথ্যা আজ আমার নাড়ি টেনে টেনে ছিঁড়ছে, আর যে লজ্জা যে দুঃখ ঘনিয়ে এল-ব'লে সে যতই প্রাণপণে ঘোমটা টানছে আমার হৃদয়ের সামনে ততই তার আবরু ঘুচে গেল। আমার সমস্ত হৃদয় দৃষ্টিতে ভরে গিয়েছে— যা দেখবার নয়, যা দেখতে চাই নে, তাও বসে বসে দেখছি।

আমি চিরদিন ঐশ্বর্যের ফাঁকির মধ্যে এতবড়ো কাঙাল হয়ে বসেছিলুম সে কথা এতকাল ভুলিয়ে রেখে আজ হঠাৎ দিনের পর দিনে, মুহূর্তের পর মুহূর্তে, কথার পর কথায়, দৃষ্টির পর দৃষ্টিতে, সেই আমার প্রতারিত জীবনের দুর্ভাগ্য এমন তিল তিল করে প্রকাশ করবার দিন এল কেন? যৌবনের এই নটা বছর মাত্র মায়াকে যা খাজনা দিয়েছি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সত্য সেটাকে সুদে আসলে কড়ায় কড়ায় আদায় করতে থাকবে। ঋণশোধের সম্বল যার একেবারে ফুরোল সব চেয়ে বড়ো ঋণশোধের ভার তারই ঘাড়ে। তবু যেন প্রাণপণে বলতে পারি, হে সত্য, তোমারই জয় হোক।

আমার পিসতুত বোন মুনুর স্বামী গোপাল কাল এসেছিল তার মেয়ের বিয়ের সাহায্য চাইতে। সে আমার ঘরের আসবাবগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছিল আমার মতো সুখী জগতে আর কেউ নেই। আমি বললুম, গোপাল, মুনুকে বোলো কাল আমি তার ওখানে খেতে যাব। মুনু আপনার হৃদয়ের অমৃতে গরিবের ঘরটিকে স্বর্গ করে রেখেছে। সেই লক্ষ্মীর হাতের অন্ন একবার খেয়ে আসবার জন্যে আমার সমস্ত প্রাণ আজ কাঁদছে। তার ঘরে অভাবগুলিই তার ভূষণ হয়ে উঠেছে। আজ তাকে একবার দেখে আসি গে।— ওগো পবিত্র, জগতে তোমার পবিত্র পায়ের ধুলো আজও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

জোর করে অহংকার করে কী করব? নাহয় মাথা হেঁট করেই বললুম আমার গুণের অভাব আছে। পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যেটা সব চেয়ে খোঁজে আমার স্বভাবে হয়তো সেই জোর নেই। কিন্তু, জোর কি শুধু আস্ফালন, শুধু খামখেয়াল, জোর কি এইরকম অসংকোচে পায়ের তলায়— কিন্তু এ-সমস্ত তর্ক করা কেন? ঝগড়া করে তো যোগ্যতা লাভ করা যায় না। অযোগ্য, অযোগ্য, অযোগ্য! নাহয় তাই হল— কিন্তু ভালোবাসার তো মূল্য তাই, সে যে অযোগ্যতাকেও সফল করে তোলে। যোগ্যের জন্যে পৃথিবীতে অনেক পুরস্কার আছে, অযোগ্যের জন্যেই বিধাতা কেবল এই ভালোবাসাটুকু রেখেছিলেন।

একদিন বিমলকে বলেছিলুম তোমাকে বাইরে আসতে হবে। বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে— সে ছিল ঘরগড়া বিমল, ছোটো জায়গা এবং ছোটো কর্তব্যের কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি। তার কাছ থেকে যে ভালোবাসাটুকু নিয়মিত পাচ্ছিলুম সে কি তার হৃদয়ের গভীর উৎসের সামগ্রী, না সে সামাজিক ম্যুনিসিপালিটির বাষ্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দের মতো?

আমি লোভী? যা পেয়েছিলুম তার চেয়ে আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার অনেক বেশি? না, আমি লোভী নই, আমি প্রেমিক। সেইজন্যেই আমি তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিস চাই নি, আমি তাকেই চেয়েছিলুম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনোমতেই ধরা যায় না। স্মৃতিসংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাই নি; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণবিকশিত বিমলকে দেখবার বড়ো ইচ্ছা ছিল।

একটা কথা তখন ভাবি নি মানুষকে যদি তার পূর্ণ মুক্তরূপে সত্যরূপেই দেখতে চাই তা হলে তার উপরে একেবারে নিশ্চিত দাবি রাখবার আশা ছেড়ে দিতে হয়। এ কথা কেন ভাবি নি? স্ত্রীর উপর স্বামীর নিত্য-দখলের অহংকারে? না, তা নয়। ভালোবাসার উপর একান্ত ভরসা ছিল বলেই।

সত্যের সম্পূর্ণ অনাবৃত রূপ সহ্য করবার শক্তি আমার আছে এই অহংকার আমার মনে ছিল। আজ তার পরীক্ষা হচ্ছে। মরি আর বাঁচি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব এই অহংকার এখনো মনে রেখে দিলুম।

আজ পর্যন্ত বিমল এক জায়গায় আমাকে কোনোমতেই বুঝতে পারে নি। জবরদস্তিকে আমি বরাবর দুর্বলতা বলেই জানি। যে দুর্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না; ন্যায়পরতার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যায়ের দ্বারা সে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়। ধৈর্যের 'পরে বিমলের ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন-কি, অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।

ভেবেছিলুম বড়ো জায়গায় এসে জীবনকে যখন সে বড়ো করে দেখবে তখন দৌরাত্ম্যের প্রতি এই মোহ থেকে সে উদ্ধার পাবে। কিন্তু, আজ দেখতে পাচ্ছি ওটা বিমলের প্রকৃতির একটা অঙ্গ। উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালোবাসা। জীবনের সমস্ত সহজ সরল রসকে সে লঙ্কামরিচ দিয়ে ঝাল আগুন ক'রে জিবের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্যন্ত জ্বালিয়ে তুলতে চায়; অন্য-সমস্ত স্বাদকে সে একরকম অবজ্ঞা করে।

তেমনি আমার পণ এই যে, কোনো-একটা উত্তেজনার কড়া মদ খেয়ে উন্মত্তের মতো দেশের কাজে লাগব না। আমি বরঞ্চ কাজের ত্রুটি সহ্য করি তবু চাকর-বাকরকে মারধোর করতে পারি নে, কারও উপর রেগেমেগে হঠাৎ কিছু-একটা বলতে বা করতে আমার সমস্ত দেহমনের ভিতর একটা সংকোচ বোধ হয়। আমি জানি আমার এই সংকোচকে মৃদুতা বলে বিমল মনে মনে অশ্রদ্ধা করে; আজ সেই একই কারণ থেকে সে ভিতরে ভিতরে আমার উপরে রাগ করে উঠছে যখন দেখছে আমি 'বন্দে মাতরম্' হেঁকে চারি দিকে যা-ইচ্ছে তাই করে বেড়াই নে।

আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাই নি এতে সকলেরই অপ্রিয় হয়েছি। দেশের লোক ভাবছে আমি খেতাব চাই কিংবা পুলিসকে ভয় করি; পুলিস ভাবছে ভিতরে আমার কু মতলব আছে বলেই বাইরে আমি এমন ভালোমানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছি।

কেননা, আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার ক'রে মা ব'লে দেবী ব'লে মন্ত্র প'ড়ে যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়, তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি। সত্যেরও উপরে কোনো-একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ। চিত্তকে মুক্ত করে দিলেই আমরা আর বল পাই নে। হয় কোনো কল্পনাকে নয় কোনো মানুষকে, নয় ভাটপাড়ার ব্যবস্থাকে আমাদের অসাড় চৈতন্যের পিঠের উপর সওয়ার করে না বসালে সে নড়তে চায় না। যতক্ষণ সহজ সত্যে আমরা স্বাদ পাই নে, যতক্ষণ এইরকম মোহে আমাদের প্রয়োজন আছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে স্বাধীনভাবে নিজের দেশকে পাবার শক্তি আমাদের হয় নি। ততক্ষণ, আমাদের অবস্থা যেমনি হোক, হয় কোনো কাল্পনিক ভূত নয় কোনো সত্যকার ওঝা, নয় একসঙ্গে দুইয়ে মিলে আমাদের উপর উৎপাত করবেই।

সেদিন সন্দীপ আমাকে বললে, তোমার অন্য নানা গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তোমার কল্পনাবৃত্তি নেই, সেইজন্যেই স্বদেশের এই দিব্যমূর্তিকে তুমি সত্য করে দেখতে পার না। দেখলুম বিমলও তাতে সায় দিলে। আমি আর উত্তর করলুম না। তর্কে জিতে সুখ নেই। কেননা, এ তো বুদ্ধির অনৈক্য নয়, এ যে স্বভাবের ভেদ। ছোটো ঘরকন্নার সীমাটুকুর মধ্যে এই ভেদ ছোটো আকারেই দেখা দেয়; সেইজন্যে সেটুকুতে মিলন-গানের তাল কেটে যায় না। বড়ো সংসারে এই ভেদের তরঙ্গ বড়ো; সেখানে এই তরঙ্গ কেবলমাত্র কলধ্বনি করে না, আঘাত করে।

কল্পনাবৃত্তি নেই? অর্থাৎ আমার মনের প্রদীপে তেল-বাতি থাকতে পারে, কেবল শিখার অভাব। আমি তো বলি সে অভাব তোমাদেরই। তোমরা চক্‌মকি পাথরের মতো আলোকহীন; তাই এত

ঠুকতে হয়, এত শব্দ করতে হয়, তবে একটু একটু স্ফুলিঙ্গ বেরোয়— সেই বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গে কেবল অহংকার বাড়ে, দৃষ্টি বাড়ে না।

আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি, সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে। তার সেই মাংসবহুল আসক্তিই তাকে ধর্ম সম্বন্ধে মোহ রচনা করায় এবং দেশের কাজে দৌরাত্ম্যের দিকে তাড়না করে। তার প্রকৃতি স্থূল অথচ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ বলেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে বড়ো নাম দিয়ে সাজিয়ে তোলে। ভোগের তৃপ্তির মতোই বিদ্বেষের আশু চরিতার্থতা তার পক্ষে উগ্ররূপে দরকারি। টাকা সম্বন্ধে সন্দীপের একটা লোলুপতা আছে সে কথা বিমল এর পূর্বে আমাকে অনেকবার বলেছে। আমি যে তা বুঝি নি তা নয়, কিন্তু সন্দীপের সঙ্গে টাকা সম্বন্ধে কৃপণতা করতে পারতুম না। ও যে আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে এ কথা মনে করতেও আমার লজ্জা হত। আমি যে ওকে টাকার সাহায্য করছি সেটা পাছে কুশ্রী হয়ে দেখা দেয় এইজন্যে ও সম্বন্ধে ওকে আমি কোনোরকম তক্‌রার করতে চাইতুম না। আজ কিন্তু বিমলকে এ কথা বোঝানো শক্ত হবে যে, দেশের সম্বন্ধে সন্দীপের মনের ভাবের অনেকখানিই সেই স্থূল লোলুপতার রূপান্তর। সন্দীপকে বিমল মনে মনে পূজা করছে ; তাই আজ সন্দীপের সম্বন্ধে বিমলের কাছে কিছু বলতে আমার মন ছোটো হয়ে যায়, কী জানি হয়তো তার মধ্যে মনের ঈর্ষা এসে বেঁধে— হয়তো অত্যুক্তি এসে পড়ে। সন্দীপের যে ছবি আমার মনে জাগছে তার রেখা হয়তো আমার বেদনার তীব্র তাপে বেঁকেচুরে গিয়েছে। তবু মনে রাখার চেয়ে লিখে ফেলা ভালো।

আমার মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবুকে আজ আমার এই জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত দেখলুম ; তিনি না ভয় করেন নিন্দাকে, না ক্ষতিকে, না মৃত্যুকে। আমি যে বাড়িতে জন্মেছি এখানে কোনো উপদেশ আমাকে রক্ষা করতে পারত না ; কিন্তু ঐ মানুষটি তাঁর শান্তি, তাঁর সত্য, তাঁর পবিত্র মূর্তিখানি নিয়ে আমার জীবনের মাঝখানটিতে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা করেছেন— তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য করে এমন প্রত্যক্ষ করে পেয়েছি।

সেই চন্দ্রনাথবাবু সেদিন আমার কাছে এসে বললেন, সন্দীপকে কি এখানে আর দরকার আছে ?

কোথাও অমঙ্গলের একটু হাওয়া দিলেই তাঁর চিত্তে গিয়ে ঘা দেয়, তিনি কেমন করে বুঝতে পারেন। সহজে তিনি চঞ্চল হন না, কিন্তু সেদিন সামনে তিনি মস্ত বিপদের একটা ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে কত ভালোবাসেন সে তো আমি জানি।

চায়ের টেবিলে সন্দীপকে বললুম, তুমি রংপুরে যাবে না ? সেখান থেকে চিঠি পেয়েছি, তারা ভেবেছে আমিই তোমাকে জোর করে ধরে রেখেছি।

বিমল চাদানি থেকে চা ঢালছিল। এক মুহূর্তে তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে সন্দীপের মুখের দিকে একবার কটাক্ষমাত্রে চাইলে।

সন্দীপ বললে, আমরা এই-যে চার দিকে ঘুরে ঘুরে স্বদেশী প্রচার করে বেড়াচ্ছি, ভেবে দেখলুম, এতে কেবল শক্তির বাজে খরচ হচ্ছে। আমার মনে হয়, এক-একটা জায়গাকে কেন্দ্র করে যদি আমরা কাজ করি তা হলে ঢের বেশি স্থায়ী কাজ হতে পারে।

এই বলে বিমলের দিকে চেয়ে বললে, আপনার কি তাই মনে হয় না ?

বিমল কী উত্তর দেবে প্রথমটা ভেবে পেলে না। একটু পরে বললে, দুরকমেই দেশের কাজ হতে পারে। চার দিকে ঘুরে কাজ করা কিংবা এক জায়গায় বসে কাজ করা, সেটা নিজের ইচ্ছা কিংবা স্বভাব অনুসারে বেছে নিতে হবে। ওর মধ্যে যে ভাবে কাজ করা আপনার মন চায় সেইটেই আপনার পথ।

সন্দীপ বললে, তবে সত্য কথা বলি। এতদিন বিশ্বাস ছিল ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেশকে মাতিয়ে বেড়ানোই আমার কাজ। কিন্তু নিজেকে ভুল বুঝেছিলুম। ভুল বোঝবার একটা কারণ ছিল এই যে, আমার অন্তরকে সব সময়ে পূর্ণ রাখতে পারে এমন শক্তির উৎস আমি কোনো এক-জায়গায় পাই নি।

তাই কেবল দেশে দেশে নতুন নতুন লোকের মনকে উত্তেজিত করে সেই উত্তেজনা থেকেই আমাকে জীবনের তেজ সংগ্রহ করতে হত। আজ আপনিই আমার কাছে দেশের বাণী। এ আগুন তো আজ পর্যন্ত আমি কোনো পুরুষের মধ্যে দেখি নি। ধিক্, এতদিন আপন শক্তির অভিমান করেছিলুম। দেশের নায়ক হবার গর্ব আর রাখি নে। আমি উপলক্ষ-মাত্র হয়ে আপনার এই তেজে এইখানে থেকেই সমস্ত দেশকে জ্বালিয়ে তুলতে পারব এ আমি স্পর্ধা করে বলতে পারি। না না, আপনি লজ্জা করবেন না ; মিথ্যা লজ্জা সংকোচ বিনয়ের অনেক উপরে আপনার স্থান। আপনি আমাদের মউচাকের মক্ষীরানী ; আমরা আপনাকে চারি দিকে ঘিরে কাজ করব, কিন্তু সেই কাজের শক্তি আপনারই, তাই আপনার থেকে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট আনন্দহীন হবে। আপনি নিঃসংকোচে আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

লজ্জায় এবং গৌরবে বিমলের মুখ লাল হয়ে উঠল এবং চায়ের পেয়ালায় চা ঢালতে তার হাত কাঁপতে লাগল।

চন্দ্রনাথবাবু আর-একদিন এসে বললেন, তোমরা দুজনে কিছুদিনের জন্যে একবার দার্জিলিং বেড়াতে যাও ; তোমার মুখ দেখে আমার বোধ হয় তোমার শরীর ভালো নেই। ভালো ঘুম হয় না বুঝি ?

বিমলকে সন্ধ্যার সময় বললুম, বিমল, দার্জিলিঙে বেড়াতে যাবে ?

আমি জানি দার্জিলিঙে গিয়ে হিমালয় পর্বত দেখবার জন্যে বিমলের খুব শখ ছিল। সেদিন সে বললে, না, এখন থাক্।

দেশের ক্ষতি হবার আশঙ্কা ছিল।

আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব। ছোটো জায়গা থেকে বড়ো জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা ; ঘরের চতুঃসীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাসা বেঁধে বসে ছিল, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলোচ্ছে না। অচেনা বাইরের সঙ্গে চেনাশুনো সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটা বোঝাপড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান কোথায় ; যদি দেখি এই বৃহৎ জীবনের ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও আমি আর খাপ খাই নে তা হলে বুঝব এতদিন যা নিয়ে ছিলুম সে কেবল ফাঁকি। সে ফাঁকিতে কোনো দরকার নেই। সেদিন যদি আসে তো ঝগড়া করব না, আস্তে আস্তে বিদায় হয়ে যাব। জোর-জবরদস্তি ? কিসের জন্যে ! সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে !

সন্দীপের আত্মকথা

যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেইটুকুই আমার, এ কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।

দেশে আপনা-আপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয় ; দেশকে যেদিন লুঠ করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব সেইদিনই দেশ আমার হবে।

লাভ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব, প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্ছে বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রফাটাই সত্য। এই সত্যকে যে শিক্ষা মানতে দেয় না তাকেই আমরা বলি নীতি, এইজন্যেই নীতিকে আজ পর্যন্ত কিছুতেই মানুষ মেনে উঠতে পারছে না।

যারা কাড়তে জানে না, ধরতে পারে না, একটুতেই যাদের মুঠো আলগা হয়ে যায়, পৃথিবীতে সেই আধমরা এক দল লোক আছে— নীতি সেই বেচারাদের সান্ত্বনা দিক। কিন্তু যারা সমস্ত মন দিয়ে

চাইতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে জানে, যাদের দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র। তাদের জন্যেই প্রকৃতি যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু দামি সাজিয়ে রেখেছে। তারাই নদী সাঁতরে আসবে, পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়বে, দরজা লাথিয়ে ভাঙবে, পাবার যোগ্য জিনিস ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। এতেই যথার্থ আনন্দ, এতেই দামি জিনিসের দাম। প্রকৃতি আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেননা, চাওয়ার জোর, নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ করতে ভালোবাসে। তাই আধমরা তপস্বীর হাড়-বের-করা গলায় সে আপনার বসন্তফুলের স্বয়ম্বরের মালা পরাতে চায় না। নহবতখানায় রোশনচৌকি বাজছে— লগ্ন বয়ে যায় যে, মন উদাস হয়ে গেল। বর কে ? আমিই বর। যে মশাল জ্বালিয়ে এসে পড়তে পারে বরের আসন তারই। প্রকৃতির বর আসে অনাহূত।

লজ্জা ? না, আমি লজ্জা করি নে। যা দরকার আমি তা চেয়ে নিই, না চেয়েও নিই। লজ্জা ক'রে যারা নেবার যোগ্য জিনিস নিলে না তারা সেই না-নেবার দুঃখটাকে চাপা দেবার জন্যেই লজ্জাটাকে বড়ো নাম দেয়। এই-যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি এ হচ্ছে রিয়ালিটির পৃথিবী— কতকগুলো বড়ো কথায় নিজেকে ফাঁকি দিয়ে খালি-পেটে খালি-হাতে যে মানুষ এই বস্তুর হাট থেকে চলে গেল সে কেন এই শক্ত মাটির পৃথিবীতে জন্মেছিল ? আশমানে আকাশকুসুমের কুঞ্জবনে কতকগুলো মিষ্ট বুলির বাঁধা তানে বাঁশি বাজাবার জন্যে ধর্মবিলাসী বাবুর দলের কাছ থেকে তারা বায়না নিয়েছিল নাকি ? আমার সে বাঁশির বুলিতেও দরকার নেই, আমার সে আকাশকুসুমেও পেট ভরবে না। আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দলব, সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই, পেতে আমার সংকোচ নেই। যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মতো একেবারে পাতলা সাদা হয়ে গেছে তাদের চিঁ চিঁ গলার ভর্ৎসনা আমার কানে পৌঁছবে না।

লুকোচুরি করতে আমি চাই নে, কেননা তাতে কাপুরুষতা আছে। কিন্তু দরকার হলে যদি করতে না পারি তবে সেও কাপুরুষতা। তুমি যা চাও তা তুমি দেয়াল গেঁথে রাখতে চাও ; সুতরাং আমি যা চাই তা আমি সিঁধ কেটে নিতে চাই। তোমার লোভ আছে তাই তুমি দেওয়াল গাঁথ ; আমার লোভ আছে তাই আমি সিঁধ কাটি। তুমি যদি কল কর, আমি কৌশল করব। এইগুলোই হচ্ছে প্রকৃতির বাস্তব কথা। এই কথাগুলোর উপরেই পৃথিবীর রাজ্য-সাম্রাজ্য, পৃথিবীর বড়ো বড়ো কাণ্ডকারখানা চলছে। আর যে-সব অবতার স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেইখানকার ভাষায় কথা কইতে থাকেন তাঁদের কথা বাস্তব নয়। সেইজন্যে এত চীৎকারে সে-সব কথা কেবলমাত্র দুর্বলদের ঘরের কোণে স্থান পায় ; যারা সবল হয়ে পৃথিবী শাসন করে তারা সে-সব কথা মানতে পারে না। কেননা মানতে গেলেই বলক্ষয় হয়। তার কারণ, কথাগুলো সত্যই নয়। যারা এ কথা বুঝতে দ্বিধা করে না, মানতে লজ্জা করে না, তারাই কৃতকার্য হল ; আর যে হতভাগারা এক দিকে প্রকৃতি আর-এক দিকে অবতারের উৎপাতে বাস্তব অবাস্তব দু নৌকায় পা দিয়ে দুলে মরছে তারা না পারে এগোতে, না পারে বাঁচতে।

এক দল মানুষ বাঁচবে না বলে প্রতিজ্ঞা ক'রে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সূর্যাস্তকালের আকাশের মতো মুমূর্ষুতার একটা সৌন্দর্য আছে, তারা তাই দেখে মুগ্ধ। আমাদের নিখিলেশ সেই জাতের জীব ; ওকে নির্জীব বললেই হয়। আজ চার বৎসর আগে ওর সঙ্গে আমার এই নিয়ে একদিন ঘোর তর্ক হয়ে গেছে। ও আমাকে বলে, জোর না হলে কিছু পাওয়া যায় না সে কথা মানি ; কিন্তু কাকে জোর বলো, আর কোন্ দিকে পেতে হবে তাই নিয়ে তর্ক। আমার জোর ত্যাগের দিকে জোর।

আমি বললুম, অর্থাৎ লোকসানের নেশায় তুমি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছ।

নিখিলেশ বললে, হাঁ, ডিমের ভিতরকার পাখি যেমন তার ডিমের খোলাটাকে লোকসান করবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। খোলাটা খুব বাস্তব জিনিস বটে, তার বদলে সে পায় হাওয়া, পায় আলো— তোমাদের মতে সে বোধ হয় ঠকে।

নিখিলেশ এইরকম রূপক দিয়ে কথা কয় ; তার পরে আর তাকে বোঝানো শক্ত যে তৎসত্ত্বেও সেগুলো কেবলমাত্র কথা, সে সত্য নয়। তা বেশ, ও এইরকম রূপক নিয়েই সুখে থাকে তো থাক্—

আমরা পৃথিবীর মাংসাশী জীব ; আমাদের দাঁত আছে, নখ আছে ; আমরা দৌড়তে পারি, ধরতে পারি, ছিঁড়তে পারি— আমরা সকালবেলায় ঘাস খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারই রোমন্থনে দিন কাটাতে পারি নে। অতএব এ পৃথিবীতে আমাদের খাদ্যের যে ব্যবস্থা আছে তোমরা রূপকওয়ালার দল তার দরজা আগলে থাকলে আমরা মানতে পারব না। হয় চুরি করব নয় ডাকাতি করব। নইলে যে আমাদের প্রাণ বাঁচবে না। আমরা তো মৃত্যুর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পদ্মপাতার উপর শুয়ে শুয়ে দশম দশায় প্রাণত্যাগ করতে রাজি নই, তা এতে আমার বৈষ্ণব বাবাজিরা যতই দুঃখিত হোন-না কেন।

আমার এই কথাগুলোকে সবাই বলবে, ও তোমার একটা মত। তার কারণ, পৃথিবীতে যারা চলছে তারা এই নিয়মেই চলছে, অথচ বলছে অন্যরকম কথা। এইজন্যে তারা জানে না এই নিয়মটাই নীতি। আমি জানি। আমার এই কথাগুলো যে মতমাত্র নয়, জীবনে তার একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে আমার দেরি হয় না। ওরা যে বাস্তব পৃথিবীর জীব, পুরুষদের মতো ওরা ফাঁকা আইডিয়ার বেলুনে চড়ে মেঘের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় না। ওরা আমার চোখে-মুখে দেহে-মনে কথায়-ভাবে একটা প্রবল ইচ্ছা দেখতে পায়— সেই ইচ্ছা কোনো তপস্যার দ্বারা শুকিয়ে ফেলা নয়, কোনো তর্কের দ্বারা পিছন দিকে মুখ-ফেরানো নয়, সে একেবারে ভরপুর ইচ্ছা— চাই-চাই খাই-খাই করতে করতে কোটালের বানের মতো গর্জে চলেছে। মেয়েরা আপনার ভিতর থেকে জানে, এই দুর্দম ইচ্ছাই হচ্ছে জগতের প্রাণ। সেই প্রাণ আপনাকে ছাড়া আর-কাউকে মানতে চায় না বলেই চার দিকে জয়ী হচ্ছে। বার বার দেখলুম আমার সেই ইচ্ছার কাছে মেয়েরা আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তারা মরবে কি বাঁচবে তার আর হুঁশ থাকে নি। যে শক্তিতে এই মেয়েদের পাওয়া যায় সেইটেই হচ্ছে বীরের শক্তি, অর্থাৎ বাস্তব জগৎকে পাবার শক্তি। যারা আর-কোনো জগৎ পাবার আছে বলে কল্পনা করে তারা তাদের ইচ্ছার ধারাকে মাটির দিক থেকে সরিয়ে আশমানের দিকেই নিয়ে যাক ; দেখি তাদের সেই ফোয়ারা কতদূর ওঠে আর কতদিন চলে। এই আইডিয়াবিহারী সূক্ষ্ম প্রাণীদের জন্যে মেয়েদের সৃষ্টি হয় নি।

'অ্যাফিনিটি !' জোড়া মিলিয়ে মিলিয়ে বিধাতা বিশেষভাবে এক-একটি মেয়ে এক-একটি পুরুষ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাদের মিলই মন্ত্রের মিলের চেয়ে খাঁটি, এমন কথা সময়মত দরকারমত অনেক জায়গায় বলেছি। তার কারণ, মানুষ মানতে চায় প্রকৃতিকে, কিন্তু একটা কথার আড়াল না দিলে তার সুখ হয় না। এইজন্যে মিথ্যে কথায় জগৎ ভরে গেল। অ্যাফিনিটি একটা কেন ? অ্যাফিনিটি হাজারটা। একটা অ্যাফিনিটির খাতিরে আর-সমস্ত অ্যাফিনিটিকে বরখাস্ত করে বসে থাকতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে এমন লেখাপড়া নেই। আমার জীবনে অনেক অ্যাফিনিটি পেয়েছি, তাতে করে আরো একটি পাবার পথ বন্ধ হয় নি। সেটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেও আমার অ্যাফিনিটি দেখতে পেয়েছে। তার পরে ? তার পরে আমি যদি জয় করতে না পারি তা হলে আমি কাপুরুষ।

বিমলার আত্মকথা

আমার লজ্জা যে কোথায় গিয়েছিল তাই ভাবি। নিজেকে দেখবার আমি একটুও সময় পাই নি— আমার দিনগুলো রাতগুলো আমাকে নিয়ে একেবারে ঘূর্ণার মতো ঘুরছিল। তাই সেদিন লজ্জা আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার একটুও ফাঁক পায় নি।

একদিন আমার সামনেই আমার মেজো জা হাসতে হাসতে আমার স্বামীকে বললেন, ভাই ঠাকুরপো, তোমাদের এ বাড়িতে এতদিন বরাবর মেয়েরাই কেঁদে এসেছে, এইবার পুরুষদের পালা এল, এখন থেকে আমরাই কাঁদাব। কী বল ভাই ছোটোরানী ? রণবেশ তো পরেছ, রণরঙ্গিণী, এবার পুরুষের বুকে কষে হানো শেল।

এই বলে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তিনি একবার তাঁর চোখ বুলিয়ে নিলেন। আমার

সাজে-সজ্জায় ভাবে-গতিকে ভিতরের দিক থেকে একটা কেমন রঙের ছটা ফুটে উঠছিল, তার লেশমাত্র মেজো জায়ের চোখ এড়াতে পারে নি। আজ আমার এ কথা লিখতে লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু সেদিন আমার কিছুই লজ্জা ছিল না। কেননা, সেদিন আমার সমস্ত প্রকৃতি আপনার ভিতর থেকে কাজ করছিল, কিছুই বুঝে-সুঝে করি নি।

আমি জানি সেদিন আমি একটু বিশেষ সাজগোজ করতুম। কিন্তু সে যেন অন্যমনে। আমার কোন্ সাজ সন্দীপবাবুর বিশেষ ভালো লাগত তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতুম। তা ছাড়া আন্দাজে বোঝবার দরকার ছিল না। সন্দীপবাবু সকলের সামনেই তার আলোচনা করতেন। তিনি আমার সামনে আমার স্বামীকে একদিন বললেন, নিখিল, যেদিন আমাদের মক্ষীরানীকে আমি প্রথম দেখলুম— সেই জরির-পাড়-দেওয়া কাপড় পরে চুপ করে বসে, চোখ দুটো যেন পথ-হারানো তারার মতো অসীমের দিকে তাকিয়ে— যেন কিসের সন্ধানে কার অপেক্ষায় অতলস্পর্শ অন্ধকারের তীরে হাজার হাজার বৎসর ধরে এইরকম করে তাকিয়ে— তখন আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল— মনে হল ওঁর অন্তরের অগ্নিশিখা যেন বাইরে কাপড়ের পাড়ে পাড়ে ওঁকে জড়িয়ে রয়েছে। এই আগুনই তো চাই, এই প্রত্যক্ষ আগুন। মক্ষীরানী, আমার এই একটি অনুরোধ রাখবেন, আর-একদিন তেমনি অগ্নিশিখা সেজে আমাদের দেখা দেবেন।

এতদিন আমি ছিলুম গ্রামের একটি ছোটো নদী— তখন ছিল আমার এক ছন্দ, এক ভাষা— কিন্তু কখন একদিন কোনো খবর না দিয়ে সমুদ্রের বান ডেকে গেল— আমার বুক ফুলে উঠল, আমার কূল ছাপিয়ে গেল, সমুদ্রের ডমরুর তালে তালে আমার স্রোতের কলতান আপনি বেজে বেজে উঠতে লাগল; আমি আপনার রক্তের ভিতরকার সেই ধ্বনির ঠিক অর্থটা তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। সে আমি কোথায় গেল? হঠাৎ আমার মধ্যে রূপের ঢেউ কোথা থেকে এমন করে ফেনিয়ে এল? সন্দীপবাবুর দুই অতৃপ্ত চোখ আমার সৌন্দর্যের দিকে যেন পূজার প্রদীপের মতো জ্বলে উঠল। রূপেতে শক্তিতে আমি যে আশ্চর্য, সে কথা সন্দীপবাবুর সমস্ত চাওয়ায় কওয়ায় মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার মতো আকাশ ফাটিয়ে বাজতে লাগল। সেদিন তাতেই পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢেকে দিলে।

আমাকে কি বিধাতা আজ একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করলেন? তার এতদিনকার অনাদরের শোধ দিয়ে দিলেন? যে সুন্দরী ছিল না সে সুন্দরী হয়ে উঠল। যে ছিল সামান্য সে নিজের মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশের গৌরবকে প্রত্যক্ষ অনুভব করলে। সন্দীপবাবু তো কেবল একটিমাত্র মানুষ নন, তিনি যে একলাই দেশের লক্ষ লক্ষ চিত্তধারার মোহনার মতো। তাই, তিনি যখন আমাকে বললেন, মউচাকের মক্ষীরানী, তখন সেদিনকার সমস্ত দেশসেবকদের স্তবগুঞ্জনধ্বনিতে আমার অভিষেক হয়ে গেল। এর পরে আমাদের ঘরের কোণে আমার বড়ো জায়ের নিঃশব্দ অবজ্ঞা আর আমার মেজো জায়ের সশব্দ পরিহাস আমাকে স্পর্শ করতেই পারলে না। সমস্ত জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পরিবর্তন হয়ে গেছে।

সন্দীপবাবু আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, আমাকে যেন সমস্ত দেশের ভারি দরকার। সেদিন সে কথা আমার বিশ্বাস করতে বাধে নি। আমি পারি, সমস্তই পারি, আমার মধ্যে একটা দিব্যশক্তি এসেছে; সে এমন-একটা কিছু যাকে ইতিপূর্বে আমি অনুভব করি নি, যা আমার অতীত। আমার অন্তরের মধ্যে এই-যে একটা বিপুল আবেগ হঠাৎ এল এ জিনিসটা কী, সে নিয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা ওঠবার সময় ছিল না; এ যেন আমারই, অথচ এ যেন আমার নয়; এ যেন আমার বাইরেকার, এ যেন সমস্ত দেশের। এ যেন বানের জল, এর জন্যে কোনো খিড়কির পুকুরের জবাবদিহি নেই।

সন্দীপবাবু দেশের সম্বন্ধে প্রত্যেক ছোটো বিষয়ে আমার পরামর্শ নিতেন। প্রথমটা আমার ভারি সংকোচ বোধ হত, কিন্তু সেটা অল্প দিনেই কেটে গেল। আমি যা বলতুম তাতেই সন্দীপবাবু আশ্চর্য হয়ে যেতেন। তিনি কেবলই বলতেন, আমরা পুরুষরা কেবলমাত্র ভাবতেই পারি, কিন্তু আপনারা বুঝতে পারেন, আপনাদের আর ভাবতে হয় না। মেয়েদেরই বিধাতা মানস থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর

পুরুষদের তিনি হাতে করে হাতুড়ি পিটিয়ে গড়েছেন। শুনতে শুনতে আমার বিশ্বাস হয়েছিল আমার মধ্যে সহজ বুদ্ধি সহজ শক্তি এতই সহজ যে আমি নিজেই এতদিন তাকে দেখতে পাই নি।

দেশের চারি দিক থেকে নানা কথা নিয়ে সন্দীপবাবুর কাছে চিঠি আসত, সে সমস্তই আমি পড়তুম এবং আমার মত না নিয়ে তার কোনোটার জবাব যেত না। মাঝে মাঝে এক-এক দিন সন্দীপবাবু আমার সঙ্গে মতে মিলতেন না। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতুম না কিন্তু তার দু দিন পরে সকালে যেন ঘুম থেকে উঠেই তিনি একটা আলো দেখতে পেতেন এবং তখনই আমাকে ডাকিয়ে এনে বলতেন, দেখুন, সেদিন আপনি যা বলেছিলেন সেটাই সত্য, আমার সমস্ত তর্ক ভুল। এক-এক দিন বলতেন, আপনার যে পরামর্শটি নিই নি সেইটেতেই আমি ঠকেছি। আচ্ছা, এর রহস্যটা কী আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

ক্রমেই আমার বিশ্বাস পাকা হতে লাগল যে, সেদিন সমস্ত দেশে যা-কিছু কাজ চলছিল তার মূলে ছিলেন সন্দীপবাবু, আর তারও মূলে ছিল একজন সামান্য স্ত্রীলোকের সহজ বুদ্ধি। প্রকাণ্ড একটা দায়িত্বের গৌরবে আমার মন ভরে রইল।

আমাদের এই-সমস্ত পরামর্শের মধ্যে আমার স্বামীর কোনো স্থান ছিল না। দাদা যেমন আপনার নাবালক ভাইটিকে খুবই ভালোবাসে, অথচ কাজে কর্মে তার বুদ্ধির উপর কোনো ভরসা রাখে না, সন্দীপবাবু আমার স্বামীর সম্বন্ধে সেইরকম ভাবটা প্রকাশ করতেন। আমার স্বামী যে এ-সব বিষয়ে একেবারে ছেলেমানুষের মতো, তাঁর বুদ্ধিবিবেচনা একেবারে উলটোরকম, এ কথা সন্দীপবাবু যেন খুব গভীর স্নেহের সঙ্গে হাসতে হাসতে বলতেন। আমার স্বামীর এই-সমস্ত অদ্ভুত মত ও বুদ্ধিবিপর্যয়ের মধ্যে এমন একটি মজার রস আছে, যেন সেইজন্যেই সন্দীপবাবু তাঁকে আরো বেশি করে ভালোবাসতেন। তাই তিনি নিরতিশয় স্নেহের সঙ্গেই আমার স্বামীকে দেশের সমস্ত দায় থেকে একেবারে রেহাই দিয়েছিলেন।

প্রকৃতির ডাক্তারিতে ব্যথা অসাড় করবার অনেক ওষুধ আছে। যখন কোনো-একটা গভীর সম্বন্ধের নাড়ি কাটা পড়তে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে কখন যে সেই ওষুধের জোগান ঘটে তা কেউ জানতে পারে না; অবশেষে একদিন জেগে উঠে দেখা যায় মস্ত একটা ব্যবচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো সম্বন্ধের মধ্যে যখন ছুরি চলছিল তখন আমার মন এমন একটা তীব্র আবেগের গ্যাসে আগাগোড়া আচ্ছন্ন হয়ে রইল যে আমি টেরই পেলুম না কত বড়ো নিষ্ঠুর একটা কাণ্ড ঘটছে। এই বুঝি মেয়েদেরই স্বভাব; তাদের হৃদয়াবেগ যখন এক দিকে প্রবল হয়ে জেগে ওঠে তখন অন্য দিকে তাদের আর-কিছুই সাড় থাকে না। এইজন্যেই আমরা প্রলয়ংকরী; আমরা আমাদের অন্ধ প্রকৃতি দিয়ে প্রলয় করি, কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে নয়। আমরা নদীর মতো; কূলের মধ্যে দিয়ে যখন বয়ে যাই তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা পালন করি, যখন কূল ছাপিয়ে বইতে থাকি তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা বিনাশ করি।

সন্দীপের আত্মকথা

আমি বুঝতে পারছি একটা গোলমাল বেধেছে। সেদিন তার একটু পরিচয় পাওয়া গেল।

নিখিলেশের বৈঠকখানার ঘরটা আমি আসার পর থেকে সদর ও অন্দরে মিশিয়ে একটা উভচরজাতীয় পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে বাইরের থেকে আমার অধিকার ছিল, ভিতরের থেকে মক্ষীর বাধা ছিল না।

আমাদের এই অধিকার যদি আমরা কিছু-কিছু হাতে রেখে রয়ে-বসে ভোগ করতুম তা হলে হয়তো লোকের একরকম সয়ে যেত। কিন্তু বাঁধ যখন প্রথম ভাঙে তখনই জলের তোড়টা হয় বেশি। বৈঠকখানা-ঘরে আমাদের সভাটা এমনি জোরে চলতে লাগল যে আর-কোনো কথা মনেই রইল না।

বৈঠকখানা-ঘরে যখন মক্ষী আসে আমার ঘর থেকে আমি একরকম করে টের পাই। খানিকটা বালা-চুরির খানিকটা এটা-ওটার শব্দ পাওয়া যায়। ঘরের দরজাটা বোধ করি সে একটু অনাবশ্যক জোরে ঘা দিয়েই খোলে। তার পরে বইয়ের আলমারির কাঁচের পাল্লাটা একটু আঁট আছে, সেটা টেনে খুলতে গেলে যথেষ্ট শব্দ হয়ে ওঠে। বৈঠকখানায় এসে দেখি দরজার দিকে পিছন করে মক্ষী শেল্‌ফ্ থেকে মনের মতো বই বাছাই করতে অত্যন্ত বেশি মনোযোগী। তখন তাকে এই দুরূহ কাজে সাহায্য করবার প্রস্তাব করতেই সে চমকে উঠে আপত্তি করে, তার পরে অন্য প্রসঙ্গ উঠে পড়ে।

সেদিন বৃহস্পতিবারের বারবেলায় পূর্বোক্ত রকমের শব্দ লক্ষ্য করেই ঘর থেকে রওনা হয়েছিলুম। পথের মাঝখানে বারান্দায় দেখি এক দরোয়ান খাড়া। তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই আমি চলেছিলুম, এমন সময় সে পথ আগলে বললে, বাবু, ও দিকে যাবেন না।

যাব না! কেন!

বৈঠকখানা-ঘরে রানীমা আছেন।

আচ্ছা, তোমার রানীমাকে খবর দাও যে সন্দীপবাবু দেখা করতে চান।

না, সে হবে না, হুকুম নেই।

ভারি রাগ হল, গলা একটু চড়িয়ে বললুম, আমি হুকুম করছি তুমি জিজ্ঞাসা করে এসো।

গতিক দেখে দরোয়ান একটু থমকে গেল। তখন আমি তাকে পাশে ঠেলে ঘরের দিকে এগোলুম। যখন প্রায় দরজার কাছ-বরাবর পৌঁচেছি এমন সময় তাড়াতাড়ি সে কর্তব্য পালন করবার জন্যে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললে, বাবু, যাবেন না।

কী! আমার গায়ে হাত! আমি হাত ছিনিয়ে নিয়ে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলুম। এমন সময়ে মক্ষী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখে দরোয়ান আমাকে অপমান করবার উপক্রম করছে।

তার সেই মূর্তি আমি কখনো ভুলব না। মক্ষী যে সুন্দরী সেটা আমার আবিষ্কার। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক ওর দিক তাকাবে না। লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, যাকে আমাদের রূপরসজ্ঞ লোকেরা নিন্দে করে বলে 'ঢ্যাঙা'। ওর ঐ লম্বা গড়নটিই আমাকে মুগ্ধ করে; যেন প্রাণের ফোয়ারার ধারা, সৃষ্টিকর্তার হৃদয়গুহা থেকে বেগে উপরের দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ওর রঙ শামলা, কিন্তু সে যে ইস্পাতের তলোয়ারের মতো শামলা— কী তেজ আর কী ধার! সেই তেজ সেদিন ওর সমস্ত মুখে চোখে ঝিক্‌মিক্ করে উঠল। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে তর্জনী তুলে রানী বললে, নন্‌কু, চলা যাও।

আমি বললুম, আপনি রাগ করবেন না, নিষেধ যখন আছে তখন আমিই চলে যাচ্ছি।

মক্ষী কম্পিতস্বরে বললে, না, আপনি যাবেন না, ঘরে আসুন।

এ তো অনুরোধ নয়, এ হুকুম। আমি ঘরে এসে চৌকিতে বসে একটা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগলুম। মক্ষী একটা কাগজের টুকরোয় পেন্‌সিল দিয়ে কী লিখে বেহারাকে ডেকে বললে, বাবুকে দিয়ে এসো।

আমি বললুম, আমাকে মাপ করবেন, ধৈর্য রাখতে পারি নি, দরোয়ানটাকে মেরেছি।

মক্ষী বললে, বেশ করেছেন।

কিন্তু ও বেচারার তো কোনো দোষ নেই, ও তো কর্তব্য পালন করেছে।

এমন সময় নিখিল ঘরে ঢুকল। আমি দ্রুত চৌকি থেকে উঠে তার দিকে পিঠ করে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

মক্ষী নিখিলকে বললে, আজ নন্‌কু দরোয়ান সন্দীপবাবুকে অপমান করেছে।

নিখিল এমনি ভালোমানুষের মতো আশ্চর্য হয়ে বললে 'কেন' যে আমি আর থাকতে পারলুম না। মুখ ফিরিয়ে তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকালুম; ভাবলুম সাধুলোকের সত্যের বড়াই স্ত্রীর কাছে টেঁকে না, যদি তেমন স্ত্রী হয়।

মক্ষী বললে, সন্দীপবাবু বৈঠকখানায় আসছিলেন, সে ওঁর পথ আটক করে বললে হুকুম নেই।

নিখিল জিজ্ঞাসা করলে, কার হুকুম নেই ?

মক্ষী বললে, তা কেমন করে বলব !

রাগে ক্ষোভে মক্ষীর চোখ দিয়ে জল পড়ে-পড়ে আর-কি।

দরোয়ানকে নিখিল ডেকে পাঠালে। সে বললে, হুজুর, আমার তো কসুর নেই। হুকুম তামিল করেছি।

কার হুকুম ?

বড়োরানীমা মেজোরানীমা আমাকে ডেকে বলে দিয়েছেন।

ক্ষণকালের জন্যে সবাই আমরা চুপ করে রইলুম।

দরোয়ান চলে গেলে মক্ষী বললে, নন্‌কুকে ছাড়িয়ে দিতে হবে।

নিখিল চুপ করে রইল। আমি বুঝলুম ওর ন্যায়বুদ্ধিতে খটকা লাগল। ওর খটকার আর অন্ত নেই।

কিন্তু বড়ো শক্ত সমস্যা ! সোজা মেয়ে তো নয়। নন্‌কুকে ছাড়ানোর উপলক্ষে জায়েদের উপর অপমানের শোধ তোলা চাই।

নিখিল চুপ করেই রইল। তখন মক্ষীর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। নিখিলের ভালোমানুষির 'পরে তার ঘৃণার আর অন্ত রইল না।

নিখিল কোনো কথা না বলে উঠে ঘর থেকে চলে গেল।

পরদিন সেই দরোয়ানকে দেখা গেল না। খবর নিয়ে শুনলুম, তাকে নিখিল মফস্বলের কোন্ কাজে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছে— দরোয়ানজির তাতে লাভ বৈ ক্ষতি হয় নি।

এইটুকুর ভিতরে নেপথ্যে কত ঝড় বয়ে গেছে সে তো আভাসে বুঝতে পারছি। বারে বারে কেবল এই কথাই মনে হয়— নিখিল অদ্ভুত্ মানুষ, একেবারে সৃষ্টিছাড়া।

এর ফল হল এই যে, এর পরে কিছুদিন মক্ষী রোজই বৈঠকখানায় এসে বেহারাকে দিয়ে আমাকে ডাকিয়ে এনে আলাপ করতে আরম্ভ করলে ; কোনোরকম প্রয়োজনের কিংবা আকস্মিকতার ছুতোটুকু পর্যন্ত রাখলে না।

এমন করেই ভাবভঙ্গি ক্রমে আকার-ইঙ্গিতে, অস্পষ্ট ক্রমে স্পষ্টতায়, জমে উঠতে থাকে। এ যে ঘরের বউ, বাইরের পুরুষের পক্ষে একেবারে নক্ষত্রলোকের মানুষ। এখানে কোনো বাঁধা পথ নেই। এই পথহীন শূন্যের ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে টানাটানি, জানাজানি, অদৃশ্য হাওয়ায় হাওয়ায় সংস্কারের পর্দা একটার পর আর-একটা উড়িয়ে দিয়ে কোন্ এক সময়ে একেবারে উলঙ্গ প্রকৃতির মাঝখানে এসে পৌঁছনো— সত্যের এ এক আশ্চর্য জয়যাত্রা !

সত্য নয় তো কী ! স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের যে মিলের টান, সেটা হল একটা বাস্তব জিনিস ; ধুলোর কণা থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারা পর্যন্ত জগতের সমস্ত বস্তুপুঞ্জ তার পক্ষে ; আর, মানুষ তাকে কতকগুলো বচন দিয়ে আড়ালে রাখতে চায়, তাকে ঘরগড়া বিধিনিষেধ দিয়ে নিজের ঘরের জিনিস করে বানাতে বসেছে ! যেন সৌরজগৎকে গলিয়ে জামাইয়ের জন্যে ঘড়ির চেন করবার ফর্মাশ। তার পরে বাস্তব যেদিন বস্তুর ডাক শুনে জেগে ওঠে, মানুষের সমস্ত কথার ফাঁকি এক মুহূর্তেই উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আপনার জায়গায় এসে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম বলো, বিশ্বাস বলো, কেউ কি তাকে ঠেকাতে পারে ? তখন কত ধিক্কার, কত হাহাকার, কত শাসন ! কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে কি শুধু মুখের কথায় ? সে তো জবাব দেয় না, সে শুধু নাড়া দেয়— সে যে বাস্তব।

তাই চোখের সামনে সত্যের এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখতে আমার ভারি চমৎকার লাগছে। কত লজ্জা, কত ভয়, কত দ্বিধা ! তাই যদি না থাকবে তবে সত্যের রস রইল কী ? এই-যে পা কাঁপতে থাকা, এই-যে থেকে-থেকে মুখ ফেরানো, এ বড়ো মিষ্টি ! আর, এই ছলনা শুধু অন্যকে নয়, নিজেকে। বাস্তবকে যখন অবাস্তবের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তখন ছলনা তার প্রধান অস্ত্র। কেননা,

বস্তুকে তার শত্রুপক্ষ লজ্জা দিয়ে বলে, তুমি স্থূল। তাই, হয় তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে নয় মায়াআবরণ প'রে বেড়াতে হয়। যেরকম অবস্থা তাতে সে জোর করে বলতে পারে না যে, হাঁ আমি স্থূল, কেননা আমি সত্য, আমি মাংস, আমি প্রবৃত্তি, আমি ক্ষুধা, নির্লজ্জ নির্দয়— যেমন নির্লজ্জ নির্দয় সেই প্রচণ্ড পাথর যা বৃষ্টির ধারায় পাহাড়ের উপর থেকে লোকালয়ের মাথার উপরে গড়িয়ে এসে পড়ে, তার পরে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

আমি সমস্তই দেখতে পাচ্ছি। ঐ-যে পর্দা উড়ে উড়ে পড়ছে; ঐ-যে দেখতে পাচ্ছি প্রলয়ের রাস্তায় যাত্রার সাজসজ্জা চলছে! ঐ-যে লাল ফিতেটুকু, ছোট্ট এতটুকু, রাশি রাশি ঘষা চুলের ভিতর থেকে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, ও যে কাল-বৈশাখীর লোলুপ জিহ্বা, কামনার গোপন উদ্দীপনায় রাঙা! ঐ-যে পাড়ের এতটুকু ভঙ্গি, ঐ-যে জ্যাকেটের এতটুকু ইঙ্গিত, আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি তার উত্তাপ। অথচ এ-সব আয়োজন অনেকটা অগোচরে হচ্ছে এবং অগোচরে থাকছে, যে করছে সেও সম্পূর্ণ জানে না।

কেন জানে না? তার কারণ, মানুষ বরাবর বাস্তবকে ঢাকা দিয়ে দিয়ে বাস্তবকে স্পষ্ট করে জানবার এবং মানবার উপায় নিজের হাতে নষ্ট করেছে। বাস্তবকে মানুষ লজ্জা করে। তাই মানুষের তৈরি রাশি-রাশি ঢাকাঢুকির ভিতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে নিজের কাজ করতে হয়; এইজন্যে তার গতিবিধি জানতে পারি নে, অবশেষে হঠাৎ যখন সে একেবারে ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে তখন তাকে আর অস্বীকার করবার জো থাকে না। মানুষ তাকে শয়তান বলে বদনাম দিয়ে তাড়াতে চেয়েছে, এইজন্যেই সাপের মূর্তি ধরে স্বর্গোদ্যানে সে লুকিয়ে প্রবেশ করে, আর কানে কানে কথা কয়েই মানবপ্রেয়সীর চোখ ফুটিয়ে দিয়ে তাকে বিদ্রোহী করে তোলে। তার পর থেকে আর আরাম নেই, তার পরে মরণ আর কি!

আমি বস্তুতন্ত্র। উলঙ্গ বাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙে আলোকের মধ্যে বেরিয়ে আসছে, এর পদে পদেই আমার আনন্দ ঘনিয়ে উঠছে। যা চাই সে খুব কাছে আসবে, তাকে মোটা করে পাব, তাকে শক্ত করে ধরব, তাকে কিছুতেই ছাড়ব না— মাঝখানে যা-কিছু আছে তা ভেঙে চুরমার হয়ে ধুলোয় লুটবে, হাওয়ায় উড়বে, এই আনন্দ, এই তো আনন্দ, এই তো বাস্তবের তাণ্ডবনৃত্য— তার পরে মরণ-বাঁচন, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ তুচ্ছ! তুচ্ছ! তুচ্ছ!

আমার মক্ষীরানী স্বপ্নের ঘোরেই চলছে, সে জানে না কোন্ পথে চলছে। সময় আসবার আগে তাকে হঠাৎ জানিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। আমি যে কিছুই লক্ষ করি নে এইটে জানানোই ভালো। সেদিন আমি যখন খাচ্ছিলুম মক্ষীরানী আমার মুখের দিকে একরকম করে তাকিয়ে ছিল, একেবারে ভুলে গিয়েছিল এই চেয়ে-থাকার অর্থটা কী। আমি হঠাৎ এক সময়ে তার চোখের দিকে চোখ তুলতেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। আমি বললুম, আপনি আমার খাওয়া দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। অনেক জিনিস লুকিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু আমার ঐ লোভটা পদে পদে ধরা পড়ে। তা দেখুন, আমি যখন নিজের হয়ে লজ্জা করি নে তখন আপনি আমার হয়ে লজ্জা করবেন না।

সে ঘাড় বেঁকিয়ে আরো লাল হয়ে উঠে বলতে লাগল, না, না, আপনি—

আমি বললুম, আমি জানি লোভী মানুষকে মেয়েরা ভালোবাসে, ঐ লোভের উপর দিয়েই তো মেয়েরা তাদের জয় করে। আমি লোভী, তাই বরাবর মেয়েদের কাছ থেকে আদর পেয়ে পেয়ে আজ আমার এমন দশা হয়েছে যে আর লজ্জার লেশমাত্র নেই। অতএব আপনি একদৃষ্টে অবাক হয়ে আমার খাওয়া দেখুন-না আমি কিচ্ছু কেয়ার করি নে। এই ডাঁটাগুলির প্রত্যেকটিকে চিবিয়ে একেবারে নিঃসত্ত্ব করে ফেলে দেব তবে ছাড়ব, এই আমার স্বভাব।

আমি কিছুদিন আগে আজকালকার দিনের একখানি ইংরেজি বই পড়ছিলুম, তাতে স্ত্রীপুরুষের মিলননীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে। সেইটে আমি ওদের বৈঠকখানায় ফেলে গিয়েছিলুম। একদিন দুপুরবেলায় আমি কী জন্যে সেই ঘরে ঢুকেই দেখি মক্ষীরানী সেই বইটা হাতে

করে নিয়ে পড়ছে, পায়ের শব্দ পেয়েই তাড়াতাড়ি সেটার উপর আর-একটা বই চাপা দিয়ে উঠে পড়ল। যে বইটা চাপা দিল সেটা লংফেলোর কবিতা।

আমি বললুম, দেখুন আপনারা কবিতার বই পড়তে লজ্জা পান কেন আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। লজ্জা পাবার কথা পুরুষের ; কেননা, আমরা কেউ বা অ্যাটর্নি, কেউ বা এঞ্জিনিয়ার। আমাদের যদি কবিতা পড়তেই হয় তা হলে অর্ধেকরাত্রে দরজা বন্ধ করে পড়া উচিত। কবিতার সঙ্গেই তো আপনাদের আগাগোড়া মিল। যে বিধাতা আপনাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি যে গীতিকবি, জয়দেব তাঁরই পায়ের কাছে বসে 'ললিতলবঙ্গলতা'য় হাত পাকিয়েছেন।

মক্ষীরানী কোনো জবাব না দিয়ে হেসে লাল হয়ে চলে যাবার উদ্‌যোগ করতেই আমি বললুম, না, সে হবে না, আপনি বসে বসে পড়ুন। আমি একখানা বই ফেলে গিয়েছিলুম, সেটা নিয়েই দৌড় দিচ্ছি।

আমার বইখানা টেবিল থেকে তুলে নিলুম। বললুম, ভাগ্যে এ বই আপনার হাতে পড়ে নি, তা হলে আপনি হয়তো আমাকে মারতে আসতেন।

মক্ষী বললেন, কেন ?

আমি বললুম, কেননা এ কবিতার বই নয়। এতে যা আছে সে একেবারে মানুষের মোটা কথা, খুব মোটা করেই বলা, কোনোরকম চাতুরী নেই। আমার খুব ইচ্ছে ছিল এ বইটা নিখিল পড়ে।

একটুখানি ভ্রূকুঞ্চিত করে মক্ষী বললে, কেন বলুন দেখি।

আমি বললুম, ও যে পুরুষমানুষ, আমাদেরই দলের লোক। এই স্থূল জগৎটাকে ও কেবলই ঝাপসা করে দেখতে চায়, সেইজন্যেই ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধে। আপনি তো দেখছেন সেইজন্যেই আমাদের স্বদেশী ব্যাপারটাকে ও লংফেলোর কবিতার মতো ঠাউরেছে— যেন ফি কথায় মধুর ছন্দ বাঁচিয়ে চলতে হবে এইরকম ওর মতলব। আমরা গদ্যের গদা নিয়ে বেড়াই, আমরা ছন্দ ভাঙার দল।

মক্ষী বললে, স্বদেশীর সঙ্গে এ বইটার যোগ কী ?

আমি বললুম, আপনি পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। কী স্বদেশ কী অন্য সব বিষয়েই নিখিল বানানো কথা নিয়ে চলতে চায়, তাই পদে পদে মানুষের যেটা স্বভাব তারই সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকি বাধে, তখন ও স্বভাবকে গাল দিতে থাকে ; কিছুতেই এ কথাটা ও মানতে চায় না যে, কথা তৈরি হবার বহু আগেই আমাদের স্বভাব তৈরি হয়ে গেছে, কথা থেমে যাবার বহু পরেও আমাদের স্বভাব বেঁচে থাকবে।

মক্ষী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল ; তার পরে গম্ভীরভাবে বললে, স্বভাবের চেয়ে বড়ো হতে চাওয়াটাই কি আমাদের স্বভাব নয় ?

আমি মনে মনে হাসলুম— ওগো ও রানী, এ তোমার আপন বুলি নয়, এ নিখিলেশের কাছে শেখা। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ, স্বভাবের রসে দিব্যি টস্ টস্ করছ ; যেমনি স্বভাবের ডাক শুনেছ অমনি তোমার সমস্ত রক্তমাংস সাড়া দিতে শুরু করেছে— এতদিন এরা তোমার কানে যে মন্ত্র দিয়েছে সেই মায়ামন্ত্রজালে তোমাকে ধরে রাখতে পারবে কেন ? তুমি যে জীবনের আগুনের তেজে শিরায় শিরায় জ্বলছ আমি কি জানি নে ? তোমাকে সাধুকথার ভিজে গামছা জড়িয়ে ঠাণ্ডা রাখবে আর কতদিন ?

আমি বললুম, পৃথিবীতে দুর্বল লোকের সংখ্যাই বেশি ; তারা নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওই রকমের মন্ত্র দিন রাত পৃথিবীর কানে আউড়ে আউড়ে সবল লোকের কান খারাপ করে দিচ্ছে। স্বভাব যাদের বঞ্চিত ক'রে কাহিল ক'রে রেখেছে তারাই অন্যের স্বভাবকে কাহিল করবার পরামর্শ দেয়।

মক্ষী বললে, আমরা মেয়েরাও তো দুর্বল, দুর্বলের ষড়্‌যন্ত্রে আমাদেরও তো যোগ দিতে হবে।

আমি হেসে বললুম, কে বললে দুর্বল ? পুরুষমানুষ তোমাদের অবলা বলে স্তুতিবাদ ক'রে ক'রে তোমাদের লজ্জা দিয়ে দুর্বল করে রেখেছে। আমার বিশ্বাস তোমরাই সবল। তোমরা পুরুষের মন্ত্রে-গড়া দুর্গ ভেঙে ফেলে ভয়ংকরী হয়ে মুক্তি লাভ করবে, এ আমি লিখে-পড়ে দিচ্ছি। বাইরেই

পুরুষরা হাঁকডাক করে বেড়ায়, কিন্তু তাদের ভিতরটা তো দেখছ— তারা অত্যন্ত বদ্ধ জীব। আজ পর্যন্ত তারাই তো নিজের হাতে শাস্ত্র গড়ে নিজেকে বেঁধেছে, নিজের ফুঁয়ে এবং আগুনে মেয়েজাতকে সোনার শিকল বানিয়ে অন্তরে বাইরে আপনাকে জড়িয়েছে। এমনি করে নিজের ফাঁদে নিজেকে বাঁধবার অদ্ভুত ক্ষমতা যদি পুরুষের না থাকত তা হলে পুরুষকে আজ ধরে রাখত কে ? নিজের তৈরি ফাঁদই পুরুষের সব চেয়ে বড়ো উপাস্য দেবতা। তাকেই পুরুষ নানা রঙে রাঙিয়েছে, নানা সাজে সাজিয়েছে, নানা নামে পুজো দিয়েছে। কিন্তু মেয়েরা ? তোমরাই দেহ দিয়ে মন দিয়ে পৃথিবীতে রক্তমাংসের বাস্তবকে চেয়েছ, বাস্তবকে জন্ম দিয়েছ, বাস্তবকে পালন করেছ।

মক্ষী শিক্ষিত মেয়ে, সহজে তর্ক করতে ছাড়ে না ; সে বললে, তাই যদি সত্যি হত তা হলে পুরুষ কি মেয়েকে পছন্দ করতে পারত ?

আমি বললুম, মেয়েরা সেই বিপদের কথা জানে ; তারা জানে পুরুষজাতটা স্বভাবত ফাঁকি ভালোবাসে। সেইজন্যে তারা পুরুষের কাছ থেকেই কথা ধার করে ফাঁকি সেজে পুরুষকে ভোলাবার চেষ্টা করে। তারা জানে খাদ্যের চেয়ে মদের দিকেই স্বভাবমাতাল পুরুষজাতটার ঝোঁক বেশি, এইজন্যেই নানা কৌশলে নানা ভাবে ভঙ্গিতে তারা নিজেকে মদ বলেই চালাতে চায় ; আসলে তারা যে খাদ্য সেটা যথাসাধ্য গোপন করে রাখে। মেয়েরা বস্তুতন্ত্র, তাদের কোনো মোহের উপকরণের দরকার করে না ; পুরুষের জন্যেই তো যত রকম-বেরকম মোহের আয়োজন। মেয়েরা মোহিনী হয়েছে নেহাত দায়ে পড়ে।

মক্ষী বললে, তবে এ মোহ ভাঙতে চান কেন ?

আমি বললুম, স্বাধীনতা চাই বলে। দেশেও স্বাধীনতা চাই, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধেও স্বাধীনতা চাই। দেশ আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেইজন্যে আমি কোনো নীতিকথার ধোঁওয়ায় তাকে এতটুকু আড়াল করে দেখতে পারব না ; আমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, তুমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেইজন্যে মাঝখানে কেবল কতকগুলো কথা ছড়িয়ে মানুষের কাছে মানুষকে দুর্গম দুর্বোধ করে তোলবার ব্যবসায় আমি একটুও পছন্দ করি নে।

আমার মনে ছিল যে লোক ঘুমোতে ঘুমোতে চলছে তাকে হঠাৎ চমকিয়ে দেওয়া কিছু নয়। কিন্তু আমার স্বভাবটা যে দুর্দাম, ধীরে সুস্থে চলা আমার চাল নয়। জানি যে কথা সেদিন বললুম তার ভঙ্গিটা তার সুরটা বড়ো সাহসিক ; জানি এরকম কথার প্রথম আঘাত কিছু দুঃসহ ; কিন্তু মেয়েদের কাছে সাহসিকেরই জয়। পুরুষরা ভালোবাসে ধোঁওয়াকে, আর মেয়েরা ভালোবাসে বস্তুকে, সেইজন্যেই পুরুষ পুজো করতে ছোটে তার নিজের আইডিয়ার অবতারকে, আর মেয়েরা তাদের সমস্ত অর্ঘ্য এনে হাজির করে প্রবলের পায়ের তলায়।

আমাদের কথাটা ঠিক যখন গরম হয়ে উঠতে চলেছে এমন সময় আমাদের ঘরের মধ্যে নিখিলের ছেলেবেলাকার মাস্টার চন্দ্রনাথবাবু এসে উপস্থিত। মোটের উপরে পৃথিবী জায়গাটা বেশ ভালোই ছিল, কিন্তু এই-সব মাস্টারমশায়দের উৎপাতে এখান থেকে বাস ওঠাতে ইচ্ছে করে। নিখিলেশের মতো মানুষ মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সংসারটাকে ইস্কুল বানিয়ে রেখে দিতে চায়। বয়স হল, তবু ইস্কুল পিছন-পিছন চলল ; সংসারে প্রবেশ করলে, সেখানেও ইস্কুল এসে ঢুকল। উচিত, মরবার সময়ে ইস্কুলমাস্টারটিকে সহমরণে টেনে নিয়ে যাওয়া। সেদিন আমাদের আলাপের মাঝখানে অসময়ে সেই মূর্তিমান ইস্কুল এসে হাজির। আমাদের সকলেরই ধাতের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছাত্র বাসা করে আছে বোধ করি। আমি যে এ-হেন দুর্বৃত্ত, আমিও কেমন থমকে গেলুম। আর আমাদের মক্ষী, তার মুখ দেখেই মনে হল সে এক মুহূর্তেই ক্লাসের সব চেয়ে ভালো ছাত্রী হয়ে একেবারে প্রথম সারে গম্ভীর হয়ে বসে গেল ; তার হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল পৃথিবীতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার একটা দায় আছে। এক-একটা মানুষ রেলের পয়েন্ট্‌স্‌ম্যানের মতো পথের ধারে বসে থাকে, তারা ভাবনার গাড়িকে খামকা এক লাইন থেকে আর-এক লাইনে চালান করে দেয়।

চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই সংকুচিত হয়ে ফিরে যাবার চেষ্টা করছিলেন— 'মাপ করবেন আমি'— কথাটা শেষ করতে না করতেই মক্ষী তাঁর পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে আর বললে, মাস্টারমশায়, যাবেন না, আপনি বসুন। সে যেন ডুব-জলে পড়ে গেছে, মাস্টারমশায়ের আশ্রয় চায়। ভীরু! কিংবা আমি হয়তো ভুল বুঝছি। এর ভিতরে হয়তো একটা ছলনা আছে। নিজের দাম বাড়াবার ইচ্ছা। মক্ষী হয়তো আমাকে আড়ম্বর করে জানাতে চায় যে, তুমি ভাবছ তুমি আমাকে অভিভূত করে দিয়েছ, কিন্তু তোমার চেয়ে চন্দ্রনাথবাবুকে আমি ঢের বেশি শ্রদ্ধা করি।— তাই করো-না। মাস্টারমশায়দের তো শ্রদ্ধা করতেই হবে। আমি তো মাস্টারমশায় নই, আমি ফাঁকা শ্রদ্ধা চাই নে। আমি তো বলেইছি, ফাঁকিতে আমার পেট ভরবে না— আমি বস্তু চিনি।

চন্দ্রনাথবাবু স্বদেশীর কথা তুললেন। আমার ইচ্ছে ছিল তাঁকে একটানা বকে যেতে দেব, কোনো জবাব করব না। বুড়োমানুষকে কথা কইতে দেওয়া ভালো ; তাতে তাদের মনে হয় তারাই বুঝি সংসারের কলে দম দিচ্ছে, বেচারারা জানতে পারে না তাদের রসনা যেখানে চলছে সংসার তার থেকে অনেক দূরে চলছে। প্রথমে খানিকটা চুপ করেই ছিলুম, কিন্তু সন্দীপচন্দ্রের ধৈর্য আছে এ বদনাম তার পরম শত্রুরাও দিতে পারবে না। চন্দ্রনাথবাবু যখন বললেন, দেখুন, আমরা কোনোদিনই চাষ করি নি, আজ এখনই হাতে হাতে ফসল পাব এমন আশা যদি করি তবে—

আমি থাকতে পারলুম না ; আমি বললুম, আমরা তো ফসল চাই নে। আমরা বলি, মা ফলেষু কদাচন।

চন্দ্রনাথবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন ; বললেন, তবে আপনারা কী চান ?

আমি বললুম, কাঁটাগাছ, যার আবাদে কোনো খরচ নেই।

মাস্টারমশায় বললেন, কাঁটাগাছ পরের রাস্তা কেবল বন্ধ করে না, নিজের রাস্তাতেও সে জঞ্জাল।

আমি বললুম, ওটা হল ইস্কুলে পড়াবার নীতিবচন। আমরা তো খড়ি হাতে বোর্ডে বচন লিখছি নে। আমাদের বুক জ্বলছে, এখন সেইটেই বড়ো কথা। এখন আমরা পরের পায়ের তেলোর কথা মনে রেখেই পথে কাঁটা দেব ; তার পরে যখন নিজের পায়ে বিঁধবে তখন নাহয় ধীরে সুস্থে অনুতাপ করা যাবে। সেটা এমনিই কি বেশি ? মরবার বয়স যখন হবে তখন ঠাণ্ডা হবার সময় হবে, যখন জ্বলুনির বয়স তখন ছট্‌ফট্‌ করাটাই শোভা পায়।

চন্দ্রনাথবাবু একটু হেসে বললেন, ছট্‌ফট্‌ করতে চান করুন, কিন্তু সেইটেকেই বীরত্ব কিংবা কৃতিত্ব মনে করে নিজেকে বাহবা দেবেন না। পৃথিবীতে যে জাত আপনার জাতকে বাঁচিয়েছে তারা ছট্‌ফট্‌ করে নি, তারা কাজ করেছে। কাজটাকে যারা বরাবর বাঘের মতো দেখে এসেছে তারাই আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে করে অকাজের অপথ দিয়েই তারা তাড়াতাড়ি সংসারে তরে যাবে।

খুব একটা কড়া জবাব দেবার জন্যই যখন কোমর বেঁধে দাঁড়াচ্ছি এমন সময় নিখিল এল। চন্দ্রনাথবাবু উঠে মক্ষীর দিকে চেয়ে বললেন, আমি এখন যাই মা, আমার কাজ আছে।

তিনি চলে যেতেই আমি আমার সেই ইংরিজি বইটা দেখিয়ে নিখিলকে বললুম, মক্ষীরানীকে বইটার কথা বলছিলুম।

পৃথিবীর সাড়ে পনেরো-আনা মানুষকে মিথ্যের দ্বারা ফাঁকি দিতে হয় আর এই ইস্কুলমাস্টারের চিরকেলে ছাত্রটিকে সত্যের দ্বারা ফাঁকি দেওয়াই সহজ। নিখিলকে জেনেশুনে ঠকতে দিলেই তবে ও ভালো করে ঠকে। তাই ওর সঙ্গে দেখা-বিন্তির খেলাই ভালো খেলা।

নিখিল বইটার নাম পড়ে দেখে চুপ করে রইল। আমি বললুম, মানুষ নিজের এই বাসের পৃথিবীটাকে নানান কথা দিয়ে ভারি অস্পষ্ট করে তুলেছে, এই-সব লেখকেরা ঝাঁটা হাতে করে উপরকার ধুলো উড়িয়ে দিয়ে ভিতরকার বস্তুটাকে স্পষ্ট করে তোলবার কাজে লেগেছে ; তাই আমি বলছিলুম, এ বইটা তোমার পড়ে দেখা ভালো।

নিখিল বললে, আমি পড়েছি।

আমি বললুম, তোমার কী বোধ হয় ?

নিখিল বললে, এরকম বই নিয়ে যারা সত্য-সত্য ভাবতে চায় তাদের পক্ষে ভালো, যারা ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে বিষ।

আমি বললুম, তার অর্থটা কী ?

নিখিল বললে, দেখো, আজকের দিনের সমাজে যে লোক এমন কথা বলে যে, নিজের সম্পত্তিতে কোনো মানুষের একান্ত অধিকার নেই সে যদি নির্লোভ হয় তবেই তার মুখে এ কথা সাজে, আর সে যদি স্বভাবতই চোর হয় তবে কথাটা তার মুখে ঘোর মিথ্যে। প্রবৃত্তি যদি প্রবল থাকে তবে এ-সব বইয়ের ঠিক মানে পাওয়া যাবে না।

আমি বললুম, প্রবৃত্তিই তো প্রকৃতির সেই গ্যাস্‌পোস্ট্‌ যার আলোতে আমরা এ-সব রাস্তার খোঁজ পাই। প্রবৃত্তিকে যারা মিথ্যে বলে তারা চোখ উপড়ে ফেলেই দিব্যদৃষ্টি পাবার দুরাশা করে।

নিখিল বললে, প্রবৃত্তিকে আমি তখনই সত্য বলে মনে মানি যখন তার সঙ্গে-সঙ্গেই নিবৃত্তিকেও সত্য বলি। চোখের ভিতরে কোনো জিনিস গুঁজে দেখতে গেলে চোখকেই নষ্ট করি, দেখতেও পাই নে। প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিস দেখতে চায় তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে, সত্যকেও দেখতে পায় না।

আমি বললুম, দেখো নিখিল, ধর্মনীতির সোনাবাঁধানো চশমার ভিতর দিয়ে জীবনটাকে দেখা তোমার একটা মানসিক বাবুগিরি ; এইজন্যেই কাজের সময় তুমি বাস্তবকে ঝাপসা দেখো, কোনো কাজ তুমি জোরের সঙ্গে করতে পার না।

নিখিল বললে, জোরের সঙ্গে কাজ করাটাকেই আমি কাজ করা বলি নে।

তবে ?

মিথ্যা তর্ক করে কী হবে ? এ-সব কথা নিয়ে নিষ্ফল বকতে গেলে এর লাবণ্য নষ্ট হয়।

আমার ইচ্ছে ছিল মক্ষী আমাদের তর্কে যোগ দেয়। সে এ পর্যন্ত একটি কথা না বলে চুপ করে বসে ছিল। আজ হয়তো আমি তার মনটাকে কিছু বেশি নাড়া দিয়েছি, তাই মনের মধ্যে দ্বিধা লেগে গেছে— ইস্কুল-মাস্টারের কাছে পাঠ বুঝে নেবার ইচ্ছে হচ্ছে।

কী জানি আজকের মাত্রাটা অতিরিক্ত বেশি হয়েছে কি না। কিন্তু বেশ করে নাড়া দেওয়াটা দরকার। চিরকাল যেটাকে অনড় বলে মন নিশ্চিন্ত আছে সেটা যে নড়ে এইটিই গোড়ায় জানা চাই।

নিখিলকে বললুম, তোমার সঙ্গে কথা হল ভালোই হল। আমি আর একটু হলেই এ বইটা মক্ষীরানীকে পড়তে দিচ্ছিলুম।

নিখিল বললে, তাতে ক্ষতি কী ? ও বই যখন আমি পড়েছি তখন বিমলই বা পড়বে না কেন ? আমার কেবল একটি কথা বুঝিয়ে বলবার আছে ; আজকাল য়ুরোপ মানুষের সব জিনিসকেই বিজ্ঞানের তরফ থেকে যাচাই করছে, এমনিভাবে আলোচনা চলছে যেন মানুষ-পদার্থটা কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব কিংবা জীবতত্ত্ব, কিংবা মনস্তত্ত্ব, কিংবা বড়োজোর সমাজতত্ত্ব। কিন্তু মানুষ যে তত্ত্ব নয়, মানুষ যে সব-তত্ত্বকে নিয়ে সব-তত্ত্বকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে আপনাকে মেলে দিচ্ছে, দোহাই তোমাদের, সে কথা ভুলো না। তোমরা আমাকে বল আমি ইস্কুল-মাস্টারের ছাত্র ; আমি নই, সে তোমরা— মানুষকে তোমরা সায়ান্সের মাস্টারের কাছ থেকে চিনতে চাও, তোমাদের অন্তরাত্মার কাছ থেকে নয়।

আমি বললুম, নিখিল, আজকাল তুমি এমন উত্তেজিত হয়ে আছ কেন ?

সে বললে, আমি যে স্পষ্ট দেখছি তোমরা মানুষকে ছোটো করছ, অপমান করছ।

কোথায় দেখছ ?

হাওয়ার মধ্যে, আমার বেদনার মধ্যে। মানুষের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বড়ো, যিনি তাপস, যিনি সুন্দর, তাঁকে তোমরা কাঁদিয়ে মারতে চাও !

একি তোমার পাগলামির কথা !

নিখিল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দেখো সন্দীপ, মানুষ মরণান্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু মরবে না এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় আছে, তাই আমি সব সইতে প্রস্তুত হয়েছি, জেনেশুনে, বুঝেসুঝে।

এই কথা বলেই সে ঘরের থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে তার এই কাণ্ড দেখছি, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনে দেখি টেবিলের উপর থেকে দুটো-তিনটে বই মেঝের উপর পড়ল আর মক্ষীরানী ত্রস্তপদে আমার থেকে যেন একটু দূর দিয়ে চলে গেল।

অদ্ভুত মানুষ ঐ নিখিলেশ। ও বেশ বুঝেছে ওর ঘরের মধ্যে একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু তবু আমাকে ঘাড় ধরে বিদেয় করে দেয় না কেন ? আমি জানি, ও অপেক্ষা করে আছে বিমল কী করে। বিমল যদি ওকে বলে 'তোমার সঙ্গে আমার জোড় মেলে নি' তবেই ও মাথা হেঁট করে মৃদুস্বরে বলবে, তা হলে দেখছি ভুল হয়ে গেছে। ভুলকে ভুল বলে মানলেই সব চেয়ে বড়ো ভুল করা হয়, এ কথা বোঝবার জোর ওর নেই। আইডিয়ায় মানুষকে যে কত কাহিল করে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হল নিখিল। ও-রকম পুরুষমানুষ আর দ্বিতীয় দেখি নি ; ও নিতান্তই প্রকৃতির একটা খেয়াল। ওকে নিয়ে একটা ভদ্র রকমের গল্প কি নাটক গড়াও চলে না, ঘর করা তো দূরের কথা।

তার পরে মক্ষী, বেশ বোধ হচ্ছে আজকে ওর ঘোর ভেঙে গেছে। ও যে কোন্ স্রোতে ভেসেছে হঠাৎ আজ সেটা বুঝতে পেরেছে। এখন ওকে জেনেশুনে হয় ফিরতে হবে নয় এগোতে হবে। তা নয়, এখন থেকে ও একবার এগোবে, একবার পিছবে। তাতে আমার ভাবনা নেই। কাপড়ে যখন আগুন লাগে তখন ভয়ে যতই ছুটোছুটি করে আগুন ততই বেশি করে জ্বলে ওঠে। ভয়ের ধাক্কাতেই ওর হৃদয়ের বেগ আরো বেশি করে বেড়ে উঠবে। আরো তো এমন দেখেছি। সেই তো বিধবা কুসুম ভয়েতে কাঁপতে কাঁপতেই আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছিল। আর, আমাদের হস্টেলের কাছে যে ফিরিঙ্গি মেয়ে ছিল সে আমার উপরে রাগ করলে এক-একদিন মনে হত সে আমাকে রেগে যেন ছিঁড়ে ফেলে দেবে। সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে যেদিন সে চীৎকার করে 'যাও যাও' বলে আমাকে ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিলে, তার পরে যেমনি আমি চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়েছি অমনি সে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। ওদের আমি খুব জানি— রাগ বলো, ভয় বলো, লজ্জা বলো, ঘৃণা বলো, এ-সমস্তই জ্বালানি কাঠের মতো ওদের হৃদয়ের আগুনকে বাড়িয়ে তুলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে জিনিস এ আগুনকে সামলাতে পারে সে হচ্ছে আইডিয়াল। মেয়েদের সে বালাই নেই। ওরা পুণ্যি করে, তীর্থ করে, গুরুঠাকুরের পায়ের কাছে গড় হয়ে পড়ে প্রণাম করে— আমরা যেমন করে আপিস করি— কিন্তু আইডিয়ার ধার দিয়ে যায় না।

আমি নিজের মুখে ওকে বেশি কিছু বলব না, এখনকার কালের কতকগুলো ইংরেজি বই ওকে পড়তে দেব। ও ক্রমে ক্রমে বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারুক যে, প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডার্‌ন্। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড়ো জানাটা মডার্‌ন্ নয়। 'মডার্‌ন্' এই কথাটার যদি আশ্রয় পায় তা হলেই ও জোর পাবে ; কেননা ওদের তীর্থ চাই, গুরুঠাকুর চাই, বাঁধা সংস্কার চাই, শুধু আইডিয়া ওদের কাছে ফাঁকা।

যাই হোক, এ নাট্যটা পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত দেখা যাক। এ কথা জাঁক করে বলতে পারব না আমি কেবলমাত্র দর্শক, উপরের তলায় রয়াল সীটে বসে মাঝে মাঝে কেবল হাততালি দিচ্ছি। বুকের ভিতরে টান পড়ছে, থেকে থেকে শিরগুলো ব্যথিয়ে উঠছে। রাত্রে বাতি নিবিয়ে বিছানায় যখন শুই তখন এতটুকু ছোঁওয়া, এতটুকু চাওয়া, এতটুকু কথা অন্ধকার ভর্তি করে কেবলই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনের ভিতরটায় একটা পুলক ঝিলমিল করতে থাকে, মনে হয় যেন রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে একটা সুরের ধারা বইছে !

এই টেবিলের উপরকার ফোটো-স্ট্যান্ডে নিখিলের ছবির পাশে মক্ষীর ছবি ছিল। আমি সে ছবিটি খুলে নিয়েছিলুম। কাল মক্ষীকে সেই ফাঁকটা দেখিয়ে বললুম, কৃপণের কৃপণতার দোষেই চুরি হয়, অতএব এই চুরির পাপটা কৃপণে চোরে ভাগাভাগি করে নেওয়াই উচিত। কী বলেন ?

মক্ষী একটু হাসলে ; বললে, ও ছবিটা তো তেমন ভালো ছিল না।

আমি বললুম, কী করা যাবে ? ছবি তো কোনোমতেই ছবির চেয়ে ভালো হয় না। ও যা তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব।

মক্ষী একখানা বই খুলে তার পাতা ওলটাতে লাগল। আমি বললুম, আপনি যদি রাগ করেন আমি ওর ফাঁকটা কোনোরকম করে ভরিয়ে দেব।

আজ ফাঁকটা ভরিয়েছি। আমার এ ছবিটা অল্প বয়সের ; তখনকার মুখটা কাঁচা-কাঁচা, মনটাও সেইরকম ছিল। তখনো ইহকাল-পরকালের অনেক জিনিস বিশ্বাস করতুম। বিশ্বাসে ঠকায় বটে, কিন্তু ওর একটা মস্ত গুণ এই— ওতে মনের উপর একটা লাবণ্য দেয়।

নিখিলের ছবির পাশে আমার ছবি রইল, আমরা দুই বন্ধু।

নিখিলেশের আত্মকথা

আগে কোনোদিন নিজের কথা ভাবি নি। এখন প্রায় মাঝে-মাঝে নিজেকে বাইরে থেকে দেখি। বিমল আমাকে কেমন চোখে দেখে সেইটে আমি দেখবার চেষ্টা করি। বড়ো গম্ভীর, সব জিনিসকে বড়ো বেশি গুরুতর করে দেখা আমার অভ্যাস।

আর-কিছু না, জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো। তাই করেই তো চলছে। সমস্ত জগতে আজ যত দুঃখ ঘরে বাইরে ছড়িয়ে আছে তাকে তো আমরা মনে মনে ছায়ার মতো মায়ার মতো উড়িয়ে দিয়ে তবেই অনায়াসে নাচ্ছি খাচ্ছি ; তাকে যদি এক মুহূর্ত সত্য বলে ধরে রেখে দেখতে পারতুম তা হলে কি মুখে অন্ন রুচত না চোখে ঘুম থাকত ?

কেবল নিজেকেই সেই-সমস্ত উড়ে-যাওয়া ভেসে-যাওয়ার দলে দেখতে পারি নে। মনে করি কেবল আমারই দুঃখ জগতের বুকে অনন্তকালের বোঝা হয়ে হয়ে জমে উঠছে। তাই এত গম্ভীর, তাই নিজের দিকে তাকালে দুই চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়।

ওরে হতভাগা, একবার জগতের সদরে দাঁড়িয়ে সমস্তর সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দেখ্‌-না সেখানে যুগযুগান্তের মহামেলায় লক্ষকোটি লোকের ভিড়ে বিমল তোমার কে ? সে তোমার স্ত্রী ! কাকে বল তোমার স্ত্রী ? ঐ শব্দটাকে নিজের ফুঁয়ে ফুলিয়ে তুলে দিন রাত্রি সামলে বেড়াচ্ছ, জানো বাইরে থেকে একটা পিন ফুটলেই এক মুহূর্তে হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে সমস্তটা চুপসে যাবে।

আমার স্ত্রী, অতএব ও আমারই ! ও যদি বলতে চায় 'না, আমি আমিই' তখনই আমি বলব, সে কেমন করে হবে, তুমি যে আমার স্ত্রী ! স্ত্রী ! ওটা কি একটা যুক্তি ! ওটা কি একটা সত্য ! ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায় ?

স্ত্রী ! এই কথাটিকে যে আমার জীবনের যা-কিছু মধুর, যা-কিছু পবিত্র সব দিয়ে বুকের মধ্যে মানুষ করেছি, একদিনও ওকে ধুলোর উপর নামাই নি। ঐ নামে কত পূজার ধূপ, কত সাহানার বাঁশি, কত বসন্তের বকুল, কত শরতের শেফালি ! ও যদি কাগজের খেলার নৌকার মতো আজ হঠাৎ নর্দমার ঘোলা জলে ডুবে যায় তা হলে সেই সঙ্গে আমার—

ঐ দেখো, আবার গাম্ভীর্য ! কাকে বলছ নর্দমা, কাকে বলছ ঘোলা জল ? ও-সব হল রাগের কথা। তুমি রাগ করবে বলেই জগতে এক জিনিস আর হবে না। বিমল যদি তোমার না হয় তো সে তোমার নয়ই, যতই চাপাচাপি রাগারাগি করবে ততই ঐ কথাটাই আরো বড়ো করে প্রমাণ হবে। বুক ফেটে যায় যে ! তা যাক। তাতে বিশ্ব দেউলে হবে না, এমন-কি তুমিও দেউলে হবে না। জীবনে মানুষ যা-কিছু হারায় তার সকলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশি বড়ো ; সমস্ত কান্নার সমুদ্র পেরিয়েও তার পার আছে ; এইজন্যেই সে কাঁদে, নইলে কাঁদতও না।

কিন্তু সমাজের দিক থেকে— সে-সব কথা সমাজ ভাবুক গে, যা করতে হয় করুক। আমি কাঁদছি আমার আপন কান্না, সমাজের কান্না নয়। বিমল যদি বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তা হলে আমার

সামাজিক স্ত্রী যেখানে থাকে থাক্, আমি বিদায় হলুম।

দুঃখ তো আছেই। কিন্তু একটা দুঃখ বড়ো মিথ্যে হবে, সেটা থেকে নিজেকে যে করে পারি বাঁচাবই। কাপুরুষের মতো এ কথা মনে করতে পারব না যে, অনাদরে আমার জীবনের দাম কমে গেল। আমার জীবনের মূল্য আছে; সেই মূল্য দিয়ে আমি কেবল আমার ঘরের অন্তঃপুরটুকু কিনে রাখবার জন্যে আসি নি। আমার যা বড়ো ব্যাবসা সে কিছুতেই দেউলে হবে না, আজ এই কথাটা খুব সত্য করে ভাববার দিন এসেছে।

আজ যেমন নিজেকে তেমনি বিমলকেও সম্পূর্ণ বাইরে থেকে দেখতে হবে। এতদিন আমি আমারই মনের কতকগুলি দামি আইডিয়াল দিয়ে বিমলকে সাজিয়েছিলুম। আমার সেই মানসী মূর্তির সঙ্গে সংসারে বিমলের সব জায়গায় যে মিল ছিল তা নয়, কিন্তু তবুও আমি তাকে পূজা করে এসেছি আমার মানসীর মধ্যে।

সেটা আমার গুণ নয়, সেইটেই আমার মহদ্দোষ। আমি লোভী; আমি আমার সেই মানসী তিলোত্তমাকে মনে মনে ভোগ করতে চেয়েছিলুম, বাইরের বিমল তার উপলক্ষ হয়ে পড়েছিল। বিমল যা সে তাইই; তাকে যে আমার খাতিরে তিলোত্তমা হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বকর্মা আমারই ফর্মাস খাটছেন না কি?

তা হলে আজ একবার আমাকে সমস্ত পরিষ্কার করে দেখে নিতে হবে; মায়ার রঙে যে-সব চিত্রবিচিত্র করেছি সে আজ খুব শক্ত করে মুছে ফেলব। এতদিন অনেক জিনিস আমি দেখেও দেখি নি। আজ এ কথা স্পষ্ট বুঝেছি, বিমলের জীবনে আমি আকস্মিক মাত্র; বিমলের সমস্ত প্রকৃতি যার সঙ্গে সত্য মিলতে পারে সে হচ্ছে সন্দীপ। এইটুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কেননা, আজ আমার নিজের কাছেও নিজের বিনয় করবার দিন নেই। সন্দীপের মধ্যে অনেক গুণ আছে যা লোভনীয়, সেই গুণে আমাকেও এতদিন সে আকর্ষণ করে এসেছে, কিন্তু খুব কম করেও যদি বলি তবু এ কথা আজ নিজের কাছে বলতে হবে যে, মোটের উপর সে আমার চেয়ে বড়ো নয়। স্বয়ম্বরসভায় আজ আমার গলায় যদি মালা না পড়ে, যদি মালা সন্দীপই পায়, তবে এই উপেক্ষায় দেবতা তাঁরই বিচার করলেন যিনি মালা দিলেন, আমার নয়। আজ আমার এ কথা অহংকার করে বলা নয়। আজ নিজের মূল্যকে নিজের মধ্যে যদি একান্ত সত্য করে না জানি ও না স্বীকার করি, আজকেকার এই আঘাতকে যদি আমার এই মানবজন্মের চরম অপমান বলেই মেনে নিতে হয়, তা হলে আমি আবর্জনার মতো সংসারের আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়ব; আমার দ্বারা আর কোনো কাজই হবে না।

অতএব আজ সমস্ত অসহ্য দুঃখের ভিতর দিয়েও আমার মনের মধ্যে একটা মুক্তির আনন্দ জাগুক। চেনাশোনা হল; বাহিরকেও বুঝলুম, অন্তরকেও বুঝলুম। সমস্ত লাভ-লোকসান মিটিয়ে যা বাকি রইল তাই আমি। সে তো পঙ্গু-আমি নয়, দরিদ্র-আমি নয়, সে অন্তঃপুরের রোগীর-পথ্যে-মানুষ-করা রোগা আমি নয়; সে বিধাতার শক্ত-হাতের তৈরি আমি। যা তার হবার তা হয়ে গেছে, আর তার কিছুতে মার নেই।

এইমাত্র মাস্টারমশায় আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে বললেন, নিখিল, শুতে যাও, রাত একটা হয়ে গেছে।

অনেক রাত্রে বিমল খুব গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে না পড়লে আমার পক্ষে শুতে যাওয়া ভারি কঠিন হয়। দিনের বেলা তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তাও চলে, কিন্তু বিছানার মধ্যে একলা-রাতের নিস্তব্ধতায় তার সঙ্গে কী কথা বলব? আমার সমস্ত দেহমন লজ্জিত হয়ে ওঠে।

আমি মাস্টারমশায়কে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি এখনো ঘুমোন নি কেন?

তিনি একটু হেসে বললেন, আমার এখন ঘুমোবার বয়স গেছে, এখন জেগে থাকবার বয়স।

এই পর্যন্ত লেখা হয়ে শুতে যাব যাব করছি এমন সময়ে আমার জানলার সামনের আকাশে

শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ একটা জায়গায় ছিন্ন হয়ে গেল, আর তারই মধ্যে থেকে একটি বড়ো তারা জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে উঠল। আমার মনে হল আমাকে সে বললে, কত সম্বন্ধ ভাঙছে গড়ছে স্বপ্নের মতো, কিন্তু আমি ঠিক আছি, আমি বাসরঘরের চিরপ্রদীপের শিখা, আমি মিলনরাত্রির চিরচুম্বন।

সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত বুক ভরে উঠে মনে হল, এই বিশ্ববস্তুর পর্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখলুম— কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয়-অস্পষ্ট আয়না। যখনই বলি 'আয়নাটা আমারই করে নিই' 'বাক্সর ভিতরে করে রাখি' তখনই ছবি সরে যায়। থাক্-না, আমার আয়নাতেই বা কী, আর ছবিতেই বা কী! প্রেয়সী, তোমার বিশ্বাস অটুট রইল, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছ প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখছে।

একটা শয়তান অন্ধকারের কোণে দাঁড়িয়ে বলছে, এ-সব তোমার ছেলে-ভোলানো কথা! তা হোক-না, ছেলেকে তো ভোলাতেই হবে— লক্ষ ছেলে, কোটি ছেলে, ছেলের পর ছেলে— কত ছেলের কত কান্না! এত ছেলেকে কি মিথ্যে দিয়ে ভোলানো চলে? আমার প্রেয়সী আমাকে ঠকাবে না— সে সত্য, সে সত্য— এইজন্যে বারে বারে তাকে দেখলুম, বারে বারে তাকে দেখব; ভুলের ভিতর দিয়েও তাকে দেখেছি, চোখের জলের ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়েও তাকে দেখা গেল। জীবনের হাটের ভিড়ের মধ্যে তাকে দেখেছি, হারিয়েছি, আবার দেখেছি, মরণের ফুকোরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েও তাকে দেখব। ওগো নিষ্ঠুর, আর পরিহাস কোরো না। যে পথে তোমার পায়ের চিহ্ন পড়েছে, যে বাতাসে তোমার এলো চুলের গন্ধ ভরে আছে, এবার যদি তার ঠিকানা ভুল করে থাকি তবে সেই ভুলে আমাকে চিরদিন কাঁদিয়ো না। ঐ ঘোমটা-খোলা তারা আমাকে বলছে, না, না, ভয় নেই, যা চিরদিন থাকবার তা চিরদিনই আছে।

এইবার দেখে আসি আমার বিমলকে, সে বিছানায় এলিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে আছে। তাকে না জাগিয়ে তার ললাটে একটি চুম্বন রেখে দিই। সেই চুম্বন আমার পূজার নৈবেদ্য। আমার বিশ্বাস, মৃত্যুর পরে আর সবই ভুলব— সব ভুল, সব কান্না, কিন্তু এই চুম্বনের স্মৃতির স্পন্দন কোনো একটা জায়গায় থেকে যাবে— কেননা, জন্মের পর জন্মে এই চুম্বনের মালা যে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে সেই প্রেয়সীর গলায় পরানো হবে বলে।

এমন সময়ে আমার ঘরের মধ্যে আমার মেজো ভাজ এসে ঢুকলেন। তখন আমাদের পাহারার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

ঠাকুরপো, তুমি করছ কী? লক্ষ্মী ভাই, শুতে যাও— তুমি নিজেকে এমন করে দুঃখ দিয়ো না। তোমার চেহারা যা হয়ে গেছে সে আমি চোখে দেখতে পারি নে।

এই বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে জল পড়তে লাগল।

আমি একটি কথাও না বলে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে শুতে গেলুম।

বিমলার আত্মকথা

গোড়ায় কিছুই সন্দেহ করি নি, ভয় করি নি; আমি জানতুম দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করছি। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে কী প্রচণ্ড উল্লাস! নিজের সর্বনাশ করাই নিজের সব চেয়ে আনন্দ এই কথা সেদিন প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম।

জানি নে, হয়তো এমনি করেই একটা অস্পষ্ট আবেগের ভিতর দিয়ে এই নেশাটা একদিন আপনিই কেটে যেত। কিন্তু সন্দীপবাবু যে থাকতে পারলেন না, তিনি যে নিজেকে স্পষ্ট করে তুললেন। তাঁর কথার সুর যেন স্পর্শ হয়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়, চোখের চাহনি যেন ভিক্ষা হয়ে আমার পায়ে ধরে।

পরের দিন সকালে গোবিন্দর মা এসে বললে, ছোটোরানীমা, ভাঁড়ার দেবার বেলা হল।

আমি বললুম, হরিমতিকে বের করে নিতে বল্। এই বলে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে জানলার কাছে বসে বিলিতি সেলাইয়ের কাজ করতে লাগলুম। এমন সময়ে বেহারা এসে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে, সন্দীপবাবু দিলেন।— সাহসের আর অন্ত নেই! বেহারাটা কী মনে করলে! বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল— চিঠি খুলে দেখি তাতে কোনো সম্ভাষণ নেই, কেবল এই কটি কথা আছে, 'বিশেষ প্রয়োজন। দেশের কাজ। সন্দীপ।'

রইল আমার সেলাই পড়ে। তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটুখানি চুল ঠিক করে নিলুম। শাড়িটা যেমন ছিল তাই রইল, জ্যাকেট একটা বদল করলুম। আমি জানি তাঁর চোখে এই জ্যাকেটটির সঙ্গে আমার একটি বিশেষ পরিচয় জড়িত আছে।

আমাকে যে বারান্দা দিয়ে বাইরে যেতে হবে তখন সেই বারান্দায় বসে আমার মেজো জা তাঁর নিয়মমত সুপুরি কাটছেন। আজ আমি কিছুই সংকোচ করলুম না। মেজো জা জিজ্ঞাসা করলেন, বলি চলেছ কোথায়?

আমি বললুম, বৈঠকখানাঘরে।

এত সকালে? গোষ্ঠলীলা বুঝি?

আমি কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেলুম। মেজো জা গান ধরলেন—

রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে।
অগাধ জলের মকর যেমন,
ও তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই।

বৈঠকখানাঘরে গিয়ে দেখি, সন্দীপ দরজার দিকে পিঠ করে ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শিত ছবির তালিকার একখানা বই নিয়ে মন দিয়ে দেখছেন। আর্ট সম্বন্ধে সন্দীপ নিজেকে বিচক্ষণ বলেই জানেন। একদিন আমার স্বামী তাঁকে বললেন যে, আর্টিস্টদের যদি গুরুমশায়ের দরকার হয় তবে তুমি বেঁচে থাকতে যোগ্য লোকের অভাব হবে না।

এমন করে খোঁচা দিয়ে কথা বলা আমার স্বামীর স্বভাব নয়, কিন্তু আজকাল তাঁর মেজাজ একটু বদলে এসেছে; সন্দীপের অহংকারে তিনি ঘা দিতে পারলে ছাড়েন না।

সন্দীপ বললেন, তুমি কি ভাব, আর্টিস্টদের আর গুরুকরণ দরকার নেই?

স্বামী বললেন, আর্ট সম্বন্ধে আর্টিস্টদের কাছ থেকেই আমাদের মতো মানুষকে চিরকাল নতুন নতুন পাঠ নিয়ে চলতে হবে, কেননা এর কোনো একটিমাত্র বাঁধা পাঠ নেই।

সন্দীপ আমার স্বামীর বিনয়কে বিদ্রূপ করে খুব হাসলেন; বললেন, নিখিল, তুমি ভাব দৈন্যটাই হচ্ছে মূলধন, ওটাকে যত খাটাবে ঐশ্বর্য ততই বাড়বে। আমি বলছি, অহংকার যার নেই সে স্রোতের শ্যাওলা, চারি দিকে কেবল ভেসে ভেসে বেড়ায়।

আমার মনের ভাব ছিল অদ্ভুত রকম। এক দিকে ইচ্ছেটা তর্কে আমার স্বামীর জিত হয়, সন্দীপের অহংকারটা একটু কমে, অথচ সন্দীপের অসংকোচ অহংকারটাই আমাকে টানে— সে যেন দামী হীরের ঝকঝকানি, কিছুতেই তাকে লজ্জা দেবার জো নেই; এমন-কি, সূর্যের কাছেও সে হার মানতে চায় না, বরঞ্চ তার স্পর্ধা আরো বেড়ে যায়।

আমি ঘরে ঢুকলুম। জানি আমার পায়ের শব্দ সন্দীপ শুনতে পেলেন, কিন্তু যেন শোনেন নি এমনি ভান করে বইটা দেখতেই লাগলেন। আমার ভয়, পাছে আর্টের কথা পেড়ে বসেন। কেননা, আর্টের ছুতো করে সন্দীপ আমার সামনে যে-সব ছবির যে-সব কথার আলোচনা করতে ভালোবাসেন আজও আমার তাতে লজ্জা বোধ করার অভ্যাস ঘোচে নি। লজ্জা লুকোবার জন্যেই আমাকে দেখাতে হত যেন এর মধ্যে লজ্জার কিছুই নেই।

তাই একবার মুহূর্তকালের জন্য ভাবছিলুম ফিরে চলে যাই, এমন সময়ে খুব একটা গভীর

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুখ তুলে সন্দীপ আমাকে দেখে যেন চমকে উঠলেন। বললেন, এই-যে আপনি এসেছেন!

কথাটার মধ্যে, কথার সুরে, তাঁর দুই চোখে, একটা চাপা ভর্ৎসনা। আমার এমন দশা যে, এই ভর্ৎসনাকেও মেনে নিলুম। আমার উপর সন্দীপের যে দাবি জন্মেছে তাতে আমার দু-তিন দিনের অনুপস্থিতিও যেন অপরাধ। সন্দীপের এই অভিমান যে আমার প্রতি অপমান সে আমি জানি, কিন্তু রাগ করবার শক্তি কই!

কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলুম। যদিও আমি অন্য দিকে চেয়ে ছিলুম তবু বেশ বুঝতে পারছিলুম সন্দীপের দুই চক্ষের নালিশ আমার মুখের সামনে যেন ধন্না দিয়ে পড়েই ছিল, সে আর নড়তে চাচ্ছিল না। এ কী কাণ্ড! সন্দীপ কোনো-একটা কথা তুললে সেই কথার আড়ালে একটু লুকিয়ে বাঁচি যে। বোধ হয় পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট যখন এমনি করে লজ্জা অসহ্য হয়ে এল তখন আমি বললুম, আপনি কী দরকারে আমাকে ডেকেছিলেন?

সন্দীপ ঈষৎ চমকে উঠে বললেন, কেন, দরকার কি থাকতেই হবে? বন্ধুত্ব কি অপরাধ? পৃথিবীতে যা সব চেয়ে বড়ো তার এতই অনাদর? হৃদয়ের পূজাকে কি পথের কুকুরের মতো দরজার বাইরে থেকে খেদিয়ে দিতে হবে মক্ষীরানী?

আমার বুকের মধ্যে দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল। বিপদ ক্রমশই কাছে ঘনিয়ে আসছে, আর তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আমার মনের মধ্যে পুলক আর ভয় দুইই সমান হয়ে উঠল। এই সর্বনাশের বোঝা আমি আমার পিঠ দিয়ে সামলাব কী করে?

আমাকে যে পথের ধুলোর উপর মুখ থুবড়ে পড়তে হবে!

আমার হাত পা কাঁপছিল। আমি খুব শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললুম, সন্দীপবাবু, আপনি দেশের কী কাজ আছে বলে আমাকে ডেকেছেন, তাই আমার ঘরের কাজ ফেলে এসেছি।

তিনি একটু হেসে বললেন, আমি তো সেই কথাই আপনাকে বলছিলুম। আমি যে পূজার জন্যেই এসেছি তা জানেন? আপনার মধ্যে আমি আমার দেশের শক্তিকেই প্রত্যক্ষ দেখতে পাই সে কথা কি আপনাকে বলি নি? ভূগোলবিবরণ তো একটা সত্য বস্তু নয়; শুধু সেই ম্যাপটার কথা স্মরণ করে কি কেউ জীবন দিতে পারে? যখন আপনাকে সামনে দেখতে পাই তখনই তো বুঝতে পারি, দেশ কত সুন্দর, কত প্রিয়, প্রাণে তেজে কত পরিপূর্ণ! আপনি নিজের হাতে আমার কপালে জয়টিকা পরিয়ে দেবেন, তবেই তো জানব আমি আমার দেশের আদেশ পেয়েছি; তবেই তো সেই কথা স্মরণ করে লড়তে লড়তে মৃত্যুবাণ খেয়ে যদি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি তবে বুঝব, সে কেবলমাত্র ভূগোলবিবরণের মাটি নয়, সে একখানা আঁচল— কেমন আঁচল জানেন? আপনি সেদিন যে একখানি শাড়ি পরেছিলেন, লাল মাটির মতো তার রঙ, আর তার চওড়া পাড় একটি রক্তের ধারার মতো রাঙা, সেই শাড়ির আঁচল! সে কি আমি কোনোদিন ভুলতে পারব! এই-সব জিনিসই তো জীবনকে সতেজ, মৃত্যুকে রমণীয় করে তোলে।

বলতে বলতে সন্দীপের দুই চোখ জ্বলে উঠল। চোখে সে ক্ষুধার আগুন কি পূজার সে আমি বুঝতে পারলুম না। আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ল যেদিন আমি প্রথম ওঁর বক্তৃতা শুনেছিলুম। সেদিন, তিনি অগ্নিশিখা না মানুষ সে আমি ভুলে গিয়েছিলুম। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা চলে— তার অনেক কায়দা-কানুন আছে। কিন্তু আগুন যে আর-এক জাতের; সে এক নিমেষে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, প্রলয়কে সুন্দর করে তোলে। মনে হতে থাকে, যে সত্য প্রতিদিনের শুকনো কাঠে হেলাফেলার মধ্যে লুকিয়ে ছিল সে আজ আপনার দীপ্যমান মূর্তি ধরে চারি দিকের সমস্ত কৃপণের সঞ্চয়গুলোকে অট্টহাস্যে দগ্ধ করতে ছুটে চলেছে।

এর পরে আমার কিছু বলবার শক্তি ছিল না। আমার ভয় হতে লাগল এখনই সন্দীপ ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরবেন। কেননা তাঁর হাত চঞ্চল আগুনের শিখার মতোই কাঁপছিল, আর তাঁর চোখের দৃষ্টি আমার উপর যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো এসে পড়ছিল।

সন্দীপ বলে উঠলেন, আপনারা সব ছোটো ছোটো ঘোরো নিয়মকেই কি বড়ো করে তুলবেন ? আপনাদের এমন প্রাণ আছে যার একটু আভাসেই আমরা জীবন-মরণকে তুচ্ছ করতে পারি, সে কি কেবল অন্দরের ঘোমটা-মোড়া জিনিস ? আজ আর লজ্জা করবেন না, লোকের কানাঘুষায় কান দেবেন না, আজ বিধিনিষেধে তুড়ি মেরে মুক্তির মাঝখানে ছুটে বেরিয়ে আসুন।

এমনি করে সন্দীপবাবুর কথায় দেশের স্তবের সঙ্গে যখন আমার স্তব মিশিয়ে যায়, তখন সংকোচের বাঁধন আর টেঁকে না, তখন রক্তের মধ্যে নাচন ধরে ! যতদিন আর্ট আর বৈষ্ণব কবিতা. আর স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধনির্ণয়, আর বাস্তব-অবাস্তবের বিচার চলছিল ততদিন আমার মন গ্লানিতে কালো হয়ে উঠেছিল। আজ সে অঙ্গারের কালিমায় আবার আগুন ধরে উঠল, সেই দীপ্তিই আমার লজ্জা নিবারণ করলে। মনে হতে লাগল আমি যে রমণী সেটা যেন আমার একটা অপরূপ দৈবী মহিমা।

হায় রে, আমার সেই মহিমা আমার চুলের ভিতর দিয়ে এখনই কেন একটা প্রত্যক্ষ দীপ্তির মতো বেরোয় না ! আমার মুখ দিয়ে এমন কোনো একটা কথা উঠছে না কেন যা মন্ত্রের মতো এখনই সমস্ত দেশকে অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত করে দেয় !

এমন সময়ে হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘরের ক্ষেমাদাসী এসে উপস্থিত। সে বলে, আমার মাইনে চুকিয়ে দাও, আমি চলে যাই, আমি সাত জন্মে এমন— হাউ হাউ হাউ হাউ !

কী ? ব্যাপারটা কী ?

মেজোরানীমার দাসী থাকো অকারণে গায়ে পড়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে ; তাকে যা মুখে আসে তাই বলে গাল দিয়েছে।

আমি যত বলি 'আচ্ছা, সে আমি বিচার করব' কিছুতেই ক্ষেমার কান্না আর থামে না।

সকালবেলায় দীপক রাগিণীর যে সুর এমন জমে উঠেছিল তার উপরে যেন বাসন-মাজার জল ঢেলে দিলে। মেয়েমানুষ যে পদ্মবনের পঙ্কজ তার তলাকার পঙ্ক ঘুলিয়ে উঠল। সেটাকে সন্দীপের কাছে তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে আমাকে তখনই অন্তঃপুরে ছুটতে হল। দেখি আমার মেজো জা সেই বারান্দায় বসে একমনে মাথা নিচু করে সুপুরি কাটছেন, মুখে একটু হাসি লেগে আছে, গুন্ গুন্ করে গান করছেন 'রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে'— ইতিমধ্যে কোথাও যে কিছু অনর্থপাত হয়েছে তার কোনো লক্ষণ তাঁর কোনোখানেই নেই।

আমি বললুম, মেজোরানী, তোমার থাকো ক্ষেমাকে এমন মিছিমিছি গাল দেয় কেন ?

তিনি ভুরু তুলে আশ্চর্য হয়ে বললেন, ওমা. সত্যি নাকি ? মাগীকে ঝাঁটা-পেটা করে দূর করে দেব। দেখো দেখি, এই সকালবেলায় তোমার বৈঠকখানার আসর মাটি ক'রে দিলে ! ক্ষেমারও আচ্ছা আক্কেল দেখছি, জানে তার মনিব বাইরের বাবুর সঙ্গে একটু গল্প করছে, একেবারে সেখানে গিয়ে উপস্থিত— লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বসেছে ! তা ছোটোরানী, এ-সব ঘরকন্নার কথায় তুমি থেকো না, তুমি বাইরে যাও, আমি যেমন করে পারি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।

আশ্চর্য মানুষের মন। এক মুহূর্তের মধ্যেই তার পালে এমন উল্টো হাওয়া লাগে ! এই সকালবেলায় ঘরকন্না ফেলে বাইরে সন্দীপের সঙ্গে বৈঠকখানায় আলাপ-আলোচনা করতে যাওয়া, আমার চিরকালের অন্তঃপুরের অভ্যস্ত আদর্শে এমনি সৃষ্টিছাড়া বলে মনে হল যে আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ঘরে চলে গেলুম।

নিশ্চয় জানি ঠিক সময় বুঝে মেজোরানী নিজে থাকোকে টিপে দিয়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়েছেন। কিন্তু আমি এমনি টলমলে জায়গায় আছি যে এ-সব নিয়ে কোনো কথাই কইতে পারি নে। এই তো সেদিন নন্‌কু দরোয়ানকে ছাড়িয়ে দেবার জন্যে প্রথম ঝাঁজে আমার স্বামীর সঙ্গে যেরকম উদ্ধতভাবে ঝগড়া করেছিলুম শেষ পর্যন্ত তা টিকল না। দেখতে দেখতে নিজের উত্তেজনাতেই নিজের মধ্যে একটা লজ্জা এল। এর মধ্যে আবার মেজোরানী এসে আমার স্বামীকে বললেন, ঠাকুরপো, আমারই অপরাধ। দেখো ভাই, আমরা সেকেলে লোক, তোমার ঐ সন্দীপবাবুর

চালচলন কিছুতেই ভালো ঠেকে না— সেইজন্যে ভালো মনে করেই আমি দরোয়ানকে— তা এতে যে ছোটোরানীর অপমান হবে এ কথা মনেও করি নি, বরঞ্চ ভেবেছিলুম উল্টো। হায় রে পোড়া কপাল, আমার যেমন বুদ্ধি!

এমনি করে দেশের দিক থেকে, পূজার দিক থেকে, যে কথাটাকে এত উজ্জ্বল করে দেখি সেইটেই যখন নীচের দিক থেকে এমন করে ঘুলিয়ে উঠতে থাকে তখন প্রথমটা হয় রাগ, তার পরেই মনে গ্লানি আসে।

আজ শোবার ঘরে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে জানলার কাছে বসে বসে ভাবতে লাগলুম, চার দিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জীবনটা আসলে কতই সরল হতে পারে। ঐ-যে মেজোরানী নিশ্চিন্তমনে বারান্দায় বসে সুপুরি কাটছেন, ঐ সহজ আসনে বসে সহজ কাজের ধারা আমার কাছে আজ অমন দুর্গম হয়ে উঠল! রোজ রোজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, এর শেষ কোন্‌খানে? আমি কি মরে যাব, সন্দীপ কি চলে যাবে, এ-সমস্তই কি রোগীর প্রলাপের মতো সুস্থ হয়ে উঠে একেবারে ভুলে যাব— না ঘাড়মোড় ভেঙে এমন সর্বনাশের তলায় তলিয়ে যাব যেখান থেকে ইহজীবনে আমার আর উদ্ধার নেই? জীবনের সৌভাগ্যকে সরলভাবে গ্রহণ করতে পারলুম না, এমন করে ছারখার করে দিলুম কী করে।

আমার এই শোবার ঘর, যে ঘরে আজ ন বৎসর আগে নতুন বউ হয়ে পা দিয়েছিলুম, সেই ঘরের সমস্ত দেয়াল ছাদ মেজে আমার মুখের দিকে চেয়ে আজ অবাক হয়ে আছে। এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমার স্বামী কলকাতা থেকে ভারতসাগরের কোন্ এক দ্বীপের অনেক দামী এই পরগাছাটি কিনে এনেছিলেন। এই কটি মাত্র পাতা, কিন্তু তাতে লম্বা যে একটি ফুলের গুচ্ছ ফুটেছিল সে যেন সৌন্দর্যের কোন্ পেয়ালা একেবারে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া, ইন্দ্রধনু যেন ঐ কটি পাতার কোলে ফুল হয়ে জন্ম নিয়ে দোল খাচ্ছে। সেই ফুটন্ত পরগাছাটিকে আমরা দুজনে মিলে আমাদের শোবার ঘরের এই জানলার কাছে টাঙিয়ে রেখেছি। সেই একবার ফুল হয়েছিল, আর হয় নি, আশা আছে আবার আর-একদিন ফুল ফুটবে। আশ্চর্য এই যে, অভ্যাসমত আজও এই গাছে আমি রোজ জল দিচ্ছি, আশ্চর্য এই যে, সেই নারকেলদড়ি দিয়ে পাকে পাকে আঁট করে বাঁধা এই পাতা-কয়টির বাঁধন আলগা হল না— তার পাতাগুলি আজও সবুজ আছে।

আজ চার বছর হল আমার স্বামীর একটি ছবি হাতির দাঁতের ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঐ কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিয়েছিলুম। ওর দিকে দৈবাৎ যখন আমার চোখ পড়ে আর চোখ তুলতে পারি নে। আজ ছ-দিন আগেও রোজ সকালে স্নানের পর ফুল তুলে ঐ ছবির সামনে রেখে প্রণাম করেছি। কত দিন এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমার তর্ক হয়ে গেছে।

একদিন তিনি বললেন, তুমি যে আমাকে আমার চেয়ে বড়ো করে তুলে পুজো কর, এতে আমার বড়ো লজ্জা বোধ হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন তোমার লজ্জা?

স্বামী বললেন, শুধু লজ্জা নয়, ঈর্ষা।

আমি বললুম, শোনো একবার কথা। তোমার আবার ঈর্ষা কাকে?

স্বামী বললেন, ঐ মিথ্যে-আমিটাকে। এর থেকে বুঝতে পারি এই সামান্য আমাকে নিয়ে তোমার সন্তোষ নেই, তুমি এমন অসামান্য কাউকে চাও যে তোমার বুদ্ধিকে অভিভূত করে দেবে; তাই আর-একটা আমাকে তুমি মন দিয়ে গড়ে তোমার মন ভোলাচ্ছ।

আমি বললুম, তোমার এই কথাগুলো শুনলে আমার রাগ হয়।

তিনি বললেন, রাগ আমার উপরে করে কী হবে, তোমার অদৃষ্টের উপর করো। তুমি তো আমাকে স্বয়ম্বর সভায় বেছে নাও নি, যেমনটি পেয়েছ তেমনি তোমাকে চোখ বুজে নিতে হয়েছে; কাজেই দেবত্ব দিয়ে আমাকে যতটা পার সংশোধন করে নিচ্ছ। দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন বলেই দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে নিতে পেরেছিলেন, তোমরা স্বয়ম্বরা হতে পার নি বলেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়ে

দেবতার গলায় মালা দিচ্ছ।

সেদিন এই কথাটা নিয়ে এত রাগ করেছিলুম যে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে গিয়েছিল। তাই মনে করে আজ ঐ কুলুঙ্গিটার দিকে চোখ তুলতে পারি নে।

ঐ-যে আমার গয়নার বাক্সের মধ্যে আর-এক ছবি আছে। সেদিন বাইরের বৈঠকখানাঘর ঝাড়পোঁছ করবার উপলক্ষে সেই ফোটোস্ট্যান্ডখানা তুলে এনেছি, সেই যার মধ্যে আমার স্বামীর ছবির পাশে সন্দীপের ছবি আছে। সে ছবি তো পুজো করি নে, তাকে প্রণাম করা চলে না ; সে রইল আমার হীরে-মানিক-মুক্তের মধ্যে ঢাকা, সে লুকোনো রইল বলেই তার মধ্যে এত পুলক। ঘরে সব দরজা বন্ধ করে তবে তাকে খুলে দেখি। রাত্রে আস্তে আস্তে কেরোসিনের বাতিটা উসকে তুলে তার সামনে ঐ ছবিটা ধরে চুপ করে চেয়ে বসে থাকি। তার পরে রোজই মনে করি এই কেরোসিনের শিখায় ওকে পুড়িয়ে ছাই করে চিরদিনের মতো চুকিয়ে ফেলে দিই ; আবার রোজই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে আমার হীরে-মানিক-মুক্তোর নীচে তাকে চাপা দিয়ে চাবি বন্ধ করে রাখি। কিন্তু, পোড়ারমুখী, এই হীরে-মানিক-মুক্তো তোকে দিয়েছিল কে ? এর মধ্যে কত দিনের কত আদর জড়িয়ে আছে। তারা আজ কোথায় মুখ লুকোবে ? মরণ হলে যে বাঁচি।

সন্দীপ একদিন আমাকে বলেছিলেন, দ্বিধা করাটা মেয়েদের প্রকৃতি নয়। তার ডাইনে বাঁয়ে নেই, তার একমাত্র আছে সামনে। তিনি বারবার বলেন, দেশের মেয়েরা যখন জাগবে তখন তারা পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি স্পষ্ট করে বলবে 'আমরা চাই'— সেই চাওয়ার কাছে কোনো ভালো-মন্দ কোনো সম্ভব-অসম্ভবের তর্কবিতর্ক টিকতে পারবে না। তাদের কেবল এক কথা 'আমরা চাই'। 'আমি চাই'। এই বাণীই হচ্ছে সৃষ্টির মূল বাণী ; সেই বাণীই কোনো শাস্ত্রবিচার না করে আগুন হয়ে সূর্যে তারায় জ্বলে উঠেছে। ভয়ংকর তার প্রণয়ের পক্ষপাত ; মানুষকে সে কামনা করেছে বলেই যুগযুগান্তরের লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে তার সেই কামনার কাছে বলি দিতে দিতে এসেছে। সৃজন-প্রলয়ের সেই ভয়ংকরী 'আমি চাই' বাণী আজ মেয়েদের মধ্যেই মূর্তিমতী। সেইজন্যেই ভীরু পুরুষ সৃজনের সেই আদিম বন্যাকে বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, পাছে সে তাদের কুমড়োখেতের মাচাগুলোকে অট্টকলহাস্যে ভাসিয়ে নিয়ে নাচতে নাচতে চলে যায়। পুরুষ মনে করে আছে, এই বাঁধকে সে চিরকালের মতো পাকা করে বেঁধে রেখেছে। জমছে, জল জমছে— হ্রদের জলরাশি আজ শান্ত গম্ভীর ; আজ সে চলেও না, আজ সে বলেও না ; পুরুষের রান্নাঘরের জলের জালা নিঃশব্দে ভর্তি করে। কিন্তু চাপ আর সইবে না, বাঁধ ভাঙবে ; তখন এতদিনের বোবা শক্তি 'আমি চাই' 'আমি চাই' বলে গর্জন করতে করতে ছুটবে।

সন্দীপের এই কথা আমার মনের মধ্যে যেন ডমরু বাজাতে থাকে। তাই আমার আপনার সঙ্গে যখন আপনার বিরোধ বাধে, যখন লজ্জা আমাকে ধিক্‌কার দিতে থাকে, তখন সন্দীপের কথা আমার মনে আসে। তখন বুঝতে পারি আমার এ লজ্জা কেবল লোকলজ্জা, সে আমার মেজো জায়ের মূর্তি ধরে বাইরে বসে বসে সুপুরি কাটতে কাটতে কটাক্ষপাত করছে। তাকে আমি কিসের গ্রাহ্য করি ! 'আমি চাই' এই কথাটাকেই নিঃসংকোচে অবাধে অন্তরে বাহিরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতে পারাই হচ্ছে আপনার পূর্ণ প্রকাশ, না বলতে পারাই হচ্ছে ব্যর্থতা। কিসের ঐ পরগাছা, কিসের ঐ কুলুঙ্গি— আমার এই উদ্দীপ্ত-আমিকে ব্যঙ্গ করে, অপমান করে, এমন সাধ্য ওদের কী আছে !

এই বলে তখনই ইচ্ছে হল, ঐ পরগাছাটাকে জানলার বাইরে ফেলে দিই, ছবিটাকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে আনি, প্রলয়শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতা প্রকাশ হোক। হাত উঠেছিল, কিন্তু বুকের মধ্যে বিঁধল, চোখে জল এল— মেজের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম। কী হবে, আমার কী হবে ! আমার কপালে কী আছে !

সন্দীপের আত্মকথা

আমি নিজের লেখা আত্মকাহিনী যখন পড়ে দেখি তখন ভাবি, এই কি সন্দীপ ? আমি কি কথা দিয়ে তৈরি ? আমি কি রক্তমাংসের মলাটে মোড়া একখানা বই ?

পৃথিবী চাঁদের মতো মরা জিনিস নয়, সে নিশ্বাস ফেলছে, তার সমস্ত নদীসমুদ্র থেকে বাষ্প উঠছে, সেই বাষ্পে সে ঘেরা ; তার চতুর্দিকে ধুলো উড়ছে। সেই ধুলোর ওড়নায় সে ঢাকা। বাইরে থেকে যে দর্শক এই পৃথিবীকে দেখবে এই বাষ্প আর ধুলোর উপর থেকে প্রতিফলিত আলোই কেবল সে দেখতে পাবে। সে কি এর দেশ-মহাদেশের স্পষ্ট সন্ধান পাবে ?

এই পৃথিবীর মতো যে মানুষ সজীব তার অন্তর থেকে কেবলই আইডিয়ার নিশ্বাস উঠছে, এইজন্যে বাষ্পে সে অস্পষ্ট। যেখানে তার ভিতরের জলস্থল, যেখানে সে বিচিত্র, সেখানে তাকে দেখা যায় না ; মনে হয় সে যেন আলোছায়ার একটা মণ্ডল।

আমার বোধ হচ্ছে যেন সজীব গ্রহের মতো আমি আমার সেই আইডিয়ার মণ্ডলটাকেই আঁকছি। কিন্তু, আমি যা চাই, যা ভাবি, যা সিদ্ধান্ত করছি, আমি যে আগাগোড়া কেবল তাইই তা তো নয়। আমি যা ভালোবাসি নে, যা ইচ্ছে করি নে, আমি যে তাও। আমার জন্মাবার আগেই যে আমার সৃষ্টি হয়ে গেছে ; আমি তো নিজেকে বেছে নিতে পারি নি, হাতে যা পেয়েছি তাকে নিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে।

এ কথা আমি বেশ জানি, যে বড়ো সে নিষ্ঠুর। সর্বসাধারণের জন্যে ন্যায়, আর অসাধারণের জন্যে অন্যায়। মাটির তলাটা আগাগোড়া সমান, আগ্নেয় পর্বত তাকে আগুনের শিঙের ভয়ংকর গুঁতো মেরে তবে উঁচু হয়ে ওঠে। সে চার দিকের প্রতি ন্যায়বিচার করে না, তার বিচার নিজের প্রতিই। সফল অন্যায়পরতা এবং অকৃত্রিম নিষ্ঠুরতার জোরেই মানুষ বলো, জাত বলো এ পর্যন্ত লক্ষপতি মহীপতি হয়ে উঠেছে। ১কে দিব্যি চোখ বুজে গিলে খেয়ে তবেই ২ দুই হয়ে উঠতে পারে, নইলে ১এর সমতল লাইন একটানা হয়ে চলত।

আমি তাই অন্যায়ের তপস্যাকেই প্রচার করি। আমি সকলকে বলি, অন্যায়ই মোক্ষ, অন্যায়ই বহ্নিশিখা ; সে যখনই দগ্ধ না করে তখনই ছাই হয়ে যায়। যখনই কোনো জাত বা মানুষ অন্যায় করতে অক্ষম হয়, তখনই পৃথিবীর ভাঙা কুলোয় তার গতি।

কিন্তু তবু এ আমার আইডিয়া, এ পুরোপুরি আমি নয়। যতই অন্যায়ের বড়াই করি না কেন, আইডিয়ার উড়ুনির মধ্যে ফুটো আছে, ফাঁক আছে, তার ভিতর থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ে— সে নেহাত কাঁচা, অতি নরম। তার কারণ, আমার অধিকাংশ আমার পূর্বেই তৈরি হয়ে গেছে।

আমার চ্যালাদের নিয়ে আমি মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরের পরীক্ষা করি। একদিন বাগানে চড়িভাতি করতে গিয়েছিলুম। একটা ছাগল চরে বেড়াচ্ছিল, আমি সবাইকে বললুম, কে ওর পিছনের একখানা পা এই দা দিয়ে কেটে আনতে পারে ? সকলেই যখন ইতস্তত করছিল আমি নিজে গিয়ে কেটে নিয়ে এলুম। আমাদের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে যে লোক নিষ্ঠুর সে এই দৃশ্য দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। আমার শান্ত অবিচলিত মুখ দেখে সকলেই নির্বিকার মহাপুরুষ বলে আমার পায়ের ধুলো নিলে। অর্থাৎ সেদিন সকলেই আমার আইডিয়ার বাষ্পমণ্ডলটাই দেখলে ; কিন্তু যেখানে আমি— নিজের দোষে না, ভাগ্যদোষে— দুর্বল সকরুণ, যেখানে ভিতরে ভিতরে বুক ফাটছিল, সেখানে আমাকে ঢাকা দেওয়াই ভালো।

বিমল-নিখিলকে নিয়ে আমার জীবনের এই-যে একটা অধ্যায় জমে উঠছে এর ভিতরেও অনেকটা কথা ঢাকা পড়ছে। ঢাকা পড়ত না যদি আমার মধ্যে আইডিয়ার কোনো বালাই না থাকত। আমার আইডিয়া আমার জীবনটাকে নিয়ে আপনার মতলবে গড়ছে, কিন্তু সেই মতলবের বাইরেও অনেকখানি জীবন বাকি পড়ে থাকছে। সেইটের সঙ্গে আমার মতলবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল থাকে না ; এইজন্যে

তাকে চেপেচুপে ঢেকেঢুকে রাখতে চাই, নইলে সমস্তটাকে সে মাটি করে দেয়।

প্রাণ-জিনিসটা অস্পষ্ট, সে যে কত বিরুদ্ধতার সমষ্টি তার ঠিক নেই। আমরা আইডিয়াওয়ালা মানুষ তাকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢেলে একটা কোনো বিশেষ আকারে সুস্পষ্ট করে জানতে চাই ; সেই জীবনের সুস্পষ্টতাই জীবনের সফলতা। দিগ্‌বিজয়ী সেকেন্দর থেকে শুরু করে আজকের দিনের আমেরিকার ক্রোড়পতি রক্‌ফেলার পর্যন্ত সকলেই নিজেকে তলোয়ারে কিংবা টাকার বিশেষ একটা ছাঁচে ঢেলে জমিয়ে দেখতে পেরেছে বলেই নিজেকে সফল করে জেনেছে।

এইখানেই আমাদের নিখিলের সঙ্গে আমার তর্ক বাধে। আমিও বলি আপনাকে জানো, সেও বলে আপনাকে জানো। কিন্তু সে যা বলে তাতে দাঁড়ায় এই আপনাকে না-জানাটাই হচ্ছে জানা। সে বলে, তুমি যাকে ফল পাওয়া বল সে হচ্ছে আপনাকে বাদ দিয়ে ফলটুকুকে পাওয়া। ফলের চেয়ে আত্মা বড়ো।

আমি বললুম, কথাটা নেহাত ঝাপসা হল।

নিখিল বললে, উপায় নেই। প্রাণটা কলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই বলে প্রাণটাকে কল বলে সোজা করে জানলেই যে প্রাণটাকে জানা হয় তা নয়। তেমনি আত্মা ফলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই আত্মাকে ফলের মধ্যে চরম করে দেখাই যে আত্মাকে সত্য দেখা তা বলব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তবে তুমি কোথায় আত্মাকে দেখছ ? কোন্ নাকের ডগায়, কোন্ ভুরূর মাঝখানে ?

সে বললে, আত্মা যেখানে আপনাকে অসীম জানছে, যেখানে ফলকে ছেড়ে এবং ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

তা হলে নিজের দেশ সম্বন্ধে কী বলবে ?

ঐ একই কথা। দেশ যেখানে বলে 'আমি আমাকেই লক্ষ্য করব' সেখানে সে ফল পেতে পারে, কিন্তু আত্মাকে হারায় ; যেখানে সকলের চেয়ে বড়োকে সকলের বড়ো করে দেখে সেখানে সকল ফলকেই সে খোওয়াতে পারে, কিন্তু আপনাকে সে পায়।

ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত কোথায় দেখেছ ?

মানুষ এত বড়ো যে সে যেমন ফলকে অবজ্ঞা করতে পারে তেমনি দৃষ্টান্তকেও। দৃষ্টান্ত হয়তো নেই, বীজের ভিতরে ফুলের দৃষ্টান্ত যেমন নেই ; কিন্তু বীজের ভিতরে ফুলের বেদনা আছে। তবু, দৃষ্টান্ত কি একেবারেই নেই ? বুদ্ধ বহু শতাব্দী ধরে যে সাধনায় সমস্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে রেখেছিলেন সে কি ফলের সাধনা ?

নিখিলের কথা আমি যে একেবারেই বুঝতে পারি নে তা নয়। কিন্তু সেইটিই হল আমার মুশকিল। ভারতবর্ষে আমার জন্ম ; সাত্ত্বিকতার বিষ রক্তের মধ্যে থেকে একেবারে মরতে চায় না। আপনাকে বঞ্চিত করার পথে চলা যে পাগলামি এ কথা মুখে যতই বলি এটাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই। এইজন্যেই আমাদের দেশে আজকাল অদ্ভুত ব্যাপার চলছে। ধর্মের ধুয়ো দেশের ধুয়ো দুটিকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি— ভগবদ্‌গীতা এবং বন্দেমাতরং আমাদের দুইই চাই— তাতে দুটোর কোনোটাই যে স্পষ্ট হতে পারছে না, তাতে একসঙ্গেই গড়ের বাদ্য এবং সানাই বাজানো চলছে, এ আমরা বুঝছি নে। আমার জীবনের কাজ হচ্ছে এই বেসুরো গোলমালটাকে থামানো ; আমি গড়ের বাদ্যটাকেই বাহাল রাখব, সানাই আমাদের সর্বনাশ করেছে। প্রবৃত্তির যে জয়পতাকা আমাদের হাতে দিয়ে মা প্রকৃতি, মা শক্তি, মা মহামায়া রণক্ষেত্রে আমাদের পাঠিয়েছেন তাকে আমরা লজ্জা দেব না। প্রবৃত্তিই সুন্দর, প্রবৃত্তিই নির্মল, যেমন নির্মল ভুঁইচাঁপা ফুল, যে কথায় কথায় স্নানের ঘরে ভিনোলিয়া সাবান মাখতে ছোটে না।

একটা প্রশ্ন কদিন ধরে মাথায় ঘুরছে, কেন বিমলের সঙ্গে জীবনটাকে জড়িয়ে ফেলতে দিচ্ছি আমার জীবনটা তো ভেসে-যাওয়া কলার ভেলা নয় যে যেখানে-সেখানে ঠেকতে ঠেকতে চলবে

সেই কথাই তো বলছিলুম যে একটিমাত্র আইডিয়ার ছাঁচে জীবনটাকে পরিমিত করতে চাই, জীব

তাকে ছাপিয়ে যায়। থেকে থেকে মানুষ ছিটকে ছিটকে পড়ে। এবার আমি যেন বেশি দূরে ছিটকে পড়েছি।

বিমল যে আমার কামনার বিষয় হয়ে উঠেছে সেজন্যে আমার কোনো মিথ্যে লজ্জা নেই। আমি যে স্পষ্ট দেখছি ও আমাকে চায়, ঐ তো আমার স্বকীয়া। গাছে ফল বোঁটায় ঝুলে আছে, সেই বোঁটার দাবিকেই চিরকালের বলে মানতে হবে নাকি! ওর যত রস যত মাধুর্য সে যে আমার হাতে সম্পূর্ণ খসে পড়বার জন্যেই; সেইখানেই একেবারে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াই ওর সার্থকতা; সেই ওর ধর্ম, ওর নীতি। আমি সেইখানেই ওকে পেড়ে আনব, ওকে ব্যর্থ হতে দেব না।

কিন্তু আমার ভাবনা এই যে, আমি জড়িয়ে পড়ছি, মনে হচ্ছে আমার জীবনে বিমল বিষম একটা দায় হয়ে উঠবে। আমি পৃথিবীতে এসেছি কর্তৃত্ব করতে; আমি লোককে চালনা করব কথায় এবং কাজে। সেই লোকের ভিড়ই আমার যুদ্ধের ঘোড়া। আমার আসন তার পিঠের উপরে, তার রাশ আমার হাতে, তার লক্ষ্য সে জানে না— শুধু আমিই জানি; কাঁটায় তার পায়ে রক্ত পড়বে, কাদায় তার গা ভরে যাবে, তাকে বিচার করতে দেব না, তাকে ছোটাব।

সেই আমার ঘোড়া আজ দরজায় দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে, তার হ্রেষাধ্বনিতে সমস্ত আকাশ আজ কেঁপে উঠল, কিন্তু আমি করছি কী? দিনের পর দিন আমার কী নিয়ে কাটছে? ও দিকে আমার এমন শুভদিন যে বয়ে গেল।

আমার ধারণা ছিল আমি ঝড়ের মতো ছুটে চলতে পারি; ফুল ছিঁড়ে আমি মাটিতে ফেলে দিই কিন্তু তাতে আমার চলার ব্যাঘাত করে না। কিন্তু এবার যে আমি ফুলের চার দিকে ফিরে ফিরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভ্রমরেরই মতো, ঝড়ের মতো নয়।

তাই তো বলি, নিজের আইডিয়া দিয়ে নিজেকে যে রঙে আঁকি সব জায়গায় সে রঙ তো পাকা হয়ে ধরে না, হঠাৎ দেখতে পাই সেই সামান্য মানুষটাকে। কোনো-এক অন্তর্যামী যদি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখতেন তা হলে নিশ্চয় দেখা যেত আমার সঙ্গে আর ঐ পাঁচুর সঙ্গে বেশি তফাত নেই— এমন-কি, ঐ নিখিলেশের সঙ্গে। কাল রাত্রে আমার আত্মকাহিনীর খাতাটা নিয়ে খুলে পড়ছিলুম। তখন সবে বি· এ· পাস করেছি, ফিলজফিতে মগজ ফেটে পড়ছে বললেই হয়। তখন থেকেই পণ করেছিলুম নিজের হাতে বা পরের হাতে গড়া কোনো মায়াকেই জীবনের মধ্যে স্থান দেব না, জীবনটাকে আগাগোড়া একেবারে নিরেট বাস্তব করে তুলব। কিন্তু তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবনকাহিনীটাকে কী দেখছি? কোথায় সেই ঠাস-বুনোনি? এ যে জালের মতো; সূত্র বরাবর চলেছে, কিন্তু সূত্র যতখানি ফাঁক তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। এই ফাঁকটার সঙ্গে লড়াই করে করে একে সম্পূর্ণ হার মানানো গেল না। কিছুদিন বেশ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জোরের সঙ্গেই চলছিলুম, আজ দেখি আবার একটা মস্ত ফাঁক।

আজ দেখি মনের মধ্যে ব্যথা লাগছে। 'আমি চাই, হাতের কাছে এসেছে, ছিঁড়ে নেব'— এ হল খুব স্পষ্ট কথা, খুব সংক্ষেপ রাস্তা। এই রাস্তায় যারা জোরের সঙ্গে চলতে পারে তারাই সিদ্ধিলাভ করে, এই কথা আমি চিরদিন বলে আসছি। কিন্তু ইন্দ্রদেব এই তপস্যাকে সহজ করতে দিলেন না, তিনি কোথা থেকে বেদনার অপ্সরীকে পাঠিয়ে দিয়ে সাধকের দৃষ্টিকে বাষ্পজালে অস্পষ্ট করে দেন।

দেখছি বিমলা জালে-পড়া হরিণীর মতো ছট্‌ফট্ করছে; তার বড়ো বড়ো দুই চোখে কত ভয় কত করুণা, জোর করে বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত— ব্যাধ তো এই দেখে খুশি হয়। আমার খুশি আছে, কিন্তু ব্যথাও আছে। সেইজন্যে কেবলই দেরি হয়ে যাচ্ছে, তেমন জোরে ফাঁস কষতে পারছি নে।

আমি জানি দুবার তিনবার এমন এক-একটা মুহূর্ত এসেছে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিমলার হাত চেপে ধরে তাকে আমার বুকের উপর টেনে আনলে সে একটি কথা বলতে পারত না, সেও বুঝতে পারছিল এখনই একটা কী ঘটতে যাচ্ছে যার পর থেকে জগৎসংসারের সমস্ত তাৎপর্য একেবারে বদলে

যাবে— সেই পরম অনিশ্চিতের গুহার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে, তার দুই চক্ষে ভয় অথচ উদ্দীপনার দীপ্তি, এই সময়টুকুর মধ্যে একটা-কিছু স্থির হয়ে যাবে তারই জন্যে সমস্ত আকাশ-পাতাল নিশ্বাস রোধ করে যেন থমকে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেই মুহূর্তগুলিকে বয়ে যেতে দিয়েছি ; নিঃসংকোচ বলের সঙ্গে নিশ্চিতপ্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হয়ে উঠতে দিই নি। এর থেকে বুঝতে পারছি এতদিন যে-সব বাধা আমার প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে ছিল তারা আজ আমার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছে।

যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোকবনে রেখেছিল। অত বড়ো বীরের অন্তরের মধ্যে ঐ এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সংকোচ ছিল তারই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সংকোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পুজো করত ! এইরকমেরই একটু সংকোচ ছিল বলেই যে বিভীষণকে তার মারা উচিত ছিল তাকে রাবণ চিরদিন দয়া এবং অবজ্ঞা করলে, আর মোলো নিজে।

জীবনের ট্রাজেডি এইখানেই। সে ছোটো হয়ে হৃদয়ের এক তলায় লুকিয়ে থাকে, তার পরে বড়োকে এক মুহূর্তে কাত করে দেয়। মানুষ আপনাকে যা বলে জানে মানুষ তা নয়, সেইজন্যেই এত অঘটন ঘটে।

নিখিল যে এমন অদ্ভুত, তাকে দেখে যে এত হাসি, তবু ভিতরে ভিতরে এও কিছুতে অস্বীকার করতে পারি নে যে সে আমার বন্ধু। প্রথমটা তার কথা বেশি কিছু ভাবি নি ; কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে তার কাছে লজ্জা পাচ্ছি, কষ্টও বোধ হচ্ছে। এক-একদিন আগেকার মতো তার সঙ্গে খুব করে গল্প করতে তর্ক করতে যাই, কিন্তু উৎসাহটা কেমন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে— এমন-কি, যা কখনো করি নে তাও করি, তার মতের সঙ্গে মত মেলাবার ভান করে থাকি। কিন্তু এই কপটতা জিনিসটা আমার সয় না, এটা নিখিলেরও সয় না— এইখানে ওর সঙ্গে আমার মিল আছে।

তাই জন্যে আজকাল নিখিলকে এড়িয়ে চলতে চাই, কোনোমতে দেখাটা না হলেই বাঁচি। এই-সব হচ্ছে দুর্বলতার লক্ষণ। অপরাধের ভূতটাকে মানবামাত্রই সে একটা সত্যকার জিনিস হয়ে দাঁড়ায় ; তখন তাকে যতই অবিশ্বাস করি-না কেন, সে চেপে ধরে। আমি নিখিলের কাছে এইটেই অসংকোচে জানাতে চাই, এ-সব জিনিসকে বড়ো করে বাস্তব করে দেখতে হবে। যা সত্য তার মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের কোনো ব্যাঘাত থাকা উচিত নয়।

কিন্তু এ কথাটা আর অস্বীকার করতে পারছি নে এইবার আমাকে দুর্বল করেছে। আমার এই দুর্বলতায় বিমল মুগ্ধ হয় নি ; আমার অসংকোচ পৌরুষের আগুনেই সেই পতঙ্গিনী তার পাখা পুড়িয়েছে। আবেশের ধোঁওয়ায় যখন আমাকে আচ্ছন্ন করে তখন বিমলার মনও আবিষ্ট হয়, কিন্তু তখন ওর মনে ঘৃণা জন্মে ; তখন আমার গলা থেকে ওর স্বয়ম্বরের মালা ফিরিয়ে নিতে পারে না বটে, কিন্তু সেটা দেখে ও চোখ বুজতে চায়।

কিন্তু ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের দুজনেরই। বিমলাকে যে ছাড়তে পারব এমন শক্তিও নিজের মধ্যে দেখছি নে। তাই বলে নিজের পথটাও আমি ছাড়তে পারব না। আমার পথ লোকের ভিড়ের পথ ; এই অন্তঃপুরের খিড়কির দরজার পথ নয়। আমি আমার স্বদেশকে ছাড়তে পারব না, বিশেষত আজকের দিনে ; বিমলাকে আজ আমি আমার স্বদেশের সঙ্গে মিশিয়ে নেব। যে পশ্চিমের ঝড়ে আমার স্বদেশলক্ষ্মীর মুখের উপর থেকে ন্যায়-অন্যায়ের ঘোমটা উড়ে গেছে সেই ঝড়েই বিমলার মুখে বধূর ঘোমটা খুলবে— সেই অনাবরণে তার অগৌরব থাকবে না। জনসমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দুলবে তরী, উড়বে তাতে 'বন্দেমাতরং' জয়পতাকা, চারি দিকে গর্জন আর ফেনা— সেই নৌকোই একসঙ্গে আমাদের শক্তির দোলা আর প্রেমের দোলা। বিমলা সেখানে মুক্তির এমন একটা বিরাট রূপ দেখবে যে তার দিকে চেয়ে তার সকল বন্ধন বিনা লজ্জায় এক সময়ে নিজের অগোচরে খসে যাবে। এই প্রলয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে ওর এক মুহূর্তের জন্যে বাধবে না। যে নিষ্ঠুরতাই প্রকৃতির সহজ শক্তি সেই পরমাসুন্দরী নিষ্ঠুরতার মূর্তি আমি বিমলার মধ্যে দেখেছি। মেয়েরা যদি

পুরুষের কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেত তা হলে পৃথিবীতে কালীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেতুম— সেই দেবী নির্লজ্জ, সে নির্দয়। আমি সেই কালীর উপাসক ; বিমলাকে সেই প্রলয়ের মাঝখানে টেনে নিয়ে আমি একদিন কালীর উপাসনা করব। এবার তারই আয়োজন করি।

নিখিলেশের আত্মকথা

ভাদ্রের বন্যায় চারি দিক টলমল করছে ; কচি ধানের আভা যেন কচি ছেলের কাঁচা দেহের লাবণ্য। আমাদের বাড়ির বাগানের নীচে পর্যন্ত জল এসেছে। সকালের রৌদ্রটি এই পৃথিবীর উপরে একেবারে অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, নীল আকাশের ভালোবাসার মতো।

আমি কেন গান গাইতে পারি নে! খালের জল ঝিল্‌মিল্‌ করছে, গাছের পাতা ঝিক্‌মিক্‌ করছে, ধানের খেত ক্ষণে ক্ষণে শিউরে শিউরে চিক্‌চিকিয়ে উঠছে— এই শরতের প্রভাতসংগীতে আমিই কেবল বোবা! আমার মধ্যে সুর অবরুদ্ধ ; আমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত উজ্জ্বলতা আটকা পড়ে যায়, ফিরে যেতে পায় না। আমার এই প্রকাশহীন দীপ্তিহীন আপনাকে যখন দেখতে পাই তখন বুঝতে পারি পৃথিবীতে কেন আমি বঞ্চিত। আমার সঙ্গ দিনরাত্রি কেউ সইতে পারবে কেন!

বিমল যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা। সেইজন্যে এই ন বছরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যে সে আমার কাছে পুরোনো হয় নি। কিন্তু আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে সে কেবল বোবা গভীরতা, সে তো কলধ্বনিত বেগ নয়। আমি কেবল গ্রহণ করতেই পারি, কিন্তু নাড়া দিতে পারি নে। আমার সঙ্গ মানুষের পক্ষে উপবাসের মতো ; বিমল এতদিন যে কী দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ছিল তা আজকের ওকে দেখে বুঝতে পারছি। দোষ দেব কাকে?

হায় রে—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

আমার মন্দির যে শূন্য থাকবার জন্যেই তৈরি, ওর যে দরজা বন্ধ। আমার যে দেবতা ছিল সে মন্দিরের বাইরেই বসে ছিল, এতকাল তা বুঝতে পারি নি। মনে করেছিলুম অর্ঘ্য সে নিয়েছে, বরও সে দিয়েছে— কিন্তু শূন্য মন্দির মোর, শূন্য মন্দির মোর।

প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে পৃথিবীর এই ভরা যৌবনে আমরা দুজনে শুক্লপক্ষে আমাদের শামলদহ'র বিলে বোটে করে বেড়াতে যেতুম। কৃষ্ণাপঞ্চমীতে যখন সন্ধ্যাবেলাকার জ্যোৎস্না ফুরিয়ে গিয়ে একেবারে তলায় এসে ঠেকত তখন আমরা বাড়ি ফিরে আসতুম। আমি বিমলকে বলতুম, গানকে বারে বারে আপন ধুয়োয় ফিরে আসতে হয় ; জীবনে মিলনসংগীতের ধুয়োই হচ্ছে এইখানে, এই খোলা প্রকৃতির মধ্যে ; এই ছল্‌ছল্‌-করা জলের উপরে যেখানে 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ', যেখানে শ্যামল পৃথিবী মাথায় ছায়ার ঘোমটা টেনে নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় কূলে কূলে কান পেতে সারারাত আড়ি পাতছে— সেইখানেই স্ত্রীপুরুষের প্রথম চার চক্ষের মিলন হয়েছিল, দেয়ালের মধ্যে নয়— তাই এখানে আমরা একবার করে সেই আদিযুগের প্রথম মিলনের ধুয়োর মধ্যে ফিরে আসি, যে মিলন হচ্ছে হরপার্বতীর মিলন, কৈলাসে মানস-সরোবরের পদ্মবনে। আমার বিবাহের পর দু বছর কলকাতায় পরীক্ষার হাঙ্গামে কেটেছে ; তার পরে আজ এই সাত বছর প্রতি ভাদ্রমাসের চাঁদ আমাদের সেই জলের বাসরঘরে বিকশিত কুমুদবনের ধারে তার নীরব শুভশঙ্খ বাজিয়ে এসেছে। জীবনের সেই এক সপ্তক এমনি করে কাটল। আজ দ্বিতীয় সপ্তক আরম্ভ হয়েছে।

ভাদ্রের সেই শুক্লপক্ষ এসেছে, সে কথা আমি তো কিছুতেই ভুলতে পারছি নে। প্রথম তিন দিন তো কেটে গেল ; বিমলের মনে পড়েছে কি না জানি নে, কিন্তু মনে করিয়ে দিল না। সব একেবারে

চুপ হয়ে গেল, গান থেমে গেছে।

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

বিরহে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দিরের শূন্যতার মধ্যেও বাঁশি বাজে ; কিন্তু বিচ্ছেদে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দির বড়ো নিস্তব্ধ, সেখানে কান্নার শব্দও বেসুরো শোনায়।

আজ আমার কান্না বেসুরো লাগছে। এ কান্না আমার থামাতেই হবে। আমার এই কান্না দিয়ে বিমলকে আমি বন্দী করে রাখব এমন কাপুরুষ যেন আমি না হই। ভালোবাসা যেখানে একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছে সেখানে কান্না যেন সেই মিথ্যাকে বাঁধতে না চায়। যতক্ষণ আমার বেদনা প্রকাশ পাবে ততক্ষণ বিমল একেবারে মুক্তি পাবে না।

কিন্তু তাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দেব, নইলে মিথ্যার হাত থেকে আমিও মুক্তি পাব না। আজ তাকে আমার সঙ্গে বেঁধে রাখা নিজেকেই মায়ার জালে জড়িয়ে রাখা মাত্র। তাতে কারও কিছুই মঙ্গল নেই, সুখ তো নেইই। ছুটি দাও, ছুটি নাও— দুঃখ বুকের মানিক হবে যদি মিথ্যা থেকে খালাস পেতে পার।

আমার মনে হচ্ছে যেন এইবার আমি একটা জিনিস বুঝতে পারার কিনারায় এসেছি। স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসাটাকে সকলে মিলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তার স্বাভাবিক অধিকার ছাড়িয়ে এত দূর পর্যন্ত তাকে বাড়িয়ে তুলেছি যে, আজ তাকে সমস্ত মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়েও বশে আনতে পারছি নে। ঘরের প্রদীপকে ঘরের আগুন করে তুলেছি। এখন তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়, তাকে অবজ্ঞা করবার দিন এসেছে। প্রবৃত্তির হাতের পূজা পেয়ে পেয়ে সে দেবীর রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে ; কিন্তু তার সামনে পুরুষের পৌরুষ বলি দিয়ে তাকে রক্তপান করাতে হবে এমন পূজা আমরা মানব না। সাজে-সজ্জায় লজ্জা-শরমে গানে-গল্পে হাসি-কান্নায় যে ইন্দ্রজাল সে তৈরি করেছে তাকে ছিন্ন করতে হবে।

কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যের উপর বরাবর আমার একটা ঘৃণা আছে। পৃথিবীর সমস্ত ফুলের সাজি, সমস্ত ফলের ডালি কেবলমাত্র প্রেয়সীর পায়ের কাছে পড়ে পঞ্চশরের পূজার উপচার জোগাচ্ছে, জগতের আনন্দলীলাকে এমন করে ক্ষুণ্ণ করতে মানুষ পারে কী করে? এ কোন্ মদের নেশায় কবির চোখ ঢুলে পড়েছে? আমি যে মদ এতদিন পান করছিলুম তার রঙ এত লাল নয়, কিন্তু তার নেশা তো এমনিই তীব্র। এই নেশার ঝোঁকেই আজ সকাল থেকে গুন্ গুন্ করে মরছি—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

শূন্য মন্দির! বলতে লজ্জা করে না? এত বড়ো মন্দির কিসে তোমার শূন্য হল? একটা মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জেনেছি, তাই বলে জীবনের সমস্ত সত্য আজ উজাড় হয়ে গেল?

শোবার ঘরের শেলফ থেকে একটা বই আনতে আজ সকালে গিয়েছিলুম। কতদিন দিনের বেলায় আমার শোবার ঘরে আমি ঢুকি নি। আজ দিনের আলোতে ঘরের দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল! সেই আন্‌লাটিতে বিমলের কোঁচানো শাড়ি পাকানো রয়েছে, এক কোণে তার ছাড়া শেমিজ আর জামা ধোবার জন্য অপেক্ষা করছে। আয়নার টেবিলের উপর তার চুলের কাঁটা, মাথার তেল, চিরুনি, এসেন্সের শিশি, সেইসঙ্গে সিঁদুরের কৌটোটিও! টেবিলের নীচে তার ছোট্ট সেই একজোড়া জরি-দেওয়া চটিজুতো— একদিন যখন বিমল কোনোমতেই জুতো পরতে চাইত না সেই সময়ে আমি ওর জন্যে আমার এক লক্ষ্ণৌয়ের সহপাঠী মুসলমান বন্ধুর যোগে এই জুতো আনিয়ে দিয়েছিলুম। কেবলমাত্র শোবার ঘর থেকে আর ঐ বারান্দা পর্যন্ত এই জুতো পরে যেতে সে লজ্জায় মরে গিয়েছিল। তার পরে বিমল অনেক জুতো ক্ষয় করেছে, কিন্তু এই চটিজোড়াটি সে আদর করে রেখে দিয়েছে। আমি তাকে ঠাট্টা করে বলেছিলুম, যখন ঘুমিয়ে থাকি লুকিয়ে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে তুমি আমার পুজো কর, আমি তোমার পায়ের ধুলো নিবারণ করে আজ আমার এই জাগ্রত দেবতার পুজো করতে এসেছি। বিমল বললে, যাও, তুমি অমন করে বোলো না, তা হলে কক্‌খনো ও

জুতো পরব না।— এই আমার চির-পরিচিত শোবার ঘর। এর একটি গন্ধ আছে যা আমার সমস্ত হৃদয় জানে, আর বোধ হয় কেউ তা পায় না। এই-সমস্ত অতি ছোটো ছোটো জিনিসের মধ্যে আমার রসপিপাসু হৃদয় তার কত যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় মেলে রয়েছে তা আজ যেমন করে অনুভব করলুম তেমন আর কোনোদিন করি নি। কেবল মূল শিকড়টি কাটা পড়লেই যে প্রাণ ছুটি পায় তা তো নয়, ঐ চটিজোড়াটা পর্যন্ত তাকে টেনে ধরতে চায়। সেইজন্যই তো লক্ষ্মী ত্যাগ করলেও তাঁর ছিন্নপদ্মের পাপড়িগুলোর চারি দিকে মন এমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। দেখতে দেখতে হঠাৎ কুলুঙ্গিটার উপর চোখ পড়ল। দেখি আমার সেই ছবি তেমনিই রয়েছে, তার সামনে অনেক দিনের শুকনো কালো ফুল পড়ে আছে। এমনতরো পূজার বিকারেও ছবির মুখে কোনো বিকার নেই। এ ঘর থেকে এই শুকিয়ে-যাওয়া কালো ফুলই আজ আমার সত্য উপহার। এরা যে এখনো এখানে আছে তার কারণ, এদের ফেলে দেওয়ারও দরকার নেই। যাই হোক, সত্যকে আমি তার এই নীরস কালো মূর্তিতেই গ্রহণ করলুম— কবে সেই কুলুঙ্গির ভিতরকার ছবিটারই মতো নির্বিকার হতে পারব ?

এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে বিমল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেলফের দিকে যেতে যেতে বললুম, আমিয়েল্‌স্‌ জর্নাল বইখানা নিতে এসেছি। এই কৈফিয়ৎটুকু দেবার কী যে দরকার ছিল তা তো জানি নে। কিন্তু এখানে আমি যেন অপরাধী, যেন অনধিকারী, যেন এমন-কিছুর মধ্যে চোখ দিতে এসেছি যা লুকানো, যা লুকিয়ে থাকবারই যোগ্য। বিমলের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলুম।

বাইরে আমার ঘরে বসে যখন বই পড়া অসম্ভব হয়ে উঠল, যখন জীবনের যা-কিছু সমস্তই যেন অসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো— কিছু দেখতে বা শুনতে, বলতে বা করতে লেশমাত্র আর প্রবৃত্তি রইল না— যখন আমার সমস্ত ভবিষ্যতের দিন সেই একটা মুহূর্তের মধ্যে জমাট হয়ে অচল হয়ে আমার বুকের উপর পাথরের মতো চেপে বসল, ঠিক সেই সময়ে পঞ্চু একটা ঝুড়িতে গোটাকতক ঝুনো নারকেল নিয়ে আমার সামনে রেখে গড় হয়ে প্রণাম করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, একি পঞ্চু ? এ কেন ?

পঞ্চু আমার প্রতিবেশী জমিদার হরিশ কুণ্ডুর প্রজা, মাস্টারমশায়ের যোগে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। একে আমি তার জমিদার নই, তার উপর সে গরিবের একশেষ, ওর কাছ থেকে কোনো উপহার গ্রহণ করবার অধিকার আমার নেই। মনে ভাবছিলুম বেচারা বোধ হয় আজ নিরুপায় হয়ে বকশিশের ছলে অন্নসংগ্রহের এই পন্থা করেছে।

পকেটের টাকার থলি থেকে দুটো টাকা বের করে যখন ওকে দিতে যাচ্ছি তখন ও জোড়হাত করে বললে, না হুজুর, নিতে পারব না।

সেকি পঞ্চু ?

না, তবে খুলে বলি। বড়ো টানাটানির সময় একবার হুজুরের সরকারি বাগান থেকে আমি নারকেল চুরি করেছিলুম। কোন্‌দিন মরব, তাই শোধ করে দিতে এসেছি।

আমিয়েল্‌স্‌ জর্নাল পড়ে আজ আমার কোনো ফল হত না, কিন্তু পঞ্চুর এই এক কথায় আমার মন খোলসা হয়ে গেল। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখদুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন ; তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসিকান্নার পরিমাপ করি।

পঞ্চু আমার মাস্টারমশায়ের একজন ভক্ত। কেমন করে এর সংসার চলে তা আমি জানি। রোজ ভোরে উঠে একটা চাঙারিতে করে পান দোক্তা রঙিন সুতো, আয়না চিরুনি প্রভৃতি চাষার মেয়েদের লোভনীয় জিনিস নিয়ে হাঁটু-জল ভেঙে বিল পেরিয়ে সে নমঃশূদ্রদের পাড়ায় যায় ; সেখানে এই জিনিসগুলোর বদলে মেয়েদের কাছ থেকে ধান পায়। তাতে পয়সার চেয়ে কিছু বেশি পেয়ে থাকে। যেদিন সকাল সকাল ফিরতে পারে সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাতাসাওয়ালার দোকানে বাতাসা কাটতে যায়। সেখান থেকে ফিরে বাড়ি এসে শাঁখা তৈরি করতে বসে— তাতে প্রায় রাত দুপুর হয়ে

যায়। এমন বিষম পরিশ্রম করেও বছরের মধ্যে কেবল কয়েক মাস ছেলেপুলে নিয়ে দু-বেলা দু-মুঠো খাওয়া চলে। তার আহারের নিয়ম এই যে, খেতে বসেই সে একঘটি জল খেয়ে পেট ভরায়, আর তার খাদ্যের মস্ত একটা অংশ হচ্ছে সস্তা দামের বীজে-কলা। বছরে অন্তত চার মাস তার এক বেলার বেশি খাওয়া জোটে না।

আমি এক সময়ে একে কিছু দান করতে চেয়েছিলুম। মাস্টারমশায় আমাকে বললেন, তোমার দানের দ্বারা মানুষকে তুমি নষ্ট করতে পারো, দুঃখ নষ্ট করতে পারো না। আমাদের বাংলাদেশে পঞ্চু তো একলা নয়। সমস্ত দেশের স্তনে আজ দুধ শুকিয়ে এসেছে। সেই মাতার দুধ তুমি তো অমন করে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে জোগাতে পারবে না।

এই-সব কথা ভাববার কথা। স্থির করেছিলুম এই ভাবনাতেই প্রাণ দেব। সেদিন বিমলাকে এসে বললুম, বিমল, আমাদের দুজনের জীবন দেশের দুঃখের মূলচ্ছেদনের কাজে লাগাব।

বিমল হেসে বললে, তুমি দেখছি আমার রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, দেখো শেষে আমাকে ভাসিয়ে চলে যেয়ো না।

আমি বললুম, সিদ্ধার্থের তপস্যায় তাঁর স্ত্রী ছিলেন না, আমার তপস্যায় স্ত্রীকে চাই।

এমনি করে কথাটা হাসির উপর দিয়েই গেল। আসলে বিমল স্বভাবত যাকে বলে মহিলা। ও যদিও গরিবের ঘর থেকে এসেছে, কিন্তু ও রানী। ও জানে, যারা নীচের শ্রেণীর, তাদের সুখদুঃখ-ভালোমন্দর মাপকাঠি চিরকালের জন্যেই নীচের দরের। তাদের তো অভাব থাকবেই, কিন্তু সে অভাব তাদের পক্ষে অভাবই নয়। তারা আপনার হীনতার বেড়ার দ্বারাই সুরক্ষিত। যেমন ছোটো পুকুরের জল আপনার পাড়ির বাঁধনেই টিকে থাকে। পাড়িকে কেটে বড়ো করতে গেলেই তার জল ফুরিয়ে পাঁক বেরিয়ে পড়ে। যে আভিজাত্যের অভিমানে খুব ছোটো ছোটো ভাগের মধ্যে ভারতবর্ষ খুব ছোটো ছোটো গৌরবের আসন ঘের দিয়ে রেখেছে, যাতে করে ছোটো ভাগের হীনতার গণ্ডির মধ্যেও নিজের মাপ-অনুযায়ী একটা কৌলীন্য এবং স্বাতন্ত্র্যের গর্ব স্থান পায়, বিমলের রক্তে সেই অভিমান প্রবল। সে ভগবান মনুর দৌহিত্রী বটে। আমার মধ্যে বোধ হয় গুহক এবং একলব্যের রক্তের ধারাটাই প্রবল ; আজ যারা আমার নীচে রয়েছে তাদের নীচ বলে আমার থেকে একেবারে দূরে ঠেলে রেখে দিতে পারি নে। আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোক যত নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে।

বিমলকে আমার সাধনার মধ্যে পাই নি। আমার জীবনে আমি বিমলকে এতই প্রকাণ্ড করে তুলেছি যে, তাকে না পাওয়াতে আমার সাধনা ছোটো হয়ে গেছে। আমার জীবনের লক্ষ্যকে কোণে সরিয়ে দিয়েছি, বিমলকে জায়গা দিতে হবে ব'লে। তাতে করে হয়েছে এই যে, তাকেই দিনরাত সাজিয়েছি পরিয়েছি শিখিয়েছি, তাকেই চিরদিন প্রদক্ষিণ করেছি ; মানুষ যে কত বড়ো, জীবন যে কত মহৎ, সে কথা স্পষ্ট করে মনে রাখতে পারি নি।

তবু এর ভিতরেও আমাকে রক্ষা করেছেন আমার মাস্টারমশায় ; তিনিই আমাকে যতটা পেরেছেন বড়োর দিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, নইলে আজকের দিনে আমি সর্বনাশের মধ্যে তলিয়ে যেতুম। আশ্চর্য ঐ মানুষটি। আমি ওঁকে আশ্চর্য বলছি এইজন্যে যে, আজকের আমার এই দেশের সঙ্গে কালের সঙ্গে ওঁর এমন একটা প্রবল পার্থক্য আছে। উনি আপনার অন্তর্যামীকে দেখতে পেয়েছেন, সেইজন্যে আর কিছুতে ওঁকে ভোলাতে পারে না। আজ যখন আমার জীবনের দেনাপাওনার হিসাব করি তখন এক দিকে একটা মস্ত ঠিকে-ভুল, একটা বড়ো লোকসান ধরা পড়ে, কিন্তু লোকসান ছাড়িয়ে উঠতে পারে এমন একটি লাভের অঙ্ক আমার জীবনে আছে সে কথা যেন জোর করে বলতে পারি।

আমাকে যখন উনি পড়ানো শেষ করেছেন তার পূর্বেই পিতৃবিয়োগ হয়ে আমি স্বাধীন হয়েছি। আমি মাস্টারমশায়কে বললুম, আপনি আমার কাছেই থাকুন, অন্য জায়গায় কাজ করবেন না।

তিনি বললেন, দেখো, তোমাকে আমি যা দিয়েছি তার দাম পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি যা দিয়েছি তার দাম যদি নিই তা হলে আমার ভগবানকে হাটে বিক্রি করা হবে।

বরাবর তাঁর বাসা থেকে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে চন্দ্রনাথবাবু আমাকে পড়াতে এসেছেন, কোনোমতেই আমাদের গাড়িঘোড়া তাঁকে ব্যবহার করাতে পারলুম না। তিনি বলতেন, আমার বাবা চিরকাল বটতলা থেকে লালদিঘি পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আপিস করে আমাদের মানুষ করেছেন, শেয়ারের গাড়িতেও কখনো চাপেন নি, আমরা হচ্ছি পুরুষানুক্রমে পদাতিক।

আমি বললুম, নাহয় আমাদের বিষয়কর্মসংক্রান্ত একটা কাজ নিন।

তিনি বললেন, না বাবা, আমাকে তোমাদের বড়োমানুষির ফাঁদে ফেলো না, আমি মুক্ত থাকতে চাই।

তাঁর ছেলে এখন এম· এ· পাস করে চাকরি খুঁজছে। আমি বললুম, আমার এখানে তার একটা কাজ হতে পারে। ছেলেরও সেই ইচ্ছে খুব ছিল। প্রথমে সে তার বাপকে এই কথা জানিয়েছিল, সেখানে সুবিধে পায় নি। তখন লুকিয়ে আমাকে আভাস দেয়। তখনই আমি উৎসাহ করে চন্দ্রনাথবাবুকে বললুম। তিনি বললেন, না, এখানে তার কাজ হবে না— তাকে এতবড়ো সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাতে ছেলে বাপের উপর খুব রাগ করেছে। সে রেগে পত্নীহীন বুড়ো বাপকে একলা ফেলে রেঙুনে চলে গেল।

তিনি আমাকে বারবার বলেছেন, দেখো নিখিল, তোমার সম্বন্ধে আমি স্বাধীন, আমার সম্বন্ধে তুমি স্বাধীন, তোমার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ। কল্যাণের সম্বন্ধকে অর্থের অনুগত করলে পরমার্থের অপমান করা হয়।

এখন তিনি এখানকার এন্ট্রেন্স স্কুলের হেড্‌মাস্টারি করেন। এতদিন তিনি আমাদের বাড়িতে পর্যন্ত থাকতেন না। এই কিছুদিন থেকে আমি প্রায় সন্ধেবেলায় তাঁর বাসায় গিয়ে রাত্রি এগারোটা দুপুর পর্যন্ত নানা কথায় কাটিয়ে আসছিলুম। বোধ হয় ভাবলেন তাঁর ছোটো ঘর এই ভাদ্রমাসের গুমটে আমার পক্ষে ক্লেশকর, সেইজন্যেই তিনি নিজে আমার এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। আশ্চর্য এই, বড়োমানুষের 'পরেও তাঁর গরিবের মতোই সমান দয়া, বড়োমানুষের দুঃখকেও তিনি অবজ্ঞা করেন না।

বাস্তবকে যত একান্ত করে দেখি ততই সে আমাদের পেয়ে বসে, আভাসমাত্রে সত্যকে যখন দেখি তখনই মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগে। বিমল আজ আমার জীবনে সেই বাস্তবকেই এত বেশি তীব্র করে তুলেছে যে, সত্য আমার পক্ষে আজ আচ্ছন্ন হবার জো হয়েছে। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আমার দুঃখের আর সীমা খুঁজে পাচ্ছি নে। তাই আজ আমার এতটুকু ফাঁককে লোকলোকান্তরে ছড়িয়ে দিয়ে শরতের সমস্ত সকাল ধরে গান গাইতে বসেছি—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

যখন চন্দ্রনাথবাবুর জীবনের বাতায়ন থেকে সত্যকে দেখতে পাই তখন ও গানের মানে একেবারেই বদলে যায়, তখন—

বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোয়াঁয়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া?

যত দুঃখ যত ভুল সব যে ঐ সত্যকে না পেয়ে। সেই সত্যকে জীবন ভরে না নিয়ে দিন রাত এমন করে কেমনে কাটবে? আর তো পারি নে, সত্য, তুমি এবার আমার শূন্য মন্দির ভরে দাও।

বিমলার আত্মকথা

সেই সময়ে হঠাৎ সমস্ত বাংলাদেশের চিত্ত যে কেমন হয়ে গেল তা বলতে পারি নে। ষাট হাজার সগরসন্তানের ছাইয়ের 'পরে এক মুহূর্তে যেন ভাগীরথীর জল এসে স্পর্শ করলে। কত যুগযুগান্তরের ছাই, রসাতলে পড়ে ছিল— কোনো আগুনের তাপে জ্বলে না, কোনো রসের মিশালে দানা বাঁধে না— সেই ছাই হঠাৎ একেবারে কথা কয়ে উঠল; বললে: এই-যে আমি!

বইয়ে পড়েছি, গ্রীস দেশের কোন্ মূর্তিকর দেবতার বরে আপনার মূর্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, কিন্তু সেই রূপের থেকে প্রাণের মধ্যে একটা ক্রমশ বিকাশ, একটা সাধনার যোগ আছে; কিন্তু আমাদের দেশের শ্মশানের ভস্মরাশির মধ্যে সেই রূপের ঐক্য ছিল কোথায়? সে যদি পাথরের মতো আঁট শক্ত জিনিস হত তা হলেও তো বুঝতুম— অহল্যা পাষাণীও তো একদিন মানুষ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ যে সব ছড়ানো, এ যে সৃষ্টিকর্তার মুঠোর ফাঁক দিয়ে কেবলই গলে গলে পড়ে, বাতাসে উড়ে উড়ে যায়, এ যে রাশ হয়ে থাকে, কিছুতে এক হয় না। অথচ সেই জিনিস হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরের আঙিনার কাছে এসে মেঘগর্জনে বলে উঠল: অয়মহং ভোঃ!

তাই আমাদের সেদিন মনে হল, এ সমস্তই অলৌকিক। এই বর্তমান মুহূর্ত কোনো সুধারসোন্মত্ত দেবতার মুকুটের থেকে মানিকের মতো একেবারে আমাদের হাতের উপর খসে পড়ল; আমাদের অতীতের সঙ্গে আমাদের এই বর্তমানের কোনো স্বাভাবিক পারম্পর্য নেই। এ দিনটি আমাদের সেই ওষুধের মতো যা খুঁজে বের করি নি, যা কিনে আনি নি, যা কোনো চিকিৎসকের কাছ থেকে পাওয়া নয়, যা আমাদের স্বপ্নলব্ধ।

সেইজন্যে মনে হল, আমাদের সব দুঃখ সব তাপ আপনি মন্ত্রে সেরে যাবে। সম্ভব-অসম্ভবের কোনো সীমা কোথাও রইল না। কেবলই মনে হতে লাগল, এই হল ব'লে, হল ব'লে।

আমাদের সেদিন মনে হয়েছিল, ইতিহাসের কোনো বাহন নেই, পুষ্পকরথের মতো সে আপনি চলে আসে। অন্তত তার মাতলিকে কোনো মাইনে দিতে হয় না, তার খোরাকির জন্য কোনো ভাবনা নেই, কেবল ক্ষণে ক্ষণে তার মদের পেয়ালা ভর্তি করে দিতে হয়— আর তার পরেই হঠাৎ একেবারে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি।

আমার স্বামী যে অবিচলিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনার মধ্যে তাঁকে যেন একটা বিষাদ এসে আঘাত করত। যেটা সামনে দেখা যাচ্ছে তার উপর দিয়েও তিনি যেন আর একটা-কিছুকে দেখতে পেতেন। মনে আছে সন্দীপের সঙ্গে তর্কে তিনি একদিন বলেছিলেন, সৌভাগ্য হঠাৎ এসে আমাদের দরজার কাছে হাঁক দিয়ে যায় কেবল দেখাবার জন্যে যে তাকে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের নেই, তাকে ঘরের মধ্যে নিমন্ত্রণ করে বসাবার কোনো আয়োজন আমরা করি নি।

সন্দীপ বললেন, দেখো নিখিল, তুমি দেবতাকে মান না, সেইজন্যেই এমন নাস্তিকের মতো কথা কও। আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি দেবী বর দিতে এসেছেন, আর তুমি অবিশ্বাস করছ?

আমার স্বামী বললেন, আমি দেবতাকে মানি, সেইজন্যেই অন্তরের মধ্যে নিশ্চিত জানি তাঁর পূজা আমরা জোটাতে পারলুম না। বর দেবার শক্তি দেবতার আছে, কিন্তু বর নেবার শক্তি আমাদের থাকা চাই।

আমার স্বামীর এইরকমের কথায় আমার ভারি রাগ হত। আমি তাঁকে বললুম, তুমি মনে কর দেশের এই উদ্দীপনা এ কেবলমাত্র একটা নেশা। কিন্তু নেশায় কি শক্তি দেয় না?

তিনি বললেন, শক্তি দেয়, কিন্তু অস্ত্র দেয় না।

আমি বললুম, শক্তি দেবতা দেন, সেইটেই দুর্লভ, আর অস্ত্র তো সামান্য কামারেও দিতে পারে।

স্বামী হেসে বললেন, কামার তো অমনি দেয় না, তাকে দাম দিতে হয়।

সন্দীপ বুক ফুলিয়ে বললেন, দাম দেব গো দেব।

স্বামী বললেন, যখন দেবে তখন আমি উৎসবের রোশনচৌকি বায়না দেব।

সন্দীপ বললেন, তোমার বায়নার আশায় আমরা বসে নেই। আমাদের নিকড়িয়া উৎসব কড়ি দিয়ে কিনতে হবে না।

বলে তিনি তাঁর ভাঙা মোটা গলায় গান ধরলেন—

আমার নিকড়িয়া রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে
নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন সুরে।

আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, মক্ষীরানী, গান যখন প্রাণে আসে তখন গলা না থাকলেও যে বাধে না এইটে প্রমাণ করে দেবার জন্যেই গাইলুম। গলার জোরে গাইলে গানের জোর হালকা হয়ে যায়। আমাদের দেশে হঠাৎ ভরপুর গান এসে পড়েছে, এখন নিখিল বসে বসে গোড়া থেকে সারগম সাধতে থাকুক, ইতিমধ্যে আমরা ভাঙা গলায় মাতিয়ে তুলব।

আমার ঘর বলে, তুই কোথায় যাবি,
বাইরে গিয়ে সব খোয়াবি—
আমার প্রাণ বলে, তোর যা আছে সব
যাক-না উড়ে পুড়ে।

আচ্ছা, নাহয় আমাদের সর্বনাশই হবে, তার বেশি তো নয়? রাজি আছি, তাতেই রাজি আছি।

ওগো, যায় যদি তো যাক-না চুকে,
সব হারাব হাসিমুখে,
আমি এই চলেছি মরণসুধা
নিতে পরান পুরে।

আসল কথা হচ্ছে নিখিল, আমাদের মন ভুলেছে, আমরা সুসাধ্য-সাধনের গণ্ডির মধ্যে টিকতে পারব না, আমরা অসাধ্য-সাধনের পথে বেরিয়ে পড়ব।

ওগো, আপন যারা কাছে টানে
এ রস তারা কেই বা জানে,
আমার বাঁকা পথের বাঁকা সে যে
ডাক দিয়েছে দূরে।
এবার বাঁকার টানে সোজার বোঝা
পড়ুক ভেঙে-চুরে।

মনে হল আমার স্বামীর কিছু বলবার আছে, কিন্তু তিনি বললেন না, আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

সমস্ত দেশের উপর এই যে একটা প্রবল আবেগ হঠাৎ ভেঙে পড়ল, ঠিক এই জিনিসটাই আমার জীবনের মধ্যে আর-এক সুর নিয়ে ঢুকেছিল। আমার ভাগ্যদেবতার রথ আসছে, কোথা থেকে তার সেই চাকার শব্দে দিনরাত্রি আমার বুকের ভিতর গুর-গুর করছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল একটা-কী পরমাশ্চর্য এসে পড়ল ব'লে, তার জন্যে আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। পাপ? যে ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্য, যে ক্ষেত্রে বিচার-বিবেক, যে ক্ষেত্রে দয়া-মায়া, সে ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ সরে যাবার পথ হঠাৎ আপনিই যে খুলে গেছে। আমি তো একে কোনোদিন কামনা করি নি, এর জন্যে প্রত্যাশা করে বসে থাকি নি, আমার সমস্ত জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখো এর জন্যে আমার তো কোনো জবাবদিহি নেই। এতদিন একমনে আমি যার পূজা করে এলুম, বর দেবার বেলা এ যে এল আর-এক দেবতা! তাই, সমস্ত দেশ যেমন জেগে উঠে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছে 'বন্দে মাতরং' আমার প্রাণ তেমনি করে তার সমস্ত শিরা-উপশিরার কুহরে কুহরে আজ বাজিয়ে তুলেছে 'বন্দে'— কোন্ অজানাকে, অপূর্বকে, কোন্ সকল-সৃষ্টি-ছাড়াকে!

দেশের সুরের সঙ্গে আমার জীবনের সুরের অদ্ভুত এই মিল! এক-একদিন অনেক রাত্রে আস্তে আস্তে আমার বিছানা থেকে উঠে খোলা ছাদের উপর দাঁড়িয়েছি। আমাদের বাগানের পাঁচিল পেরিয়ে আধপাকা ধানের খেত, তার উত্তরে গ্রামের ঘন গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নদীর জল এবং তারও

পরপারে বনের রেখা, সমস্তই যেন বিরাট রাত্রির গর্ভের মধ্যে কোন্‌-এক ভাবী সৃষ্টির ভ্রূণের মতো অস্ফুট আকারে ঘুমিয়ে রয়েছে। আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেয়েছি, আমার দেশ দাঁড়িয়ে আছে আমারই মতো একটি মেয়ে। সে ছিল আপন আঙিনার কোণে, আজ তাকে হঠাৎ অজানার দিকে ডাক পড়েছে। সে কিছুই ভাববার সময় পেলে না, সে চলেছে সামনের অন্ধকারে ; একটা দীপ জ্বেলে নেবারও সবুর তার সয় নি। আমি জানি, এই সুপ্তরাত্রে তার বুক কেমন করে উঠছে পড়ছে। আমি জানি, যে দূর থেকে বাঁশি ডাকছে ওর সমস্ত মন এমনি করে সেখানে ছুটে গেছে যে ওর মনে হচ্ছে যেন পেয়েছি, যেন পৌঁচেছি, যেন এখন চোখ বুজে চললেও কোনো ভয় নেই। না, এ তো মাতা নয়। সন্তানকে স্তন দিতে হবে, অন্ধকারের প্রদীপ জ্বালাতে হবে, ঘরের ধুলো ঝাঁট দিতে হবে, সে কথা তো এর খেয়ালে আসে না। এ আজ অভিসারিকা। এ আমাদের বৈষ্ণব-পদাবলীর দেশ। এ ঘর ছেড়েছে, কাজ ভুলেছে। এর আছে কেবল অন্তহীন আবেগ ; সেই আবেগে সে চলেছে মাত্র, কিন্তু পথে কি কোথায় সে কথা তার মনেও নেই। আমিও সেই অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা। আমি ঘরও হারিয়েছি, পথও হারিয়েছি। উপায় এবং লক্ষ্য দুইই আমার কাছে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে, কেবল আছে আবেগ আর চলা। ওরে নিশাচরী, রাত যখন রাঙা হয়ে পোহাবে তখন ফেরবার পথের যে চিহ্নও দেখতে পাবি নে। কিন্তু ফিরব কেন, মরব। যে কালো অন্ধকার বাঁশি বাজালো সে যদি আমার সর্বনাশ করে, কিছুই যদি সে আমার বাকি না রাখে, তবে আর আমার ভাবনা কিসের ? সব যাবে ; আমার কণাও থাকবে না, চিহ্নও থাকবে না, কালোর মধ্যে আমার সব কালো একেবারে মিশিয়ে যাবে ; তার পরে কোথায় ভালো কোথায় মন্দ, কোথায় হাসি কোথায় কান্না !

সেদিন বাংলাদেশে সময়ের কলে পুরো ইস্টিম দেওয়া হয়েছিল। তাই যা সহজে হবার নয় তা দেখতে দেখতে ধাঁ ধাঁ করে হয়ে উঠছিল। বাংলাদেশের যে কোণে আমরা থাকি এখানেও কিছুই আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না এমনি মনে হতে লাগল। এতদিন আমাদের এ দিকে বাংলাদেশের অন্য অংশের চেয়ে বেগ কিছু কম ছিল। তার প্রধান কারণ, আমার স্বামী বাইরের দিক থেকে কারও উপর কোনো চাপ দিতে চান না। তিনি বলতেন, দেশের নামে ত্যাগ যারা করবে তারা সাধক, কিন্তু দেশের নামে উপদ্রব যারা করবে তারা শত্রু ; তারা স্বাধীনতার গোড়া কেটে স্বাধীনতার আগায় জল দিতে চায়।

কিন্তু সন্দীপবাবু যখন এখানে এসে বসলেন তার চেলারা চার দিক থেকে আনাগোনা করতে লাগল, মাঝে মাঝে হাটে বাজারে বক্তৃতাও হতে থাকল, তখন এখানেও ঢেউ উঠতে লাগল। একদল স্থানীয় যুবক সন্দীপের সঙ্গে জুটে গেল। তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা গ্রামের কলঙ্ক। উৎসাহের দীপ্তির দ্বারা তারাও ভিতরে বাহিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এটা বেশ বোঝা গেল, দেশের হাওয়ার মধ্যে যখন আনন্দ বইতে থাকে তখন মানুষের বিকৃতি আপনি সেরে যায়। মানুষের পক্ষে সুস্থ সরল সবল হওয়া বড়ো কঠিন যখন দেশে আনন্দ না থাকে।

এই সময়ে সকলের চোখে পড়ল আমার স্বামীর এলাকা থেকে বিলিতি নুন, বিলিতি চিনি, বিলিতি কাপড় এখনো নির্বাসিত হয় নি। এমন-কি, আমার স্বামীর আমলারা পর্যন্ত এই নিয়ে চঞ্চল এবং লজ্জিত হয়ে উঠতে লাগল। অথচ কিছুদিন পূর্বে আমার স্বামী যখন এখানে স্বদেশী জিনিসের আমদানি করেছিলেন তখন এখানকার ছেলেবুড়ো সকলেই তা নিয়ে মনে মনে এবং প্রকাশ্যে হাসাহাসি করেছিল। দিশি জিনিসের সঙ্গে যখন আমাদের স্পর্ধার যোগ ছিল না তখন তাকে আমরা মনেপ্রাণে অবজ্ঞা করেছি। এখনো আমার স্বামী তাঁর সেই দিশি ছুরিতে দিশি পেন্সিল কাটেন, খাগড়ার কলমে লেখেন, পিতলের ঘটিতে জল খান এবং সন্ধ্যার সময়ে শামাদানে দিশি বাতি জ্বালিয়ে লেখাপড়া করেন ; কিন্তু তাঁর এই অত্যন্ত সাদা ফিকে রঙের স্বদেশীতে আমরা মনের মধ্যে কোনো রস পাই নি। বরঞ্চ তখন তাঁর বসবার ঘরে আসবাবের দৈন্যে আমি বরাবর লজ্জা বোধ করে এসেছি, বিশেষত বাড়িতে যখন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা আর-কোনো সাহেব-সুবোর সমাগম হত। আমার স্বামী হেসে বলতেন, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি অত বিচলিত হচ্ছ কেন ?

আমি বলতুম, ওরা যে আমাদের অসভ্য অজবুগ মনে করে যাবে।

তিনি বলতেন, তা যখন মনে করবে তখন আমিও এই কথা মনে করব ওদের সভ্যতা চামড়ার উপরকার সাদা পালিশ পর্যন্ত, বিশ্বমানুষের ভিতরকার লাল রক্তধারা পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

ওঁর ডেস্কে একটি সামান্য পিতলের ঘটিকে উনি ফুলদানি করে ব্যবহার করতেন। কতদিন কোনো সাহেব আসবার খবর পেলে আমি লুকিয়ে সেটিকে সরিয়ে বিলিতি রঙিন কাচের ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রেখেছি।

আমার স্বামী বলতেন, দেখো বিমল, ফুলগুলি যেমন আত্মবিস্মৃত আমার এই পিতলের ঘটিটিও তেমনি। কিন্তু তোমার ঐ বিলিতি ফুলদানি অত্যন্ত বেশি করে জানায় যে ও ফুলদানি, ওতে গাছের ফুল না রেখে পশমের ফুল রাখা উচিত।

তখন এ সম্বন্ধে তার একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন মেজোরানী। তিনি একেবারে হাঁপিয়ে এসে বলতেন, ঠাকুরপো, শুনেছি আজকাল দিশি সাবান উঠেছে নাকি— আমাদের তো ভাই, সাবান মাখার দিন উঠেই গেছে, তবে ওতে যদি চর্বি না থাকে তা হলে মাখতে পারি। তোমাদের বাড়িতে এসে অবধি ঐ এক অভ্যেস হয়ে গেছে। অনেকদিন তো ছেড়েই দিয়েছি, তবু সাবান না মেখে আজও মনে হয় যেন স্নানটা ঠিকমত হল না।

এতেই আমার স্বামী ভারি খুশি। বাক্স বাক্স দিশি সাবান আসতে লাগল। সে কি সাবান না সাজিমাটির ডেলা ? আমি বুঝি জানি নে ? স্বামীর আমলে মেজোরানী যে বিলিতি সাবান মাখতেন আজও সমানে তাই চলেছে, একদিনও কামাই নেই। ঐ দিশি সাবান দিয়ে তাঁর কাপড়-কাচা চলতে লাগল।

আর-একদিন এসে বললেন, ভাই ঠাকুরপো, দিশি কলম নাকি উঠেছে, সে তো আমার চাই। মাথা খাও, আমাকে এক বান্ডিল—

ঠাকুরপো মহা উৎসাহিত। কলমের নাম ধরে যত রকমের দাঁতনের কাঠি তখন বেরিয়েছিল সব মেজোরানীর ঘর বোঝাই হতে লাগল। ওতে ওঁর কোনো অসুবিধা ছিল না, কেননা লেখাপড়ার সম্পর্ক ওঁর ছিল না বললেই হয়। ধোবার বাড়ির হিসেব শজনের ডাঁটা দিয়ে লেখাও চলে। তাও দেখেছি লেখবার বাক্সের মধ্যে ওঁর সেই পুরোনো কালের হাতির দাঁতের কলমটি আছে, যখন কালেভদ্রে লেখার শখ যায় তখন ঠিক সেইটেরই উপরে হাত পড়ে।

আসল কথা, আমি যে আমার স্বামীর খেয়ালে যোগ দিই নে, সেইটের কেবল জবাব দেবার জন্যেই উনি এই কাণ্ডটি করতেন। অথচ আমার স্বামীকে ওঁর এই ছলনার কথা বলবার জো ছিল না। বলতে গেলেই তিনি এমন মুখ করে চুপ করে থাকতেন যে বুঝতুম যে, উল্টো ফল হল। এ-সব মানুষকে ঠকানোর হাত থেকে বাঁচাতে গেলেই ঠকতে হয়।

মেজোরানী সেলাই ভালোবাসেন ; একদিন যখন সেলাই করছেন তখন আমি স্পষ্টই তাঁকে বললুম, এ তোমার কী কাণ্ড ! এ দিকে তোমার ঠাকুরপোর সামনে দিশি কাঁচির নাম করতেই তোমার জিব দিয়ে জল পড়ে, ও দিকে সেলাই করবার বেলা বিলিতি কাঁচি ছাড়া যে তোমার এক দণ্ড চলে না !

মেজোরানী বললেন, তাতে দোষ হয়েছে কী ? কত খুশি হয় বল্ দেখি। ছোটোবেলা থেকে ওর সঙ্গে যে একসঙ্গে বেড়েছি, তোদের মতো ওকে আমি হাসিমুখে কষ্ট দিতে পারি নে। পুরুষমানুষ, ওর আর-তো কোনো নেশা নেই— এক, এই দিশি দোকান নিয়ে খেলা, আর, ওর এক সর্বনেশে নেশা তুই— এইখেনেই ও মজবে !

আমি বললুম, যাই বল, পেটে এক মুখে এক ভালো নয়।

মেজোরানী হেসে উঠলেন ; বললেন, ওলো সরলা, তুই যে দেখি বড্ড বেশি সিধে, একেবারে গুরুমশায়ের বেতকাঠির মতো। মেয়েমানুষ অত সোজা নয়— সে নরম বলেই অমন একটু-আধটু নুয়ে থাকে, তাতে দোষ নেই।

মেজোরানীর সেই কথাটি ভুলব না, ওর এক সর্বনেশে নেশা তুই, এইখেনেই ও মজবে।

আজ আমার কেবলই মনে হয়, পুরুষমানুষের একটা নেশা চাই, কিন্তু সে নেশা যেন মেয়েমানুষ না হয়।

আমাদের শুকসায়রের হাট এ জেলার মধ্যে মস্ত বড়ো হাট। এখানে জোলার এ ধারে নিত্য বাজার বসে, আর জোলার ও ধারে প্রতি শনিবারে হাট লাগে। বর্ষার পর থেকেই এই হাট বেশি করে জমে। তখন নদীর সঙ্গে জোলার যোগ হয়ে যাতায়াতের পথ সহজ হয়ে যায়। তখন সুতো এবং আগামী শীতের জন্যে গরম কাপড়ের আমদানি খুব বেড়ে ওঠে।

সেই সময়টাতে দিশি কাপড় আর দিশি নুন-চিনির বিরোধ নিয়ে বাংলাদেশের হাটে হাটে তুমুল গণ্ডগোল বেধেছে। আমাদের সকলেরই খুব একটা জেদ চড়ে গেছে। আমাকে সন্দীপ এসে বললেন, এত বড়ো হাটবাজার আমাদের হাতে আছে এটাকে আগাগোড়া স্বদেশী করে তুলতে হবে; এই এলাকা থেকে বিলিতি অলক্ষ্মীকে কুলোর হাওয়া দিয়ে বিদায় করা চাই।

আমি কোমর বেঁধে বললুম, চাই বৈকি।

সন্দীপ বললেন, এ নিয়ে নিখিলের সঙ্গে আমার অনেক কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে, কিছুতে পেরে উঠলুম না। ও বলে, বক্তৃতা পর্যন্ত চলবে, কিন্তু জবর্দস্তি চলবে না।

আমি একটু অহংকার করেই বললুম, আচ্ছা, সে আমি দেখছি।

আমি জানি আমার উপর আমার স্বামীর ভালোবাসা কত গভীর। সেদিন আমার বুদ্ধি যদি স্থির থাকত তা হলে আমার পোড়া মুখ নিয়ে এমন দিনে সেই ভালোবাসার উপর দাবি করতে যেতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যেত। কিন্তু সন্দীপকে যে দেখাতে হবে আমার শক্তি কত! তাঁর কাছে আমি যে শক্তিরূপিণী! তিনি তাঁর আশ্চর্য ব্যাখ্যার দ্বারা বার বার আমাকে এই কথাই বুঝিয়েছেন যে, পরমাশক্তি এক-একজন বিশেষ মানুষের কাছে এক-একজন বিশেষ মানুষেরই রূপে দেখা দেন; তিনি বলেন, আমরা বৈষ্ণবতন্ত্রের হ্লাদিনীশক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখবার জন্যেই এত ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি, যখন কোথাও দেখতে পাই তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি আমার অন্তরের মধ্যে যে ত্রিভঙ্গ বাঁশি বাজাচ্ছেন তাঁর বাঁশির অর্থটা কী। বলতে বলতে এক-একদিন গান ধরতেন—

যখন দেখা দাও নি রাধা, তখন বেজেছিল বাঁশি।
এখন চোখে চোখে চেয়ে সুর যে আমার গেল ভাসি।
তখন নানা তানের ছলে
ডাক ফিরেছে জলে স্থলে,
এখন আমার সকল কাঁদা রাধার রূপে উঠল হাসি।

এই-সব কেবলই শুনতে শুনতে আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমি বিমলা। আমি শক্তিতত্ত্ব, আমি রসতত্ত্ব, আমার কোনো বন্ধন নেই, আমার মধ্যে সমস্তই সম্ভব, আমি যা-কিছুকে স্পর্শ করছি তাকেই নূতন করে সৃষ্টি করছি— নূতন করে সৃষ্টি করেছি আমার এই জগৎকে— আমার হৃদয়ের পরশমণি ছোঁয়াবার আগে শরতের আকাশে এত সোনা ছিল না। আর মুহূর্তে মুহূর্তে আমি নূতন করছি ঐ বীরকে, ঐ সাধককে— ঐ আমার ভক্তকে— ঐ জ্ঞানে উজ্জ্বল, তেজে উদ্দীপ্ত, ভাবের রসে অভিষিক্ত অপূর্ব প্রতিভাকে। আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি, ওর মধ্যে প্রতি ক্ষণে আমি নূতন প্রাণ ঢেলে দিচ্ছি, ও আমার নিজেরই সৃষ্টি। সেদিন অনেক অনুরোধ করে সন্দীপ তাঁর একটি বিশেষ ভক্ত বালক অমূল্যচরণকে আমার কাছে এনেছিলেন। একদণ্ড পরেই আমি দেখতে পেলুম তার চোখের তারার মধ্যে একটা নূতন দীপ্তি জ্বলে উঠল, বুঝলুম সে আদ্যাশক্তিকে দেখতে পেয়েছে, বুঝতে পারলুম ওর রক্তের মধ্যে আমারই সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়েছে। পরদিন সন্দীপ আমাকে এসে বললেন, এ কী মন্ত্র তোমার, ও বালক তো আর সেই বালক নেই, ওর পলতেয় এক মুহূর্তে শিখা ধরে গেছে। তোমার এ আগুনকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে কে? একে একে সবাই আসবে। একটি একটি করে প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে একদিন যে দেশে দেয়ালির উৎসব লাগবে।

নিজের এই মহিমার নেশায় মাতাল হয়েই আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম, ভক্তকে আমি বরদান

করব। আর এও আমার মনে ছিল, আমি যা চাইব তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সেদিন সন্দীপের কাছ থেকে ফিরে এসেই চুল খুলে ফেলে আমি নতুন করে চুল বাঁধলুম। ঘাড়ের থেকে এঁটে চুলগুলোকে মাথার উপরের দিকে টেনে তুলে আমার মেম আমাকে একরকম খোঁপা বাঁধতে শিখিয়েছিলেন। আমার স্বামী আমার সেই খোঁপা খুব ভালোবাসতেন ; তিনি বলতেন, ঘাড় জিনিসটা যে কত সুন্দর হতে পারে তা বিধাতা কালিদাসের কাছে প্রকাশ না করে আমার মতো অ-কবির কাছে খুলে দেখালেন ! কবি হয়তো বলতেন পদ্মের মৃণাল, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যেন মশাল, তার ঊর্ধ্বে তোমার কালো খোঁপার কালো শিখা উপরের দিকে জ্বলে উঠেছে। এই বলে তিনি আমার সেই চুল তোলা ঘাড়ের উপর— হায় রে, সে কথা আর কেন ?

তার পরে তাঁকে ডেকে পাঠালুম। আগে এমন ছোটোখাটো সত্যমিথ্যা নানা ছুতোয় তাঁর ডাক পড়ত। কিছুদিন থেকে ডাকবার সব উপলক্ষই বন্ধ হয়ে গেছে, বানাবার শক্তিও নেই।

নিখিলেশের আত্মকথা

পঞ্চুর স্ত্রী যক্ষ্মায় ভুগে ভুগে মরেছে। পঞ্চুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সমাজ হিসেব করে বলেছে, খরচ লাগবে সাড়ে তেইশ টাকা।

আমি রাগ করে বললুম, নাই বা করলি প্রায়শ্চিত্ত, তোর ভয় কিসের ?

সে ক্লান্ত গোরুর মতো তার ধৈর্যভারপূর্ণ চোখ তুলে বললে, মেয়েটি আছে, বিয়ে দিতে হবে। আর, বউয়েরও তো গতি করা চাই।

আমি বললুম, পাপই যদি হয়ে থাকে, এতদিন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত তো কম হয় নি।

সে বললে, আজ্ঞে, কম কী ! ডাক্তার খরচায় জমিজমা কিছু বিক্রি আর বাকি সমস্ত বন্ধক পড়ে গেছে। কিন্তু দান-দক্ষিনে ব্রাহ্মণভোজন না হলে তো খালাস পাই নে।

তর্ক করে কী হবে। মনে মনে বললুম, যে ব্রাহ্মণ ভোজন করে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে হবে ?

একে তো পঞ্চু বরাবরই উপবাসের ধার ঘেঁষে কাটিয়েছে, তার উপরে এই স্ত্রীর চিকিৎসা এবং সৎকার উপলক্ষে সে একেবারে অগাধ জলে পড়ল। এই সময়ে কোনোরকম করে একটা সান্ত্বনা পাবার জন্যে সে এক সন্ন্যাসী সাধুর চেলাগিরি শুরু করলে। তাতে হল এই, তার ছেলেমেয়েরা যে খেতে পাচ্ছে না সেইটে ভুলে থাকবার একটা নেশায় সে ডুবে রইল। বুঝে নিলে সংসারটা কিছুই না ; সুখ যেমন নেই তেমনি দুঃখটাও স্বপ্নমাত্র। অবশেষে একদিন রাত্রে ছেলেমেয়ে চারটিকে ভাঙা ঘরে ফেলে রেখে সে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

এ-সব কথা আমি কিছুই জানতুম না। আমার মনটার মধ্যে তখন সুরাসুরের মন্থন চলছিল। মাস্টারমশায় যে পঞ্চুর ছেলেমেয়েগুলিকে নিজের বাসায় রেখে মানুষ করছেন সে কথাও আমাকে জানান নি। তখন তাঁর নিজের ছেলে তার বউকে নিয়ে রেঙ্গুন চলে গেছে ; ঘরে তিনি একলা, তাঁর আবার সমস্ত দিন ইস্কুল।

এমনি করে এক মাস যখন কেটে গেছে তখন একদিন সকালবেলায় পঞ্চু এসে উপস্থিত। তার বৈরাগ্যের ঘোর ভেঙেছে। যখন তার বড়ো ছেলেমেয়ে দুটি তার কোলের কাছে মাটির উপর বসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে 'বাবা, তুই কোথায় গিয়েছিলি', সব-ছোটো ছেলেটি তার কোল দখল করে বসলে, আর সেজো মেয়েটি পিঠের উপর পড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলে, তখন কান্নার পর কান্না— কিছুতে তার কান্না থামতে চায় না। বলতে লাগল, মাস্টারবাবু, এগুলোকে দু-বেলা পেট ভরে খাওয়াব সে শক্তিও নেই, আবার এদের ফেলে রেখে দৌড় মারব সে মুক্তিও নেই, এমন করে বেঁধে মার কেন ? আমি কী পাপ করেছিলুম ?

এ দিকে যে ব্যাবসাটুকু ধরে কোনোমতে তার দিন চলছিল তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রথম দিনকতক ঐ-যে মাস্টারমশায়ের ওখানে সে বাসা পেলে সেইটেকেই সে টেনে চলতে লাগল, তার নিজের বাড়িতে নড়বার নাম করতেও চায় না। শেষ কালে মাস্টারমশায় তাকে বললেন, পঞ্চু, তুমি বাড়িতে যাও, নইলে তোমার ঘর-দুয়ারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তোমাকে কিছু টাকা ধার দিচ্ছি, তুমি কাপড়ের ব্যাবসা করে অল্প অল্প করে শোধ দিয়ো।

প্রথমটা পঞ্চুর মনে একটু খেদ হল ; মনে করলে দয়াধর্ম বলে একটা জিনিস জগতে নেই। তার পরে টাকাটা নেবার বেলায় মাস্টারমশায় যখন হ্যান্ডনোট লিখিয়ে নিলেন তখন ভাবলে, শোধ তো করতে হবে, এমন উপকারের মূল্য কী ! মাস্টারমশায় কাউকে বাইরের দিকে দান করে ভিতরের দিকে ঋণী করতে নিতান্ত নারাজ ; তিনি বলেন, মনের ইজ্জত চলে গেলে মানুষের জাত মারা যায়।

হ্যান্ডনোটে টাকা নেওয়ার পর পঞ্চু মাস্টারমশায়কে খুব বড়ো করে প্রণাম করতে আর পারলে না, পায়ের ধুলোটা বাদ পড়ল। মাস্টারমশায় মনে মনে হাসলেন, তিনি প্রণামটা খাটো করতে পারলেই বাঁচেন। তিনি বলেন, আমি শ্রদ্ধা করব, আমাকে শ্রদ্ধা করবে, মানুষের সঙ্গে এই সম্বন্ধই আমার খাঁটি ; ভক্তি আমার পাওনার অতিরিক্ত।

পঞ্চু কিছু ধুতি-শাড়ি কিছু শীতের কাপড় কিনে আনিয়ে চাষিদের ঘরে ঘরে বেচে বেড়াতে লাগল। নগদ দাম পেত না বটে, তেমনি কিছু-বা ধান, কিছু-বা পাট, কিছু-বা অন্য ফসল, যা হাতে হাতে আদায় করে আনত সেটা দামে কাটা যেত না। দু মাসের মধ্যেই সে মাস্টারমশায়ের এক কিস্তি সুদ এবং আসলের কিছু শোধ করে দিলে এবং এই ঋণশোধের অংশ প্রণামের থেকে কাটান পড়ল। পঞ্চু নিশ্চয় মনে করতে লাগল, মাস্টারমশায়কে সে যে একদিন গুরু বলে ঠাউরেছিল, ভুল করেছিল ; লোকটার কাঞ্চনের প্রতি দৃষ্টি আছে।

এইরকমে পঞ্চুর দিন চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে স্বদেশীর বান খুব প্রবল হয়ে এসে পড়ল। আমাদের এবং আশপাশের গ্রাম থেকে যে-সব ছেলে কলকাতার স্কুলে কলেজে পড়ত তারা ছুটির সময় বাড়ি ফিরে এল, তাদের অনেকে স্কুল কলেজ ছেড়ে দিলে। তারা সবাই সন্দীপকে দলপতি করে স্বদেশী-প্রচারে মেতে উঠল। এদের অনেকেই আমার অবৈতনিক স্কুল থেকে এন্‌ট্রেন্স্‌ পাস করে গেছে, অনেককেই আমি কলকাতায় পড়বার বৃত্তি দিয়েছি। এরা একদিন দল বেঁধে আমার কাছে এসে উপস্থিত। বললে, আমাদের শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি সুতো র‍্যাপার প্রভৃতি একেবারে উঠিয়ে দিতে হবে।

আমি বললুম, সে আমি পারব না।

তারা বললে, কেন, আপনার লোকসান হবে ?

বুঝলুম, কথাটা আমাকে একটু অপমান করে বলবার জন্যে। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমার লোকসান নয়, গরিবের লোকসান।

মাস্টারমশায় ছিলেন ; তিনি বলে উঠলেন, হাঁ, ওঁর লোকসান বৈকি, সে লোকসান তো তোমাদের নয়।

তারা বললে, দেশের জন্যে—

মাস্টারমশায় তাদের কথা চাপা দিয়ে বললেন, দেশ বলতে মাটি তো নয়, এইসমস্ত মানুষই তো। তা, তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ ? আর, আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ, এরা সইবে কেন, আর এদের সইতে দেব কেন ?

তারা বললে, আমরা নিজেরাও তো দিশি নুন, দিশি চিনি, দিশি কাপড় ধরেছি।

তিনি বললেন, তোমাদের মনে রাগ হয়েছে, জেদ হয়েছে, সেই নেশায় তোমরা যা করছ খুশি হয়ে করছ। তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু পয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ, তোমাদের সেই খুশিতে ওরা তো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের উপরে।

ওরা প্রতিদিনই মরণ-বাঁচনের টানাটানিতে পড়ে ওদের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ছে কেবলমাত্র কোনোমতে টিকে থাকবার জন্যে— ওদের কাছে দুটো পয়সার দাম কত সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না— ওদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা কোথায় ? জীবনের মহলে বরাবর তোমরা এক কোঠায়, ওরা আর-এক কোঠায় কাটিয়ে এসেছে ; আর আজ তোমাদের দায় ওদের কাঁধের উপর চাপাতে চাও, তোমাদের রাগের ঝাল ওদের দিয়ে মিটিয়ে নেবে ? আমি তো একে কাপুরুষতা মনে করি। তোমরা নিজে যত দূর পর্যন্ত পার করো, মরণ পর্যন্ত— আমি বুড়োমানুষ, নেতা বলে তোমাদের নমস্কার করে পিছনে পিছনে চলতে রাজি আছি। কিন্তু ঐ গরিবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয়পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার।

তারা প্রায় সকলেই মাস্টারমশায়ের ছাত্র, স্পষ্ট কোনো কটু কথা বলতে পারল না, কিন্তু রাগে তাদের রক্ত গরম হয়ে বুকের মধ্যে ফুটতে লাগল। আমার দিকে চেয়ে বললে, দেখুন, সমস্ত দেশ আজ যে ব্রত গ্রহণ করেছে কেবল আপনি তাতে বাধা দেবেন ?

আমি বললুম, আমি বাধা দিতে পারি এমন সাধ্য আমার কী আছে ! আমি বরং প্রাণপণে তার আনুকূল্য করব।

এম· এ· ক্লাসের ছাত্রটি বাঁকা হাসি হেসে বললে, কী আনুকূল্যটা করছেন ?

আমি বললুম, দিশি মিল থেকে দিশি কাপড় দিশি সুতো আনিয়ে আমাদের হাটে রাখিয়েছি ; এমন-কি, অন্য এলেকার হাটেও আমাদের সুতো পাঠাই—

সে ছাত্রটি বলে উঠল, কিন্তু আমরা আপনার হাটে গিয়ে দেখে এসেছি, আপনার দিশি সুতো কেউ কিনছে না।

আমি বললুম, সে আমার দোষ নয়, আমার হাটের দোষ নয় ; তার একমাত্র কারণ সমস্ত দেশ তোমাদের ব্রত নেয় নি।

মাস্টারমশায় বললেন, শুধু তাই নয়, যারা ব্রত নিয়েছে তারা বিব্রত করবারই ব্রত নিয়েছে। তোমরা চাও, যারা ব্রত নেয় নি তারাই ঐ সুতো কিনে যারা ব্রত নেয় নি এমন লোককে দিয়ে কাপড় বোনাবে, আর যারা ব্রত নেয় নি তাদের দিয়ে এই কাপড় কেনাবে। কী উপায়ে ? না তোমাদের গায়ের জোরে আর জমিদারের পেয়াদার তাড়ায়। অর্থাৎ ব্রত তোমাদের কিন্তু উপবাস করবে ওরা, আর উপবাসের পারণ করবে তোমরা।

সায়ান্স ক্লাসের ছাত্রটি বললে, আচ্ছা বেশ, উপবাসের কোন্ অংশটা আপনারাই নিয়েছেন শুনি।

মাস্টারমশায় বললেন, শুনবে ? দিশি মিল থেকে নিখিলের সেই সুতো নিখিলকেই কিনতে হচ্ছে, নিখিলই সেই সুতোয় জোলাদের দিয়ে কাপড় বোনাচ্ছে, তাঁতের ইস্কুল খুলে বসেছে, তার পরে বাবাজির যে-রকম ব্যাবসাবুদ্ধি তাতে সেই সুতোয় গামছা যখন তৈরি হবে তখন তার দাম দাঁড়াবে কিংখাবের টুকরোর মতো, সুতরাং সে গামছা নিজেই কিনে উনি ওঁর বসবার ঘরের পর্দা খাটাবেন, সে পর্দায় ওঁর ঘরের আবরু থাকবে না ; ততদিনে তোমাদের যদি ব্রত সাঙ্গ হয় তখন দিশি কারুকার্যের নমুনা দেখে তোমরাই সব চেয়ে চেঁচিয়ে হাসবে— আর, কোথাও যদি সেই রঙিন গামছার অর্ডার এবং আদর মেলে সে ইংরেজের কাছে।

এতদিন ওঁর কাছে আছি, মাস্টারমশায়ের এমনতরো শান্তিভঙ্গ হতে কোনোদিন দেখি নি। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, কিছুদিন থেকে ওঁর হৃদয়ের মধ্যে একটা বেদনা নিঃশব্দে জমে আসছে ; সে কেবল আমাকে ভালোবাসেন ব'লে। সেই বেদনাতেই ওঁর ধৈর্যের বাঁধ ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করে দিয়েছে।

মেডিকেল কলেজের ছাত্র বলে উঠল, আপনারা বয়সে বড়ো, আপনাদের সঙ্গে তর্ক আমরা করব না। তা হলে এক কথায় বলুন, আপনাদের হাট থেকে বিলিতি মাল আপনারা সরাবেন না ?

আমি বললুম, না, সরাব না, কারণ, সে মাল আমার নয়।

এম· এ· ক্লাসের ছাত্রটি ঈষৎ হেসে বললে, কারণ, তাতে আপনার লোকসান আছে।

মাস্টারমশায় বললেন, হাঁ, তাতে ওঁর লোকসান আছে, সুতরাং সে উনিই বুঝবেন।

তখন ছাত্রেরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে 'বন্দেমাতরং' বলে চীৎকার করে বেরিয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরেই মাস্টারমশায় পঞ্চুকে আমার কাছে নিয়ে এসে উপস্থিত। ব্যাপার কী?

ওদের জমিদার হরিশ কুণ্ডু পঞ্চুকে এক-শো টাকা জরিমানা করেছে।

কেন, ওর অপরাধ কী?

ও বিলিতি কাপড় বেচেছে। ও জমিদারকে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে বললে, পরের কাছে ধার-করা টাকায় কাপড় কখানা কিনেছে, এইগুলো বিক্রি হয়ে গেলেই ও এমন কাজ আর কখনো করবে না। জমিদার বললে, সে হচ্ছে না, আমার সামনে কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল্, তবে ছাড়া পাবি। ও থাকতে না পেরে হঠাৎ বলে ফেললে, আমার তো সে সামর্থ্য নেই, আমি গরিব ; আপনার যথেষ্ট আছে, আপনি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। শুনে জমিদার লাল হয়ে উঠে বললে, হারামজাদা, কথা কইতে শিখেছ বটে— লাগাও জুতি। এই বলে এক চোট অপমান তো হয়েই গেল, তার পরে এক-শো টাকা জরিমানা।— এরাই সন্দীপের পিছনে পিছনে চীৎকার করে বেড়ায়, বন্দেমাতরং ! এরা দেশের সেবক !

কাপড়ের কী হল?

পুড়িয়ে ফেলেছে।

সেখানে আর কে ছিল?

লোকের সংখ্যা ছিল না, তারা চীৎকার করতে লাগল, বন্দেমাতরং। সেখানে সন্দীপ ছিলেন ; তিনি একমুঠো ছাই তুলে নিয়ে বললেন, ভাই-সব, বিলিতি ব্যাবসার অন্ত্যেষ্টিসংকারে তোমাদের গ্রামে এই প্রথম চিতার আগুন জ্বলল। এই ছাই পবিত্র, এই ছাই গায়ে মেখে ম্যান্‌চেস্টারের জাল কেটে ফেলে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে তোমাদের সাধনা করতে বেরোতে হবে।

আমি পঞ্চুকে বললুম, পঞ্চু, তোমাকে ফৌজদারি করতে হবে।

পঞ্চু বললে, কেউ সাক্ষি দেবে না।

কেউ সাক্ষি দেবে না? সন্দীপ ! সন্দীপ !

সন্দীপ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, কী, ব্যাপারটা কী?

এই লোকটার কাপড়ের বস্তা ওর জমিদার তোমার সামনে পুড়িয়েছে, তুমি সাক্ষি দেবে না?

সন্দীপ হেসে বললে, দেব বৈকি। কিন্তু আমি যে ওর জমিদারের পক্ষে সাক্ষী।

আমি বললুম, সাক্ষী আবার জমিদারের পক্ষে কী? সাক্ষী তো সত্যের পক্ষে !

সন্দীপ বললে, যেটা ঘটেছে সেটাই বুঝি একমাত্র সত্য?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অন্য সত্যটা কী?

সন্দীপ বললে, যেটা ঘটা দরকার। যে সত্যকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। সেই সত্যের জন্যে অনেক মিথ্যে চাই, যেমন মায়া দিয়ে এই জগৎ গড়া হচ্ছে। পৃথিবীতে যারা সৃষ্টি করতে এসেছে তারা সত্যকে মানে না, তারা সত্যকে বানায়।

অতএব—

অতএব তোমরা যাকে মিথ্যে সাক্ষি বল আমি সেই মিথ্যে সাক্ষি দেব। যারা রাজ্য বিস্তার করেছে, সাম্রাজ্য গড়েছে, সমাজ বেঁধেছে, ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন করেছে, তারাই তোমাদের বাঁধা সত্যের আদালতে বুক ফুলিয়ে মিথ্যে সাক্ষি দিয়ে এসেছে। যারা শাসন করবে তারা মিথ্যেকে ডরায় না, যারা শাসন মানবে তাদের জন্যেই সত্যের লোহার শিকল। তোমরা কি ইতিহাস পড় নি? তোমরা কি জান না, পৃথিবীর বড়ো বড়ো রান্নাঘরে যেখানে রাষ্ট্রযজ্ঞে পলিটিক্সের খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে মসলাগুলো সব মিথ্যে?

জগতে অনেক খিচুড়ি পাকানো হয়েছে, এখন—

না গো, তোমরা খিচুড়ি পাকাবে কেন, তোমাদের টুঁটি চেপে ধরে খিচুড়ি গেলাবে। বঙ্গবিভাগ করবে, বলবে তোমাদের সুবিধের জন্যেই ; শিক্ষার দরজা এঁটে বন্ধ করতে থাকবে, বলবে তোমাদেরই আদর্শ অত্যুচ্চ করে তোলবার সদভিপ্রায়ে ; তোমরা সাধু হয়ে অশ্রুপাত করতে থাকবে, আর আমরা অসাধু হয়ে মিথ্যের দুর্গ শক্ত করে বানাব। তোমাদের অশ্রু টিকবে না, কিন্তু আমাদের দুর্গ টিকবে।

মাস্টারমশায় আমাকে বললেন, এ-সব তর্ক করবার কথা নয় নিখিল। আমাদের ভিতরেই এবং সকলের মূলেই যে একটি বিরাট সত্য আছে, এ কথা যে লোক নিজের ভিতর থেকেই উপলব্ধি না করতে পারে সে লোক কেমন করে বিশ্বাস করবে যে, সেই অন্তরতম সত্যকেই সমস্ত আবরণ মোচন করে প্রকাশ করাই মানুষের চরম লক্ষ্য, বাইরের জিনিসকে স্তূপাকার করে তোলা লক্ষ্য নয় ?

সন্দীপ হেসে উঠে বললে, আপনার এ কথা মাস্টারমশায়ের মতো কথাই হয়েছে। এ-সব কেবল বইয়ের পাতায় দেখা যায়, চোখের পাতায় দেখছি বাইরের জিনিসকে স্তূপাকার করে তোলাই মানুষের চরম লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যকে যারা বড়োরকম করে সাধন করছে তারা ব্যাবসার বিজ্ঞাপনে প্রতিদিন বড়ো অক্ষরে মিথ্যা কথা বলে, তারা রাষ্ট্রনীতির সদর-খাতায় খুব মোটা কলমে জাল হিসাব লেখে, তাদের খবরের কাগজ মিথ্যার বোঝাই জাহাজ, আর মাছি যেমন ক'রে সান্নিপাতিক জ্বরের বীজ বহন করে তাদের ধর্মপ্রচারকেরা তেমনি করে মিথ্যাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়ায়। আমি তাদেরই শিষ্য— আমি যখন কন্‌গ্রেসের দলে ছিলুম তখন আমি বাজার বুঝে আধ সের সত্যে সাড়ে-পনেরো সের জল মেশাতে কিছুমাত্র লজ্জা করি নি, আজ আমি সে দল থেকে বেরিয়ে এসেছি, আজও আমি এই ধর্মনীতিকেই সার জেনেছি যে, সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ।

মাস্টারমশায় বললেন, সত্যফল-লাভ।

সন্দীপ বললেন, হাঁ, সেই ফসল মিথ্যের আবাদে তবে ফলে। পায়ের নীচের মাটি একেবারে চিরে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিয়ে তবে সেই ফসল ফলে। আর যা সত্য, যা আপনি জন্মায়, সে হচ্ছে আগাছা, কাঁটাগাছ ; তার থেকেই যারা ফলের আশা করে তারা কীটপতঙ্গের দল।

এই বলেই সন্দীপ বেগে বেরিয়ে চলে গেল। মাস্টারমশায় একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন, জান নিখিল ? সন্দীপ অধার্মিক নয়, ও বিধার্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ ; চাঁদই বটে, কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উল্টো দিকে গিয়ে পড়েছে।

আমি বললুম, সেইজন্যে চিরদিনই ওর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, কিন্তু ওর প্রতি আমার স্বভাবের আকর্ষণ আছে। ও আমার অনেক ক্ষতি করেছে, আরো করবে, কিন্তু ওকে আমি অশ্রদ্ধা করতে পারি নে।

তিনি বললেন, সে আমি ক্রমে বুঝতে পারছি। আমি অনেক দিন আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি, সন্দীপকে এতদিন তুমি কেমন করে সহ্য করে আছ। এমন-কি, এক-একদিন আমার সন্দেহ হয়েছে এর মধ্যে তোমার দুর্বলতা আছে। এখন দেখতে পাচ্ছি, ওর সঙ্গে তোমার কথারই মিল নেই, কিন্তু ছন্দের মিল রয়েছে।

আমি কৌতুক করে বললুম, মিত্রে মিত্রে মিলে অমিত্রাক্ষর। হয়তো আমাদের ভাগ্যকবি প্যারাডাইস লস্ট্‌'এর মতো একটা এপিক লেখবার সংকল্প করেছেন।

মাস্টারমশায় বললেন, এখন পঞ্চুকে নিয়ে কী করা যায় ?

আমি বললুম, আপনি বলেছিলেন, যে বিঘেকয়েক জমির উপর পঞ্চুর বাড়ি আছে সেটাতে অনেক দিন থেকে ওর মৌরসি স্বত্ব জন্মেছে, সেই স্বত্ব কাটিয়ে দেবার জন্যে ওর জমিদার অনেক চেষ্টা করছে। ওর সেই জমিটা আমি কিনে নিয়ে সেইখানেই ওকে আমার প্রজা করে রেখে দিই।

আর এক-শো টাকার জরিমানা ?

সে জরিমানার টাকা কিসের থেকে আদায় হবে ? জমি যে আমার হবে।

আর ওর কাপড়ের বস্তা ?

আমি আনিয়ে দিচ্ছি। আমার প্রজা হয়ে ও যেমন ইচ্ছে বিক্রি করুক, দেখি ওকে কে বাধা দেয়।

পঞ্চু হাত জোড় করে বললে, হুজুর, রাজায় রাজায় লড়াই, পুলিসের দারোগা থেকে উকিল-ব্যারিস্টর পর্যন্ত শকুনি-গৃধিনীর পাল জমে যাবে, সবাই দেখে আমোদ করবে, কিন্তু মরবার বেলায় আমি মরব।

কেন, তোর কী করবে ?

ঘরে আমার আগুন লাগিয়ে দেবে, ছেলেমেয়ে-সুদ্ধু নিয়ে পুড়ব।

মাস্টারমশায় বললেন, আচ্ছা, তোর ছেলেমেয়েরা কিছুদিন আমার ঘরেই থাকবে, তুই ভয় করিস নে ; তোর ঘরে বসে তুই যেমন ইচ্ছে ব্যাবসা কর্, কেউ তোর গায়ে হাত দিতে পারবে না। অন্যায়ের কাছে তুই হার মেনে পালাবি এ আমি হতে দেব না। যত সইব বোঝা ততই বাড়বে।

সেইদিনই পঞ্চুর জমি কিনে রেজেস্ট্রী করে আমি দখল করে বসলুম। তার পর থেকে ঝুঁটোপুটি চলল।

পঞ্চুর বিষয়-সম্পত্তি ওর মাতামহের। পঞ্চু ছাড়া তার ওয়ারিশ কেউ ছিল না এই কথাই সকলের জানা। হঠাৎ কোথা থেকে এক মামী এসে জুটে জীবনস্বত্বের দাবি করে তার পুঁটুলি, তার প্যাট্‌রা, হরিনামের ঝুলি এবং একটি প্রাপ্তবয়স্ক বিধবা ভাইঝি নিয়ে পঞ্চুর ঘরের মধ্যে উপস্থিত।

পঞ্চু অবাক হয়ে বললে, আমার মামী তো বহুকাল হল মারা গেছে।

তার উত্তর, প্রথম পক্ষের মামী মারা গেছে বটে, দ্বিতীয় পক্ষের অভাব হয় নি।

কিন্তু মামার মৃত্যুর অনেক পরে যে মামী মরেছে, দ্বিতীয় পক্ষের তো সময় ছিল না।

স্ত্রীলোকটি স্বীকার করলে দ্বিতীয় পক্ষটি মৃত্যুর পরের নয়, মৃত্যুর পূর্বের। সতিনের ঘর করবার ভয়ে বাপের বাড়ি ছিল, স্বামীর মৃত্যুর পরে প্রবল বৈরাগ্যে সে বৃন্দাবনে চলে যায় ; কুণ্ডু-জমিদারের আমলারা এ-সব কথা কেউ কেউ জানে, বোধ করি প্রজাদেরও কারও কারও জানা আছে, আর জমিদার যদি জোরে হাঁক দেয় তবে বিবাহের সময়ে যারা নিমন্ত্রণ খেয়েছিল তারাও বেরিয়ে আসতে পারে।

সেদিন দুপুরবেলা পঞ্চুর এই দুর্গ্রহ নিয়ে আমি যখন খুব ব্যস্ত আছি এমন সময় অন্তঃপুর থেকে বিমলা আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমি চমকে উঠলুম ; জিজ্ঞাসা করলুম, কে ডাকছে ?

বললে, রানীমা।

বড়োরানীমা ?

না, ছোটোরানীমা।

ছোটোরানী ! মনে হল এক-শো বছর ছোটোরানী আমাকে ডাকে নি।

বৈঠকখানা-ঘরে সবাইকে বসিয়ে রেখে আমি অন্তঃপুরে চললুম। শোবার ঘরে বিমলাকে দেখে আরো আশ্চর্য হলুম, যখন দেখা গেল সর্বাঙ্গে, বেশি নয়, অথচ বেশ একটু সাজের আভাস আছে। কিছুদিন এই ঘরটার মধ্যেও যত্নের লক্ষণ দেখি নি, সব এমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল যে মনে হত, যেন ঘরটা সুদ্ধ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। ওরই মধ্যে আগেকার মতো আজ একটু পারিপাট্য দেখতে পেলুম।

আমি কিছু না বলে বিমলার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিমলার মুখ একটু লাল হয়ে উঠল, সে ডান হাত দিয়ে তার বাঁ হাতের বালা দ্রুতবেগে ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, দেখো, সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে কেবল আমাদের এই হাটটার মধ্যেই বিলিতি কাপড় আসছে, এটা কি ভালো হচ্ছে ?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কী করলে ভালো হয় ?

ঐ জিনিসগুলো বের করে দিতে বলো-না।

জিনিসগুলো তো আমার নয়।

কিন্তু, হাট তো তোমার।

হাট আমার চেয়ে তাদের অনেক বেশি যারা ঐ হাটে জিনিস কিনতে আসে।

তারা দিশি জিনিস কিনুক-না।

যদি কেনে তো আমি খুশি হব, কিন্তু যদি না কেনে ?

সে কী কথা। ওদের এত বড়ো আস্পর্ধা হবে ? তুমি হলে—

আমার সময় অল্প, এ নিয়ে তর্ক করে কী হবে ? আমি অত্যাচার করতে পারব না।

অত্যাচার তো তোমার নিজের জন্য নয়, দেশের জন্যে—

দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা, সে কথা তুমি বুঝতে পারবে না।

এই বলে আমি চলে এলুম। হঠাৎ আমার চোখের সামনে সমস্ত জগৎ যেন দীপ্যমান হয়ে উঠল। মাটির পৃথিবীর ভার যেন চলে গেছে, সে যে আপনার জীবপালনের সমস্ত কাজ করেও আপনার নিরন্তর বিকাশের সমস্ত পর্যায়ের ভিতরেও একটি অদ্ভুত শক্তির বেগে দিনরাত্রিকে জপমালার মতো ফেরাতে ফেরাতে যুগে যুগে আকাশের মধ্যে ছুটে চলেছে, সেইটে আমি আমার রক্তের মধ্যে অনুভব করলুম। কর্মভারের সীমা নেই, অথচ মুক্তিবেগেরও সীমা নেই। কেউ বাঁধবে না, কেউ বাঁধবে না, কিছুতেই বাঁধবে না। অকস্মাৎ আমার মনের গভীরতা থেকে একটা বিপুল আনন্দ যেন সমুদ্রের জলস্তম্ভের মতো আকাশের মেঘকে গিয়ে স্পর্শ করলে।

নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করলুম, হঠাৎ তোমার এ হল কী ? প্রথমটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল না ; তার পরে পরিষ্কার বুঝলুম, এই কয়দিন যে বন্ধন দিনরাত আমার মনের ভিতরে এমন পীড়া দিয়েছে আজ তার একটা মস্ত ফাঁক দেখা গেল। আমি ভারি আশ্চর্য হলুম আমার মনের মধ্যে কোনো ঘোর ছিল না। ফোটোগ্রাফের প্লেটে যেরকম করে ছবি পড়ে আমার দৃষ্টিতে বিমলার সমস্ত-কিছু তেমনি করে অঙ্কিত হল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম বিমলা আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করবার জন্যে বিশেষ করে সাজ করেছে। আজকের দিনের পূর্ব পর্যন্ত আমি কখনোই বিমলাকে এবং বিমলার সাজকে তফাত করে দেখি নি। আজ ওর বিলিতি খোঁপার চূড়াকে কেবলমাত্র চুলের কুণ্ডলী বলেই দেখলুম ; শুধু তাই নয়, একদিন এই খোঁপা আমার কাছে অমূল্য ছিল, আজ দেখি এ সস্তা দামে বিকোবার জন্যে প্রস্তুত।

সন্দীপের সঙ্গে আমার দেশ নিয়ে পদে পদে বিরোধ হয়, কিন্তু সে সত্যকার বিরোধ। কিন্তু বিমলা দেশের নাম করে যে কথাগুলো বলছে সে কেবলমাত্র সন্দীপের ছায়া দিয়ে গড়া, আইডিয়া দিয়ে নয় ; এই ছায়ার যদি বদল হয় ওর কথারও বদল হবে। এই-সমস্তই আমি খুব স্বচ্ছ করে দেখলুম, লেশমাত্র কুয়াশা কোথাও ছিল না।

আমার সেই শোবার ঘরের ভাঙা খাঁচাটির ভিতর থেকে যখন সেই হেমন্ত-মধ্যাহ্নের খোলা আলোর মধ্যে বেরিয়ে এলুম, তখন এক দল শালিখ আমার বাগানের গাছের তলায় অকস্মাৎ কী কারণে ভারি উত্তেজনার সঙ্গে কিচিমিচি বাধিয়েছে ; বারান্দার সামনে দক্ষিণে খোওয়া-ফেলা রাস্তার দুই ধারে সারি সারি কাঞ্চন গাছ অজস্র গোলাপি ফুলের মুখরতায় আকাশকে অভিভূত করে দিয়েছে ; অদূরে মেঠো পথের প্রান্তে শূন্য গোরুর গাড়ি আকাশে পুচ্ছ তুলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, তারই বন্ধনমুক্ত জোড়া গোরুর মধ্যে একটা ঘাস খাচ্ছে, আর-একটা রৌদ্রে শুয়ে পড়ে আছে, আর তার পিঠের উপর একটা কাক ঠোকর মেরে মেরে কীট উদ্ধার করছে— আরামে গোরুটার চোখ বুজে এসেছে। আজ আমার মনে হল, বিশ্বের এই যা-কিছু খুব সহজ অথচ অত্যন্ত বৃহৎ আমি তারই স্পন্দিত বক্ষের খুব কাছে এসে বসেছি, তারই আতপ্ত নিশ্বাস ঐ কাঞ্চন ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে আমার হৃদয়ের উপরে এসে পড়ছে। আমার মনে হল, আমি আছি এবং সমস্তই আছে এই দুইয়ে মিলে আকাশ জুড়ে যে সংগীত বাজছে সে কী উদার, কী গভীর, কী অনির্বচনীয় সুন্দর!

তার পরে মনে পড়ল, দারিদ্র্য এবং চাতুরীর ফাঁদে আটকা-পড়া পঞ্চু ; সেই পঞ্চুকে যেন দেখলুম আজ হেমন্তের রৌদ্রে বাংলার সমস্ত উদাস মাঠ-বাট জুড়ে ঐ গোরুটার মতো চোখ বুজে পড়ে আছে— কিন্তু আরামে নয়, ক্লান্তিতে, ব্যাধিতে, উপবাসে। সে যেন বাংলার সমস্ত গরিব রায়তের

প্রতিমূর্তি। দেখতে পেলুম পরম আচারনিষ্ঠ ফোঁটাকাটা স্থূলতনু হরিশ কুণ্ডু। সেও ছোটো নয়, সেও বিরাট, সে যেন বাঁশবনের তলায় বহুকালের বদ্ধ পচা দিঘির উপর তেলা সবুজ একটা অখণ্ড সরের মতো এ পার থেকে ও পার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিষ-বুদ্‌বুদ্‌ উদ্‌গার করছে।

যে প্রকাণ্ড তামসিকতা এক দিকে উপবাসে কৃশ, অজ্ঞানে অন্ধ, অবসাদে জীর্ণ, আর-এক দিকে মুমূর্ষুর রক্তশোষণে স্ফীত হয়ে আপনার অবিচলিত জড়ত্বের তলায় ধরিত্রীকে পীড়িত করে পড়ে আছে, শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এই কাজটা মুলতুবি হয়ে পড়ে রয়েছে শত শত বৎসর ধরে। আমার মোহ ঘুচুক, আমার আবরণ কেটে যাক, আমার পৌরুষ অন্তঃপুরের স্বপ্নের জালে ব্যর্থ হয়ে জড়িয়ে পড়ে থাকে না যেন। আমরা পুরুষ, মুক্তিই আমাদের সাধনা, আইডিয়ালের ডাক শুনে আমরা সামনের দিকে ছুটে চলে যাব, দৈত্যপুরীর দেয়াল ডিঙিয়ে বন্দিনী লক্ষ্মীকে আমাদের উদ্ধার করে আনতে হবে। যে মেয়ে তার নিপুণ হাতে আমাদের সেই অভিযানের জয়পতাকা তৈরি করে দিচ্ছে সেই আমাদের সহধর্মিণী, আর ঘরের কোণে যে আমাদের মায়াজাল বুনছে তার ছদ্মবেশ ছিন্ন করে তার মোহমুক্ত সত্যকার পরিচয় যেন আমরা পাই— তাকে আমাদের নিজেরই কামনার রসে-রঙে অপ্সরী সাজিয়ে তুলে যেন নিজের তপস্যা-ভঙ্গ করতে না পাঠাই। আজ আমার মনে হচ্ছে আমার জয় হবে ; আমি সহজের রাস্তায় দাঁড়িয়েছি, সহজ চোখে সব দেখছি ; আমি মুক্তি পেয়েছি, আমি মুক্তি দিলুম— যেখানে আমার কাজ সেইখানেই আমার উদ্ধার।

আমি জানি বেদনায় বুকের নাড়ীগুলা আবার এক-একদিন টন্‌টন্‌ করে উঠবে। কিন্তু সেই বেদনাকেও আমি এবার চিনে নিয়েছি ; তাকে আমি আর শ্রদ্ধা করতে পারব না। আমি জানি সে কেবলমাত্রই আমার— তার দাম কিসের ? যে দুঃখ বিশ্বের সেই তো আমার গলার হার হবে। হে সত্য, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।— কিছুতেই আমাকে ফিরে যেতে দিয়ো না ছলনার ছদ্মস্বর্গলোকে। আমাকে একলা-পথের পথিক যদি কর সে পথ তোমারই পথ হোক ! আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তোমার জয়ভেরী বেজেছে আজ।

সন্দীপের আত্মকথা

সেদিন অশ্রুজলের বাঁধ ভাঙে আর-কি। আমাকে বিমলা ডাকিয়ে আনলে, কিন্তু খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বের হল না, তার দুই চোখ ঝক্‌ঝক্‌ করতে লাগল। বুঝলুম, নিখিলের কাছে কোনো ফল পায় নি। যেমন করে হোক ফল পাবে সেই অহংকার ওর মনে ছিল, কিন্তু সে আশা আমার মনে ছিল না। পুরুষেরা যেখানে দুর্বল মেয়েরা সেখানে তাদের খুব ভালো করেই চেনে, কিন্তু পুরুষেরা যেখানে খাঁটি পুরুষ মেয়েরা সেখানকার রহস্য ঠিক ভেদ করতে পারে না। আসল কথা, পুরুষ মেয়ের কাছে রহস্য, আর মেয়ে পুরুষের কাছে রহস্য, এই যদি না হবে তা হলে এই দুটো জাতের ভেদ জিনিসটা প্রকৃতির পক্ষে নেহাত একটা অপব্যয় হত।

অভিমান ! যেটা দরকার সেটা ঘটল না কেন সে হিসেব মনে নেই। কিন্তু, আমি যেটা মুখ ফুটে চাইলুম সেটা কেন ঘটল না এইটেই হল খেদ। ওদের ঐ আমির দাবিটাকে নিয়ে যে কত রঙ, কত ভঙ্গি, কত কান্না, কত ছল, কত হাবভাব তার আর অন্ত নেই ; ঐটেতেই তো ওদের মাধুর্য। ওরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি ব্যক্তিবিশেষ। আমাদের যখন বিধাতা তৈরি করছিলেন তখন ছিলেন তিনি ইস্কুল-মাস্টার, তখন তাঁর ঝুলিতে কেবল পুঁথি আর তত্ত্ব ; আর ওদের বেলা তিনি মাস্টারিতে জবাব দিয়ে হয়ে উঠেছেন আর্টিস্ট, তখন তুলি আর রঙের বাক্স।

তাই সেই অশ্রুভরা অভিমানের রক্তিমায় যখন বিমলা সূর্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানি জল-ভরা আগুন-ভরা রাঙা মেঘের মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে আমার ভারি মিষ্টি দেখতে লাগল। আমি খুব কাছে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলুম ; সে হাত ছাড়িয়ে নিলে না, থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠল।

বললুম, মক্ষী, আমরা দুজনে সহযোগী, আমাদের এক লক্ষ্য। বোসো তুমি।

এই বলে বিমলাকে একটা চৌকিতে বসিয়ে দিলুম। আশ্চর্য! এতখানি বেগ কেবল এইটুকুতে এসে ঠেকে গেল ; বর্ষার যে পদ্মা ভাঙতে ভাঙতে ডাকতে ডাকতে আসছে, মনে হয় সামনে কিছু আর রাখবে না, সে হঠাৎ একটা জায়গায় যেন বিনা কারণে তার ভাঙনের সোজা লাইন ছেড়ে একেবারে এ পার থেকে ও পারে চলে গেল। তার তলার দিকে কোথায় কী বাধা লুকিয়ে ছিল মকরবাহিনী নিজেও তা জানত না। আমি বিমলার হাত চেপে ধরলুম, আমার দেহবীণার ছোটো বড়ো সমস্ত তার ভিতরে ভিতরে ঝংকার দিয়ে উঠল ; কিন্তু ঐ আস্থায়ীতেই কেন থেমে গেল, অন্তরা পর্যন্ত কেন পৌঁছল না ? বুঝতে পারলুম জীবনের স্রোতঃপথের গভীরতম তলাটা বহুকালের গতি দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে ; ইচ্ছার বন্যা যখন প্রবল হয়ে বয় তখন সেই তলার পথটাকে কোথাও বা ভাঙে, আবার কোথাও বা এসে ঠেকে যায়। ভিতরে একটা সংকোচ কোথাও রয়ে গেছে, সেটা কী ? সে কোনো একটা জিনিস নয়, সে অনেকগুলোতে জড়ানো। সেইজন্যে তার চেহারা স্পষ্ট বুঝতে পারি নে, এই কেবল বুঝি সেটা একটা বাধা। এই বুঝি, আমি আসলে যা তা আদালতের সাক্ষ্য দ্বারা কোনো কালে পাকা দলিলে প্রমাণ হবে না। আমি নিজের কাছে নিজে রহস্য, সেইজন্যেই নিজের উপর এমন প্রবল টান ; ওকে আগাগোড়া সম্পূর্ণ চিনে ফেললেই ওকে টান মেরে ফেলে দিয়ে একেবারে তুরীয় অবস্থা হয়ে যেত।

চৌকিতে বসে দেখতে দেখতে বিমলার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মনে মনে সে বুঝলে তার একটা ফাঁড়া কেটে গেল। ধূমকেতু তো পাশ দিয়ে সোঁ করে চলে গেল, কিন্তু তার আগুনের পুচ্ছের ধাক্কায় ওর মনপ্রাণ কিছুক্ষণের জন্য যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ল। আমি এই ঘোরটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে বললুম, বাধা আছে, কিন্তু তা নিয়ে খেদ করব না, লড়াই করব। কী বল রানী ?

বিমলা একটু কেশে তার বদ্ধ স্বরকে কিছু পরিষ্কার করে নিয়ে শুধু বললে, হাঁ।

আমি বললুম, কী করে কাজটা আরম্ভ করতে হবে তারই প্ল্যানটা একটু স্পষ্ট করে ঠিক করে নেওয়া যাক।

বলে আমি আমার পকেট থেকে পেন্‌সিল-কাগজ বের করে নিয়ে বসলুম। কলকাতা থেকে আমাদের দলের যে-সব ছেলে এসে পড়েছে তাদের মধ্যে কিরকম কাজের বিভাগ করে দিতে হবে তারই আলোচনা করতে লাগলুম। এমন সময়ে হঠাৎ মাঝখানে বিমলা বলে উঠল, এখন থাক্ সন্দীপবাবু, আমি পাঁচটার সময় আসব, তখন সব কথা হবে। এই বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

বুঝলুম, এতক্ষণ চেষ্টা করে কিছুতে আমার কথায় বিমলা মন দিতে পারছিল না ; নিজের মনটাকে নিয়ে এখন কিছুক্ষণ ওর একলা থাকা চাই। হয়তো বিছানায় পড়ে ওকে কাঁদতে হবে।

বিমলা চলে গেলে ঘরের ভিতরকার হাওয়া যেন আরো বেশি মাতাল হয়ে উঠল। সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তবে যেমন আকাশের মেঘ রঙে রঙে রঙিন হয়ে ওঠে, তেমনি বিমলা চলে যাওয়ার পরে আমার মনটা রঙিয়ে রঙিয়ে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল ঠিক সময়টাকে বয়ে যেতে দিয়েছি। এ কী কাপুরুষতা! আমার এই অদ্ভুত দ্বিধায় বিমল বোধ হয় আমার 'পরে অবজ্ঞা করেই চলে গেল! করতেও পারে।

এই নেশার আবেশে রক্তের মধ্যে যখন ঝিম্‌ঝিম্ করছে এমন সময়ে বেহারা এসে খবর দিলে অমূল্য আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ক্ষণকালের জন্য ইচ্ছে হল তাকে এখন বিদায় করে দিই, কিন্তু মন স্থির করবার পূর্বেই সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল।

তার পর নুন-চিনি-কাপড়ের লড়াইয়ের খবর। তখনই ঘরের হাওয়া থেকে নেশা ছুটে গেল। মনে হল স্বপ্ন থেকে জাগলুম। কোমর বেঁধে দাঁড়ালুম। তার পরে, চলো রণক্ষেত্রে! হর হর ব্যোম ব্যোম!

খবর এই, হাটে কুণ্ডুদের যে-সব প্রজা মাল আনে তারা বশ মেনেছে। নিখিলের পক্ষের আমলারা প্রায় সকলেই গোপনে আমাদের দলে। তারা অন্তরটিপুনি দিচ্ছে। মাড়োয়ারিরা বলছে, আমাদের কাছ থেকে কিছু দণ্ড নিয়ে বিলিতি কাপড় বেচতে দিন, নইলে ফতুর হয়ে যাব। মুসলমানেরা কিছুতেই বাগ

মানছে না।

একটা চাষি তার ছেলেমেয়েদের জন্যে সস্তা দামের জর্মন শাল কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের দলের এখানকার গ্রামের একজন ছেলে তার সেই শাল-ক'টা কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই নিয়ে গোলমাল চলছে। আমরা তাকে বলছি, তোকে দিশি গরম কাপড় কিনে দিচ্ছি। কিন্তু সস্তা দামের দিশি গরম কাপড় কোথায় ? রঙিন কাপড় তো দেখি নে। কাশ্মীরি শাল তো ওকে কিনে দিতে পারি নে। সে এসে নিখিলের কাছে কেঁদে পড়েছে। তিনি সেই ছেলেটার নামে নালিশ করবার হুকুম দিয়েছেন। নালিশের ঠিকমত তদ্‌বির যাতে না হয় আমলারা তার ভার নিয়েছে, এমন-কি, মোক্তার আমাদের দলে।

এখন কথা হচ্ছে, যার কাপড় পোড়াব তার জন্যে যদি দিশি কাপড় কিনে দিতে হয়, তার পরে আবার মামলা চলে, তা হলে তার টাকা পাই কোথায় ? আর, ঐ পুড়তে পুড়তে বিলিতি কাপড়ের ব্যাবসা যে গরম হয়ে উঠবে। নবাব যখন বেলোয়ারি ঝাড় ভাঙার শব্দে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ঘরে ঝাড় ভেঙে বেড়াত তখন ঝাড়ওয়ালার ব্যাবসার খুব উন্নতি হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, সস্তা অথচ দিশি গরম কাপড় বাজারে নেই। শীত এসে পড়েছে, এখন বিলিতি শাল-র‍্যাপার-মেরিনো রাখব কি তাড়াব ?

আমি বললুম, যে লোক বিলিতি কাপড় কিনবে তাকে দিশি কাপড় বখশিশ দেওয়া চলবে না। দণ্ড তারই হওয়া চাই, আমাদের নয়। মামলা যারা করতে যাবে তাদের ফসলের খোলায় আগুন লাগিয়ে দেব, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না। ওহে অমূল্য, অমন চমকে উঠলে চলবে না। চাষির খোলায় আগুন দিয়ে রোশনাই করায় আমার শখ নেই। কিন্তু এ হল যুদ্ধ। দুঃখ দিতে যদি ডরাও তা হলে মধুর রসে ডুব মারো, রাধাভাবে ভোর হয়ে ক বলতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ো।

আর বিলিতি গরম কাপড় ? যত অসুবিধেই হোক, ও কিছুতেই চলবে না। বিলিতির সঙ্গে কোনো কারণেই কোনোখানেই রফা করতে পারব না। বিলিতি রঙিন র‍্যাপার যখন ছিল না তখন চাষির ছেলে মাথার উপর দিয়ে দোলাই জড়িয়ে শীত কাটাত, এখনো তাই করবে। তাতে তাদের শখ মিটবে না তা জানি, কিন্তু শখ মেটাবার সময় এখন নয়।

হাটে যারা নৌকো আনে তাদের মধ্যে অনেককে ছলে বলে বাধ্য করবার পথে কতকটা আনা গেছে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হচ্ছে মিরজান, সে কিছুতেই নরম হল না। এখানকার নায়েব কুলদাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, ওর ঐ নৌকোখানা ডুবিয়ে দিতে পার কি না। সে বললে, সে আর শক্ত কী, পারি ; কিন্তু দায় তো শেষকালে আমার ঘাড়ে পড়বে না ? আমি বললুম, দায়টাকে কারও ঘাড়ে পড়বার মতো আলগা জায়গায় রাখা উচিত নয়, তবু নিতান্তই যদি পড়ো-পড়ো হয় তো আমিই ঘাড় পেতে দেব।

হাট হয়ে গেলে মিরজানের খালি নৌকো ঘাটে বাঁধা ছিল। মাঝিও ছিল না। নায়েব কৌশল করে একটা যাত্রার আসরে তাদের নিমন্ত্রণ করিয়েছিল। সেই রাত্রে নৌকোটাকে খুলে স্রোতের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে তাকে ফুটো করে তার মধ্যে রাবিশের বস্তা চাপিয়ে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া হল।

মিরজান সমস্তই বুঝলে। সে একেবারে আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বললে, হজুর, গোস্তাকি হয়েছিল, এখন—

আমি বললুম, এখন সেটা এমন স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে কী করে ?

তার জবাব না দিয়ে সে বললে, সে নৌকোখানার দাম দু হাজার টাকার কম হবে না হজুর। এখন আমার হুঁশ হয়েছে, এবারকার মতো কসুর যদি মাপ করেন—

বলে সে আমার পায়ে জড়িয়ে ধরল। তাকে বললুম আর দিন-দশেক পরে আমার কাছে আসতে। এই লোকটাকে যদি এখন দু হাজার টাকা দেওয়া যায় তা হলে একে কিনে রাখতে পারি। এরই মতো মানুষকে দলে আনতে পারলে তবে কাজ হয়। কিছু বেশি করে টাকা জোগাড় করতে না পারলে কোনো ফল হবে না।

বিকেলবেলায় বিমলা ঘরে আসবামাত্র চৌকি থেকে উঠে তাকে বললুম, রানী, সব হয়ে এসেছে, আর দেরি নেই, এখন টাকা চাই।

বিমলা বললে, টাকা? কত টাকা?

আমি বললুম, খুব বেশি নয়, কিন্তু যেখান থেকে হোক টাকা চাই।

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, কত চাই বলুন।

আমি বললুম, আপাতত কেবল পঞ্চাশ হাজার মাত্র।

টাকার সংখ্যাটা শুনে বিমলা ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলে, কিন্তু বাইরে সেটা গোপন করে গেল। বার বার সে কী করে বলবে যে 'পারব না'?

আমি বললুম, রানী, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পার তুমি। করেওছ। কী যে করেছ যদি দেখাতে পারতুম তো দেখতে। কিন্তু এখন তার সময় নয়; একদিন হয়তো সময় আসবে। এখন টাকা চাই।

বিমলা বললে, দেব।

আমি বুঝলুম, বিমলা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে ওর গয়না বেচে দেবে। আমি বললুম, তোমার গয়না এখন হাতে রাখতে হবে, কখন কী দরকার হয় বলা যায় না।

বিমলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললুম, তোমার স্বামীর টাকা থেকে এ টাকা দিতে হবে।

বিমলা আরো স্তম্ভিত হয়ে গেল। খানিক পরে সে বললে, তাঁর টাকা আমি কেমন করে নেব?

আমি বললুম, তার টাকা কি তোমার টাকা নয়?

সে খুব অভিমানের সঙ্গেই বললে, নয়।

আমি বললুম, তা হলে সে টাকা তারও নয়। সে টাকা দেশের। দেশের যখন প্রয়োজন আছে তখন এ টাকা নিখিল দেশের কাছ থেকে চুরি করে রেখেছে।

বিমলা বললে, আমি সে টাকা পাব কী করে?

যেমন করে হোক। তুমি সে পারবে। যাঁর টাকা তুমি তাঁর কাছে এনে দেবে। বন্দেমাতরং! 'বন্দেমাতরং' এই মন্ত্রে আজ লোহার সিন্দুকের দরজা খুলবে, ভাণ্ডারঘরের প্রাচীর খুলবে, আর যারা ধর্মের নাম করে সেই মহাশক্তিকে মানে না তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে। মক্ষী, বলো বন্দেমাতরং!

বন্দেমাতরং!

আমরা পুরুষ, আমরা রাজা, আমরা খাজনা নেব। আমরা পৃথিবীতে এসে অবধি পৃথিবীকে লুঠ করছি। আমরা যতই তার কাছে দাবি করেছি ততই সে আমাদের বশ মেনেছে। আমরা পুরুষ আদিকাল থেকে ফল পেড়েছি, গাছ কেটেছি, মাটি খুঁড়েছি, পশু মেরেছি, পাখি মেরেছি, মাছ মেরেছি। সমুদ্রের তলা থেকে, মাটির নীচে থেকে, মৃত্যুর মুখের থেকে আদায়, আদায়, আমরা কেবলই আদায় করে এসেছি। আমরা সেই পুরুষজাত। বিধাতার ভাণ্ডারের কোনো লোহার সিন্দুককে আমরা রেয়াত করি নি, আমরা ভেঙেছি আর কেড়েছি।

এই পুরুষদের দাবি মেটানোই হচ্ছে ধরণীর আনন্দ। দিনরাত সেই অন্তহীন দাবি মেটাতে মেটাতেই পৃথিবী উর্বরা হয়েছে, সুন্দরী হয়েছে, সার্থক হয়েছে, নইলে জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা পড়ে সে আপনাকে আপনি জানত না। নইলে তার হৃদয়ের সকল দরজাই বন্ধ থাকত, তার খনির হীরে খনিতেই থেকে যেত, আর শুক্তির মুক্তো আলোতে উদ্ধার পেত না।

আমরা পুরুষ কেবল আমাদের দাবির জোরে মেয়েদের আজ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছি। কেবলই আমাদের কাছে আপনাকে দিতে দিতে তারা ক্রমে ক্রমে আপনাকে বড়ো করে বেশি করে পেয়েছে। তারা তাদের সমস্ত সুখের হীরে এবং দুঃখের মুক্তো আমাদের রাজকোষে জমা করে দিতে গিয়েই তবে তার সন্ধান পেয়েছে। এমনি করে পুরুষের পক্ষে নেওয়াই হচ্ছে যথার্থ দান, আর মেয়েদের পক্ষে দেওয়াই হচ্ছে যথার্থ লাভ।

বিমলার কাছে খুব একটা বড়ো হাঁক হেঁকেছি। মনের ধর্মই নাকি আপনার সঙ্গে না-হক ঝগড়া করা, তাই প্রথমটা একটা খটকা লেগেছিল। মনে হয়েছিল, এটা বড়ো বেশি কঠিন হল। একবার ভাবলুম ওকে ডেকে বলি, না, তোমার এ-সব ঝঞ্ঝাটে গিয়ে কাজ নেই, তোমার জীবনে কেন এমন অশান্তি এনে দেব ? ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গিয়েছিলুম, পুরুষজাত এইজন্যেই তো সকর্মক, আমরা অকর্মকদের মধ্যে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে অশান্তি ঘটিয়ে তাদের অস্তিত্বকে সার্থক করে তুলব যে। আমরা আজ পর্যন্ত মেয়েদের যদি কাঁদিয়ে না আসতুম তা হলে তাদের দুঃখের ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দরজা যে আঁটাই থাকত। পুরুষ যে ত্রিভুবনকে কাঁদিয়ে ধন্য করবার জন্যেই। নইলে তার হাত এমন সবল, তার মুঠো এমন শক্ত হবে কেন ?

বিমলার অন্তরাত্মা চাইছে যে, আমি সন্দীপ তার কাছে খুব বড়ো দাবি করব, তাকে মরতে ডাক দেব। এ না হলে সে খুশি হবে কেন ? এতদিন সে ভালো করে কাঁদতে পায় নি বলেই তো আমার পথ চেয়ে বসে ছিল। এতদিন সে কেবলমাত্র সুখে ছিল বলেই তো আমাকে দেখবামাত্র তার হৃদয়ের দিগন্তে দুঃখের নববর্ষা একেবারে নীল হয়ে ঘনিয়ে এল। আমি যদি দয়া করে তার কান্না থামাতেই চাই তা হলে জগতে আমার দরকার ছিল কী !

আসলে আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি খটকা বেধেছিল তার প্রধান কারণ, এটা যে টাকার দাবি। টাকা জিনিসটা যে পুরুষমানুষের। ওটা চাইতে যাওয়ার মধ্যে একটু ভিক্ষুকতা এসে পড়ে। সেইজন্যে টাকার অঙ্কটাকে বড়ো করতে হল। এক-আধ হাজার হলে সেটাতে অত্যন্ত চুরির গন্ধ থাকে, কিন্তু পঞ্চাশ হাজারটা হল ডাকাতি।

তা ছাড়া, আমার খুব ধনী হওয়া উচিত ছিল। এতদিন কেবলমাত্র টাকার অভাবে আমার অনেক ইচ্ছা পদে পদে ঠেকে গেছে ; এটা, আর যাকে হোক, আমাকে কিছুতেই শোভা পায় না। আমার ভাগ্যের পক্ষে এটা অন্যায় যদি হত তাকে মাপ করতুম, কিন্তু এটা রুচিবিরুদ্ধ, সুতরাং অমার্জনীয়। বাসা ভাড়া করলে মাসে মাসে আমি যে তার ভাড়ার জন্যে মাথায় হাত দিয়ে ভাবব, আর রেলে চাপবার সময় অনেক চিন্তা করে টাকার থলি টিপে টিপে ইন্টারমিডিয়েটের টিকিট কিনব, এটা আমার মতো মানুষের পক্ষে তো দুঃখকর নয়, হাস্যকর। আমি বেশ দেখতে পাই, নিখিলের মতো মানুষের পক্ষে পৈতৃক সম্পত্তিটা বাহুল্য। ও গরিব হলে ওকে কিছুই বেমানান হত না। তা হলে ও অনায়াসে অকিঞ্চনতার স্যাকরা গাড়িতে ওর চন্দ্রমাস্টারের জুড়ি হতে পারত।

আমি জীবনে অন্তত একবার পঞ্চাশ হাজার টাকা হাতে নিয়ে নিজের আরামে এবং দেশের প্রয়োজনে দু দিনে সেটা উড়িয়ে দিতে চাই। আমি আমীর, আমার এই গরিবের ছদ্মবেশটা দু দিনের জন্যেও ঘুচিয়ে একবার আয়নায় আপনাকে দেখে নিই, এই আমার একটা শখ আছে।

কিন্তু বিমলা পঞ্চাশ হাজারের নাগাল সহজে কোথাও পাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। হয়তো শেষকালে সেই দু-চার হাজারেই ঠেকবে। তাই সই। 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' বলেছে ; কিন্তু ত্যাগটা যখন নিজের ইচ্ছায় নয় তখন হতভাগ্য পণ্ডিত বারো-আনা, এমন-কি, পনেরো-আনাও ত্যজতি।

এই পর্যন্ত লিখেছি, এ গেল আমার খাসের কথা। এ-সব কথা আমার অবকাশের সময় আরো ফুটিয়ে তোলা যাবে। এখন অবকাশ নেই। এখানকার নায়েব খবর পাঠিয়েছে, এখনই একবার তার কাছে যাওয়া চাই ; শুনছি একটা গোলমাল বেধেছে।

নায়েব বললে, যে লোকটার দ্বারা নৌকো ডোবানো হয়েছিল পুলিস তাকে সন্দেহ করেছে ; লোকটা পুরোনো দাগি, তাকে নিয়ে টানাটানি চলছে। লোকটা সেয়ানা, তার কাছ থেকে কথা আদায় করা শক্ত হবে। কিন্তু বলা যায় কি, বিশেষত নিখিল রেগে রয়েছে, নায়েব স্পষ্ট তো কিছু করতে পারবে না। নায়েব আমাকে বললে, দেখুন, আমাকে যদি বিপদে পড়তে হয় আমি আপনাকে ছাড়ব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আমাকে যে জড়াবে তার ফাঁস কোথায় ?

নায়েব বললে, আপনার লেখা একখানা, আর অমূল্যবাবুর লেখা তিনখানা চিঠি আমার কাছে আছে।

এখন বুঝছি, যে চিঠিখানা লিখে নায়েব আমার কাছ থেকে জবাব আদায় করে রেখেছিল সেটা এই কারণেই জরুরি, তার আর-কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ-সব চাল নূতন শেখা যাচ্ছে। যেমন করে শত্রুর নৌকো ডুবিয়েছি প্রয়োজন হলেই তেমনি করে যে মিত্রকেও অনায়াসে ডোবাতে পারি, আমার 'পরে নায়েবের এই শ্রদ্ধাটুকু ছিল। শ্রদ্ধা আরো অনেকখানি বাড়ত যদি চিঠিখানার জবাব লিখে না দিয়ে মুখে দেওয়া যেত।

এখন কথা হচ্ছে এই, পুলিসকে ঘুষ দেওয়া চাই এবং যদি আরো কিছুদূর গড়ায় তা হলে যে লোকটার নৌকো ডুবনো গেছে আপসে তারও ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এখন বেশ বুঝতে পারছি, এই-যে বেড়-জালটি পাতা হচ্ছে এর মুনাফার একটা মোটা অংশ নায়েবের ভাগেও পড়বে। কিন্তু মনে মনে সে কথাটা চেপেই রাখতে হচ্ছে। মুখে আমিও বলছি বন্দেমাতরং, আর সেও বলছে বন্দেমাতরং।

এ-সব ব্যাপারে যে আসবাব দিয়ে কাজ চালাতে হয় তার ফাটা অনেক, যেটুকু পদার্থ টিকে থাকে তার চেয়ে গলে পড়ে ঢের বেশি। ধর্মবুদ্ধিটা না কি লুকিয়ে মজ্জার মধ্যে সেঁধিয়ে বসে আছে, সেইজন্যে নায়েবটার উপর প্রথম দফায় খুব রাগ হয়েছিল, আর-একটু হলেই দেশের লোকের কপটতা সম্বন্ধে খুব কড়া কথা এই ডায়ারিতে লিখতে বসেছিলুম। কিন্তু ভগবান যদি থাকেন তাঁর কাছে আমার এই কৃতজ্ঞতাটুকু স্বীকার করতেই হবে তিনি আমার বুদ্ধিটাকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন; নিজের ভিতরে কিম্বা নিজের বাইরে কিছু অস্পষ্ট থাকবার জো নেই। অন্য যাকেই ভোলাই, নিজেকে কখনোই ভোলাই নে। সেইজন্যে বেশিক্ষণ রাগতে পারলুম না। যেটা সত্য সেটা ভালোও নয় মন্দও নয়, সেটা সত্য, এইটেই হল বিজ্ঞান। মাটি যতটা জল শুষে নেয় সেটুকু বাদে যে জলটা থাকে সেইটে নিয়েই জলাশয়। বন্দেমাতরমের নীচের তলার মাটিতে খানিকটা জল শুষবে; সে জল আমিও শুষব, ঐ নায়েবও শুষবে; তার পরেও যেটা থাকবে সেইটেই হল বন্দেমাতরং। একে কপটতা বলে গাল দিতে পারি, কিন্তু এটা সত্য, একে মানতে হবে। পৃথিবীর সকল বড়ো কাজেরই তলায় একটা স্তর জমে যেটা কেবল পাঁক; মহাসমুদ্রের নীচেও সেটা আছে।

তাই বড়ো কাজ করবার সময় এই পাঁকের দাবির হিসেবটি ধরা চাই। অতএব নায়েব কিছু নেবে এবং আমারও কিছু প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনটা বড়ো প্রয়োজনের অন্তর্গত। কারণ, ঘোড়াই কেবল দানা খাবে তা নয়, চাকাতেও কিছু তেল দিতে হয়।

যাই হোক, টাকা চাই। পঞ্চাশ হাজারের জন্যে সবুর করলে চলবে না। এখনই যা পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ করতে হবে। আমি জানি, এই সমস্ত জরুর যখন তাগিদ করে আখেরকে তখন ভাসিয়ে দিতে হয়। আজকের দিনের পাঁচ হাজার পরশু দিনের পঞ্চাশ হাজারের অঙ্কুর মুড়িয়ে খায়। আমি তো তাই নিখিলকে বলি, যারা ত্যাগের রাস্তায় চলে তাদের লোভকে দমন করতেই হয় না, যারা লোভের রাস্তায় চলে পদে পদে তাদের লোভকে ত্যাগ করতে হয়। পঞ্চাশ হাজারকে আমি ত্যাগ করলুম, নিখিলের মাস্টারমশায় চন্দ্রবাবুকে ওটা ত্যাগ করতে হয় না।

ছটা যে রিপু আছে তার মধ্যে প্রথম দুটো এবং শেষ দুটো হচ্ছে পুরুষের, আর মাঝখানের দুটো হচ্ছে কাপুরুষের। কামনা করব, কিন্তু লোভ থাকবে না, মোহ থাকবে না। তা থাকলেই কামনা হল মাটি। মোহ জিনিসটা থাকে অতীতকে আর ভবিষ্যৎকে জড়িয়ে। বর্তমানকে পথ ভোলাবার ওস্তাদ হচ্ছে তারা। এখনই যেটা দরকার সেটাতে যারা মন দিতে পারে নি, যারা অন্যকালের বাঁশি শুনছে, তারা বিরহিণী শকুন্তলার মতো; কাছের অতিথির হাঁক তারা শুনতে পায় না, সেই শাপে দূরের যে অতিথিকে তারা মুগ্ধ হয়ে কামনা করে তাকে হারায়। যারা কামনার তপস্বী তাদেরই জন্যে মোহমুদ্গর। কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ!

সেদিন আমি বিমলার হাত চেপে ধরেছিলুম, তারই রেশ ওর মনের মধ্যে বাজছে। আমার মনেও

তার ঝংকারটা থামে নি। এই রেশটুকুকে তাজা রেখে দিতে হবে। এইটেকেই যদি বার বার অভ্যস্ত করে মোটা করে তুলি তা হলে এখন যেটা গানের উপর দিয়ে চলছে তখন সেটা তর্কে এসে নামবে। এখন আমার কোনো কথায় বিমলা 'কেন' জিজ্ঞাসা করবার ফাঁক পায় না। যে-সব মানুষের মোহ জিনিসটাতে দরকার আছে তাদের বরাদ্দ বন্ধ করে কী হবে? এখন আমার কাজের ভিড়, অতএব এখনকার মতো রসের পেয়ালার এই উপরকার আমেজ পর্যন্তই থাক্, তলানি পর্যন্ত গেলে গোলমাল বাধবে। যখন তার ঠিক সময় আসবে তখন তাকে অবজ্ঞা করব না। হে কামী, লোভকে ত্যাগ করো এবং মোহকে ওস্তাদের হাতের বীণাযন্ত্রের মতো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তার মিহি তারে মিড় লাগাতে থাকো।

এ দিকে কাজের আসর আমাদের জমে উঠেছে। আমাদের দলবল ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে গেছে। ভাই-বেরাদর বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারব না। ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের করে হাঁউ করে ওঠে, একদিন ওদের ভালুকনাচ নাচাব।

নিখিল বলে, ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয় তা হলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।

আমি বলি, তা হতে পারে, কিন্তু কোনখানটাতে আছে তা জানা চাই এবং সেইখানটাতেই জোর করে ওদের বসিয়ে দিতে হবে, নইলে ওরা বিরোধ করবেই।

নিখিল বলে, বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে বুঝি তুমি বিরোধ মেটাতে চাও?

আমি বলি, তোমার প্ল্যান কী?

নিখিল বলে, বিরোধ মেটাবার একটিমাত্র পথ আছে।

আমি জানি, সাধুলোকের লেখা গল্পের মতো নিখিলের সব তর্কই শেষকালে একটা উপদেশে এসে ঠেকবেই। আশ্চর্য এই, এতদিন এই উপদেশ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু আজও এগুলোকে ও নিজেও বিশ্বাস করে! সাধে আমি বলি, নিখিল হচ্ছে একেবারে জন্ম-স্কুলবয়। গুণের মধ্যে, ও খাঁটি মাল। চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েছে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও মরেও মানতে চায় না। মুশকিল এই, এদের কাছে মরাটা শেষ প্রমাণ নয়, ওরা চক্ষু বুজে ঠিক করে রেখেছে তার উপরেও কিছু আছে।

অনেক দিন থেকে আমার মনে একটি প্ল্যান আছে; সেটা যদি খাটাবার সুযোগ পাই তা হলে দেখতে দেখতে সমস্ত দেশে আগুন লেগে যাবে। দেশকে চোখে দেখতে না পেলে আমাদের দেশের লোক জাগবে না। দেশের একটা দেবীপ্রতিমা চাই। কথাটা আমার বন্ধুদের মনে লেগেছিল; তারা বললে, আচ্ছা, একটা মূর্তি বানানো যাক। আমি বললুম, আমরা বানালে চলবে না, যে প্রতিমা চলে আসছে তাকেই আমাদের স্বদেশের প্রতিমা করে তুলতে হবে। পূজার পথ আমাদের দেশে গভীর করে কাটা আছে, সেই রাস্তা দিয়েই আমাদের ভক্তির ধারাকে দেশের দিকে টেনে আনতে হবে।

এই নিয়ে নিখিলের সঙ্গে কিছুকাল পূর্বে আমার খুব তর্ক হয়ে গেছে। নিখিল বললে, যে কাজকে সত্য বলে শ্রদ্ধা করি তাকে সাধন করবার জন্যে মোহকে দলে টানা চলবে না।

আমি বললুম, মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, মোহ নইলে ইতর লোকের চলেই না; আর পৃথিবীর বারো-আনা ভাগ ইতর। সেই মোহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই সকল দেশে দেবতার সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ আপনাকে চেনে।

নিখিল বললে, মোহকে ভাঙবার জন্যেই দেবতা। রাখবার জন্যেই অপদেবতা।

আচ্ছা বেশ, অপদেবতাই সই, সেটাকে নইলে কাজ এগোয় না। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে মোহটা খাড়াই আছে, তাকে সমানে খোরাক দিচ্ছি, অথচ তার কাছ থেকে কাজ আদায় করছি নে। এই দেখো-না, ব্রাহ্মণকে ভূদেব বলছি, তার পায়ের ধুলো নিচ্ছি, দান-দক্ষিনেরও অন্ত নেই, অথচ এতবড়ো একটা তৈরি জিনিসকে বৃথা নষ্ট হতে দিচ্ছি, কাজে লাগাচ্ছি নে। ওদের ক্ষমতাটা যদি পুরো

ওদের হাতে দেওয়া যায় তা হলে সেই ক্ষমতা দিয়ে যে আমরা আজ অসাধ্য সাধন করতে পারি। কেননা, পৃথিবীতে এক দল জীব আছে তারা পদতলচর, তাদের সংখ্যাই বেশি ; তারা কোনো কাজই করতে পারে না যদি না নিয়মিত পায়ের ধুলো পায়, তা পিঠেই হোক আর মাথাতেই হোক। এদের খাটাবার জন্যেই মোহ একটা মস্ত শক্তি। সেই শক্তিশেলগুলোকে এতদিন আমাদের অস্ত্রশালায় শান দিয়ে এসেছি, আজ সেটা হানবার দিন এসেছে— আজ কি তাদের সরিয়ে ফেলতে পারি ?

কিন্তু নিখিলকে এ-সব কথা বোঝানো ভারি শক্ত। সত্য জিনিসটা ওর মনে একটা নিছক প্রেজুডিসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। যেন সত্য বলে কোনো-একটা বিশেষ পদার্থ আছে। আমি ওকে কতবার বলেছি, যেখানে মিথ্যাটা সত্য সেখানে মিথ্যাই সত্য। আমাদের দেশ এই কথাটা বুঝত বলেই অসংকোচে বলতে পেরেছে, অজ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যাই সত্য। সেই মিথ্যা থেকে ভ্রষ্ট হলেই সত্য থেকে সে ভ্রষ্ট হবে। দেশের প্রতিমাকে যে লোক সত্য বলে মানতে পারে দেশের প্রতিমা তার মধ্যে সত্যের মতোই কাজ করবে। আমাদের যে-রকমের স্বভাব কিংবা সংস্কার তাতে আমরা দেশকে সহজে মানতে পারি নে, কিন্তু দেশের প্রতিমাকে অনায়াসে মানতে পারি। এটা যখন জানা কথা, তখন যারা কাজ উদ্ধার করতে চায় তারা এইটে বুঝেই কাজ করবে।

নিখিল হঠাৎ ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে, সত্যের সাধনা করবার শক্তি তোমরা খুইয়েছ বলেই তোমরা হঠাৎ আকাশ থেকে একটা মস্ত ফল পেতে চাও। তাই শত শত বৎসর ধরে দেশের যখন সকল কাজই বাকি তখন তোমরা দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার জন্যে হাত পেতে বসে রয়েছ।

আমি বললুম, অসাধ্য সাধন করা চাই, সেইজন্যেই দেশকে দেবতা করা দরকার।

নিখিল বললে, অর্থাৎ সাধ্যের সাধনায় তোমাদের মন উঠছে না। যা-কিছু আছে সমস্ত এমনিই থাকবে, কেবল তার ফলটা হবে আজগুবি।

আমি বললুম, নিখিল, তুমি যা বলছ ওগুলো উপদেশ। একটা বিশেষ বয়সে ওর দরকার থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের যখন দাঁত ওঠে তখন ও চলবে না। স্পষ্টই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, কোনোদিন স্বপ্নেও যার আবাদ করি নি সেই ফসল হুহু করে ফলে উঠছে। কিসের জোরে ? আজ দেশকে দেবতা বলে মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ব'লে। এইটেকেই মূর্তি দিয়ে চিরন্তন করে তোলা এখনকার প্রতিভার কাজ। প্রতিভা তর্ক করে না, সৃষ্টি করে। আজ দেশ যা ভাবছে আমি তাকে রূপ দেব। আমি ঘরে ঘরে বলে বেড়াব, দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, তিনি পুজো চান। আমরা ব্রাহ্মণদের গিয়ে বলব, দেবীর পূজারি তোমরাই, সেই পুজো বন্ধ আছে বলেই তোমরা নাবতে বসেছ। তুমি বলবে, আমি মিথ্যা বলছি। না, এ সত্য। আমার মুখ থেকে এই কথাটি শোনবার জন্যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অপেক্ষা করে রয়েছে, সেইজন্যেই বলছি এ কথা সত্য। যদি আমার বাণী আমি প্রচার করতে পারি তা হলে তুমিই দেখতে পাবে এর আশ্চর্য ফল।

নিখিল বললে, আমার আয়ু কতদিনই বা ? তুমি যে ফল দেশের হাতে তুলে দেবে তারও পরের ফল আছে, সেটা হয়তো এখন দেখা যাবে না।

আমি বললুম, আমি আজকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার।

নিখিল বললে, আমি কালকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই সকলের।

আসল কথা বাঙালির যে-একটা বড়ো ঐশ্বর্য আছে কল্পনাবৃত্তি, সেটা হয়তো নিখিলের ছিল, কিন্তু বাইরের থেকে একটা ধর্মবৃত্তির বনস্পতি বড়ো হয়ে উঠে ওটাকে নিজের আওতায় মেরে ফেললে ব'লে। ভারতবর্ষে এই-যে দুর্গা-জগদ্ধাত্রীর পূজা বাঙালি উদ্‌ভাবন করেছে এইটেতে সে নিজের আশ্চর্য পরিচয় দিয়েছে। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, এ দেবী পোলিটিকাল দেবী। মুসলমানের শাসনকালে বাঙালি যে দেশশক্তির কাছ থেকে শত্রুজয়ের বর কামনা করেছিল এই দুই দেবী তারই দুই-রকমের মূর্তি। সাধনার এমন আশ্চর্য বাহ্যরূপ ভারতবর্ষের আর কোন্ জাত গড়তে পেরেছে ?

কল্পনার দিব্যদৃষ্টি নিখিলের একেবারেই অন্ধ হয়ে গেছে বলেই সে আমাকে অনায়াসে বলতে

পারলে, মুসলমান-শাসনে বর্গি বলো, শিখ বলো, নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে ফল চেয়েছিল। বাঙালি তার দেবীমূর্তির হাতে অস্ত্র দিয়ে মন্ত্র পড়ে ফল কামনা করেছিল ; কিন্তু দেশ দেবী নয়, তাই ফলের মধ্যে কেবল ছাগমহিষের মুণ্ডপাত হল। যেদিন কল্যাণের পথে দেশের কাজ করতে থাকব সেইদিনই যিনি দেশের চেয়ে বড়ো, যিনি সত্য দেবতা, তিনি সত্য ফল দেবেন।

মুশকিল হচ্ছে, কাগজে কলমে লিখলে নিখিলের কথা শোনায় ভালো। কিন্তু আমার কথা কাগজে লেখবার নয়, লোহার খন্তা দিয়ে দেশের বুক চিরে চিরে লেখবার। পণ্ডিত যে-রকম কৃষিতত্ত্ব ছাপার কালিতে লেখে সে-রকম নয়, লাঙলের ফলা দিয়ে চাষি যে-রকম মাটির বুকে আপনার কামনা অঙ্কিত করে সেই-রকম।

বিমলার সঙ্গে যখন আমাদের দেখা হল আমি বললুম, যে দেবতার সাধনা করবার জন্যে লক্ষ যুগের পর পৃথিবীতে এসেছি তিনি যতক্ষণ আমাকে প্রত্যক্ষ না দেখা দিয়েছেন ততক্ষণ তাঁকে আমার সমস্ত দেহমন দিয়ে কি বিশ্বাস করতে পেরেছি ? তোমাকে যদি না দেখতুম তা হলে আমার সমস্ত দেশকে আমি এক করে দেখতে পেতুম না, এ কথা আমি তোমাকে কতবার বলেছি— জানি নে তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পার কি না। এ কথা বোঝানো ভারি শক্ত যে, দেবলোকে দেবতারা থাকেন অদৃশ্য, মর্তলোকেই তাঁরা দেখা দেন।

বিমলা এক-রকম করে আমার দিকে চেয়ে বললে, তোমার কথা খুব স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি। এই প্রথম বিমলা আমাকে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বললে।

আমি বললুম, অর্জুন যে কৃষ্ণকে তাঁর সামান্য সারথিরূপে সর্বদা দেখতেন তাঁরও একটি বিরাট রূপ ছিল, সেও একদিন অর্জুন দেখেছিলেন ; তখন তিনি পুরো সত্য দেখেছিলেন। আমার সমস্ত দেশের মধ্যে আমি তোমার সেই বিরাট রূপ দেখেছি। তোমারই গলায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার ; তোমারই কালো চোখের কাজল-মাখা পল্লব আমি দেখতে পেয়েছি নদীর নীল জলের বহু দূরপারের বনরেখার মধ্যে ; আর কচি ধানের খেতের উপর দিয়ে তোমার ছায়া-আলোর রঙিন ডুরেশাড়িটি লুটিয়ে লুটিয়ে যায় ; আর তোমার নিষ্ঠুর তেজ দেখেছি জ্যৈষ্ঠের যে রৌদ্রে সমস্ত আকাশটা যেন মরুভূমির সিংহের মতো লাল জিব বের করে দিয়ে হা হা করে শ্বসতে থাকে। দেবী যখন তাঁর ভক্তকে এমন আশ্চর্য রকম করে দেখা দিয়েছেন তখন তাঁরই পূজা আমি আমার সমস্ত দেশে প্রচার করব, তবে আমার দেশের লোক জীবন পাবে। 'তোমারই মুরতি গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।' কিন্তু সে কথা সকলে স্পষ্ট করে বোঝে নি। তাই আমার সংকল্প, সমস্ত দেশকে ডাক দিয়ে আমার দেবীর মূর্তিটি নিজের হাতে গড়ে এমন করে তার পুজো দেব যে কেউ তাকে আর অবিশ্বাস করতে পারবে না। তুমি আমাকে সেই বর দাও, সেই তেজ দাও।

বিমলার চোখ বুজে এল। সে যে-আসনে বসে ছিল সেই আসনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে যেন পাথরের মূর্তির মতোই স্তব্ধ হয়ে রইল। আমি আর খানিকটা বললেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। খানিক পরে সে চোখ মেলে বলে উঠল, ওগো প্রলয়ের পথিক, তুমি পথে বেরিয়েছ, তোমার পথে বাধা দেয় এমন সাধ্য কারও নেই। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, আজ তোমার ইচ্ছার বেগ কেউ সামলাতে পারবে না। রাজা আসবে তোমার পায়ের কাছে তার রাজদণ্ড ফেলে দিতে, ধনী আসবে তার ভাণ্ডার তোমার কাছে উজাড় করে দেবার জন্যে, যাদের আর-কিছুই নেই তারাও কেবলমাত্র মরবার জন্যে তোমার কাছে এসে সেধে পড়বে। ভালো-মন্দর বিধিবিধান সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে। রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্যে যে কী দেখেছ তা জানি নে, কিন্তু আমি আমার এই হৃৎপদ্মের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলুম। তার কাছে আমি কোথায় আছি ! সর্বনাশ গো সর্বনাশ, কী তার প্রচণ্ড শক্তি ! যতক্ষণ না সে আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে ততক্ষণ আমি তো আর বাঁচি নে, আমি তো আর পারি নে, আমার যে বুক ফেটে গেল !

বলতে বলতে সে চৌকির উপর থেকে মাটির উপর পড়ে গিয়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তার পরে ফুলে ফুলে কান্না— কান্না— কান্না।

এই তো হিপনটিজ্‌ম্‌। এই শক্তিই পৃথিবী জয় করবার শক্তি। কোনো উপায় নয়, উপকরণ নয়, এই সম্মোহন। কে বলে সত্যমেব জয়তে ? জয় হবে মোহের। বাঙালি সে কথা বুঝেছিল ; তাই বাঙালি এনেছিল দশভুজার পূজা, বাঙালি গড়েছিল সিংহবাহিনীর মূর্তি। সেই বাঙালি আবার আজ মূর্তি গড়বে, জয় করবে বিশ্ব কেবল সম্মোহনে। বন্দেমাতরং !

আস্তে আস্তে হাতে ধরে বিমলাকে চৌকির উপরে উঠিয়ে বসালুম। এই উত্তেজনার পরে অবসাদ আসবার আগেই তাকে বললুম, বাংলাদেশে মায়ের পূজা প্রতিষ্ঠা করবার ভার তিনি আমার উপরেই দিয়েছেন, কিন্তু আমি যে গরিব।

বিমলার মুখ তখনো লাল, চোখ তখনো বাষ্পে ঢাকা ; সে গদ্‌গদ কণ্ঠে বললে, তুমি গরিব কিসের ? যার যা-কিছু আছে সব যে তোমারই। কিসের জন্যে বাক্স ভরে আমার গয়না জমে রয়েছে ? আমার সমস্ত সোনা-মানিক তোমার পুজোয় নাও-না কেড়ে, আমার কিছুই দরকার নেই।

এর আগে আর-একবার বিমলা গয়না দিতে চেয়েছিল ; আমার কিছুতে বাধে না, ঐখানটায় বাধল। সংকোচটা কিসের আমি ভেবে দেখেছি। চিরদিন পুরুষই মেয়েকে গয়না দিয়ে সাজিয়ে এসেছে, মেয়ের হাত থেকে গয়না নিতে গেলে কেমন যেন পৌরুষে ঘা পড়ে।

কিন্তু এখানে নিজেকে ভোলা চাই। আমি নিচ্ছি নে। এ মায়ের পূজা, সমস্তই সেই পূজায় ঢালব। এমন সমারোহ করে করতে হবে যে তেমন পূজা এ দেশে কেউ কোনোদিন দেখে নি। চিরদিনের মতো নূতন বাংলার ইতিহাসের মর্মের মাঝখানে এই পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এই পূজাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠদানরূপে দেশকে দিয়ে যাব। দেবতার সাধনা করে দেশের মূর্খেরা, দেবতার সৃষ্টি করবে সন্দীপ।

এ তো গেল বড়ো কথা। কিন্তু ছোটো কথাও যে পাড়তে হবে। আপাতত অন্তত তিন হাজার টাকা না হলে তো চলবেই না, পাঁচ হাজার হলেই বেশ সুডোল ভাবে চলে। কিন্তু এতবড়ো উদ্দীপনার মুখে হঠাৎ এই টাকার কথাটা কি বলা চলে ? কিন্তু আর সময় নেই।

সংকোচের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে ফেললুম, রানী, এ দিকে যে ভাণ্ডার শূন্য হয়ে এল, কাজ বন্ধ হয় ব'লে।

অমনি বিমলার মুখে একটা বেদনার কুঞ্চন দেখা দিল। আমি বুঝলুম, বিমলা ভাবছে, আমি এখনই বুঝি সেই পঞ্চাশ হাজার দাবি করছি। এই নিয়ে ওর বুকের উপর পাথর চেপে রয়েছে ; বোধ হয় সারারাত ভেবেছে, কিন্তু কোনো কিনারা পায় নি। প্রেমের পূজার আর কোনো উপচার তো হাতে নেই, হৃদয়কে তো স্পষ্ট করে আমার পায়ে ঢেলে দিতে পারছে না, সেইজন্যে ওর মন চাচ্ছে এই মস্ত একটা টাকাকে ওর অবরুদ্ধ-আদরের প্রতিরূপ করে আমার কাছে এনে দিতে। কিন্তু কোনো রাস্তা না পেয়ে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। ওর ঐ কষ্টটা আমার বুকে লাগছে। ও যে এখন সম্পূর্ণ আমারই ; উপড়ে তোলবার দুঃখ এখন তো আর দরকার নেই, এখন ওকে অনেক যত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আমি বললুম, রানী, এখন সেই পঞ্চাশ হাজারের বিশেষ দরকার নেই, হিসেব করে দেখছি পাঁচ হাজার, এমন-কি, তিনি হাজার হলেও চলে যাবে।

হঠাৎ টানটা কমে গিয়ে বিমলার হৃদয় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে যেন একটা গানের মতো বললে, পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব।

যে সুরে রাধিকা গান গেয়েছিল—

> বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল
> স্বর্গে মর্তে তিন ভুবনে নাইকো যাহার মূল।
> বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে,
> সবার কানে বাজবে না সে—
> দেখ্‌ লো চেয়ে, যমুনা ওই ছাপিয়ে গেল কূল।

এ ঠিক সেই সুরই, আর সেই গানই, আর সেই একই কথা— 'পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব'।

'বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল !' বাঁশির ভিতরকার ফাঁকটি সরু বলেই, চার দিকে তার বাধা বলেই, এমন সুর। অতিলোভের চাপে বাঁশিটি যদি ভেঙে আজ চ্যাপটা করে দিতুম তা হলে শোনা যেত, কেন, এত টাকায় তোমার দরকার কী ? আর, আমি মেয়েমানুষ, অত টাকা পাবই বা কোথা ? ইত্যাদি ইত্যাদি। রাধিকার গানের সঙ্গে তার একটি অক্ষরও মিলত না। তাই বলছি, মোহটাই হল সত্য, সেইটেই বাঁশি, আর মোহ বাদ দিয়ে সেটা হচ্ছে ভাঙা বাঁশির ভিতরকার ফাঁক— সেই অত্যন্ত নির্মল শূন্যতাটা যে কী তার আস্বাদ নিখিল আজকাল কিছু পেয়েছে, ওর মুখ দেখলেই সেটা বোঝা যায়। আমার মনেও কষ্ট লাগে। কিন্তু নিখিলের বড়াই, ও সত্যকে চায়, আমার বড়াই আমি মোহটাকে পারতপক্ষে হাত থেকে ফসকাতে দেব না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। অতএব এ নিয়ে দুঃখ করে কী হবে ?

বিমলার মনটাকে সেই উপরের হাওয়াতেই উড়িয়ে রাখবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা সংক্ষেপে সেরে ফেলে, ফের আবার সেই মহিষমর্দিনীর পুজোর মন্ত্রণায় বসে গেলুম। পুজোটা হবে কবে এবং কখন ? নিখিলের এলাকায় রুইমারিতে অঘ্রানের শেষে যে হোসেনগাজির মেলা হয় সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক আসে, সেইখানে পুজোটা যদি দেওয়া যায় তা হলে খুব জমাট হয়। বিমলা উৎসাহিত হয়ে উঠল। ও মনে করলে এ তো বিলিতি কাপড় পোড়ানো নয়, লোকের ঘর জ্বালানো নয়, এত বড়ো সাধু প্রস্তাবে নিখিলের কোনো আপত্তি হবে না। আমি মনে মনে হাসলুম— যারা ন বছর দিনরাত্তির একসঙ্গে কাটিয়েছে তারাও পরস্পরকে কত অল্প চেনে ! কেবল ঘরকন্নার কথাটুকুতেই চেনে, ঘরের বাইরের কথা যখন হঠাৎ উঠে পড়ে তখন তারা আর থই পায় না। ওরা ন বছর ধরে বসে বসে এই কথাটাই ক্রমাগত বিশ্বাস করে এসেছে যে, ঘরের সঙ্গে বাইরের অবিকল মিল বুঝি আছেই ; আজ ওরা বুঝতে পারছে, কোনোদিন যে-দুটোকে মিলিয়ে নেওয়া হয় নি আজ তারা হঠাৎ মিলে যাবে কী করে।

যাক, যারা ভুল বুঝেছিল তারা ঠেকতে ঠেকতে ঠিক করে বুঝে নিক, তা নিয়ে আমার বেশি চিন্তা করবার দরকার নেই। বিমলাকে তো এই উদ্দীপনার বেগে বেলুনের মতো অনেকক্ষণ উড়িয়ে রাখা সম্ভব নয়, অতএব এই হাতের কাজটা যত শীঘ্র পারা যায় সেরে নিতে হচ্ছে। বিমলা যখন চৌকি থেকে উঠে দরজা পর্যন্ত গেছে আমি নিতান্ত যেন উড়ো রকম ভাবে বললুম, রানী, তা হলে টাকাটা কবে—

বিমলা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, এই মাসের শেষে মাস-কাবারের সময়—

আমি বললুম, না, দেরি হলে চলবে না।

তোমার কবে চাই ?

কালই।

আচ্ছা কালই এনে দেব।

নিখিলেশের আত্মকথা

আমার নামে কাগজে প্যারাগ্রাফ এবং চিঠি বেরোতে শুরু হয়েছে ; শুনছি একটা ছড়া এবং ছবি বেরোবে তারও উদ্যোগ হচ্ছে। রসিকতার উৎস খুলে গেছে, সেইসঙ্গে অজস্র মিথ্যেকথার ধারাবর্ষণে সমস্ত দেশ একেবারে পুলকিত। জানে যে এই পঙ্কিল রসের হোরিখেলায় পিচকিরিটা তাদেরই হাতে ; আমি ভদ্রলোক রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলেছি, আমার গায়ের আবরণখানা সাদা রাখবার উপায় নেই।

লিখেছে, আমার এলেকায় আপামর সাধারণ সকলেই স্বদেশীর জন্যে একেবারে উৎসুক হয়ে রয়েছে, কেবল আমার ভয়েই কিছু করতে পারছে না, দুই-একজন সাহসী যারা দিশি জিনিস চালাতে চায় জমিদারি চালে আমি তাদের বিধিমতে উৎপীড়ন করছি। পুলিসের সঙ্গে আমার তলে তলে যোগ আছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমি গোপনে চিঠি-চালাচালি করছি এবং বিশ্বস্তসূত্রে খবরের কাগজ খবর

পেয়েছে যে, পৈতৃক খেতাবের উপরেও স্বোপার্জিত খেতাব যোগ করে দেবার জন্যে আমার আয়োজন ব্যর্থ হবে না। লিখেছে, 'স্বনামা পুরুষো ধন্য, কিন্তু দেশের লোক বিনামার ফর্মাশ দিয়াছে, সে খবরও আমরা রাখি।' আমার নামটা স্পষ্ট করে দেয় নি, কিন্তু বাইরের অস্পষ্টতার ভিতর থেকে সেটা খুব বড়ো করে ফুটে উঠেছে।

এ দিকে মাতৃবৎসল হরিশ কুণ্ডুর গুণগান করে কাগজে চিঠির পর চিঠি বেরোচ্ছে। লিখেছে, মায়ের এমন সেবক দেশে যদি বেশি থাকত তা হলে এত দিনে ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানা-ঘরের চিমনিগুলো পর্যন্ত বন্দেমাতরমের সুরে সমস্বরে রামশিঙে ফুঁকতে থাকত।

এ দিকে আমার নামে লাল কালিতে লেখা একখানা চিঠি এসেছে, তাতে খবর দিয়েছে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ লিভারপুলের নিমকহালাল জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বলেছে, ভগবান পাবক এখন থেকে এই পাবনের কাজে লাগলেন ; মায়ের যারা সন্তান নয় তারা যাতে মায়ের কোল জুড়ে থাকতে না পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

নাম সই করেছে, 'মায়ের কোলের অধম শরিক, শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।'

আমি জানি, এ সমস্তই আমার এখানকার সব ছাত্রদের রচনা। আমি ওদের দুই-একজনকে ডেকে সেই চিঠিখানা দেখালুম। বি. এ. গম্ভীর ভাবে বললে, আমরাও শুনেছি দেশে একদল লোক মরিয়া হয়ে রয়েছে, স্বদেশীর বাধা দূর করতে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই।

আমি বললুম, তাদের অন্যায় জবর্দস্তিতে দেশের একজন লোকও যদি হার মানে তা হলে সেটাতে সমস্ত দেশের পরাভব।

ইতিহাসে এম. এ. বললেন, বুঝতে পারছি নে।

আমি বললুম, আমাদের দেশ দেবতাকে থেকে পেয়াদাকে পর্যন্ত ভয় করে করে আধমরা হয়ে রয়েছে, আজ তোমরা মুক্তির নাম করে সেই জুজুর ভয়কে ফের আর-এক নামে যদি দেশে চালাতে চাও, অত্যাচারের দ্বারা কাপুরুষতাটার উপরে যদি তোমাদের দেশের জয়ধ্বজা রোপণ করতে চাও, তা হলে দেশকে যারা ভালোবাসে তারা সেই ভয়ের শাসনের কাছে এক চুল মাথা নিচু করবে না।

ইতিহাসে এম. এ. বললেন, এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে রাজ্যশাসন ভয়ের শাসন নয় ?

আমি বললুম, এই ভয়ের শাসনের সীমা কোন্ পর্যন্ত সেইটের দ্বারাই দেশের মানুষ কতটা স্বাধীন জানা যায়। ভয়ের শাসন যদি চুরিডাকাতি এবং পরের প্রতি অন্যায়ের উপরেই টানা যায় তা হলে বোঝা যায় যে প্রত্যেক মানুষকে অন্য মানুষের আক্রমণ থেকে স্বাধীন করবার জন্যেই এই শাসন। কিন্তু মানুষ নিজে কী কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কার সঙ্গে বসে খাবে, এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয় তা হলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া ঘেঁষে অস্বীকার করা হয়। সেটাই হল মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা।

ইতিহাসে এম. এ. বললেন, অন্য দেশের সমাজেও কি ইচ্ছাকে গোড়া ঘেঁষে কাটবার কোথাও কোনো ব্যবস্থা নেই ?

আমি বললুম, কে বললে নেই ? মানুষকে নিয়ে দাস-ব্যাবসা যে দেশে যে পরিমাণে আছে সে পরিমাণেই মানুষ আপনাকে নষ্ট করছে।

এম. এ. বললেন, তা হলে ঐ দাস-ব্যাবসাটা মানুষেরই ধর্ম, ওটাই মনুষ্যত্ব।

বি. এ. বললেন, সন্দীপবাবু এ সম্বন্ধে সেদিন যে দৃষ্টান্ত দিলেন সেটা আমাদের মনে খুব লেগেছে। ঐ-যে ওপারে হরিশ কুণ্ডু আছেন জমিদার, কিংবা সানকিভাঙার চক্রবর্তীরা, ওঁদের সমস্ত এলেকা ঝাঁট দিয়ে আজ এক ছটাক বিলিতি নুন পাবার জো নেই। কেন ? কেননা বরাবরই ওঁরা জোরের উপরে চলেছেন, যারা স্বভাবতই দাস, প্রভু না থাকাটাই হচ্ছে তাদের সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ।

এফ. এ. -প্লাক্‌ড় ছোকরাটি বললে, একটা ঘটনা জানি, চক্রবর্তীদের একটি কায়স্থ প্রজা ছিল। সে তার একটা হাট নিয়ে চক্রবর্তীদের কিছুতে মানছিল না। মামলা করতে করতে শেষকালে তার এমন দশা হল যে খেতে পায় না। যখন দুদিন তার ঘরে হাঁড়ি চড়ল না তখন স্ত্রীর রুপোর গয়না বেচতে

বেরোল ; এই্ তার শেষ সম্বল। জমিদারের শাসনে গ্রামের কেউ তার গয়না কিনতেও সাহস করে না। জমিদারের নায়েব বললে, আমি কিনব, পাঁচ টাকা দামে। দাম তার টাকা ত্রিশ হবে। প্রাণের দায়ে পাঁচ টাকাতেই যখন সে রাজি হল তখন তার গয়নার পুঁটুলি নিয়ে নায়েব বললে, এই পাঁচ টাকা তোমার খাজনা-বাকিতে জমা করে নিলুম। এই কথা শুনে আমরা সন্দীপবাবুকে বলেছিলুম, চক্রবর্তীকে আমরা বয়কট করব। সন্দীপবাবু বললেন, এই-সমস্ত জ্যান্ত লোককেই যদি বাদ দাও তা হলে কি ঘাটের মড়া নিয়ে দেশের কাজ করবে ? এরা প্রাণপণে ইচ্ছে করতে জানে, এরাই তো প্রভু। যারা যোলো-আনা ইচ্ছে করতে জানে না তারা হয় এদের ইচ্ছেয় চলবে নয় এদের ইচ্ছেয় মরবে। তিনি আপনার সঙ্গে তুলনা করে বললেন, আজ চক্রবর্তীর এলেকায় একটি মানুষ নেই যে স্বদেশী নিয়ে টুঁ শব্দটি করতে পারে, অথচ নিখিলেশ হাজার ইচ্ছে করলেও স্বদেশী চালাতে পারবেন না।

আমি বললুম, আমি স্বদেশীর চেয়ে বড়ো জিনিস চালাতে চাই, সেইজন্যে স্বদেশী চালানো আমার পক্ষে শক্ত। আমি মরা খুঁটি চাই নে তো, আমি জ্যান্ত গাছ চাই। আমার কাজে দেরি হবে।

ঐতিহাসিক হেসে বললেন, আপনি মরা খুঁটিও পাবেন না, জ্যান্ত গাছও পাবেন না। কেননা, সন্দীপবাবুর কথা আমি মানি, পাওয়া মানেই কেড়ে নেওয়া। এ কথা শিখতে আমাদের সময় লেগেছে ; কেননা, এগুলো ইস্কুলের শিক্ষার উল্টো শিক্ষা। আমি নিজের চোখে দেখেছি, কুণ্ডুদের গোমস্তা গুরুচরণ ভাদুড়ি টাকা আদায় করতে বেরিয়েছিল। একটা মুসলমান প্রজার বেচে-কিনে নেবার মতো কিছু ছিল না। ছিল তার যুবতী স্ত্রী। ভাদুড়ি বললে, তোর বউকে নিকে দিয়ে টাকা শোধ করতে হবে। নিকে করবার উমেদার জুটে গেল, টাকাও শোধ হল। আপনাকে বলছি, স্বামীটার চোখের জল দেখে আমার রাত্রে ঘুম হয় নি, কিন্তু যতই কষ্ট হোক আমি এটা শিখেছি যে, যখন টাকা আদায় করতেই হবে তখন যে মানুষ ঋণীর স্ত্রীকে বেচিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে পারে মানুষ-হিসেবে সে আমার চেয়ে বড়ো ; আমি পারি নে, আমার চোখে জল আসে, তাই সব ফেঁসে যায়। আমার দেশকে কেউ যদি বাঁচায় তবে এই-সব গোমস্তা, এই-সব কুণ্ডু, এই-সব চক্রবর্তীরা।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ; বললুম, তাই যদি হয়, তবে এই-সব গোমস্তা এই-সব কুণ্ডু এই-সব চক্রবর্তীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার কাজই আমার। দেখো, দাসত্বের যে বিষ মজ্জার মধ্যে আছে সেইটেই যখন সুযোগ পেয়ে বাইরে ফুটে ওঠে তখনই সেটা সাংঘাতিক দৌরাত্ম্যের আকার ধরে। বউ হয়ে যে মার খায় শাশুড়ি হয়ে সে'ই সব চেয়ে বড়ো মার মারে। সমাজে যে মানুষ মাথা হেঁট করে থাকে সে যখন বরযাত্র হয়ে বেরোয় তখন তার উৎপাতে মানী গৃহস্থের মান রক্ষা করা অসাধ্য। ভয়ের শাসনে তোমরা নির্বিচারে কেবলই সকল-তাতেই সকলকে মেনে এসেছ, সেইটেকেই ধর্ম বলতে শিখেছ, সেইজন্যেই আজকে অত্যাচার করে সকলকে মানানোটাকেই তোমরা ধর্ম বলে মনে করছ। আমার লড়াই দুর্বলতার ঐ নিদারুণতার সঙ্গে।

আমার এ-সব কথা অত্যন্ত সহজ কথা, সরল লোককে বললে বুঝতে তার মুহূর্তমাত্র দেরি হয় না, কিন্তু আমাদের দেশে যে-সব এম. এ. ঐতিহাসিক বুদ্ধির প্যাঁচ কষছে সত্যকে পরাস্ত করবার জন্যেই তাদের প্যাঁচ।

এ দিকে পঞ্চুর জাল মামীকে নিয়ে ভাবছি। তাকে অপ্রমাণ করা কঠিন। সত্য ঘটনার সাক্ষীর সংখ্যা পরিমিত, এমন-কি, সাক্ষী না থাকাও অসম্ভব নয়, কিন্তু যে ঘটনা ঘটে নি জোগাড় করতে পারলে তার সাক্ষীর অভাব হয় না। আমি যে মৌরসি স্বত্ব পঞ্চুর কাছ থেকে কিনেছি সেইটে কাঁচিয়ে দেবার এই ফন্দি।

আমি নিরুপায় দেখে ভাবছিলুম পঞ্চুকে আমার নিজ এলাকাতেই জমি দিয়ে ঘরবাড়ি করিয়ে দিই। কিন্তু মাস্টারমশায় বললেন, অন্যায়ের কাছে সহজে হার মানতে পারব না। আমি নিজে চেষ্টা দেখব।

আপনি চেষ্টা দেখবেন ?

হাঁ, আমি।

এ-সমস্ত মামলা-মকদ্দমার ব্যাপার, মাস্টারমশায় যে কী করতে পারেন বুঝতে পারলুম না।

সন্ধ্যাবেলায় যে সময়ে রোজ আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সেদিন দেখা হল না। খবর নিয়ে জানলুম, তিনি তাঁর কাপড়ের বাক্স আর বিছানা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন ; চাকরদের কেবল এইটুকু বলে গেছেন, তাঁর ফিরতে দু-চারদিন দেরি হবে। আমি ভাবলুম, সাক্ষী সংগ্রহ করবার জন্যে তিনি পঞ্চুদের মামার বাড়িতেই বা চলে গেছেন। তা যদি হয় আমি জানি সে তাঁর বৃথা চেষ্টা হবে। জগদ্ধাত্রী-পুজো মহরম এবং রবিবারে জড়িয়ে তাঁর ইস্কুলের কয়দিন ছুটি ছিল ; তাই ইস্কুলেও তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না।

হেমন্তের বিকেলের দিকে দিনের আলোর রঙ যখন ঘোলা হয়ে আসতে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে মনেরও রঙ বদল হয়ে আসে। সংসারে অনেক লোক আছে যাদের মনটা কোঠাবাড়িতে বাস করে। তারা 'বাহির' বলে পদার্থকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলতে পারে। আমার মনটা আছে যেন গাছতলায়। বাইরের হাওয়ার সমস্ত ইশারা একেবারে গায়ের উপরে এসে পড়ে, আলো-অন্ধকারের সমস্ত মিড় বুকের ভিতরে বেজে ওঠে। দিনের আলো যখন প্রখর থাকে তখন সংসার তার অসংখ্য কাজ নিয়ে চার দিকে ভিড় করে দাঁড়ায়, তখন মনে হয় জীবনে এ ছাড়া আর কিছুরই দরকার নেই। কিন্তু যখন আকাশ ম্লান হয়ে আসে, যখন স্বর্গের জানলা থেকে মর্তের উপর পর্দা নেমে আসতে থাকে, তখন আমার মন বলে, জগতে সন্ধ্যা আসে সমস্ত সংসারটাকে আড়াল করবার জন্যেই ; এখন কেবল একের সঙ্গ অনন্ত অন্ধকারকে ভরে তুলবে এইটেই ছিল জল স্থল আকাশের একমাত্র মন্ত্রণা। দিনের বেলা যে প্রাণ অনেকের মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠবে সন্ধ্যার সময় সেই প্রাণই একের মধ্যে মুদে আসবে, আলো-অন্ধকারের ভিতরকার অর্থটাই ছিল এই। আমি সেটাকে অস্বীকার করে কঠিন হয়ে থাকতে পারি নে। তাই সন্ধ্যাটি যেই জগতের উপর প্রেয়সীর কালো চোখের তারার মতো অনিমেষ হয়ে ওঠে তখন আমার সমস্ত দেহমন বলতে থাকে, সত্য নয়, এ কথা কখনোই সত্য নয় যে, কেবলমাত্র কাজই মানুষের আদি অন্ত ; মানুষ একান্তই মজুর নয়, হোক-না সে সত্যের মজুরি, ধর্মের মজুরি। সেই তারার-আলোয়-ছুটি-পাওয়া কাজের-বাইরেকার মানুষ, সেই অন্ধকারের অমৃতে ডুবে মরবার মানুষটিকে তুই কি চিরদিনের মতো হারালি নিখিলেশ ? সমস্ত সংসারের অসংখ্যতাও যে জায়গায় মানুষকে লেশমাত্র সঙ্গ দিতে পারে না সেইখানে যে লোক একলা হয়েছে সে কী ভয়ানক একলা !

সেদিন বিকেলবেলাটা ঠিক যখন সন্ধ্যার মোহানাটিতে এসে পৌচেছে তখন আমার কাজ ছিল না, কাজে মনও ছিল না, মাস্টারমশায়ও ছিলেন না, শূন্য বুকটা যখন আকাশে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছিল তখন আমি বাড়ি-ভিতরের বাগানে গেলুম। আমার চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বড়ো শখ। আমি টবে করে নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকা বাগানে সাজিয়েছিলুম, যখন সমস্ত গাছ ভরে ফুল ফুটে উঠত তখন মনে হত সবুজ সমুদ্রে ঢেউ লেগে রঙের ফেনা উঠেছে। কিছুকাল আমি বাগানে যাই নি, আজ মনে মনে একটু হেসে বললুম, আমার বিরহিণী চন্দ্রমল্লিকার বিরহ ঘুচিয়ে আসি গে।

বাগানে যখন ঢুকলুম তখন কৃষ্ণ-প্রতিপদের চাঁদটি ঠিক আমাদের পাঁচিলের উপরটিতে এসে মুখ বাড়িয়েছে। পাঁচিলের তলাটিতে নিবিড় ছায়া, তারই উপর দিয়ে বাঁকা হয়ে চাঁদের আলো বাগানের পশ্চিম দিকে এসে পড়েছে। ঠিক আমার মনে হল চাঁদ যেন হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে অন্ধকারের চোখ টিপে ধরে মুচকে হাসছে।

পাঁচিলের যে ধারটিতে গ্যালারির মতো করে থাকে থাকে চন্দ্রমল্লিকার টব সাজানো রয়েছে সেই দিকে গিয়ে দেখি সেই পুষ্পিত সোপানশ্রেণীর তলায় ঘাসের উপরে কে চুপ করে শুয়ে আছে। আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। আমি কাছে যেতেই সেও চমকে তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

তার পর কী করা যায় ? আমি ভাবছি আমি এইখান থেকে ফিরে যাব কি না, বিমলাও নিশ্চয় ভাবছিল সে উঠে চলে যাবে কি না। কিন্তু থাকাও যেমন শক্ত, চলে যাওয়াও তেমনি। আমি কিছু-একটা মনস্থির করার পূর্বেই বিমলা উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

সেই একটুখানি সময়ের মধ্যেই বিমলার দুর্বিষহ দুঃখ আমার কাছে যেন মূর্তিমান হয়ে দেখা দিল। সেই মুহূর্তে আমার নিজের জীবনের নালিশ কোথায় দূরে ভেসে গেল। আমি তাকে ডাকলুম, বিমলা !

সে চমকে দাঁড়ালো। কিন্তু তখনো সে আমার দিকে ফিরল না। আমি তার সামনে এসে দাঁড়ালুম। তার দিকে ছায়া, আমার মুখের উপর চাঁদের আলো পড়ল। সে দুই হাত মুঠো করে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললুম, বিমলা, আমার এই পিঞ্জরের মধ্যে চারি দিক বন্ধ, তোমাকে কিসের জন্যে এখানে ধরে রাখব? এমন করে তো তুমি বাঁচবে না।

বিমলা চোখ বুজেই রইল, একটি কথাও বললে না।

আমি বললুম, তোমাকে যদি এমন জোর করে বেঁধে রাখি তা হলে আমার সমস্ত জীবন যে একটা লোহার শিকল হয়ে উঠবে। তাতে কি আমার কোনো সুখ আছে?

বিমলা চুপ করেই রইল।

আমি বললুম, এই আমি তোমাকে সত্য বলছি, আমি তোমাকে ছুটি দিলুম। আমি যদি তোমার আর-কিছু না হতে পারি অন্তত আমি তোমার হাতের হাত-কড়া হব না।

এই বলে আমি বাড়ির দিকে চলে গেলুম। না না, এ আমার ঔদার্য নয়, এ আমার ঔদাসীন্য তো নয়ই। আমি যে ছাড়তে না পারলে কিছুতেই ছাড়া পাব না। যাকে আমার হৃদয়ের হার করব তাকে চিরদিন আমার হৃদয়ের বোঝা করে রেখে দিতে পারব না। অন্তর্যামীর কাছে আমি জোড়হাতে কেবল এই প্রার্থনাই করছি আমি সুখ না পাই নেই পেলুম, দুঃখ পাই সেও স্বীকার, কিন্তু আমাকে বেঁধে রেখে দিয়ো না। মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে রাখার চেষ্টা যে নিজেরই গলা চেপে ধরা। আমার সেই আত্মহত্যা থেকে আমাকে বাঁচাও।

বৈঠকখানার ঘরে এসে দেখি মাস্টারমশায় বসে আছেন। তখন ভিতরে ভিতরে আবেগে আমার মন দুলছে। মাস্টারমশায়কে দেখে আমি অন্য কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার আগে বলে উঠলুম, মাস্টারমশায়, মুক্তিই হচ্ছে মানুষের সব চেয়ে বড়ো জিনিস। তার কাছে আর-কিছুই নেই, কিছুই না।

মাস্টারমশায় আমার এই উত্তেজনায় আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কিছু না বলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বললুম, বই পড়ে কিছুই বোঝা যায় না। শাস্ত্রে পড়েছিলুম ইচ্ছাটাই বন্ধন ; সে নিজেকে বাঁধে, অন্যকে বাঁধে। কিন্তু, শুধু কেবল কথা ভয়ানক ফাঁকা। সত্যি যেদিন পাখিকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি সেদিন বুঝতে পারি পাখিই আমাকে ছেড়ে দিলে। যাকে আমি খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধন যে শিকলের বাঁধনের চেয়ে শক্ত। আমি আপনাকে বলছি, পৃথিবীতে এই কথাটি কেউ বুঝতে পারছে না। সবাই মনে করছে, সংস্কার আর কোথাও করতে হবে। আর কোথাও না, কোথাও না, কেবল ইচ্ছের মধ্যে ছাড়া।

মাস্টারমশায় বললেন, আমরা মনে করি, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে হাতে করে পাওয়াই স্বাধীনতা ; কিন্তু আসলে, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা।

আমি বললুম, মাস্টারমশায়, অমন করে কথায় বলতে গেলে টাক-পড়া উপদেশের মতো শোনায় ; কিন্তু যখনই চোখে ওকে আভাসমাত্রেও দেখি তখন যে দেখি ঐটেই অমৃত। দেবতারা এইটেই পান করে অমর। সুন্দরকে আমরা দেখতেই পাই নে যতক্ষণ না তাকে আমরা ছেড়ে দিই। বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেক্‌জাণ্ডার করেন নি, এ কথা যে তখন মিথ্যেকথা যখন এটা শুকনো গলায় বলি। এই কথা কবে গান গেয়ে বলতে পারব? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই-সব প্রাণের কথা ছাপার বইকে ছাপিয়ে পড়বে কবে, একেবারে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার নির্ঝরের মতো?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল মাস্টারমশায় ক'দিন ছিলেন না, কোথায় ছিলেন তা জানিও নে। একটু লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি ছিলেন কোথায়?

মাস্টারমশায় বললেন, পঞ্চুর বাড়িতে।

পঞ্চুর বাড়িতে? এই চার দিন সেখানেই ছিলেন?

হাঁ, মনে ভাবলুম, যে মেয়েটি পঞ্চুর মামী সেজে এসেছে তার সঙ্গেই কথাবার্তা কয়ে দেখব। আমাকে দেখে প্রথমটা সে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল ; ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও যে এতবড়ো অদ্ভুত

কেউ হতে পারে এ কথা সে মনে করতেও পারে নি। দেখলে যে আমি রয়েই গেলুম। তার পরে তার লজ্জা হতে লাগল। আমি তাকে বললুম, মা, আমাকে তো তুমি অপমান করে তাড়াতে পারবে না। আর, আমি যদি থাকি তা হলে পঞ্চুকেও রাখব ; ওর মা-হারা সব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, তারা পথে বেরোবে এ তো আমি দেখতে পারব না। দুদিন আমার কথা চুপ করে শুনলে ; 'হাঁ'ও বলে না, 'না'ও বলে না ; শেষকালে আজ দেখি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধছে। বললে, আমরা বৃন্দাবনে যাব, আমাদের পথখরচ দাও। বৃন্দাবনে যাবে না জানি, কিন্তু একটু মোটারকম পথখরচ দিতে হবে। তাই তোমার কাছে এলুম।

আচ্ছা, সে যা দরকার তা দেব।

বুড়িটা লোক খারাপ নয়। পঞ্চু ওকে জলের কলসী ছুঁতে দেয় না, ঘরে এলে হাঁ-হাঁ করে ওঠে— তাই নিয়ে ওর সঙ্গে খুঁটিনাটি চলছিল। কিন্তু ওর হাতে আমার খেতে আপত্তি নেই শুনে আমাকে যত্নের একশেষ করেছে। চমৎকার রাঁধে। আমার উপরে পঞ্চুর ভক্তিশ্রদ্ধা যে একটুখানি ছিল তাও এবার চুকে গেল। আগে ওর ধারণা ছিল অন্তত, আমি লোকটা সরল ; কিন্তু এবার ওর ধারণা হয়েছে আমি যে বুড়িটার হাতে খেলুম সেটা কেবল তাকে বশ করবার ফন্দি। সংসারে ফন্দিটা চাই বটে, কিন্তু তাই বলে একেবারে ধর্মটা খোয়ানো ? মিথ্যে সাক্ষিতে আমি বুড়ির উপর যদি টেক্কা দিতে পারতুম তা হলে বটে বোঝা যেত। যা হোক, বুড়ি বিদায় হলেও কিছুদিন আমাকে পঞ্চুর ঘর আগলে থাকতে হবে, নইলে হরিশ কুণ্ডু কিছু-একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসবে। সে নাকি ওর পারিষদ্‌দের কাছে বলেছে, আমি ওর একটা জাল মামী জুটিয়ে দিলুম, ও বেটা আমার উপর টেক্কা মেরে কোথা থেকে এক জাল বাবার জোগাড় করেছে! দেখি ওর বাবা ওকে বাঁচায় কী করে।

আমি বললুম, ও বাঁচতেও পারে, মরতেও পারে, কিন্তু এই-যে এরা দেশের লোকের জন্যে হাজার রকম ছাঁচের ফাঁস-কল তৈরি করছে, ধর্মে, সমাজে, ব্যবসায়ে, সেটার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যদি হারও হয় তা হলেও আমরা সুখে মরতে পারব।

বিমলার আত্মকথা

এক জন্মে যে এতটা ঘটতে পারে সে মনেও করা যায় না। আমার যেন সাত জন্ম হয়ে গেল। এই কয় মাসে হাজার বছর পার হয়ে গেছে। সময় এত জোরে চলছিল যে, চলছে বলে বুঝতেই পারি নি। সেদিন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পেরেছি।

বাজার থেকে বিদেশী মাল বিদায় করবার কথা যখন স্বামীর কাছে বলতে গেলুম তখন জানতুম এই নিয়ে খানিকটা কথা-কাটাকাটি চলবে। কিন্তু আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে, তর্কের দ্বারা তর্ককে নিরস্ত করা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। আমার চার দিকের বায়ুমণ্ডলে একটা জাদু আছে। সন্দীপের মতো অতবড়ো একটা পুরুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো যে আমার পায়ের কাছে এসে ভেঙে পড়ল— আমি তো ডাক দিই নি, সে আমার এই হাওয়ার ডাক। আর সেদিন দেখলুম, সেই অমূল্যকে, আহা সে ছেলেমানুষ, কচি মুরলী বাঁশটির মতো সরল এবং সরস, সে আমার কাছে যখন এল তখন ভোরবেলাকার নদীর মতো দেখতে দেখতে তার জীবনের ধারার ভিতর থেকে একটি রঙ ফুটে উঠল। দেবী তাঁর ভক্তের মুখের দিকে চেয়ে যে কিরকম মুগ্ধ হতে পারেন সেদিন অমূল্যর দিকে চেয়ে আমি তা বুঝতে পারলুম। আমার শক্তির সোনার কাঠি যে কেমনতরো কাজ করে এমনি করে তো তা দেখতে পেয়েছি।

তাই সেদিন নিজের 'পরে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বজ্রবাহিনী বিদ্যুৎশিখার মতো আমার স্বামীর কাছে গিয়েছিলুম। কিন্তু, হল কী ? আজ ন বছরে একদিনও স্বামীর চোখে এমন উদাস দৃষ্টি দেখি নি। সে যেন মরুভূমির আকাশের মতো, তার নিজের মধ্যেও একটুখানি রসের বাষ্প নেই, আর যার দিকে

তাকিয়ে আছে তার মধ্যেও যেন কোথাও কিছুমাত্র রঙ দেখা যাচ্ছে না। একটু যদি রাগও করতেন তা হলেও বাঁচতুম। কোথাও তাঁকে ছুঁতেও পারলুম না। মনে হল আমি মিথ্যে। যেন আমি স্বপ্ন; স্বপ্নটা যেই ভেঙে গেল, অমনি কেবল অন্ধকার রাত্রি।

এতকাল রূপের জন্যে আমার রূপসী জা'দের ঈর্ষা করে এসেছি। মনে জানতুম বিধাতা আমাকে শক্তি দেন নি, আমার স্বামীর ভালোবাসাই আমার একমাত্র শক্তি। আজ যে শক্তির মদ পেয়ালা ভরে খেয়েছি, নেশা জমে উঠেছে। এমন সময় হঠাৎ পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল। এখন বাঁচি কী করে!

তাড়াতাড়ি খোঁপা বাঁধতে বসেছিলুম! লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! মেজোরানীর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি বলে উঠলেন, কী লো ছোটোরানী, খোঁপাটা যে মাথা ডিঙিয়ে লাফ মারতে চায়, মাথাটা ঠিক আছে তো?

সেদিন বাগানে স্বামী আমাকে অনায়াসে বললেন, তোমাকে ছুটি দিলুম। ছুটি কি এতই সহজে দেওয়া যায় কিংবা নেওয়া যায়? ছুটি কি একটা জিনিস? ছুটি যে ফাঁকা। মাছের মতো আমি যে চিরদিন আদরের জলে সাঁতার দিয়েছি, হঠাৎ আকাশে তুলে ধরে যখন বললে 'এই তোমার ছুটি'— তখন দেখি এখানে আমি চলতেও পারি নে, বাঁচতেও পারি নে।

আজ শোবার ঘরে যখন ঢুকি তখন শুধু দেখি আসবাব, শুধু আলনা, শুধু আয়না, শুধু খাট! এর উপরে সেই সর্বব্যাপী হৃদয়টি নেই। রয়েছে ছুটি, কেবল ছুটি, একটা ফাঁক। ঝর্না একেবারে শুকিয়ে গেল, পাথর আর নুড়িগুলো বেরিয়ে পড়েছে। আদর নেই, আসবাব!

এ জগতে সত্য আমার পক্ষে কোথায় কতটুকু টিকে আছে সে সম্বন্ধে হঠাৎ যখন এতবড়ো একটা ধাঁধা লাগল তখন আবার দেখা হল সন্দীপের সঙ্গে। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের ধাক্কা লেগে সেই আগুন তো আবার তেমনি করেই জ্বলল। কোথায় মিথ্যে? এ যে ভরপুর সত্য, দুই কূল ছাপিয়ে-পড়া সত্য। এই-যে মানুষগুলো সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা কচ্ছে, হাসছে— ঐ-যে বড়োরানী মালা জপছেন, মেজোরানী থাকো দাসীকে নিয়ে হাসছেন, পাঁচালীর গান গাচ্ছেন— আমার ভিতরকার এই আবির্ভাব যে এই-সমস্তর চেয়ে হাজার গুণে সত্য।

সন্দীপ বললেন, পঞ্চাশ হাজার চাই। আমার মাতাল মন বলে উঠল, পঞ্চাশ হাজার কিছুই নয়, এনে দেব! কোথায় পাব, কী করে পাব, সেও কি একটা কথা! এই তো আমি নিজে এক মুহূর্তে কিছু-না থেকে একেবারে সব-কিছুকে যেন ছাড়িয়ে উঠেছি! এমনি করেই এক ইশারায় সব ঘটনা ঘটবে। পারব পারব পারব! একটুও সন্দেহ নেই।

চলে তো এলুম। তার পর চার দিকে চেয়ে দেখি, টাকা কই? কল্পতরু কোথায়? বাহিরটা মনকে এমন করে লজ্জা দেয় কেন? কিন্তু তবু টাকা এনে দেবই। যেমন করেই হোক, তাতে গ্লানি নেই। যেখানে দীনতা সেখানেই অপরাধ, শক্তিকে কোনো অপরাধ স্পর্শই করে না। চোরই চুরি করে, বিজয়ী রাজা লুঠ করে নেয়। কোথায় মালখানা, সেখানে কার হাতে টাকা জমা হয়, পাহারা দেয় কারা, এই-সব সন্ধান করছি! অর্ধেক রাত্রে বাহির-বাড়িতে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দফতরখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কাটিয়েছি। ঐ লোহার গরাদের মুঠো থেকে পঞ্চাশ হাজার ছিনিয়ে নেব কী করে? মনে দয়া ছিল না। যারা পাহারা দিচ্ছে তারা যদি মন্ত্রে ঐখানে মরে পড়ে তা হলে এখনই আমি উন্মত্ত হয়ে ঐ ঘরের মধ্যে ছুটে যেতে পারি। এই বাড়ির রানীর মনের মধ্যে ডাকাতের দল খাঁড়া হাতে নৃত্য করতে করতে দেবীর কাছে বর মাগতে লাগল— কিন্তু বাইরের আকাশ নিঃশব্দ হয়ে রইল, প্রহরে প্রহরে পাহারা বদল হতে লাগল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল, বৃহৎ রাজবাড়ি নির্ভয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে রইল।

শেষকালে একদিন অমূল্যকে ডাকলুম। বললুম, দেশের জন্যে টাকার দরকার, খাজাঞ্চির কাছ থেকে এ টাকা বের করে আনতে পারবে না?

সে বুক ফুলিয়ে বললে, কেন পারব না?

হায় রে, আমিও সন্দীপের কাছে এমনি করে বলেছিলুম 'কেন পারব না'। অমূল্যর বুক-ফোলানো দেখে একটুও আশ্বাস পেলুম না।

জিজ্ঞাসা করলুম, কী করবে বলো দেখি।

অমূল্য এমনি-সব আজগুবি প্ল্যান বলতে লাগল যে, সে মাসিক কাগজের ছোটো গল্পে ছাড়া আর কোথাও প্রকাশ করবারই যোগ্য নয়।

আমি বললুম, না অমূল্য, ও-সব ছেলেমানুষি রাখো।

সে বললে, আচ্ছা, টাকা দিয়ে ঐ পাহারার লোকদের বশ করব।

টাকা পাবে কোথায় ?

সে অম্লানমুখে বললে, বাজার লুঠ ক'রে।

আমি বললুম, ও-সব দরকার নেই, আমার গয়না আছে তাই দিয়ে হবে।

অমূল্য বললে, কিন্তু খাজাঞ্চির উপর ঘুষ চলবে না। খুব একটা সহজ ফিকির আছে।

কিরকম ?

সে আপনার শুনে কাজ নেই। সে খুব সহজ।

তবু শুনি।

অমূল্য কোর্তার পকেট থেকে প্রথমে একটা পকেট-এডিশন গীতা বের করে টেবিলের উপর রাখলে, তার পরে একটি ছোটো পিস্তল বের করে আমাকে দেখালে, আর-কিছু বললে না।

কী সর্বনাশ ! আমাদের বুড়ো খাজাঞ্চিকে মারার কথা মনে করতে ওর এক মুহূর্তও দেরি হল না। ওর মুখখানি এমনতরো যে মনে হয়, একটা কাক মারাও ওর পক্ষে শক্ত, অথচ মুখের কথা একেবারে অন্য জাতের। আসল কথা, এই সংসারে বুড়ো খাজাঞ্চি যে কতখানি সত্য তা ও একেবারে দেখতে পাচ্ছে না, সেখানে যেন ফাঁকা আকাশ। সেই আকাশে প্রাণ নেই, ব্যথা নেই, কেবল শ্লোক আছে ; ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

আমি বললুম, বল কী অমূল্য ! আমাদের রায়মশায়ের যে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, তার যে—

স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই এমন মানুষ এ দেশে পাব কোথায় ? দেখুন, আমরা যাকে দয়া বলি সে কেবল নিজের 'পরেই দয়া, পাছে নিজের দুর্বল মনে ব্যথা লাগে সেইজন্যেই অন্যকে আঘাত করতে পারি নে, এই তো হল কাপুরুষতার চূড়ান্ত !

সন্দীপের মুখের বুলি বালকের মুখে শুনে বুক কেঁপে উঠল। ও যে নিতান্ত কাঁচা, ভালোকে ভালো বলে বিশ্বাস করবারই যে ওর সময়। আহা, ওর যে বাঁচবার বয়েস, বাড়বার বয়েস। আমার ভিতরে মা জেগে উঠল যে ! নিজের দিক থেকে আমার ভালোও ছিল না, মন্দও ছিল না, ছিল কেবল মরণ মধুর রূপ ধ'রে ; কিন্তু যখন এই আঠারো বছরের ছেলে এমন অনায়াসে মনে করতে পারলে একজন বুড়োমানুষকে বিনা দোষে মেরে ফেলাই ধর্ম তখন আমার গা শিউরে উঠল। যখন দেখতে পেলুম ওর মনে পাপ নেই তখন ওর এই কথার পাপ বড়ো ভয়ংকর হয়ে আমার কাছে দেখা দিলে। যেন বাপমায়ের অপরাধকে কচি ছেলের মধ্যে দেখতে পেলুম।

বিশ্বাসে উৎসাহে ভরা বড়ো বড়ো ঐ দুটি সরল চোখের দিকে চেয়ে আমার প্রাণের ভিতর কেমন করতে লাগল। অজগর সাপের মুখের মধ্যে ঢুকতে চলেছে, একে কে বাঁচাবে ? আমার দেশ কেন সত্যিকার মা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এই ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরছে না ? কেন একে বলছে না, 'ওরে বাছা, আমাকে তুই বাঁচিয়ে কী করবি তোকে যদি বাঁচাতে না পারলুম' ?

জানি জানি, পৃথিবীর বড়ো বড়ো প্রতাপ শয়তানের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে, কিন্তু মা যে আছে একলা দাঁড়িয়ে এই শয়তানের সমৃদ্ধিকে তুচ্ছ করবার জন্যে। মা তো কার্যসিদ্ধি চায় না, সে সিদ্ধি যতবড়ো সিদ্ধিই হোক, মা যে বাঁচাতে চায়। আজ আমার সমস্ত প্রাণ চাচ্ছে এই ছেলেটিকে দুই হাতে টেনে ধরে বাঁচাবার জন্যে।

কিছু আগেই ওকে ডাকাতি করতে বলেছিলুম, এখন যতবড়ো উল্টো কথাই বলি সেটাকে ও

মেয়েমানুষের দুর্বলতা বলে হাসবে। মেয়েমানুষের দুর্বলতাকে ওরা তখনই মাথা পেতে নেয় যখন সে পৃথিবী মজাতে বসে।

অমূল্যকে বললুম, যাও, তোমাকে কিছু করতে হবে না, টাকা সংগ্রহ করবার ভার আমারই উপর।

যখন সে দরজা পর্যন্ত গেছে তাকে ডাক দিয়ে ফেরালুম ; বললুম, অমূল্য, আমি তোমার দিদি। আজ ভাইফোঁটার পাঁজির তিথি নয়, কিন্তু ভাইফোঁটার আসল তিথি বছরে তিন শো পঁয়ষট্টি দিন। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন।

হঠাৎ আমার মুখ থেকে এই কথা শুনে অমূল্য একটু থমকে রইল। তার পরেই প্রণাম করে আমার পায়ের ধুলো নিলে। উঠে যখন দাঁড়ালো তার চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে।

ভাই আমার, আমি তো মরতেই বসেছি, তোমার সব বালাই নিয়ে যেন মরি— আমা হতে তোমার কোনো অপরাধ যেন না হয়।

অমূল্যকে বললুম, তোমার পিস্তলটি আমাকে প্রণামী দিতে হবে।

কী করবে দিদি ?

মরণ প্র্যাকটিস করব।

এই তো চাই দিদি, মেয়েদেরও মরতে হবে, মারতে হবে। এই বলে অমূল্য পিস্তলটি আমার হাতে দিলে।

অমূল্য তার তরুণ মুখের দীপ্তিরেখা আমার জীবনের মধ্যে নূতন উষার প্রথম-অরুণলেখাটির মতো এঁকে দিয়ে গেল। পিস্তলটাকে বুকের কাপড়ের ভিতর নিয়ে বললুম, এই রইল আমার উদ্ধারের শেষ সম্বল, আমার ভাইফোঁটার প্রণামী।

নারীর হৃদয়ে যেখানে মায়ের আসন আমার সেইখানকার জানলাটি হঠাৎ এই একবার খুলে গিয়েছিল। তখন মনে হল, এখন থেকে বুঝি তবে খোলাই রইল।

কিন্তু শ্রেয়ের পথ আবার বন্ধ হয়ে গেল, প্রেয়সী নারী এসে মাতার স্বস্ত্যয়নের ঘরে তালা লাগিয়ে দিলে।

পরের দিনে সন্দীপের সঙ্গে আবার দেখা। একটা উলঙ্গ পাগলামি আবার হৃৎপিণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য শুরু করে দিলে। কিন্তু এ কী এ ! এই কি আমার স্বভাব ? কখনোই না।

এই নির্লজ্জকে এই নিদারুণকে এর আগে কোনোদিন দেখি নি। সাপুড়ে হঠাৎ এসে এই সাপকে আমার আঁচলের ভিতর থেকে বের করে দেখিয়ে দিলে ; কিন্তু কখনোই এ আমার আঁচলের মধ্যে ছিল না, এ ঐ সাপুড়েরই চাদরের ভিতরকার জিনিস। অপদেবতা কেমন করে আমার উপর ভর করেছে ! আজ আমি যা-কিছু করছি সে আমার নয়, সে তারই লীলা।

সেই অপদেবতা একদিন রাঙা মশাল হাতে করে এসে আমাকে বললে, আমিই তোমার দেশ, আমিই তোমার সন্দীপ, আমার চেয়ে বড়ো তোমার আর কিছুই নেই, বন্দেমাতরং ! আমি হাত জোড় করে বললুম, তুমিই আমার ধর্ম, তুমিই আমার স্বর্গ, আমার যা-কিছু আছে সব তোমার প্রেমে ভাসিয়ে দেব। বন্দেমাতরং !

পাঁচ হাজার চাই ? আচ্ছা, পাঁচ হাজারই নিয়ে যাব। কালই চাই ? আচ্ছা, কালই পাবে। কলঙ্কে দুঃসাহসে ঐ পাঁচ হাজার টাকার দান মদের মতো ফেনিয়ে উঠবে ; তার পরে মাতালের উৎসব ; অচলা পৃথিবী পায়ের তলায় টলমল করতে থাকবে, চোখের উপর আগুন ছুটবে, কানের ভিতর ঝড়ের গর্জন জাগবে, সামনে কী আছে কী নেই তা বুঝতেই পারব না ; তার পরে টলতে টলতে পড়ব গিয়ে মরণের মধ্যে ; সমস্ত আগুন এক নিমেষে নিবে যাবে, সমস্ত ছাই হাওয়ায় উড়বে— কিছুই আর বাকি থাকবে না।

টাকা কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে কথা এর আগে কোনোমতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না। সেদিন তীব্র উত্তেজনার আলোতে এই টাকাটা হঠাৎ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম।

ফি বছর আমার স্বামী পুজোর সময় তাঁর বড়ো ভাজ আর মেজো ভাজকে তিন হাজার টাকা করে

প্রণামী দিয়ে থাকেন। সেই টাকা বছরে বছরে তাঁদের নামে ব্যাঙ্কে জমা হয়ে সুদে বাড়ছে। এবারেও নিয়মমত প্রণামী দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জানি টাকাটা এখনো ব্যাঙ্কে পাঠানো হয় নি। কোথায় আছে তাও আমার জানা। আমাদের শোবার ঘরের সংলগ্ন কাপড়-ছাড়বার ছোটো কুঠরির কোণে লোহার সিন্দুক আছে, তারই মধ্যে টাকাটা তোলা হয়েছে।

ফি বছরে এই টাকা নিয়ে আমার স্বামী কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা দিতে যান ; এবারে তাঁর আর যাওয়া হল না। এইজন্যেই তো দৈবকে মানি। এই টাকা দেশ নেবেন বলেই আটক আছে। এ টাকা ব্যাঙ্কে নিয়ে যায় সাধ্য কার ? আর এই টাকা আমি না নিই এমন সাধ্যই বা আমার কই ? প্রলয়ংকরী খর্পর বাড়িয়ে দিয়েছেন ; বলছেন, আমি ক্ষুধিত, আমাকে দে ! আমি আমার বুকের রক্ত দিলুম, ঐ পাঁচ হাজার টাকায়। মা গো, এই টাকা যার গেল তার সামান্যই ক্ষতি হবে, কিন্তু আমাকে এবার তুমি একেবারে ফতুর করে নিলে।

এর আগে কতদিন বড়োরানী-মেজোরানীকে আমি মনে মনে চোর বলেছি ; আমার বিশ্বাসপরায়ণ স্বামীকে ভুলিয়ে তাঁরা ফাঁকি দিয়ে কেবল টাকা নিচ্ছেন, এই ছিল আমার নালিশ ; তাঁদের স্বামীদের মৃত্যুর পরে অনেক সরকারি জিনিসপত্র তাঁরা লুকিয়ে সরিয়েছেন, এ কথা অনেকবার স্বামীকে বলেছি। তিনি তার কোনো জবাব না করে চুপ করে থাকতেন। তখন আমার রাগ হত ; আমি বলতুম, দান করতে হয় হাতে তুলে দান করো, কিন্তু চুরি করতে দেবে কেন ? বিধাতা সেদিন আমার এই নালিশ শুনে মুচকে হেসেছিলেন, আজ আমি আমার স্বামীর সিন্দুক থেকে ঐ বড়োরানীর মেজোরানীর টাকা চুরি করতে চলেছি !

রাত্রে আমার স্বামী সেই ঘরেই তাঁর জামাকাপড় ছাড়েন, সেই জামার পকেটেই তাঁর চাবি থাকে। সেই চাবি বের করে নিয়ে লোহার সিন্দুক খুললুম। অল্প যে একটু শব্দ হল, মনে হল সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল। হঠাৎ একটা শীতে আমার হাত-পা হিম হয়ে বুকের মধ্যে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকল।

লোহার সিন্দুকের মধ্যে একটা টানা দেরাজ আছে। সেইটে খুলে দেখলুম নোট নেই, কাগজের মোড়কে ভাগ করা গিনি সাজানো। প্রতি মোড়কে কত গিনি আছে, আমার কত দরকার, সে তখন হিসেব করবার সময় নয়। কুড়িটি মোড়ক ছিল, সবক'টা নিয়েই আমার আঁচলে বাঁধলুম। কম ভারী নয় ! চুরির ভারে আমার মন যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ! হয়তো নোটের তাড়া হলে সেটাকে এত বেশি চুরি বলে মনে হত না। এ যে সব সোনা !

সেই রাত্রে নিজের ঘরে যখন চোর হয়ে ঢুকতে হল তখন থেকে এ ঘর আমার আর আপন রইল না। এ ঘরে আমার কত বড়ো অধিকার ! চুরি করে সব খোয়ালুম।

মনে মনে জপতে লাগলুম, বন্দেমাতরং, বন্দেমাতরং ! দেশ, আমার দেশ, আমার সোনার দেশ ! সব সোনা সেই দেশের সোনা, এ আর কারও নয় !

কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে মন যে দুর্বল হয়ে থাকে। স্বামী পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন, চোখ বুজে তাঁর ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলুম। অন্তঃপুরের খোলা ছাদের উপর গিয়ে সেই আঁচলে বাঁধা চুরির উপর বুক দিয়ে মাটিতে পড়ে রইলুম, সেই মোড়কগুলো বুকে বাজতে লাগল। নিস্তব্ধ রাত্রি আমার শিয়রের কাছে তর্জনী তুলে রইল। ঘরকে তো আমি দেশ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে পারলুম না। আজ ঘরকে লুটেছি, দেশকেই লুটেছি ; এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার ঘর রইল না, দেশও হয়ে গেল পর। আমি যদি ভিক্ষে করে দেশের সেবা করতুম এবং সেই সেবা সম্পূর্ণ না করেও মরে যেতুম, তবে সেই অসমাপ্ত সেবাই হত পূজা, দেবতা তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু চুরি তো পূজা নয় ; এ জিনিস কেমন করে দেশের হাতে তুলে দেব ! চোরাই মালে দেশের ভরা ডোবাতে বসলুম গো ! নিজে মরতে বসেছি, কিন্তু দেশকে আঁকড়ে ধরে তাকে সুদ্ধ কেন অশুচি করি !

এ টাকা লোহার সিন্দুকে ফেরবার পথ বন্ধ। আবার এই রাত্রে সেই ঘরে ফিরে গিয়ে সেই চাবি নিয়ে সেই সিন্দুক খোলবার শক্তি আমার নেই। আমি তা হলে স্বামীর ঘরের চৌকাঠের কাছে অজ্ঞান

হয়ে পড়ে যাব। এখন সামনে রাস্তা ছাড়া রাস্তাই নেই।

কত টাকা নিলুম তাই যে বসে বসে গুনব, সে আমি লজ্জায় পারলুম না। ও যেমন ঢাকা আছে তেমনি ঢাকা থাক্, চুরির হিসেব করব না।

শীতের অন্ধকার রাত্রে আকাশে একটুও বাষ্প ছিল না ; সমস্ত তারাগুলি ঝক্ ঝক্ করছে। আমি ছাদের উপর শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম দেশের নাম করে ঐ তারাগুলি যদি একটি একটি মোহরের মতো আমাকে চুরি করতে হত, অন্ধকারের বুকের মধ্যে সঞ্চিত ঐ তারাগুলি, তার পরদিন থেকে চিরকালের জন্যে রাত্রি একেবারে বিধবা, নিশীথের আকাশ একেবারে অন্ধ, তা হলে সে চুরি যে সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি হত। আজ আমি এই-যে চুরি করে আনলুম এও তো টাকা-চুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালের আলো চুরিরই মতো ; এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি, বিশ্বাস-চুরি, ধর্ম-চুরি।

ছাদের উপর পড়ে রাত্রি কেটে গেল। সকালে যখন বুঝলুম আমার স্বামী এতক্ষণে উঠে চলে গেছেন তখন সর্বাঙ্গে শাল মুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে চললুম। তখন মেজোরানী ঘটিতে করে তাঁর বারান্দার টবের গাছ-ক'টিতে জল দিচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, ওলো ছোটোরানী, শুনেছিস খবর ?

আমি চুপ করে দাঁড়ালুম, আমার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। মনে হতে লাগল, আঁচলে বাঁধা গিনিগুলো শালের ভিতর থেকে বড়ো বেশি উঁচু হয়ে আছে। মনে হল, এখনই আমার কাপড় ছিঁড়ে গিনিগুলো বারান্দাময় ঝন্ ঝন্ করে ছড়িয়ে পড়বে, নিজের ঐশ্বর্য চুরি করে ফতুর হয়ে গেছে এমন চোর আজ এই বাড়ির দাসী-চাকরদের কাছেও ধরা পড়ে যাবে।

মেজেরানী বললেন, তোদের দেবীচৌধুরানীর দল ঠাকুরপোর তহবিল লুঠ করবে শাসিয়ে বেনামি চিঠি লিখেছে।

আমি চোরের মতোই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আমি ঠাকুরপোকে বলছিলুম তোমার শরণাপন্ন হতে। দেবী, প্রসন্ন হও গো, তোমার দলবল ঠেকাও। আমরা তোমার বন্দেমাতরমের শিন্নি মানছি। দেখতে দেখতে অনেক কাণ্ডই তো হল, এখন দোহাই তোমার, ঘরে সিঁদটা ঘটতে দিয়ো না।

আমি কিছু না বলে তাড়াতাড়ি আমার শোবার ঘরে চলে গেলুম। চোরাবালিতে পা দিয়ে ফেলেছি, আর ওঠবার জো নেই, এখন যত ছটফট করব ততই ডুবতে থাকব।

এ টাকাটা এক্ষনি আমার আঁচল থেকে খসিয়ে সন্দীপের হাতে দিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচি, এ বোঝা আমি আর বইতে পারি নে, আমার পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্ছে।

সকালবেলাতেই খবর পেলুম সন্দীপ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আজ আর আমার সাজসজ্জা ছিল না, শাল মুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলুম।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখি সন্দীপের সঙ্গে অমূল্য বসে আছে। মনে হল আমার মানসম্ভ্রম যা-কিছু বাকি ছিল সমস্ত যেন ঝিম্ ঝিম্ করে আমার গা বেয়ে নেবে গিয়ে পায়ের তলা দিয়ে একেবারে মাটির মধ্যে চলে গেল। নারীর চরম অমর্যাদা ঐ বালকের সামনে আজ আমাকে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে হবে। আমার এই চুরির কথা এরা আজ দলের মধ্যে বসে আলোচনা করছে ! এর উপরে অল্প একটুখানিও আবরু রাখতে দেয় নি !

পুরুষমানুষকে আমরা বুঝব না। ওরা যখন ওদের উদ্দেশ্যের রথ টানবার পথ তৈরি করতে বসে তখন বিশ্বের হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে ভেঙে পথের খোওয়া বিছিয়ে দিতে ওদের একটুও বাধে না। ওরা নিজের হাতে সৃষ্টি করবার নেশায় যখন মেতে ওঠে তখন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে চুরমার করতেই ওদের আনন্দ ! আমার এই মর্মান্তিক লজ্জা ওদের চোখের কোণেও পড়বে না, প্রাণের 'পরে দরদ নেই ওদের, ওদের যত ব্যগ্রতা সব উদ্দেশ্যের দিকে। হায় রে, এদের কাছে আমি কেই বা ! বন্যার মুখের কাছে একটা মেঠো ফুলের মতো।

কিন্তু আমাকে এমন করে নিবিয়ে ফেলে সন্দীপের লাভ হল কী ? এই পাঁচ হাজার টাকা ? কিন্তু আমার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না কি ? ছিল বৈকি। সেই খবর তো সন্দীপের কাছেই শুনেছিলুম, আর সেই শুনেই তো আমি সংসারের সমস্তকে তুচ্ছ করতে পেরেছিলুম। আমি আলো দেব, আমি জীবন দেব, আমি শক্তি দেব, আমি অমৃত দেব, সেই বিশ্বাসে সেই আনন্দে দুই কূল ছাপিয়ে আমি বাহির হয়ে পড়েছিলুম। আমার সেই আনন্দকে যদি কেউ পূর্ণ করে তুলত তা হলে আমি মরে গিয়েও বাঁচতুম, আমার সমস্ত সংসার ভাসিয়ে দিয়েও আমার লোকসান হত না।

আজ কি এরা বলতে চায় এ সমস্তই মিথ্যে কথা ? আমার মধ্যে যে দেবী আছে ভক্তকে বরাভয় দেবার শক্তি তার নেই ? আমি যে স্তবগান শুনেছিলুম, যে গান শুনে স্বর্গ হতে ধুলোয় নেমে এসেছিলুম, সে কি এই ধুলোকে স্বর্গ করবার জন্যে নয় ? সে কি স্বর্গকেই মাটি করবার জন্যে ?

সন্দীপ আমার মুখের দিকে তার তীব্র দৃষ্টি রেখে বললে, টাকা চাই রানী !

অমূল্য আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, সেই বালক, সে আমার মায়ের গর্ভে জন্মায় নি বটে, কিন্তু সে তার মায়ের গর্ভে জন্মেছিল— সেই মা, সে যে একই মা ! আহা, ঐ কচি মুখ, ঐ স্নিগ্ধ চোখ, ঐ তরুণ বয়েস ! আমি মেয়েমানুষ, আমি ওর মায়ের জাত, ও আমাকে বললে কিনা 'আমার হাতে বিষ তুলে দাও', আর আমি ওর হাতে বিষই তুলে দেব !

টাকা চাই রানী !—

রাগে লজ্জায় আমার ইচ্ছে হল সেই সোনার বোঝা সন্দীপের মাথার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিই। আমি কিছুতেই আঁচলের গিরে যেন খুলতে পারছিলুম না, থর্থর্ করে আমার আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। তার পর টেবিলের উপর সেই কাগজের মোড়কগুলো যখন পড়ল তখন সন্দীপের মুখ কালো হয়ে উঠল। সে নিশ্চয় ভাবলে ঐ মোড়কগুলোর মধ্যে আধুলি আছে। কী ঘৃণা ! অক্ষমতার উপরে কী নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ! মনে হল ও যেন আমাকে মারতে পারে। সন্দীপ ভাবলে, আমি বুঝি ওর সঙ্গে দর করতে বসেছি, ওর পাঁচ হাজার টাকার দাবি দু-তিন শো টাকা দিয়ে রফা করতে চাই। একবার মনে হল, এই মোড়কগুলো নিয়ে ও জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ও কি ভিক্ষুক ? ও যে রাজা !

অমূল্য জিজ্ঞাসা করলে, আর নেই রানীদিদি ?

করুণায় ভরা তার গলা। আমার মনে হল আমি বুঝি চীৎকার করে কেঁদে উঠব। প্রাণপণে হৃদয়কে যেন চেপে ধরে একটু কেবল ঘাড় নাড়লুম। সন্দীপ চুপ করে রইল ; মোড়কগুলো ছুঁলেও না, একটা কথাও বললে না।

চলে যাব ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই আমার পা চলছে না। পৃথিবী দু ফাঁক হয়ে আমাকে যদি টেনে নিত তা হলেই এই মাটির পিণ্ড মাটির মধ্যে আশ্রয় পেয়ে বাঁচত।

আমার অপমান ঐ বালকের বুকে গিয়ে বাজল। সে হঠাৎ খুব একটা আনন্দের ভান করে বলে উঠল, এই কম কী ! এতেই ঢের হবে। তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ রানীদিদি।

বলেই সে একটা মোড়ক খুলে ফেললে, গিনিগুলো ঝক্ ঝক্ করে উঠল।

এক মুহূর্তে সন্দীপের মুখের যেন একটা কালো মোড়ক খুলে গেল। তারও মুখ চোখ আনন্দে ঝক্ ঝক্ করতে লাগল। মনের ভিতরকার এই হঠাৎ উল্টো হাওয়ার দমকা সামলাতে না পেরে সে চৌকি থেকে লাফিয়ে উঠে আমার কাছে ছুটে এল। কী তার মতলব ছিল জানি নে। আমি বিদ্যুতের মতো অমূল্যের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলুম, হঠাৎ একটা চাবুক খেয়ে তার মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে সন্দীপকে ঠেলা দিলুম। পাথরের টেবিলের উপর মাথাটা তার ঠক্ করে ঠেকল, তার পরে সেখান থেকে সে মাটিতে পড়ে গেল, কিছুক্ষণ তার আর সাড়া রইল না। এই প্রবল চেষ্টার পরে আমার শরীরে আর একটুও বল ছিল না, আমি চৌকির উপরে বসে পড়লুম। অমূল্যের মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল, সে সন্দীপের দিকে ফিরেও তাকালে না, আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমার পায়ের কাছে বসল। ওরে ভাই, ওরে বাছা, তোর এই শ্রদ্ধাটুকু আজ আমার শূন্য বিশ্বপাত্রের শেষ সুধাবিন্দু। আর আমি পারলুম না, আমার কান্না ভেঙে পড়ল। আমি দুই হাতে আঁচল

দিয়ে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। মাঝে মাঝে আমার পায়ের উপর অমূল্যের করুণ হাতের স্পর্শ যতই পাই আমার কান্না ততই ফেটে পড়তে চায়।

খানিকক্ষণ পরে সামলে উঠে চোখ খুলে দেখি যেন একেবারে কিছুই হয় নি এমনিভাবে সন্দীপ টেবিলের কাছে বসে গিনিগুলো রুমালে বাঁধছে। অমূল্য আমার পায়ের কাছ থেকে উঠে দাঁড়ালো, ছল্‌ছল্‌ করছে তার চোখ।

সন্দীপ অসংকোচে আমাদের মুখের দিকে চোখ তুলে বললে, ছ হাজার টাকা।

অমূল্য বললে, এত টাকা তো আমাদের দরকার নেই সন্দীপবাবু। হিসেব করে দেখেছি, সাড়ে তিন হাজার টাকা হলেই আমাদের এখনকার কাজ উদ্ধার হবে।

সন্দীপ বললে, আমাদের কাজ তো কেবলমাত্র এখনকার কাজই নয়। আমাদের যা দরকার তার কি সংখ্যা আছে?

অমূল্য বললে, তা হোক, ভবিষ্যতে যা দরকার হবে তার জন্যে আমি দায়ী, আপনি ঐ আড়াই হাজার টাকা রানীদিদিকে ফিরিয়ে দিন।

সন্দীপ আমার মুখের দিকে চাইলে। আমি বলে উঠলুম, না না, ও টাকা আমি আর ছুঁতেও চাই নে। ও নিয়ে তোমাদের যা-খুশি তাই করো।

সন্দীপ অমূল্যর দিকে চেয়ে বললে, মেয়েরা যেমন করে দিতে পারে এমন কি পুরুষ পারে?

অমূল্য উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, মেয়েরা যে দেবী!

সন্দীপ বললে, আমরা পুরুষরা বড়ো জোর আমাদের শক্তিকে দিতে পারি, মেয়েরা যে আপনাকে দেয়। ওরা আপনার প্রাণের ভিতর থেকে সন্তানকে জন্ম দেয়, পালন করে, বাহির থেকে নয়। এই দানই তো সত্য দান।

এই বলে সন্দীপ আমার দিকে চেয়ে বললে, রানী, আজ তুমি যা দিলে এ যদি কেবলমাত্র টাকা হত তা হলে আমি এ ছুঁতুম না, তুমি আপনার প্রাণের চেয়ে বড়ো জিনিস দিয়েছ।

মানুষের বোধ হয় দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারে সন্দীপ আমাকে ভোলাচ্ছে, কিন্তু আমার আর-একটা বুদ্ধি ভোলে। সন্দীপের চরিত্র নেই, সন্দীপের শক্তি আছে। সেইজন্যে ও যে মুহূর্তে প্রাণকে জাগিয়ে তোলে সেই মুহূর্তেই মৃত্যুবাণও মারে। দেবতার অক্ষয় তূণ ওর হাতে আছে, কিন্তু তূণের মধ্যে দানবের অস্ত্র।

সন্দীপের রুমালে সব গিনি ধরছিল না; সে বললে, রানী, তোমার একখানি রুমাল আমাকে দিতে পার?

আমি রুমাল বের করে দিতেই সেই রুমালটি নিয়ে সে মাথায় ঠেকালে, তার পরেই আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে আমাকে প্রণাম করে বললে, দেবী, তোমাকে এই প্রণামটি দেবার জন্যেই ছুটে এসেছিলুম, তুমি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। তোমার ঐ ধাক্কাই আমার বর। ঐ ধাক্কা আমি মাথায় করে নিয়েছি। বলে মাথায় যেখানে লেগেছিল সেইখানটা আমাকে দেখিয়ে দিলে।

আমি কি সত্যি ভুল বুঝেছিলুম? সন্দীপ কি দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে তখন আমাকে প্রণাম করতেই এসেছিল? তার মুখে চোখে হঠাৎ যে মত্ততা ফেনিয়ে উঠল সে তো, মনে হল, অমূল্যও দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু স্তবগানে সন্দীপ এমন আশ্চর্য সুর লাগাতে জানে যে তর্ক করতে পারি নে, সত্য দেখবার চোখ যেন কোন্ আফিমের নেশায় বুজে আসে। সন্দীপকে আমি যে আঘাত করেছি সে আঘাত সে আমাকে দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দিলে, তার মাথার ক্ষত আমার বুকের ভিতরে রক্তপাত করতে লাগল। সন্দীপের প্রণাম যখন পেলুম আমার চুরি তখন মহিমান্বিত হয়ে উঠল। টেবিলের উপরকার গিনিগুলি সমস্ত লোকনিন্দাকে, ধর্মবুদ্ধির সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা করে ঝক্ ঝক্ করে হাসতে লাগল।

আমারই মতো অমূল্যেরও মন ভুলে গেল। ক্ষণকালের জন্যে সন্দীপের প্রতি তার যে শ্রদ্ধা প্রতিরুদ্ধ হয়েছিল সে আবার বাধামুক্ত হয়ে উছলে উঠল, আমার পূজায় এবং সন্দীপের পূজায় তার হৃদয়ের

পুষ্পপাত্রটি পূর্ণ হয়ে গেল। সরল বিশ্বাসের কী স্নিগ্ধসুধা ভোরবেলাকার শুকতারার আলোটির মতো তার চোখ থেকে বিকীর্ণ হতে লাগল। আমি পূজা দিলেম, আমি পূজা পেলেম, আমার পাপ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। অমূল্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বললে, বন্দেমাতরং!

কিন্তু স্তবের বাণী তো সব সময় শুনতে পাই নে। নিজের মনের ভিতর থেকে নিজের 'পরে নিজের শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখবার সম্বল আমার যে কিছুই নেই। আমার শোবার ঘরে ঢুকতে পারি নে। সেই লোহার সিন্দুক আমার দিকে ভ্রূকুটি করে থাকে, আমাদের পালঙ্ক আমার দিকে যেন একটা নিষেধের হাত বাড়ায়। আপনার ভিতরে আপনার এই অপমান থেকে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে; কেবলই মনে হয় সন্দীপের কাছে গিয়ে আপনার স্তব শুনি গে। আমার অতলস্পর্শ গ্লানির গহ্বর থেকে জগতে সেই একটুমাত্র পূজার বেদী জেগে আছে; সেখান থেকে যেখানেই পা বাড়াই সেইখানেই শূন্য। তাই দিনরাত্রি ঐ বেদী আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই। স্তব চাই, স্তব চাই, দিনরাত্রি স্তব চাই! ঐ মদের পেয়ালা একটুমাত্র খালি হতে থাকলেই আমি আর বাঁচি নে। তাই সমস্ত দিনই সন্দীপের কাছে গিয়ে তার কথা শোনবার জন্যে আমার প্রাণ কাঁদছে; আমার অস্তিত্বের মূল্যটুকু পাবার জন্যে আজ পৃথিবীর মধ্যে সন্দীপকে আমার এত দরকার।

আমার স্বামী দুপুরবেলা যখন খেতে আসেন আমি তাঁর সামনে বসতে পারি নে; অথচ না-বসাটা এতই বেশি লজ্জা যে সেও আমি পারি নে, আমি তাঁর একটু পিছনের দিকে এমন করে বসি যে তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি ঘটে না। সেদিন তেমনি করে বসে আছি, তিনি খাচ্ছেন, এমন সময় মেজোরানী এসে বসলেন; বললেন, ঠাকুরপো, তুমি ঐ-সব ডাকাতির শাসানি-চিঠি হেসে উড়িয়ে দাও, কিন্তু আমার ভয় হয়। আমাদের এবারকার প্রণামীর টাকাটা তুমি এখনো ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দাও নি?

আমার স্বামী বললেন, না, সময় পাই নি।

মেজোরানী বললেন, দেখো ভাই, তুমি বড়ো অসাবধান, ও টাকাটা—

স্বামী হেসে বললেন, সে যে আমার শোবার ঘরের পাশের ঘরে লোহার সিন্দুকে আছে।

যদি সেখান থেকে নেয় বলা যায় কি?

আমার ও ঘরেও যদি চোর ঢোকে তা হলে কোন্‌দিন তোমাকেও চুরি হতে পারে।

ওগো, আমাকে কেউ নেবে না, ভয় নেই তোমার। নেবার মতো জিনিস তোমার আপনার ঘরেই আছে। না ভাই, ঠাট্টা না, তুমি ঘরে টাকা রেখো না।

সদর-খাজনা চালান যেতে আর দিন-পাঁচেক আছে, সেইসঙ্গেই ও টাকাটা আমি কলকাতার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেব।

দেখো ভাই, ভুলে বোসো না, তোমার যেরকম ভোলা মন কিছুই বলা যায় না।

এ ঘর থেকে যদি টাকা চুরি যায় তা হলে আমারই টাকা চুরি যাবে, তোমার কেন যাবে বউরানী?

ঠাকুরপো, তোমার ঐ-সব কথা শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে। আমি কি আমার-তোমার ভেদ করে কথা কচ্ছি? তোমারই যদি চুরি যায় সে কি আমাকে বাজবে না? পোড়া বিধাতা সব কেড়ে নিয়ে আমার যে লক্ষ্মণ দেওরটি রেখেছেন তাঁর মূল্য বুঝি আমি বুঝি নে? আমি ভাই তোমাদের বড়োরানীর মতো দিনরাত্রি দেবতা নিয়ে ভুলে থাকতে পারি নে, দেবতা আমাকে যা দিয়েছেন সেই আমার দেবতার চেয়েও বেশি। কী লো ছোটোরানী, তুই যে একেবারে কাঠের পুতুলের মতো চুপ করে রইলি? জান ভাই ঠাকুরপো, ছোটোরানী মনে ভাবে আমি তোমাকে খোশামোদ করি। তা, তেমন দায়ে পড়লে খোশামোদই করতে হত। কিন্তু, তুমি কি আমাদের তেমনি দেওর যে খোশামোদের অপেক্ষা রাখ? যদি হতে ঐ মাধব চক্রবর্তীর মতো তা হলে আমাদের বড়োরানীরও দেবসেবা আজ ঘুচে যেত, আধপয়সাটির জন্যে তোমার হাতে পায়ে ধরাধরি করেই দিন কাটত। তাও বলি, তা হলে ওর উপকার হত, বানিয়ে বানিয়ে তোমার নিন্দে করবার এত সময় পেত না।

এমনি করে মেজেরানী অনর্গল বকে যেতে লাগলেন, তারই মাঝে' মাঝে ছেঁচকিটা ঘণ্টটা চিংড়িমাছের মুড়োটার প্রতিও ঠাকুরপোর মনোযোগ আকর্ষণ করা চলতে থাকল। আমার তখন মাথা ঘুরছে। আর তো সময় নেই, এখনই একটা উপায় করতে হবে। কী হতে পারে, কী করা যেতে পারে, এই কথা যখন বার বার মনকে জিজ্ঞাসা করছি তখন মেজোরানীর বকুনি আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য বোধ হতে লাগল। বিশেষত আমি জানি মেজোরানীর চোখে কিছুই এড়ায় না ; তিনি ক্ষণে ক্ষণে আমার মুখের দিকে চাচ্ছিলেন, কী দেখছিলেন জানি নে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আমার মুখে সমস্ত কথাই যেন স্পষ্ট ধরা পড়ছিল।

দুঃসাহসের অন্ত নেই। আমি যেন নিতান্ত সহজ কৌতুকে হেসে উঠলুম ; বলে উঠলুম, আসল কথা, আমার 'পরেই মেজোরানীর যত অবিশ্বাস, চোর ডাকাত সমস্ত বাজে কথা।

মেজেরানী মুচকে হেসে বললেন, তা ঠিক বলেছিস লো, মেয়েমানুষের চুরি বড়ো সর্বনেশে। তা, আমার কাছে ধরা পড়তেই হবে, আমি তো আর পুরুষমানুষ নই। আমাকে ভোলাবি কী দিয়ে ?

আমি বললুম, তোমার মনে এতই যদি ভয় থাকে তবে আমার যা-কিছু আছে তোমার কাছে নাহয় জামিন রাখি, যদি কিছু লোকসান করি তো কেটে নিয়ো।

মেজোরানী হেসে বললেন, শোনো একবার, ছোটোরানীর কথা শোনো ! এমন লোকসান আছে যা ইহকাল-পরকালে জামিন দিয়ে উদ্ধার হয় না।

আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যে আমার স্বামী একটি কথাও বললেন না। তাঁর খাওয়া হয়ে যেতেই তিনি বাইরে চলে গেলেন, আজকাল তিনি আর বিশ্রাম করতে ঘরের মধ্যে বসেন না।

আমার অধিকাংশ দামি গয়না ছিল খাজাঞ্চির জিম্মায়। তবু আমার নিজের কাছে যা ছিল তার দাম ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার কম হবে না। আমি সেই গয়নার বাক্স নিয়ে মেজেরানীর কাছে খুলে দিলুম ; বললুম, মেজোরানী, আমার এই গয়না রইল তোমার কাছে। এখন থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

মেজোরানী গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা, তুই যে অবাক করলি ! তুই কি সত্যি ভাবিস তুই আমার টাকা চুরি করবি এই ভয়ে রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছে না ?

আমি বললুম, ভয় করতেই বা দোষ কী ? সংসারে কে কাকে চেনে বলো মেজোরানী।

মেজোরানী বললেন, তাই আমাকে বিশ্বাস করে শিক্ষা দিতে এসেছ বুঝি ? আমার নিজের গয়না কোথায় রাখি ঠিক নেই, তোমার গয়না পাহারা দিয়ে আমি মরি আর কি ! চার দিকে দাসী চাকর ঘুরছে, তোমার ও গয়না তুমি নিয়ে যাও ভাই।

মেজোরানীর কাছ থেকে চলে এসেই বাইরের বৈঠকখানা-ঘরে অমূল্যকে ডেকে পাঠালুম। অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গে দেখি সন্দীপ এসে উপস্থিত। আমার তখন দেরি করবার সময় ছিল না ; আমি সন্দীপকে বললুম, অমূল্যর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কথা আছে, আপনাকে একবার—

সন্দীপ কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, অমূল্যকে আমার থেকে আলাদা করে দেখ না কি ? তুমি যদি আমার কাছ থেকে ওকে ভাঙিয়ে নিতে চাও তা হলে আমি ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না।

আমি এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্দীপ বললে, আচ্ছা বেশ, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথা শেষ করে নিয়ে তার পরে আমার সঙ্গেও একটু বিশেষ কথা কবার অবসর দিতে হবে কিন্তু, নইলে আমার হার হবে। আমি সব মানতে পারি, হার মানতে পারি নে। আমার ভাগ সকলের ভাগের বেশি। এই নিয়ে চিরজীবন বিধাতার সঙ্গে লড়ছি। বিধাতাকে হারাব, আমি হারব না।

তীব্র কটাক্ষে অমূল্যকে আঘাত করে সন্দীপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অমূল্যকে বললুম, লক্ষ্মী ভাই আমার, তোমাকে একটি কাজ করে দিতে হবে।

সে বললে, তুমি যা বলবে আমি প্রাণ দিয়ে করব দিদি।

শালের ভিতর থেকে গয়নার বাক্স বের করে তার সামনে রেখে বললুম, আমার এই গয়না বন্ধক

দিয়ে হোক, বিক্রি করে হোক, আমাকে ছ হাজার টাকা যত শীঘ্র পার এনে দিতে হবে।

অমূল্য ব্যথিত হয়ে বলে উঠল, না দিদি, না, গয়না বিক্রি বন্ধক না, আমি তোমাকে ছ হাজার টাকা এনে দেব।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম ও-সব কথা রাখো, আমার আর একটুও সময় নেই। এই নিয়ে যাও গয়নার বাক্স, আজ রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় যাও, পরশুর মধ্যে ছ হাজার টাকা আমাকে এনে দিতে হবে।

অমূল্য বাক্সের ভিতর থেকে হীরের চিকটা আলোতে তুলে ধরে আবার বিষণ্ণমুখে রেখে দিলে; আমি বললুম, এই-সব হীরের গয়না ঠিক দামে সহজে বিক্রি হবে না, সেইজন্যে আমি তোমাকে যে গয়না দিচ্ছি এর দাম ত্রিশ হাজারেরও বেশি হবে। এ-সবই যদি যায় সেও ভালো, কিন্তু ছ হাজার টাকা আমার নিশ্চয়ই চাই।

অমূল্য বললে, দেখো দিদি, তোমার কাছ থেকে এই-যে ছ হাজার টাকা নিয়েছেন সন্দীপবাবু, এর জন্যে আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেছি। বলতে পারি নে এ কী লজ্জা। সন্দীপবাবু বলেন, দেশের জন্যে লজ্জা বিসর্জন করতে হবে। তা হয় তো হবে। কিন্তু এ যেন একটু আলাদা কথা। দেশের জন্যে মরতে ভয় করি নে, মারতে দয়া করি নে এই শক্তি পেয়েছি; কিন্তু তোমার হাত থেকে এই টাকা নেওয়ার গ্লানি কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারছি নে। এইখানে সন্দীপবাবু আমার চেয়ে অনেক শক্ত, ওঁর একতিলও ক্ষোভ নেই। উনি বলেন টাকা যার বাক্সে ছিল টাকা যে সত্যি তারই এই মোহটা কাটানো চাই নইলে বন্দেমাতরং মন্ত্র কিসের!

বলতে বলতে অমূল্য উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগল। আমাকে শ্রোতা পেলে ওর এই-সব কথা বলবার উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। ও বলতে লাগল, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মাকে তো কেউ মারতে পারে না। কাউকে বধ করা, ও একটা কথা মাত্র। টাকা হরণ করাও সেইরকম একটা কথা। টাকা কার? ওকে কেউ সৃষ্টি করে না, ওকে কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না, ও তো কারও আত্মার অঙ্গ নয়। ও আজ আমার, কাল আমার ছেলের, আর-একদিন আমার মহাজনের। সেই চঞ্চল টাকা যখন তত্ত্বত কারওই নয় তখন তোমার অকর্মণ্য ছেলের হাতে না পড়ে দেশসেবকদের সেবায় যদি লাগে তা হলে তাকে নিন্দা করলেই সে কি নিন্দিত হবে?

সন্দীপের মুখের কথা যখন এই বালকের মুখে শুনি তখন ভয়ে আমার বুক কাঁপতে থাকে। যারা সাপুড়ে তারা বাঁশি বাজিয়ে সাপ নিয়ে খেলুক, মরতে যদি হয় তারা জেনেশুনে মরুক। কিন্তু, আহা, এরা যে কাঁচা, সমস্ত বিশ্বের আশীর্বাদ এদের যে নিয়ত রক্ষা করতে চায়, এরা সাপকে সাপ না জেনে হাসতে হাসতে তার সঙ্গে খেলা করতে যখন হাত বাড়ায় তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি এই সাপটা কী ভয়ংকর অভিশাপ! সন্দীপ ঠিকই বুঝেছে— আমি নিজে তার হাতে মরতে পারি, কিন্তু এই ছেলেটিকে তার হাত থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আমি বাঁচাব।

আমি একটু হেসে অমূল্যকে বললুম, তোমাদের দেশসেবকদের সেবার জন্যেও টাকার দরকার আছে বুঝি?

অমূল্য সগর্বে মাথা তুলে বললে, আছে বৈকি। তারাই যে আমাদের রাজা, দারিদ্র্যে তাদের শক্তিক্ষয় হয়। আপনি জানেন, সন্দীপবাবুকে ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া অন্য গাড়িতে কখনো চড়তে দিই নে। রাজভোগে তিনি কখনো লেশমাত্র সংকুচিত হন না। তাঁর এই মর্যাদা তাঁকে রাখতে হয় তাঁর নিজের জন্যে নয়, আমাদের সকলের জন্যে। সন্দীপবাবু বলেন, সংসারে যারা ঈশ্বর ঐশ্বর্যের সম্মোহনই হচ্ছে তাদের সব চেয়ে বড়ো অস্ত্র। দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে দুঃখগ্রহণ করা নয়, সে হচ্ছে আত্মঘাত।

এমন সময় নিঃশব্দে সন্দীপ হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি আমার গয়নার বাক্সর উপর শাল চাপা দিলুম। সন্দীপ বাঁকা সুরে জিজ্ঞাসা করলে, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথার পালা এখনো ফুরোয় নি বুঝি?

অমূল্য একটু লজ্জিত হয়ে বললে, না, আমাদের কথা হয়ে গেছে! বিশেষ কিছু না।

আমি বললুম, না অমূল্য, এখনো হয় নি।

সন্দীপ বললে, তা হলে দ্বিতীয়বার সন্দীপের প্রস্থান ?

আমি বললুম, হাঁ।

তা হলে সন্দীপকুমারের পুনঃপ্রবেশ—

সে আজ নয়, আমার সময় হবে না।

সন্দীপের চোখদুটো জ্বলে উঠল ; বললে, কেবল বিশেষ কাজেরই সময় আছে, আর সময় নষ্ট করবার সময় নেই !

ঈর্ষা ! প্রবল যেখানে দুর্বল সেখানে অবলা আপনার জয়ডঙ্কা না বাজিয়ে থাকতে পারে কি ? আমি তাই খুব দৃঢ়স্বরেই বললুম, না, আমার সময় নেই।

সন্দীপ মুখ কালি করে চলে গেল। অমূল্য কিছু উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললে, রানীদিদি, সন্দীপবাবু বিরক্ত হয়েছেন।

আমি তেজের সঙ্গে বললুম, বিরক্ত হবার ওঁর কারণও নেই, অধিকারও নেই। একটি কথা তোমাকে বলে রাখি অমূল্য, আমার এই গয়না-বিক্রির কথা তুমি প্রাণান্তেও সন্দীপবাবুকে বলতে পারবে না।

অমূল্য বললে, না, বলব না।

তা হলে আর দেরি কোরো না, আজ রাত্রের গাড়িতেই তুমি চলে যাও।

এই বলে অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। বাইরে এসে দেখি বারান্দায় সন্দীপ দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলুম এখনই সে অমূল্যকে ধরবে। সেইটে বাঁচাবার জন্যে তাঁকে ডাকতে হল, সন্দীপবাবু, কী বলতে চাচ্ছিলেন ?

আমার কথা তো বিশেষ কথা নয়, কেবল বাজে কথা, সময় যখন নেই তখন—

আমি বললুম, আছে সময়।

অমূল্য চলে গেল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বললে, অমূল্যর হাতে একটা কী বাক্স দিলে, ওটা কিসের বাক্স ?

বাক্সটা সন্দীপের চোখ এড়াতে পারে নি। আমি একটু শক্ত করেই বললুম, আপনাকে যদি বলবার হত তা হলে আপনার সামনেই দিতুম।

তুমি কি ভাবছ অমূল্য আমাকে বলবে না ?

না, বলবে না।

সন্দীপের রাগ আর চাপা রইল না ; একেবারে আগুন হয়ে উঠে বললে, তুমি মনে করছ তুমি আমার উপর প্রভুত্ব করবে। পারবে না। ঐ অমূল্য, ওকে যদি আমার পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিই তা হলে সেই ওর সুখের মরণ হয়, ওকে তুমি তোমার পদানত করবে— আমি থাকতে সে হবে না।

দুর্বল, দুর্বল ! এতদিন পরে সন্দীপ বুঝতে পেরেছে, ও আমার কাছে দুর্বল। তাই হঠাৎ এই অসংযত রাগ। ও বুঝতে পেরেছে, আমার যে শক্তি আছে তার সঙ্গে জোরজবর্দস্তি খাটবে না, আমার কটাক্ষের ঘায়ে ওর দুর্গের প্রাচীর আমি ভেঙে দিতে পারি। সেইজন্যেই আজ এই আস্ফালন। আমি একটা কথা না বলে একটুখানি কেবল হাসলুম। এতদিন পরে আমি ওর উপরের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছি ; আমার এ জায়গাটুকু যেন না হারায়, যেন না নাবি। আমার দুর্গতির মধ্যেও যেন আমার মান একটু থাকে।

সন্দীপ বললে, আমি জানি তোমার ও বাক্স গয়নার বাক্স।

আমি বললুম, আপনি যেমন-খুশি আন্দাজ করুন, আমি বলব না।

তুমি অমূল্যকে আমার চেয়ে বেশি বিশ্বাস কর ? জান, ঐ বালক আমার ছায়ার ছায়া, আমার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি, আমার পাশ থেকে সরে গেলে ও কিছুই নয় !

যেখানে ও আপনার প্রতিধ্বনি নয় সেইখানে ও অমূল্য, সেইখানে আমি ওকে আপনার প্রতিধ্বনির চেয়ে বিশ্বাস করি।

মায়ের পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমার সমস্ত গয়না আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত আছ সে কথা ভুললে চলবে না। সে তোমার দেওয়াই হয়ে গেছে।

দেবতা যদি আমার কোনো গয়না বাকি রাখেন তা হলে সেই গয়না দেবতাকে দেব। আমার যে গয়না চুরি যায় সে গয়না দেব কেমন করে?

দেখো, তুমি আমার কাছ থেকে অমন করে ফসকে যাবার চেষ্টা কোরো না। এখন আমার কাজ আছে, সেই কাজ আগে হয়ে যাক, তার পরে তোমাদের ঐ মেয়েলি ছলাকলা-বিস্তারের সময় হবে। তখন সেই লীলায় আমিও যোগ দেব।

যে মুহূর্তে আমি আমার স্বামীর টাকা চুরি করে সন্দীপের হাতে দিয়েছি সেই মুহূর্ত থেকেই আমাদের সম্বন্ধের ভিতরকার সুরটুকু চলে গেছে। কেবলই যে আমারই সমস্ত মূল্য ঘুচিয়ে দিয়ে আমি কানা কড়ার মতো সস্তা হয়ে গেছি তা নয়, আমার 'পরে সন্দীপেরও শক্তি ভালো করে খেলবার আর জায়গা পাচ্ছে না— মুঠোর মধ্যে যা এসে পড়ে তার উপর আর তীর মারা চলে না! সেইজন্য সন্দীপের আজ আর সেই বীরের মূর্তি নেই। ওর কথার মধ্যে কলহের কর্কশ ইতর আওয়াজ লাগছে।

সন্দীপ আমার মুখের উপর তার উজ্জ্বল চোখদুটো তুলে বসে রইল, দেখতে দেখতে তার চোখ যেন মধ্যাহ্ন-আকাশের তৃষ্ণার মতো জ্বলে উঠতে লাগল। তার পা দুই-একবার চঞ্চল হয়ে উঠল; বুঝতে পারলুম সে উঠি-উঠি করছে, এখনই সে উঠে এসে আমাকে চেপে ধরবে। আমার বুকের ভিতরে দুলতে লাগল, সমস্ত শরীরের শির দব্ দব্ করছে, কানের মধ্যে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করছে, বুঝলুম আর-একটু বসে থাকলে আমি আর উঠতে পারব না। প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে চৌকি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে উঠেই দরজার দিকে ছুটলুম। সন্দীপের রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠের মধ্যে থেকে গুমরে উঠল, কোথায় পালাও রানী?

পরক্ষণেই সে লাফ দিয়ে উঠে আমাকে ধরতে এল। এমন সময় বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যেতেই সন্দীপ তাড়াতাড়ি চৌকিতে ফিরে এসে বসল্। আমি বইয়ের শেলফের দিকে মুখ করে বইগুলোর নামের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আমার স্বামী ঘরে ঢোকবামাত্রই সন্দীপ বলে উঠল, ওহে নিখিল, তোমার শেলফে ব্রাউনিং নেই? আমি মক্ষীরানীকে আমাদের সেই কলেজ-ক্লাবের কথা বলছিলুম— মনে আছে তো ব্রাউনিঙের সেই কবিতাটা তর্জমা নিয়ে আমাদের চার জনের মধ্যে লড়াই? বল কী, মনে নেই? সেই যে—

> She should never have looked at me,
> If she meant I should not love her!
> There are plenty... men you call such,
> I suppose... she may discover
> All her soul to, if she pleases,
> And yet leave much as she found them:
> But I'm not so, and she knew it
> When she fixed me, glancing round them.

আমি হিঁচড়ে-মিচড়ে তার একটা বাংলা করেছিলুম, কিন্তু সেটা এমন হল না 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'। এক সময়ে ঠাউরেছিলুম কবি হলেম বুঝি, আর দেরি নেই, বিধাতা দয়া করে আমার সে ফাঁড়া কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের দক্ষিণাচরণ, সে যদি আজ নিমক-মহালের ইন্‌স্পেক্টর না হত তা হলে নিশ্চয় কবি হতে পারত, সে খাসা তর্জমাটি করেছিল— পড়ে মনে হয় ঠিক যেন বাংলা ভাষা পড়ছি, যে দেশ জিয়োগ্রাফিতে নেই এমন কোনো দেশের ভাষা নয়—

আমায় ভালো বাসবে না সে এই যদি তার ছিল জানা,
তবে কি তার উচিত ছিল আমার-পানে দৃষ্টি হানা ?
তেমন-তেমন অনেক মানুষ আছে তো এই ধরাধামে
(যদিচ ভাই, আমি তাদের গনি নেকো মানুষ নামে)—
যাদের কাছে সে যদি তার খুলে দিত প্রাণের ঢাকা,
তবু তারা রইত খাড়া যেমন ছিল তেমনি ফাঁকা।
আমি তো নই তাদের মতন সে কথা সে জানত মনে
যখন মোরে বাঁধল ধ'রে বিদ্ধ ক'রে নয়নকোণে।

না মক্ষীরানী, তুমি মিথ্যে খুঁজছ ; নিখিল বিবাহের পর থেকে কবিতা-পড়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছে, বোধ হয় ওর আর দরকার হয় না। আমি ছেড়ে দিয়েছিলুম কাজের তাড়ায়, কিন্তু বোধ হচ্ছে যেন 'কাব্যজ্বরো মনুষ্যাণাং' আমাকে ধরবে-ধরবে করছে।

আমার স্বামী বললেন, আমি তোমাকে সতর্ক করে দিতে এসেছি সন্দীপ।

সন্দীপ বললে, কাব্যজ্বর সম্বন্ধে ?

স্বামী ঠাট্টায় যোগ না দিয়ে বললেন, কিছুদিন ধরে ঢাকা থেকে মৌলবি আনাগোনা করতে আরম্ভ করেছে, এ অঞ্চলের মুসলমানদের ভিতরে ভিতরে খেপিয়ে তোলবার উদ্যোগ চলেছে। তোমার উপর ওরা বিরক্ত হয়ে আছে, হঠাৎ একটা-কিছু উৎপাত করতে পারে।

পালাতে পরামর্শ দাও নাকি ?

আমি খবর দিতে এসেছি, পরামর্শ দিতে চাই নে।

আমি যদি এখানকার জমিদার হতুম তা হলে ভাবনার কথা হত মুসলমানদেরই, আমার নয়। তুমি আমাকেই উদ্‌বিগ্ন করে না তুলে ওদের দিকে যদি একটু উদ্‌বেগের চাপ দাও তা হলে সেটা তোমার এবং আমার উভয়েরই যোগ্য হয়। জান, তোমার দুর্বলতায় পাশের জমিদারদের পর্যন্ত তুমি দুর্বল করে তুলেছে ?

সন্দীপ, আমি তোমাকে পরামর্শ দিই নি, তুমিও আমাকে পরামর্শ না দিলে চলত। ওটা বৃথা হচ্ছে। আর-একটি কথা আমার বলবার আছে। তোমরা কিছুদিন থেকে দলবল নিয়ে আমার প্রজাদের 'পরে ভিতরে ভিতরে উৎপাত করছ। আর চলবে না, এখন তোমাকে আমার এলেকা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

মুসলমানের ভয়ে, না আরো কোনো ভয় আছে ?

এমন ভয় আছে যে ভয় না থাকাই কাপুরুষতা, আমি সেই ভয় থেকেই বলছি তোমাকে যেতে হবে সন্দীপ। আর দিন-পাঁচেক পরে আমি কলকাতায় যাচ্ছি, সেই সময় তোমারও আমার সঙ্গে যাওয়া চাই। আমাদের কলকাতার বাড়িতে থাকতে পার, তাতে কোনো বাধা নেই।

আচ্ছা, পাঁচ দিন ভাববার সময় পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে মক্ষীরানী, তোমার মউচাক থেকে বিদায় হবার গুঞ্জনগান করে নেওয়া যাক। হে আধুনিক বাংলার কবি, খোলো তোমার দ্বার, তোমার বাণী লুঠ করে নিই— চুরি তোমারই, তুমি আমারই গানকে তোমার গান করেছ— নাহয় নাম তোমার হল, কিন্তু গান আমার। এই বলে তার বেসুর-ঘেঁষা মোটা ভাঙা গলায় ভৈরবীতে গান ধরলে—

মধুঋতু নিত্য হয়ে রইল তোমার মধুর দেশে।
যাওয়া-আসার কান্নাহাসি হাওয়ায় সেথা বেড়ায় ভেসে।
যায় যে জনা সেই শুধু যায়, ফুল ফোটা তো ফুরোয় না হায়—
ঝরবে যে ফুল সেই কেবলি ঝরে পড়ে বেলাশেষে।
যখন আমি ছিলেম কাছে তখন কত দিয়েছি গান ;
এখন আমার দূরে যাওয়া, এরও কি গো নাই কোনো দান ?

পুষ্পবনের ছায়ায় ঢেকে এই আশা তাই গেলেম রেখে—
আগুন-ভরা ফাগুনকে তোর কাঁদায় যেন আষাঢ় এসে ॥

সাহসের অন্ত নেই, সে সাহসের কোনো আবরণও নেই— একেবারে আগুনের মতো নগ্ন। তাকে বাধা দেওয়ার সময় পাওয়া যায় না ; তাকে নিষেধ করা যেন বজ্রকে নিষেধ করা, বিদ্যুৎ সে নিষেধ হেসে উড়িয়ে দেয়।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলুম। বাড়ির ভিতরের দিকে যখন চলে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি অমূল্য কোথা থেকে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। বললে, রানীদিদি, তুমি কিছু ভেবো না। আমি চললুম, কিছুতেই নিষ্ফল হয়ে ফিরব না।

আমি তার নিষ্ঠাপূর্ণ তরুণ মুখের দিকে চেয়ে বললুম, অমূল্য, নিজের জন্য ভাবব না, যেন তোমাদের জন্যে ভাবতে পারি।

অমূল্য চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য, তোমার মা আছেন ?

আছেন।

বোন ?

নেই, আমি মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা আমার অল্প বয়সে মারা গেছেন।

যাও তুমি, তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও অমূল্য।

দিদি, আমি যে এখানে আমার মাকেও দেখছি আমার বোনকেও দেখছি।

আমি বললুম, অমূল্য, আজ রাত্রে যাবার আগে তুমি এখান থেকে খেয়ে যেয়ো।

সে বললে, সময় হবে না দিদিরানী, তোমার প্রসাদ আমার সঙ্গে দিয়ো আমি নিয়ে যাব।

তুমি কী খেতে ভালোবাস অমূল্য ?

মায়ের কাছে থাকলে পৌষে পেট ভরে পিঠে খেতুম। ফিরে এসে তোমার হাতের তৈরি পিঠে খাব দিদিরানী।

নিখিলেশের আত্মকথা

রাত্রি তিনটের সময় জেগে উঠেই আমার হঠাৎ মনে হয়, যে জগতে আমি একদিন বাস করতুম সে যেন মরে ভূত হয়ে আমার এই বিছানা, এই ঘর, এই-সব জিনিসপত্র দখল করে বসে আছে। আমি বেশ বুঝতে পারলুম মানুষ কেন পরিচিত লোকের ভূতকেও ভয় করে। চিরকালের জানা যখন এক মুহূর্তে অজানা হয়ে ওঠে তখন সে এক বিভীষিকা। জীবনের সমস্ত ব্যবহার যে সহজ স্রোতে চলছিল আজ তাকে যখন এমন খাদে চালাতে হবে যে খাদ এখনো কাটা হয় নি তখন বিষম ধাঁধা লেগে যায় ; তখন নিজের স্বভাবকে বাঁচিয়ে চলা শক্ত হয় ; তখন নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আমিও বুঝি আর-একজন কেউ।

কিছুদিন থেকে বুঝতে পারছি সন্দীপের দলবল আমাদের অঞ্চলে উৎপাত শুরু করেছে। যদি আমার স্বভাবে স্থির থাকতুম তা হলে সন্দীপকে জোরের সঙ্গে বলতুম, এখান থেকে চলে যাও। কিন্তু গোলেমালে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। আমার পথ আর সরল নেই। সন্দীপকে চলে যেতে বলার মধ্যে আমার একটা লজ্জা আসে। ওর সঙ্গে আর-একটা কথা এসে পড়ে ; তাতে নিজের কাছে ছোটো হয়ে যাই।

দাম্পত্য আমার ভিতরের জিনিস, সে তো কেবল আমার গৃহস্থ-আশ্রম বা সংসারযাত্রা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ। সেইজন্যেই বাইরের দিক থেকে ওর উপরে একটুও জোর দিতে পারলুম না ; দিতে গেলেই মনে হয়, আমার দেবতাকে অপমান করছি। এ কথা কাউকে বোঝাতে পারব না। আমি হয়তো অদ্ভুত। সেইজন্যেই হয়তো ঠকলুম। কিন্তু আমার বাইরেকে ঠকা থেকে বাঁচাতে গিয়ে

ভিতরকে ঠকাই কী করে ?

যে সত্য অন্তর থেকে বাইরেকে সৃষ্টি করে তোলে আমি সেই সত্যের দীক্ষা নিয়েছি। তাই আজ আমাকে বাইরের জাল এমন করে ছিন্ন করতে হল। আমার দেবতা আমাকে বাইরের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবেন। হৃদয়ের রক্তপাত করে সেই মুক্তি আমি পাব। কিন্তু যখন পাব তখন অন্তরের রাজত্ব আমার হবে।

সেই মুক্তির স্বাদ এখনই পাচ্ছি। থেকে থেকে অন্ধকারের ভিতর থেকে আমার অন্তরের ভোরের পাখি গান গেয়ে উঠছে। যে বিমলা মায়ার তৈরি সেই স্বপ্ন ছুটে গেলেও ক্ষতি হবে না, আমার ভিতরের পুরুষটি এই আশ্বাসবাণী থেকে থেকে বলে উঠছে।

মাস্টারমশায়ের কাছে খবর পেলুম সন্দীপ হরিশ কুণ্ডুর সঙ্গে যোগ দিয়ে খুব ধুম করে মহিষমর্দিনী পুজোর আয়োজন করছে। এই পুজোর খরচা হরিশ কুণ্ডু তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করতে লেগে গেছে। আমাদের কবিরত্ন আর বিদ্যাবাগীশমশায়কে দিয়ে একটি স্তব রচনা করা হচ্ছে যার মধ্যে দুই অর্থ হয়। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে এই নিয়ে সন্দীপের একটু তর্কও হয়ে গেছে। সন্দীপ বলে, দেবতার একটা এভোল্যুশন আছে ; পিতামহরা যে দেবতা সৃষ্টি করেছিলেন পৌত্রেরা যদি সেই দেবতাকে আপনার মতো না করে তোলে তা হলে যে নাস্তিক হয়ে উঠবে। পুরাতন দেবতাকে আধুনিক করে তোলাই আমার মিশন, দেবতাকে অতীতের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই আমার জন্ম। আমি দেবতার উদ্ধারকর্তা।

ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি সন্দীপ হচ্ছে আইডিয়ার জাদুকর ; সত্যকে আবিষ্কার করায় ওর কোনো প্রয়োজন নেই, সত্যের ভেলকি বানিয়ে তোলাতেই ওর আনন্দ। মধ্য-আফ্রিকায় যদি ওর জন্ম হত তা হলে নরবলি দিয়ে নরমাংস ভোজন করাই যে মানুষকে মানুষের অন্তরঙ্গ করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধনা এই কথা নূতন যুক্তিতে প্রমাণ করে ও পুলকিত হয়ে উঠত। ভোলানোই যার কাজ নিজেকেও না ভুলিয়ে সে থাকতে পারে না। আমার বিশ্বাস, সন্দীপ কথার মন্ত্রে যতবার নূতন-নূতন কুহক সৃষ্টি করে প্রত্যেকবার নিজেই মনে করে 'সত্যকে পেয়েছি', তার এক সৃষ্টির সঙ্গে আর-এক সৃষ্টির যতই বিরোধ থাক।

যাই হোক দেশের মধ্যে মায়ার এই তাড়িখানা বানিয়ে তোলায় আমি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারব না। যে তরুণ যুবকেরা দেশের কাজে লাগতে চাচ্ছে গোড়া থেকেই তাদের নেশা অভ্যাস করানোর চেষ্টায় আমার যেন কোনো হাত না থাকে। মন্ত্রে ভুলিয়ে যারা কাজ আদায় করতে চায় তারা কাজটারই দাম বড়ো করে দেখে, যে মানুষের মনকে ভোলায় সেই মনের দাম তাদের কাছে কিছুই নেই। প্রমত্ততা থেকে দেশকে যদি বাঁচাতে না পারি, তবে দেশের পূজা হবে দেশের বিষনৈবেদ্য, দেশের কাজ বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্রের মতো দেশের বুকে এসে বাজবে।

বিমলার সামনেই সন্দীপকে বলেছি, তোমাকে আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। এতে হয়তো বিমলা এবং সন্দীপ দুজনেই আমার মতলবকে ভুল বুঝবে। কিন্তু, এই ভুল-বোঝার ভয় থেকে মুক্তি চাই। বিমলাও আমাকে ভুল বুঝুক।

ঢাকা থেকে মৌলবি প্রচারকের আনাগোনা চলছে। আমাদের এলাকার মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতোই ঘৃণা করত। কিন্তু দুই-এক জায়গায় গোরু-জবাই দেখা দিল। আমি আমার মুসলমান প্রজারই কাছে তার প্রথম খবর পাই এবং তার প্রতিবাদও শুনি। এবারে বুঝলুম, ঠেকানো শক্ত হবে। ব্যাপারটার মূলে একটা কৃত্রিম জেদ আছে। বাধা দিতে গেলে ক্রমে তাকে অকৃত্রিম করে তোলা হবে। সেইটেই তো আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের চাল।

আমার প্রধান প্রধান হিন্দু প্রজাকে ডাকিয়ে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। বললুম, নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে শাক্ত তো রক্তপাত করতে ছাড়ে না। উপায় কী ? মুসলমানকেও নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে। তোমরা গোলমাল কোরো না।

তারা বললে, মহারাজ, এতদিন তো এ-সব উপসর্গ ছিল না।

আমি বললুম, ছিল না, সে ওদের ইচ্ছা। আবার ইচ্ছা করেই যাতে নিবৃত্ত হয় সেই পথই দেখো। সে তো ঝগড়ার পথ নয়।

তারা বললে, না মহারাজ, সেদিন নেই, শাসন না করলে কিছুতেই থামবে না।

আমি বললুম, শাসনে গোহিংসা তো থামবেই না, তার উপরে মানুষের প্রতি হিংসা বেড়ে উঠতে থাকবে।

এদের মধ্যে একজন ছিল ইংরেজি-পড়া ; সে এখনকার বুলি আওড়াতে শিখেছে। সে বললে, দেখুন, এটা তো কেবল একটা সংস্কারের কথা নয়, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, এ দেশে গোরু যে—

আমি বললুম, এ দেশে মহিষও দুধ দেয় মহিষেও চাষ করে, কিন্তু তার কাটামুণ্ড মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন, কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।

ইংরেজি-পড়া বললে, এর পিছনে কে আছে সেটা কি দেখতে পাচ্ছেন না ? মুসলমানেরা জানতে পেরেছে তাদের শাস্তি হবে না। পাঁচুড়েতে কী কাণ্ড তারা করেছে শুনেছেন তো ?

আমি বললুম, এই-যে মুসলমানদের অস্ত্র করে আজ আমাদের উপরে হানা সম্ভব হচ্ছে, এই অস্ত্রই যে আমরা নিজের হাতে বানিয়েছি ; ধর্ম যে এমনি করেই বিচার করেন। আমরা যা এতকাল ধরে জমিয়েছি আমাদের উপরেই তা খরচ হবে।

ইংরেজি-পড়া বললে, আচ্ছা, ভালো, তাই খরচ হয়ে যাক। কিন্তু এর মধ্যে আমাদেরও একটা সুখ আছে, আমাদেরই এবার জিত, যে আইন ওদের সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি সেই আইনকে আজ আমরা ধূলিসাৎ করেছি ; এতদিন ওরা রাজা ছিল, আজ ওদেরও আমরা ডাকাতি ধরাব। এ কথা ইতিহাসে কেউ লিখবে না, কিন্তু এ কথা চিরদিন আমাদের মনে থাকবে।

এ দিকে কাগজে কাগজে অখ্যাতিতে আমি বিখ্যাত হয়ে পড়লুম। শুনছি, চক্রবর্তীদের এলাকায় নদীর ধারে শ্মশানঘাটে দেশসেবকের দল আমার কুশপুত্তলি বানিয়ে খুব ধুম করে সেটাকে দাহ করেছে ; তার সঙ্গে আরো অনেক অপমানের আয়োজন ছিল। এরা কাপড়ের কল খুলে যৌথ কারবার করবে বলে আমাকে খুব বড়ো শেয়ার কেনাতে এসেছিল। আমি বলেছিলুম, যদি কেবল আমার এই ক'টি টাকা লোকসান যেত খেদ ছিল না, কিন্তু তোমরা যদি কারখানা খোল তবে অনেক গরিবের টাকা মারা যাবে এইজন্যেই আমি শেয়ার কিনব না।

কেন মশাই ? দেশের হিত কি আপনি পছন্দ করেন না ?

কারবার করলে দেশের হিত হতেও পারে, কিন্তু 'দেশের হিত করব' বললেই তো কারবার হয় না। যখন ঠাণ্ডা ছিলুম তখন আমাদের ব্যাবসা চলে নি— আর খেপে উঠেছি বলেই কি আমাদের ব্যাবসা হুহু করে চলবে ?

এক কথায় বলুন-না আপনি শেয়ার কিনবেন না।

কিনব যখন তোমাদের ব্যাবসাকে ব্যাবসা বলে বুঝব। তোমাদের আগুন জ্বলছে বলেই যে তোমাদের হাঁড়িও চড়বে সেটার তো কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখছি নে।

এরা মনে করে আমি খুব হিসাবি, আমি কৃপণ। আমার স্বদেশী কারবারের হিসাবের খাতাটা এদের খুলে দেখাতে ইচ্ছা করে। আর, সেই-যে একদিন মাতৃভূমিতে ফসলের উন্নতি করতে বসেছিলুম তার ইতিহাস এরা বুঝি জানে না ! ক' বছর ধরে জাভা মরিশস থেকে আখ আনিয়ে চাষ করালুম ; সরকারি কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষের পরামর্শে যত রকমের কর্ষণ বর্ষণ হতে পারে তার কিছুই বাকি রাখি নি, অবশেষে তার থেকে ফসলটা কী হল ? সে আমার এলাকার চাষিদের চাপা অট্টহাস্য। আজও সেটা চাপা রয়ে গেছে। তার পরে সরকারি কৃষিপত্রিকা তর্জমা করে যখন ওদের কাছে জাপানি সিম কিংবা বিদেশী কাপাসের চাষের কথা বলতে গেছি তখন দেখতে পেয়েছি সে পুরোনো চাপা হাসি আর চাপা

থাকে না। দেশে তখন দেশসেবকদের কোনো সাড়াশব্দ ছিল না, বন্দেমাতরং মন্ত্র তখন নীরব। আর সেই যে আমার কলের জাহাজ— দূর হোক সে-সব কথা তুলে লাভ কী? দেশহিতের যে আগুন ওরা জ্বালালে তাতে আমারই কুশপুত্তলি দগ্ধ হয়ে যদি থামে তবে তো রক্ষা।

এ কী খবর! আমাদের চকুয়ার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গেছে! কাল রাত্রে সদর-খাজনার সাড়ে সাত হাজার টাকার এক কিস্তি সেখানে জমা হয়েছিল, আজ ভোরে নৌকা করে আমাদের সদরে রওনা হবার কথা। পাঠাবার সুবিধা হবে বলে নায়েব ট্রেজরি থেকে টাকা ভাঙিয়ে দশ কুড়ি টাকার নোট করে তাড়াবন্দি করে রেখেছিল। অর্ধেক রাত্রে ডাকাতের দল বন্দুক-পিস্তল নিয়ে মালখানা লুটেছে। কাসেম সর্দার পিস্তলের গুলি খেয়ে জখম হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই ডাকাতেরা কেবল ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি দেড় হাজার টাকার নোট ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে চলে এসেছে। অনায়াসে সব টাকাই নিয়ে আসতে পারত। যাই হোক, ডাকাতের পালা শেষ হল, এইবার পুলিসের পালা আরম্ভ হবে। টাকা তো গেছেই, এখন শান্তিও থাকবে না।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি সেখানে খবর রটে গেছে। মেজোরানী এসে বললেন, ঠাকুরপো, এ কী সর্বনাশ!

আমি উড়িয়ে দেবার জন্য বললুম, সর্বনাশের এখনো অনেক বাকি আছে। এখনো কিছুকাল খেয়ে পরে কাটাতে পারব।

না ভাই, ঠাট্টা নয়, তোমারই উপর এদের এত রাগ কেন! ঠাকুরপো, তুমি নাহয় ওদের একটু মন রেখেই চলো-না। দেশসুদ্ধ লোককে কি—

দেশসুদ্ধ লোকের খাতিরে দেশকে সুদ্ধ মজাতে পারব না তো।

এই সেদিন শুনলুম নদীর ধারে তোমাকে নিয়ে ওরা এক কাণ্ড করে বসেছে! ছি ছি! আমি তো ভয়ে মরি! ছোটোরানী মেমের কাছে পড়েছে, ওর তো ভয়ডর নেই— আমি কেনারাম পুরুতকে ডাকিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে তবে বাঁচি। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, তুমি কলকাতায় যাও— এখানে থাকলে ওরা কোন্ দিন কী করে বসে।

মেজোরানীদিদির ভয়-ভাবনা আজ আমার প্রাণে সুধা বর্ষণ করলে। অন্নপূর্ণা, তোমাদের হৃদয়ের দ্বারে আমাদের ভিক্ষা কোনোদিন ঘুচবে না।

ঠাকুরপো, তোমার শোবার ঘরের পাশে ঐ-যে টাকাটা রেখেছ ওটা ভালো করছ না। কোন্ দিক থেকে ওরা খবর পাবে আর শেষকালে— আমি টাকার জন্যে ভাবি নে ভাই, কী জানি—

আমি মেজোরানীকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বললুম, আচ্ছা ও টাকাটা বের করে এখনই আমাদের খাতাঞ্জিখানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরশুদিনই কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে আসব।

এই বলে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি পাশের ঘর বন্ধ। দরজাটা ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে বিমলা বললে, আমি কাপড় ছাড়ছি।

মেজোরানী বললেন, এই সকালেবেলাতেই ছোটোরানীর সাজ হচ্ছে! অবাক করলে! আজ বুঝি ওদের বন্দেমাতরমের বৈঠক বসবে! ওলো, ও দেবীচৌধুরানী, লুটের মাল বোঝাই হচ্ছে নাকি?

আর-একটু পরে এসে সব ঠিক করা যাবে এই ব'লে বাইরে এসে দেখি সেখানে পুলিস-ইন্‌স্‌পেক্টর উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলুম, কিছু সন্ধান পেলেন?

সন্দেহ তো করছি।

কাকে?

ঐ কাসেম সর্দারকে।

সেকি কথা! ও-ই তো জখম হয়েছে।

জখম কিছু নয়; পায়ের চামড়া ঘেঁষে একটুখানি রক্ত পড়েছে, সে ওর নিজেরই কীর্তি।

কাসেমকে আমি কোনোমতেই সন্দেহ করতে পারি নে, ও বিশ্বাসী।

বিশ্বাসী সে কথা মানতে রাজি আছি, কিন্তু তাই বলেই যে চুরি করতে পারে না তা বলা যায় না। এও দেখেছি পঁচিশ বৎসর যে লোক বিশ্বাস রক্ষা করে এসেছে সেও একদিন হঠাৎ—

তা যদি হয় আমি ওকে জেলে দিতে পারব না।

আপনি দেবেন কেন ? যার হাতে দেবার ভার সেই দেবে।

কাসেম ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি টাকাটা ফেলে রাখলে কেন ?

ঐ ধোঁকাটা মনে জন্মে দেবার জন্যেই। আপনি যাই বলুন, লোকটা পাকা। ও আপনাদের কাছারিতে পাহারা দেয়, এ দিকে কাছাকাছি এ অঞ্চলে যত চুরি ডাকাতি হয়েছে নিশ্চয় তার মূলে ও আছে।

লাঠিয়ালরা পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে ডাকাতি সেরে এক রাত্রেই কেমন করে ফিরে এসে মনিবের কাছারিতে হাজরি লেখাতে পারে ইন্‌স্‌পেক্টর তার অনেক দৃষ্টান্ত দেখালেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কাসেমকে এনেছেন ?

তিনি বললেন, না সে থানায় আছে, এখনই ডেপুটিবাবু তদন্ত করতে আসবেন।

আমি বললুম, আমি তাকে দেখতে চাই।

কাসেমের সঙ্গে দেখা হবামাত্র সে আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে, খোদার কসম, মহারাজ, আমি এ কাজ করি নি।

আমি বললুম, কাসেম, আমি তোমাকে সন্দেহ করি নে। ভয় নেই তোমার, বিনা দোষে তোমার শাস্তি ঘটতে দেব না।

কাসেম ডাকাতদের ভালো বর্ণনা করতে পারলে না ; কেবল খুবই অত্যুক্তি করতে লাগল— চার-শো পাঁচ-শো লোক, এত-বড়ো-বড়ো বন্দুক-তলোয়ার ইত্যাদি। বুঝলুম এ-সমস্ত বাজে কথা ; হয় ভয়ের দৃষ্টিতে সব বেড়ে উঠেছে নয় পরাভবের লজ্জা চাপা দেবার জন্যে বাড়িয়ে তুলেছে। ওর ধারণা, হরিশ কুণ্ডুর সঙ্গে আমার শত্রুতা, এ তারই কাজ, এমন-কি, তাদের এক্রাম সর্দারের গলার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে ব'লে তার বিশ্বাস।

আমি বললুম, দেখ্‌ কাসেম, আন্দাজের উপর ভর করে খবরদার পরের নাম জড়াস নে। হরিশ কুণ্ডু এর মধ্যে আছে কি না সে কথা বানিয়ে তোলবার ভার তোর উপর নেই।

বাড়ি ফিরে এসে মাস্টামশায়কে ডেকে পাঠালুম। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, আর কল্যাণ নেই। ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে দেশকে তার জায়গায় বসিয়েছি, এখন দেশের সমস্ত পাপ উদ্ধত হয়ে ফুটে বেরোবে, তার আর কোনো লজ্জা থাকবে না।

আপনি কি মনে করেন, এ কাজ—

আমি জানি নে, কিন্তু পাপের হাওয়া উঠেছে। দাও, দাও, তোমার এলেকা থেকে ওদের এখনই বিদায় করে দাও।

আর একদিন সময় দিয়েছি, পরশু এরা সব যাবে।

দেখো, আমি একটি কথা বলি, বিমলাকে তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও। এখান থেকে তিনি বাইরেটাকে সংকীর্ণ করে দেখছেন, সব মানুষের সব জিনিসের ঠিক পরিমাণ বুঝতে পারছেন না। ওঁকে তুমি একবার পৃথিবীটা দেখিয়ে দাও ; মানুষকে, মানুষের কর্মক্ষেত্রকে, উনি একবার বড়ো জায়গা থেকে দেখে নিন।

আমিও ঐ কথাই ভাবছিলুম।

কিন্তু আর দেরি কোরো না। দেখো নিখিল, মানুষের ইতিহাস পৃথিবীর সমস্ত দেশকে সমস্ত জাতকে নিয়ে তৈরি হয়ে উঠছে, এইজন্যে পলিটিক্সেও ধর্মকে বিকিয়ে দেশকে বাড়িয়ে তোলা চলবে না। আমি জানি য়ুরোপ এ কথা মনের সঙ্গে মানে না, কিন্তু তাই বলেই যে য়ুরোপই আমাদের গুরু এ আমি মানব না। সত্যের জন্যে মানুষ ম'রে অমর হয়, কোনো জাতিও যদি মরে তা হলে মানুষের

ইতিহাসে সেও অমর হবে। সেই সত্যের অনুভূতি জগতের মধ্যে এই ভারতবর্ষেই খাঁটি হয়ে উঠুক শয়তানের অভ্রভেদী অট্টহাসির মাঝখানে। কিন্তু বিদেশ থেকে এ কী পাপের মহামারী এসে আমাদের দেশে প্রবেশ করলে!

সমস্ত দিন এই-সব নানা হাঙ্গামে কেটে গেল। শ্রান্ত হয়ে রাত্রে শুতে গেলুম। সেই টাকাটা আজ বের না করে কাল সকালে বের করে নেব স্থির করেছি।

রাত্রে কখন এক সময়ে ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার। একটা কিসের শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি। বুঝি কেউ কাঁদছে।

থেকে থেকে বাদলা-রাতের দমকা হাওয়ার মতো চোখের জলে ভরা এক-একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হল, আমার এই ঘরটার বুকের ভিতরকার কান্না।

আমার ঘরে আর-কেউ নেই। বিমলা কিছুদিন থেকে কোনো-একটা পাশের ঘরে শোয়। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি বিমলা মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

এ-সব কথা লিখতে পারা যায় না। এ যে কী, তা কেবল তিনিই জানেন যিনি বিশ্বের মর্মের মধ্যে বসে জগতের সমস্ত বেদনাকে গ্রহণ করছেন। আকাশ মূক, তারাগুলি নীরব, রাত্রি নিস্তব্ধ— তারই মাঝখানে ঐ একটি নিদ্রাহীন কান্না!

আমরা এই-সব সুখদুঃখকে সংসারের সঙ্গে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভালো মন্দ একটা-কিছু নাম দিয়ে চুকিয়ে ফেলে দিই। কিন্তু অন্ধকারের বক্ষ ভাসিয়ে দিয়ে এই-যে ব্যথার উৎস উঠছে এর কি কোনো নাম আছে! সেই নিশীথরাত্রে সেই লক্ষকোটি তারার নিঃশব্দতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি যখন ওর দিকে চেয়ে দেখলুম তখন আমার মন সভয়ে বলে উঠল, আমি একে বিচার করবার কে! হে প্রাণ, হে মৃত্যু, হে অসীম বিশ্ব, হে অসীম বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাদের মধ্যে যে রহস্য রয়েছে আমি জোড়-হাতে তাকে প্রণাম করি।

একবার ভাবলুম ফিরে যাই। কিন্তু পারলুম না। নিঃশব্দে বিমলার শিয়রের কাছে বসে তার মাথার উপর হাত রাখলুম। প্রথমটা তার সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠল, তার পরেই সে কঠিনতা যেন ফেটে ভেঙে কান্না সহস্রধারায় বয়ে যেতে লাগল। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে এত কান্না যে কোথায় ধরতে পারে সে তো ভেবে পাওয়া যায় না।

আমি আস্তে আস্তে বিমলার মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম। তার পরে কখন এক সময়ে হাৎড়ে হাৎড়ে সে আমার পা-দুটো টেনে নিলে, বুকের উপরে এমনি করে চেপে ধরলে যে আমার মনে হল সেই আঘাতে তার বুক ফেটে যাবে।

বিমলার আত্মকথা

আজ সকালে অমূল্যর কলকাতা থেকে ফেরার কথা। বেহারাকে বলে রেখেছি সে এলেই যেন খবর দেয়। কিন্তু, স্থির থাকতে পারছি নে। বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে বসে রইলুম।

অমূল্যকে যখন আমার গয়না বেচবার জন্যে কলকাতায় পাঠালুম তখন নিজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা বুঝি মনেই ছিল না। এ কথা একবারও আমার বুদ্ধিতে এলই না যে সে ছেলেমানুষ, অত টাকার গয়না কোথাও বেচতে গেলে সবাই তাকে সন্দেহ করবে। মেয়েমানুষ আমরা এত অসহায় যে আমাদের নিজের বিপদ অন্যের ঘাড়ে না চাপিয়ে আমাদের যেন উপায় নেই। আমরা মরবার সময় পাঁচজনকে ডুবিয়ে মারি।

বড়ো অহংকার করে বলেছিলুম, অমূল্যকে বাঁচাব। যে নিজে তলিয়ে যাচ্ছে সে নাকি অন্যকে বাঁচাতে পারে! হায় হায়, আমিই বুঝি ওকে মারলুম। ভাই আমার, আমি তোর এমনি দিদি, যেদিন মনে মনে তোর কপালে ভাইফোঁটা দিলুম সেই দিনই বুঝি যম মনে মনে হাসলে! আমি যে অকল্যাণের বোঝাই নিয়ে ফিরছি আজ।

আমার আজ মনে হচ্ছে মানুষকে এক-এক সময়ে যেন অমঙ্গলের প্লেগে ধরে, হঠাৎ কোথা হতে তার বীজ এসে প'ড়ে তার এক রাত্রেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সেই সময়ে সকল সংসার থেকে খুব দূরে কোথাও তাকে সরিয়ে রাখা যায় না কি? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার ছোঁয়াচ যে বড়ো ভয়ানক। সে যে বিপদের মশালের মতো, নিজে পুড়তে থাকে সংসারে আগুন লাগাবার জন্যেই।

নটা বাজল। আমার কেমন বোধ হচ্ছে, অমূল্য বিপদে পড়েছে, ওকে পুলিসে ধরেছে। আমার গয়নার বাক্স নিয়ে থানায় গোলমাল পড়ে গেছে— কার বাক্স, ও কোথা থেকে পেলে, তার জবাব তো শেষ কালে আমাকেই দিতে হবে। সমস্ত পৃথিবীর লোকের সামনে কী জবাবটা দেব? মেজোরানী, এতকাল তোমাকে বড়ো অবজ্ঞাই করেছি। আজ তোমার দিন এল। তুমি আজ সমস্ত পৃথিবীর রূপ ধরে শোধ তুলবে। হে ভগবান, এইবার আমাকে বাঁচাও, আমার সমস্ত অহংকার ভাসিয়ে দিয়ে মেজোরানীর পায়ের তলায় পড়ে থাকব!

আর থাকতে পারলুম না, তখনই বাড়ি-ভিতরে মেজোরানীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তিনি তখন বারান্দায় রোদ্দুরে বসে পান সাজছেন, পাশে থাকো বসে। থাকোকে দেখে মুহূর্তের জন্যে মনটা সংকুচিত হল; তখনই সেটা কাটিয়ে নিয়ে মেজোরানীর পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি বলে উঠলেন, ও কী লো ছোটোরানী, তোর হল কী? হঠাৎ এত ভক্তি কেন?

আমি বললুম, দিদি, আজ আমার জন্মতিথি। অনেক অপরাধ করেছি— করো দিদি, আশীর্বাদ করো, আর যেন কোনোদিন তোমাদের কোনো দুঃখ না দিই। আমার ভারি ছোটো মন।

বলেই তাঁকে আবার প্রণাম ক'রে তাড়াতাড়ি উঠে এলুম। তিনি পিছন থেকে বলতে লাগলেন, বলি ও ছুটু, তোর জন্মতিথি, এ কথা আগে বলিস নি কেন? আমার এখানে দুপুর বেলা তোর নেমন্তন্ন রইল। লক্ষ্মী বোন, ভুলিস নে।

ভগবান এমন-কিছু করো যাতে আজ আমার জন্মতিথি হয়। একেবারে নতুন হতে পারি নে কি? সব ধুয়ে-মুছে আর-একবার গোড়া থেকে পরীক্ষা করো প্রভু!

বাইরে বৈঠকখানা-ঘরে যখন ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় সেখানে আজ সন্দীপ এসে উপস্থিত হল। বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে উঠল। আজ সকালের আলোয় তার যে মুখ দেখলুম তাতে প্রতিভার জাদু একটুও ছিল না। আমি বলে উঠলুম, আপনি যান এখান থেকে।

সন্দীপ হেসে বললে, অমূল্য তো নেই, এবারে বিশেষ কথার পালা যে আমার।

পোড়া কপাল! যে অধিকার আমিই দিয়েছি সে অধিকার আজ ঠেকাই কী করে! বললুম, আমার একলা থাকবার দরকার আছে।

রানী, আর-একজন লোক ঘরে থাকলেও একলা থাকার ব্যাঘাত হয় না। আমাকে তুমি মনে কোরো না ভিড়ের লোক, আমি সন্দীপ, লক্ষ লোকের মাঝেও আমি একলা।

আপনি আর-এক সময় আসবেন, আজ সকালে আমি—

অমূল্যের জন্যে অপেক্ষা করছেন?

আমি বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করছি এমন সময় সন্দীপ তার শালের ভিতর থেকে আমার গয়নার বাক্স বের করে ঠক্‌ করে পাথরের টেবিলের উপর রাখলে।

আমি চমকে উঠলুম; বললুম, তা হলে অমূল্য যায় নি?

কোথায় যায় নি?

কলকাতায়?

সন্দীপ একটু হেসে বললে, না।

বাঁচলুম। আমার ভাইফোঁটা বাঁচল। আমি চোর, বিধাতার দণ্ড ঐ পর্যন্তই পৌঁছক— অমূল্য রক্ষা পাক।

সন্দীপ আমার মুখের ভাব দেখে বিদ্রূপ করে বললে, এত খুশি রানী? গয়নার বাক্সর এত দাম? তবে কোন্ প্রাণে এই গয়না দেবীর পূজায় দিতে চেয়েছিলে? দিয়ে তো ফেলেছ, দেবতার হাত থেকে আবার কি ফিরিয়ে নিতে চাও?

অহংকার মরতে মরতেও ছাড়ে না; ইচ্ছে হল দেখিয়ে দিই, এ গয়নার 'পরে আমার সিকি পয়সার মমতা নেই। আমি বললুম, এ গয়নায় আপনার যদি লোভ থাকে নিয়ে যান-না।

সন্দীপ বললে, আজ বাংলাদেশে যেখানে যত ধন আছে সমস্তর 'পরেই আমার লোভ। লোভের মতো এত বড়ো মহৎ বৃত্তি কি আর-কিছু আছে? পৃথিবীর যারা ইন্দ্র লোভ তাদের ঐরাবত।— তা হলে এ সমস্ত গয়না আমার?

এই ব'লে সন্দীপ বাক্সটি তুলে নিয়ে শালের মধ্যে ঢাকা দিতেই অমূল্য ঘরের মধ্যে ঢুকল। তার চোখের গোড়ায় কালি পড়েছে, মুখ শুকনো, উস্কখুস্ক চুল; একদিনেই তার তরুণ-বয়েসের লাবণ্য যেন ঝরে গিয়েছে। তাকে দেখবামাত্রই আমার বুকের ভিতরটায় কামড়ে উঠল।

অমূল্য আমার দিকে না তাকিয়েই একেবারে সন্দীপকে গিয়ে বললে, আপনি গয়নার বাক্স আমার তোরঙ্গ থেকে বের করে এনেছেন?

গয়নার বাক্স তোমারই নাকি?

না, কিন্তু তোরঙ্গ আমার।

সন্দীপ হা হা ক'রে হেসে উঠল। বললে, তোরঙ্গ সম্বন্ধে আমি-তুমি ভেদবিচার তো তোমার বড়ো সূক্ষ্ম হে অমূল্য! তুমিও মরবার আগে ধর্মপ্রচারক হয়ে মরবে দেখছি।

অমূল্য চৌকির উপর বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে টেবিলের উপর মাথা রাখলে। আমি তার কাছে এসে তার মাথায় হাত রেখে বললুম, অমূল্য, কী হয়েছে?

তখনই সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দিদি, এ গয়নার বাক্স আমিই নিজের হাতে তোমাকে এনে দেব এই আমার সাধ ছিল, সন্দীপবাবু তা জানতেন, তাই উনি তাড়াতাড়ি—

আমি বললুম, কী হবে আমার ঐ গয়নার বাক্স নিয়ে? ও যাক-না, তাতে ক্ষতি কী?

অমূল্য বিস্মিত হয়ে বললে, যাবে কোথায়?

সন্দীপ বললে, এ গয়না আমার, এ আমার রানীর দেওয়া অর্ঘ্য।

অমূল্য পাগলের মতো বলে উঠল, না না না, কখনোই না! দিদি, এ আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছি, এ তুমি আর কাউকে দিতে পারবে না।

আমি বললুম, ভাই, তোমার দান চিরদিন আমার মনে রইল, কিন্তু গয়নায় যার লোভ সে নিয়ে যাক-না।

অমূল্য তখন হিংস্র জন্তুর মতো সন্দীপের দিকে তাকিয়ে গুমরে গুমরে বললে, দেখুন সন্দীপবাবু, আপনি জানেন, আমি ফাঁসিকে ভয় করি নে। এ গয়নার বাক্স যদি আপনি নেন—

সন্দীপ বিদ্রূপের হাসি হাসবার চেষ্টা করে বললে, অমূল্য, তোমারও এতদিনে জানা উচিত তোমার শাসনকে আমি ভয় করি নে; মক্ষীরানী, এ গয়না আজ আমি নেব বলে আসি নি, তোমাকে দেব বলেই এসেছিলুম। কিন্তু আমার জিনিস তুমি যে অমূল্যর হাত থেকে নেবে সেই অন্যায় নিবারণ করবার জন্যেই প্রথমে এ বাক্সে আমার দাবি স্পষ্ট করে তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলুম। এখন আমার এই জিনিস তোমাকে আমি দান করছি। এই রইল। এবারে ঐ বালকের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া করো, আমি চললুম। কিছুদিন থেকে তোমাদের দুজনের মধ্যে বিশেষ কথা চলছে, আমি তার মধ্যে নেই, যদি কোনো বিশেষ ঘটনা ঘ'টে ওঠে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। অমূল্য, তোমার তোরঙ্গ বই প্রভৃতি যা-কিছু আমার ঘরে ছিল সমস্তই বাজারে তোমার বাসাঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার ঘরে তোমার কোনো জিনিস রাখা চলবে না।

এই বলে সন্দীপ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল।

আমি বললুম, অমূল্য, তোমাকে আমার গয়না বিক্রি করতে দিয়ে অবধি মনে আমার শান্তি ছিল না।

কেন দিদি ?

আমার ভয় হচ্ছিল এ গয়নার বাক্স নিয়ে পাছে তুমি বিপদে পড়, পাছে তোমাকে কেউ চোর বলে সন্দেহ করে ধরে। আমার সে ছ হাজার টাকায় কাজ নেই। এখন আমার একটি কথা তোমাকে শুনতে হবে— এখনই তুমি বাড়ি যাও, যাও তোমার মায়ের কাছে।

অমূল্য চাদরের ভিতর থেকে একটা পুঁটুলি বের করে বললে, দিদি, ছ হাজার টাকা এনেছি।

জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় পেলে ?

তার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, গিনির জন্যে অনেক চেষ্টা করলুম, সে হল না, তাই নোট এনেছি।

অমূল্য, মাথা খাও, সত্যি করে বলো, এ টাকা কোথায় পেলে ?

সে আপনাকে বলব না।

আমি চোখে যেন অন্ধকার দেখতে লাগলুম। বললুম, কী কাণ্ড করেছ অমূল্য ? এ টাকা কি—

অমূল্য বলে উঠল, আমি জানি তুমি বলবে এ টাকা আমি অন্যায় করে এনেছি— আচ্ছা, তাই স্বীকার। কিন্তু যতবড়ো অন্যায় ততবড়োই দাম, সে দাম আমি দিয়েছি। এখন এ টাকা আমার।

এ টাকার সমস্ত বিবরণ আমার আর শুনতে ইচ্ছে হল না। শিরগুলো সংকুচিত হয়ে আমার সমস্ত শরীরকে যেন গুটিয়ে আনতে লাগল। আমি বললুম, নিয়ে যাও অমূল্য, এ টাকা যেখান থেকে নিয়ে এসেছ এখনই সেখানে দিয়ে এসো।

সে যে বড়ো শক্ত কথা।

না, শক্ত নয় ভাই। কী কুক্ষণে তুমি আমার কাছে এসেছিলে। সন্দীপও তোমার যতবড়ো অনিষ্ট করতে পারে নি আমি তাই করলুম !

সন্দীপের নামটা যেন তাকে খোঁচা মারলে। সে বললে, সন্দীপ ! তোমার কাছে এলুম বলেই তো ওকে চিনতে পেরেছি। জানো দিদি, তোমার কাছ থেকে সেদিন ও যে ছ হাজার টাকার গিনি নিয়ে গেছে তার থেকে এক পয়সাও খরচ করে নি। এখান থেকে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে রুমাল থেকে সমস্ত গিনি মেজের উপর ঢেলে রাশ করে তুলে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বললে, এ টাকা নয়, এ ঐশ্বর্য-পারিজাতের পাপড়ি, এ অলকাপুরীর বাঁশি থেকে সুরের মতো ঝরে পড়তে পড়তে শক্ত হয়ে উঠেছে, একে তো ব্যাঙ্কনোটে ভাঙানো চলে না। এ যে সুন্দরীর কণ্ঠহার হয়ে থাকবার কামনা করছে— ওরে অমূল্য, তোরা একে স্থূলদৃষ্টিতে দেখিস নে, এ হচ্ছে লক্ষ্মীর হাসি, ইন্দ্রাণীর লাবণ্য— না না, ঐ অরসিক নায়েবটার হাতে পড়বার জন্যে এর সৃষ্টি হয় নি। দেখো অমূল্য, নায়েবটা নিছক মিথ্যা কথা বলেছে, পুলিস সেই নৌকোচুরির কোনো খবর পায় নি, ও এই সুযোগে কিছু করে নিতে চায়। দেখো অমূল্য, নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠি-তিনটে আদায় করতে হবে।— আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেমন করে ?— সন্দীপ বললে, জোর ক'রে, ভয় দেখিয়ে।— আমি বললুম, রাজি আছি, কিন্তু এই গিনিগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে।— সন্দীপ বললে, আচ্ছা, সে হবে।— কেমন করে ভয় দেখিয়ে নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠিগুলি আদায় করে পুড়িয়ে ফেলেছি সে অনেক কথা। সেই রাত্রেই আমি সন্দীপের কাছে এসে বলেছি, আর ভয় নেই, গিনিগুলি আমাকে দিন, কাল সকালেই আমি দিদিকে ফিরিয়ে দেব।— সন্দীপ বললে, এ কোন্ মোহ তোমাকে পেয়ে বসল ! এবার দিদির আঁচলে দেশ ঢাকা পড়ল বুঝি ! বলো বন্দেমাতরং ! ঘোর কেটে যাক।— তুমি তো জান দিদি, সন্দীপ কী মন্ত্র জানে। গিনি তারই কাছে রইল। আমি অন্ধকার-রাত্রে পুকুরের ঘাটের চাতালের উপর বসে বন্দেমাতরং জপতে লাগলুম। কাল যখন তুমি গয়না বেচতে দিলে তখন সন্ধ্যার সময় আবার ওর কাছে গেলুম। বেশ বুঝলুম, তখন ও আমার উপরে রাগে জ্বলছে। সে রাগ প্রকাশ করলে না ;

বললে, দেখো, যদি আমার কোনো বাক্সয় সে গিনি থাকে তো নিয়ে যাও। বলে আমার গায়ের উপর চাবির গোছাটা ফেলে দিলে। কোথাও নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় রেখেছেন বলুন। সন্দীপ বললে, আগে তোমার মোহ ভাঙবে, তার পরে আমি বলব। এখন নয়।— আমি দেখলুম, কিছুতেই তাকে নড়াতে পারব না, তখন আমাকে অন্য উপায় নিতে হয়েছিল। এর পরেও ওকে এই ছ হাজার টাকার নোট দেখিয়ে সেই গিনি-ক'টা নেবার অনেক চেষ্টা করেছি। গিনি এনে দিচ্ছি বলে আমাকে ভুলিয়ে রেখে ওর শোবার ঘর থেকে আমার তোরঙ্গ ভেঙে গয়নার বাক্স নিয়ে তোমার কাছে এসেছে! এ বাক্স তোমার কাছে আমাকে নিয়ে আসতে দিলে না! আবার বলে কিনা, এ গয়না ওরই দান? আমাকে যে কতখানি বঞ্চিত করেছে সে আমি কাকে বলব! এ আমি কখনো মাপ করতে পারব না। দিদি, ওর মন্ত্র একেবারে ছুটে গেছে। তুমিই ছুটিয়ে দিয়েছ।

আমি বললুম, ভাই আমার, আমার জীবন সার্থক হয়েছে। কিন্তু অমূল্য, এখনো বাকি আছে। শুধু মায়া কাটালে হবে না, যে কালি মেখেছি সে ধুয়ে ফেলতে হবে। দেরি কোরো না অমূল্য, এখনই যাও, এ টাকা যেখান থেকে এনেছ সেইখানেই রেখে এসো। পারবে না লক্ষ্মী ভাই?

তোমার আশীর্বাদে পারব দিদি।

এ শুধু তোমার একলার পারা নয়। এর মধ্যে যে আমারও পারা আছে। আমি মেয়েমানুষ, বাইরের রাস্তা আমার বন্ধ, নইলে তোমাকে আমি যেতে দিতুম না, আমিই যেতুম। আমার পক্ষে এইটেই সব চেয়ে কঠিন শাস্তি যে, আমার পাপ তোমাকে সামলাতে হচ্ছে।

ও কথা বোলো না দিদি। যে রাস্তায় চলেছিলুম, সে তোমার রাস্তা নয়। সে রাস্তা দুর্গম বলেই আমার মনকে টেনেছিল। দিদি, এবার তোমার রাস্তায় ডেকেছ— এ রাস্তা আমার আরো হাজার গুণে দুর্গম হোক, কিন্তু তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে জিতে আসব, কোনো ভয় নেই। তা হলে এ টাকা যেখান থেকে এনেছি সেইখানেই ফিরিয়ে দিতে হবে এই তোমার হুকুম?

আমার হুকুম নয় ভাই, উপরের হুকুম।

সে আমি জানি নে। সেই উপরের হুকুম তোমার মুখ দিয়ে এসেছে এই আমার যথেষ্ট। কিন্তু দিদি, তোমার কাছে আমার নেমন্তন্ন আছে। সেইটে আজ আদায় করে তবে যাব। প্রসাদ দিতে হবে। তার পরে সন্ধের মধ্যেই যদি পারি কাজ সেরে আসব।

হাসতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল; বললুম, আচ্ছা।

অমূল্য চলে যেতেই আমার বুক দমে গেল। কোন্ মায়ের বাছাকে বিপদে ভাসালুম! ভগবান, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন সর্বনেশে ঘটা করে কেন! এত লোককে নিমন্ত্রণ! আমার একলায় কুলোল না? এত মানুষকে দিয়ে তার ভার বহন করাবে! আহা, ঐ ছেলেমানুষকে কেন মারবে?

তাকে ফিরে ডাকলুম, অমূল্য! আমার গলা এমন ক্ষীণ হয়ে বাজল সে শুনতে পেলে না। দরজার কাছে গিয়ে আবার ডাকলুম, অমূল্য! তখন সে চলে গেছে।

বেহারা, বেহারা!

কী রানীমা?

অমূল্যবাবুকে ডেকে দে।

কী জানি, বেহারা অমূল্যর নাম বোধ হয় জানে না, তাই সে একটু পরেই সন্দীপকে ডেকে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বললে, যখন তাড়িয়ে দিলে তখনই জানতুম ফিরে ডাকবে। যে চাঁদের টানে ভাঁটা সেই চাঁদের টানেই জোয়ার। এমনি নিশ্চয় জানতুম তুমি ডাকবে যে, আমি দরজার কাছে অপেক্ষা করে বসেছিলুম। যেমনি তোমার বেহারাকে দেখেছি অমনি সে কিছু বলবার পূর্বেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি। ভোজপুরীটা আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে রইল। ভাবলে লোকটা মন্ত্রসিদ্ধ। মক্ষীরানী, সংসারে সব চেয়ে বড়ো লড়াই এই মন্ত্রের লড়াই।

সম্মোহনে সম্মোহনে কাটাকাটি। এর বাণ শব্দভেদী বাণ। আবার, নিঃশব্দভেদী বাণও আছে। এতদিন পরে এই লড়াইয়ে সন্দীপের সমকক্ষ মিলেছে। তোমার তূণে অনেক বাণ আছে রণরঙ্গিণী! পৃথিবীর মধ্যে দেখলুম, কেবল তুমিই সন্দীপকে আপন ইচ্ছামতে ফেরাতে পারলে, আবার আপন ইচ্ছামতে টেনে আনলে। শিকার তো এসে পড়ল। এখন একে নিয়ে কী করবে বলো। একেবারে নিঃশেষে মারবে, না তোমার খাঁচায় পুরে রাখবে? কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি রানী, এই জীবটিকে বধ করাও যেমন শক্ত, বন্ধ করাও তেমনি। অতএব দিব্য অস্ত্র তোমার হাতে যা আছে তার পরীক্ষা করতে বিলম্ব কোরো না।

সন্দীপের মনের ভিতরে একটা পরাভবের সংশয় এসেছে বলেই সে আজ এমন অনর্গল বকে গেল। আমার বিশ্বাস, ও জানত আমি অমূল্যকেই ডেকেছি; বেহারা খুব সম্ভব তারই নাম বলেছিল; ও তাকে ফাঁকি দিয়ে নিজে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমাকে বলতে দেবার সময় দিলে না যে, ওকে ডাকি নি, অমূল্যকে ডেকেছি। কিন্তু আস্ফালন মিথ্যে, এবার দুর্বলকে দেখতে পেয়েছি। এখন আমার জয়লব্ধ জায়গাটির সূচ্যগ্রভূমিও ছাড়তে পারব না।

আমি বললুম, সন্দীপবাবু, আপনি গল্‌ গল্‌ করে এত কথা বলে যান কেমন করে? আগে থাকতে বুঝি তৈরি হয়ে আসেন?

এক মুহূর্তে সন্দীপের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। আমি বললুম, শুনেছি কথকদের খাতায় নানা রকমের লম্বা লম্বা বর্ণনা লেখা থাকে, যখন যেটা যেখানে দরকার খাটিয়ে দেয়। আপনার সেরকম খাতা আছে নাকি?

সন্দীপ চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, বিধাতার প্রসাদে তোমাদের তো হাবভাব-ছলাকলার অন্ত নেই, তার উপরেও দর্জির দোকান স্যাকরার দোকান তোমাদের সহায়, আর বিধাতা কি আমাদেরই এমনি নিরস্ত্র করে রেখেছেন যে—

আমি বললুম, সন্দীপবাবু, খাতা দেখে আসুন; এ কথাগুলো ঠিক হচ্ছে না। দেখছি এক-একবার আপনি উল্টোপাল্টা বলে বসেন; খাতা-মুখস্থর ঐ একটা মস্ত দোষ।

সন্দীপ আর থাকতে পারলে না; একেবারে গর্জে উঠল, তুমি! তুমি আমাকে অপমান করবে! তোমার কী না আমার কাছে ধরা পড়েছে বলো তো! তোমার যে—

ওর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না। সন্দীপ যে মন্ত্রব্যবসায়ী, মন্ত্র যে-মুহূর্তে খাটে না সে-মুহূর্তেই ওর আর জোর নেই; রাজা থেকে একেবারে রাখাল হয়ে যায়। দুর্বল! দুর্বল! ও যতই রূঢ় হয়ে উঠে কর্কশ কথা বলতে লাগল ততই আনন্দে আমার বুক ভরে উঠল। আমাকে বাঁধবার নাগপাশ ওর ফুরিয়ে গেছে, আমি মুক্তি পেয়েছি। বাঁচা গেছে, বাঁচা গেছে! অপমান করো, আমাকে অপমান করো, এইটেই তোমার সত্য। আমাকে স্তব কোরো না, সেইটেই মিথ্যা।

এমন সময় আমার স্বামী ঘরের মধ্যে এলেন। অন্য দিন সন্দীপ মুহূর্তেই আপনাকে যে-রকম সামলে নেয় আজ তার সে শক্তি ছিল না। আমার স্বামী তার মুখের দিকে চেয়ে একটু আশ্চর্য হলেন। আগে হলে আমি এতে লজ্জা পেতুম। কিন্তু স্বামী যাই মনে করুন-না আমি আজ খুশি হলুম। আমি ঐ দুর্বলকে দেখে নিতে চাই।

আমরা দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইলুম দেখে আমার স্বামী একটু ইতস্তত করে চৌকিতে বসলেন; বললেন, সন্দীপ, আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম, শুনলুম এই ঘরেই আছ।

সন্দীপ কথাটার উপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিয়ে বললে, হাঁ, মক্ষীরানী সকালেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি যে মউচাকের দাসমক্ষিকা, কাজেই হুকুম শুনেই সব কাজ ফেলে চলে আসতে হল।

স্বামী বললেন, কাল কলকাতায় যাচ্ছি, তোমাকে যেতে হবে।

সন্দীপ বললে, কেন বলো দেখি। আমি কি তোমার অনুচর নাকি?

আচ্ছা, তুমিই কলকাতায় চলো, আমিই তোমার অনুচর হব।

কলকাতায় আমার কাজ নেই।

সেইজন্যেই তো কলকাতায় যাওয়া তোমার দরকার। এখানে তোমার বড্ড বেশি কাজ।

আমি তো নড়ছি নে।

তা হলে তোমাকে নড়াতে হবে।

জোর ?

হাঁ, জোর।

আচ্ছা বেশ, নড়ব। কিন্তু জগৎটা তো কলকাতা আর তোমার এলেকা এই দুই ভাগে বিভক্ত নয়। ম্যাপে আরো জায়গা আছে।

তোমার গতিক দেখে মনে হয়েছিল, জগতে আমার এলেকা ছাড়া আর-কোনো জায়গাই নেই।

সন্দীপ তখন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, মানুষের এমন অবস্থা আসে যখন সমস্ত জগৎ এতটুকু জায়গায় এসে ঠেকে। তোমার এই বৈঠকখানাটির মধ্যে আমার বিশ্বকে আমি প্রত্যক্ষ করে দেখেছি, সেইজন্যেই এখান থেকে নড়ি নে। মক্ষীরানী, আমার কথা এরা কেউ বুঝতে পারবে না, হয়তো তুমিও বুঝবে না। আমি তোমাকে বন্দনা করি। আমি তোমারই বন্দনা করতে চললুম। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মন্ত্র বদল হয়ে গেছে। বন্দে মাতরং নয়— বন্দে প্রিয়াং, বন্দে মোহিনীং। মা আমাদের রক্ষা করেন, প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন— বড়ো সুন্দর সেই বিনাশ। সেই মরণনৃত্যের নূপুর-ঝংকার বাজিয়ে তুলেছ আমার হৃৎপিণ্ডে। এই কোমলা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বাংলাদেশের রূপ তুমি তোমার এই ভক্তের চক্ষে এক মুহূর্তে বদলে দিয়েছ। দয়ামায়া তোমার নেই গো ; এসেছ মোহিনী, তুমি তোমার বিষপাত্র নিয়ে ; সেই বিষ পান ক'রে, সেই বিষে জর্জর হয়ে, হয় মরব নয় মৃত্যুঞ্জয় হব। মাতার দিন আজ নেই। প্রিয়া প্রিয়া প্রিয়া ! দেবতা স্বর্গ ধর্ম সত্য সব তুমি তুচ্ছ করে দিয়েছ, পৃথিবীর আর-সমস্ত সম্বন্ধ আজ ছায়া, নিয়ম-সংযমের সমস্ত বন্ধন আজ ছিন্ন। প্রিয়া প্রিয়া প্রিয়া ! তুমি যে দেশে দুটি পা দিয়ে দাঁড়িয়েছ তার বাইরের সমস্ত পৃথিবীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারই ছাইয়ের উপর আনন্দে তাণ্ডবনৃত্য করতে পারি ! এরা ভালোমানুষ, এরা অত্যন্ত ভালো, এরা সবার ভালো করতে চায়— যেন সবই সত্য ! কখনোই না, এমন সত্য বিশ্বে আর কোথাও নেই, এই আমার একমাত্র সত্য। বন্দনা করি তোমাকে ! তোমার প্রতি নিষ্ঠা আমাকে নিষ্ঠুর করেছে, তোমার 'পরে ভক্তি আমার মধ্যে প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়েছে ! আমি ভালো নই, আমি ধার্মিক নই, আমি পৃথিবীতে কিছুই মানি নে, আমি যাকে সকলের চেয়ে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি কেবলমাত্র তাকেই মানি।

আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! এই কিছু-আগেই আমি একে সমস্ত মন দিয়ে ঘৃণা করেছিলুম। যাকে ছাই বলে দেখেছিলুম তার মধ্যে থেকে আগুন জ্বলে উঠেছে। এ একেবারে খাঁটি আগুন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিধাতা এমন করে মিশিয়ে কেন মানুষকে তৈরি করেন ? সে কি কেবল তাঁর অলৌকিক ইন্দ্রজাল দেখাবার জন্যে ? আধ ঘণ্টা আগেই আমি মনে মনে ভাবছিলুম এই মানুষটাকে একদিন রাজা বলে ভ্রম হয়েছিল বটে কিন্তু এ যাত্রার দলের রাজা। তা নয়, তা নয়, যাত্রার দলের পোশাকের মধ্যেও এক-এক সময়ে রাজা লুকিয়ে থেকে যায়। এর মধ্যে অনেক লোভ, অনেক স্থূল, অনেক ফাঁকি আছে, স্তরে স্তরে মাংসের মধ্যে এ ঢাকা ; কিন্তু তবুও— আমরা জানি নে, আমরা শেষ কথাটাকে জানি নে, এইটেই স্বীকার করা ভালো ; আপনাকেও জানি নে। মানুষ বড়ো আশ্চর্য ; তাকে নিয়ে কী প্রচণ্ড রহস্যই তৈরি হচ্ছে তা সেই রুদ্র দেবতাই জানেন ! মাঝের থেকে দগ্ধ হয়ে গেলুম। প্রলয় ! প্রলয়ের দেবতাই শিব, তিনিই আনন্দময়, তিনি বন্ধন মোচন করবেন।

কিছুদিন থেকে বারে বারে মনে হচ্ছে আমার দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারছে সন্দীপের এই প্রলয়রূপ ভয়ংকর ; আর-এক বুদ্ধি বলছে এই তো মধুর। জাহাজ যখন ডোবে তখন

চার দিকে যারা সাঁতার দেয় তাদের টেনে নেয় ; সন্দীপ যেন সেই মরণের মূর্তি, ভয় ধরবার আগেই ওর প্রচণ্ড টান এসে ধরে— সমস্ত আলো সমস্ত কল্যাণ থেকে, আকাশের মুক্তি থেকে, নিশ্বাসের বাতাস থেকে, চিরদিনের সঞ্চয় থেকে, প্রতিদিনের ভাবনা থেকে, চোখের পলকে একটা নিবিড় সর্বনাশের মধ্যে একেবারে লোপ করে দিতে চায়। কোন্ মহামারীর দূত হয়ে ও এসেছে, অশিবমন্ত্র পড়তে পড়তে রাস্তা দিয়ে চলেছে, আর ছুটে আসছে দেশের সব বালকরা সব যুবকরা। বাংলাদেশের হৃদয়পদ্মে যিনি মা বসে আছেন তিনি কেঁদে উঠেছেন ; তাঁর অমৃতভাণ্ডারের দরজা ভেঙে ফেলে এরা সেখানে মদের ভাণ্ড নিয়ে পানসভা বসিয়েছে, ধুলার উপর ঢেলে ফেলতে চায় সব সুধা, চুরমার করতে চায় চিরদিনের সুধাপাত্র। সবই বুঝলুম, কিন্তু মোহকে তো ঠেকিয়ে রাখতে পারি নে। সত্যের কঠোর তপস্যার পরীক্ষা করবার জন্যে সত্যদেবেরই এই কাজ— মাতলামি স্বর্গের সাজ প'রে এসে তাপসদের সামনে নৃত্য করতে থাকে। বলে, তোমরা মূঢ়, তপস্যায় সিদ্ধি হয় না, তার পথ দীর্ঘ, তার কাল মন্থর ; তাই বজ্রধারী আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি তোমাদের বরণ করব ; আমি সুন্দরী, আমি মত্ততা, আমার আলিঙ্গনেই নিমেষের মধ্যে সমস্ত সিদ্ধি।

একটুখানি চুপ করে থেকে সন্দীপ আবার আমাকে বললে, এবার দূরে যাবার সময় এসেছে দেবী। ভালোই হয়েছে। তোমার কাছে আসার কাজ আমার হয়ে গেছে। তার পরেও যদি থাকি তা হলে একে-একে আবার সব নষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড়ো তাকে লোভে প'ড়ে সস্তা করতে গেলেই সর্বনাশ ঘটে ; মুহূর্তের অন্তরে যা অনন্ত তাকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলেই সীমাবদ্ধ করা হয়। আমরা সেই অনন্তকে নষ্ট করতে বসেছিলুম, ঠিক এমন সময়ে তোমারই বজ্র উদ্যত হল, তোমার পূজাকে তুমি রক্ষা করলে আর তোমার এই পূজারীকেও। আজ আমার এই বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল। দেবী, আমিও আজ তোমাকে মুক্তি দিলুম ; আমার মাটির মন্দিরে তোমাকে ধরছিল না, এ মন্দির প্রত্যেক পলকে ভাঙবে-ভাঙবে করছিল ; আজ তোমার বড়ো মূর্তিকে বড়ো মন্দিরে পূজা করতে চললুম, তোমার কাছ থেকে দূরেই তোমাকে সত্য করে পাব— এখানে তোমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, সেখানে তোমার কাছ থেকে বর পাব।

টেবিলের উপর আমার গয়নার বাক্স ছিল। আমি সেটা তুলে ধরে বললুম, আমার এই গয়না আমি তোমার হাত দিয়ে যাঁকে দিলুম তাঁর চরণে তুমি পৌঁছে দিয়ো।

আমার স্বামী চুপ করে রইলেন। সন্দীপ বেরিয়ে চলে গেল।

অমূল্যর জন্যে নিজের হাতে খাবার তৈরি করতে বসেছিলুম, এমন সময় মেজোরানী এসে বললেন, কী লো ছুটু, নিজের জন্মতিথিতে নিজেকে খাওয়াবার উজ্জুগ হচ্ছে বুঝি ?

আমি বললুম, নিজেকে ছাড়া আর কাউকে খাওয়াবার নেই নাকি ?

মেজোরানী বললেন, আজ তো তোর খাওয়াবার কথা নয়, আমরা খাওয়াব। সেই জোগাড়ও তো করছিলুম, এমন সময় খবর শুনে পিলে চমকে গেছে ; আমাদের কোন্ কাছারিতে নাকি পাঁচ-ছ শো ডাকাত পড়ে ছ হাজার টাকা লুটে নিয়েছে। লোকে বলছে এইবার তারা আমাদের বাড়ি লুট করতে আসবে।

এই খবর শুনে আমার মনটা হাল্কা হল। এ তবে আমাদেরই টাকা। এখনই অমূল্যকে ডাকিয়ে বলি, এই ছ হাজার টাকা এইখানেই আমার সামনে আমার স্বামীর হাতে সে ফিরিয়ে দিক, তার পরে আমার যা বলবার সে আমি তাঁকে বলব।

মেজোরানী আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললেন, অবাক করলে ! তোর মনে একটুও ভয়ডর নেই ?

আমি বললুম, আমাদের বাড়ি লুট করতে আসবে এ আমি বিশ্বাস করতে পারি নে।

বিশ্বাস করতে পারো না! কাছারি লুঠ করবে এইটেই বা বিশ্বাস করতে কে পারত?

কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে পুলিপিঠের মধ্যে নারকেলের পুর দিতে লাগলুম। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে তিনি বললেন, যাই, ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠাই, আমাদের সেই ছ হাজার টাকাটা এখনই বের করে নিয়ে কলকাতায় পাঠাতে হবে, আর দেরি করা নয়।

এই বলে তিনি চলে যেতেই আমি পিঠের বারকোশ সেইখানে আলগা ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি সেই লোহার সিন্দুকের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম। আমার স্বামীর এমনি ভোলা-মন যে দেখি তাঁর যে জামার পকেটে চাবি থাকে সে জামাটা তখনো আলনায় ঝুলছে। চাবির রিং থেকে লোহার সিন্দুকের চাবিটা খুলে আমার জ্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেললুম।

এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা পড়ল। বললুম, কাপড় ছাড়ছি।— শুনতে পেলুম মেজোরানী বললেন, এই কিছু আগে দেখি পিঠে তৈরি করছে, আবার এখনই সাজ করবার ধুম পড়ে গেল! কত লীলাই যে দেখব! আজ বুঝি ওদের বন্দেমাতরমের বৈঠক বসবে। ওলো, ও দেবীচৌধুরানী, লুঠের মাল বোঝাই হচ্ছে নাকি?

কী মনে করে একবার আস্তে আস্তে লোহার সিন্দুকটা খুললুম। বোধ হয় মনে ভাবছিলুম যদি সমস্তটা স্বপ্ন হয়, যদি হঠাৎ সেই ছোটো দেরাজটা টেনে খুলতেই দেখি সেই কাগজের মোড়কগুলি ঠিক তেমনিই সাজানো রয়েছে। হায় রে, বিশ্বাসঘাতকের নষ্ট বিশ্বাসের মতোই সব শূন্য।

মিছামিছি কাপড় ছাড়তেই হল। কোনো দরকার নেই, তবু নতুন করে চুল বাঁধলুম। মেজোরানীর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন 'বলি এত সাজ কিসের' আমি বললুম, জন্মতিথির।

মেজোরানী হেসে বললেন, একটা কিছু ছুতো পেলেই অমনি সাজ। ঢের দেখেছি, তোর মতো এমন ভাবুনে দেখি নি।

অমূল্যকে ডাকবার জন্যে বেহারার খোঁজ করছি, এমন সময় সে এসে পেন্‌সিলে লেখা একটি ছোটো চিঠি আমার হাতে দিলে। তাতে অমূল্য লিখেছে, দিদি, খেতে ডেকেছিলে, কিন্তু সবুর করতে পারলুম না। আগে তোমার আদেশ পালন করে আসি, তার পরে তোমার প্রসাদ গ্রহণ করব। হয়তো ফিরে আসতে সন্ধ্যা হবে।

অমূল্য কার হাতে টাকা ফেরাতে চলল, আবার কোন্ জালের মধ্যে নিজেকে জড়াতে গেল! আমি তাকে তীরের মতো কেবল ছুঁড়তেই পারি, কিন্তু লক্ষ্য ভুল হলে তাকে আর কোনোমতে ফেরাতে পারি নে।

এই অপরাধের মূলে যে আমি আছি এই কথাটা এখনই স্বীকার করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু মেয়েরা সংসারে বিশ্বাসের উপরেই বাস করে, সেই যে তাদের জগৎ। সেই বিশ্বাসকে লুকিয়ে ফাঁকি দিয়েছি এই কথাটা জানিয়ে তার পরে সংসারে টিকে থাকা আমাদের পক্ষে বড়ো কঠিন। যা আমরা ভাঙব ঠিক তার উপরেই যে আমাদের দাঁড়াতে হবে, সেই ভাঙা জিনিসের খোঁচা নড়তে-চড়তে আমাদের প্রতি মুহূর্তেই বাজতে থাকবে। অপরাধ করা শক্ত নয়, কিন্তু সেই অপরাধের সংশোধন করা মেয়েদের পক্ষে যত কঠিন এমন আর কারও নয়।

কিছুদিন থেকে আমার স্বামীর সঙ্গে বেশ সহজে কথাবার্তা কওয়ার প্রণালীটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই হঠাৎ এতবড়ো একটা কথা কেমন করে এবং কখন যে তাঁকে বলব তা কিছুতেই ভেবে পেলুম না। আজ তিনি অনেক দেরিতে খেতে এসেছেন; তখন বেলা দুটো। অন্যমনস্ক হয়ে কিছুই প্রায় খেতে পারলেন না। আমি যে তাঁকে একটু অনুরোধ করে খেতে বলব সে অধিকারটুকু খুইয়েছি। মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছলুম।

একবার ভাবলুম সংকোচ কাটিয়ে বলি, ঘরের মধ্যে একটু বিশ্রাম করো'সে, তোমাকে বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে। একটু কেশে কথাটা যেই তুলতে যাচ্ছি এমন সময় বেহারা এসে খবর দিলে দারোগাবাবু কাসেম সর্দারকে নিয়ে এসেছে। আমার স্বামী উদ্‌বিগ্নমুখে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন।

তিনি বাইরে যাওয়ার একটু পরেই মেজোরানী এসে বললেন, ঠাকুরপো কখন খেতে এলেন

আমাকে খবর দিলি নে কেন ? আজ তাঁর খাবার দেরি দেখে নাইতে গেলুম, এরই মধ্যে কখন—

কেন, কী চাই ?

শুনছি তোরা কাল কলকাতায় যাচ্ছিস। তা হলে আমি এখানে থাকতে পারব না। বড়োরানী তাঁর রাধাবল্লভ ঠাকুরকে ছেড়ে কোথাও নড়বেন না। কিন্তু আমি এই ডাকাতির দিনে যে তোমাদের এই শূন্য ঘর আগলে বসে কথায় কথায় চমকে চমকে মরব সে আমি পারব না। কাল যাওয়াই তো ঠিক ?

আমি বললুম, হাঁ ঠিক। মনে মনে ভাবলুম, সেই যাওয়ার আগে এইটুকু সময়ের মধ্যে কত ইতিহাসই যে তৈরি হয়ে উঠবে তার ঠিকানা নেই। তার পরে কলকাতাতেই যাই কি এখানেই থাকি সব সমান। তার পর থেকে সংসারটা যে কেমন, জীবনটা যে কী, কে জানে! সব ধোঁওয়া, স্বপ্ন।

এই যে আমার অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়ে উঠল ব'লে, আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র আছে, এই সময়টাকে কেউ এক দিন থেকে আর-একদিন পর্যন্ত সরিয়ে সরিয়ে টেনে টেনে খুব দীর্ঘ করে দিতে পারে না ? তা হলে এরই মধ্যে আমি ধীরে ধীরে একবার সমস্তটা যথাসাধ্য সেরে-সুরে নিই ; অন্তত এই আঘাতটার জন্য নিজেকে এবং সংসারকে প্রস্তুত করে তুলি। প্রলয়ের বীজ যতক্ষণ মাটির নীচে থাকে ততক্ষণ অনেক সময় নেয় ; সে এত সময় যে মনে হয়, ভয়ের বুঝি কোনো কারণ নেই। কিন্তু মাটির উপর একবার যেই এতটুকু অঙ্কুর দেখা দেয় অমনি দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠে ; তখন তাকে কোনোমতে আঁচল দিয়ে, বুক দিয়ে, প্রাণ দিয়ে চাপা দেবার আর সময় পাওয়া যায় না।

মনে করছি কিছুই ভাবব না, অসাড় হয়ে চুপ করে পড়ে থাকব, তার পরে মাথার উপরে যা এসে পড়ে পড়ুক গে। পরশুদিনের মধ্যেই তো যা হবার তা হয়ে যাবে— জানাশোনা, হাসাহাসি, কাঁদাকাটি, প্রশ্ন-জবাব, সবই।

কিন্তু অমূল্যর সেই আত্মোৎসর্গের দীপ্তিতে-সুন্দর বালকের মুখখানি যে কিছুতে ভুলতে পারছি নে। সে তো চুপ করে বসে ভাগ্যের প্রতীক্ষা করে নি, সে যে ছুটে গেল বিপদের মাঝখানে। আমি নারীর অধম তাকে প্রণাম করি— সে আমার বালকদেবতা, সে আমার কলঙ্কের বোঝা একেবারে খেলাচ্ছলে কেড়ে নিতে এসেছে! সে আমার মার নিজের মাথায় নিয়ে আমাকে বাঁচাবে, ভগবানের এমন ভয়ানক দয়া আমি সইব কেমন করে! বাছা আমার, তোমাকে প্রণাম। ভাই আমার, তোমাকে প্রণাম! নির্মল তুমি, সুন্দর তুমি, বীর তুমি, নির্ভীক তুমি, তোমাকে প্রণাম! জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে হয়ে আমার কোলে এসো এই বর আমি কামনা করি।

এর মধ্যে চার দিকে নানা গুজব জেগে উঠেছে, পুলিস আনাগোনা করছে, বাড়ির দাসী-চাকররা সবাই উদ্‌বিগ্ন। ক্ষেমা দাসী আমাকে এসে বললে, ছোটোরানীমা, আমার এই সোনার পৈঁচে আর বাজুবন্ধ তোমার লোহার সিন্দুকে তুলে রেখে দাও।— ঘরের ছোটোরানীই দেশ জুড়ে এই দুর্ভাবনার জাল তৈরি করে নিজে তার মধ্যে আটকা পড়ে গেছে, এ কথা বলি কার কাছে ? ক্ষেমার গয়না, থাকোর জমানো টাকা, আমাকে ভালোমানুষের মতো নিতে হল। আমাদের গয়লানী একটা টিনের বাক্সোয় করে একটি বেনারসি কাপড় এবং তার আর-আর দামি সম্পত্তি আমার কাছে রেখে গেল ; বললে, রানীমা, এই বেনারসি কাপড় তোমারই বিয়েতে আমি পেয়েছিলুম।

কাল যখন আমারই ঘরের লোহার সিন্দুক খোলা হবে তখন এই ক্ষেমা, থাকো, গয়লানী— থাক্, সে কথা কল্পনা করে হবে কী! বরঞ্চ ভাবি, কালকের দিনের পর আর আর-এক বৎসর কেটে গেছে, আবার আর-একটা তেসরা মাঘের দিন এসেছে, সেদিনও কি আমার সংসারের সব কাটা ঘা এমনি কাটাই থেকে যাবে ?

অমূল্য লিখেছে, সে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফিরবে। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে একা বসে চুপ করে থাকতে পারি নে। আবার পিঠে তৈরি করতে গেলুম। যা তৈরি হয়েছে তা যথেষ্ট, কিন্তু আরো করতে হবে। এত কে খাবে ? বাড়ির সমস্ত দাসী-চাকরদের খাইয়ে দেব। আজ রাত্রেই খাওয়াতে হবে। আজ রাত পর্যন্ত আমার দিনের সীমা। কালকের দিন আর আমার হাতে নেই।

পিঠের পরে পিঠে ভাজছি, বিশ্রাম নেই। এক-একবার মনে হচ্ছে যেন উপরে আমার মহলের দিকে কী-একটা গোলমাল চলছে। হয়তো আমার স্বামী লোহার সিন্দুক খুলতে এসে চাবি খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই নিয়ে মেজোরানী দাসী-চাকরকে ডেকে একটা তোলপাড় কাণ্ড বাধিয়েছেন। না, আমি শুনব না, কিচ্ছু শুনব না, দরজা বন্ধ করে থাকব। দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি থাকো তাড়াতাড়ি আসছে ; সে হাঁপিয়ে বললে, ছোটোরানীমা! আমি বলে উঠলুম, যা যা, বিরক্ত করিস নে আমার এখন সময় নেই।— থাকো বললে, মেজোরানীমা'র বোনপো নন্দবাবু কলকাতা থেকে এক কল এনেছেন, সে মানুষের মতো গান করে, তাই মেজোরানীমা তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন।

হাসব কি কাঁদব তাই ভাবি। এর মাঝখানেও গ্রামোফোন। তাতে যতবার দম দিচ্ছে সেই থিয়েটারের নাকি সুর বেরোচ্ছে ; ওর কোনো ভাবনা নেই। যন্ত্র যখন জীবনের নকল করে তখন তা এমনি বিষম বিদ্রূপ হয়েই ওঠে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। জানি, অমূল্য এলেই আমাকে খবর পাঠাতে দেরি করবে না ; তবু থাকতে পারলুম না, বেহারাকে ডেকে বললুম, অমূল্যবাবুকে খবর দাও। বেহারা খানিকটা ঘুরে এসে বললে, অমূল্যবাবু নেই।

কথাটা কিছুই নয়, কিন্তু হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে যেন তোলপাড় করে উঠল। অমূল্যবাবু নেই— সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে এ কথাটা যেন কান্নার মতো বাজল। নেই, সে নেই! সে সূর্যাস্তের সোনার রেখাটির মতো দেখা দিলে, তার পরে সে আর নেই! সম্ভব অসম্ভব কত দুর্ঘটনার কল্পনাই আমার মাথার মধ্যে জমে উঠতে লাগল। আমিই তাকে মৃত্যুর মধ্যে পাঠিয়েছি, সে যে কোনো ভয় করে নি সে তারই মহত্ত্ব, কিন্তু এর পরে আমি বেঁচে থাকব কেমন করে?

অমূল্যর কোনো চিহ্নই আমার কাছে ছিল না ; কেবল ছিল তার সেই ভাইফোঁটার প্রণামী, সেই পিস্তলটি। মনে হল এর মধ্যে দৈবের ইঙ্গিত রয়েছে। আমার জীবনের মূলে যে কলঙ্ক লেগেছে, বালক-বেশে আমার নারায়ণ সেটি ঘুচিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে রেখে দিয়েই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কী ভালোবাসার দান! কী পাবনমন্ত্র তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন!

বাক্স খুলে পিস্তলটি বের করে দুই হাতে তুলে আমার মাথায় ঠেকালুম। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের ঠাকুরবাড়ি থেকে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলুম।

রাত্রে লোকজনদের পিঠে খাওয়ানো গেল। মেজোরানী এসে বললেন, নিজে নিজেই খুব ধুম করে জন্মতিথি করে নিলি যা হোক। আমাদের বুঝি কিছু করতে দিবি নে? এই বলে তিনি তাঁর সেই গ্রামোফোনটাতে যত রাজ্যের নটীদের মিহি চড়া সুরের দ্রুত তানের কসরত শোনাতে লাগলেন ; মনে হতে লাগল যেন গন্ধর্বলোকের সুরওয়ালা ঘোড়ার আস্তাবল থেকে চিঁহি চিঁহি শব্দে হ্রেষাধ্বনি উঠছে।

খাওয়ানো শেষ করতে অনেক রাত হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল আজ রাতে আমার স্বামীর পায়ের ধুলো নেব। শোবার ঘরে গিয়ে দেখি তিনি অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। আজ সমস্ত দিন তাঁর অনেক ঘোরাঘুরি অনেক ভাবনা গিয়েছে। খুব সাবধানে মশারি একটুখানি খুলে তাঁর পায়ের কাছে আস্তে আস্তে মাথা রাখলুম। চুলের স্পর্শ লাগতেই ঘুমের ঘোরে তিনি তাঁর পা দিয়ে আমার মাথাটা একটু ঠেলে দিলেন।

পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে বসলুম। দূরে একটা শিমুল গাছ অন্ধকারে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে ; তার সমস্ত পাতা ঝরে গিয়েছে, তারই পিছনে সপ্তমীর চাঁদ ধীরে ধীরে অস্ত গেল।

আমার হঠাৎ মনে হল আকাশের সমস্ত তারা যেন আমাকে ভয় করছে, রাত্রিবেলাকার এই প্রকাণ্ড জগৎ আমার দিকে যেন আড়চোখে চাইছে। কেননা আমি যে একলা ; একলা মানুষের মতো এমন সৃষ্টিছাড়া আর কিছুই নেই। যার সমস্ত আত্মীয়স্বজন একে একে মরে গিয়েছে সেও একলা নয়, মৃত্যুর আড়াল থেকেও সে সঙ্গ পায়। কিন্তু যার সমস্ত আপন মানুষ পাশেই রয়েছে, তবু কাছে নেই, যে মানুষ পরিপূর্ণ সংসারের সকল অঙ্গ থেকেই একেবারে খসে পড়ে গিয়েছে, মনে হয় যেন অন্ধকারে তার মুখের দিকে চাইলে সমস্ত নক্ষত্রলোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি যেখানে রয়েছি

সেইখানেই নেই, যারা আমাকে ঘিরে রয়েছে আমি তাদের কাছে থেকেই দূরে। আমি চলছি, ফিরছি, বেঁচে আছি একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের উপরে যেন পদ্মপাতার উপরকার শিশিরবিন্দুর মতো।

কিন্তু মানুষ যখন বদলে যায় তখন তার আগাগোড়া সমস্ত বদল হয় না কেন ? হৃদয়ের দিকে তাকালে দেখতে পাই যা ছিল তা সবই আছে, কেবল নড়ে-চড়ে গিয়েছে। যা সাজানো ছিল আজ তা এলোমেলো, যা কণ্ঠের হারে গাঁথা ছিল আজ তা ধুলোয়। সেইজন্যেই তো বুক ফেটে যাচ্ছে। ইচ্ছা করে মরি ; কিন্তু সবই যে হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে আছে, মরার ভিতরে তো শেষ দেখতে পাচ্ছি নে। আমার মনে হচ্ছে যেন মরার মধ্যে আরো ভয়ানক কান্না। যা-কিছু চুকিয়ে দেবার তা বাঁচার ভিতর দিয়েই চুকোতে পারি— অন্য উপায় নেই।

এবারকার মতো আমাকে মাপ করো, হে আমার প্রভু। যা-কিছুকে তুমি আমার জীবনের ধন বলে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে সে-সমস্তকেই আমি আমার জীবনের বোঝা করে তুলেছি। আজ তা আর বহনও করতে পারছি নে, ত্যাগ করতেও পারছি নে। আর-একদিন তুমি আমার ভোরবেলাকার রাঙা আকাশের ধারে দাঁড়িয়ে যে বাঁশি বাজিয়েছিলে সেই বাঁশিটি বাজাও, সব সমস্যা সহজ হয়ে যাক ; তোমার সেই বাঁশির সুরটি ছাড়া ভাঙাকে কেউ জুড়তে পারে না, অপবিত্রকে কেউ শুভ্র করতে পারে না। সেই বাঁশির সুরে আমার সংসারকে তুমি নতুন করে সৃষ্টি করো। নইলে আমি আর কোনো উপায় দেখি নে।

মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম ; একটা কোনো দয়া কোথাও থেকে চাই, একটা কোনো আশ্রয়, একটু ক্ষমার আভাস, একটা এমন আশ্বাস যে সব চুকে যেতেও পারে। মনে মনে বললুম, আমি দিনরাত ধর্না দিয়ে পড়ে থাকব প্রভু, আমি খাব না, আমি জলস্পর্শ করব না, যতক্ষণ না তোমার আশীর্বাদ এসে পৌঁছয়।

এমন সময় পায়ের শব্দ শুনলুম। আমার বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। কে বলে দেবতা দেখা দেন না ! আমি মুখ তুলে চাইলুম না, পাছে আমার দৃষ্টি তিনি সইতে না পারেন। এসো, এসো এসো— তোমার পা আমার মাথায় এসে ঠেকুক, আমার এই বুকের কাঁপনের উপর এসে দাঁড়াও, প্রভু— আমি এই মুহূর্তেই মরি !

আমার শিয়রের কাছে এসে বসলেন। কে ? আমার স্বামী ! আমার স্বামীর হৃদয়ের মধ্যে আমার সেই দেবতারই সিংহাসন নড়ে উঠেছে যিনি আমার কান্না আর সইতে পারলেন না। মনে হল মূর্ছা যাব। তার পরে আমার শিরার বাঁধন যেন ছিঁড়ে ফেলে আমার বুকের বেদনা কান্নার জোয়ারে ভেসে বেরিয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে তাঁর পা চেপে ধরলুম ; ঐ পায়ের চিহ্ন চিরজীবনের মতো ঐখানে আঁকা হয়ে যায় না কি ?

এইবার তো সব কথা খুলে বললেই হত। কিন্তু এর পরে কি আর কথা আছে ? থাক্ গে আমার কথা।

তিনি আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আশীর্বাদ পেয়েছি। কাল যে অপমান আমার জন্যে আসছে সেই অপমানের ডালি সকলের সামনে মাথায় তুলে নিয়ে আমার দেবতার পায়ে সরল হয়ে প্রণাম করতে পারব।

কিন্তু এই মনে করে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, আজ ন বছর আগে যে নহবত বেজেছিল সে আর ইহজন্মে কোনোদিন বাজবে না। এ ঘরে আমাকে বরণ করে এনেছিল যে ! ওগো, এই জগতে কোন্ দেবতার পায়ে মাথা কুটে মরলে সেই বউ চন্দন চেলি প'রে সেই বরণের পিঁড়িতে এসে দাঁড়াতে পারে ? কত দিন লাগবে আর, কত যুগ, কত যুগান্তর, সেই ন বছর আগেকার দিনটিতে আর একটিবার ফিরে যেতে ? দেবতা নতুন সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে ?

নিখিলেশের আত্মকথা

আজ আমরা কলকাতায় যাব। সুখদুঃখ কেবলই জমিয়ে তুলতে থাকলে বোঝা ভারী হয়ে ওঠে। কেননা বসে থাকাটা মিথ্যে, সঞ্চয় করাটা মিথ্যে। আমি যে এই ঘরের কর্তা এটা বানানো জিনিস, সত্য এই যে, আমি জীবনপথের পথিক। ঘরের কর্তাকে তাই বারেবারে ঘা লাগবে, তার পরে শেষ আঘাত আছে মৃত্যু। তোমার সঙ্গে আমার যে মিলন সে মিলন চলার মুখে ; যতদূর পর্যন্ত এক পথে চলা গেল ততদূর পর্যন্তই ভালো, তার চেয়ে বেশি টানাটানি করতে গেলেই মিলন হবে বাঁধন। সে বাঁধন আজ রইল পড়ে ; এবার বেরিয়ে পড়লুম, চলতে চলতে যেটুকু চোখে চোখে মেলে, হাতে হাতে ঠেকে সেইটুকুই ভালো। তার পরে ? তার পরে আছে অনন্ত জগতের পথ, অসীম জীবনের বেগ— তুমি আমাকে কতটুকু বঞ্চনা করতে পারো প্রিয়ে ? সামনে যে বাঁশি বাজছে কান দিয়ে যদি শুনি তো শুনতে পাই, বিচ্ছেদের সমস্ত ফাটলগুলোর ভিতর দিয়ে তার মাধুর্যের ঝর্না ঝরে পড়ছে। লক্ষ্মীর অমৃত ভাণ্ডার ফুরোবে না বলেই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের পাত্র ভেঙে দিয়ে কাঁদিয়ে হাসেন। আমি ভাঙা পাত্র কুড়োতে যাব না, আমি আমার অতৃপ্তি বুকে নিয়েই সামনে চলে যাব।

মেজোরানীদিদি এসে বললেন, ঠাকুরপো, তোমার বইগুলো সব বাক্স ভরে গোরুর গাড়ি বোঝাই করে যে চলল তার মানে কী বলো তো ?

আমি বললুম, তার মানে ঐ বইগুলোর উপর থেকে এখনো মায়া কাটাতে পারি নি।

মায়া কিছু কিছু থাকলেই যে বাঁচি। কিন্তু, এখানে আর ফিরবে না নাকি ?

আনাগোনা চলবে, কিন্তু পড়ে থাকা আর চলবে না।

সত্যি নাকি ? তা হলে একবার এসো, একবার দেখো'সে কত জিনিসের উপরে আমার মায়া।— এই বলে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন।

তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি ছোটোবড়ো নানা রকমের বাক্স আর পুঁটলি। একটা বাক্স খুলে দেখালেন, এই দেখো ঠাকুরপো আমার পান-সাজার সরঞ্জাম। কেয়াখয়ের গুঁড়িয়ে বোতলের মধ্যে পুরেছি ; এই-সব দেখছ এক-এক-টিন মসলা। এই দেখো তাস, দশ-পঁচিশও ভুলি নি, তোমাদের না পাই আমি খেলবার লোক জুটিয়ে নেবই। এই চিরুনি তোমারই স্বদেশী চিরুনি, আর এই—

কিন্তু ব্যাপারটা কী মেজোরানী ? এ-সব বাক্সয় তুলেছ কেন ?

আমি যে তোমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছি।

সে কী কথা ?

ভয় নেই ভাই, ভয় নেই, তোমার সঙ্গেও ভাব করতে যাব না, ছোটোরানীর সঙ্গেও ঝগড়া করব না। মরতেই তো হবে, তাই সময় থাকতে গঙ্গাতীরের দেশে আশ্রয় নেওয়া ভালো। ম'লে তোমাদের সেই নেড়া-বটতলায় পোড়াবে সে কথা মনে হলে আমার মরতে ঘেন্না ধরে, সেইজন্যেই তো এতদিন ধরে তোমাদের জ্বালাচ্ছি।

এতক্ষণ পরে আমার এই বাড়ি যেন কথা কয়ে উঠল। আমার বয়স যখন ছয় তখন ন বছর বয়সে মেজোরানী আমাদের এই বাড়িতে এসেছেন। এই বাড়ির ছাদে দুপুরবেলায় উঁচু পাঁচিলের কোণের ছায়ায় বসে ওঁর সঙ্গে খেলা করেছি। বাগানে আমড়াগাছে চড়ে উপর থেকে কাঁচা আমড়া ফেলেছি, তিনি নীচে বসে সেগুলি কুচি-কুচি করে তার সঙ্গে নুন লঙ্কা ধনেশাক মিশিয়ে অপথ্য তৈরি করেছেন। পুতুলের বিবাহের ভোজ উপলক্ষে যে-সব উপকরণ ভাঁড়ার-ঘর থেকে গোপনে সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল তার ভার ছিল আমারই উপরে, কেননা ঠাকুরমার বিচারে আমার কোনো অপরাধের দণ্ড ছিল না। তার পরে যে-সব শৌখিন জিনিসের জন্যে দাদার 'পরে তাঁর আবদার ছিল সে আবদারের বাহক ছিলুম আমি ; আমি দাদাকে বিরক্ত করে করে যেমন করে হোক কাজ উদ্ধার করে আনতুম।

তার পরে মনে পড়ে, তখনকার দিনে জ্বর হলে কবিরাজের কঠোর শাসনে তিন দিন কেবল গরম জল আর এলাচদানা আমার পথ্য ছিল ; মেজোরানী আমার দুঃখ সইতে পারতেন না, কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে খাবার এনে দিয়েছেন, এক-একদিন ধরা পড়ে তাঁকে ভর্ৎসনাও সইতে হয়েছে। তার পরে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের রঙ নিবিড় হয়ে উঠেছে ; কত ঝগড়াও হয়েছে ; বিষয়ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক ঈর্ষা সন্দেহ এবং বিরোধও এসে পড়েছে ; আবার তার মাঝখানে বিমল এসে পড়ে কখনো কখনো এমন হয়েছে যে, মনে হয়েছে বিচ্ছেদ বুঝি আর জুড়বে না। কিন্তু তার পরে প্রমাণ হয়েছে, অন্তরের মিল সেই বাইরের ক্ষতের চেয়ে অনেক প্রবল। এমনি করে শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত একটি সত্য সম্বন্ধ দিনে দিনে অবিচ্ছিন্ন হয়ে জেগে উঠেছে; সেই সম্বন্ধের শাখাপ্রশাখা এই বৃহৎ বাড়ির সমস্ত ঘরে আঙিনায় বারান্দায় ছাদে বাগানে তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে সমস্তকে অধিকার করে দাঁড়িয়েছে। যখন দেখলুম মেজোরানী তাঁর সমস্ত ছোটোখাটো জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্স বোঝাই করে আমাদের বাড়ির থেকে যাবার মুখ করে দাঁড়িয়েছেন, তখন এই চিরসম্বন্ধটির সমস্ত শিকড়গুলি পর্যন্ত আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন শিউরে উঠল। আমি বেশ বুঝতে পারলুম কেন মেজোরানী, যিনি ন বছর বয়স থেকে আর এ পর্যন্ত কখনো একদিনের জন্যেও এ বাড়ি ছেড়ে বাইরে কাটান নি, তিনি তার সমস্ত অভ্যাসের বাঁধন কেটে ফেলে অপরিচিতের মধ্যে ভেসে চললেন। অথচ সেই আসল কারণটির কথা মুখ ফুটে বলতেই চান না, অন্য কত রকমের তুচ্ছ ছুতো তোলেন। এই ভাগ্যকর্তৃক বঞ্চিতা পতিপুত্রহীনা নারী সংসারের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র সম্বন্ধকে নিজের হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত অমৃত দিয়ে পালন করেছেন, তার বেদনা যে কত গভীর সে আজ তাঁর এই ঘরময় ছড়াছড়ি বাক্স-পুঁটুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে যত স্পষ্ট করে বুঝলুম এমন আর কোনোদিন বুঝি নি। আমি বুঝেছি টাকাকড়ি ঘরদুয়ারের ভাগ নিয়ে, ছোটোখাটো সামান্য সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে, বিমলের সঙ্গে আমার সঙ্গে তাঁর যে বার বার ঝগড়া হয়ে গেছে তার কারণ বৈষয়িকতা নয় ; তার কারণ তাঁর জীবনের এই একটিমাত্র সম্বন্ধে তাঁর দাবি তিনি প্রবল করতে পারেন নি, বিমল কোথা থেকে হঠাৎ মাঝখানে এসে একে ম্লান করে দিয়েছে, এইখানে তিনি নড়তে-চড়তে ঘা পেয়েছেন, অথচ তাঁর নালিশ করবার জোর ছিল না। বিমলও একরকম করে বুঝেছিল আমার উপর মেজোরানীর দাবি কেবলমাত্র সামাজিকতার দাবি নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর ; সেইজন্যে আমাদের এই আশৈশবের সম্পর্কটির 'পরে তাঁর এতটা ঈর্ষা। আজ বুকের দরজাটার কাছে আমার হৃদয় ধক্ ধক্ করে ঘা দিতে লাগল। একটা তোরঙ্গের উপর বসে পড়লুম ; বললুম, মেজোরানীদিদি, আমরা দুজনেই এই বাড়িতে যেদিন নতুন দেখা দিয়েছি সেইদিনের মধ্যে আর-একবার ফিরে যেতে বড়ো ইচ্ছে করে।

মেজোরানী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, না ভাই মেয়েজন্ম নিয়ে আর নয় ! যা সয়েছি তা একটা জন্মের উপর দিয়েই যাক, ফের আর কি সয় ?

আমি বলে উঠলুম, দুঃখের ভিতর দিয়ে যে মুক্তি আসে সেই মুক্তি দুঃখের চেয়ে বড়ো।

তিনি বললেন, তা হতে পারে, ঠাকুরপো, তোমরা পুরুষমানুষ, মুক্তি তোমাদের জন্যে। আমরা মেয়েরা বাঁধতে চাই, বাঁধা পড়তে চাই ; আমাদের কাছ থেকে তোমরা সহজে ছাড়া পাবে না গো। ডানা যদি মেলতে চাও আমাদের সুদ্ধ নিতে হবে, ফেলতে পারবে না। সেইজন্যেই তো এই-সব বোঝা সাজিয়ে রেখেছি। তোমাদের একেবারে হালকা হতে দিলে কি আর রক্ষা আছে !

আমি হেসে বললুম, তাই তো দেখছি ; বোঝা বলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই বোঝা বইবার মজুরি তোমরা পুষিয়ে দাও বলেই আমরা নালিশ করি নে।

মেজোরানী বললেন, আমাদের বোঝা হচ্ছে ছোটো জিনিসের বোঝা। যাকেই বাদ দিতে যাবে সেই বলবে 'আমি সামান্য, আমার ভার কতটুকুই বা', এমনি করে হালকা জিনিস দিয়েই আমরা তোমাদের মোট ভারী করি।— কখন বেরোতে হবে ঠাকুরপো ?

রাত্তির সাড়ে এগারোটায়, সে এখনো ঢের সময় আছে।

দেখো ঠাকুরপো, লক্ষ্মীটি, আমার একটি কথা রাখতে হবে, আজ সকাল-সকাল খেয়ে নিয়ে

দুপুরবেলায় একটু ঘুমিয়ে নিয়ো ; গাড়িতে রাত্তিরে তো ভালো ঘুম হবে না। তোমার শরীর এমন হয়েছে দেখলেই মনে হয়, আর-একটু হলেই ভেঙে পড়বে। চলো, এখনই তোমাকে নাইতে যেতে হবে।

এমন সময় ক্ষেমা মস্ত একটা ঘোমটা টেনে মৃদুস্বরে বললে, দারোগাবাবু কাকে সঙ্গে করে এনেছে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মেজোরানী রাগ করে উঠে বললেন, মহারাজ চোর না ডাকাত যে দারোগা তার সঙ্গে লেগেই রয়েছে। বলে আয় গে, মহারাজ এখন নাইতে গেছেন।

আমি বললুম, একবার দেখে আসি গে, হয়তো কোনো জরুরি কাজ আছে।

মেজোরানী বললেন, না, সে হবে না। ছোটোরানী কাল বিস্তর পিঠে তৈরি করেছে, দারোগাকে সেই পিঠে খেতে পাঠিয়ে তার মেজাজ ঠাণ্ডা করে রাখছি।।

বলে তিনি আমাকে হাতে ধরে টেনে স্নানের ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আমি ভিতর থেকে বললুম, আমার সাফ কাপড় যে এখনো—

তিনি বললেন, সে আমি ঠিক করে রাখব, ততক্ষণ তুমি স্নান করে নাও।

এই উৎপাতের শাসনকে অমান্য করি এমন সাধ্য আমার নেই ; সংসারে এ যে বড়ো দুর্লভ। থাক গে, দারোগাবাবু বসে বসে পিঠে খাক গে। নাহয় হল আমার কাজের অবহেলা।

ইতিমধ্যে সেই ডাকাতি নিয়ে দারোগা দু-পাঁচ জনকে ধরা-পাকড়া করছেই। রোজই একটা-না-একটা নিরীহ লোককে ধরে বেঁধে এনে আসর গরম করে রেখেছে। আজও বোধ হয় তেমনি কোন্-এক অভাগাকে পাকড়া করে এনেছে। কিন্তু পিঠে কি একলা দারোগাই খাবে ? সে তো ঠিক নয়। দরজায় দমাদম ঘা লাগালুম।

মেজোরানী বাইরে থেকে বললেন, জল ঢালো, জল ঢালো, মাথা গরম হয়ে উঠেছে বুঝি ?

আমি বললুম, পিঠে দুজনের মতো সাজিয়ে পাঠিয়ো ; দারোগা যাকে চোর বলে ধরেছে পিঠে তারই প্রাপ্য, বেহারাকে বলে দিয়ো তার ভাগে যেন বেশি পড়ে।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি স্নান সেরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। দেখি দরজার বাইরে মাটির উপরে বিমল বসে ! এ কি আমার সেই বিমল, সেই তেজে অভিমানে ভরা গরবিনী ! কোন্ ভিক্ষা মনের মধ্যে নিয়ে এ আমার দরজাতেও বসে থাকে ! আমি একটু থমকে দাঁড়াতেই সে উঠে মুখ একটু নিচু করে আমাকে বললে, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

আমি বললুম, তা হলে এসো আমাদের ঘরে।

কোনো বিশেষ কাজে কি তুমি বাইরে যাচ্ছ ?

হাঁ, কিন্তু থাক্ সে কাজ, আগে তোমার সঙ্গে—

না, তুমি কাজ সেরে এসো, তার পরে তোমার খাওয়া হলে কথা হবে।

বাইরে গিয়ে দেখি দারোগার পাত্র শূন্য। সে যাকে ধরে এনেছে সে তখনো বসে বসে পিঠে খাচ্ছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, এ কী, অমূল্য যে !

সে এক-মুখ পিঠে নিয়ে বললে, আজ্ঞে হাঁ। পেট ভরে খেয়ে নিয়েছি, এখন কিছু যদি না মনে করেন তা হলে যে ক'টা বাকি আছে রুমালে বেঁধে নিই।

বলে পিঠেগুলো সব রুমালে বেঁধে নিলে।

আমি দারোগার দিকে চেয়ে বললুম, ব্যাপারখানা কী ?

দারোগা হেসে বললে, মহারাজ, চোরের হেঁয়ালি তো হেঁয়ালিই রয়ে গেছে, তার উপরে চোরাই মালের হেঁয়ালি নিয়ে মাথা ঘোরাচ্ছি।

এই বলে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি খুলে একতাড়া নোট সে আমার সামনে ধরলে। বললে, এই মহারাজের ছ হাজার টাকা।

কোথা থেকে বেরোল?

আপাতত অমূল্যবাবুর হাত থেকে। উনি কাল রাত্রে আপনার চকুয়া কাছারির নায়েবের কাছে গিয়ে বললেন, চোরাই নোট পাওয়া গেছে— চুরি যেতে নায়েব এত ভয় পায় নি যেমন এই চোরাই মাল ফিরে পেয়ে। তার ভয় হল সবাই সন্দেহ করবে এ নোট সেই লুকিয়ে রেখেছিল, এখন বিপদের সম্ভাবনা দেখে একটা অসম্ভব গল্প বানিয়ে তুলেছে। সে অমূল্যবাবুকে খাওয়াবার ছল করে বসিয়ে রেখেই থানায় খবর দিয়েছে। আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েই ভোর থেকে ওঁকে নিয়ে পড়েছি। উনি বললেন, কোথা থেকে পেয়েছি সে আপনাকে বলব না। আমি বললুম, না বললে আপনি তো ছাড়া পাবেন না। উনি বলেন, মিথ্যে বলব। আমি বলি, আচ্ছা, তাই বলুন। উনি বলেন, ঝোপের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। আমি বললুম, মিথ্যে কথা অত সহজ নয়। কোথায় ঝোপ, সেই ঝোপের মধ্যে আপনি কী দরকারে গিয়েছিলেন, সমস্ত বলা চাই। উনি বললেন, সে-সমস্ত বানিয়ে তোলবার আমি যথেষ্ট সময় পাব, সেজন্যে কিছু চিন্তা করবেন না।

আমি বললুম, হরিচরণবাবু, ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে মিছিমিছি টানাটানি করে কী হবে?

দারোগা বললেন, শুধু ভদ্রলোকের ছেলে নয়, উনি নিবারণ ঘোষালের ছেলে, তিনি আমার ক্লাস-ফ্রেন্ড ছিলেন। মহারাজ, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি ব্যাপারখানা কী। অমূল্য জানতে পেরেছেন কে চুরি করেছে, এই বন্দেমাতরমের হুজুক উপলক্ষে তাকে উনি চেনেন। নিজের ঘাড়ে দায় নিয়ে তাকে উনি বাঁচাতে চান। এই-সব হচ্ছে ওঁর বীরত্ব।— বাবা, আমাদেরও বয়েস একদিন তোমাদেরই মতো ঐ আঠারো-উনিশ ছিল; পড়তুম রিপন কলেজে, একদিন স্ট্র্যান্ডে এক গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে পাহারাওয়ালার জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রায় জেলখানার সদর-দরজার দিকে ঝুঁকেছিলুম, দৈবাৎ ফসকে গেছে।— মহারাজ, এখন চোর ধরা-পড়া শক্ত হল, কিন্তু আমি বলে রাখছি কে এর মূলে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কে?

আপনার নায়েব তিনকড়ি দত্ত আর ঐ কাসেম সর্দার।

দারোগা তাঁর এই অনুমানের পক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়ে যখন চলে গেলেন আমি অমূল্যকে বললুম, টাকাটা কে নিয়েছিল আমাকে যদি বল কারও কোনো ক্ষতি হবে না।

সে বললে, আমি।

কেমন করে? ওরা যে বলে ডাকাতের দল—

আমি একলা।

অমূল্য যা বললে সে অদ্ভুত। নায়েব রাত্রে আহার সেরে বাইরে বসে আঁচাচ্ছিল, সে জায়গাটা ছিল অন্ধকার। অমূল্যর দুই পকেটে দুই পিস্তল, একটাতে ফাঁকা টোটা আর একটাতে গুলি ভরা। ওর মুখের আধখানাতে ছিল কালো মুখোশ। হঠাৎ একটা বুল্স্ আই লণ্ঠনের আলো নায়েবের মুখে ফেলে পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করতেই সে হাঁউমাউ শব্দ করে মূর্ছা গেল; দু-চারজন বরকন্দাজ ছুটে আসতেই তাদের মাথার উপর পিস্তলের আওয়াজ করে দিলে, তারা যে যেখানে পারলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। কাসেম সর্দার লাঠি হাতে ছুটে এল, তার পা লক্ষ্য করে গুলি মারতেই সে বসে পড়ল। তার পরে ঐ নায়েবকে দিয়ে লোহার সিন্দুক খুলিয়ে ছ হাজার টাকার নোটগুলো নিয়ে আমাদের কাছারির এক ঘোড়া মাইল পাঁচ-ছয় ছুটিয়ে সেই ঘোড়াটাকে এক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে পরদিন সকালে আমার এখানে এসে পৌঁচেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য, এ কাজ কেন করতে গেলে?

সে বললে, আমার বিশেষ দরকার ছিল।

তবে আবার ফিরিয়ে দিলে কেন?

যাঁর হুকুমে ফিরিয়ে দিলুম তাঁকে ডাকুন, তাঁর সামনে আমি বলব।

তিনি কে?

ছোটোরানীদিদি।

বিমলকে ডেকে পাঠালুম। সে একখানি সাদা শাল মাথার উপর দিয়ে ফিরিয়ে গা ঢেকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকল ; পায়ে জুতোও ছিল না। দেখে আমার মনে হল বিমলকে এমন যেন আর কখনো দেখি নি ; সকালবেলাকার চাঁদের মতো ও যেন আপনাকে প্রভাতের আলো দিয়ে ঢেকে এনেছে !

অমূল্য বিমলের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার আদেশ পালন করে এসেছি দিদি। টাকা ফিরিয়ে দিয়েছি।

বিমল বললে, বাঁচিয়েছ ভাই।

অমূল্য বললে, তোমাকে স্মরণ করেই একটি মিথ্যা কথাও বলি নি। আমার বন্দেমাতরং মন্ত্র রইল তোমার পায়ের তলায়। ফিরে এসে এই বাড়িতে ঢুকেই তোমার প্রসাদও পেয়েছি।

বিমলা এ কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না। অমূল্য পকেট থেকে রুমাল বের করে তার গ্রন্থি খুলে সঞ্চিত পিঠেগুলি দেখালে। বললে, সব খাই নি, কিছু রেখেছি— তুমি নিজের হাতে আমার পাতে তুলে দিয়ে খাওয়াবে ব'লে এইগুলি জমানো আছে।

আমি বুঝলুম, এখানে আমার আর দরকার নেই ; ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। মনে ভাবলুম, আমি তো কেবল বকে বকেই মরি, আর ওরা আমার কুশপুত্তলির গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা পরিয়ে নদীর ধারে দাহ করে। কাউকে তো মরার পথ থেকে ফেরাতে পারি নে, যে পারে সে ইঙ্গিতেই পারে। আমাদের বাণীতে সেই অমোঘ ইঙ্গিত নেই। আমরা শিখা নই, আমরা অঙ্গার ; আমরা নিবোনো ; আমরা দীপ জ্বালাতে পারব না। আমার জীবনের ইতিহাসে সেই কথাটাই প্রমাণ হল, আমার সাজানো বাতি জ্বলল না।

আবার আস্তে আস্তে অন্তঃপুরে গেলুম। বোধ হয় আর-একবার মেজোরানীর ঘরের দিকে আমার মনটা ছুটল। আমার জীবনও এ সংসারে কোনো একটা জীবনের বীণায় সত্য এবং স্পষ্ট আঘাত দিয়েছে এটা অনুভব করা আজ আমার যে বড়ো দরকার ; নিজের অস্তিত্বের পরিচয় তো নিজের মধ্যে পাওয়া যায় না, বাইরে আর-কোথাও যে তার খোঁজ করতে হয়।

মেজোরানীর ঘরের সামনে আসতেই তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, এই যে ঠাকুরপো, আমি বলি বুঝি তোমার আজও দেরি হয়। আর দেরি নেই, তোমার খাবার তৈরি রয়েছে, এখনই আসছে।

আমি বললুম, ততক্ষণ সেই টাকাটা বের করে ঠিক করে রাখি।

আমার শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে মেজোরানী জিজ্ঞাসা করলেন, দারোগা যে এল, সেই চুরির কোনো আশকারা হল না কি?

সেই ছ হাজার টাকা ফিরে পাবার ব্যাপারটা মেজোরানীর কাছে আমার বলতে ইচ্ছে হল না। আমি বললুম, সেই নিয়েই তো চলছে।

লোহার সিন্দুকের ঘরে গিয়ে পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে দেখি সিন্দুকের চাবিটাই নেই। অদ্ভুত আমার অন্যমনস্কতা! এই চাবির রিং নিয়ে আজ সকাল থেকে কতবার কত বাক্স খুলেছি, আলমারি খুলেছি, কিন্তু একবারও লক্ষ্যই করি নি যে, সে চাবিটা নেই।

মেজোরানী বললেন, চাবি কই?

আমি তার জবাব না করে এ পকেট ও পকেট নাড়া দিলুম, দশবার করে সমস্ত জিনিসপত্র হাঁটকে খোঁজাখুঁজি করলুম। আমাদের বোঝবার বাকি রইল না যে, চাবি হারায় নি, কেউ একজন রিং থেকে খুলে নিয়েছে। কে নিতে পারে? এ ঘরে তো—

মেজোরানী বললেন, ব্যস্ত হোয়ো না, আগে তুমি খেয়ে নাও। আমার বিশ্বাস, তুমি অসাবধান বলেই ছোটোরানী ঐ চাবিটা বিশেষ করে তার বাক্সে তুলে রেখেছে।

আমার ভারি গোলমাল ঠেকতে লাগল। আমাকে না জানিয়ে বিমল রিং থেকে চাবি বের করে নেবে, এ তার স্বভাব নয়। আমার খাবার সময় আজ বিমল ছিল না ; সে তখন রান্নাঘর থেকে ভাত আনিয়ে অমূল্যকে নিজে বসে খাওয়াচ্ছিল। মেজোরানী তাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলেন, আমি বারণ করলুম।

খেয়ে উঠেছি এমন সময় বিমল এল। আমার ইচ্ছা ছিল মেজোরানীর সামনে এই চাবি-হারানোর কথাটার আলোচনা না হয়। কিন্তু সে আর ঘটল না। বিমল আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুরপোর লোহার সিন্দুকের চাবি কোথায় আছে জানিস?

বিমল বললে, আমার কাছে।

মেজোরানী বললেন, আমি তো বলেছিলুম। চারি দিকে চুরিডাকাতি হচ্ছে, ছোটোরানী বাইরে দেখাত ওর ভয় নেই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সাবধান হতে ছাড়ে নি।

বিমলার মুখ দেখে মনে কেমন একটা খটকা লাগল ; বললুম, আচ্ছা, চাবি এখন তোমার কাছেই থাক্, বিকেলে টাকাটা বের করে নেব।

মেজোরানী বলে উঠলেন, আবার বিকেলে কেন ঠাকুরপো, এইবেলা ওটা বের করে নিয়ে খাজাঞ্চির কাছে পাঠিয়ে দাও।

বিমল বললে, টাকাটা আমি বের করে নিয়েছি।

চমকে উঠলুম।

মেজোরানী জিজ্ঞাসা করলেন, বের করে নিয়ে রাখলি কোথায়?

বিমল বললে, খরচ করে ফেলেছি।

মেজোরানী বললেন, ওমা, শোনো একবার! এত টাকা খরচ করলি কিসে?

বিমল তার কোনো উত্তর করলে না। আমিও তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলুম না ; দরজা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। মেজোরানী বিমলকে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন ; আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বেশ করেছে নিয়েছে। আমার স্বামীর পকেটে বাক্সে যা-কিছু টাকা থাকত সব আমি চুরি করে লুকিয়ে রাখতুম ; জানতুম সে টাকা পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। ঠাকুরপো, তোমারও প্রায় সেই দশা ; কত খেয়ালেই যে টাকা ওড়াতে জান। তোমাদের টাকা যদি আমরা চুরি করি তবেই সে টাকা রক্ষা পাবে। এখন চলো, একটু শোবে চলো।

মেজোরানী আমাকে শোবার ঘরে ধরে নিয়ে গেলেন, আমি কোথায় চলেছি আমার মনেও ছিল না। তিনি আমার বিছানার পাশে বসে প্রফুল্লমুখে বললেন, ওলো ও ছুটু, একটা পান দে তো ভাই। তোরা যে একেবারে বিবি হয়ে উঠলি। পান নেই ঘরে? নাহয় আমার ঘর থেকেই আনিয়ে দে-না।

আমি বললুম, মেজোরানী, তোমার তো এখনো খাওয়া হয় নি।

তিনি বললেন, কোন্ কালে।

এটা একেবারে মিথ্যে কথা। তিনি আমার পাশে বসে যা-তা বকতে লাগলেন, কত রাজ্যের কত বাজে কথা। দাসী এসে দরজার বাইরে থেকে খবর দিলে বিমলের ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বিমল কোনো সাড়া দিলে না। মেজোরানী বললেন, ও কী, এখনো তোর খাওয়া হয় নি বুঝি? বেলা যে ঢের হল।

এই বলে জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেলেন।

সেই ছ হাজার টাকার ডাকাতির সঙ্গে এই লোহার সিন্দুকের টাকা বের করে নেওয়ার যে যোগ আছে তা বুঝতে পারলুম। কিরকমের যোগ সে কথা জানতেও ইচ্ছা করল না ; কোনোদিন সে প্রশ্নও করব না।

বিধাতা আমাদের জীবন-ছবির দাগ একটু ঝাপসা করেই টেনে দেন ; আমরা নিজের হাতে সেটাকে কিছু-কিছু বদলে মুছে পুরিয়ে দিয়ে নিজের মনের মতো একটা স্পষ্ট চেহারা ফুটিয়ে তুলব এই তাঁর অভিপ্রায়। সৃষ্টিকর্তার ইশারা নিয়ে নিজের জীবনটাকে নিজে সৃষ্টি করে তুলব, একটা বড়ো আইডিয়াকে আমার সমস্তর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে দেখাব, এই বেদনা বরাবর আমার মনে আছে।

এই সাধনাতে এতদিন কাটিয়েছি। প্রবৃত্তিকে কত বঞ্চিত করেছি, নিজেকে কত দমন করেছি, সেই অন্তরের ইতিহাস অন্তর্যামীই জানেন। শক্ত কথা এই যে, কারও জীবন একলার জিনিস নয় ; সৃষ্টি যে করবে সে নিজের চার দিককে নিয়ে যদি সৃষ্টি না করে তবে ব্যর্থ হবে। মনের মধ্যে তাই একান্ত একটা প্রয়াস ছিল যে বিমলকেও এই রচনার মধ্যে টানব। সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাকে ভালো যখন বাসি তখন কেন পারব না, এই ছিল আমার জোর।

এমন সময় স্পষ্ট দেখতে পেলুম নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চার দিককে যারা সহজেই সৃষ্টি করতে পারে তারা এক জাতের মানুষ, আমি সে জাতের না। আমি মন্ত্র নিয়েছি, কাউকে মন্ত্র দিতে পারি নি। যাদের কাছে আপনাকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছি তারা আমার আর-সবই নিয়েছে, কেবল আমার এই অন্তরতম জিনিসটি ছাড়া। আমার পরীক্ষা কঠিন হল। সব চেয়ে যেখানে সহায় চাই সব চেয়ে সেখানেই একলা হলুম। এই পরীক্ষাতেও জিতব, এই আমার পণ রইল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার দুর্গম পথ আমার একলারই পথ।

আজ সন্দেহ হচ্ছে আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালাই করব আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবর্দস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটা তো ছাঁচে ঢালবার নয়। আর, ভালোকে জড়বস্তু মনে করে গড়ে তুলতে গেলেই মরে গিয়ে সে তার ভয়ানক শোধ নেয়।

এই জুলুমের জন্যেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তফাত হয়ে গেছি তা জানতেই পারি নি। বিমল নিজে যা হতে পারত তা আমার চাপে উপরে ফুটে উঠতে পারে নি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ খইয়ে ফেলেছে। এই ছ হাজার টাকা আজ ওকে চুরি করে নিতে হয়েছে ; আমার সঙ্গে ও স্পষ্ট ব্যবহার করতে পারে নি, কেননা ও বুঝেছে এক জায়গায় আমি ওর থেকে প্রবলরূপে পৃথক। আমাদের মতো একরোখা আইডিয়ার মানুষের সঙ্গে যারা মেলে তারা মেলে, যারা মেলে না তারা আমাদের ঠকায়। সরল মানুষকেও আমরা কপট করে তুলি। আমরা সহধর্মিণীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি।

আবার কি সেই গোড়ায় ফেরা যায় না ? তা হলে একবার সহজের রাস্তায় চলি। আমার পথের সঙ্গিনীকে এবার কোনো আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধতে চাইব না ; কেবল আমার ভালোবাসার বাঁশি বাজিয়ে বলব, তুমি আমাকে ভালোবাসো, সেই ভালোবাসার আলোতে তুমি যা তারই পূর্ণ বিকাশ হোক, আমার ফর্মাশ একেবারে চাপা পড়ুক, তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছা আছে তারই জয় হোক— আমার ইচ্ছা লজ্জিত হয়ে ফিরে যাক।

কিন্তু আমাদের মধ্যেকার যে বিচ্ছেদটা ভিতরে ভিতরে জমছিল সেটা আজ এমনতরো একটা ক্ষতর মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে যে, আর কি তার উপর স্বভাবের শুশ্রূষা কাজ করতে পারবে ? যে আবরুর আড়ালে প্রকৃতি আপনার সংশোধনের কাজ নিঃশব্দে করে সেই আবরু যে একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল। ক্ষতকে ঢাকা দিতে হয়, এই ক্ষতকে আমার ভালোবাসা দিয়ে ঢাকব ; বেদনাকে আমার হৃদয় দিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে বাইরের স্পর্শ থেকে আড়াল করে রাখব ; একদিন এমন হবে যে এই ক্ষতর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। কিন্তু, আর কি সময় আছে ? এতদিন গেল ভুল বুঝতে, আজকের দিন এল ভুল ভাঙতে, কতদিন লাগবে ভুল শোধরাতে ! তার পরে ? তার পরে ক্ষত শুকোতেও পারে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ কি আর কোনো কালে হবে ?

একটা কী খট করে উঠল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, বিমল দরজার কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছে। বোধ হয় দরজার পাশে এসে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, ঘরে ঢুকবে কি না ঢুকবে ভেবে পাচ্ছিল না,

শেষে ফিরে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ডাকলুম, বিমল ; সে থমকে দাঁড়ালো, তার পিঠ ছিল আমার দিকে। আমি তাকে হাতে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলুম।

ঘরে এসেই মেঝের উপর পড়ে মুখের উপর একটা বালিশ আঁকড়ে ধরে তার কান্না। আমি একটি কথা না বলে তার হাত ধরে মাথার কাছে বসে রইলুম।

কান্নার বেগ থেমে গিয়ে উঠে বসতেই, আমি তাকে আমার বুকের কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করলুম। সে একটু জোর করে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর বারবার মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল। আমি পা সরিয়ে নিতেই সে দুই হাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরে গদ্‌গদ স্বরে বললে, না না না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না, আমাকে পুজো করতে দাও।

আমি তখন চুপ করে রইলুম। এ পূজায় বাধা দেবার আমি কে! যে পূজা সত্য সে পূজার দেবতাও সত্য— সে দেবতা কি আমি যে আমি সংকোচ করব ?

বিমলার আত্মকথা

চলো, চলো, এইবার বেরিয়ে পড়ো সকল ভালোবাসা যেখানে পূজার সমুদ্রে মিশেছে সেই সাগরসংগমে। সেই নির্মল নীলের অতলের মধ্যে সমস্ত পঙ্কের ভার মিলিয়ে যাবে। আর আমি ভয় করি নে, আপনাকেও না, আর-কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি ; যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।

আজ রাত্রে কলকাতায় যেতে হবে। এতক্ষণ অন্তর-বাহিরের নানা গোলমালে জিনিসপত্র গোছাবার কাজে মন দিতে পারি নি। এইবার বাক্সগুলো টেনে নিয়ে গোছাতে বসলুম। খানিক বাদে দেখি আমার স্বামীও আমার পাশে এসে জুটলেন। আমি বললুম, না, ও হবে না। তুমি যে একটু ঘুমিয়ে নেবে আমাকে কথা দিয়েছ।

আমার স্বামী বললেন, আমিই যেন কথা দিয়েছি, কিন্তু আমার ঘুম তো কথা দেয় নি, তার যে দেখা নেই।

আমি বললুম, না, সে হবে না তুমি শুতে যাও।

তিনি বললেন, তুমি একলা পারবে কেন ?

খুব পারব।

আমি না হলেও তোমার চলে এ জাঁক তুমি করতে চাও করো, কিন্তু তুমি না হলে আমার চলে না। তাই একলা-ঘরে কিছুতেই আমার ঘুম এল না।

এই বলে তিনি কাজে লেগে গেলেন। এমন সময়ে বেহারা এসে জানালে, সন্দীপবাবু এসেছেন, তিনি খবর দিতে বললেন।

খবর কাকে দিতে বললেন সে কথা জিজ্ঞাসা করবার জোর ছিল না। আমার কাছে এক মুহূর্তে আকাশের আলোটা যেন লজ্জাবতী লতার মতো সংকুচিত হয়ে গেল।

আমার স্বামী বললেন, চলো বিমল, শুনে আসি সন্দীপ কী বলে। ও তো বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল, আবার যখন ফিরে এসেছে তখন বোধ হয় বিশেষ কোনো কথা আছে।

যাওয়ার চেয়ে না-যাওয়াটাই বেশি লজ্জা ব'লে স্বামীর সঙ্গে বাইরে গেলুম। বৈঠক্‌খানার ঘরে সন্দীপ দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো ছবি দেখছিল। আমরা যেতেই বলে উঠল, তোমরা ভাবছ লোকটা ফেরে কেন ? সৎকার সম্পূর্ণ শেষ না হলে প্রেত বিদায় হয় না।

এই বলে চাদরের ভিতর থেকে সে একটা রুমালের পুঁটলি বের করে টেবিলের উপরে খুলে ধরলে। সেই গিনিগুলো। বললে, নিখিল, ভুল কোরো না, ভেবো না হঠাৎ তোমাদের সংসর্গে পড়ে

সাধু হয়ে উঠেছি। অনুতাপের অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে এই ছ হাজার টাকার গিনি ফিরিয়ে দেবার মতো ছিঁচকাদুনে সন্দীপ নয়। কিন্তু—

এই বলে সন্দীপ কথাটা আর শেষ করলে না। একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে চেয়ে বললে, মক্ষীরানী, এতদিন পরে সন্দীপের নির্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেছে। রাত্রি তিনটের পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই করে দেখেছি সে নিতান্ত ফাঁকি নয়, তার দেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই। সেই আমার সর্বনাশিনী কিন্তু'র হাতে দিয়ে গেলুম আমার পূজা। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখলুম পৃথিবীতে কেবলমাত্র তারই ধন আমি নিতে পারব না— তোমার কাছে আমি নিঃস্ব হয়ে তবে বিদায় পাব দেবী! এই নাও।

বলে সেই গয়নার বাক্সটিও বের করে টেবিলের উপর রেখে সন্দীপ দ্রুত চলে যাবার উপক্রম করলে। আমার স্বামী তাকে ডেকে বললেন, শুনে যাও, সন্দীপ।

সন্দীপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, আমার সময় নেই নিখিল। খবর পেয়েছি মুসলমানের দল আমাকে মহামূল্য রত্নের মতো লুঠ করে নিয়ে তাদের গোরস্থানে পুঁতে রাখবার মতলব করেছে। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার দরকার। উত্তরের গাড়ি ছাড়তে আর পঁচিশ মিনিট মাত্র আছে অতএব এখনকার মতো চললুম। তার পরে আবার একটু অবকাশ পেলে তোমাদের সঙ্গে বাকি সমস্ত কথা চুকিয়ে দেব। যদি আমার পরামর্শ নাও, তুমিও বেশি দেরি কোরো না। মক্ষীরানী, বন্দে প্রলয়রূপিণীং হৃদপিণ্ডমালিনীং!

এই বলে সন্দীপ প্রায় ছুটে চলে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। গিনি আর গয়নাগুলো যে কত তুচ্ছ সে আর-কোনোদিন এমন করে দেখতে পাই নি। কত জিনিস সঙ্গে নেব, কোথায় কী ধরাব, এই কিছু আগে তাই ভাবছিলুম, এখন মনে হল কোনো জিনিসই নেবার দরকার নেই— কেবল বেরিয়ে চলে যাওয়াটাই দরকার।

আমার স্বামী চৌকি থেকে উঠে এসে আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে বললেন, আর তো বেশি সময় নেই, এখন কাজগুলো সেরে নেওয়া যাক।

এমন সময় চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে সংকুচিত হলেন; বললেন, মাপ কোরো মা, খবর দিয়ে আসতে পারি নি। নিখিল, মুসলমানের দল ক্ষেপে উঠেছে। হরিশ কুণ্ডুর কাছারি লুঠ হয়ে গেছে। সেজন্যে ভয় ছিল না, কিন্তু মেয়েদের উপর তারা যে অত্যাচার আরম্ভ করেছে সে তো প্রাণ থাকতে সহ্য করা যায় না।

আমার স্বামী বললেন, আমি তবে চললুম।

আমি তাঁর হাত ধরে বললুম, তুমি গিয়ে কী করতে পারবে? মাস্টারমশায়, আপনি ওঁকে বারণ করুন।

চন্দ্রনাথবাবু বললেন, মা, বারণ করবার তো সময় নেই।

আমার স্বামী বললেন, কিচ্ছু ভেবো না বিমল।

জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম, তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। হাতে তাঁর কোনো অস্ত্রও ছিল না।

একটু পরে মেজোরানী ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকেই বললেন, করলি কী ছুটু, কী সর্বনাশ করলি? ঠাকুরপোকে যেতে দিলি কেন?

বেহারাকে বললেন, ডাক ডাক, শিগগির দেওয়ানবাবুকে ডেকে আন।

দেওয়ানবাবুর সামনে মেজোরানী কোনোদিন বেরোন নি। সেদিন তাঁর লজ্জা ছিল না। বললেন, মহারাজকে ফিরিয়ে আনতে শিগগির সওয়ার পাঠাও।

দেওয়ানবাবু বললেন, আমরা সকলে মানা করেছি, তিনি ফিরবেন না।

মেজোরানী বললেন, তাঁকে বলে পাঠাও, মেজোরানীর ওলাউঠো হয়েছে, তাঁর মরণকাল আসন্ন।

দেওয়ান চলে গেলে মেজোরানী আমাকে গাল দিতে লাগলেন, রাক্ষুসী, সর্বনাশী! নিজে

মরলি নে, ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি!

দিনের আলো শেষ হয়ে এল। জানলার সামনে পশ্চিম দিগন্তে গোয়ালপাড়ার ফুটন্ত শজনেগাছটার পিছনে সূর্য অস্ত গেল। সেই সূর্যাস্তের প্রত্যেক রেখাটি আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অস্তমান সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে দক্ষিণে দুই ভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল একটা প্রকাণ্ড পাখির ডানা মেলার মতো— তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে-থাকে সাজানো। মনে হতে লাগল আজকের দিনটা যেন হুহু করে উড়ে চলেছে রাত্রের সমুদ্র পার হবার জন্যে।

অন্ধকার হয়ে এল। দূর গ্রামে আগুন লাগলে থেকে থেকে যেমন তার শিখা আকাশে লাফিয়ে উঠতে থাকে তেমনি বহু দূর থেকে এক-একবার এক-একটা কলরবের ঢেউ অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন ফেঁপে উঠতে লাগল।

ঠাকুরঘর থেকে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠল। আমি জানি মেজোরানী সেই ঘরে গিয়ে জোড়হাত করে বসে আছেন। আমি এই রাস্তার ধারের জানলা ছেড়ে এক পা কোথাও নড়তে পারলুম না। সামনেকার রাস্তা, গ্রাম, আরো দূরেকার শস্যশূন্য মাঠ এবং তারও শেষ প্রান্তে গাছের রেখা ঝাপসা হয়ে এল। রাজবাড়ির বড়ো দিঘিটা অন্ধের চোখের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁ দিকের ফটকের উপরকার নবতখানাটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কী-যেন একটা দেখতে পাচ্ছে।

রাত্রিবেলাকার শব্দ যে কতরকমের ছদ্মবেশ ধরে তার ঠিকানা নেই। কাছে কোথায় একটা ডাল নড়ে, মনে হয় দূরে যেন কে ছুটে পালাচ্ছে। হঠাৎ বাতাসে একটা দরজা পড়ল, মনে হল সেটা যেন সমস্ত আকাশের বুক ধড়াস করে ওঠার শব্দ।

মাঝে মাঝে রাস্তার ধারের কালো গাছের সারের নীচে দিয়ে আলো দেখতে পাই, তার পরে আর দেখতে পাই নে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনি, তার পরে দেখি ঘোড়সওয়ার রাজবাড়ির গেট থেকেই বেরিয়ে ছুটে চলছে।

কেবলই মনে হতে লাগল, আমি মরলেই সব বিপদ কেটে যাবে। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি সংসারকে আমার পাপ নানা দিক থেকে মারতে থাকবে। মনে পড়ল, সেই পিস্তলটা বাক্সের মধ্যে আছে, কিন্তু এই পথের ধারের জানলা ছেড়ে পিস্তল নিতে যেতে পা সরল না, আমি যে আমার ভাগ্যের প্রতীক্ষা করছি।

রাজবাড়ির দেউড়ির ঘণ্টায় ঢং ঢং করে দশটা বাজল।

তার খানিক পরে দেখি রাস্তায় অনেকগুলি আলো, অনেক ভিড়। অন্ধকারে সমস্ত জনতা এক হয়ে জুড়ে গিয়ে মনে হল একটা প্রকাণ্ড কালো অজগর এঁকেবেঁকে রাজবাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকতে আসছে।

দেওয়ানজি দূরে লোকের শব্দ শুনে গেটের কাছে ছুটে গেলেন। সেই সময় একজন সওয়ার এসে পৌঁছতেই দেওয়ানজি ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, জটাধর খবর কী?

সে বললে, খবর ভালো নয়।

প্রত্যেক কথা উপর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলুম।

তার পরে কী চুপিচুপি বললে, শোনা গেল না।

তার পরে একটা পাল্কি আর তারই পিছনে একটা ডুলি ফটকের মধ্যে ঢুকল। পাল্কির পাশে পাশে মথুর ডাক্তার আসছিলেন। দেওয়ানজি জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবু, কী মনে করেন?

ডাক্তার বললেন, কিছু বলা যায় না। মাথায় বিষম চোট লেগেছে।

আর অমূল্যবাবু?

তাঁর বুকে গুলি লেগেছিল, তাঁর হয়ে গেছে।

প্রবন্ধ

ব্যঙ্গকৌতুক

ব্যঙ্গকৌতুক

রসিকতার ফলাফল

আর কিছুই নয়, মাসিক পত্রে একটা ভারি মজার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। পড়িয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তো হাসিয়াছিলই, আবার শত্রুপক্ষও খুব হাসিতেছে।

অষ্টপাইকা, সাপ্‌টিবারি ও টাঙ্গাইল হইতে তিনজন পাঠক জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন প্রবন্ধটির অর্থ কী। তাঁহাদের মধ্যে একজন ভদ্রতা করিয়া অনুমান করিয়াছেন ইহাতে ছাপাখানার গলদ আছে; আর-এক জন অনাবশ্যক সহৃদয়তাবশত লেখকের মানসিক্ অবস্থা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন; তৃতীয় ব্যক্তি অনুমান এবং আশঙ্কার অতীত অবস্থায় উত্তীর্ণ, বস্তুত আমিই তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠিত।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি পাল হবিগঞ্জ হইতে লিখিতেছেন—

'গোবিন্দবাবুর এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কী? ইহাতে কি ফরাসডাঙার তাঁতিদের দুঃখ ঘুচিবে? দেশে যে এত লোককে খেপা কুকুর কামড়াইতেছে এ প্রবন্ধে কি তাহার কোনো প্রতিকার কল্পিত হইয়াছে?'

'অজ্ঞানতিমিরনিবারণী' পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনায় লিখিত হইয়াছে—

'গোবিন্দবাবু যদি সত্যই মনে করেন দেশে ধানের খেতে পাটের আবাদ হইয়া চাষাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে তবে তাঁহার প্রবন্ধের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নাই। আর যদি তিনি বলিতে চান পাট ছাড়িয়া ধানের চাষই শ্রেয় তবে সে কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু কোন্‌টা যে তাঁহার মত, প্রবন্ধ হইতে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।'

দুরূহ সন্দেহ নাই। কারণ, পাটের চাষ সম্বন্ধে কোনোদিন কোনো কথাই বলি নাই।

'জ্ঞানপ্রকাশ' বলিতেছেন—

'লেখার ভাবে আভাসে বোধ হয় বালবিধবার দুঃখে লেখক আমাদের কাঁদাইবার চেষ্টা করিয়াছেন— কাঁদা দূরে যাক, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই।'

হাস্যসংবরণ করিতে না পারার জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী, কিন্তু তিনি অকস্মাৎ আভাসে যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ নিজগুণে।

'সম্মার্জনী'-নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়াছেন—

'হরিহরপুরের ম্যুনিসিপালিটির বিরুদ্ধে গোবিন্দবাবুর যে সুগভীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রাঞ্জল ও ওজস্বী হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একটি বিষয়ে দুঃখিত ও আশ্চর্য হইলাম, ইনি পরের ভাব অনায়াসেই নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন। এক স্থলে বলিয়াছেন, জন্মিলেই মরিতে হয়— এই চমৎকার ভাবটি যদি গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের গ্রন্থ হইতে চুরি না করিতেন তবে লেখকের মৌলিকতার প্রশংসা করিতাম। নিম্নে আমরা কয়েকটি চোরাই মালের নমুনা দিতেছি— গিবন বলিয়াছেন, রাজ্যে রাজা না থাকিলে সমূহ বিশৃঙ্খলা ঘটে; গোবিন্দবাবু লিখিয়াছেন, একে অরাজকতা তাহাতে অনাবৃষ্টি, গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং। সংস্কৃত শ্লোকটিও কালিদাস হইতে চুরি। রাস্কিনে একটি বর্ণনা আছে, আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, সমুদ্রের জলে তাহার জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। গোবিন্দবাবু লিখিয়াছেন, পঞ্চমীর চাঁদের আলো রামধনবাবুর টাকের উপর চিক্ চিক্ করিতেছে। কী আশ্চর্য চুরি! কী অদ্ভুত

প্রতারণা !! কী অপূর্ব দুঃসাহসিকতা !!!'

'সংবাদসার' বলেন—

'রামধনবাবু যে নেউগিপাড়ার শ্যামাচরণ ত্রিবেদী তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্যামাচরণবাবুর টাক নাই বটে, কিন্তু আমরা সন্ধান লইয়াছি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় অল্প অল্প টাক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তিগত উল্লেখ অতিশয় নিন্দনীয়।'

আমার নিজেরই গোলমাল ঠেকিতেছে। আমার প্রবন্ধ যে হরিহরপুর ম্যুনিসিপালিটির বিরুদ্ধে লিখিত তৎসম্বন্ধে 'সম্মার্জনী'র যুক্তি একেবারে অকাট্য। হরিহরপুর চব্বিশ-পরগনায় না তিব্বতে না হাঁসখালি সবডিবিজনের অন্তর্গত আমি কিছুই অবগত নহি ; সেখানে যে ম্যুনিসিপালিটি আছে বা ছিল বা ভবিষ্যতে হইবে তাহা আমার স্বপ্নের অগোচর।

অপর পক্ষে, আমার প্রবন্ধে আমি নেউগিপাড়ার শ্যামাচরণ ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাত করিয়াছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ করা কঠিন। 'সংবাদসার' এমনি নিবিড়ভাবে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন যে, তাহার মধ্যে ছুঁচ চালাইবার জো নাই। আমি একজনকে চিনি বটে, কিন্তু সে বেচারা ত্রিবেদী নয়, মজুমদার ; তার বাড়ি নেউগিপাড়ায় নয়, ঝিনিদহে ; আর তার ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় টাক থাকা চুলায় যাক, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রই নাই, দুইটি ভাগিনেয় আছে বটে।

যাঁহারা বলেন আমি বরাকরের পাথুরিয়া কয়লার খনির মালেকদের চরিত্রের কালিমার সহিত উক্ত কয়লার তুলনা করিয়াছি, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত খনি আছে কি না এবং কোথায় আছে এবং থাকিলেই বা কী, যদি খোলসা করিয়া সমস্ত আমাকে লিখিয়া পাঠান তবে খনিরহস্য সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা দূর হইয়া যায়। যিনি যাহাই বলুন 'লুনের ট্যাক্স' 'বিধবাবিবাহ' কিংবা 'গাওয়া ঘি' সম্বন্ধে যে আমি কিছুই বলি নাই তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

এ দিকে ঘরেও গোল বাধিয়াছে। গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয়স্বরূপ আমি এক জায়গায় লিখিয়াছিলাম, এ জগৎটা পশুশালা। আমার ধারণা ছিল যে পাঠকেরা হাসিবে। অন্তত তিন জন পাঠক যে হাসেন নাই তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। প্রথমত শ্যালক আসিয়া আমাকে গাল পাড়িল ; সে কহিল, নিশ্চয়ই আমি তাহাকে পশু বলিয়াছি। আমি কহিলাম, বলিলে অপরাধ হয় না, কিন্তু তোমার দিব্য, বলি নাই। ভ্রাতার অপমানে ব্রাহ্মণী পিতার ঘরে যাইবেন বলিয়া শাসাইতেছেন। জমিদার পশুপতিবাবু থাকিয়া থাকিয়া রাগে তাঁহার গোঁফজোড়া বিড়ালের ন্যায় ফুলাইয়া তুলিতেছেন। তিনি বলেন তাঁহাকে শ্যালক সম্বোধন করিয়া অনধিকারচর্চা করিয়াছি, এবং লোকসমাজে তিনি আমার সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনা করিতেছেন তাহা সুশ্রাব্য নয়। এ দিকে পাকড়াশি-বাড়ির জগৎবাবু চা খাইতে খাইতে আমার প্রবন্ধ পড়িয়া অট্টহাস্যের সঙ্গে মুখভ্রষ্ট চায়ের ও রুটির কণায় বজ্রবিদ্যুদ্‌বৃষ্টির কৃত্রিম দৃষ্টান্ত রচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে যেমনি পড়িলেন 'জগৎটা পশুশালা' অমনি হাস্যের বেগ হঠাৎ থামিয়া গিয়া গলায় চা বাধিয়া গেল— লোকে ভাবিল, ডাক্তার ডাকিবার সবুর সহিবে না।

পাড়াসুদ্ধ লোকের ধারণা যে, আমার প্রবন্ধে আমি তাহাদেরই পরমপূজনীয় জ্যাঠা, খুড়শ্বশুর অথবা ভাগ্নীজামাই সম্বন্ধে কোনো-না-কোনো সত্য কথার আভাস দিয়াছি ; তাহারাও আমার ক্ষণভঙ্গুর মাথার খুলিটার উপরে লক্ষপাত করিবে এমন কথা প্রকাশ করিতেছে। আমার প্রবন্ধের গভীর অভিপ্রায়টি যে কী তৎসম্বন্ধে আমার কথা তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না, কিন্তু আমার প্রতি তাহাদের অভিপ্রায় যে কী তৎসম্বন্ধে তাহাদের কথা অবিশ্বাস করিবার কোনো হেতু আমার পক্ষে নাই। বস্তুত তাহাদের ভাষা উত্তরোত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মনে করিয়াছি বাসা বদলাইতে হইবে, আমার রচনার ভাষাও বদলানো আবশ্যক। আর যাহাই করি লোককে হাসাইবার চেষ্টা করিব না।

১২৯২

ডেঞ্চে পিঁপড়ের মন্তব্য

দেখো দেখো, পিঁপড়ে দেখো ! খুদে খুদে রাঙা রাঙা সরু সরু সব আনাগোনা করছে— ওরা সব পিঁপড়ে, যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে পিপীলিকা। আমি হচ্ছি ডেঞ্চে; সমুচ্চ ডাঁইবংশসম্ভূত, ঐ পিঁপড়েগুলোকে দেখলে আমার অত্যন্ত হাসি আসে।

হা হা হা, রকম দেখো, চলছে দেখো, যেন ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেছে ; আমি যখন দাঁড়াই তখন আমার মাথা আকাশে ঠেকে ! সূর্য যদি মিছরির টুকরো হত আমার মনে হয় আমি দাঁড়া বাড়িয়ে ভেঙে ভেঙে এনে আমার বাসায় জমিয়ে রাখতে পারতুম। উঃ, আমি এত বড়ো একটা খড় এতখানি রাস্তা টেনে এনেছি, আর ওরা দেখো কী করছে— একটা মরা ফড়িং নিয়ে তিন জনে মিলে টানাটানি করছে। আমাদের মধ্যে এত ভয়ানক তফাত ! সত্যি বলছি, আমার দেখতে ভারি মজা লাগে।

আমার পা দেখো আর ওদের পা দেখো ! যতদূর চেয়ে দেখি আমার পায়ের আর অন্ত দেখি নে, এতবড়ো পা ! পদমর্যাদা এর চেয়ে আর কী আশা করা যেতে পারে ! কিন্তু পিঁপড়েরা আপনাদের খুদে খুদে পা নিয়েই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছে। দেখে আশ্চর্য বোধ হয়। হাজার হোক, পিঁপড়ে কিনা।

ওরা একে ক্ষুদ্র, তাতে আবার আমি বিস্তর উঁচু থেকে দেখি— ওদের সবটা আমার নজরে আসে না। কিন্তু আমি আমার অতি দীর্ঘ ছ পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে কটাক্ষে দৃক্‌পাত করে আন্দাজে ওদের আগাগোড়াই বুঝে নিয়েছি। কারণ, পিঁপড়ে এত ক্ষুদ্র যে ওদের দেখে ফেলতে অধিকক্ষণ লাগে না। পিঁপড়ে-জাতি সম্বন্ধে আমি ডাঁই ভাষায় একটা কেতাব লিখব এবং বক্তৃতাও দেব।

পিঁপড়ে-সমাজ সম্বন্ধে আমার বিস্তর অনুমানলব্ধ অভিজ্ঞতা আছে। ডেঞ্চেদের সন্তানস্নেহ আছে, অতএব পিঁপড়েদের তা কখনোই থাকতে পারে না ; কারণ, তারা পিঁপড়ে, কেবলমাত্র পিঁপড়ে, পিঁপড়ে ব্যতীত আর কিছুই নয়। শোনা যায় পিঁপড়েরা মাটিতে বাসা বানাতে পারে ; স্পষ্টই বোধ হচ্ছে তারা ডেঞ্চে জাতির কাছ থেকে স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা করছে— কারণ, তারা পিঁপড়ে, সামান্য পিঁপড়ে, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে পিপীলিকা।

পিঁপড়েদের দেখে আমার অত্যন্ত মায়া হয়, ওদের উপকার করবার প্রবৃত্তি আমার অত্যন্ত বলবতী হয়ে ওঠে। এমন-কি, আমার ইচ্ছা করে, সভ্য ডেঞ্চে-সমাজ কিছুদিনের জন্য ছেড়ে, দলকে-দল ডেঞ্চে-ভ্রাতৃবৃন্দকে নিয়ে পিঁপড়েদের বাসার মধ্যে বাসস্থাপন করি এবং পিঁপড়ে-সংস্কারকার্যে ব্রতী হই— এতদূর পর্যন্ত ত্যাগস্বীকার করতে আমি প্রস্তুত আছি। তাদের শর্করকণা গলাধঃকরণ করে এবং তাদের বিবরের মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে কোনোক্রমে আমরা জীবনযাপন করতে রাজি আছি, যদি এতেও তারা কিছুমাত্র উন্নত হয়।

তারা উন্নতি চায় না— তারা নিজের শর্করা নিজে খেতে এবং নিজের বিবরে নিজে বাস করতে চায়, তার কারণ তারা পিঁপড়ে, নিতান্তই পিঁপড়ে। কিন্তু আমরা যখন ডেঞ্চে তখন আমরা তাদের উন্নতি দেবই, এবং তাদের শর্করা আমরা খাব ও তাদের বিবরে আমরা বাস করব— আমরা এবং আমাদের ভাইপো, ভাগ্নে, ভাইঝি ও শ্যালকবৃন্দ।

যদি জিজ্ঞাসা কর তাদের শর্করা আমরা কেন খাব এবং তাদের বিবরে কেন বাস করব তবে তার প্রধান কারণ এই দেখাতে পারি যে, তারা পিঁপড়ে এবং আমরা ডেঞ্চে ! দ্বিতীয়, আমরা নিঃস্বার্থভাবে পিঁপড়েদের উন্নতিসাধনে ব্রতী হয়েছি, অতএব আমরা তাদের শর্করা খাব এবং বিবরেও বাস করব। তৃতীয়, আমাদের প্রিয় ডাঁইভূমি ত্যাগ করে আসতে হবে, সেইজন্য, সেই দুঃখ নিবারণের জন্য, শর্করা কিছু অধিক পরিমাণে খাওয়া আবশ্যক। চতুর্থ, বিদেশে বিজাতির মধ্যে বিচরণ করতে হবে, নানা রোগ হতে পারে— তা হলে বোধ করি আমরা বেশি দিন বাঁচব না— হায়, আমাদের কী শোচনীয় অবস্থা ! অতএব শর্করা খেতেই হবে, এবং বিবরেও যতটা স্থান আছে সমস্ত আমরা এবং আমাদের শ্যালকেরা মিলে ভাগাভাগি করে নেব।

পিঁপড়েরা যদি আপত্তি করে তবে তাদের বলব, অকৃতজ্ঞ ! যদি তারা শর্করা খেতে এবং বিবরে

স্থান পেতে চায় তবে ডাঁই ভাষায় তাদের স্পষ্ট বলব, তোমরা পিপড়ে, ক্ষুদ্র, তোমরা পিপীলিকা। এর চেয়ে আর প্রবল যুক্তি কী আছে!

তবে পিপড়েরা খাবে কী! তা জানি নে। হয়তো আহার এবং বাসস্থানের অকুলান হতেও পারে, কিন্তু এটা তাদের ধৈর্য ধরে বিবেচনা করা উচিত যে, আমাদের দীর্ঘপদস্পর্শে ক্রমে তাদের পদবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা আছে। শৃঙ্খলা এবং শান্তির কিছুমাত্র অভাব থাকবে না। তারা ক্রমিক উন্নতি লাভ করুক এবং আমরা ক্রমিক শর্করা খাই, এমনি একটা বন্দোবস্ত থাকলে তবেই শৃঙ্খলা এবং শান্তি রক্ষা হবে, না হলে তুমুল বিবাদের আটক কী?— মাথায় গুরুভার পড়লে এতই বিবেচনা করে চলতে হয়।

শর্করাভাবে এবং অতিরিক্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার ভারে যদি পিপড়ে জাতি মারা পড়ে? তা হলে আমরা অন্যত্র উন্নতি প্রচার করতে যাব— কারণ, আমরা ডেঞ্রে জাতি, উচ্চ পদের প্রভাবে অত্যন্ত উন্নত।

চৈত্র ১২৯২

প্রত্নতত্ত্ব

১

প্রাচীন ভারতে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ছিল কি না ও অক্সিজেন বাষ্পের কী নাম ছিল

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে একেবারেই এ সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে না ইহা আমরা স্বীকার করি না। প্রাচীন ভারতে ইতিহাস ছিল না, এ কথা অশ্রদ্ধেয়। প্রকৃত কথা, আধুনিক ভারতে অনুসন্ধান ও গবেষণার নিতান্ত অভাব। বর্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিলেই পাঠকেরা দেখিবেন, আমাদের অনুসন্ধানের ত্রুটি হয় নাই এবং তাহাতে যথেষ্ট ফললাভও হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি ছিল কি না ও অক্সিজেন বাষ্পের কী নাম ছিল, তাহার মীমাংসা করিবার পূর্বে কীটুকভট্ট ও পুণ্ড্রবর্ধন মিশ্রের জীবিতকাল নির্ধারণ করা বিশেষ আবশ্যক।

প্রথমত, কীটুকভট্ট কোন রাজার রাজত্বকালে বাস করিতেন সেইটি নিঃসংশয়রূপে স্থির করা যাউক। এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, তিনি পুরন্দরসেনের মন্ত্রী, অন্য মতে তিনি বিজয়পালের সভাপণ্ডিত ছিলেন। দেখিতে হইবে পুরন্দরনেন কয়জন ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কে মিথিলায়, কে উৎকলে এবং কেই-বা কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহার রাজত্বকাল খৃস্ট-শতাব্দীর পাঁচ শত বৎসর পূর্বে, কাহার নয় শত বৎসর পরে এবং কাহারই-বা খৃস্ট-শতাব্দীর সমসাময়িক কালে। বোধনাচার্য তাহার রাজাবলী গ্রন্থে লিখিয়াছেন, পরম্পারম্প্রথিতপথিকৌ (মধ্যে পুঁথির দুই পাতা পাওয়া যায় নাই) লসত্যসৌ। এই শ্লোকের অর্থ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বকোবিদ পণ্ডিতপ্রবর মধুসূদন শাস্ত্রীমহাশয়ের সহিত আমাদের মতের ঐক্য হইতেছে না।

কারণ, নৃপতিনির্ঘণ্ট গ্রন্থে উতঙ্কসূরি লিখিতেছেন— নিগ·· নন্দ···পরন্ত·· ঞ্চং। ইহার মধ্যে যেটুকু অর্থ ছিল, তাহার অধিকাংশই কীটে নিঃশেষপূর্বক পরিপাক করিয়াছে। যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা বোধনাচার্যের লেখনের কোনো সমর্থন করিতেছে না ইহা নিশ্চয়।

কিন্তু উভয়ের লেখার প্রামাণিকতা তুলনা করিতে গেলে, বোধনাচার্য ও উতঙ্কসূরির জন্মকালের পূর্বাপরতা স্থির করিতে হয়।

দেখা যাউক, চীন-পরিব্রাজক নিনফু বোধনাচার্য সম্বন্ধে কী বলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুই বলেন না।

আমরা আরব-ভ্রমণকারী আল্‌করীম, পর্টুগীজ ভ্রমণকারী গঞ্জালিস ও গ্রীক দার্শনিক ম্যাক্‌ডীমসের সমস্ত গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলাম। প্রথমত ইঁহাদের তিনজনের ভ্রমণকাল নির্ণয় করা ঐতিহাসিকের কর্তব্য। আমরাও তাহাতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু প্রবন্ধ-সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে তৎপূর্বে বলা আবশ্যক যে, উক্ত তিন ভ্রমণকারীর কোনো রচনায় বোধনাচার্য অথবা উতঙ্কসূরির কোনো উল্লেখ নাই। নিনফুর গ্রন্থে হ্লাও-কো -নামক এক ব্যক্তির নির্দেশ আছে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌মাত্রেই হ্লাও-কো নাম বোধনাচার্য নামের চৈনিক অপভ্রংশ বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু হ্লাও-কো বোধনাচার্যও হইতে পারে, শম্বরদত্ত হইতেও আটক নাই।

অতএব পুরন্দরসেন একজন ছিলেন কি অনেক জন ছিলেন কি ছিলেন না, প্রথমত তাহার কোনো প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়ত, উক্ত সংশয়াপন্ন পুরন্দরসেনের সহিত কীট্টকভট্ট অথবা পুণ্ড্রবর্ধন মিশ্রের কোনো যোগ ছিল কি না ছিল, তাহা নির্ণয় করা কাহারও সাধ্য নহে।

অতএব, উক্ত কীট্টকভট্ট ও পুণ্ড্রবর্ধন মিশ্রের রচিত মোহান্তক ও জ্ঞানাঞ্জন -নামক গ্রন্থে যদি গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেন বাষ্পের কোনো উল্লেখ না পাওয়া যায়, তবে তাহা হইতে কী প্রমাণ হয় বলা শক্ত। শুদ্ধ এই পর্যন্ত বলা যায় যে, উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের সময়ে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেন আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সে সময়টা কী তাহা আমি অনুমান করিলে মধুসূদন শাস্ত্রীমহাশয় প্রতিবাদ করিবেন এবং তিনি অনুমান করিলে আমি প্রতিবাদ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব কীট্টক ও পুণ্ড্রবর্ধনের নিকট এইখানে বিদায় লইতে হইল। তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইল, এজন্য পাঠকদিগের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি। কিন্তু তাঁহাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, প্রথমত নন্দ উপনন্দ আনন্দ ব্যোমপাল ক্ষেমপাল অনঙ্গপাল প্রভৃতি আঠারো জন নৃপতির কাল ও বংশাবলী -নির্ণয় সম্বন্ধে মধুসূদন শাস্ত্রীর মত খণ্ডন করিয়া সোমদেব চৌলুকভট্ট শঙ্কর কৃপানন্দ উপমন্যু প্রভৃতি পণ্ডিতের জীবিতকাল নির্ধারণ করিতে হইবে ; তাহার পর তাঁহাদের রচিত বোধপ্রদীপ আনন্দসরিৎ মুগ্ধচৈতনালহরী প্রভৃতি পঞ্চান্নখানি গ্রন্থের জীর্ণাবশেষ আলোচনা করিয়া দেখাইব, উহাদের মধ্যে কোনো গ্রন্থেই গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি অথবা অক্সিজেনের নামগন্ধ নাই। উক্ত গ্রন্থসমূহে ষট্‌চক্রভেদ সর্পদংশনমন্ত্র রক্ষাবীজ আছে এবং একজন পণ্ডিত এমনও মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, স্বপ্নে নিজের লাঙ্গুল দর্শন করিলে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান ও কুণ্ডপতনক-নামক চাতুর্মাস্য ব্রতপালন আবশ্যক ; কিন্তু ব্যাটারি ও বাষ্প বিষয়ে কোনো বর্ণনা বা বিধান পাওয়া গেল না। আমরা ক্রমশ ইহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া ইতিহাসহীনতা সম্বন্ধে ভারতের দুর্নাম দূর করিব ; প্রাচীন গ্রন্থ হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিব যে, পুরাকালে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ভারতখণ্ডে ছিল না এবং সংস্কৃত ভাষায় অক্সিজেন বাষ্পের কোনো নাম পাওয়া যায় না।

২

মধুসূদন শাস্ত্রীমহাশয় -কর্তৃক উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ

আমাদের ভারত-ইতিহাস-সমুদ্রে পাতিহাঁস, বঙ্গসাহিত্যকুঞ্জের গুঞ্জোন্মত্ত কুঞ্জবিহারীবাবু কলম ধরিয়াছেন ; অতএব প্রাচীন ভারত, সাবধান ! কোথায় খোঁচা লাগে কী জানি। অপোগণ্ডের যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকিবে তবে নিজের সুধাভাণ্ডে দণ্ডপ্রহার করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন ! অথবা বহুদর্শী প্রাচীন ভারতকে সাবধান করা বাহুল্য, উদ্যতলেখনী কুঞ্জবিহারীকে দেখিয়া তিনি পবিত্র উত্তরীয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বসিয়া আছেন। তাই আমাদের এই আমড়াতলার দামড়াবাছুরটি প্রাচীন ভারতে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি এবং অক্সিজেনের সংস্কৃত নাম খুঁজিয়া পাইলেন না। ধন্য তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা !

আমাদের দেশে যে এক কালে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি এবং অক্সিজেন বাষ্প আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ভাই বাঙালি, এ কথা তুমি বিশ্বাস করিবে কেন ? তাহা হইলে তোমার এমন দশা হইবে কেন ? আজ যে তুমি লাঞ্ছিত, গঞ্জিত, তিরস্কৃত, পরপদানত, অন্নবস্ত্রহীন, দাসানুদাস ভিক্ষুক, জগতে তোমার এমন

অবস্থা হয় কেন ? কোন্ দিন তুমি এবং তোমাদের সাহিত্য-সংসারের এই সার সঙটি বলিয়া বসিবেন, অসভ্য ভারতের বাতাসে অক্সিজেন বাষ্পই ছিল না এবং বিদ্যুৎ খেলাইতে পারে ভারতের অশিক্ষিত আকাশ এমন এন্‌লাইটেণ্ড্‌ ছিল না।

ভাই বাঙালি, তুমি এন্‌লাইটেণ্ড্‌, বাতাসের সঙ্গে তুমি অনেক অক্সিজেন বাষ্প টানিয়া থাক এবং তোমার চোখে মুখে বিদ্যুৎ খেলে। আমি মূর্খ, আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন তাই, ভাই, আমি বিশ্বাস করি প্রাচীন ভারতে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ছিল এবং অক্সিজেন বাষ্পের অস্তিত্বও অবিদিত ছিল না। কেন বিশ্বাস করি ? আগে নিষ্ঠার সহিত কূর্ম কল্কি ও স্কন্দ পুরাণ পাঠ করো, গো এবং ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি স্থাপন করো, ম্লেচ্ছের অন্ন যদি খাইতে ইচ্ছা হয় তো গোপনে খাইয়া সমাজে অস্বীকার করো, যতটুকু নব্য শিক্ষা হইয়াছে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাও, তবে বুঝিতে পারিবে কেন বিশ্বাস করি। আজ তোমাকে যাহা বলিব তুমি হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমার যুক্তি তোমার কাছে অজ্ঞের প্রলাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

তবু একবার জিজ্ঞাসা করি, কীটে যতটা খাইয়াছে এবং মুসলমানে যতটা ধ্বংস করিয়াছে, তাহার কি একটা হিসাব আছে! যে পাপিষ্ঠ যবন ভারতের পবিত্র স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে, ভারতের গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারির প্রতি যে তাহারা মমতা প্রদর্শন করিবে ইহাও কি সম্ভব! যে ম্লেচ্ছগণ শত শত আর্যসন্তানের পবিত্র মস্তক উষ্ণীষ ও শিখা -সমেত উড়াইয়া দিয়াছিল, তাহারা যে আমাদের পবিত্র দেবভাষা হইতে অক্সিজেন বাষ্পটুকু উড়াইয়া দিবে ইহাতে কিছু বিচিত্র আছে ?

এই তো গেল প্রথম যুক্তি। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, যদি যবনগণের দ্বারাই গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেনের প্রাচীন নাম লোপ না হইবে, তবে তাহা গেল কোথায়— তবে কোথাও তাহার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না কেন ? প্রাচীন শাস্ত্রে এত শত ঋষি-মুনির নাম আছে, তন্মধ্যে গল্বন ঋষির নাম বহু গবেষণাতেও পাওয়া যায় না কেন ? যে পবিত্র ভারতে দধীচি বজ্রনির্মাণের জন্য নিজ অস্থি ইন্দ্রকে দান করিয়াছেন, ভীমসেন গদাঘাতের দ্বারা জরাসন্ধকে নিহত করিয়াছেন এবং জহ্নুমুনি গঙ্গাকে এক গণ্ডূষে পান করিয়া জানু দিয়া নিঃসারিত করিয়াছেন, যে ভারতে ঋষিবাক্যপালনের জন্য বিন্ধ্যপর্বত আজিও নতশির, সেই ভারতের সাহিত্য হইতে অক্সিজেন বাষ্পের নাম পর্যন্ত যে লুপ্ত হইয়াছে, সর্বসংহারক যবনের উপদ্রবই যদি তাহার কারণ না হয়, তবে হে ভাই বাঙালি, তাহার কী কারণ আছে জিজ্ঞাসা করি।

তৃতীয় যুক্তি এই যে ইতিহাসের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, যবনেরা প্রাচীন ভারতের বহুতর কীর্তি লোপ করিয়াছে। এ কথা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আজ যে আমরা নিন্দিত অপমানিত ভীত ত্রস্ত ভয়গ্রস্ত রিক্তহস্ত অস্তংগমিতমহিমা পরাধীন হইয়াছি, ভারতের যবনাধিকারই তাহার একমাত্র কারণ। এতটা দূরই যদি স্বীকার করিতে পারিলাম, তবে আমাদের গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেনের নামও যে সেই দুরাত্মারাই লোপ করিয়াছে এটুকু যোগ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবার তিলমাত্র কারণ দেখি না।

চতুর্থ যুক্তি, যখন এক সময়ে যবন ভারত অধিকার করিয়াছিল এবং নির্বিচারে বহুতর পূত মস্তক ও মন্দিরচূড়া ভগ্ন করিয়াছিল, যখন অনায়াসে যবনের স্কন্ধে সমস্ত দোষারোপ করা যাইতে পারে এবং সেজন্য কেহ লাইবেলের মকদ্দমা আনিবে না, তখন যে ব্যক্তি সভ্যতার কোনো উপকরণ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের দৈন্য স্বীকার করে সে পাষণ্ড, হৃদয়হীন, বিকৃতমস্তিষ্ক এবং স্বদেশদ্রোহী! অতএব, তাহার কথার কোনো মূল্য থাকিতে পারে না ; সে যে-সকল প্রমাণ আহরণ করে কোনো প্রকৃত নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ হিন্দুসন্তান তাহাকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতেই পারেন না।

এমন যুক্তি আমরা আরো অনেক দিতে পারি। কিন্তু আমরা হিন্দু, পৃথিবীতে আমাদের মতো উদার, আমাদের মতো সহিষ্ণু জাতি আর নাই। আমরা পরের মতের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। অতএব আমাদের সর্বপ্রধান যুক্তি বাপান্ত, অর্ধচন্দ্র এবং ধোপা-নাপিত-রোধ।

লেখার নমুনা

সম্পাদকমহাশয়-সমীপেষু—

ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন, কিন্তু না বলিয়া থাকিতে পারি না, আপনারা এখনো লিখিতে শিখেন নাই। অমন মৃদুসম্ভাষণে কাজ চলে না। গলায় গামছা দিয়া লোক টানিতে হইবে। কিন্তু উপদেশের অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ বলিয়া আমাদের এজেন্সি আপিস হইতে একটা লেখার নমুনা পাঠাইতেছি। পছন্দ হইলে ছাপাইবেন, দাম দিতে ভুলিবেন না। যিনি লিখিয়াছেন তিনি সাহিত্যসংসারে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। বাঙ্গালার ভূগোলে সাহিত্যসংসার কোথায় আছে ঠিক জানি না; এই পর্যন্ত জানি, আমাদের বিখ্যাত লেখককে তাঁহার ঘরের লোক ছাড়া আর কেহই চেনেন না। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, সাহিত্যসংসার বলিতে তিনি, তাঁহার বিধবা পিসি, তাঁহার স্ত্রী এবং দুই বিবাহযোগ্যা কন্যা বুঝায়। এই ক্ষুদ্র সাহিত্যসংসারটির জীবিকা আমাদের খ্যাতনামা লেখকটির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সকল সময়ে রুচি রক্ষা করিয়া, সত্য রক্ষা করিয়া, ভদ্রতা রক্ষা করিয়া লিখিলে ইহার কোনোমতে চলে না; অতএব উপযুক্ত লেখক এমন আর পাইবেন না।

তবু কেন বলি

দেখিয়া বিস্মিত আশ্চর্য এবং চমৎকৃত হইতে হয়, কী বলিব, চক্ষে জল আসে, কান্না পায়, অশ্রুসলিলে বক্ষ ভাসিয়া যায়, যখন দেখিতে পাই, যখন প্রত্যহ এমন-কি, প্রতিদিন প্রত্যক্ষ দেখা যায়— কী দেখা যায়! পোড়া মুখে কেমন করিয়া বলিব কী দেখা যায়! বলিতে লজ্জা হয়, শরম আসে, মুখ ঢাকিতে ইচ্ছা হয়, উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়িয়া বলিতে ইচ্ছা করে, মাতঃ বসুন্ধরে, জননী, মা, মা গো, একবার দ্বিধা হও মা— একবার দুখানা হইয়া ভাঙিয়া যা মা, সন্তানের লজ্জা নিবারণ কর্ জননী। ভাই বঙ্গবাসী, বুঝিয়াছ কি, কোন্ কলঙ্কের কথা, কোন্ লাঞ্ছনার কথা, কোন্ দুঃসহ লজ্জার কথা বলিতেছি, ব্যক্ত করিতেছি, প্রকাশ করিতে গিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে? না, বোঝ নাই, তোমরা বুঝিবে কেন ভাই? তোমরা মিল্ বোঝ, স্পেন্সর বোঝ, তোমরা শেলির আধো-আধো ছায়া-ছায়া ভাঙা-ভাঙা কবিত্ব বোঝ, তোমরা গরিবের কথা বুঝিবে কেন, দরিদ্রের কথা শুনিবে কেন, এ অকিঞ্চনের ভাষা তোমাদের কানে যাইবে কেন? কিন্তু ভাই, একটি প্রশ্ন আছে, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, গুণমণি, ঐ মুখের একটি উত্তর শুনিতে চাই— আচ্ছা ভাই, পরের কথা বোঝ, আর আপনার লোকের কথা বোঝ না, বাহিরের কথা বোঝ আর ঘরের কথা বুঝিতে পার না, যে আপনার নয় তাহার কথা বোঝ— যে আপনার তাহার কথা বোঝ না? বোঝ না তাহাতেও দুঃখ নাই, তাহাতেও খেদ নাই, তাহাতেও তিলার্ধমাত্র শোকের কারণ নাই, কিন্তু ভাই, কথাটা যে একেবারেই হৃদয়ঙ্গমই হয় না, একেবারে যেন অবোধের মতো বসিয়া থাক! সেই তো আমাদের দুর্দশা, সেই তো আমাদের দুরদৃষ্ট। ভাই বাঙালি, জিজ্ঞাসা করিতে পার বটে, যে কথা আজিকার দিনে কেহ বুঝিবে না সে কথা তুলিলে কেন, উত্থাপন করিলে কেন? যে কথা সবাই ভুলিয়াছে সে কথা মনে করাইয়া দাও কেন? যে দুর্বিষহ বেদনা, যে দুঃসহ ব্যথা, যে অসহ্য যন্ত্রণা নাই তাহাতে আঘাত দাও কেন? আমিও তো সেই কথা বলি ভাই। এই ভাঙা মন্দিরে এই ভাঙা কণ্ঠের প্রতিধ্বনি কেন তুলি! এই শ্মশানের চিতানলে আবার কেন নূতন করিয়া নয়নজল নিক্ষেপ করি! আর্যজননীর সমাধিক্ষেত্রে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যশাসিত সভ্যচালিত নবসভ্যতার দিনে আবার কেন নূতন করিয়া নীরবতার তরঙ্গ উত্থিত করি! কেন করি! তোমরা কী করিয়া বুঝিবে ভাই, কেন করি! তুমি যে ভাই, সভ্য, তুমি কী করিয়া বুঝিবে কেন করি! তুমি যে ভাই, নবসভ্যতার নূতন বিদ্যালয়ে নূতন শিক্ষা লাভ করিয়া নূতন তানে নূতন গান ধরিয়াছ, নূতন রসে নূতন মজিয়া নূতন ভাবে নূতন ভোর হইয়াছ, তুমি কী করিয়া বুঝিবে কেন করি! তুমি যে এ কথা কখনো কিছু শোন নাই এবং আজ সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছ, তুমি যে এ কথা কখনো কিছু বোঝ

নাই এবং আজ একেবারেই বোঝ না, তুমি কী করিয়া বুঝিবে কেন করি ! তবু জিজ্ঞাসা করিবে কেন করি ? আমি যে ভাই, তোমাদের মিল্ পড়ি নাই, তোমাদের স্পেন্সর পড়ি নাই, তোমাদের ডারুয়িন পড়ি নাই ;.আমি যে ভাই, তোমাদের হক্সলি এবং টিণ্ড্যাল, রাস্কিন এবং কার্লাইল পড়ি নাই এবং পড়িয়া বুঝিতে পারি নাই ; আমি যে ভাই, কেবলমাত্র ষড়্ দর্শন এবং অষ্টাঙ্গ বেদ, সংহিতা এবং পুরাণ, আগম এবং নিগম, উপক্রমণিকা এবং ঋজুপাঠ-প্রথমভাগ পড়িয়াছি— ঐ-সকল গ্রন্থ এই পতিত ভারতে আমি ছাড়া আর যে কেহ পড়ে নাই এবং বুঝে নাই ভাই । তবু আবার জিজ্ঞাসা করিবে কেন করি ! প্রাণের ভাইসকল, আমি যে পাগল, বাতুল, উন্মাদ, বায়ুগ্রস্ত, আমার মাথার ঠিক নাই, বুদ্ধির স্থিরতা নাই, চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত !

ভাই বাঙালি, এখন বুঝিলে কি, কেন করি, অবোধ অশ্রু কেন পড়ে, পোড়া চোখের জল কেন বারণ মানে না, কেন মিছে অরণ্যে রোদন, অস্থানে ক্রন্দন করিয়া মরি ! নীরব হৃদয়ের জ্বালা ব্যক্ত হইল কি, এই ভস্মীভূত প্রাণের শিখা দেখিতে পাইলে কি, শুষ্ক অশ্রুধারা দুই কপোল বাহিয়া কি প্রবাহিত হইল ? যে ধ্বনি কখনো শোন নাই তাহার প্রতিধ্বনি শুনিলে কি, যে আশা কখনো হৃদয়ে স্থান দাও নাই তাহার নৈরাশ্য তিলমাত্র অনুভব করিলে কি, যাহা বুঝাইতে গেলে বুঝানো যায় না এবং যাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝা উত্তরোত্তর অসাধ্য হইয়া উঠে তাহা কি আজ তোমাদের এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতারুদ্ধ বধির কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল ।—

সম্পাদকমহাশয়, আজ এই পর্যন্ত প্রকাশ করা গেল । কারণ, ইহার পরের প্যারাগ্রাফেই আমাদের লেখক আরম্ভ করিয়াছেন, 'যদি না করিয়া থাকে তবে আমি ক্ষান্ত হইলাম, নীরব হইলাম, তবে আমি মুখ বন্ধ করিলাম, তবে আমি আর একটি কথাও কহিব না— না, একটিও না ।' এই বলিয়া কেন কথা কহিবেন না, শ্মশানক্ষেত্রে কথা বলিলেই বা কিরূপ ফল হয় এবং সমাধিক্ষেত্রে কথা বলিলেই বা কিরূপ নিষ্ফল হয়, এবং কথা বলিলেই বা কিরূপ হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং হৃদয় বিদীর্ণ হইলেই বা কিরূপ কথা বাহির হইতে থাকে, তাহাই ভাই বাঙালিকে পুনরায় বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছেন না । এই অংশটি এত দীর্ঘ যে আপনার কাগজে স্থান হইবে না । পাঠকদিগকে আশ্বাস দেওয়া যাইতেছে, প্রবন্ধটি অবিলম্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে । মূল্য ৫৫০ মাত্র, কিন্তু যাঁহারা ডাক-মাশুল -স্বরূপে উক্ত ৫৫০ পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে বিনা মূল্যে গ্রন্থ উপহার দেওয়া যাইবে ।

—সাহিত্য এজেন্সির কার্যাধ্যক্ষ

সারবান সাহিত্য

নাটক

সম্পাদকমহাশয়,

আজকাল বাংলা সাহিত্যে রাশি রাশি নাটক-নভেলের আমদানি হইতেছে । কিন্তু তাহাতে সার পদার্থ কিছুমাত্র নাই । না আছে তত্ত্বজ্ঞান, না আছে উপদেশ । কী করিলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে, গোজাতির রোগনিবারণ করিবার কী কী উপায় আছে, দ্বৈত দ্বৈতাদ্বৈত এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন্ বাদ শ্রেষ্ঠ, কফ পিত্ত ও বায়ু -বৃদ্ধির পক্ষে দিশি কুমড়া ও বিলাতি কুমড়ার মধ্যে কোনো প্রভেদ আছে কি না, অশোক এবং হর্ষবর্ধনের মধ্যে কে আগে কে পরে— আমাদের অগণ্য কাব্য-নাটকের মধ্যে এ-সকল সারগর্ভ বিশ্বহিতকর প্রসঙ্গের কোনো মীমাংসা পাওয়া যায় না । একবার কল্পনা করিয়া দেখুন, যদি কোনো নাটকের পঞ্চমাঙ্কের সর্বশেষভাগে এমন একটি তত্ত্ব পাওয়া যায় যদ্দ্বারা জৈবশক্তি ও দৈবশক্তির অন্যোন্য সম্বন্ধ নিরূপিত হয় অথবা সৃষ্টিবিকাশের ক্রমপর্যায় নাটকের অঙ্কে অঙ্কে বিভক্ত

হইয়া দুর্গম জ্ঞানশিখরের মরকত-সোপান-পরম্পরা রচিত হয়, তবে রসগ্রাহী সহৃদয় পাঠকেরা কিরূপ পুলকিত ও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। এখন যে-সকল অসার ম্লেচ্ছভাবসংস্পর্শদূষিত গ্রন্থ বাহির হইতেছে তাহা পাঠ করিয়া বাবুরা সাহেব এবং ঘরের গৃহিণীরা বিবি হইতেছেন। বঙ্গসাহিত্যের এই কলঙ্ক অপনোদন করিবার মানসে আমি নাটক-উপন্যাসের ছলে কতকগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রথম সংখ্যায় পঞ্জিকা নাট্যাকারে বাহির করিব স্থির করিয়াছি। গ্রহ-ফলাফলের প্রতি বর্তমান কালের ইংরাজি-শিক্ষিত বাবু-বিবি দিগের বিশ্বাস ক্রমশ হ্রাস হইতেছে। সেই নষ্ট বিশ্বাস উদ্ধার করিবার জন্য আমি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। সাধারণের চিত্ত-আকর্ষণের অভিপ্রায়ে এই নাটকের কিঞ্চিৎ নমুনা মহাশয়ের জগদ্‌বিখ্যাত পত্রের এক পার্শ্বে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

নাটকের পাত্রগণ

হর

পার্বতী

প্রথম অঙ্ক। দৃশ্য কৈলাসপর্বত

হরপার্বতী

পার্বতী। নাথ!

হর। কেন প্রিয়ে?

পার্বতী। শ্বেতবরাহ কল্পাব্দ হইতে কয়জন মনুর আবির্ভাব হইয়াছে সেই মনোহর প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।

হর। (সহাস্যে) প্রিয়ে, পঞ্জিকার প্রথম সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক বর্ষারম্ভদিনে এই পরমজিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তরে তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া আসিতেছি। জীবিতবল্লভে, আজও কি এ সম্বন্ধে তোমার ধারণা জন্মিল না?

পার্বতী। প্রাণনাথ, জানই তো আমরা বুদ্ধিহীন নারীজাতি, বিশেষত আজকালকার বিবিদের মতো ফিমেল ইস্কুলে পড়ি নাই। (বোধ করি সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন, এইখানে বর্তমান শিক্ষিতা মহিলাদের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ করা হইল। ইহাতে স্ত্রীশিক্ষা অনেকটা নিবারণ হইবে। —লেখক) হৃদয়নাথ, অহর্নিশি একমাত্র পতিচিন্তা ব্যতীত যাহার আর কোনো চিন্তা নাই তাহার স্মৃতিপটে অতগুলা মনুর কথা কিরূপে অঙ্কিত হইবে? হাজার হউক, তাহারা তো পরপুরুষ বটে। (বর্তমান কালের পাঠিকারা এইস্থল হইতে পতিভক্তির সুন্দর উপদেশ পাইবেন। —লেখক)

হর। প্রিয়তমে, তবে অবহিত হইয়া মনোহর কথা শ্রবণ করো। শ্বেতবরাহ কল্পাব্দের পর হইতে ছয় জন মনু গত হইয়াছেন। প্রথম স্বায়ম্ভূব মনু। দ্বিতীয় স্বরোচিষ মনু। তৃতীয় ঐত্তমজ মনু। চতুর্থ তামস মনু। পঞ্চম রৈবত মনু। ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনু। সম্প্রতি সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার চলিতেছে। সপ্তবিংশতি যুগ গত হইয়াছে। অষ্টবিংশতি যুগে কলিযুগের প্রারম্ভ। তত্র চতুর্যুগের পরিমাণ বিংশতি-সহস্রাধিক ত্রিচত্বারিংশল্লক্ষ-পরিমিত বর্ষ।

পার্বতী। (স্বগত) অহো কী শ্রুতিমনোহর! (প্রকাশ্যে) প্রাণেশ্বর, এবার সত্যযুগোৎপত্তির কাল নিরূপণ করিয়া দাসীর কর্ণকুহর সুধাসিক্ত করো।

হর। প্রিয়ে, তবে শ্রবণ করো। বৈশাখ শুক্লপক্ষ অক্ষয়তৃতীয়া রবিবারে সত্যযুগোৎপত্তি। ইত্যাদি।

(এইরূপে কাব্যকৌশলসহকারে প্রথম অঙ্কে একে একে চারি যুগের উৎপত্তি বিবরণ বর্ণিত হইবে। —লেখক)

দ্বিতীয় অঙ্ক। দৃশ্য কৈলাস

বৃষস্কন্ধে মহেশ এবং শিলাতলে হৈমবতী আসীনা। নাটকের মধ্যে বৈচিত্র্যসাধনের জন্য হরপার্বতীর নাম পরিবর্তন করা গিয়াছে এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে বৃষের অবতারণা করা হইয়াছে। যদি কোনো রঙ্গভূমিতে এই নাটকের অভিনয় হয় নিশ্চয়ই বৃষ সাজিবার লোকের অভাব হইবে না। বক্ষ্যমাণ অঙ্কে পার্বতী মধুর সম্ভাষণে মহেশ্বরের নিকট হইতে বর্ষফল জানিয়া লইতেছেন। এই অঙ্কে প্রসঙ্গক্রমে সোনার ভারতের দুর্দশায় পার্বতীর বিলাপ এবং রেলগাড়ি প্রচলিত হওয়াতে আর্যাবর্তের কী কী অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহা কৌশলে বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে আঢ়কেশ ফল কুড়বেশ ফল এবং গোটিকাপাত ফল -নামক সুখশ্রাব্য প্রসঙ্গে এই অঙ্কের সমাপ্তি।

তৃতীয় অঙ্ক এবং চতুর্থ অঙ্ক। দৃশ্য কৈলাস
গজচর্মে ত্র্যম্বক ও অম্বিকা আসীনা

নাট্যশালায় গজচর্মের আয়োজন যদি অসম্ভব হয়, কার্পেট পাতিয়া দিলেই চলিবে। এই দুই অঙ্কে বারবেলা, কালবেলা, পরিঘযোগ, বিষ্কম্ভযোগ, অসৃকযোগ, বিষ্টিভদ্রা, মহাদগ্ধা, নক্ষত্রফল, রাশিফল, ববকরণ, বালবকরণ, তৈতিলকরণ, কিস্তুঘ্নকরণ, ঘাতচন্দ্র, তারাপ্রতিকার, গোচরফল প্রভৃতির বর্ণনা আছে। অভিনেতাদিগের প্রতি লেখকের সবিনয় অনুরোধ, এই দুই অঙ্কে তাঁহারা যথাযথ ভাব রক্ষা করিয়া যেন অভিনয় করেন— কারণ অরিদ্বিদশ এবং মিত্রষড়ষ্টক -কথনে যদি অভিনেতার কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গিতে ভিন্নতা না থাকে, তবে দর্শকগণের চিত্তে কখনোই অনুরূপ ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে না। —লেখক

পঞ্চমাঙ্ক। দৃশ্য কৈলাস
সিংহের উপর ত্রিপুরারি ও মহাদেবী আসীন
(সিংহের অভাবে কাঠের চৌকি হইলে ক্ষতি নাই। —লেখক)

মহাদেবী। প্রভু, দেবদেব, তুমি তো ত্রিকালজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তোমার নখদর্পণে ; এইবার বলো দেখি ১৮৭৯ সালের এক আইনে কী বলে।

ত্রিপুরারি। মহাদেবী, শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী, তবে অবধান করো। কোনো-একটি বিষয়ের অনেকগুলি দলিল হইলে তাহার মধ্যে প্রধানখানিতে নিয়মিত স্ট্যাম্প, অপরগুলিতে এক টাকা অনুসারে দিতে হয়।

ইহার পর দলিল রেজেস্টারির খরচা, তামাদির নিয়ম, উকিল-খরচা, খাজনাবিষয়ক আইন, ইনকমট্যাক্স, বাঙ্গিডাক, মনিঅর্ডার, সর্বশেষ সাউথ ইস্টারন্ স্টেট রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার কথা বিবৃত করিয়া যবনিকাপতন। এই অঙ্কে যে ব্যক্তি সিংহ সাজিবে তাহার কিঞ্চিৎ আপত্তি থাকিতে পারে ; অতক্ষণ দুই জনকে স্কন্ধে করিয়া হামাগুড়ির ভঙ্গিতে নিশ্চল দাঁড়াইয়া থাকা কঠিন ব্যাপার! সেইজন্য উকিল-খরচা-কথনের মধ্যে সিংহ একবার গর্জন করিয়া উঠিবে, 'মা, আমার ক্ষুধা পাইয়াছে।' মা বলিলেন, 'তা, যাও বাছা, সাহারা মরুতে তোমার শিকার ধরিয়া খাও গে, আমরা নীচে নামিয়া বসিতেছি।' হামাগুড়ি দিয়া সিংহ নিষ্ক্রান্ত হইবে। এই সুযোগে দর্শকেরা সিংহের আবাসস্থলের পরিচয় পাইবেন।— আমার কোনো কোনো নব্যবন্ধু পরামর্শ দিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে মধ্যে নন্দীভৃঙ্গীর হাস্যরসের অবতারণা করিলে ভালো হয়। কিন্তু তাহা হইলে নাটকের গৌরব লাঘব হয়। এইজন্য হাস্যপ্রগল্‌ভতা আমি সযত্নে দূরে পরিহার করিয়াছি। ভবিষ্যতে সুশ্রুত ও চরক -সংহিতা নাট্যাকারে

রচনা করিবার অভিলাষ আছে এবং উপন্যাসের ন্যায় লঘু সাহিত্যকে কতদূর পর্যন্ত সারবান করিয়া তোলা যাইতে পারে পাঠকদিগকে তাহারও কিঞ্চিৎ নমুনা দিবার সংকল্প করিয়াছি।

ভবদীয় একান্ত অনুগত শ্রীজনহিতৈষী
সাহিত্যপ্রচারক

১২৯৮

মীমাংসা

আমাদের বাড়ির পাশেই নবীন ঘোষের বাড়ি। একেবারে সংলগ্ন বলিলেই হয়।

আমি কখনো আমাদের বাড়ির ছাদে উঠি না, জানালায়ও দাঁড়াই না। আপন মনে গৃহকার্য করিয়া যাই।

নবীন ঘোষের বড়ো ছেলে মুকুন্দ ঘোষকে কখনো চক্ষে দেখি নাই।

কিন্তু মুকুন্দ ঘোষ কেন বাঁশি বাজায়! সকালে বাজায়, মধ্যাহ্নে বাজায়, সন্ধ্যাবেলায় বাজায়। আমার ঘর হইতে স্পষ্ট শোনা যায়।

আমি কবি নই, মাসিক পত্রিকার সম্পাদক নই, মনের ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারি না। কেবল সকালে কাঁদি, মধ্যাহ্নে কাঁদি, সন্ধ্যাবেলায় কাঁদি এবং ইচ্ছা করে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাই।

বুঝিতে পারি রাধিকা কেন তাঁহার সখীকে সম্বোধন করিয়া কাতর স্বরে বলিয়াছিলেন 'বারণ কর্ লো সই, আর যেন শ্যামের বাঁশি বাজে না বাজে না'।

বুঝিতে পারি চণ্ডীদাস কেন লিখিয়াছেন—

যে না দেশে বাঁশির ঘর সেই দেশে যাব,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।

কিন্তু পাঠক, আমার এ হৃদয়বেদনা তুমি কি বুঝিয়াছ?

উত্তর

আমি বুঝিয়াছি। যদিও আমি কুলবধূ নই। কারণ, আমি পুরুষমানুষ। কিন্তু আমার বাড়ির পাশেও একটি কন্সর্টের দল আছে। তাহার মধ্যে একটি ছোকরা নূতন বাঁশি অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে— প্রত্যুষ হইতে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত সারিগম সাধিতেছে। পূর্বাপেক্ষা অনেকটা সড়গড় হইয়াছে; এখন প্রত্যেক সুরে কেবলমাত্র আধসুর সিকিসুর তফাত দিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমার চিত্ত উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে; ঘরে আর কিছুতে মন টেঁকে না। বুঝিতে পারিতেছি রাধিকা কেন বলিয়াছিলেন 'বারণ কর্ লো সই, আর যেন শ্যামের বাঁশি বাজে না বাজে না'। শ্যাম বোধ করি তখন নূতন সারিগম সাধিতেছিলেন। বুঝিতে পারিতেছি চণ্ডীদাস কেন লিখিয়াছিলেন—

যে না দেশে বাঁশির ঘর সেই দেশে যাব,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।

বোধ হয় চণ্ডীদাসের বাসার পাশে কন্সর্টের দল ছিল।

আমার বাড়ির পাশে যে ছোকরা বাঁশি অভ্যাস করে বোধ হয় তাহারই নাম মুকুন্দ ঘোষ।

—শ্রীসংগীতপ্রিয়

আমার এ কী হইল! এ কী বেদনা! নিদ্রা নাই, আহার নাই, মনে সুখ নাই। থাকিয়া থাকিয়া 'চমকি চমকি উঠি'।

কমলপত্র বীজন করিলে অসহ্য বোধ হয়, চন্দনপঙ্ক লেপন করিলে উপশম না হইয়া বিপরীত হয়। শীতল সমীরণে সমস্ত জগতের তাপ নিবারণ করে, কেবল আমি হতভাগিনী সখীকে ডাকিয়া বলি,

'উহু উহু, সখী, দ্বার রোধ করিয়া দাও'।

সখীরা স্নেহভরে দেহ স্পর্শ করিলে চমকিয়া হাত ঠেলিয়া দিই। না জানি কোন্ স্পর্শে আরাম পাইব।

মনোহরা শারদপূর্ণিমা কাহার না আনন্দদায়িনী! কেবল আমার কষ্ট কেন দ্বিগুণ বাড়াইয়া তোলে?

আমার ন্যায় আর-কোনো হতভাগিনী সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন—

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্।

অন্যত্র লিখিয়াছেন 'নিশি নিশি রুজমুপযাতি'। আমারও সেই দশা। রাত্রেই বাড়িয়া উঠে।

আমার এ কী হইল?

উত্তর

তোমার বাত হইয়াছে। অতএব পুবে হাওয়া বহিলে যে দ্বার রোধ করিয়া দাও সেটা ভালোই কর। পরীক্ষাস্বরূপে চন্দনপঙ্ক লেপন না করিলেই উত্তম করিতে। পূর্ণিমার সময় যে বেদনা বাড়ে সে তোমার একলার নহে, রোগটার ঐ এক লক্ষণ। চাঁদের সহিত বিরহ বাত পয়ার এবং জোয়ার-ভাঁটার একটা যোগ আছে।

রাধিকার ন্যায় রাত্রে তোমার রোগ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু রাধিকার সময় ভালো ডাক্তার ছিল না, তোমার সময়ে ডাক্তারের অভাব নাই। অতএব আমার ঠিকানা সম্পাদকের নিকট জানিয়া লইয়া অবিলম্বে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিবে।

—নূতন উত্তীর্ণ ডাক্তার

১২৯৮

পয়সার লাঞ্ছনা

আমাদের আপিসের সাহেব বলে, বাঙালির বেশি বেতনের আবশ্যক নাই। সে স্থির করিয়া রাখিয়াছে, ভদ্র বাঙালির ছেলের পক্ষে মাসিক পঁচিশ টাকা খুব উচ্চ বেতন। আমাদের অবস্থা এবং আমাদের দেশের সম্বন্ধে সাহেবরা যখন একটা মত স্থির করে তখন তাহার উপর আমাদের কোনো কথা বলা প্রগল্‌ভতা। কেবল সাহেবের প্রতি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতাসূচক বিশেষণ-প্রয়োগপূর্বক মনের ক্ষোভে আপনা-আপনির মধ্যে বলাবলি করি— সাহেব সবই তো জানেন।

শোনা যায় জগতে হরণ-পূরণের একটা নিয়ম আছে। সে নিয়মের অর্থ এই— যাহার একটার অভাব তাহার আর-একটার বাহুল্য প্রায়ই থাকে। আপিসেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের যেমন বেতন অল্প তেমনি খাটুনি এবং লাঞ্ছনা অধিক এবং সাহেবের ঠিক তাহার বিপরীত।

কিন্তু জগতের এ নিয়ম কোনো কোনো জগদ্‌বাসীর পক্ষে যেমনই আনন্দজনক হউক আমাদের পক্ষে ঠিক তেমন সুবিধার বোধ হয় নাই। কেবল অগত্যা সহিয়াছিলাম, কিন্তু যেদিন আমাদের উপরে একটা কর্ম খালি হইল এবং বাহির হইতে একটা কাঁচা ইংরাজের ছেলেকে সেই কর্মে নিযুক্ত করিয়া আমাদের প্রমোশন বন্ধ করা হইল, সেদিন আমাদের ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। ইচ্ছা হইল তখনই কাজ ফেলিয়া যদি চলিয়া যাই, একটা মিউটিনি করি, ইংরাজকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিই, পার্লামেন্টে একটা দরখাস্ত করি, স্টেট্‌সম্যান কাগজে একটা বেনামি পত্র লিখি। কিন্তু তাহার কোনোটা না করিয়া বাড়িতে চলিয়া গিয়া সেদিন আর জলখাবার খাইলাম না, খোকার সর্দি হইয়াছে বলিয়া স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিলাম, স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল, আমি সকাল সকাল শুইয়া পড়িলাম। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, হায় রে পয়সা, তোর জন্য এত অপমান!

স্ত্রী অভিমান করিয়া আমার কাছে আসিলেন না, কিন্তু নিঃশব্দচরণে নিদ্রাদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ কখন দেখিতে পাইলাম আমি একটি পয়সা। কিছু আশ্চর্য বোধ হইল না। কবে কোন্

সনাতন টাকশাল হইতে বাহির হইয়াছি যেন মনেও নাই। এই পর্যন্ত অবগত আছি যে, ব্রহ্মার পা হইতে যেমন শূদ্রের উৎপত্তি সেইরূপ টাকশালের অত্যন্ত নিম্নবিভাগেই আমাদের জন্ম।

সেদিন সিকি দু-আনির একটা মহতী সভা বসিবে কাগজে এইরূপ একটা বিজ্ঞাপন পড়া গিয়াছিল। হাতে কাজ ছিল না, কৌতূহলবশত গড়াইয়া গড়াইয়া সেই সভায় গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং দেয়ালের কাছে একটা কোণে আশ্রয় লইলাম।

সুকুমারী সহধর্মিণী দু-আনিকে সযত্নে বামপার্শ্বে লইয়া শুভ্রকায় চার-আনিগুলি দলে দলে আসিয়া সভাগৃহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহারা বাস করে কেহ-বা কোটের পকেটে, কেহ-বা চামড়ার থলিতে, কেহ-বা টিনের বাক্সে। কেহ কেহ-বা অদৃষ্টগতিকে আমাদের প্রতিবেশীরূপে আমাদের পাড়ায় ট্যাকের মধ্যেও বন্ধ হইয়া দিনযাপন করে।

সেদিনকার আলোচনার বিষয়টা এই যে, আমরা পয়সার সহিত সর্বতোভাবে পৃথক হইতে চাহি, কারণ, উহারা বড়োই হীন। দু-আনিরা সুতীক্ষ্ণ উচ্চস্বরে কহিল, এবং উহারা তাম্রবর্ণ ও উহাদের গন্ধ ভালো নহে। আমার পাশে একটি দু-আনি ছিল, সে ঈষৎ বাঁকিয়া বসিয়া নাসাগ্র কুঞ্চিত করিল, তাহার পার্শ্ববর্তী চার-আনি আমার দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইল, আমি তো একেবারে সংকোচে সিকিপয়সা হইয়া গেলাম। মনে মনে কহিলাম, আমাদেরই তো আটটা ষোলোটা হজম করিয়া তোমাদের আজ এত মূল্য, সেজন্য কি কিছু কৃতজ্ঞতা নাই? মাটির নীচে তো উভয়ের সমান পদবী ছিল।

সেদিন প্রস্তাব হইল গৌরমুদ্রা এবং তাম্রমুদ্রার জন্য স্বতন্ত্র টাকশাল স্থাপিত হউক। যদিও এক মহারানীর ছাপ উভয়ের উপর মারা হইয়াছে, তাই বলিয়া কোনোরূপ সাম্য আমরা স্বীকার করিতে চাহি না। আমরা এক ট্যাক, এক থলি, এক বাক্সে বাস করিব না। এমন-কি, সিকি দু-আনি ভাঙাইয়া পয়সা করা ও পয়সা ভাঙাইয়া সিকি দু-আনি করা এরূপ অপমানজনক আইনও আমরা পরিবর্তন করিতে চাহি। সাম্যবাদের গৌরব আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু তাহার একটা সীমা আছে। গিনি মোহরের সহিত সিকি দু-আনি এক সাম্যসীমার অন্তর্গত, কিন্তু তাই বলিয়া সিকি দু-আনির সহিত পয়সা!

সকলেই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, কখনোই নহে! কখনোই নহে! দু-আনির তীব্র কণ্ঠস্বর সর্বোচ্চে শোনা গেল। যে খনিতে আমার আদিম উৎপত্তি সেই খনির মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছায় আমি বসুমতীকে দ্বিধা হইতে অনুরোধ করিলাম, বসুমতী সে অনুরোধ পালন করিল না— দেয়াল ঘেঁষিয়া রক্তবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

এমন সময় এক ঝক্‌ঝকে নূতন সিকি গড়াইয়া এই সিকি দু-আনির সভার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে দেখিলাম সকলকে ছাড়াইয়া উঠিল। সতেজে বক্তৃতা দিতে লাগিল, ঝন্‌ঝন্ শব্দে চারি দিকে করতালি পড়িল।

কিন্তু আমি ঠাহর করিয়া শুনিলাম, বক্তৃতাটা যেমন হউক আওয়াজটা ঠিক রূপালি ছাঁদের নহে। মনে বড়ো সন্দেহ হইল। সভা যখন ভঙ্গ হইল, ধীরে ধীরে গড়াইয়া গড়াইয়া বহুসাহসপূর্বক তাহার গায়ের উপর গিয়া পড়িলাম— ঠন্ করিয়া আওয়াজ হইল, সে আওয়াজটা অত্যন্ত দিশি এবং গন্ধটাও দেখিলাম আমাদের স্বজাতীয়ের মতো। মহা রাগিয়া উঠিয়া সে কহিল, তুমি কোথাকার অসভ্য হে! আমি কহিলাম, বৎস, তুমিও যেখানকার আমিও সেখানকার। ছোঁড়াটা আমাদের নিম্নতম কুটুম্ব— আধ-পয়সা; কোথা হইতে পারা মাখিয়া আসিয়াছে।

তাহার রকম সকম দেখিয়া হাহাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলাম।

হাসির শব্দে জাগিয়া উঠিয়া দেখি, স্ত্রী পাশে শুইয়া কাঁদিতেছে। তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইলাম। ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া বলিলাম, বড়ো ধরা পড়িয়াছে! কিন্তু মনে করিতেছি আমিও কাল হইতে পারা মাখিয়া আপিসে যাইব।

আমার স্ত্রী কহিল, তাহার অপেক্ষা পারা খাইয়া মরা ভালো।

১৩০০

কথামালার নূতন-প্রকাশিত গল্প

একদা কয়েকজন কাঠুরিয়া এক পার্বত্য সরল বৃক্ষের শাখাচ্ছেদনে মনোযোগী হইয়াছিল। শ্রম লাঘব করিবার অভিপ্রায়ে বিস্তর পরামর্শপূর্বক তাহারা এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিল। যে শাখা ছেদনের আবশ্যক কয়েকজনে মিলিয়া তাহারই উপর চড়িয়া বসিল এবং নিভৃতে বসিয়া সতর্কতার সহিত অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল।

যথাসময়ে শাখা ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং কাঠুরিয়া কয়েকটিও তৎসঙ্গে ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

কাঠুরিয়ার সর্দার এই সংবাদ-শ্রবণে অধীর হইয়া সেই তরুসমীপে উপস্থিত হইল এবং কুঠার আস্ফালন করিয়া কহিল, 'তুমি যে অপরাধ করিয়াছ আমি তাহার বিচার করিতে চাহি।'

বনস্পতি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল, 'হে জনপুঙ্গব, আমার স্কন্ধের উপর আরোহণ করিয়া আমারই শাখাচ্ছেদন করিয়াছ, এক্ষণে কে কাহার বিচার করিবে ?'

মানব আরক্তলোচনে কহিল, 'আমার কয়েকজন কাঠুরিয়া যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল, তাহার জন্য কেহই দণ্ড পাইবে না এ কখনো হইতে পারে না।'

বনস্পতি ভীত হইয়া কম্পিত মর্মরস্বরে কহিল, 'প্রভু, তাঁহারা সুবুদ্ধিসহকারে মানবচাতুরী অবলম্বন করিয়া যেরূপ কাণ্ড করিয়াছিলেন, আশ্চর্য কার্যনৈপুণ্যবশত অবিলম্বেই তাহার ফললাভ করিয়াছেন— আমি মূঢ় বৃক্ষ, তাহার প্রতিবিধান করি এমন সাধ্য ছিল না।'

মানব কহিল, 'কিন্তু তোমারই শাখা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।'

বনস্পতি কহিল, 'সে কথা যথার্থ, কারণ আমারই শাখায় তাঁহারা কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতির নিয়ম অনিবার্য।'

মানব সুযুক্তিসহকারে কহিল, 'অতএব তোমাকেই দণ্ড স্বীকার করিতে হইবে। তোমার যাহা-কিছু বক্তব্য আছে বলিতে থাকো, আমি এক্ষণে কুঠারে শান দিতে চলিলাম।'

তাৎপর্য

অনবধানবশত যদি হুঁচট খাইয়া থাক, চৌকাঠকে পদাঘাত করিবে। সেই জড়পদার্থের পক্ষে এই একমাত্র সুবিচার।

১২৯৮

প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ

মীটিঙে প্রায় সকল দেবতাই একযোগে স্ব স্ব কর্মে রিজাইন দিতে উদ্যত হইলেন।

পিতামহ ব্রহ্মা বৈদিক ভাষায় উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিত -সংযোগপূর্বক কহিলেন, 'ভো ভো দেবগণ শৃণ্বন্তু।

'আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি তো এই বিশ্বসৃষ্টি এবং বেদরচনা সমাপ্ত করিয়া সমস্ত কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়া পেন্‌শন লইয়াছি। এমন-কি, আমার কাছে আর কোনো প্রত্যাশা নাই বলিয়া সকলে আমার পূজা পর্যন্ত বন্ধ করিয়াছে। এবং আমার প্রথম বয়সের বিশ্ব এবং বেদ -নামক দুটো রচনা লইয়া লোকে নির্ভয়ে স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ এবং সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বলে, রচনা মন্দ হয় নাই, কিন্তু আরো ঢের ভালো হইতে পারিত ; কেহ বলে, আমাদের হাতে যদি প্রুফ-সংশোধনের ভার থাকিত তাহা হইলে ছত্রে ছত্রে এত মুদ্রাকরপ্রমাদ থাকিত না। আমি চুপ করিয়া থাকি, মনে মনে তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলি, বাবা, ঐ আমার প্রথম রচনা। তোমরা অবশ্য আমার চেয়ে অনেক

পাকা হইয়াছ, কিন্তু তখন যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না ; একেবারে সমস্তই মন হইতে গড়িতে হইয়াছিল। তৎপূর্বে তোমরা যদি একটু মনোযোগ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে তাহা হইলে সমালোচনা শুনিয়া অনেক জ্ঞানলাভ করিতাম, একটা মস্ত স্ট্যাণ্ডার্ড পাওয়া যাইত। দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা বড়োই বিলম্বে জন্মিয়াছ। যাহা হউক, যখন দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভ হইবে তখন তোমাদের কথা স্মরণ রাখিব।

'আবার কেহ কেহ, রচনা দুটো যে আমার তাহা একেবারে অস্বীকার করে। হয়তো অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারিত ওটা তাহাদেরই নিজের, কিন্তু তাহা হইলে তাহাদের কল্পনাশক্তি ও প্রতিভার খর্বতা স্বীকার করা হয় বলিয়া ক্ষান্ত আছে। হরি হরি ! এই দীর্ঘজীবনে ঐ দুটো বৈ আর কোনো দুষ্কর্ম করি নাই, ইহাতেই এত কথা শুনিতে হইল।

'যাহা হউক এ তো গেল আমার আক্ষেপের কথা। কিন্তু তোমরা কী মনোদুঃখে, মর্তলোকের প্রতি কী অভিমানে তোমাদের বহুকালের পদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ ?'

তখন দেবতারা কেহ-বা বৈদিক, কেহ-বা পৌরাণিক ভাষায়, কেহ-বা ত্রিষ্টুভ, কেহ-বা অনুষ্টুভ ছন্দে, দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ অন্তঃস্থ ব বর্গীয় ব এবং তিন সয়ের উচ্চারণ রক্ষা করিয়া বলিলেন, 'ভগবন্, সায়ান্স্-নামক একটা দানব অত্যন্ত জুলুম আরম্ভ করিয়াছে। ইহার নিকটে বৃত্র প্রভৃতি প্রাচীন অসুরদিগকে গণ্যই করি না।'

বৃদ্ধ পিতামহ মনে মনে হাসিলেন ; ভাবিলেন, কোনোমতে মানে মানে তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছ, এখন তাহাকে গণ্য না করিলেও চলে। কিন্তু তখন যে নাকালটা হইয়াছিলে সে বেশ মনে আছে। কিন্তু সে কথা আর উত্থাপন না করিয়া গম্ভীরভাবে চারিটি মস্তক নাড়িয়া কহিলেন, 'অবশ্য অবশ্য।'

সুরগুরু বৃহস্পতি কহিলেন, 'আর্য, শত্রুটাকে তত ডরাই না, কিন্তু মিত্রদের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়াছি। এতদিন আমরা ছিলাম মানুষের হৃদয়লোকে বিশ্বাসের স্বর্গধামে ; এখন তাহারা সায়ান্সের সহিত গোপনে সন্ধিস্থাপনপূর্বক সেখান হইতে নির্বাসিত করিয়া আমাদিগকে মাথার খুলির এক কোণে অত্যন্ত শুষ্ক সংকীর্ণ জায়গায় একটুখানি স্থান দিতে চায়। সেখানে একফোঁটা বিশ্বাসের অমৃত নাই। বলে, দেখো, তোমাদের কত গৌরব বাড়িল। ছিলে অজ্ঞানান্ধ হৃদয়গহ্বরে, এখন উঠিলে মস্তিষ্কঘৃতজ্বালিত জ্ঞানালোকিত মস্তকচূড়ায়। ভাগ্যে আমরা কয়জনা বুদ্ধিমান ছিলাম, নতুবা স্বর্গে মর্তে কোথাও তোমাদের স্থান হইত না। আমরা সকলের কাছে প্রমাণ করিয়াছি যে, তোমরা আর কোথাও যদি না থাক, নিদেন আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যে আছ। প্রতিবাদ করিয়া সেখান হইতে তোমাদিগকে বিচলিত করে এমন বুদ্ধিমান এখনো কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। বিষ্ণুর মীন কূর্ম বরাহ প্রভৃতি অবতারগুলিকে আমরা এভোল্যুশন থিওরি বলিয়া প্রচার করিয়াছি। দেবতাদের উদ্ধারের জন্য আমরা এত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি।

'ভগবন্, যথার্থ আন্তরিক ভক্তি কখনোই নিজের দেবতাকে লইয়া এরূপ ছেলে ভুলাইবার চেষ্টা করে না। দেব চতুরানন, এতকাল দেবতা ছিলাম, কেবল মাঝে মাঝে দৈত্যদের উপদ্রবে স্বর্গছাড়া হইয়াছি, কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদিগকে কেহ এভোল্যুশন থিওরি করিয়া দেয় নাই। প্রভু, তুমি যদি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাক তুমি জান আমরা কী, কিন্তু আজকাল তোমার অপেক্ষা যাহারা কিঞ্চিৎ বেশি শিখিয়াছে তাহাদের হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করো। বড়ো আশা দিয়াছিলে তোমার দেবতারা অমর, কিন্তু এইভাবে যদি কিছুদিন চলে, আমাদের মানববন্ধুরা যদি সাংঘাতিক স্নেহভরে আরো কিছুকাল আমাদের ব্যাখ্যা করিতে থাকেন, তবে সে আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে।'

বৃহস্পতির মুখে এই-সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা আর উত্তর করিতে পারিলেন না, চারিটি শুভ্র মস্তক নত করিয়া চিন্তিতভাবে বসিয়া রহিলেন।

তখন দেবতাগণ স্ব স্ব পদ সম্বন্ধে পরিবর্তন প্রার্থনা করিলেন। বিজ্ঞ দেবতা প্রজাপতি এবং বালক দেবতা কন্দর্প সুরসভায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'সকলেই জানেন, বিবাহ-ডিপার্টমেন্টে বহুকাল আমাদের কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব ছিল ; সেজন্য আমাদের কোনোরূপ নিয়মিত নৈবেদ্য অথবা উপরি-পাওনা ছিল না

বটে, কিন্তু কৌতুক যথেষ্ট ছিল। সম্প্রতি টাকা-নামক একটা চক্রমুখো হঠাৎ-দেবতা টঙ্কশালা হইতে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্রাকারে আবির্ভূত হইয়া একপ্রকার গায়ের জোরে আমাদের সে কাজ কাড়িয়া লইয়াছে। অতএব উক্ত ডিপার্ট্‌মেন্ট্ হইতে আমাদের নাম কাটিয়া আজ হইতে সেই প্রবলশক্তি নূতন দেবতার নাম বাহাল হউক।'

সর্বসম্মতিক্রমে তাহাই স্থির হইল।

তখন যম উঠিয়া কহিলেন, 'এতকাল আমিই নরলোকের সর্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ ছিলাম, কিন্তু এখন সেখানে আমা অপেক্ষা ভয় করে এমন-সকল প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে। অতএব, পুলিস-দারোগাকে আমার যমদণ্ড ছাড়িয়া দিয়া আমি অদ্য হইতে কাজে ইস্তফা দিতে চাই।'

অধিকাংশ দেবতার মতে যমরাজের প্রস্তাব নিতান্ত অসংগত না হইলেও ব্যাপারটা গুরুতর বিধায় আগামী মীটিঙে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আপাতত স্থগিত রহিল।

কার্তিকেয় উঠিয়া কহিলেন, 'গুরুদেবের বক্তৃতার পর আমাকে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না। আমি দেবসেনাপতি। কিন্তু দেবগণকে রক্ষা করা আমার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, অতএব, হয় আমার পোস্ট্ অ্যাবলিশ করিয়া এস্টাব্লিশ্‌মেন্ট্ কমানো হউক, নয় কোনো সাময়িক পত্রের সম্পাদকের উপর স্বর্গরক্ষাকার্যের ভার দেওয়া হউক। এমন-কি, আমার বহুকালের ময়ূরটিও আমি বিনা মূল্যে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। ইহার পেখম ছড়াইলে তাঁহাদের অনেকটা বিজ্ঞাপনের কাজ হইবে।'

দেবতাদের সম্মতিক্রমে সেনাপতির পোস্ট্ অ্যাবলিশ হইল, এখন হইতে ময়ূরের খোরাকি তাঁহার নিজের তহবিল হইতে পড়িবে।

বরুণ উঠিয়া অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া কহিলেন, 'নরলোকে আমার কি আর কোনো আবশ্যক আছে? খোলাভাঁটিবাহিনী বারুণী আমাকে উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করিয়াছে। এইবেলা মানে মানে সময় থাকিতে সরিতে ইচ্ছা করি।'

দেবতাগণ বহুল চিন্তা ও তর্কের পর স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ দেখিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, এখনো সময় হয় নাই। কারণ, এখনো সময়ে সময়ে বারুণীর প্রাখর্য নিবারণের জন্য দুর্বল মানব বরুণের সহায়তা প্রার্থনা করিয়া থাকে।

তখন ধর্ম বলিলেন, 'লোকাচারকে আমার অধীনস্থ কর্মচারী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সে তো আমার সঙ্গে পরামর্শমাত্র না করিয়া আপন ইচ্ছামত যাহা-তাহা করে, তবে সেই ছোঁড়াটাকেই সিংহাসন ছাড়িয়া দিলাম।' বায়ু কহিলেন, 'পৃথিবীতে এখন উনপঞ্চাশ দিকে উনপঞ্চাশ বায়ু বহিতেছে, চাই-কি, এখন আমি অবসর লইতে পারি।' আদিত্য কহিলেন, 'মানবসমাজে বিস্তর খদ্যোত উঠিয়াছে; তাহারা মনে করিতেছে, সূর্য না হইলেও আমরা একলা কাজ চালাইতে পারি। জগৎ আলোকিত করিবার ভার তাহাদের উপর দিয়া আমি অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি।' ভগবান চন্দ্রমা শুক্লপ্রতিপদের কৃশমূর্তি ধারণ করিয়া কহিলেন, 'নরলোকে কবিরা তাঁহাদের প্রেয়সীর পদনখরকে আমা অপেক্ষা দশগুণ প্রাধান্য দিয়া থাকেন, অতএব যে পর্যন্ত কবিরমণী-মহলে পাদুকার সম্পূর্ণ প্রচলন না হয় সে পর্যন্ত আমি অন্তঃপুরে যাপন করিতে চাই।' এমন-কি, ভোলানাথ শিব অর্ধনিমীলিত নেত্রে কহিলেন, 'আমা অপেক্ষা বেশি গাঁজা টানে পৃথিবীতে এমন লোকের তো অভাব নাই; সেই-সমস্ত সংস্কারকদিগের উপর আমার প্রলয়কার্যের ভার দিয়া আমি অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। এমন-কি, আমি নিশ্চয় জানি, আমার ভূতগুলারও কোনো আবশ্যক হইবে না।'

সর্বশেষে যখন শুভ্রবসনা অমলকমলাসনা সরস্বতী উঠিয়া বীণানিন্দিত মধুর স্বরে দেবসমাজে তাঁর নিবেদন আরম্ভ করিলেন, তখন দেবগণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন এবং মহেন্দ্রের সহস্র চক্ষের পল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল।

দেবী কহিলেন, 'অন্যান্য নানা কার্যের মধ্যে বালকদিগকে শিক্ষাদানের ভার এতদিন আমার উপর ছিল, কিন্তু সে কার্য আমি কিছুতেই চালাইতে পারিব না। আমি রমণী, আমার মাতৃহৃদয়ে শিশুদিগের

প্রতি কিছু দয়ামায়া আছে— তাহাদের পাঠের জন্য আজকাল যে-সকল পুস্তক নির্বাচিত হয় সে আমি কিছুতেই পড়াইতে পারিব না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং তাহাদের ক্ষুদ্র শক্তি ভাঙিয়া পড়ে। এ নিষ্ঠুর কার্য একজন বলিষ্ঠ পুরুষের প্রতি অর্পিত হইলেই ভালো হয়। অতএব সুরসভায় আমি সানুনয়ে প্রার্থনা করি, যমরাজের প্রতি উক্ত ভার দেওয়া হউক।'

যমরাজ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রতিবাদ করিলেন, 'আমার কোনো আবশ্যক নাই, কারণ, ইস্কুলের মাস্টার এবং ইন্‌স্পেক্টর আছে।'

শিশুশিক্ষা-বিভাগে যমরাজের বিশেষ নিয়োগ যে বাহুল্য এ সম্বন্ধে দেবতাদের কোনো মতভেদ রহিল না।

সাহিত্য

সাহিত্য

সাহিত্যের তাৎপর্য

বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর-একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে ; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত— তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানা ভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।

যেমন জঠরে জারকরস অনেকের পর্যাপ্তপরিমাণে না থাকাতে বাহিরের খাদ্যকে তাহারা ভালো করিয়া আপনার শরীরের জিনিস করিয়া লইতে পারে না তেমনি হৃদয়বৃত্তির জারকরস যাহারা পর্যাপ্তরূপে জগতে প্রয়োগ করিতে পারে না তাহারা বাহিরের জগৎটাকে অন্তরের জগৎ, আপনার জগৎ, মানুষের জগৎ করিয়া লইতে পারে না।

এক-একটি জড়প্রকৃতি লোক আছে জগতের খুব অল্প বিষয়েই যাহাদের হৃদয়ের ঔৎসুক্য, তাহারা জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধিকাংশ জগৎ হইতে বঞ্চিত। তাহাদের হৃদয়ের গবাক্ষগুলি সংখ্যায় অল্প এবং বিস্তৃতিতে সংকীর্ণ বলিয়া বিশ্বের মাঝখানে তাহারা প্রবাসী হইয়া আছে।

এমন সৌভাগ্যবান লোকও আছেন যাঁহাদের বিস্ময় প্রেম এবং কল্পনা সর্বত্র সজাগ, প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ ; লোকালয়ের নানা আন্দোলন তাঁহাদের চিত্তবীণাকে নানা রাগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে।

বাহিরের বিশ্ব ইঁহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রঙে, নানা ছাঁচে নানা রকম করিয়া তৈরি হইয়া উঠিতেছে।

ভাবুকের মনে এই জগৎটি বাহিরের জগতের চেয়ে মানুষের বেশি আপনার। তাহা হৃদয়ের সাহায্যে মানুষের হৃদয়ের পক্ষে বেশি সুগম হইয়া উঠে। তাহা আমাদের চিত্তের প্রভাবে যে বিশেষত্ব লাভ করে তাহাই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপাদেয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, বাহিরের জগতের সঙ্গে মানবের জগতের প্রভেদ আছে। কোন্‌টা সাদা, কোন্‌টা কালো, কোন্‌টা বড়ো, কোন্‌টা ছোটো, মানবের জগৎ সেই খবরটুকুমাত্র দেয় না। কোন্‌টা প্রিয়, কোন্‌টা অপ্রিয়, কোন্‌টা সুন্দর, কোন্‌টা অসুন্দর, কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, মানুষের জগৎ সেই কথাটা নানা সুরে বলে।

এই যে মানুষের জগৎ ইহা আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে বহিয়া আসিতেছে। এই প্রবাহ পুরাতন এবং নিত্যনূতন। নব নব ইন্দ্রিয় নব নব হৃদয়ের ভিতর দিয়া এই সনাতন স্রোত চিরদিনই নবীভূত হইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু ইহাকে পাওয়া যায় কেমন করিয়া ? ইহাকে ধরিয়া রাখা যায় কী উপায়ে ? এই অপরূপ মানস-জগৎকে রূপ দিয়া পুনর্বার বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারিলে ইহা চিরদিনই সৃষ্ট এবং চিরদিনই নষ্ট হইতে থাকে।

কিন্তু এ জিনিস নষ্ট হইতে চায় না। হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ।

সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি, দ্বিতীয়, তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।

সকল সময় এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেখানে থাকে সেখানেই সোনায় সোহাগা।

কবির কল্পনাসচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয় ততই তাঁহার রচনার গভীরতায় আমাদের পরিতৃপ্তি বাড়ে। ততই মানববিশ্বের সীমা বিস্তারিত হইয়া আমাদের চিরন্তন বিহারক্ষেত্র বিপুলতা লাভ করে।

কিন্তু রচনাশক্তির নৈপুণ্যও সাহিত্যে মহামূল্য। কারণ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে শক্তি প্রকাশিত হয় তাহা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ হইলেও এই শক্তিটি একেবারে নষ্ট হয় না। ইহা ভাষার মধ্যে সাহিত্যের মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহাতে মানবের প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। এই ক্ষমতাটি লাভের জন্য মানুষ চিরদিন ব্যাকুল। যে কৃতিগণের সাহায্যে মানুষের এই ক্ষমতা পরিপুষ্ট হইতে থাকে মানুষ তাঁহাদিগকে যশস্বী করিয়া ঋণশোধের চেষ্টা করে।

যে মানসজগৎ হৃদয়ভাবের উপকরণে অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করিবার উপায় কী?

তাহাকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে যাহাতে হৃদয়ের ভাব উদ্রিক্ত হয়।

হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করিতে সাজ-সরঞ্জাম অনেক লাগে।

পুরুষ-মানুষের আপিসের কাপড় সাদাসিধা ; তাহা যতই বাহুল্যবর্জিত হয় ততই কাজের উপযোগী হয়। মেয়েদের বেশভূষা, লজ্জাশরম ভাবভঙ্গি সমস্ত সভ্যসমাজেই প্রচলিত।

মেয়েদের কাজ হৃদয়ের কাজ। তাহাদিগকে হৃদয় দিতে হয় ও হৃদয় আকর্ষণ করিতে হয় ; এইজন্য তাহাদিগকে নিতান্ত সোজাসুজি, সাদাসিধা ছাঁটাছোঁটা হইলে চলে না। পুরুষদের যথাযথ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু মেয়েদের সুন্দর হওয়া চাই। পুরুষের ব্যবহার মোটের উপর সুস্পষ্ট হইলেই ভালো, কিন্তু মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ আভাস-ইঙ্গিত থাকা চাই।

সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের, রূপকের, ছন্দের, আভাসের, ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন-বিজ্ঞানের মতো নিরলংকার হইলে তাহার চলে না।

অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়। নারীর যেমন শ্রী এবং হ্রী সাহিত্যের অনির্বচনীয়তাটিও সেইরূপ। তাহা অনুকরণের অতীত। তাহা অলংকারকে অতিক্রম করিয়া উঠে, তাহা অলংকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না।

ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সংগীত।

কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই। উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। 'দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়' এই এক কথায় বলরামদাস কী না বলিয়াছেন? ব্যাকুল দৃষ্টির ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত হইবে? দৃষ্টি পাখির মতো উড়িয়া ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকুতে প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মুহূর্তে শান্তিলাভ করিয়াছে।

এ ছাড়া ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনোমতে বলিবার জো নাই এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য এই সংগীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সংগীতই সঞ্চার করিয়া দেয়।

অতএব চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।

কিন্তু কেবল মানুষের হৃদয়ই যে সাহিত্যে ধরিয়া রাখিবার জিনিস তাহা নহে। মানুষের চরিত্রও এমন একটি সৃষ্টি যাহা জড়সৃষ্টির ন্যায় আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আয়ত্তগম্য নহে। তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলে দাঁড়ায় না। তাহা মানুষের পক্ষে পরম ঔৎসুক্যজনক, কিন্তু তাহাকে পশুশালার পশুর মতো বাঁধিয়া খাঁচার মধ্যে পুরিয়া ঠাহর করিয়া দেখিবার সহজ উপায় নাই।

এই ধরাবাঁধার অতীত বিচিত্র মানবচরিত্র, সাহিত্য ইহাকেও অন্তরলোক হইতে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত

করিতে চায়। অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কারণ, মানবচরিত্র স্থির নহে সুসংগত নহে, তাহার অনেক অংশ, অনেক স্তর ; তাহার সদর-অন্দরে অবারিত গতিবিধি সহজ নয়। তা ছাড়া তাহার লীলা এত সূক্ষ্ম, এত অভাবনীয়, এত আকস্মিক যে, তাহাকে পূর্ণ আকারে আমাদের হৃদয়গম্য করা অসাধারণ ক্ষমতার কাজ। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন।

এইবার আমাদের সমস্ত আলোচ্য বিষয়কে এক কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র।

কিন্তু, মানবচরিত্র এটুকুও যেন বাহুল্য বলা হইল। বস্তুত বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।

ভগবানের আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে মানবচরিত্রের মধ্যে আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিতেছে। মানুষের হৃদয়ও সাহিত্যে আপনাকে সৃজন করিবার, ব্যক্ত করিবার, চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার অন্ত নাই, ইহা বিচিত্র। কবিগণ মানবহৃদয়ের এই চিরন্তন চেষ্টার উপলক্ষমাত্র।

ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত ; মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎসৃষ্টির আনন্দগীতের ঝংকার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে ; সেই-যে মানসসংগীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই-যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ। বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিণী বাজাইতেছে সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী। বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালোমন্দ তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, এই বাণীও তেমনি দেশে দেশে, ভাষায় ভাষায়, আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

অগ্রহায়ণ ১৩১০

সাহিত্যের সামগ্রী

একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে। অনেকে কবিত্ব করিয়া বলেন যে, পাখি যেমন নিজের উল্লাসেই গান করে, লেখকের রচনার উচ্ছ্বাসও সেইরূপ আত্মগত, পাঠকেরা যেন তাহা আড়ি পাতিয়া শুনিয়া থাকেন।

পাখির গানের মধ্যে পক্ষিসমাজের প্রতি যে কোনো লক্ষ নাই, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। না থাকে তো না'ই রহিল, তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা, কিন্তু লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠকসমাজ।

তা বলিয়াই যে সেটাকে কৃত্রিম বলিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। মাতার স্তন্য একমাত্র সন্তানের জন্য, তাই বলিয়াই তাহাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলিবার কোনো বাধা দেখি না।

নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জ্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মতো নীরব হইয়া থাকে তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কী আছে বা না আছে তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কথায় বলে 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ' ; ভাণ্ডারে কী জমা আছে তাহা আন্দাজে হিসাব করিয়া বাহিরের লোকের কোনো সুখ নাই, তাহাদের পক্ষে মিষ্টান্নটা হাতে হাতে পাওয়া আবশ্যক।

সাহিত্যে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসও সেইরকমের একটা কথা। রচনা রচয়িতার নিজের জন্য নহে ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে, এবং সেইটে ধরিয়া লইয়াই বিচার করিতে হইবে।

আমাদের মনের ভাবের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত

করিতে চায়। প্রকৃতিতে আমরা দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিকিয়া থাকিবার জন্য, প্রাণীদের মধ্যে সর্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। যে জীব সন্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে, তাহার জীবনের অধিকার তত বেশি বাড়িয়া যায়, নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে।

মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেই রকমের একটা চেষ্টা আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, প্রাণের অধিকার দেশে ও কালে, মনোভাবের অধিকার মনে এবং কালে। মনোভাবের চেষ্টা বহু কাল ধরিয়া বহু মনকে আয়ত্ত করা।

এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীন কাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত লিপি, কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই— কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কত তুলিতে, খোন্তায়, কলমে, কত আঁকজোক, কত প্রয়াস— বাঁ দিক হইতে ডাহিনে, ডাহিন দিক হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নীচে, এক সার হইতে অন্য সারে! কী? না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না; তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিবে। আমার বাড়িঘর, আমার আসবাব-পত্র, আমার শরীর-মন, আমার সুখদুঃখের সামগ্রী, সমস্তই যাইবে কেবল আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ করিয়াছি, তাহা চিরদিন মানুষের ভাবনা, মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝখানে বাঁচিয়া থাকিবে।

মধ্য-এশিয়ায় গোবি-মরুভূমির বালুকাস্তূপের মধ্য হইতে যখন বিলুপ্ত মানবসমাজের বিস্মৃত প্রাচীনকালের জীর্ণ পুঁথি বাহির হইয়া পড়ে তখন তাহার সেই অজানা ভাষার অপরিচিত অক্ষরগুলির মধ্যে কী একটি বেদনা প্রকাশ পায়! কোন্ কালের কোন্ সজীব চিত্তের চেষ্টা আজ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশলাভের জন্য আঁকুবাঁকু করিতেছে! যে লিখিয়াছিল সে নাই, যে লোকালয়ে লেখা হইয়াছিল তাহাও নাই; কিন্তু মানুষের মনের ভাবটুকু মানুষের সুখদুঃখের মধ্যে লালিত হইবার জন্য যুগ হইতে যুগান্তরে আসিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারিতেছে না, দুই বাহু বাড়াইয়া মুখের দিকে চাহিতেছে।

জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, পাহাড় কোনোকালে মরিবে না, সরিবে না; অনন্ত কালের পথের ধারে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নব নব যুগের পথিকদের কাছে এক কথা চিরদিন ধরিয়া আবৃত্তি করিতে থাকিবে। পাহাড়কে তিনি কথা কহিবার ভার দিয়াছিলেন।

পাহাড় কালাকালের কোনো বিচার না করিয়া তাঁহার ভাষা বহন করিয়া আসিয়াছে। কোথায় অশোক, কোথায় পাটলিপুত্র, কোথায় ধর্মজাগ্রত ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন! কিন্তু পাহাড় সেদিনকার সেই কথা-কয়টি বিস্মৃত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে। কতদিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে! অশোকের সেই মহাবাণীও কত শত বৎসর মানবহৃদয়কে বোবার মতো কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়াছে! পথ দিয়া রাজপুত গেল, পাঠান গেল, মোগল গেল, বর্গির তরবারি বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্রবেগে দিগ্‌দিগন্তে প্রলয়ের কশাঘাত করিয়া গেল— কেহ তাহার ইশারায় সাড়া দিল না। সমুদ্রপারের যে ক্ষুদ্র দ্বীপের কথা অশোক কখনো কল্পনাও করেন নাই, তাঁহার শিল্পীরা পাষাণফলকে যখন তাঁহার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিতেছিল, তখন যে দ্বীপের অরণ্যচারী 'দ্রুয়িদ'গণ আপনাদের পূজার আবেগ ভাষাহীন প্রস্তরস্তূপে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছিল, বহুসহস্র বৎসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটি বিদেশী আসিয়া কালান্তরের সেই মূক ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। রাজচক্রবর্তী অশোকের ইচ্ছা এত শতাব্দী পরে একটি বিদেশীর সাহায্যে সার্থকতা লাভ করিল। সে ইচ্ছা আর কিছুই নহে, তিনি যত বড়ো সম্রাটই হউন, তিনি কী চান কী না চান, তাঁহার কাছে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ, তাহা পথের পথিককেও জানাইতে হইবে। তাঁহার মনের ভাব এত যুগ ধরিয়া সকল মানুষের মনের আশ্রয় চাহিয়া পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। রাজচক্রবর্তীর

সেই একাগ্র আকাঙ্ক্ষার দিকে পথের লোক কেহ বা চাহিতেছে, কেহ বা না চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে।

তাই বলিয়া অশোকের অনুশাসনগুলিকে আমি যে সাহিত্য বলিতেছি তাহা নহে। উহাতে এইটুকু প্রমাণ হইতেছে, মানবহৃদয়ের একটা প্রধান আকাঙ্ক্ষা কী। আমরা যে মূর্তি গড়িতেছি, ছবি আঁকিতেছি, কবিতা লিখিতেছি, পাথরের মন্দির নির্মাণ করিতেছি, দেশে বিদেশে চিরকাল ধরিয়া অবিশ্রাম এই যে একটা চেষ্টা চলিতেছে, ইহা আর কিছুই নয়, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।

যাহা চিরকালীন মানুষের হৃদয়ে অমর হইতে চেষ্টা করে সাধারণত তাহা আমাদের ক্ষণকালীন প্রয়োজন ও চেষ্টা হইতে নানা প্রকারের পার্থক্য অবলম্বন করে। আমরা সাংবৎসরিক প্রয়োজনের জন্যই ধান যব গম প্রভৃতি ওষধির বীজ বপন করিয়া থাকি, কিন্তু অরণ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই যদি তবে বনস্পতির বীজ সংগ্রহ করিতে হয়।

সাহিত্যে সেই চিরস্থায়িত্বের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা। সেইজন্য দেশহিতৈষী সমালোচকেরা যতই উত্তেজনা করেন যে, সারবান সাহিত্যের অভাব হইতেছে, কেবল নাটক নভেল কাব্যে দেশ ছাইয়া যাইতেছে, তবু লেখকদের হুঁশ হয় না। কারণ, সারবান সাহিত্যে উপস্থিত প্রয়োজন মিটে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বেশি।

যাহা জ্ঞানের কথা তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া শেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কাল যাহা পণ্ডিতের অগম্য ছিল আজ তাহা অর্বাচীন বালকের কাছেও নূতন নহে। যে সত্য নূতন বেশে বিপ্লব আনয়ন করে সেই সত্য পুরাতন বেশে বিস্ময়মাত্র উদ্রেক করে না। আজ যে-সকল তত্ত্ব মূঢ়ের নিকটে পরিচিত কোনোকালে যে তাহা পণ্ডিতের নিকটেও বিস্তর বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই লোকের কাছে আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়।— কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না।

জ্ঞানের কথা একবার জানিলে আর জানিতে হয় না। আগুন গরম, সূর্য গোল, জল তরল, ইহা একবার জানিলেই চুকিয়া যায় ; দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাহা আমাদের নূতন শিক্ষার মতো জানাইতে আসে তবে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়। কিন্তু ভাবের কথা বারবার অনুভব করিয়া শ্রান্তিবোধ হয় না। সূর্য যে পূর্ব দিকে ওঠে এ কথা আর আমাদের মন আকর্ষণ করে না ; কিন্তু সূর্যোদয়ের যে সৌন্দর্য ও আনন্দ তাহা জীবসৃষ্টির পর হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে অম্লান আছে। এমন-কি, অনুভূতি যত প্রাচীন কাল হইতে যত লোকপরম্পরার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসে ততই তাহার গভীরতা বৃদ্ধি হয়, ততই তাহা আমাদিগকে সহজে আবিষ্ট করিতে পারে।

অতএব চিরকাল যদি মানুষ আপনার কোনো জিনিস মানুষের কাছে উজ্জ্বল নবীন ভাবে অমর করিয়া রাখিতে চায় তবে তাহাকে ভাবের কথাই আশ্রয় করিতে হয়। এইজন্য সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।

তাহা ছাড়া যাহা জ্ঞানের জিনিস তাহা এক ভাষা হইতে আর-এক ভাষায় স্থানান্তর করা চলে। মূল রচনা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া অন্য রচনার মধ্যে নিবিষ্ট করিলে অনেক সময় তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। তাহার বিষয়টি লইয়া নানা লোকে নানা ভাষায় নানা রকম করিয়া প্রচার করিতে পারে ; এইরূপেই তাহার উদ্দেশ্য যথার্থভাবে সফল হইয়া থাকে।

কিন্তু ভাবের বিষয়সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাহা যে মূর্তিকে আশ্রয় করে তাহা হইতে আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়। তাহার জন্য নানাপ্রকার আভাস-ইঙ্গিত, নানাপ্রকার ছলাকলার দরকার হয়। তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলেই হয় না, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়।

এই কলাকৌশলপূর্ণ রচনা ভাবের দেহের মতো। এই দেহের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যকারের পরিচয়। এই দেহের প্রকৃতি ও গঠন -অনুসারেই তাহার আশ্রিত ভাব মানুষের কাছে আদর পায়, ইহার

শক্তি-অনুসারেই তাহা হৃদয়ে ও কালে ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে।

প্রাণের জিনিস দেহের উপরে একান্ত নির্ভর করিয়া থাকে। জলের মতো তাহাকে এক পাত্র হইতে আর-এক পাত্রে ঢালা যায় না। দেহ এবং প্রাণ পরস্পর পরস্পরকে গৌরবান্বিত করিয়া একাত্ম হইয়া বিরাজ করে।

ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মানুষের। তাহা একজন যদি বাহির না করে তো কালক্রমে আর-একজন বাহির করিবে। কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। তাহা একজনের যেমন হইবে আর-একজনের তেমন হইবে না। সেইজন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে; ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।

অবশ্য, রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিতভাবে বুঝায়; কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।

দিঘি বলিতে জল এবং খনন-করা আধার দুই একসঙ্গে বুঝায়। কিন্তু কীর্তি কোন্‌টা? জল মানুষের সৃষ্টি নহে— তাহা চিরন্তন। সেই জলকে বিশেষভাবে সর্বসাধারণের ভোগের জন্য সুদীর্ঘকাল রক্ষা করিবার যে উপায় তাহাই কীর্তিমান মানুষের নিজের। ভাব সেইরূপ মনুষ্যসাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্তিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায়-রচনাই লেখকের কীর্তি।

অতএব দেখিতেছি, ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা। অঙ্গার-জিনিসটা জলে স্থলে বাতাসে নানা পদার্থে সাধারণভাবে সাধারণের আছে; গাছপালা তাহাকে নিগূঢ় শক্তিবলে বিশেষ আকারে প্রথমত নিজের করিয়া লয়, এবং সেই উপায়েই তাহা সুদীর্ঘকাল বিশেষভাবে সর্বসাধারণের ভোগের দ্রব্য হইয়া উঠে। শুধু যে তাহা আহার এবং উত্তাপের কাজে লাগে তাহা নহে; তাহা হইতে সৌন্দর্য, ছায়া, স্বাস্থ্য বিকীর্ণ হইতে থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে, সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

তা যদি হয় তবে জ্ঞানের জিনিস সাহিত্য হইতে আপনি বাদ পড়িয়া যায়। কারণ, ইংরেজিতে যাহাকে ট্রুথ বলে এবং বাংলাতে যাহাকে আমরা সত্য নাম দিয়াছি অর্থাৎ যাহা আমাদের বুদ্ধির অধিগম্য বিষয়, তাহাকে ব্যক্তিবিশেষের নিজত্ববর্জিত করিয়া তোলাই একান্ত দরকার। সত্য সর্বাংশেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ, শুভ্রনিরঞ্জন। মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আমার কাছে একরূপ, অন্যের কাছে অন্যরূপ নহে। তাহার উপরে বিচিত্র হৃদয়ের নূতন নূতন রঙের ছায়া পড়িবার জো নাই।

যে-সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর রঙ ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে প্রকারে, ভাবে ভাষায়, সুরে ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচিতে পারে; তাহা মানুষের একান্ত আপনার; তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি। সুতরাং তাহা একবার প্রকাশিত হইয়া উঠিলে তাহার রূপান্তর অবস্থান্তর করা চলে না; তাহার প্রত্যেক অংশের উপরে তাহার সমগ্রতা একান্তভাবে নির্ভর করে। যেখানে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায় সেখানে সাহিত্য-অংশে তাহা হেয়।

সাহিত্যের বিচারক

ঘরে বসিয়া আনন্দে যখন হাসি এবং দুঃখে যখন কাঁদি তখন এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, আরো একটু বেশি করিয়া হাসা দরকার বা কান্নাটা ওজনে কম পড়িয়াছে। কিন্তু পরের কাছে যখন আনন্দ বা দুঃখ দেখানো আবশ্যক হইয়া পড়ে তখন মনের ভাবটা সত্য হইলেও বাহিরের প্রকাশটা সম্পূর্ণ তাহার অনুযায়ী না হইতে পারে।

এমন-কি, মা'ও যখন সশব্দ বিলাপে পল্লীর নিদ্রাতন্দ্রা দূর করিয়া দেয় তখন সে যে শুদ্ধমাত্র পুত্রশোক প্রকাশ করে তাহা নয়, পুত্রশোকের গৌরব প্রকাশ করিতেও চায়। নিজের কাছে দুঃখসুখ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় না ; পরের কাছে তাহা প্রমাণ করিতে হয়। সুতরাং শোকপ্রকাশের জন্য যেটুকু কান্না স্বাভাবিক শোকপ্রমাণের জন্য তাহার চেয়ে সুর চড়াইয়া না দিলে চলে না।

ইহাকে কৃত্রিমতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে অন্যায় হইবে। শোকপ্রমাণ শোকপ্রকাশের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ। আমার ছেলের মূল্য যে কেবল আমারই কাছে বেশি, তাহার বিচ্ছেদ যে কতখানি মর্মান্তিক ব্যাপার তাহা পৃথিবীর আর কেহই যে বুঝিবে না, তাহার অভাবসত্ত্বেও পৃথিবীর আর-সকলেই যে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দচিত্তে আহার-নিদ্রা ও আপিস-যাতায়াতে প্রবৃত্ত থাকিবে, শোকাতুর মাতাকে তাহার পুত্রের প্রতি জগতের এই অবজ্ঞা আঘাত করিতে থাকে। তখন সে নিজের শোকের প্রবলতার দ্বারা এই ক্ষতির প্রাচুর্যকে বিশ্বের কাছে ঘোষণা করিয়া তাহার পুত্রকে যেন গৌরবান্বিত করিতে চায়।

যে অংশে শোক নিজের সে অংশে তাহার একটি স্বাভাবিক সংযম থাকে, যে অংশে তাহা পরের কাছে ঘোষণা তাহা অনেক সময়েই সংগতির সীমা লঙ্ঘন করে। পরের অসাড় চিত্তকে নিজের শোকের দ্বারা বিচলিত করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছায় তাহার চেষ্টা অস্বাভাবিক উদ্যম অবলম্বন করে।

কেবল শোক নহে, আমাদের অধিকাংশ হৃদয়ভাবেরই এই দুইটা দিকই আছে ; একটা নিজের জন্য, একটা পরের জন্য। আমার হৃদয়ভাবকে সাধারণের হৃদয়ভাব করিতে পারিলে তাহার একটা সান্ত্বনা একটা গৌরব আছে। 'আমি যাহাতে বিচলিত তুমি উহাতে উদাসীন' ইহা আমাদের কাছে ভালো লাগে না।

কারণ, নানা লোকের কাছে প্রমাণিত না হইলে সত্যতার প্রতিষ্ঠা হয় না। আমিই যদি আকাশকে হলদে দেখি, আর দশজনে না দেখে, তবে তাহাতে আমার ব্যাধিই সপ্রমাণ হয়। সেটা আমারই দুর্বলতা।

আমার হৃদয়বেদনায় পৃথিবীর যত বেশি লোক সমবেদনা অনুভব করিবে ততই তাহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি যাহা একান্তভাবে অনুভব করিতেছি তাহা যে আমার দুর্বলতা, আমার ব্যাধি, আমার পাগলামি নহে, তাহা যে সত্য, তাহা সর্বসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে প্রমাণিত করিয়া আমি বিশেষভাবে সান্ত্বনা ও সুখ পাই।

যাহা নীল তাহা দশজনের কাছে নীল বলিয়া প্রচার করা কঠিন নহে ; কিন্তু যাহা আমার কাছে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, তাহা দশজনের কাছে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া প্রতীত করা দুরূহ। সে অবস্থায় নিজের ভাবকে কেবলমাত্র প্রকাশ করিয়াই খালাস পাওয়া যায় না ; নিজের ভাবকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয় যাহাতে পরের কাছেও তাহা যথার্থ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে।

সুতরাং এইখানেই বাড়াবাড়ি হইবার সম্ভাবনা। দূর হইতে যে জিনিসটা দেখাইতে হয় তাহা কতকটা বড়ো করিয়া দেখানো আবশ্যক। সেটুকু বড়ো সত্যের অনুরোধেই করিতে হয়। নহিলে জিনিসটা যে-পরিমাণে ছোটো দেখায় সেই পরিমাণেই মিথ্যা দেখায়। বড়ো করিয়াই তাহাকে সত্য করিতে হয়।

আমার সুখদুঃখ আমার কাছে অব্যবহিত, তোমার কাছে তাহা অব্যবহিত নয়। আমি হইতে তুমি দূরে আছ। সেই দূরত্বটুকু হিসাব করিয়া আমার কথা তোমার কাছে কিছু বড়ো করিয়াই বলিতে হয়।

সত্যরক্ষাপূর্বক এই বড়ো করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক তেমনি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে।

কারণ, প্রকৃতিতে যাহা দেখি তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায় তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।

প্রাকৃত-সত্যে এবং সাহিত্য-সত্যে এইখানেই তফাত আরম্ভ হয়। সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে প্রাকৃত মা তেমন করিয়া কাঁদে না। তাই বলিয়া সাহিত্যের মা'র কান্না মিথ্যা নহে। প্রথমত, প্রাকৃত

রোদন এমন প্রত্যক্ষ যে তাহার বেদনা আকারে ইঙ্গিতে কণ্ঠস্বরে চারি দিকের দৃশ্যে এবং শোকঘটনার নিশ্চয় প্রমাণে আমাদের প্রতীতি ও সমবেদনা উদ্রেক করিয়া দিতে বিলম্ব করে না। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃত মা আপনার শোক সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারে না, সে ক্ষমতা তাহার নাই, সে অবস্থাও তাহার নয়।

এইজন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। অতএব এ স্থলে একটি অপরটির আরশি হইয়া কোনো কাজ করিতে পারে না।

এই প্রত্যক্ষতার অভাববশত সাহিত্যে ছন্দোবন্ধ-ভাষাভঙ্গির নানাপ্রকার কল-বল আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠে।

এখানে 'অধিকতর সত্য' এই কথাটা ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য আছে। মানুষের ভাবসম্বন্ধে প্রাকৃত সত্য জড়িত-মিশ্রিত, ভগ্নখণ্ড, ক্ষণস্থায়ী। সংসারের ঢেউ ক্রমাগতই ওঠাপড়া করিতেছে, দেখিতে দেখিতে একটার ঘাড়ে আর-একটা আসিয়া পড়িতেছে, তাহার মধ্যে প্রধান-অপ্রধানের বিচার নাই— তুচ্ছ ও অসামান্য গায়ে-গায়ে ঠেলাঠেলি করিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতির এই বিরাট রঙ্গশালায় যখন মানুষের ভাবাভিনয় আমরা দেখি তখন আমরা স্বভাবতই অনেক বাদসাদ দিয়া বাছিয়া লইয়া, আন্দাজের দ্বারা অনেকটা ভর্তি করিয়া, কল্পনার দ্বারা অনেকটা গড়িয়া তুলিয়া থাকি। আমাদের একজন পরমাত্মীয়ও তাঁহার সমস্তটা লইয়া আমাদের কাছে পরিচিত নহেন। আমাদের স্মৃতি নিপুণ সাহিত্যরচয়িতার মতো তাঁহার অধিকাংশই বাদ দিয়া ফেলে। তাঁহার ছোটোবড়ো সমস্ত অংশই যদি ঠিক সমান অপক্ষপাতের সহিত আমাদের স্মৃতি অধিকার করিয়া থাকে তবে এই স্তূপের মধ্যে আসল চেহারাটি মারা পড়ে ও সবটা রক্ষা করিতে গেলে আমাদের পরমাত্মীয়কে আমরা যথার্থভাবে দেখিতে পাই না। পরিচয়ের অর্থই এই যে, যাহা বর্জন করিবার তাহা বর্জন করিয়া যাহা গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ করা।

একটু বাড়াইতেও হয়। আমাদের পরমাত্মীয়কেও আমরা মোটের উপরে অল্পই দেখিয়া থাকি। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ আমাদের অগোচর। আমরা তাঁহার ছায়া নহি, আমরা তাঁহার অন্তর্যামীও নই। তাঁহার অনেকখানিই যে আমরা দেখিতে পাই না, সেই শূন্যতার উপরে আমাদের কল্পনা কাজ করে। ফাঁকগুলি পুরাইয়া লইয়া আমরা মনের মধ্যে একটা পূর্ণ ছবি আঁকিয়া তুলি। যে লোকের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা খেলে না, যাহার ফাঁক আমাদের কাছে ফাঁক থাকিয়া যায়, যাহার প্রত্যক্ষগোচর অংশই আমাদের কাছে বর্তমান, অপ্রত্যক্ষ অংশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট অগোচর, তাহাকে আমরা জানি না, অল্পই জানি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই এইরূপ আমাদের কাছে ছায়া, আমাদের কাছে অসত্যপ্রায়। তাহাদের অনেককেই আমরা উকিল বলিয়া জানি, ডাক্তার বলিয়া জানি, দোকানদার বলিয়া জানি— মানুষ বলিয়া জানি না। অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে যে বহির্বিষয়ে তাহাদের সংস্রব সেইটেকেই সর্বাপেক্ষা বড়ো করিয়া জানি ; তাহাদের মধ্যে তদপেক্ষা বড়ো যাহা আছে তাহা আমাদের কাছে কোনো আমল পায় না।

সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায় তাহা সম্পূর্ণরূপে জানায় ; অর্থাৎ স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটোকে ছোটো করিয়া, বড়োকে বড়ো করিয়া, ফাঁককে ভরাট করিয়া, আলগাকে জমাট করিয়া দাঁড় করায়। প্রকৃতির অপক্ষপাত প্রাচুর্যের মধ্যে মন যাহা করিতে চায় সাহিত্য তাহাই করিতে থাকে। মন প্রকৃতির আরশি নহে, সাহিত্যও প্রকৃতির আরশি নহে। মন প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক করিয়া লয় ; সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।

দুয়ের কার্যপ্রণালী প্রায় একই রকম। কেবল দুয়ের মধ্যে কয়েকটা বিশেষ কারণে তফাত ঘটিয়াছে। মন যাহা গড়িয়া তোলে তাহা নিজের আবশ্যকের জন্য, সাহিত্য যাহা গড়িয়া তোলে তাহা সকলের আনন্দের জন্য। নিজের জন্য একটা মোটামুটি নোট করিয়া রাখিলেও চলে, সকলের জন্য

আগাগোড়া সুসম্বদ্ধ করিয়া তুলিতে হয় এবং তাহাকে এমন জায়গায় এমন আলোকে এমন করিয়া ধরিতে হয় যাহাতে সম্পূর্ণভাবে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। মন সাধারণত প্রকৃতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করে, সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সঞ্চয় করে। মনের জিনিসকে বাহিরে ফলাইয়া তুলিতে গেলে বিশেষভাবে সৃজন শক্তির আবশ্যক হয়। এইরূপে প্রকৃতি হইতে মনে ও মন হইতে সাহিত্যে যাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠে তাহা অনুকরণ হইতে বহুদূরবর্তী।

প্রকৃত সাহিত্যে আমরা আমাদের কল্পনাকে, আমাদের সুখদুঃখকে, শুদ্ধ বর্তমান কাল নহে চিরন্তন কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। সুতরাং সেই সুবিশাল প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রের সহিত তাহার পরিমাণসামঞ্জস্য করিতে হয়। ক্ষণকালের মধ্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে যখন চিরকালের জন্য গড়িয়া তোলা যায় তখন ক্ষণকালের মাপ-কাঠি লইয়া কাজ চলে না। এই কারণে প্রচলিত কালের সহিত, সংকীর্ণ সংসারের সহিত, উচ্চসাহিত্যের পরিমাণের প্রভেদ থাকিয়া যায়।

অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

জগতের সহিত মনের যে সম্বন্ধ মনের সহিত সাহিত্যকারের প্রতিভার সেই সম্বন্ধ। এই প্রতিভাকে বিশ্বমানবমন নাম দিলে ক্ষতি নাই। জগৎ হইতে মন আপনার জিনিস সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশ্বমানবমন পুনশ্চ নিজের জিনিস নির্বাচন করিয়া নিজের জন্য গড়িয়া লইতেছে।

বুঝিতেছি কথাটা বেশ ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে। আর-একটু পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। কৃতকার্য হইব কি না জানি না।

আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে দুইটা অংশের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। একটা অংশ আমার নিজত্ব, আর-একটা অংশ আমার মানবত্ব। আমার ঘরটা যদি সচেতন হইত তবে সে নিজের ভিতরকার খণ্ডাকাশ ও তাহারই সহিত পরিব্যাপ্ত মহাকাশ এই দুটাকে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিত। আমাদের ভিতরকার নিজত্ব ও মানবত্ব সেই প্রকার। যদি দুয়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য দেয়াল তোলা থাকে তবে আত্মা অন্ধকূপের মধ্যে বাস করে।

প্রকৃত সাহিত্যকারের অন্তঃকরণে যদি তাহার নিজত্ব ও মানবত্বের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে তবে তাহা কল্পনার কাচের শার্সির স্বচ্ছ ব্যবধান। তাহার মধ্য দিয়া পরস্পরের চেনা-পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে না। এমন-কি, এই কাচ দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের কাচের কাজ করিয়া থাকে; ইহা অদৃশ্যকে দৃশ্য, দূরকে নিকট করে।

সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্তা। লেখকের নিজত্বকে সে আপনার করিয়া লয়, ক্ষণিককে সে অমর করিয়া তোলে, খণ্ডকে সে সম্পূর্ণতা দান করে।

জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা— সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।

পূর্বেই বলিয়াছি, মনোরাজ্যের কথা আসিয়া পড়িলে সত্যতা বিচার করা কঠিন হইয়া পড়ে। কালোকে কালো প্রমাণ করা সহজ, কারণ অধিকাংশের কাছেই তাহা নিশ্চয় কালো; কিন্তু ভালোকে ভালো প্রমাণ করা তেমন সহজ নহে; কারণ এখানে অধিকাংশের একমত সাক্ষ্য সংগ্রহ করা কঠিন।

এখানে অনেকগুলি মুশকিলের কথা আসিয়া পড়ে। অধিকাংশের কাছেই যাহা ভালো তাহাই কি সত্য ভালো, না, বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছে যাহা ভালো, তাহাই সত্য ভালো?

যদি বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবে প্রাকৃতবস্তুসম্বন্ধে এ কথা নিশ্চয় বলিতে হয় যে, অধিকাংশের কাছে যাহা কালো তাহাই সত্য কালো। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, এ সম্বন্ধে মতভেদের সম্ভাবনা এত অল্প যে অধিক সাক্ষ্য সংগ্রহ করিবার কোনো প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু ভালো যে ভালোই এবং কত ভালো তাহা লইয়া মতের এত অনৈক্য ঘটিয়া থাকে যে, সে সম্বন্ধে কিরূপ সাক্ষ্য লওয়া উচিত তাহা স্থির করা কঠিন হয়।

বিশেষ কঠিন এইজন্য, সাহিত্যকারদের শ্রেষ্ঠ চেষ্টা কেবল বর্তমান কালের জন্য নহে। চিরকালের

মনুষ্যসমাজই তাঁহাদের লক্ষ্য। যাহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের জন্য লিখিত তাহার অধিকাংশ সাক্ষী ও বিচারক বর্তমান কাল হইতে কেমন করিয়া মিলিবে?

ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহা তৎসাময়িক ও তৎস্থানিক তাহাই অধিকাংশ লোকের কাছে সর্বপ্রধান আসন অধিকার করে। কোনো-একটি বিশেষ সময়ের সাক্ষী-সংখ্যা গণনা করিয়া সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে অবিচার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এইজন্য বর্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া সর্বকালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষ্যনিবেশ করিতে হয়।

কালে কালে মানুষের বিচিত্র শিক্ষা ভাব ও অবস্থার পরিবর্তন-সত্ত্বেও যে-সকল রচনা আপন মহিমা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে তাহাদেরই অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেছে। মন আমাদের সহজগোচর নয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে অবিশ্রাম গতির মধ্যে তাহার নিত্যানিত্য সংগ্রহ করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। এইজন্য সুবিপুল কালের পরিদর্শনশালার মধ্যেই মানুষের মানসিক বস্তুর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়; ইহা ছাড়া নিশ্চয় অবধারণের চূড়ান্ত উপায় নাই।

কিন্তু কাজ চলিবার মতো উপায় না থাকিলে সাহিত্যে অরাজকতা উপস্থিত হইত। হাইকোর্টের আপিল-আদালতে যে জজ-আদালতের সমস্ত বিচারই পর্যস্ত হইয়া যায় তাহা নহে। সাহিত্যেও সেইরূপ জজ-আদালতের কাজ বন্ধ থাকিতে পারে না। আপিলের শেষমীমাংসা অতিদীর্ঘ-কালসাপেক্ষ; ততক্ষণ মোটামুটি বিচার একরকম পাওয়া যায় এবং অবিচার পাইলেও উপায় নাই।

যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক-একজনের প্রতিভা সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে, সর্বকালের আসন অধিকার করে, তেমনি বিচারের প্রতিভাও আছে; এক-একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সংকীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন; স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।

আবার ব্যাবসাদার বিচারকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বতপ্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জনগর্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে; অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময়েই গাড়িজুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়াই ভোলে। কিন্তু বীণাপাণির অনেক অন্তঃপুরচারী আত্মীয় বিরলবেশে দীনের মতো মা'র কাছে যায় এবং তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করেন। তাহারা কখনো-কখনো তাঁহার শুভ্র অঞ্চলে কিছু-কিছু ধূলিক্ষেপও করে; তিনি তাহা হাসিয়া ঝাড়িয়া ফেলেন। এই-সমস্ত ধুলামাটি সত্ত্বেও দেবী যাহাদিগকে আপনার বলিয়া কোলে তুলিয়া লন দেউড়ির দরোয়ানগুলা তাহাদিগকে চিনিবে কোন্ লক্ষণ দেখিয়া? তাহারা পোশাক চেনে, তাহারা মানুষ চেনে না। তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের উপর নাই। সারস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার ভার যাঁহাদের উপরে আছে তাঁহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান; তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্যাদা বোঝেন।

আশ্বিন ১৩১০

সৌন্দর্যবোধ

প্রথম-বয়সে ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া নিয়মে সংযমে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ভারতবর্ষের এই প্রাচীন উপদেশের কথা তুলিতে গেলে অনেকের মনে এই তর্ক উঠিবে, এ যে বড়ো কঠোর সাধনা। ইহার দ্বারা নাহয় খুব একটা শক্ত মানুষ তৈরি করিয়া তুলিলে, নাহয় বাসনার দড়িদড়া ছিঁড়িয়া মস্ত একজন সাধুপুরুষ হইয়া উঠিলে, কিন্তু এ সাধনায় রসের স্থান কোথায়? কোথায় গেল সাহিত্য, চিত্র, সংগীত? মানুষকে যদি পুরা করিয়া তুলিতে হয় তবে সৌন্দর্যচর্চাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না।

এ তো ঠিক কথা। সৌন্দর্য তো চাই। আত্মহত্যা তো সাধনার বিষয় হইতে পারে না, আত্মার বিকাশই সাধনার লক্ষ্য। বস্তুত শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্যপালন শুষ্কতার সাধনা নয়। ক্ষেত্রকে মরুভূমি করিয়া তুলিবার জন্য চাষা খাটিয়া মরে না। চাষা যখন লাঙল দিয়া মাটি বিদীর্ণ করে, মই দিয়া ঢেলা দলিয়া গুঁড়া করিতে থাকে, নিড়ানি দিয়া সমস্ত ঘাস ও গুল্ম উপড়াইয়া ক্ষেত্রটাকে একেবারে শূন্য করিয়া ফেলে, তখন আনাড়ি লোকের মনে হইতে পারে, জমিটার উপর উৎপীড়ন চলিতেছে। কিন্তু এমনি করিয়াই ফল ফলাইতে হয়। তেমনি যথার্থভাবে রসগ্রহণের অধিকারী হইতে গেলে গোড়ায় কঠিন চাষেরই দরকার। রসের পথেই পথ ভুলাইবার অনেক উপসর্গ আছে। সে পথে সমস্ত বিপদ এড়াইয়া পূর্ণতালাভ করিতে যে চায় নিয়মসংযম তাহারই বেশি আবশ্যক। রসের জন্যই এই নীরসতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, উপলক্ষের দ্বারা লক্ষ্য প্রায়ই চাপা পড়ে ; সে গান শিখিতে চায়, ওস্তাদি শিখিয়া বসে ; ধনী হইতে চায়, টাকা জমাইয়া কৃপাপাত্র হইয়া ওঠে ; দেশের হিত চায়, কমিটিতে রেজোল্যুশন পাস করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

তেমনি নিয়ম-সংযমটাই চরম লক্ষ্যের সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বসিয়া আছে, এ আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। নিয়মটাকেই যাহারা লাভ যাহারা পুণ্য মনে করে, তাহারা নিয়মের লোভে একেবারে লুব্ধ হইয়া উঠে। নিয়মলোলুপতা ষড়্‌রিপুর জায়গায় সপ্তম রিপু হইয়া দেখা দেয়।

এটা মানুষের জড়ত্বের একটা লক্ষণ। সঞ্চয় করিতে শুরু করিলে মানুষ আর থামিতে চায় না। বিলাতের কথা শুনিতে পাই, সেখানে কত লোক পাগলের মতো কেবল দেশ-বিদেশের ছাপ-মারা ডাকের টিকিট সংগ্রহ করিতেছে, সেজন্য সন্ধানের এবং খরচের অন্ত নাই। এইরূপ সংগ্রহবায়ুদ্বারা খেপিয়া উঠিয়া কেহ বা চিনের বাসন, কেহ বা পুরাতন জুতা সংগ্রহ করিয়া মরিতেছে। উত্তরমেরুর ঠিক কেন্দ্রস্থানটিতে গিয়া কোনোমতে একটা ধ্বজা পুঁতিয়া আসিতে হইবে, সেও এমনি একটা ব্যাপার। সেখানে বরফের ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু নাই, কিন্তু মন নিবৃত্ত হইতেছে না— কে সেই মেরুমরুর কেন্দ্রবিন্দুটির কত মাইল কাছে যাইতেছে তাহারই অঙ্কপাতের নেশা পাইয়া বসিয়াছে। পাহাড়ে যে যত ফুট উচ্চে উঠিয়াছে সে ততটাকেই একটা লাভ বলিয়া গণ্য করিতেছে ; এই শূন্য লাভের জন্য নিজে মরিতেছে এবং কত অনিচ্ছুক মজুরদিগকে জোর করিয়া মারিতেছে, তবু থামিতে চাহিতেছে না।

অপব্যয় এবং ক্লেশ যতই বেশি প্রয়োজনহীন সঞ্চয় ও পরিণামহীন জয়লাভের গৌরবও তত বেশি বলিয়া বোধ হয়। নিয়মসাধনার লোভও ক্লেশের পরিমাণ খতাইয়া আনন্দভোগ করে। কঠিন শয্যায় শুইয়া যদি শুরু করা যায় তবে মাটিতে বিছানা পাতিয়া, পরে একখানিমাত্র কম্বল বিছাইয়া, পরে কম্বল ছাড়িয়া শুধু মাটিতে শুইবার লোভ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে থাকে। কৃচ্ছ্রসাধনটাকেই লাভ মনে করিয়া শেষকালে আত্মঘাতে আসিয়া দাঁড়ি টানিতে হয়। ইহা আর-কিছু নয়, নিবৃত্তিকেই একটা প্রচণ্ড প্রবৃত্তি করিয়া তোলা, গলার ফাঁস ছিঁড়িবার চেষ্টাতেই গলায় ফাঁস আঁটিয়া মরা।

অতএব কেবলমাত্র নিয়ম পালন করাটাকেই যদি লোভের জিনিস করিয়া তোলা যায়, তবে কঠোরতার চাপ কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়া স্বভাব হইতে সৌন্দর্যবোধকে একেবারে পিষিয়া বাহির করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ণতালাভের প্রতিই লক্ষ রাখিয়া সংযমচর্চাকেও যদি ঠিকমত সংযত করিয়া রাখিতে পারি তবে মনুষ্যত্বের কোনো উপাদানই আঘাত পায় না, বরঞ্চ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

কথাটা এই যে, ভিত-মাত্রই শক্ত হইয়া থাকে, না হইলে তাহা আশ্রয় দিতে পারে না। যা-কিছু ধারণ করিয়া থাকে, যাহা আকৃতিদান করে, তাহা কঠিন। মানুষের শরীর যতই নরম হোক-না কেন, যদি শক্ত হাড়ের উপরে তাহার পত্তন না হইত তবে সে একটা পিণ্ড হইয়া থাকিত, তাহার চেহারা খুলিতই না। তেমনি জ্ঞানের ভিত্তিটাও শক্ত, আনন্দের ভিত্তিটাও শক্ত। জ্ঞানের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত তবে তো সে কেবল খাপছাড়া স্বপ্ন হইত, আর আনন্দের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত তবে তাহা

নিতান্তই পাগলামি মাতলামি হইয়া উঠিত।

এই-যে শক্ত ভিত্তি ইহাই সংযম। ইহার মধ্যে বিচার আছে, বল আছে, ত্যাগ আছে ; ইহার মধ্যে নির্মম দৃঢ়তা আছে। ইহা দেবতার মতো এক হাতে বর দেয়, আর-এক হাতে সংহার করে। এই সংযম গড়িবার বেলাও যেমন দৃঢ় ভাঙিবার বেলাও তেমনি কঠিন। সৌন্দর্যকে পুরামাত্রায় ভোগ করিতে গেলে এই সংযমের প্রয়োজন ; নতুবা প্রবৃত্তি অসংযত থাকিলে শিশু ভাতের থালা লইয়া যেমন অন্নব্যঞ্জন কেবল গায়ে মাখিয়া মাটিতে ছড়াইয়া বিপরীত কাণ্ড করিয়া তোলে, অথচ অল্পই তাহার পেটে যায়, ভোগের সামগ্রী লইয়া আমাদের সেই দশা হয় ; আমরা কেবল তাহা গায়েই মাখি, লাভ করিতে পারি না।

সৌন্দর্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নহে। সমস্ত ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া কেহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় না। একটুতেই আগুন হাতের বাহির হইয়া যায় বলিয়াই ঘর আলো করিতে আগুনের উপরে দখল রাখা চাই। প্রবৃত্তি-সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। প্রবৃত্তিকে যদি একেবারে পুরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দিই তবে যে সৌন্দর্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া তবে সে ছাড়ে ; ফুলকে তুলিতে গিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ধুলায় লুটাইয়া দেয়।

এ কথা সত্য, সংসারে আমাদের ক্ষুধিত প্রবৃত্তি যেখানে পাত পাড়িয়া বসে তাহার কাছাকাছি প্রায়ই একটা সৌন্দর্যের আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। ফল যে কেবল আমাদের পেট ভরায় তাহা নহে, তাহা স্বাদে গন্ধে দৃশ্যে সুন্দর। কিছুমাত্র সুন্দর যদি নাও হইত তবু আমরা তাহাকে পেটের দায়েই খাইতাম। আমাদের এতবড়ো একটা গরজ থাকা সত্ত্বেও, কেবল পেট ভরাইবার দিক হইতে নয়, সৌন্দর্যভোগের দিক হইতেও সে আমাদিগকে আনন্দ দিতেছে। এটা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাভ।

জগতে সৌন্দর্য বলিয়া এই-যে আমাদের একটা উপরি-পাওনা ইহা আমাদের মনকে কোন্ দিকে চালাইতেছে? ক্ষুধাতৃপ্তির ঝোঁকটাই যাহাতে একেশ্বর হইয়া না ওঠে, যাহাতে আমাদের মন হইতে তাঁহার ফাঁস একটু আলগা হয়, সৌন্দর্যের সেই চেষ্টা দেখিতে পাই। চণ্ডী ক্ষুধা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিতেছে, তোমাকে খাইতেই হইবে, ইহার উপরে আর কোনো কথা নাই। অমনি সৌন্দর্যলক্ষ্মী হাসিমুখে সুধাবর্ষণ করিয়া অত্যুগ্র প্রয়োজনের চোখ-রাঙানিকে আড়াল করিয়া দিতেছেন, পেটের জ্বালাকে নীচের তলায় রাখিয়া উপরের মহালে আনন্দভোজে মনোহর আয়োজন করিতেছেন। অনিবার্য প্রয়োজনের মধ্যে মানুষের একটা অবমাননা আছে ; কিন্তু সৌন্দর্য নাকি প্রয়োজনের বাড়া, এইজন্য সে আমাদের অপমান দূর করিয়া দেয়। সৌন্দর্য আমাদের ক্ষুধাতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সর্বদা একটা উচ্চতর সুর লাগাইতেছে বলিয়াই, যাহারা একদিন অসংযত বর্বর ছিল তাহারা আজ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, যে কেবল ইন্দ্রিয়েরই দোহাই মানিত সে আজ প্রেমের বশ মানিয়াছে। আজ ক্ষুধা লাগিলেও আমরা পশুর মতো, রাক্ষসের মতো, যেমন-তেমন করিয়া খাইতে বসিতে পারি না ; শোভনতাটুকু রক্ষা না করিলে আমাদের খাইবার প্রবৃত্তিই চলিয়া যায়। অতএব এখন আমাদের খাইবার প্রবৃত্তিই একমাত্র নহে, শোভনতা তাহাকে নরম করিয়া আনিয়াছে। আমরা ছেলেকে লজ্জা দিয়া বলি ছি ছি, অমন লোভীর মতো খাইতে আছে! সেরূপ খাওয়া দেখিতে কুশ্রী। সৌন্দর্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে। জগতের সঙ্গে আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমাদের দৈন্য, আমাদের দাসত্ব ; আনন্দের সম্বন্ধেই আমাদের মুক্তি।

তবেই দেখা যাইতেছে, পরিণামে সৌন্দর্য মানুষকে সংযমের দিকেই টানিতেছে। মানুষকে সে এমন একটি অমৃত দিতেছে যাহা পান করিয়া মানুষ ক্ষুধার রূঢ়তাকে দিনে দিনে জয় করিতেছে। অসংযমকে অমঙ্গল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে যাহার মনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় সে তাহাকে অসুন্দর বলিয়া ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতে চাহিতেছে।

সৌন্দর্য যেমন আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে, আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে সংযমও তেমনি আমাদের সৌন্দর্যভোগের গভীরতা বাড়াইয়া দিতেছে। স্তব্ধভাবে নিবিষ্ট হইতে না জানিলে আমরা সৌন্দর্যের মর্মস্থান হইতে রস উদ্ধার করিতে পারি না। একপরায়ণা সতী স্ত্রীই তো প্রেমের যথার্থ সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারে, স্বৈরিণী তো পারে না। সতীত্ব সেই চাঞ্চল্যবিহীন সংযম যাহার দ্বারা গভীরভাবে প্রেমের নিগূঢ় রস লাভ করা সম্ভব হয়। আমাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার মধ্যেও যদি সেই সতীত্বের সংযম না থাকে তবে কী হয়? সে কেবলই সৌন্দর্যের বাহিরে বাহিরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; মত্ততাকেই আনন্দ বলিয়া ভুল করে; যাহাকে পাইলে সে একেবারে সব ছাড়িয়া স্থির হইয়া বসিতে পারিত তাহাকে পায় না। যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে। যে লোক পেটুক সে ভোজনের রসজ্ঞ হইতে পারে না।

পৌষ্যরাজা ঋষিকুমার উতঙ্ককে কহিলেন, যাও, অন্তঃপুরে যাও, সেখানে মহিষীকে দেখিতে পাইবে। উতঙ্ক অন্তঃপুরে গেলেন, কিন্তু মহিষীকে দেখিতে পাইলেন না। অশুচি হইয়া কেহ সতীকে দেখিতে পাইত না; উতঙ্ক তখন অশুচি ছিলেন।

বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের সমস্ত মহিমার অন্তঃপুরে যে সতীলক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন তিনিও আমাদের সম্মুখেই আছেন, কিন্তু শুচি না হইলে দেখিতে পাইব না। যখন বিলাসে হাবুডুবু খাই, ভোগের নেশায় মাতিয়া বেড়াই, তখন বিশ্বজগতের আলোকবসনা সতীলক্ষ্মী আমাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্ধান করেন।

এ কথা ধর্মনীতিপ্রচারের দিক হইতে বলিতেছি না; আনন্দের দিক হইতে যাহাকে ইংরেজিতে আর্ট বলে, তাহারই তরফ হইতে বলিতেছি। আমাদের শাস্ত্রেও বলে, কেবল ধর্মের জন্য নয়, সুখের জন্যও সংযত হইবে। সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। অর্থাৎ ইচ্ছার যদি চরিতার্থতা চাও তবে ইচ্ছাকে শাসনে রাখো, যদি সৌন্দর্যভোগ করিতে চাও তবে ভোগলালসাকে দমন করিয়া শুচি হইয়া শান্ত হও। প্রবৃত্তিকে যদি দমন করিতে না জানি তবে প্রবৃত্তিরই চরিতার্থতাকে আমরা সৌন্দর্যবোধের চরিতার্থতা বলিয়া ভুল করি, যাহা চিত্তের জিনিস তাহাকে দুই হাতে করিয়া দলিয়া মনে করি যেন তাহাকে পাইলাম। এইজন্যই বলিয়াছি, সৌন্দর্যবোধ ঠিকমত-উদ্‌বোধনের জন্য ব্রহ্মচর্যের সাধনই আবশ্যক।

যাঁহাদের চোখে ধুলা দেওয়া শক্ত তাঁহারা হঠাৎ সন্দিগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিবেন, এ যে একেবারে কবিত্ব আসিয়া পড়িল। তাঁহারা বলিবেন, সংসারে তো আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে-সকল কলাকুশল গুণী সৌন্দর্যসৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই সংযমের দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান নাই। তাঁহাদের জীবনচরিতটা পাঠ্য নহে।

অতএব কবিত্ব রাখিয়া এই বাস্তব সত্যটার আলোচনা করা দরকার।

আমার বক্তব্য এই যে, বাস্তবকে আমরা এত বেশি বিশ্বাস করি কেন? কারণ, সে প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু অনেক স্থলেই মানুষের সম্বন্ধে আমরা যাহাকে বাস্তব বলি তাহার বেশির ভাগই আমাদের অপ্রত্যক্ষ। একটুখানি দেখিতে পাই বলিয়া মনে করি সবটাই যেন দেখিতে পাইলাম, এইজন্য মানুষ-ঘটিত বাস্তব বৃত্তান্ত লইয়া একজন যাহাকে সাদা বলে আর-একজন তাহাকে মেটে বলিলেও বাঁচিতাম, তাহাকে একেবারে কালো বলিয়া বসে। নেপোলিয়নকে কেহ বলে দেবতা, কেহ বলে দানব। আকবরকে কেহ বলে উদার প্রজাহিতৈষী, কেহ বলে তাঁহার হিন্দুপ্রজার পক্ষে তিনিই যত নষ্টের গোড়া। কেহ বলেন বর্ণভেদেই আমাদের হিন্দুসমাজ রক্ষা করিয়াছে, কেহ বলে বর্ণভেদের প্রথাই আমাদিগকে একেবারে মাটি করিয়া দিল। অথচ উভয় পক্ষেই বাস্তব সত্যের দোহাই দেয়।

বস্তুত মানুষ-ঘটিত ব্যাপারে একই জায়গায় আমরা অনেক উলটা কাণ্ড দেখিতে পাই। মানুষের দেখা-অংশের মধ্যে যে-সকল বৈপরীত্য প্রকাশ পায় মানুষের না-দেখা অংশের মধ্যেই নিশ্চয় তাহার একটা নিগূঢ় সমন্বয় আছে; অতএব আসল সত্যটা যে প্রত্যক্ষের উপরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহা নহে, অপ্রত্যক্ষের মধ্যেই ডুবিয়া আছে; এইজন্যই তাহাকে লইয়া এত তর্ক, এত দলাদলি এবং এইজন্যই একই ইতিহাসকে দুই বিরুদ্ধ পক্ষে ওকালতনামা দিয়া থাকে।

জগতের কলানিপুণ গুণীদের সম্বন্ধেও যেখানে আমরা উলটা কাণ্ড দেখিতে পাই সেখানেও বাস্তব সত্যের বড়াই করিয়া হঠাৎ কিছু বিরুদ্ধ কথা বলিয়া বসা যায় না। সৌন্দর্যসৃষ্টি দুর্বলতা হইতে, চঞ্চলতা হইতে, অসংযম হইতে ঘটিতেছে, এটা যে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ কথা। বাস্তব সত্য সাক্ষ্য দিলেও আমরা বলিব, নিশ্চয় সকল সাক্ষীকে হাজির পাওয়া যায় নাই ; আসল সাক্ষীটি পালাইয়া বসিয়া আছে। যদি দেখি কোনো ডাকাতের দল খুবই উন্নতি করিতেছে তবে সেই বাস্তব সত্যের সহায়ে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, দস্যুবৃত্তিই উন্নতির উপায়। তখন এই কথা বিনা প্রমাণেই বলা যাইতে পারে যে, দস্যুদের আপাতত যেটুকু উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহার মূল কারণ নিজেদের মধ্যে ঐক্য, অর্থাৎ দলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ধর্মরক্ষা ; আবার এই উন্নতি যখন নষ্ট হইবে তখন এই ঐক্যকেই নষ্ট হইবার কারণ বলিয়া বসিব না, তখন বলিব অন্যের প্রতি অধর্মাচরণই তাহাদের পতনের কারণ। যদি দেখি একই লোক বাণিজ্যে প্রচুর টাকা করিয়া ভোগে তাহা উড়াইয়া দিয়াছেন তবে এ কথা বলিব না যে, যাহারা টাকা নষ্ট করিতে পারে টাকা উপার্জনের পন্থা তাহারাই জানে ; বরং এই কথাই বলিব; টাকা রোজগার করিবার ব্যাপারে এই লোকটি হিসাবী ছিলেন, সেখানে তাঁর সংযম ও বিবেচনাশক্তি সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, আর টাকা উড়াইবার বেলা তাঁহার উড়াইবার ঝোঁক হিসাবের বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

কলাবান্ গুণীরাও যেখানে বস্তুত গুণী সেখানে তাঁহারা তপস্বী ; সেখানে যথেচ্ছাচার চলিতে পারে না ; সেখানে চিত্তের সাধনা ও সংযম আছেই। অল্প লোকই এমন পুরাপুরি বলিষ্ঠ যে তাঁহাদের ধর্মবোধকে ষোলো-আনা কাজে লাগাইতে পারেন। কিছু-না-কিছু ভ্রষ্টতা আসিয়া পড়ে। কারণ, আমরা সকলেই হীনতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, চরমে আসিয়া দাঁড়াই নাই। কিন্তু জীবনে আমরা যে-কোনো স্থায়ী বড়ো জিনিস গড়িয়া তুলি, তাহা আমাদের অন্তরের ধর্মবুদ্ধির সাহায্যেই ঘটে, ভ্রষ্টতার সাহায্যে নহে। গুণী ব্যক্তিরাও যেখানে তাঁহাদের কলারচনা স্থাপন করিয়াছেন সেখানে তাঁহাদের চরিত্রই দেখাইয়াছেন, যেখানে তাঁহাদের জীবনকে নষ্ট করিয়াছেন সেখানে চরিত্রের অভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে, তাঁহাদের মনের ভিতরে ধর্মের যে একটি সুন্দর আদর্শ আছে রিপুর টানে তাহার বিরুদ্ধে গিয়া পীড়িত হইয়াছেন। গড়িয়া তুলিতে সংযম দরকার হয়, নষ্ট করিতে অসংযম। ধারণা করিতে সংযম চাই, আর মিথ্যা বুঝিতেই অসংযম।

এখানে কথা উঠিবে, তবেই তো একই মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবিকাশের ক্ষমতা ও চরিত্রের অসংযম একত্রই থাকিতে পারে, তবে তো দেখি বাঘে গোরুতে এক ঘাটেই জল খায়।

বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায় না বটে, কিন্তু সে কখন ? যখন বাঘও পূর্ণতা পাইয়া উঠিয়াছে, গোরুও পূর্ণ গোরু হইয়াছে। শিশু অবস্থায় উভয়ে একসঙ্গে খেলা করিতে পারে ; বড়ো হইলে বাঘও ঝাঁপ দিয়া পড়ে, গোরুও দৌড় দিতে চেষ্টা করে।

তেমনি সৌন্দর্যবোধের যথার্থ পরিণতভাব কখনোই প্রবৃত্তির বিক্ষোভ চিত্তের অসংযমের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে টিকিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের বিরোধী।

যদি বল কেন বিরোধী, তার কারণ আছে। বিশ্বামিত্র বিধাতার সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেটা তাঁহার ক্রোধের সৃষ্টি, দম্ভের সৃষ্টি ; সুতরাং সেই জগৎ বিধাতার জগতের সঙ্গে মিশ খাইল না, তাহাকে স্পর্ধা করিয়া আঘাত করিতে লাগিল, খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া হইয়া রহিল, চরাচরের সঙ্গে সুর মিলাইতে পারিল না— অবশেষে পীড়া দিয়া পীড়া পাইয়া সেটা মরিল।

আমাদের প্রবৃত্তি উগ্র হইয়া উঠিলে বিধাতার জগতের বিরুদ্ধে নিজে যেন সৃষ্টি করিতে থাকে। তখন চারি দিকের সঙ্গে তাহার আর মিল খায় না। আমাদের ক্রোধ, আমাদের লোভ নিজের চারি দিকে এমন-সকল বিকার উৎপাদন করে যাহাতে ছোটোই বড়ো হইয়া উঠে, বড়োই ছোটো হইয়া যায় ; যাহা ক্ষণকালের তাহাকেই চিরকালের বলিয়া মনে হয়, যাহা চিরকালের তাহা চোখেই পড়ে না। যাহার প্রতি আমাদের লোভ জন্মে তাহাকে আমরা এমনি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড়ো বড়ো সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্রসূর্যতারাকে সে ম্লান করিয়া দেয়। ইহাতে

আমাদের সৃষ্টি বিধাতার সঙ্গে বিরোধ করিতে থাকে।

মনে করো নদী চলিতেছে; তাহার প্রত্যেক ঢেউ স্বতন্ত্র হইয়া মাথা তুলিলেও তাহারা সকলে মিলিয়া সেই এক সমুদ্রের দিকে গান করিতে করিতে চলিতেছে। কেহ কাহাকেও বাধা দিতেছে না। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কোথাও পাক পড়িয়া যায় তবে সেই ঘূর্ণা এক জায়গাতেই দাঁড়াইয়া উন্মত্তের মতো ঘুরিতে থাকে, চলিবার বাধা দিয়া ডুবাইবার চেষ্টা করে; সমস্ত নদীর যে গতি, যে অভিপ্রায়, তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইয়া সে স্থিরত্বও লাভ করে না, অগ্রসর হইতেও পারে না।

আমাদের কোনো-একটা প্রবৃত্তি উন্মত্ত হইয়া উঠিলে সেও আমাদিগকে নিখিলের প্রবাহ হইতে টানিয়া লইয়া একটা বিন্দুর উপরেই ঘুরাইয়া মারিতে থাকে। আমাদের চিত্ত সেই একটা কেন্দ্রের চারি দিকেই বাঁধা পড়িয়া তাহার মধ্যে আপনার সমস্ত বিসর্জন করিতে ও অন্যের সমস্ত নষ্ট করিতে চায়। এই উন্মত্ততার মধ্যে এক দল লোক একরকমের সৌন্দর্য দেখে। এমন-কি, আমার মনে হয় য়ুরোপীয় সাহিত্যে এই পাক খাওয়া প্রবৃত্তির ঘূর্ণিনৃত্যের প্রলয়োৎসব, যাহার কোনো পরিণাম নাই, যাহার কোথাও শান্তি নাই, তাহাতেই যেন বেশি সুখ পাইয়াছে। কিন্তু ইহাকে আমরা শিক্ষার সম্পূর্ণতা বলিতে পারি না, ইহা স্বভাবের বিকৃতি। সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে দেখিলে যাহাকে হঠাৎ মনোহর বলিয়া বোধ হয় নিখিলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার সৌন্দর্যের বিরোধ চোখে ধরা পড়ে। মদের বৈঠকে মাতাল জগৎ-সংসারকে ভুলিয়া গিয়া নিজেদের সভাকে বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া মনে করে, কিন্তু অপ্রমত্ত দর্শক চারি দিকের সংসারের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার বীভৎসতা বুঝিতে পারে। আমাদের প্রবৃত্তিরও উৎপাত যখন ঘটে তখন সে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিলাভ করিলেও বৃহৎ বিশ্বের মাঝখানে তাহাকে ধরিয়া দেখিলেই তাহার কুশ্রীতা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এমনি করিয়া স্থিরভাবে যে ব্যক্তি বড়োর সঙ্গে ছোটোকে, সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেককে মিলাইয়া দেখিতে না জানে, সে উত্তেজনাকেই আনন্দ ও বিকৃতিকেই সৌন্দর্য বলিয়া ভ্রম করে। এইজন্যই সৌন্দর্যবোধকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে চিত্তের শান্তি চাই; তাহা অসংযমের দ্বারা হইবার জো নাই।

সৌন্দর্যবোধের সম্পূর্ণতা কোন্‌ দিকে চলিয়াছে তাহাই দেখা যাক।

ইহা দেখা গেছে, বর্বরজাতি যাহাকে সুন্দর বলিয়া আদর করে সভ্যজাতি তাহাকে দূরে ফেলিয়া দেয়। ইহার প্রধান কারণ, বর্বরের মন যেটুকু ক্ষেত্রের মধ্যে আছে সভ্য লোকের মন সেটুকু ক্ষেত্রের মধ্যে নাই। ভিতরে ও বাহিরে, দেশে ও কালে সভ্যজাতির জগৎটাই যে বড়ো এবং তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত বিচিত্র। এইজন্যই বর্বরের জগতে ও সভ্যের জগতে বস্তুর মাপ এবং ওজন এক হইতেই পারে না।

ছবি সম্বন্ধে যে ব্যক্তি আনাড়ি সে একটা পটের উপরে খুব খানিকটা রঙচঙ বা গোলগাল আকৃতি দেখিলেই খুশি হইয়া ওঠে। ছবিকে সে বড়ো ক্ষেত্রে রাখিয়া দেখিতেছে না। এখানে তাহার ইন্দ্রিয়ের রাশ টানিয়া ধরিবে এমন কোনো উচ্চতর বিচারবুদ্ধি নাই। গোড়াতেই যাহা তাহাকে আহ্বান করে তাহারই কাছে সে আপনাকে ধরা দিয়া বসে। রাজবাড়ির দেউড়ির দরোয়ানজির চাপরাস ও চাপদাড়ি দেখিয়া তাহাকেই সর্বপ্রধান ব্যক্তি মনে করিয়া সে অভিভূত হইয়া পড়ে, দেউড়ি পার হইয়া সভায় যাইবার কোনো প্রয়োজন সে অনুভব করিতেই পারে না। কিন্তু যে লোক এতবড়ো গ্রাম্য নহে সে এত সহজে ভোলে না। সে জানে, দরোয়ানের মহিমাটা হঠাৎ খুব বেশি করিয়া চোখে পড়ে বটে, কারণ চোখে পড়ার বেশি মহিমা যে তাহার নাই। রাজার মহিমা কেবলমাত্র চোখে পড়িবার বিষয় নহে, তাহাকে মন দিয়াও দেখিতে হয়। এইজন্য রাজার মহিমার মধ্যে একটা শক্তি শান্তি ও গাম্ভীর্য আছে।

অতএব যে ব্যক্তি সমজদার ছবিতে সে একটা রঙচঙের ঘটা দেখিলেই অভিভূত হইয়া পড়ে না। সে মুখ্যের সঙ্গে গৌণের, মাঝখানের সঙ্গে চারি পাশের, সম্মুখের সঙ্গে পিছনের একটা সামঞ্জস্য খুঁজিতে থাকে। রঙচঙে চোখ ধরা পড়ে, কিন্তু সামঞ্জস্যের সুষমা দেখিতে মনের প্রয়োজন। তাহাকে গভীরভাবে দেখিতে হয়, এইজন্য তাহার আনন্দ গভীরতর।

এই কারণে অনেক গুণী দেখা যায়, বাহিরের ক্ষুদ্র লালিত্যকে যাঁহারা আমল দিতে চান না;

তাঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে যেন একটা কঠোরতা আছে। তাঁহাদের ধ্রুপদের মধ্যে খেয়ালের তান নাই। হঠাৎ তাহার বাহিরের রিক্ততা দেখিয়া ইতর লোকে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে; অথচ সেই নির্মল রিক্ততার গভীরতর ঐশ্বর্যই বিশিষ্ট লোকের চিত্তকে বৃহৎ আনন্দ দান করে।

তবেই দেখা যাইতেছে, শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, তাহার পিছনে মনের দৃষ্টি যোগ না দিলে সৌন্দর্যকে বড়ো করিয়া দেখা যায় না। এই মনের দৃষ্টি লাভ করা বিশেষ শিক্ষার কর্ম।

মনেরও আবার অনেক স্তর আছে। কেবল বুদ্ধিবিচার দিয়া আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহার সঙ্গে হৃদয়ভাব যোগ দিলে ক্ষেত্র আরো বাড়িয়া যায়, ধর্মবুদ্ধি যোগ দিলে আরো অনেক দূর চোখে পড়ে, অধ্যাত্মদৃষ্টি খুলিয়া গেলে দৃষ্টিক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না।

অতএব যে দেখাতে আমাদের মনের বড়ো অংশ অধিকার করে সেই দেখাতেই আমরা বেশি তৃপ্তি পাই। ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে মানুষের মুখ আমাদিগকে বেশি টানে, কেননা, মানুষের মুখে শুধু আকৃতির সুষমা নয়, তাহাতে চেতনার দীপ্তি, বুদ্ধির স্ফূর্তি, হৃদয়ের লাবণ্য আছে; তাহা আমাদের চৈতন্যকে বুদ্ধিকে হৃদয়কে দখল করিয়া বসে। তাহা আমাদের কাছে শীঘ্র ফুরাইতে চায় না।

আবার মানুষের মধ্যে যাঁহারা নরোত্তম, ধরাতলে যাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের প্রকাশ, তাঁহারা আমাদের মনে এতদূর পর্যন্ত টান দেন, সেখানে আমরা নিজেরাই নাগাল পাই না। এইজন্য যে রাজপুত্র মানুষের দুঃখমোচনের উপায়চিন্তা করিতে রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তাঁহার মনোহারিতা মানুষকে কত কাব্য কত চিত্র -রচনায় লাগাইয়াছে তাহার সীমা নাই।

এইখানে সন্দিগ্ধ লোকেরা বলিবেন, সৌন্দর্য হইতে যে ধর্মনীতির কথা আসিয়া পড়িল! দুটোতে ঘোলাইয়া দিবার দরকার কী? যাহা ভালো তাহা ভালো এবং যাহা সুন্দর তাহা সুন্দর। ভালো আমাদের মনকে একরকম করিয়া টানে, সুন্দর আমাদের মনকে আর-একরকম করিয়া টানে; উভয়ের আকর্ষণপ্রণালীর বিভিন্নতা আছে বলিয়াই ভাষায় দুটোকে দুই নাম দিয়া থাকে। যাহা ভালো তাহার প্রয়োজনীয়তা আমাদিগকে মুগ্ধ করে, আর যাহা সুন্দর তাহা যে কেন মুগ্ধ করে সে আমরা জানি না।

এ সম্বন্ধে আমার বলিবার একটা কথা এই যে, মঙ্গল আমাদের ভালো করে বলিয়াই যে তাহাকে আমরা ভালো বলি ইহা বলিলে সবটা বলা হয় না। যথার্থ যে মঙ্গল তাহা আমাদের প্রয়োজনসাধন করে এবং তাহা সুন্দর; অর্থাৎ প্রয়োজনসাধনের ঊর্ধ্বেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে। নীতিপণ্ডিতেরা জগতের প্রয়োজনের দিক হইতে নীতি-উপদেশ দিয়া মঙ্গলপ্রচার করিতে চেষ্টা করেন এবং কবিরা মঙ্গলকে তাহার অনির্বচনীয় সৌন্দর্যমূর্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বস্তুত মঙ্গল যে সুন্দর সে আমাদের প্রয়োজনসাধন করে বলিয়া নহে। ভাত আমাদের কাজে লাগে, কাপড় আমাদের কাজে লাগে, ছাতাজুতা আমাদের কাজে লাগে; ভাত-কাপড় ছাতা-জুতা আমাদের মনে সৌন্দর্যের পুলক সঞ্চার করে না। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গেলেন এই সংবাদে আমাদের মনের মধ্যে বীণার তারে যেন একটা সংগীত বাজাইয়া তোলে। ইহা সুন্দর ভাষাতেই সুন্দর ছন্দেই সুন্দর করিয়া সাজাইয়া স্থায়ী করিয়া রাখিবার বিষয়। ছোটো ভাই বড়ো ভাইয়ের সেবা করিলে সমাজের হিত হয় বলিয়া যে এ কথা বলিতেছি তাহা নহে, ইহা সুন্দর বলিয়াই। কেন সুন্দর? কারণ, মঙ্গলমাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে, সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে। সত্যের সঙ্গে মঙ্গলের সেই পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেই তাহার সৌন্দর্য আর আমাদের অগোচর থাকে না। করুণা সুন্দর, ক্ষমা সুন্দর, প্রেম সুন্দর। শতদলপদ্মের সঙ্গে, পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে তাহার তুলনা হয়; শতদলপদ্মের মতো, পূর্ণিমার চাঁদের মতো নিজের মধ্যে এবং চারি দিকের জগতের মধ্যে তাহার একটি বিরোধহীন সুষমা আছে; সে নিখিলের অনুকূল এবং নিখিল তাহার অনুকূল। আমাদের পুরাণে লক্ষ্মী কেবল সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের দেবী নহেন, তিনি মঙ্গলের দেবী। সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।

সৌন্দর্যে ও মঙ্গলে যে জায়গায় মিল আছে সে জায়গাটা বিচার করিয়া দেখা যাক। আমরা প্রথমে

দেখাইয়াছি, সৌন্দর্য প্রয়োজনের বাড়া। এইজন্য তাহাকে আমরা ঐশ্বর্য বলিয়া মানি। এইজন্য তাহা আমাদিগকে নিছক স্বার্থসাধনের দারিদ্র্য হইতে প্রেমের মধ্যে মুক্তি দেয়।

মঙ্গলের মধ্যে আমরা সেই ঐশ্বর্য দেখি। যখন দেখি, কোনো বীরপুরুষ ধর্মের জন্য স্বার্থ ছাড়িয়াছেন, প্রাণ দিয়াছেন, তখন এমন একটা আশ্চর্য পদার্থ আমাদের চোখে পড়ে যাহা আমাদের সুখদুঃখের চেয়ে বেশি, আমাদের স্বার্থের চেয়ে বড়ো, আমাদের প্রাণের চেয়ে মহৎ। মঙ্গল নিজের এই ঐশ্বর্যের জোরে ক্ষতি ও ক্লেশকে ক্ষতি ও ক্লেশ বলিয়া গণ্যই করে না। স্বার্থের ক্ষতিতে তাহার ক্ষতি হইবার জো নাই। এইজন্য সৌন্দর্য যেমন আমাদিগকে স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগে প্রবৃত্ত করে, মঙ্গলও সেইরূপ করে। সৌন্দর্যও জগদ্‌ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করে, মঙ্গলও মানুষের জীবনের মধ্যে তাহাই করিয়া থাকে। মঙ্গল, সৌন্দর্যকে শুধু চোখের দেখা নয়, শুধু বুদ্ধির বোঝা নয়, তাহাকে আরো ব্যাপক আরো গভীর করিয়া মানুষের কাছে আনিয়া দিয়াছে ; তাহা ঈশ্বরের সামগ্রীকে অত্যন্তই মানুষের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুত মঙ্গল মানুষের নিকটবর্তী অন্তরতম সৌন্দর্য ; এইজন্যই তাহাকে আমরা অনেক সময় সহজে সুন্দর বলিয়া বুঝিতে পারি না, কিন্তু যখন বুঝি তখন আমাদের প্রাণ বর্ষার নদীর মতো ভরিয়া উঠে। তখন আমরা তাহার চেয়ে রমণীয় আর কিছুই দেখি না।

ফুল পাতা, প্রদীপের মালা এবং সোনারুপার থালি দিয়া যদি ভোজের জায়গা সাজাইতে পারো সে তো ভালোই, কিন্তু নিমন্ত্রিত যদি যজ্ঞকর্তার কাছ হইতে সমাদর না পায়, হৃদ্যতা না পায়, তবে সে-সমস্ত ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য তাহার কাছে রোচে না ; কারণ, এই হৃদ্যতাই অন্তরের ঐশ্বর্য, অন্তরের প্রাচুর্য। হৃদ্যতার মিষ্টহাস্য মিষ্টবাক্য মিষ্টব্যবহার এমন সুন্দর যে তাহা কলার পাতাকেও সোনার থালার চেয়ে বেশি মূল্য দেয়। সকলের কাছেই যে দেয় এ কথাও বলিতে পারি না। বহু-আড়ম্বরের ভোজে অপমান স্বীকার করিয়াও প্রবেশ করিতে প্রস্তুত এমন লোকও অনেক দেখা যায়। কেন দেখা যায় ? কারণ, ভোজের বড়ো তাৎপর্য বৃহৎ সৌন্দর্য সে বোঝে না। বস্তুত খাওয়াটা বা সজ্জাটাই ভোজের প্রধান অঙ্গ নহে। কুঁড়ির পাপড়িগুলি যেমন নিজের মধ্যেই কুঞ্চিত তেমনি স্বার্থরত মানুষের শক্তি নিজের দিকেই চিরদিন সংকুচিত, একদিন তাহার বাঁধন ঢিলা করিয়া তাহাকে পরাভিমুখ করিবামাত্র ফোটা ফুলের মতো বিশ্বের দিকে তাহার মিলনমাধুর্যময় অতি সুন্দর বিস্তার ঘটে ; যজ্ঞের সেই ভিতর-দিকটার গভীরতর মঙ্গলসৌন্দর্য যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না তাহার কাছে ভোজ্যপেয়ের প্রাচুর্য ও সাজসজ্জার আড়ম্বরই বড়ো হইয়া উঠে। তাহার অসংযত প্রবৃত্তি, তাহার দানদক্ষিণা-পানভোজনের অতিমাত্র লোভ, যজ্ঞের উদার মাধুর্যকে ভালো করিয়া দেখিতে দেয় না।

শাস্ত্র বলে : শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমাই শক্তিমানের ভূষণ। কিন্তু ক্ষমাপ্রকাশের মধ্যেই শক্তির সৌন্দর্য-অনুভব তো সকলের কর্ম নহে। বরঞ্চ সাধারণ মূঢ় লোকেরা শক্তির উপদ্রব দেখিলেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ করে। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। কিন্তু সাজসজ্জার চেয়ে এই লজ্জার সৌন্দর্য কে দেখিতে পায় ? যে ব্যক্তি সৌন্দর্যকে সংকীর্ণ করিয়া দেখে না। সংকীর্ণ প্রকাশের তরঙ্গভঙ্গ যখন বিস্তীর্ণ প্রকাশের মধ্যে শান্ত হইয়া গেছে তখন সেই বড়ো সৌন্দর্যকে দেখিতে হইলে উচ্চভূমি হইতে প্রশস্ত ভাবে দেখা চাই। তেমন করিয়া দেখার জন্য মানুষের শিক্ষা চাই, গাম্ভীর্য চাই, অন্তরের শান্তি চাই।

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা গর্ভিণী নারীর সৌন্দর্যবর্ণনায় কোথাও কুণ্ঠাপ্রকাশ করেন নাই। য়ুরোপের কবি এখানে একটা লজ্জা ও দীনতা বোধ করেন। বস্তুত গর্ভিণী রমণীর যে কান্তি সেটাতে চোখের উৎসব তেমন নাই। নারীত্বের চরম সার্থকতালাভ যখন আসন্ন হইয়া আসে তখন তাহারই প্রতীক্ষা নারীমূর্তিকে গৌরবে ভরিয়া তোলে। এই দৃশ্যে চোখের বিলাসে যেটুকু কম পড়ে মনের ভক্তিতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়। সমস্ত বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িয়া শরতের যে হালকা মেঘ বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগাইয়া উড়িয়া বেড়ায় তাহার উপরে যখন অস্তসূর্যের আলো পড়ে তখন রঙের ছটায় চোখ ধাঁদিয়া যায়। কিন্তু আষাঢ়ের যে নূতন ঘনমেঘ পয়স্বিনী কালো গাভীটির মতো আসন্ন বৃষ্টির ভারে একেবারে মন্থর হইয়া পড়িয়াছে, যাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলতার মধ্যে

বর্ণবৈচিত্র্যের চাপল্য কোথাও নাই, সে আমাদের মনকে চারি দিক হইতে এমন করিয়া ঘনাইয়া ধরে যে কোথাও যেন কিছু ফাঁক রাখে না। ধরণীর তাপশান্তি, শস্যক্ষেত্রে দৈন্যনিবৃত্তি, নদীসরোবরের কৃশতা-মোচনের উদার আশ্বাস তাহার স্নিগ্ধ নীলিমার মধ্যে যে মাখানো ; মঙ্গলময় পরিপূর্ণতার গম্ভীর মাধুর্যে সে স্তব্ধ হইয়া থাকে। কালিদাস তো বসন্তের বাতাসকে বিরহী যক্ষের দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। এ কার্যে তাঁহার হাতযশ আছে বলিয়া লোকে রটনা করে ; বিশেষত উত্তরে যাইতে হইলে দক্ষিণা-বাতাসকে কিছুমাত্র উজানে যাইতে হইত না। কিন্তু কবি প্রথম আষাঢ়ে নূতন মেঘকেই পছন্দ করিলেন ; সে যে জগতের তাপ নিবারণ করে, সে কি শুধু প্রণয়ীর বার্তা প্রণয়িনীর কানের কাছে প্রলপিত করিবে ? সে যে সমস্ত পথটার নদীগিরিকাননের উপর বিচিত্র পূর্ণতার সঞ্চার করিতে করিতে যাইবে। কদম্ব ফুটিবে, জম্বুকুঞ্জ ভরিয়া উঠিবে, বলাকা উড়িয়া চলিবে, ভরা নদীর জল ছল্‌ছল্‌ করিয়া তাহার কূলের বেত্রবনে আসিয়া ঠেকিবে এবং জনপদবধূর ভ্রূবিলাসহীন প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের দৃষ্টিপাতে আষাঢ়ের আকাশ যেন আরো জুড়াইয়া যাইবে। বিরহীর বার্তাপ্রেরণকে সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলব্যাপারের সঙ্গে পদে পদে গাঁথিয়া গাঁথিয়া তবে কবির সৌন্দর্যরসপিপাসু চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছে।

কুমারসম্ভবের কবি অকালবসন্তের আকস্মিক উৎসবে পুষ্পশরে মোহবর্ষণের মধ্যে হরপার্বতীর মিলনকে চূড়ান্ত করিয়া তোলেন নাই। স্ত্রীপুরুষের উন্মত্ত সংঘাত হইতে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সেই প্রলয়াগ্নিতে আগে তিনি শান্তিধারা বর্ষণ করিয়াছেন, তবে তো মিলনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন। কবি গৌরীর প্রেমের সর্বাপেক্ষা কমনীয় মূর্তি তপস্যার অগ্নির দ্বারাই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। সেখানে বসন্তের পুষ্পসম্পদ ম্লান, কোকিলের মুখরতা স্তব্ধ। অভিজ্ঞান-শকুন্তলেও প্রেয়সী যেখানে জননী হইয়াছেন, বাসনার চাঞ্চল্য যেখানে বেদনার তপস্যায় গাম্ভীর্যলাভ করিয়াছে, যেখানে অনুতাপের সঙ্গে ক্ষমা আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানেই রাজদম্পতির মিলন সার্থক হইয়াছে। প্রথম মিলনে প্রলয়, দ্বিতীয় মিলনেই পরিত্রাণ। এই দুই কাব্যেই শান্তির মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, যেখানেই কবি সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন সেখানেই তাঁহার তুলিকা বর্ণবিরল, তাঁহার বীণা অপ্রমত্ত।

বস্তুত সৌন্দর্য যেখানেই পরিণতিলাভ করিয়াছে সেখানেই সে আপনার প্রগল্‌ভতা দূর করিয়া দিয়াছে। সেইখানেই ফুল আপনার বর্ণগন্ধের বাহুল্যকে ফলের গূঢ়তর মাধুর্যে পরিণত করিয়াছে ; সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্যের সহিত মঙ্গল একান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সৌন্দর্য ও মঙ্গলের এই সম্মিলন যে দেখিয়াছে সে ভোগবিলাসের সঙ্গে সৌন্দর্যকে কখনোই জড়াইয়া রাখিতে পারে না। তাহার জীবনযাত্রার উপকরণ সাদাসিধা হইয়া থাকে ; সেটা সৌন্দর্যবোধের অভাব হইতে হয় না, প্রকর্ষ হইতেই হয়। অশোকের প্রমোদ-উদ্যান কোথায় ছিল ? তাঁহার রাজবাটীর ভিতের কোনো চিহ্নও তো দেখিতে পাই না। কিন্তু অশোকের রচিত স্তূপ ও স্তম্ভ বুদ্ধগয়ায় বোধিবটমূলের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শিল্পকলাও সামান্য নহে। যে পুণ্যস্থানে ভগবান্ বুদ্ধ মানবের দুঃখনিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন রাজচক্রবর্তী অশোক সেইখানেই, সেই পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রেই, কলাসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিজের ভোগকে এই পূজার অর্ঘ্য তিনি এমন করিয়া দেন নাই। এই ভারতবর্ষে কত দুর্গম গিরিশিখরে কত নির্জন সমুদ্রতীরে, কত দেবালয় কত কলাশোভন পুণ্যকীর্তি দেখিতে পাই, কিন্তু হিন্দুরাজাদের বিলাসভবনের স্মৃতিচিহ্ন কোথায় গেল ? রাজধানী-নগর ছাড়িয়া অরণ্যপর্বতে এই-সমস্ত সৌন্দর্যস্থাপনের কারণ কী ? কারণ আছে। সেখানে মানুষ নিজের সৌন্দর্যসৃষ্টির দ্বারা নিজের চেয়ে বড়োর প্রতিই বিস্ময়পূর্ণ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছে। মানুষের রচিত সৌন্দর্য দাঁড়াইয়া আপনার চেয়ে বড়ো সৌন্দর্যকে দুই হাত তুলিয়া অভিবাদন করিতেছে ; নিজের সমস্ত মহত্ত্ব দিয়া নিজের চেয়ে মহত্তরকেই নীরবে প্রচার করিতেছে। মানুষ এই-সকল কারুপরিপূর্ণ নিস্তব্ধভাষার দ্বারা বলিয়াছে, দেখো, চাহিয়া দেখো, যিনি সুন্দর তাঁহাকে দেখো, যিনি মহান্ তাঁহাকে দেখো। সে এ কথা বলিতে চাহে নাই যে, আমি কতবড়ো ভোগী সেইটে

দেখিয়া লও। সে বলে নাই, জীবিত অবস্থায় আমি যেখানে বিহার করিতাম সেখানে চাও, মৃত অবস্থায় আমি যেখানে মাটিতে মিশাইয়াছি সেখানেও আমার মহিমা দেখো। জানি না, প্রাচীন হিন্দুরাজারা নিজেদের প্রমোদভবনকে তেমন করিয়া অলংকৃত করিতেন কি না, অন্তত ইহা নিশ্চয় যে হিন্দুজাতি সেগুলিকে সমাদর করিয়া রক্ষা করে নাই ; যাহাদের গৌরব প্রচারের জন্য তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাদের সঙ্গেই আজ সে-সমস্ত ধুলায় মিশাইয়াছে। কিন্তু মানুষের শক্তি মানুষের ভক্তি যেখানে নিজের সৌন্দর্যরচনাকে ভগবানের মঙ্গলরূপের বামপার্শ্বে বসাইয়া ধন্য হইয়াছে সেখানে সেই মিলনমন্দিরগুলিকে অতিদুর্গম স্থানেও আমরা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। মঙ্গলের সঙ্গেই সৌন্দর্যের, বিষ্ণুর সঙ্গেই লক্ষ্মীর মিলন পূর্ণ। সকল সভ্যতার মধ্যেই এই ভাবটি প্রচ্ছন্ন আছে। একদিন নিশ্চয় আসিবে যখন সৌন্দর্য ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা বদ্ধ, ঈর্ষার দ্বারা বিদ্ধ, ভোগের দ্বারা জীর্ণ হইবে না ; শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে নির্মলভাবে স্ফূর্তি পাইবে। সৌন্দর্যকে আমাদের বাসনা হইতে, লোভ হইতে, স্বতন্ত্র করিয়া না দেখিতে পাইলে তাহাকে পূর্ণভাবে দেখা হয় না। সেই অশিক্ষিত অসংযত অসম্পূর্ণ দেখায় আমরা যাহা দেখি তাহাতে আমাদিগকে তৃপ্তি দেয় না, তৃষ্ণাই দেয় ; খাদ্য দেয় না, মদ খাওয়াইয়া আহারে স্বাস্থ্যকর অভিরুচি পর্যন্ত নষ্ট করিতে থাকে।

এই আশঙ্কাবশতই নীতিপ্রচারকেরা সৌন্দর্যকে দূর হইতে নমস্কার করিতে উপদেশ দেন। পাছে লোকসান হয় বলিয়া লাভের পথ মাড়াইতেই নিষেধ করেন। কিন্তু যথার্থ উপদেশ এই যে, সৌন্দর্যের পূর্ণ অধিকার পাইব বলিয়াই সংযমসাধন করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য সেইজন্যই, পরিণামে শুষ্কতালাভের জন্য নহে।

সাধনার কথা যখন উঠিল তখন প্রশ্ন হইতে পারে, এ সাধনার সিদ্ধি কী ? ইহার শেষ কোনখানে ? আমাদের অন্যান্য কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি কিন্তু সৌন্দর্যবোধ কিসের জন্য আমাদের মনে স্থান পাইয়াছে ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সৌন্দর্যবোধের রাস্তাটা কোন্ দিকে চলিয়াছে সে কথাটার আর-একবার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

সৌন্দর্যবোধ যখন শুদ্ধমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহায়তা লয় তখন যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝি তাহা খুবই স্পষ্ট, তাহা দেখিবামাত্রই চোখে ধরা পড়ে। সেখানে আমাদের সম্মুখে এক দিকে সুন্দর ও আর-এক দিকে অসুন্দর এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব একেবারে সুনির্দিষ্ট। তার পরে বুদ্ধিও যখন সৌন্দর্যবোধের সহায় হয় তখন সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা দূরে গিয়া পড়ে। তখন যে জিনিস আমাদের মনকে টানে সেটা হয়তো চোখ মেলিবামাত্রই দৃষ্টিতে পড়িবার যোগ্য বলিয়া মনে না হইতেও পারে। আরম্ভের সহিত শেষের, প্রধানের সহিত অপ্রধানের, এক অংশের সহিত অন্য অংশের গূঢ়তর সামঞ্জস্য দেখিয়া যেখানে আমরা আনন্দ পাই সেখানে আমরা চোখ-ভুলানো সৌন্দর্যের দাসখত তেমন করিয়া আর মানি না। তার পরে কল্যাণবুদ্ধি যেখানে যোগ দেয় সেখানে আমাদের মনের অধিকার আরো বাড়িয়া যায়, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব আরো ঘুচিয়া যায়। সেখানে কল্যাণী সতী সুন্দর হইয়া দেখা দেন, কেবল রূপসী নহে। যেখানে ধৈর্য-বীর্য ক্ষমা-প্রেম আলো ফেলে সেখানে রঙচঙের আয়োজন-আড়ম্বরের কোনো প্রয়োজনই আমরা বুঝি না। কুমারসম্ভব কাব্যে ছদ্মবেশী মহাদেব তাপসী উমার নিকট শংকরের রূপ গুণ বয়স বিভবের নিন্দা করিলেন, তখন উমা কহিলেন : মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃস্থিতম্। তাঁহার প্রতি আমার মন একমাত্র ভাবের রসে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং আনন্দের জন্য আর-কোনো উপকরণের প্রয়োজনই নাই। ভাবরসে সুন্দর-অসুন্দরের কঠিন বিচ্ছেদ দূরে চলিয়া যায়।

তবু মঙ্গলের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে। মঙ্গলের বোধ ভালোমন্দের একটা সংঘাতের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এমনতরো দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছুর পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। পরিণাম এক বৈ দুই নহে। নদী যতক্ষণ চলে ততক্ষণ তাহার দুই কূলের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যেখানে তাহার চলা শেষ হয় সেখানে একমাত্র অকূল সমুদ্র। নদীর চলার দিকটাতে দ্বন্দ্ব, সমাপ্তির দিকটাতে দ্বন্দ্বের অবসান।

আগুন জ্বালাইবার সময় দুই কাঠে ঘষিতে হয়, শিখা যখন জ্বলিয়া উঠে তখন দুই কাঠের ঘর্ষণ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সৌন্দর্যবোধও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখকর ও অসুখকর, জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর, এই দুয়ের ঘর্ষণের দ্বন্দ্বে স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জ্বলিয়া উঠে তবে তাহার সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়।

তখন কী হয় ? তখন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়, তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে। তখনই বুঝিতে পারি, সত্যের যথার্থ উপলব্ধিমাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য।

এই চঞ্চল সংসারে আমরা সত্যের আস্বাদ কোথায় পাই ? যেখানে আমাদের মন বসে। রাস্তার লোক আসিতেছে যাইতেছে, তাহারা আমাদের কাছে ছায়া, তাহাদের উপলব্ধি আমাদের কাছে নিতান্ত ক্ষীণ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নাই। বন্ধুর সত্য আমাদের কাছে গভীর, সেই সত্য আমাদের মনকে আশ্রয় দেয় ; বন্ধুকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি সে আমাদিগকে ততখানি আনন্দ দেয়। যে দেশ আমার নিকট ভূ-বৃত্তান্তের অন্তর্গত একটা নামমাত্র সে দেশের লোক সে দেশের জন্য প্রাণ দেয়। তাহারা দেশকে অত্যন্ত সত্যরূপে জানিতে পারে বলিয়াই তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারে। মূঢ়ের কাছে যে বিদ্যা বিভীষিকা বিদ্বানের কাছে তাহা পরমানন্দের জিনিস, বিদ্বান তাহা লইয়া জীবন কাটাইয়া দিতেছে। তবেই দেখা যাইতেছে, যেখানেই আমাদের কাছে সত্যের উপলব্ধি সেইখানেই আমরা আনন্দকে দেখিতে পাই। সত্যের অসম্পূর্ণ উপলব্ধিই আনন্দের অভাব। কোনো সত্যে যেখানে আমাদের আনন্দ নাই সেখানে আমরা সেই সত্যকে জানি মাত্র, তাহাকে পাই না। যে সত্য আমার কাছে নিরতিশয় সত্য তাহাতেই আমার প্রেম, তাহাতেই আমার আনন্দ।

এইরূপে বুঝিলে সত্যের অনুভূতি ও সৌন্দর্যের অনুভূতি এক হইয়া দাঁড়ায়।

মানবের সমস্ত সাহিত্য সংগীত ললিতকলা জানিয়া এবং না জানিয়া এই দিকেই চলিতেছে। মানুষ তাহার কাব্যে চিত্রে শিল্পে সত্যমাত্রকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে। পূর্বে যাহা চোখে পড়িত না বলিয়া আমাদের কাছে অসত্য ছিল কবি তাহাকে আমাদের দৃষ্টির সামনে আনিয়া আমাদের সত্যের রাজ্যের, আনন্দের রাজ্যের, সীমানা বাড়াইয়া দিতেছেন। সমস্ত তুচ্ছকে অনাদৃতকে মানুষের সাহিত্য প্রতিদিন সত্যের গৌরবে আবিষ্কার করিয়া কলাসৌন্দর্যে চিহ্নিত করিতেছে। যে কেবলমাত্র পরিচিত ছিল তাহাকে বন্ধু করিয়া তুলিতেছে। যাহা কেবলমাত্র চোখে পড়িত তাহার উপরে মনকে টানিতেছে।

আধুনিক কবি বলিয়াছেন : Truth is beauty, beauty truth। আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে Truth এবং Beauty মূর্তিমতী। উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন : আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই truth এবং beauty, সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্‌।

সত্যের এই আনন্দরূপ অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্যসাহিত্যের লক্ষ্য। সত্যকে যখন শুধু আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই তখন নয়, কিন্তু যখন তাহাকে হৃদয় দিয়া পাই তখন তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি। তবে কি সাহিত্য কলাকৌশলের সৃষ্টি নহে, তাহা কেবল হৃদয়ের আবিষ্কার ? ইহার মধ্যে সৃষ্টিরও একটা ভাগ আছে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়কে, সেই আবিষ্কারের আনন্দকে হৃদয় আপনার ঐশ্বর্যদ্বারা ভাষায় বা ধ্বনিতে বা বর্ণে চিহ্নিত করিয়া রাখে ; ইহাতেই সৃষ্টিনৈপুণ্য ; ইহাই সাহিত্য, ইহাই সংগীত, ইহাই চিত্রকলা।

মরুভূমির বালুময় বিস্তারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মানুষ তাহাকে দুই পিরামিডের বিস্ময়চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছে। নির্জন দ্বীপের সমুদ্রতটকে মানুষ পাহাড়ের গায়ে কারুকৌশলপূর্ণ গুহা খুদিয়া চিহ্নিত করিয়াছে ; বলিয়াছে, ইহা আমার হৃদয়কে তৃপ্ত করিল ; এই চিহ্নই বোম্বাইয়ের হস্তিগুহা। পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া মানুষ সমুদ্রের মধ্যে সূর্যোদয়ের মহিমা দেখিল, অমনি বহুশতক্রোশ দূর হইতে পাথর আনিয়া সেখানে আপনার করজোড়ের চিহ্ন রাখিয়া দিল ; তাহাই কনারকের মন্দির। সত্যকে যেখানে মানুষ নিবিড়রূপে অর্থাৎ আনন্দরূপে অমৃতরূপে উপলব্ধি করিয়াছে সেইখানেই আপনার একটা চিহ্ন

কাটিয়াছে। সেই চিহ্নই কোথাও বা মূর্তি, কোথাও বা মন্দির, কোথাও বা তীর্থ, কোথাও বা রাজধানী। সাহিত্যও এই চিহ্ন। বিশ্বজগতের যে-কোনো ঘাটেই মানুষের হৃদয় আসিয়া ঠেকিতেছে সেইখানেই সে ভাষা দিয়া একটা স্থায়ী তীর্থ বাঁধাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এমনি করিয়া বিশ্বতটের সকল স্থানকেই সে মানবযাত্রীর হৃদয়ের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য উত্তরণযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। এমনি করিয়া মানুষ জলে স্থলে আকাশে, শরতে বসন্তে বর্ষায়, ধর্মে কর্মে ইতিহাসে অপরূপ চিহ্ন কাটিয়া কাটিয়া সত্যের সুন্দর মূর্তির প্রতি মানুষের হৃদয়কে নিয়ত আহ্বান করিতেছে। দেশে দেশে কালে কালে এই চিহ্ন, এই আহ্বান, কেবলই বিস্তৃত হইয়া চলিতেছে। জগতে সর্বত্রই মানুষ সাহিত্যের দ্বারা হৃদয়ের এই চিহ্নগুলি যদি না কাটিত তবে জগৎ আমাদের কাছে আজ কত সংকীর্ণ হইয়া থাকিত তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। আজ এই চোখে-দেখা কানে-শোনা জগৎ যে বহুলপরিমাণে আমাদের হৃদয়ের জগৎ হইয়া উঠিয়াছে ইহার প্রধান কারণ, মানুষের সাহিত্য হৃদয়ের আবিষ্কার-চিহ্নে জগৎকে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

সত্য যে পদার্থপুঞ্জের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য, সত্য যে কার্যকারণপরম্পরা, সে কথা জানাইবার অন্য শাস্ত্র আছে। কিন্তু সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে : রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। তিনিই রস ; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।

পৌষ ১৩১৩

বিশ্বসাহিত্য

আমাদের অন্তঃকরণে যত-কিছু বৃত্তি আছে সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই। নহিলে আমি আছি বা কিছু আছে, ইহার অর্থই থাকে না।

জগতে সত্যের সঙ্গে আমাদের এই-যে যোগ ইহা তিন প্রকারের। বুদ্ধির যোগ, প্রয়োজনের যোগ, আর আনন্দের যোগ।

ইহার মধ্যে বুদ্ধির যোগকে একপ্রকার প্রতিযোগিতা বলা যাইতে পারে। সে যেন ব্যাধের সঙ্গে শিকারের যোগ। সত্যকে বুদ্ধি যেন প্রতিপক্ষের মতো নিজের রচিত একটা কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া জেরা করিয়া করিয়া তাহার পেটের কথা টুকরা-টুকরা ছিনিয়া বাহির করে। এইজন্য সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধির একটা অহংকার থাকিয়া যায়। সে যে পরিমাণে সত্যকে জানে সেই পরিমাণে আপনার শক্তিকে অনুভব করে।

তার পরে প্রয়োজনের যোগ। এই প্রয়োজনের অর্থাৎ কাজের যোগে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির একটা সহযোগিতা জন্মে। এই গরজের সম্বন্ধে সত্য আরো বেশি করিয়া আমাদের কাছে আসে। কিন্তু তবু তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য ঘোচে না। ইংরেজ সওদাগর যেমন একদিন নবাবের কাছে মাথা নিচু করিয়া ভেট দিয়া কাজ আদায় করিয়া লইয়াছিল এবং কৃতকার্য হইয়া শেষকালে নিজেই সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছে, তেমনি সত্যকে ব্যবহারে লাগাইয়া কাজ উদ্ধার করিয়া শেষকালে মনে করি, আমরাই যেন জগতের বাদশাগিরি পাইয়াছি! তখন আমরা বলি, প্রকৃতি আমাদের দাসী, জল বায়ু অগ্নি আমাদের বিনা বেতনের চাকর।

তার পরে আনন্দের যোগ। এই সৌন্দর্যের বা আনন্দের যোগে সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়া যায় ; সেখানে আর অহংকার থাকে না ; সেখানে নিতান্ত ছোটোর কাছে, দুর্বলের কাছে, আপনাকে একেবারে সঁপিয়া দিতে আমাদের কিছুই বাধে না। সেখানে মথুরার রাজা বৃন্দাবনের গোয়ালিনীর কাছে আপনার রাজমর্যাদা লুকাইবার আর পথ পায় না। যেখানে আমাদের আনন্দের যোগ সেখানে আমাদের বুদ্ধির

শক্তিকেও অনুভব করি না, কর্মের শক্তিকেও অনুভব করি না, সেখানে শুদ্ধ আপনাকেই অনুভব করি ; মাঝখানে কোনো আড়াল বা হিসাব থাকে না।

এক কথায়, সত্যের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ আমাদের ইস্কুল, প্রয়োজনের যোগ আমাদের আপিস, আনন্দের যোগ আমাদের ঘর। ইস্কুলেও আমরা সম্পূর্ণভাবে থাকি না, আপিসেও আমরা সম্পূর্ণরূপে ধরা দিই না, ঘরেই আমরা বিনা বাধায় নিজের সমস্তটাকে ছাড়িয়া দিয়া বাঁচি। ইস্কুল নিরলংকার, আপিস নিরাভরণ, আর ঘরকে কত সাজসজ্জায় সাজাইয়া থাকি।

এই আনন্দের যোগ ব্যাপারখানা কী ? না, পরকে আপনার করিয়া জানা, আপনাকে পরের করিয়া জানা। যখন তেমন করিয়া জানি তখন কোনো প্রশ্ন থাকে না। এ কথা আমরা কখনো জিজ্ঞাসা করি না যে, আমি আমাকে কেন ভালোবাসি। আমার আপনার অনুভূতিতেই যে আনন্দ। সেই আমার অনুভূতিকে অন্যের মধ্যেও যখন পাই তখন এ কথা আর জিজ্ঞাসা করিবার কোনো প্রয়োজনই হয় না যে, তাহাকে আমার কেন ভালো লাগিতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিয়াছিলেন—

> নবা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।
> আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি ॥
> নবা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।
> আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি ॥

পুত্রকে চাহি বলিয়াই যে পুত্র প্রিয় হয় তাহা নহে, আত্মাকে চাহি বলিয়াই পুত্র প্রিয় হয়। বিত্তকে চাহি বলিয়াই যে বিত্ত প্রিয় হয় তাহা নহে, আত্মাকে চাহি বলিয়াই বিত্ত প্রিয় হয়। ইত্যাদি। এ কথার অর্থ এই যাহার মধ্যে আমি নিজেকেই পূর্ণতর বলিয়া বুঝিতে পারি আমি তাহাকেই চাই। পুত্র আমার অভাব দূর করে, তাহার মানে, আমি পুত্রের মধ্যে আমাকে আরো পাই। তাহার মধ্যে আমি যেন আমিতর হইয়া উঠি। এইজন্য সে আমার আত্মীয় ; আমার আত্মাকে আমার বাহিরেও সে সত্য করিয়া তুলিয়াছে। নিজের মধ্যে যে সত্যকে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে অনুভব করিয়া প্রেম অনুভব করি পুত্রের মধ্যেও সেই সত্যকে সেইমতই অত্যন্ত অনুভব করাতে আমার সেই প্রেম বাড়িয়া উঠে। সেইজন্য একজন মানুষ যে কী তাহা জানিতে গেলে সে কী ভালোবাসে তাহা জানিতে হয়। ইহাতেই বুঝা যায়, এই বিশ্বজগতে কিসের মধ্যে সে আপনাকে লাভ করিয়াছে, কতদূর পর্যন্ত সে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছে। যেখানে আমার প্রীতি নাই সেখানেই আমার আত্মা তাহার গণ্ডির সীমারেখায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শিশু বাহিরে আলো দেখিলে বা কিছু-একটা চলাফেরা করিতেছে দেখিলে আনন্দে হাসিয়া উঠে, কলরব করে। সে এই আলোকে এই চাঞ্চল্যে আপনারই চেতনাকে অধিকতর করিয়া পায়, এইজন্যই তাহার আনন্দ।

কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ ছাড়াও ক্রমে যখন তাহার চেতনা হৃদয়মনের নানা স্তরে ব্যাপ্ত হইতে থাকে তখন শুধু এতটুকু আন্দোলনে তাহার আনন্দ হয় না। একেবারে হয় না তাহা নহে, অল্প হয়।

এমনি করিয়া মানুষের বিকাশ যতই বড়ো হয় সে ততই বড়োরকম করিয়া আপনার সত্যকে অনুভব করিতে চায়।

এই যে নিজের অন্তরাত্মাকে বাহিরে অনুভব করা, এটা প্রথমে মানুষের মধ্যেই মানুষ অতি সহজে এবং সম্পূর্ণরূপে করিতে পারে। চোখের দেখায়, কানের শোনায়, মনের ভাবায়, কল্পনার খেলায়, হৃদয়ের নানান টানে মানুষের মধ্যে সে স্বভাবতই নিজেকে পুরাপুরি আদায় করে। এইজন্য মানুষকে জানিয়া, মানুষকে টানিয়া, মানুষের কাজ করিয়া, সে এমন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। এইজন্যই দেশে এবং কালে যে মানুষ যত বেশি মানুষের মধ্যে আপনার আত্মাকে মিলাইয়া নিজেকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন তিনি ততই মহৎ মানুষ। তিনি যথার্থই মহাত্মা। সমস্ত মানুষেরই মধ্যে আমার আত্মার সার্থকতা, এ যে ব্যক্তি কোনো-না-কোনো সুযোগে কিছু-না-কিছু বুঝিতে না পারিয়াছে

তাহার ভাগ্যে মনুষ্যত্বের ভাগ কম পড়িয়া গেছে। সে আত্মাকে আপনার মধ্যে জানাতেই আত্মাকে ছোটো করিয়া জানে।

সকলের মধ্যেই নিজেকে জানা— আমাদের মানবাত্মার এই-যে একটা স্বাভাবিক ধর্ম, স্বার্থ তাহার একটা বাধা, অহংকার তাহার একটা বাধা ; সংসারে এই-সকল নানা বাধায় আমাদের আত্মার সেই স্বাভাবিক গতিস্রোত খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে আমরা অবাধে দেখিতে পাই না।

কিন্তু জানি, কেহ কেহ তর্ক করিবেন, মানবাত্মার যেটা স্বাভাবিক ধর্ম সংসারে তাহার এত লাঞ্ছনা কেন ? যেটাকে তুমি বাধা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছ, যাহা স্বার্থ, যাহা অহংকার, তাহাকেই বা স্বাভাবিক ধর্ম না বলিবে কেন ?

বস্তুত অনেকে তাহা বলিয়াও থাকে। কেননা, স্বভাবের চেয়ে স্বভাবের বাধাটাই বেশি করিয়া চোখে পড়ে। দুই-চাকার গাড়িতে মানুষ যখন প্রথম চড়া অভ্যাস করে তখন চলার চেয়ে পড়াটাই তাহার ভাগ্যে বেশি ঘটে। সেই সময়ে কেহ যদি বলে, লোকটা চড়া অভ্যাস করিতেছে না, পড়াই অভ্যাস করিতেছে, তবে তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা। সংসারে স্বার্থ এবং অহংকারের ধাক্কা তো পদে পদেই দেখিতে পাই, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়াও মানুষের নিগূঢ় স্বধর্মরক্ষার চেষ্টা অর্থাৎ সকলের সঙ্গে মিলিবার চেষ্টা যদি না দেখিতে পাই, যদি পড়াটাকেই স্বাভাবিক বলিয়া তক্‌রার করি, তবে সে নিতান্তই কলহ করা হয়।

বস্তুত যে ধর্ম আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক তাহাকে স্বাভাবিক বলিয়া জানিবার জন্যই তাহাকে তাহার পুরা দমে কাজ জোগাইবার জন্যই, তাহাকে বাধা দিতে হয়। সেই উপায়েই সে নিজেকে সচেতনভাবে জানে, এবং তাহার চৈতন্য যতই পূর্ণ হয় তাহার আনন্দও ততই নিবিড় হইতে থাকে। সকল বিষয়েই এইরূপ।

এই যেমন বুদ্ধি। কার্যকারণের সম্বন্ধ ঠিক করা বুদ্ধির একটা ধর্ম। সহজ প্রত্যক্ষ জিনিসের মধ্যে সে যতক্ষণ তাহা সহজেই করে ততক্ষণ সে নিজেকে যেন পুরাপুরি দেখিতেই পায় না। কিন্তু বিশ্বজগতে কার্যকারণের সম্বন্ধগুলি এতই গোপনে তলাইয়া আছে যে, তাহা উদ্ধার করিতে বুদ্ধিকে নিয়তই প্রাণপণে খাটিতে হইতেছে। এই বাধা কাটাইবার খাটুনিতেই বুদ্ধি বিজ্ঞানদর্শনের মধ্যে নিজেকে খুব নিবিড় করিয়া অনুভব করে ; তাহাতেই তাহার গৌরব বাড়ে। বস্তুত ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বিজ্ঞান দর্শন আর কিছুই নহে, বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধির নিজেকেই উপলব্ধি। সে নিজের নিয়ম যেখানে দেখে সেখানে সেই পদার্থকে এবং নিজেকে একত্র করিয়া দেখে। ইহাকেই বলে বুঝিতে পারা। এই দেখাতেই বুদ্ধির আনন্দ। নহিলে আপেলফল যে কারণে মাটিতে পড়ে সূর্য সেই কারণেই পৃথিবীকে টানে, এ কথা বাহির করিয়া মানুষের এত খুশি হইবার কোনো কারণ ছিল না। টানে তো টানে, আমার তাহাতে কী ? আমার তাহাতে এই, জগৎচরাচরের এই ব্যাপক ব্যাপারকে আমার বুদ্ধির মধ্যে পাইলাম, সর্বত্রই আমার বুদ্ধিকে অনুভব করিলাম। আমার বুদ্ধির সঙ্গে ধূলি হইতে সূর্যচন্দ্রতারা সবটা মিলিল। এমনি করিয়া অন্তহীন জগৎরহস্য মানুষের বুদ্ধিকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া মানুষের কাছে তাহাকে বেশি করিয়া প্রকাশ করিতেছে, নিখিলচরাচরের সঙ্গে মিলাইয়া আবার তাহা মানুষকে ফিরাইয়া দিতেছে। সমস্তের সঙ্গে এই বুদ্ধির মিলনই জ্ঞান। এই মিলনই আমাদের বোধশক্তির আনন্দ।

তেমনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার মনুষ্যত্বের মিলনকে পাওয়াই মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম এবং তাহাতেই তাহার যথার্থ আনন্দ। এই ধর্মকে পূর্ণচেতনরূপে পাইবার জন্যই অন্তরে বাহিরে কেবলই বিরোধ ও বাধার ভিতর দিয়াই তাহাকে চলিতে হয়। এইজন্যই স্বার্থ এত প্রবল, আত্মাভিমান এত অটল, সংসারের পথ এত দুর্গম। এই সমস্ত বাধার ভিতর দিয়া যেখানে মানবের ধর্ম সমুজ্জ্বল হইয়া পূর্ণসুন্দররূপে সবলে নিজেকে প্রকাশ করে সেখানে বড়ো আনন্দ। সেখানে আমরা আপনাকেই বড়ো করিয়া পাই।

মহাপুরুষের জীবনী এইজন্যই আমরা পড়িতে চাই। তাঁহাদের চরিত্রে আমাদের নিজের বাধাযুক্ত আচ্ছন্ন প্রকৃতিকেই মুক্ত ও প্রসারিত দেখিতে পাই। ইতিহাসে আমরা আমাদেরই স্বভাবকে নানা লোকের মধ্যে নানা দেশে নানা কালে নানা ঘটনায় নানা পরিমাণে ও নানা আকারে দেখিয়া রস পাইতে থাকি। তখন আমি স্পষ্ট করিয়া বুঝি বা না বুঝি, মনের মধ্যে স্বীকার করিতে থাকি সকল মানুষকে লইয়াই আমি এক— সেই ঐক্য যতটা মাত্রায় আমি ঠিকমত অনুভব করিব ততটা মাত্রায় আমার মঙ্গল, আমার আনন্দ।

কিন্তু জীবনীতে ও ইতিহাসে আমরা সমস্তটা আগাগোড়া স্পষ্ট দেখিতে পাই না। তাহাও অনেক বাধায় অনেক সংশয়ে ঢাকা পড়িয়া আমাদের কাছে দেখা দেয়। তাহার মধ্য দিয়াও আমরা মানুষের যে পরিচয় পাই তাহা খুব বড়ো, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই পরিচয়কে আবার আমাদের মনের মতো করিয়া, তাহাকে আমাদের সাধ মিটাইয়া সাজাইয়া, চিরকালের মতো ভাষায় ধরিয়া রাখিবার জন্য আমাদের অন্তরের একটা চেষ্টা আছে। তেমনি করিতে পারিলে তবেই সে যেন বিশেষ করিয়া আমার হইল। তাহার মধ্যে সুন্দর ভাষায় সুরচিত নৈপুণ্যে আমার প্রীতিকে প্রকাশ করিতেই সে মানুষের হৃদয়ের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সে আর এই সংসারের আনাগোনার স্রোতে ভাসিয়া গেল না।

এমনি করিয়া, বাহিরের যে-সকল অপরূপ প্রকাশ, তাহা সূর্যোদয়ের ছটা হউক বা মহৎ চরিত্রের দীপ্তি হউক বা নিজের অন্তরের আবেগ হউক, যাহা-কিছু ক্ষণে ক্ষণে আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে হৃদয় তাহাকে নিজের একটা সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত করিয়া আপনার বলিয়া তাহাকে আঁকড়িয়া রাখে। এমনি করিয়া সেই-সকল উপলক্ষে সে আপনাকেই বিশেষ করিয়া প্রকাশ করে।

সংসারে মানুষ যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে সেই প্রকাশের দুইটি মোটা ধারা আছে। একটা ধারা মানুষের কর্ম, আর-একটা ধারা মানুষের সাহিত্য। এই দুই ধারা একেবারে পাশাপাশি চলিয়াছে। মানুষ আপনার কর্মরচনায় এবং ভাবরচনায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে। ইহারা উভয়ে উভয়কে পূরণ করিতে করিতে চলিয়াছে। এই দুয়ের মধ্য দিয়াই ইতিহাসে ও সাহিত্যে মানুষকে পুরাপুরি জানিতে হইবে।

কর্মক্ষেত্রে মানুষ তাহার দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি ও অভিজ্ঞতা লইয়া গৃহ সমাজ রাজ্য ও ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতেছে। এই গড়ার মধ্যে মানুষ যাহা জানিয়াছে, যাহা পাইয়াছে, যাহা চায়, সমস্তই প্রকাশ পাইতেছে। এমনি করিয়া মানুষের প্রকৃতি জগতের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়া নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া সকলের মাঝখানে আপনাকে দাঁড় করাইয়া তুলিতেছে। এমনি করিয়া, যাহা ভাবের মধ্যে ঝাপসা হইয়া ছিল ভবের মধ্যে তাহা আকারে জন্ম লইতেছে, যাহা একের মধ্যে ক্ষীণ হইয়া ছিল তাহা অনেকের মধ্যে নানা-অঙ্গ-বিশিষ্ট বড়ো ঐক্য পাইতেছে। এইরূপে ক্রমে এমন হইয়া উঠিতেছে যে প্রত্যেক স্বতন্ত্র মানুষ এই বহুদিনের ও বহুজনের গড়া ঘর সমাজ রাজ্য ও ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া ছাড়া নিজেকে স্পষ্ট করিয়া পুরা করিয়া প্রকাশ করিতেই পারে না। এই সমস্তটাই মানুষের কাছে মানুষের প্রকাশরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থা না হইলে তাহাকে আমরা সভ্যতা অর্থাৎ পূর্ণমনুষ্যত্ব বলিতেই পারি না। রাজ্যেই বলো, সমাজেই বলো, যে ব্যাপারে আমরা এক-একজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একের সঙ্গে সকলের যোগ নাই, সেইখানেই আমরা অসভ্য। এইজন্য সভ্যসমাজের রাজ্যে আঘাত লাগিলে সেই রাজ্যের প্রত্যেক লোকের বৃহৎ কলেবরটাতে আঘাত লাগে; সমাজ কোনো দিকে সংকীর্ণ হইলে সেই সমাজের প্রত্যেক লোকের আত্মবিকাশ আচ্ছন্ন হইতে থাকে। মানুষের সংসারক্ষেত্রের এই-সমস্ত রচনা যে পরিমাণে উদার হয় সেই পরিমাণে সে আপনার মনুষ্যত্বকে অবাধে প্রকাশ করিতে পারে। যে পরিমাণে সেখানে সংকোচ আছে প্রকাশের অভাবে মানুষ সেই পরিমাণে সেখানে দীন হইয়া থাকে; কারণ, সংসার, কাজের উপলক্ষ করিয়া মানুষকে প্রকাশেরই জন্য এবং প্রকাশই একমাত্র আনন্দ।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে মানুষ এই-যে আপনাকেই প্রকাশ করে এখানে প্রকাশ করাটাই তাহার আসল লক্ষ্য নয়, ওটা কেবল গৌণফল। গৃহিণী ঘরের কাজের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু প্রকাশ

করাটাই তাঁহার মনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য নয়। গৃহকর্মের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার নানা অভিপ্রায় সাধন করেন ; সেই-সকল অভিপ্রায় কাজের উপর হইতে ঠিকরাইয়া আসিয়া তাঁহার প্রকৃতিকে আমাদের কাছে বাহির করিয়া দেয়।

কিন্তু সময় আছে যখন মানুষ মুখ্যতই আপনাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে। মনে করো যেদিন ঘরে বিবাহ সেদিন এক দিকে বিবাহের কাজটা সারিবার জন্য আয়োজন চলিতে থাকে, আবার অন্য দিকে শুধু কাজ সারা নহে, হৃদয়কে জানাইয়া দিবারও প্রয়োজন ঘটে ; সেদিন ঘরের লোক ঘরের মঙ্গলকে ও আনন্দকে সকলের কাছে ঘোষণা না করিয়া দিয়া থাকিতে পারে না। ঘোষণার উপায় কী ? বাঁশি বাজে, দীপ জ্বলে, ফুলপাতার মালা দিয়া ঘর সাজানো হয়। সুন্দর ধ্বনি, সুন্দর গন্ধ, সুন্দর দৃশ্যের দ্বারা, উজ্জ্বলতার দ্বারা, হৃদয় আপনাকে শতধারায় ফোয়ারার মতো চারি দিকে ছড়াইয়া ফেলিতে থাকে। এমনি করিয়া নানাপ্রকার ইঙ্গিতে আপনার আনন্দকে সে অন্যের মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়া সেই আনন্দকে সকলের মধ্যে সত্য করিতে চায়।

মা তাঁহার কোলের শিশুর সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু শুধু তাই নয়, কেবল কাজ করিয়া নয়, মায়ের স্নেহ আপনা-আপনি বিনা কারণে আপনাকে বাহিরে ব্যক্ত করিতে চায়। তখন সে কত খেলায় কত আদরে কত ভাষায় ভিতর হইতে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে। তখন সে শিশুকে নানা রঙের সাজে সাজাইয়া, নানা গহনা পরাইয়া, নিতান্তই বিনা প্রয়োজনে নিজের প্রাচুর্যকে প্রাচুর্যদ্বারা, মাধুর্যকে সৌন্দর্যদ্বারা বাহিরে বিস্তার না করিয়া থাকিতে পারে না।

ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের হৃদয়ের ধর্মই এই। সে আপনার আবেগকে বাহিরের জগতের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে চায়। সে নিজের মধ্যে নিজে পুরা নহে। অন্তরের সত্যকে কোনোপ্রকারে বাহিরে সত্য করিয়া তুলিলে তবে সে বাঁচে। যে বাড়িতে সে থাকে সে বাড়িটি তাহার কাছে কেবল ইঁট-কাঠের ব্যাপার হইয়া থাকে না ; সে বাড়িটিকে সে বাস্তু করিয়া তুলিয়া তাহাতে হৃদয়ের রঙ মাখাইয়া দেয়। যে দেশে হৃদয় বাস করে সে দেশ তাহার কাছে মাটি-জল-আকাশ হইয়া থাকে না ; সেই দেশ তাহার কাছে ঈশ্বরের জীবধাত্রীরূপকে জননীভাবে প্রকাশ করিলে তবে সে আনন্দ পায়, নহিলে হৃদয় আপনাকে বাহিরে দেখিতে পায় না। এমন না ঘটিলে হৃদয় উদাসীন হয় এবং ঔদাসীন্য হৃদয়ের পক্ষে মৃত্যু।

সত্যের সঙ্গে হৃদয় এমনি করিয়া কেবলই রসের সম্পর্ক পাতায়। রসের সম্বন্ধ যেখানে আছে সেখানে আদানপ্রদান আছে। আমাদের হৃদয়লক্ষ্মী জগতের যে কুটুম্ববাড়ি হইতে যেমন সওগাত পায় সেখানে তাহার অনুরূপ সওগাতটি না পাঠাইতে পারিলে তাহার গৃহিণীপনায় যেন ঘা লাগে। এইরূপ সওগাতের ডালায় নিজের কুটুম্বিতাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে নানা মাল-মসলা লইয়া, ভাষা লইয়া, স্বর লইয়া, তুলি লইয়া, পাথর লইয়া সৃষ্টি করিতে হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার নিজের কোনো প্রয়োজন সারা হইল তো ভালোই, কিন্তু অনেক সময়ে সে আপনার প্রয়োজন নষ্ট করিয়াও কেবল নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র। সে দেউলে হইয়াও আপনাকে ঘোষণা করিতে চায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এই-যে প্রকাশের বিভাগ ইহাই তাহার প্রধান বাজে খরচের বিভাগ ; এইখানেই বুদ্ধি-খাতাঞ্চিকে বারংবার কপালে করাঘাত করিতে হয়।

হৃদয় বলে, আমি অন্তরে যতখানি বাহিরেও ততখানি সত্য হইব কী করিয়া ? তেমন সামগ্রী, তেমন সুযোগ বাহিরে কোথায় আছে ? সে কেবলই কাঁদিতে থাকে যে, আমি আপনাকে দেখাইতে অর্থাৎ আপনাকে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ধনী হৃদয়ের মধ্যে যখন আপনার ধনিত্ব অনুভব করে তখন সেই ধনিত্ব বাহিরে প্রকাশ করিতে গিয়া কুবেরের ধনকেও সে ফুঁকিয়া দিতে পারে। প্রেমিক হৃদয়ের মধ্যে যখন যথার্থ প্রেম অনুভব করে তখন সেই প্রেমকে প্রকাশ অর্থাৎ বাহিরে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য সে ধন প্রাণ মান সমস্তই এক নিমেষে বিসর্জন করিতে পারে। এমনি করিয়া বাহিরকে অন্তরের ও অন্তরকে বাহিরের সামগ্রী করিবার একান্ত ব্যাকুলতা হৃদয়ের কিছুতেই ঘুচে না। বলরামদাসের একটি পদ আছে : তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির। অর্থাৎ প্রিয়বস্তু যেন

হৃদয়ের ভিতরকারই বস্তু ; তাহাকে কে যেন বাহিরে আনিয়াছে, সেইজন্য তাহাকে আবার ভিতরে ফিরাইয়া লইবার জন্য এতই আকাঙ্ক্ষা। আবার ইহার উলটাও আছে। হৃদয় আপনার ভিতরের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগকে যখন বাহিরের কিছুতে প্রত্যক্ষ করিতে না পারে তখন অন্তত সে নানা উপকরণ লইয়া নিজের হাতে তাহার একটা প্রতিরূপ গড়িবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। এমনি করিয়া জগৎকে আপনার ও আপনাকে জগতের করিয়া তুলিবার জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা কেবলই কাজ করিতেছে। নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করা এই কাজেরই একটি অঙ্গ। সেইজন্য এই প্রকাশব্যাপারে হৃদয় মানুষকে সর্বস্ব খোয়াইতেও রাজি করিয়া আনে।

বর্বর সৈন্য যখন লড়াই করিতে যায় তখন সে কেবলমাত্র শত্রুপক্ষকে হারাইয়া দিবার জন্যই ব্যস্ত থাকে না। তখন সে সর্বাঙ্গে রঙচঙ মাখিয়া চীৎকার করিয়া বাজনা বাজাইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিয়া চলে ; ইহা অন্তরের হিংসাকে বাহিরে মূর্তিমান করিয়া তোলা। এ না হইলে হিংসা যেন পুরা হয় না। হিংসা অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে ; আর আত্মপ্রকাশের তৃপ্তির জন্য এই-সমস্ত বাজে কাণ্ড করিতে থাকে।

এখনকার পাশ্চাত্যযুদ্ধেও জিগীষার আত্মপ্রকাশের জন্য বাজনা-বাদ্য সাজ-সরঞ্জাম যে একেবারেই নাই, তাহা নয়। তবু এই-সকল আধুনিক যুদ্ধে বুদ্ধির চালেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছে, ক্রমেই মানবহৃদয়ের ধর্ম ইহা হইতে সরিয়া আসিতেছে। ইজিপ্টে দরবেশের দল যখন ইংরেজসৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছিল তখন তাহারা কেবল লড়াইয়ে জিতিবার জন্যই মরে নাই। তাহারা অন্তরের উদ্দীপ্ত তেজকে প্রকাশ করিবার জন্যই শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত মরিয়াছিল। লড়াইয়ে যাহারা কেবল জিতিতেই চায় তাহারা এমন অনাবশ্যক কাণ্ড করে না। আত্মহত্যা করিয়াও মানুষের হৃদয় আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। এতবড়ো বাজে খরচের কথা কে মনে করিতে পারে!

আমরা যে পূজা করিয়া থাকি তাহা বুদ্ধিমানেরা এক ভাবে করে, ভক্তিমানেরা আর-এক ভাবে করে। বুদ্ধিমান মনে করে, পূজা করিয়া ভগবানের কাছ হইতে সদ্‌গতি আদায় করিয়া লইব ; আর ভক্তিমান বলে, পূজা না করিলে আমার ভক্তির পূর্ণতা হয় না, ইহার আর কোনো ফল না'ই থাকুক, হৃদয়ের ভক্তিকে বাহিরে স্থান দিয়া তাহাকেই পুরা আশ্রয় দেওয়া হইল। এইরূপে ভক্তি পূজার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিয়া নিজেকেই সার্থক করে। বুদ্ধিমানের পূজা সুদে টাকা খাটানো ; ভক্তিমানের পূজা একেবারেই বাজে খরচ। হৃদয় আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া লোকসানকে একেবারে গণ্যই করে না।

বিশ্বজগতের মধ্যেও যেখানে আমরা আমাদের হৃদয়ের এই ধর্মটি দেখি সেখানেই আমাদের হৃদয় আপনিই আপনাকে ধরা দিয়া বসে, কোনো কথাটি জিজ্ঞাসা করে না। জগতের মধ্যে এই বেহিসাবি বাজে খরচের দিকটা সৌন্দর্য। যখন দেখি, ফুল কেবলমাত্র বীজ হইয়া উঠিবার জন্যই তাড়া লাগাইতেছে না, নিজের সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া সুন্দর হইয়া ফুটিতেছে— মেঘ কেবল জল ঝরাইয়া কাজ সারিয়া তাড়াতাড়ি ছুটি লইতেছে না, রহিয়া-বসিয়া বিনা প্রয়োজনে রঙের ছটায় আমাদের চোখ কাড়িয়া লইতেছে— গাছগুলা কেবল কাঠি হইয়া শীর্ণ কাঙালের মতো বৃষ্টি ও আলোকের জন্য হাত বাড়াইয়া নাই, সবুজ শোভার পুঞ্জ পুঞ্জ ঐশ্বর্যে দিক্‌বধূদের ডালি ভরিয়া দিতেছে— যখন দেখি, সমুদ্র যে কেবল জলকে মেঘরূপে পৃথিবীর চারি দিকে প্রচার করিয়া দিবার একটা মস্ত আপিস তাহা নহে, সে আপনার তরল নীলিমার অতল স্পর্শ ভয়ের দ্বারা ভীষণ— এবং পর্বত কেবল ধরাতলে নদীর জল জোগাইয়াই ক্ষান্ত নহে, সে যোগনিমগ্ন রুদ্রের মতো ভয়ংকরকে আকাশ জুড়িয়া নিস্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে— তখন জগতের মধ্যে আমরা হৃদয়ধর্মের পরিচয় পাই। তখন চিরপ্রবীণ বুদ্ধি মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করে, জগৎ জুড়িয়া এত অনাবশ্যক চেষ্টার বাজে খরচ কেন? চিরনবীন হৃদয় বলে, কেবলমাত্র আমাকে ভুলাইবার জন্যই, আর তো কোনো কারণ দেখি না। হৃদয়ই জানে, জগতের মধ্যে একটি হৃদয় কেবলই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। নহিলে সৃষ্টির মধ্যে এত রূপ, এত গান, এত হাবভাব, এত আভাস-ইঙ্গিত, এত সাজসজ্জা কেন? হৃদয় যে ব্যাবসাদারির

কৃপণতায় ভোলে না, সেইজন্যই তাহাকে ভুলাইতে জলে স্থলে আকাশে পদে পদে প্রয়োজনকে গোপন করিয়া এত অনাবশ্যক আয়োজন। জগৎ যদি রসময় না হইত তবে আমরা নিতান্তই ছোটো হইয়া অপমানিত হইয়া থাকিতাম ; আমাদের হৃদয় কেবলই বলিত, জগতের যজ্ঞে আমারই নিমন্ত্রণ নাই। কিন্তু সমস্ত জগৎ তাহার অসংখ্য কাজের মধ্যেও রসে ভরিয়া উঠিয়া হৃদয়কে এই মধুর কথাটি বলিতেছে যে, আমি তোমাকে চাই : নানারকম করিয়া চাই ; হাসিতে চাই, কান্নাতে চাই ; ভয়ে চাই, ভরসায় চাই ; ক্ষোভে চাই, শান্তিতে চাই।

এমনি জগতের মধ্যেও আমরা দুটা ব্যাপার দেখিতেছি, একটা কাজের প্রকাশ, একটা ভাবের প্রকাশ। কিন্তু, কাজের ভিতর দিয়া যাহা প্রকাশ হইতেছে তাহাকে সমগ্ররূপে দেখা ও বোঝা আমাদের কর্ম নয়। ইহার মধ্যে যে অমেয় জ্ঞানশক্তি আছে আমাদের জ্ঞান দিয়া তাহার কিনারা পাওয়া যায় না।

কিন্তু ভাবের প্রকাশ একেবারে প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সুন্দর যাহা তাহা সুন্দর। বিরাট যাহা তাহা মহান। রুদ্র যাহা তাহা ভয়ংকর। জগতের যাহা রস তাহা একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, এবং আমাদের হৃদয়ের রসকে বাহিরে টানিয়া আনিতেছে। এই মিলনের মধ্যে লুকোচুরি যতই থাক্, বাধাবিঘ্ন যতই ঘটুক, তবু প্রকাশ ছাড়া এবং মিলন ছাড়া ইহার মধ্যে আর-কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তবেই দেখিতেছি, জগৎসংসারে ও মানবসংসারে একটা সাদৃশ্য আছে। ঈশ্বরের সত্যরূপ জ্ঞানরূপ জগতের নানা কাজে প্রকাশ পাইতেছে, আর তাঁহার আনন্দরূপ জগতের নানা রসে প্রত্যক্ষ হইতেছে। কাজের মধ্যে তাঁহার জ্ঞানকে আয়ত্ত করা শক্ত, রসের মধ্যে তাঁহার আনন্দকে অনুভব করায় জটিলতা নাই। কারণ, রসের মধ্যে তিনি যে নিজেকে প্রকাশই করিতেছেন।

মানুষের সংসারেও আমাদের জ্ঞানশক্তি কাজ করিতেছে, আমাদের আনন্দশক্তি রসের সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। কাজের মধ্যে আমাদের আত্মরক্ষার শক্তি, আর রসের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রকাশের শক্তি। আত্মরক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, আর আত্মপ্রকাশ আমাদের প্রয়োজনের বেশি।

প্রয়োজনে প্রকাশকে এবং প্রকাশে প্রয়োজনকে বাধা দেয়, যুদ্ধের উদাহরণে তাহা দেখাইয়াছি। স্বার্থ বাজে খরচ করিতে চায় না, অথচ বাজে খরচেই আনন্দ আত্মপরিচয় দেয়। এইজন্যই স্বার্থের ক্ষেত্রে আপিসে আমাদের আত্মপ্রকাশ যতই অল্প হয় ততই তাহা শ্রদ্ধেয় হইয়া থাকে, এবং এইজন্যই আনন্দের উৎসবে স্বার্থকে যতই বিস্মৃত হইতে দেখি উৎসব ততই উজ্জ্বল হইতে থাকে।

তাই সাহিত্যে মানুষের আত্মপ্রকাশে কোনো বাধা নাই। স্বার্থ সেখান হইতে দূরে। দুঃখ সেখানে আমাদের হৃদয়ের উপর চোখের জলের বাষ্প সৃজন করে, কিন্তু আমাদের সংসারের উপর হস্তক্ষেপ করে না ; ভয় আমাদের হৃদয়কে দোলা দিতে থাকে, কিন্তু আমাদের শরীরকে আঘাত করে না ; সুখ আমাদের হৃদয়ে পুলকস্পর্শ সঞ্চার করে, কিন্তু আমাদের লোভকে নাড়া দিয়া অত্যন্ত জাগাইয়া তোলে না। এইরূপে মানুষ আপনার প্রয়োজনের সংসারের ঠিক পাশে-পাশেই একটা প্রয়োজন-ছাড়া সাহিত্যের সংসার রচনা করিয়া চলিয়াছে। সেখানে সে নিজের বাস্তব কোনো ক্ষতি না করিয়া নানা রসের দ্বারা আপনার প্রকৃতিকে নানারূপে অনুভব করিবার আনন্দ পায়, আপনার প্রকাশকে বাধাহীন করিয়া দেখে। সেখানে দায় নাই, সেখানে খুশি। সেখানে পেয়াদা-বরকন্দাজ নাই, সেখানে স্বয়ং মহারাজা।

এইজন্য, সাহিত্যে আমরা কিসের পরিচয় পাই ? না, মানুষের যাহা প্রাচুর্য, যাহা ঐশ্বর্য, যাহা তাহার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। যাহা তাহার সংসারের মধ্যেই ফুরাইয়া যাইতে পারে নাই।

এইজন্য, ইতিমধ্যে আমার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছি, ভোজনরস যদিচ পৃথিবীতে ছোটো ছেলে হইতে বুড়া পর্যন্ত সকলেরই কাছে সুপরিচিত তবু সাহিত্যে তাহা প্রহসন ছাড়া অন্যত্র তেমন করিয়া স্থান পায় নাই। কারণ, সে রস আহারের তৃপ্তিকে ছাপাইয়া উছলিয়া উঠে না। পেটটি পুরাইয়া একটি জলদগম্ভীর 'আঃ' বলিয়াই তাহাকে হাতে-হাতেই নগদ-বিদায় করিয়া দিই। সাহিত্যের রাজদ্বারে তাহাকে দক্ষিণার জন্য নিমন্ত্রণপত্র দিই না। কিন্তু যাহা আমাদের ভাঁড়ার-ঘরের ভাঁড়ের মধ্যে কিছুতেই

কুলায় না সেই-সকল রসের বন্যাই সাহিত্যের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া কলধ্বনি করিতে করিতে বহিয়া যায়। মানুষ তাহাকে কাজের মধ্যেই নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে না বলিয়াই ভরা হৃদয়ের বেগে সাহিত্যের মধ্যে তাহাকে প্রকাশ করিয়া তবে বাঁচে।

এইরূপ প্রাচুর্যেই মানুষের যথার্থ প্রকাশ। মানুষ যে ভোজনপ্রিয় তাহা সত্য বটে, কিন্তু মানুষ যে বীর ইহাই সত্যতম। মানুষের এই সত্যের জোর সামলাইবে কে ? তাহা ভাগীরথীর মতো পাথর গুঁড়াইয়া, ঐরাবতকে ভাসাইয়া, গ্রাম নগর শস্যক্ষেত্রের তৃষ্ণা মিটাইয়া, একেবারে সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। মানুষের বীরত্ব মানুষের সংসারের সমস্ত কাজ সারিয়া দিয়া সংসারকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

এমনি করিয়া স্বভাবতই মানুষের যাহা-কিছু বড়ো, যাহা-কিছু নিত্য, যাহা সে কাজে-কর্মে ফুরাইয়া ফেলিতে পারে না, তাহাই মানুষের সাহিত্যে ধরা পড়িয়া আপনা-আপনি মানুষের বিরাটরূপকেই গড়িয়া তুলে।

আরো একটি কারণ আছে। সংসারে যাহাকে আমরা দেখি তাহাকে ছড়াইয়া দেখি ; তাহাকে এখন একটু তখন একটু, এখানে একটু সেখানে একটু দেখি ; তাহাকে আরো দশটার সঙ্গে মিশাইয়া দেখি। কিন্তু সাহিত্যে সেই-সকল ফাঁক, সেই-সকল মিশাল থাকে না। সেখানে যাহাকে প্রকাশ করা হয় তাহার উপরেই সমস্ত আলো ফেলা হয়। তখনকার মতো আর-কিছুকেই দেখিতে দেওয়া হয় না। তাহার জন্য নানা কৌশলে এমন একটি স্থান তৈরি করিয়া দেওয়া হয় যেখানে সে'ই কেবল দীপ্যমান।

এমন অবস্থায়, এমন জমাট স্বাতন্ত্র্যে, এমন প্রখর আলোকে যাহাকে মানাইবে না তাহাকে আমরা স্বভাবতই এ জায়গায় দাঁড় করাই না। কারণ, এমন স্থানে অযোগ্যকে দাঁড় করাইলে তাহাকে লজ্জিত করা হয়। সংসারের নানা আচ্ছাদনের মধ্যে পেটুক তেমন করিয়া চোখে পড়ে না, কিন্তু সাহিত্যমঞ্চের উপর তাহাকে একাগ্র আলোকে ধরিয়া দেখাইলে সে হাস্যকর হইয়া উঠে। এইজন্য মানুষের যে-প্রকাশটি তুচ্ছ নয়, মানবহৃদয় যাহাকে করুণায় বা বীর্যে, রুদ্রতায় বা শান্তিতে আপনার উপযুক্ত প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত না হয়, যাহা কলানৈপুণ্যের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়াইয়া নিত্যকালের অনিমেষ দৃষ্টিপাত মাথা তুলিয়া সহ্য করিতে পারে, স্বভাবতই মানুষ তাহাকেই সাহিত্যে স্থান দেয় ; নহিলে তাহার অসংগতি আমাদের কাছে পীড়াজনক হইয়া উঠে। রাজা ছাড়া আর-কাহাকেও সিংহাসনের উপর দেখিলে আমাদের মনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।

কিন্তু সকল মানুষের বিচারবুদ্ধি বড়ো নয়, সকল সমাজও বড়ো নয়, এবং এক-একটা সময় আসে যখন ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র মোহে মানুষকে ছোটো করিয়া দেয়। তখন সেই দুঃসময়ের বিকৃত দর্পণে ছোটো জিনিস বড়ো হইয়া দেখা দেয় এবং তখনকার সাহিত্যে মানুষ আপনার ছোটোকেই বড়ো করিয়া তোলে, আপনার কলঙ্কের উপরেই স্পর্ধার সঙ্গে আলো ফেলে। তখন কলার বদলে কৌশল, গৌরবের জায়গায় গর্ব এবং টেনিসনের আসনে কিপ্‌লিঙের আবির্ভাব হয়।

কিন্তু মহাকাল বসিয়া আছেন। তিনি তো সমস্তই ছাঁকিয়া লইবেন। তাঁহার চালুনির মধ্য দিয়া যাহা ছোটো, যাহা জীর্ণ তাহা গলিয়া ধুলায় পড়িয়া ধুলা হইয়া যায়। নানা কাল ও নানা লোকের হাতে সেই-সকল জিনিসই টেঁকে যাহার মধ্যে সকল মানুষই আপনাকে দেখিতে পায়। এমনি করিয়া বাছাই হইয়া যাহা থাকিয়া যায় তাহা মানুষের সর্বদেশের সর্বকালের ধন।

এমনি করিয়া ভাঙিয়া গড়িয়া সাহিত্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃতির, মানুষের প্রকাশের একটি নিত্যকালীন আদর্শ আপনি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। সেই আদর্শই নূতন যুগের সাহিত্যেরও হাল ধরিয়া থাকে। সেই আদর্শমতই যদি আমরা সাহিত্যের বিচার করি তবে সমগ্র মানবের বিচারবুদ্ধির সাহায্য লওয়া হয়।

এইবার আমার আসল কথাটি বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ; সেটি এই, সাহিত্যকে দেশকালপাত্রে ছোটো করিয়া দেখিলে ঠিকমত দেখাই হয় না। আমরা যদি এইটে বুঝি যে, সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের যাহা দেখিবার তাহা দেখিতে পাইব। যেখানে সাহিত্যরচনায় লেখক উপলক্ষমাত্র না হইয়াছে সেখানে তাহার লেখা নষ্ট হইয়া

গেছে। যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব অনুভব করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে। তবেই সাহিত্যকে এইভাবে দেখিতে হইবে যে, বিশ্বমানব রাজমিস্ত্রি হইয়া এই মন্দিরটি গড়িয়া তুলিতেছেন ; লেখকেরা নানা দেশ ও নানা কাল হইতে আসিয়া তাহার মজুরের কাজ করিতেছে। সমস্ত ইমারতের প্ল্যানটা কী তাহা আমাদের কারও সামনে নাই বটে, কিন্তু যেটুকু ভুল হয় সেটুকু বার বার ভাঙা পড়ে ; প্রত্যেক মজুরকে তাহার নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা খাটাইয়া, নিজের রচনাটুকুকে সমগ্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া, সেই অদৃশ্য প্ল্যানের সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে হয়, ইহাতেই তাহার ক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং এইজন্যই তাহাকে সাধারণ মজুরের মতো কেহ সামান্য বেতন দেয় না, তাহাকে ওস্তাদের মতো সম্মান করিয়া থাকে।

আমার উপরে যে আলোচনার ভার দেওয়া হইয়াছে ইংরাজিতে আপনারা তাহাকে Comparative Literature নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।

কর্মের মধ্যে মানুষ কোন্ কথা বলিতেছে, তাহার লক্ষ্য কী, তাহার চেষ্টা কী, ইহা যদি বুঝিতে হয় তবে সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে মানুষের অভিপ্রায়ের অনুসরণ করিতে হয়। আকবরের রাজত্ব বা গুজরাটের ইতিবৃত্ত বা এলিজাবেথের চরিত্র এমন করিয়া আলাদা আলাদা দেখিলে কেবল খবর-জানার কৌতূহলনিবৃত্তি হয় মাত্র। যে জানে আকবর বা এলিজাবেথ উপলক্ষমাত্র, যে জানে মানুষ সমস্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়া নিজের গভীরতম অভিপ্রায়কে নানা সাধনায় নানা ভুল ও নানা সংশোধনে সিদ্ধ করিবার জন্য কেবলই চেষ্টা করিতেছে, যে জানে মানুষ সকল দিকেই সকলের সহিত বৃহৎভাবে যুক্ত হইয়া নিজেকে মুক্তি দিবার প্রয়াস পাইতেছে, যে জানে স্বতন্ত্র নিজেকে রাজতন্ত্রে ও রাজতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে সার্থক করিবার জন্য যুঝিয়া মরিতেছে— মানব বিশ্বমানবের মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য, ব্যষ্টি সমষ্টির মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য নিজেকে লইয়া কেবলই ভাঙাগড়া করিতেছে— সে ব্যক্তি মানুষের ইতিহাস হইতে, লোকবিশেষকে নহে, সেই নিত্যমানুষের নিত্যসচেষ্ট অভিপ্রায়কে দেখিবারই চেষ্টা করে। সে কেবল তীর্থের যাত্রীদের দেখিয়াই ফিরিয়া আসে না ; সমস্ত যাত্রীরা যে একমাত্র দেবতাকে দেখিবার জন্য নানা দিক হইতে আসিতেছে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তবে সে ঘরে ফেরে।

তেমনি সাহিত্যের মধ্যে মানুষ আপনার আনন্দকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিতেছে, এই প্রকাশের বিচিত্রমূর্তির মধ্যে মানুষের আত্মা আপনার কোন্ নিত্যরূপ দেখাইতে চায়, তাহাই বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে যথার্থ দেখিবার জিনিস। সে আপনাকে রোগী না ভোগী না যোগী কোন্ পরিচয়ে পরিচিত করিতে আনন্দবোধ করিতেছে, জগতের মধ্যে মানুষের আত্মীয়তা কতদূর পর্যন্ত সত্য হইয়া উঠিল, অর্থাৎ সত্য কতদূর পর্যন্ত তাহার আপনার হইয়া উঠিল, ইহাই জানিবার জন্য এই সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাকে কৃত্রিম রচনা বলিয়া জানিলে হইবে না ; ইহা একটি জগৎ ; ইহার তত্ত্ব আমাদের কোনো ব্যক্তিবিশেষের আয়ত্তাধীন নহে ; বস্তুজগতের মতো ইহার সৃষ্টি চলিয়াছেই, অথচ সেই অসমাপ্ত সৃষ্টির অন্তরতম স্থানে একটি সমাপ্তির আদর্শ অচল হইয়া আছে।

সূর্যের ভিতরের দিকে বস্তুপিণ্ড আপনাকে তরল-কঠিন নানা ভাবে গড়িতেছে, সে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাহাকে ঘিরিয়া আলোকের মণ্ডল সেই সূর্যকে কেবলই বিশ্বের কাছে ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। এইখানেই সে আপনাকে কেবলই দান করিতেছে, সকলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিতেছে। মানুষকে যদি আমরা সমগ্রভাবে এমনি করিয়া দৃষ্টির বিষয় করিতে পারিতাম তবে তাহাকে এইরূপ সূর্যের মতোই দেখিতাম। দেখিতাম, তাহার বস্তুপিণ্ড ভিতরে ভিতরে ধীরে ধীরে নানা স্তরে বিন্যস্ত হইয়া উঠিতেছে, আর তাহাকে ঘিরিয়া একটি প্রকাশের জ্যোতির্মণ্ডলী নিয়তই আপনাকে চারি দিকে বিকীর্ণ করিয়াই আনন্দ পাইতেছে। সাহিত্যকে মানুষের চারি দিকে সেই ভাষারচিত প্রকাশমণ্ডলীরূপে একবার দেখো। এখানে জ্যোতির ঝড় বহিতেছে, জ্যোতির উৎস উঠিতেছে, জ্যোতির্বাষ্পের সংঘাত ঘটিতেছে।

লোকালয়ের পথ দিয়া চলিতে চলিতে যখন দেখিতে পাও মানুষের অবকাশ নাই— মুদি দোকান চালাইতেছে, কামার লোহা পিটিতেছে, মজুর বোঝা লইয়া চলিয়াছে, বিষয়ী আপনার খাতার হিসাব মিলাইতেছে— সেইসঙ্গে আর-একটা জিনিস চোখে দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু একবার মনে মনে দেখো : এই রাস্তার দুই ধারে ঘরে-ঘরে দোকানে-বাজারে অলিতে-গলিতে কত শাখায়-প্রশাখায় রসের ধারা কত পথ দিয়া কত মলিনতা কত সংকীর্ণতা কত দারিদ্র্যের উপরে কেবলই আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে ; রামায়ণ-মহাভারত কথা-কাহিনী কীর্তন-পাঁচালি বিশ্বমানবের হৃদয়সুধাকে প্রত্যেক মানবের কাছে দিনরাত বাঁটিয়া দিতেছে ; নিতান্ত তুচ্ছ লোকের ক্ষুদ্র কাজের পিছনে রাম লক্ষ্মণ আসিয়া দাঁড়াইতেছেন : অন্ধকার বাসার মধ্যে পঞ্চবটীর করুণামিশ্রিত হাওয়া বহিতেছে ; মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি হৃদয়ের প্রকাশ মানুষের কর্মক্ষেত্রের কাঠিন্য ও দারিদ্র্যকে তাহার সৌন্দর্য ও মঙ্গলের কঙ্কণ-পরা দুটি হাত দিয়া বেড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত সাহিত্যকে সমস্ত মানুষের চারি দিকে একবার এমনি করিয়া দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে, মানুষ আপনার বাস্তব সত্তাকে ভাবের সত্তায় নিজের চতুর্দিকে আরো অনেক দূর পর্যন্ত বাড়াইয়া লইয়া গেছে। তাহার বর্ষার চারি দিকে কত গানের বর্ষা, কাব্যের বর্ষা, কত মেঘদূত, কত বিদ্যাপতি বিস্তীর্ণ হইয়া আছে ; তাহার ছোটো ঘরটির সুখদুঃখকে সে কত চন্দ্রসূর্যবংশীয় রাজাদের সুখদুঃখের কাহিনীর মধ্যে বড়ো করিয়া তুলিয়াছে ! তাহার ঘরের মেয়েটিকে ঘিরিয়া গিরিরাজকন্যার করুণা সর্বদা সঞ্চরণ করিতেছে ; কৈলাসের দরিদ্রদেবতার মহিমার মধ্যে সে আপনার দারিদ্র্যদুঃখকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে ! এইরূপে অনবরত মানুষ আপনার চারি দিকে যে বিকিরণ সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাহিরে যেন নিজেকে নিজে ছাড়াইয়া, নিজেকে নিজে বাড়াইয়া চলিতেছে। যে মানুষ অবস্থার দ্বারা সংকীর্ণ সেই মানুষ নিজের ভাবসৃষ্টিদ্বারা নিজের এই-যে বিস্তার রচনা করিতেছে, সংসারের চারি দিকে যাহা একটি দ্বিতীয় সংসার, তাহাই সাহিত্য।

এই বিশ্বসাহিত্যে আমি আপনাদের পথপ্রদর্শক হইব এমন কথা মনেও করিবেন না। নিজের নিজের সাধ্য-অনুসারে এ পথ আমাদের সকলকে কাটিয়া চলিতে হইবে। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, পৃথিবী যেমন আমার খেত এবং তোমার খেত এবং তাঁহার খেত নহে, পৃথিবীকে তেমন করিয়া জানা অত্যন্ত গ্রাম্যভাবে জানা, তেমনি সাহিত্য আমার রচনা, তোমার রচনা এবং তাঁহার রচনা নহে। আমরা সাধারণত সাহিত্যকে এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া থাকি। সেই গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব, প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশচেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

মাঘ ১৩১৩

সৌন্দর্য ও সাহিত্য

'সৌন্দর্যবোধ' ও 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে আমার বক্তব্য বিষয়টি স্পষ্ট হয় নাই, এমন অপবাদ প্রচার হওয়াতে যথাসাধ্য পুনরুক্তি বাঁচাইয়া মূলকথাটা পরিষ্কার করিয়া লইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

যেমন জগতে যে ঘটনাটিকে কেবল এইমাত্র জানি যে তাহা ঘটিতেছে, কিন্তু কেন ঘটিতেছে, তাহার পূর্বাপর কী, জগতের অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কোথায়, তাহা না জানিলে তাহাকে পুরাপুরি আমাদের জ্ঞানে জানা হয় না— তেমনি জগতে যে সত্য কেবল আছে মাত্র বলিয়াই জানি, কিন্তু তাহাতে আমার কোনো আনন্দই নাই, তাহা আমার হৃদয়ের পক্ষে একেবারে নাই বাললেই হয়। এই-যে এতবড়ো জগতে আমরা রহিয়াছি ইহার অনেকটাকেই আমাদের জানা-জগতের সম্পূর্ণ সামিল করিয়া আনিতে পারি নাই এবং ইহার অধিকাংশই আমাদের মনোহর জগতের মধ্যে ভুক্ত হইয়া আমাদের আপন হইয়া উঠে নাই।

অথচ, জগতের যতটা জ্ঞানের দ্বারা আমি জানিব ও হৃদয়ের দ্বারা আমি পাইব ততটা আমারই ব্যাপ্তি, আমারই বিস্তৃতি। জগৎ যে পরিমাণে আমার অতীত সেই পরিমাণে আমিই ছোটো। সেইজন্য আমার মনোবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, আমার কর্মশক্তি নিখিলকে কেবলই অধিক করিয়া অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এমনি করিয়াই আমাদের সত্ত্ব সত্যে ও শক্তিতে বিস্তৃত হইয়া উঠে।

এই বিকাশের ব্যাপারে আমাদের সৌন্দর্যবোধ কোন্ কাজে লাগে? সে কি সত্যের যে বিশেষ অংশকে আমরা বিশেষ করিয়া সুন্দর বলি কেবল তাহাকেই আমাদের হৃদয়ের কাছে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া বাকি অংশকে ম্লান ও তিরস্কৃত করিয়া দেয়? তা যদি হয় তবে তো সৌন্দর্য আমাদের বিকাশের বাধা, নিখিল সত্যের মধ্যে হৃদয়কে ব্যাপ্ত হইতে দিবার পক্ষে সে আমাদের অন্তরায়। সে তো তবে সত্যের মাঝখানে বিন্ধ্যাচলের মতো উঠিয়া তাহাকে সুন্দর-অসুন্দরের আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পরস্পরের মধ্যে চলাচলের পথকে দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। আমি বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে তাহা নহে; জ্ঞান যেমন ক্রমে ক্রমে সমস্ত সত্যকেই আমাদের বুদ্ধিশক্তির আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে সৌন্দর্যবোধেও তেমনি সমস্ত সত্যকেই ক্রমে ক্রমে আমাদের আনন্দের অধিকারে আনিবে, এই তাহার একমাত্র সার্থকতা। সমস্তই সত্য, এইজন্য সমস্তই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। এবং সমস্তই সুন্দর, এইজন্য সমস্তই আমাদের আনন্দের সামগ্রী।

গোলাপফুল আমার কাছে যে কারণে সুন্দর সমগ্র জগতের মধ্যে সেই কারণটি বড়ো করিয়া রহিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে সেইরূপ উদার প্রাচুর্য অথচ তেমনি কঠিন সংযম; তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি অপরিসীম বৈচিত্র্যে আপনাকে চতুর্দিকে সহস্রধা করিতেছে এবং তাহার কেন্দ্রানুগ শক্তি এই উদ্দাম বৈচিত্র্যের উল্লাসকে একটিমাত্র পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে মিলাইয়া রাখিয়াছে। এই-যে এক দিকে ফুটিয়া পড়া এবং আর-এক দিকে আঁটিয়া ধরা, ইহারই ছন্দে ছন্দে সৌন্দর্য; বিশ্বের মধ্যে এই ছাড়-দেওয়া এবং টান-রাখার নিত্যলীলাতেই সুন্দর আপনাকে সর্বত্র প্রকাশ করিতেছেন। জাদুকর অনেকগুলি গোলা লইয়া যখন খেলা করে তখন গোলাগুলিকে একসঙ্গে ছুঁড়িয়া ফেলা এবং লুফিয়া ধরার দ্বারাই আশ্চর্য চাতুর্য ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহার মধ্যে যদি কোনো একটা গোলার কেবল ক্ষণকালীন অবস্থা আমাদের চোখে পড়ে তবে হয় তাহার ওঠা নয় পড়া দেখি; তাহাতে দেখার পূর্ণতা হয় না বলিয়া আনন্দের পূর্ণতা ঘটে না। জগতের আনন্দলীলাকেও আমরা যতই পূর্ণতররূপে দেখি ততই জানিতে পারি, ভালোমন্দ সুখদুঃখ জীবনমৃত্যু সমস্তই উঠিয়া ও পড়িয়া বিশ্বসংগীতের ছন্দ রচনা করিতেছে; সমগ্রভাবে দেখিলে এই ছন্দের কোথাও বিচ্ছেদ নাই, সৌন্দর্যের কোথাও লাঘব নাই। জগতের মধ্যে সৌন্দর্যকে এইরূপ সমগ্রভাবে দেখিতে শেখাই সৌন্দর্যবোধের শেষ লক্ষ্য। মানুষ তেমনি করিয়া দেখিবার দিকে যতই অগ্রসর হইতেছে তাহার আনন্দকে ততই জগতের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিতেছে; পূর্বে যাহা নিরর্থক ছিল ক্রমেই তাহা সার্থক হইয়া উঠিতেছে, পূর্বে সে যাহার প্রতি উদাসীন ছিল ক্রমে সে তাহাকে আপনার সঙ্গে মিলাইয়া লইতেছে, এবং যাহাকে বিরুদ্ধ বলিয়া জানিত তাহাকে বৃহতের মধ্যে দেখিয়া তাহার ঠিক স্থানটিকে দেখিতে পাইতেছে ও তৃপ্তিলাভ করিতেছে। বিশ্বের সমগ্রের মধ্যে মানুষের এই সৌন্দর্যকে দেখার বৃত্তান্ত, জগৎকে তাহার আনন্দের দ্বারা অধিকার করিবার ইতিহাস, মানুষের সাহিত্যে আপনা-আপনি রক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু সৌন্দর্যকে অনেক সময় আমরা নিখিল-সত্য হইতে পৃথক করিয়া দেখি এবং তাহাকে লইয়া দল বাঁধিয়া বেড়াই, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে। সৌন্দর্যের বিশেষ ভাবের অনুশীলনটা যেন একটা বিশেষ বাহাদুরির কাজ, এইরূপ ভঙ্গিতে একদল লোক তাহার জয়ধ্বজা উড়াইয়া বেড়ায়। স্বয়ং ঈশ্বরকেও এইরূপ নিজের বিশেষদলভুক্ত করিয়া, বড়াই করিয়া এবং অন্য দলের সঙ্গে লড়াই করিয়া বেড়াইতে মানুষকে দেখা গিয়াছে।

বলা বাহুল্য, সৌন্দর্যকে চারি দিক হইতে বিশেষ করিয়া লইয়া জগতের আর-সমস্ত ডিঙাইয়া

কেবল তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়ানো সংসারের পনেরো-আনা লোকের কর্ম নহে। কেবলই সুন্দর-অসুন্দর বাঁচাইয়া জৈন তপস্বীদের মতো প্রতি পদক্ষেপের হিসাব লইয়া চলিতে গেলে চলাই হয় না।

পৃথিবীতে, কী সৌন্দর্যে কী শুচিতায় যাহাদের হিসাব নিরতিশয় সূক্ষ্ম তাহারা মোটা-হিসাবের লোকদিগকে অবজ্ঞা করে ; তাহাদিগকে বলে গ্রাম্য। মোটা-হিসাবের লোকেরা সসংকোচে তাহা স্বীকার করিয়া লয়।

য়ুরোপের সাহিত্যে সৌন্দর্যের দোহাই দিয়া, যাহা-কিছু প্রচলিত, যাহা-কিছু প্রাকৃত, তাহাকে তুচ্ছ, তাহাকে humdrum বলিয়া একেবারে ঝাঁটাইয়া দিবার চেষ্টা কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায়। আমার বেশ মনে আছে, অনেক দিন হইল, কোনো বড়ো লেখকের লেখা একখানি ফরাসি বহির ইংরেজি তর্জমা পড়িয়াছিলাম। সে বইখানি নামজাদা। কবি সুইন্‌বরন্‌ তাহাকে Gospel of Beauty অর্থাৎ সৌন্দর্যের ধর্মশাস্ত্র উপাধি দিয়াছেন। তাহাতে এক দিকে একজন পুরুষ ও আর-এক দিকে একজন স্ত্রীলোক আপনার সম্পূর্ণ মনের মতনকে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর মধ্যে খুঁজিয়া বেড়ানোকেই জীবনের ব্রত করিয়াছে। সংসারের যাহা-কিছু প্রতিদিনের, যাহা-কিছু চারি দিকের, যাহা-কিছু সাধারণ, তাহা হইতে কোনোমতে আপনাকে বাঁচাইয়া অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার সামান্যতাকে পদে পদে অপমান করিয়া, সমস্ত বইখানির মধ্যে আশ্চর্য লিপিচাতুর্যের সহিত রঙের পর রঙ, সুরের পর সুর চড়াইয়া সৌন্দর্যের একটি অতিদুর্লভ উৎকর্ষের প্রতি একটি অতিতীব্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করা হইয়াছে। আমার তো মনে হয়, এমন নিষ্ঠুর বই আমি পড়ি নাই। আমার কেবলই মনে হইতেছিল, সৌন্দর্যের টান মানুষের মনকে যদি সংসার হইতে এমনি করিয়া ছিনিয়া লয়, মানুষের বাসনাকে তাহার চারি দিকের সহিত যদি কোনোমতেই খাপ খাইতে না দেয়, যাহা প্রচলিত তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রচার করে, যাহা হিতকর তাহাকে গ্রাম্য বলিয়া পরিহাস করিতে থাকে, তবে সৌন্দর্যে ধিক্‌ থাক্‌। এ যেন আঙুরকে দলিয়া তাহার সমস্ত কান্তি ও রসগন্ধ বাদ দিয়া কেবলমাত্র তাহার মদটুকুকেই চোলাইয়া লওয়া।

সৌন্দর্য জাত মানিয়া চলে না, সে সকলের সঙ্গেই মিশিয়া আছে। সে আমাদের ক্ষণকালের মাঝখানেই চিরন্তনকে, আমাদের সামান্যের মুখশ্রীতেই চিরবিস্ময়কে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া দেয়। সমস্ত জগতের যেটি মূলসুর সৌন্দর্য সেটি আমাদের মনের মধ্যে ধরাইয়া দেয়, সমস্ত সত্যকে তাহার সাহায্যে নিবিড় করিয়া দেখিতে পাই। একদিন ফাল্গুনমাসের দিনশেষে অতি সামান্য যে একটা গ্রামের পথ দিয়া চলিয়াছিলাম, বিকশিত সর্ষের খেত হইতে গন্ধ আসিয়া সেই বাঁকা রাস্তা, সেই পুকুরের পাড়, সেই ঝিকিমিকি বিকালবেলাটিকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চিরদিনের করিয়া দিয়াছে। যাহাকে চাহিয়া দেখিতাম না তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছে, যাহাকে ভুলিতাম তাহাকে ভুলিতে দেয় নাই। সৌন্দর্যে আমরা যেটিকে দেখি কেবল সেইটিকেই দেখি এমন নয়, তাহার যোগে আর-সমস্তকেই দেখি ; মধুর গান সমস্ত জল স্থল আকাশকে অস্তিত্বমাত্রকেই মর্যাদা দান করে। যাঁহারা সাহিত্যবীর তাঁহারাও অস্তিত্বমাত্রের গৌরবঘোষণা করিবার ভার লইয়াছেন। তাঁহারা ভাষা ছন্দ ও রচনা -রীতির সৌন্দর্য দিয়া এমন-সকল জিনিসকে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করেন অতিপ্রত্যক্ষ বলিয়াই আমরা যাহাদিগকে চাহিয়া দেখি না। অভ্যাসবশত সামান্যকে আমরা তুচ্ছ বলিয়াই জানি ; তাঁহারা সেই সামান্যের প্রতি তাঁহাদের রচনাসৌন্দর্যের সমাদর অর্পণ করিবামাত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহা সামান্য নহে, সৌন্দর্যের বেষ্টনে তাহার সৌন্দর্য ও তাহার মূল্য ধরা পড়িয়াছে। সাহিত্যের আলোকে আমরা অতিপরিচিতকে নূতন করিয়া দেখিতে পাই বলিয়া, সুপরিচিত এবং অপরিচিতকে আমরা একই বিস্ময়পূর্ণ অপূর্বতার মধ্যে গভীর করিয়া উপলব্ধি করি।

কিন্তু মানুষের যখন বিকৃতি ঘটে তখন সৌন্দর্যকে সে তাহার পরিবেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে উলটা কাজে লাগাইতে থাকে। মাথাকে শরীর হইতে কাটিয়া লইলে সেই কাটা মুণ্ড শরীরের যেমন বিরুদ্ধ হয়, এ তেমনি। সাধারণ হইতে বিশেষ করিয়া লইলে সাধারণের বিরুদ্ধে সৌন্দর্যকে দাঁড়

করানো হয় ; তাহাকে সত্যের ঘর-শত্রু করিয়া তাহার সাহায্যে সামান্যের প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার উপায় করা হয়। বস্তুত সে জিনিসটা তখন সৌন্দর্যের যথার্থ ধর্মই পরিহার করে। ধর্মই বলো, সৌন্দর্যই বলো, যে-কোনো বড়ো জিনিসই বলো-না, যখনই তাহাকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া একটু বিশেষ করিয়া লইবার চেষ্টা করা হয় তখনই তাহার স্বরূপটি নষ্ট হইয়া যায়। নদীকে আমার করিয়া লইবার জন্য বাঁধিয়া লইলে সে আর নদীই থাকে না, সে পুকুর হইয়া পড়ে।

এইরূপে সংসারে অনেক সৌন্দর্যকে সংকীর্ণ করিয়া তাহাকে ভোগবিলাসের অহংকারের ও মত্ততার সামগ্রী করিয়া তোলাতেই কোনো কোনো সম্প্রদায় সৌন্দর্যকে বিপদ বলিয়াই গণ্য করিয়াছে। তাহারা বলে, সৌন্দর্য কেবল কনকলঙ্কাপুরী মজাইবার জন্যই আছে।

ঈশ্বরের প্রসাদে বিপদ কিসে নাই ? জলে বিপদ, স্থলে বিপদ, আগুনে বিপদ, বাতাসে বিপদ। বিপদই আমাদের কাছে প্রত্যেক জিনিসের সত্য পরিচয় ঘটায়, তাহার ঠিক ব্যবহারটি শিখাইতে থাকে।

ইহার উত্তরে কথা উঠিবে, জলে-স্থলে আগুনে-বাতাসে আমাদের এত প্রয়োজন যে তাহাদের নহিলে এক মুহূর্ত টিকিতে পারি না, সুতরাং সমস্ত বিপদ স্বীকার করিয়াই তাহাদিগকে সকল রকম করিয়া চিনিয়া লইতে হয়, কিন্তু সৌন্দর্যরসভোগ আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে, সুতরাং তাহা নিছক বিপদ, অতএব তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই বুঝি— ঈশ্বর আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই সৌন্দর্যের মায়ামৃগকে আমাদের সম্মুখে দৌড় করাইতেছেন ; ইহার প্রলোভনে আমরা অসাবধান হইলেই জীবনের সারধনটি চুরি যায় !

রক্ষা করো ! ঈশ্বর পরীক্ষক এবং সংসার পরীক্ষাস্থল, এই-সমস্ত মিথ্যা বিভীষিকার কথা আর সহ্য হয় না। আমাদের নকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের খাঁটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করিয়ো না। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নাই এবং পরীক্ষার কোনো প্রয়োজনই নাই। সে বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র শিক্ষাই আছে। সেখানে কেবল বিকাশেরই ব্যাপার চলিতেছে। সেইজন্য, মানুষের মনে সৌন্দর্যবোধ যে এমন প্রবল হইয়াছে সে আমাদের বিকাশ ঘটাইবে বলিয়াই। বিপদ থাকে তো থাক্, তাই বলিয়া বিকাশের পথকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া চলিলে মঙ্গল নাই।

বিকাশ বলিতে কী বুঝায় সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ যত রকম করিয়া যতদূর ব্যাপ্ত হইতে থাকে ততই প্রত্যেকের বিকাশ। স্বর্গরাজ ইন্দ্র যদি আমাদের সেই যোগসাধনের বিঘ্ন ঘটাইবার জন্যই সৌন্দর্যকে মর্তে পাঠাইয়া দেন ইহা সত্য হয়, তবে ইন্দ্রদেবের সেই প্রবঞ্চনাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া দুই চক্ষু মুদিয়া থাকাই শ্রেয়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু ইন্দ্রদেবের প্রতি আমার লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই। তাঁহার কোনো দূতকেই মারিয়া খেদাইতে হইবে এমন কথা আমি বলিতে পারিব না। এ কথা নিশ্চয়ই জানি, সত্যের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের প্রগাঢ় এবং অখণ্ড মিলন ঘটাইবার জন্যই সৌন্দর্যবোধ হাসিমুখে আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। সে কেবল বিনা প্রয়োজনের মিলন, সে কেবলমাত্র আনন্দের মিলন। নীলাকাশ যখন নিতান্তই শুধু শুধু আমাদের হৃদয় দখল করিয়া সমস্ত শ্যামল পৃথিবীর উপর তাহার জ্যোতির্ময় পীতাম্বরটি ছড়াইয়া দেয় তখনই আমরা বলি, সুন্দর ! বসন্তে গাছের নূতন কচি পাতা বনলক্ষ্মীদের আঙুলগুলির মতো যখন একেবারেই বিনা আবশ্যকে আমাদের দুই চোখকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতে থাকে তখনই আমাদের মনে সৌন্দর্যরস উছলিয়া উঠে।

কিন্তু সৌন্দর্যবোধ কেবল সুন্দর নামক সত্যের একটা অংশের দিকেই আমাদের হৃদয়কে টানে ও বাকি অংশ হইতে আমাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া দেয়, তাহার এই অন্যায় বদনাম কেমন করিয়া ঘুচানো যাইবে, সেই কথাই ভাবিতেছি।

আমাদের জ্ঞানশক্তিই কি জগতের সমস্ত সত্যকেই এখনই আমাদের জানার মধ্যে আনিয়াছে ? আমাদের কর্মশক্তিই কি জগতের সমস্ত শক্তিকে আজই আমাদের ব্যবহারের আয়ত্ত করিয়াছে ? জগতের এক অংশ আমাদের জানা, অধিকাংশই অজানা ; বিশ্বশক্তির সামান্য অংশ আমাদের কাজে

খাটিতেছে, অধিকাংশকেই আমরা ব্যবহারে লাগাইতে পারি নাই। তা হউক, তবু আমাদের জ্ঞান সেই জানা জগৎ ও না-জানা জগতের দ্বন্দ্ব প্রতিদিন একটু একটু ঘুচাইয়া চলিয়াছে ; যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া জগতের সমস্ত সত্যকে ক্রমে আমাদের বুদ্ধির অধিকারে আনিতেছে ও জগৎকে আমাদের মনের জগৎ, আমাদের জ্ঞানের জগৎ, করিয়া তুলিতেছে। আমাদের কর্মশক্তি জগতের সমস্ত শক্তিকে ব্যবহারের দ্বারা ক্রমে ক্রমে আপন করিয়া তুলিতেছে এবং বিদ্যুৎ জল অগ্নি বাতাস দিনে দিনে আমাদেরই বৃহৎ কর্মশরীর হইয়া উঠিতেছে। আমাদের সৌন্দর্যবোধও ক্রমে ক্রমে সমস্ত জগৎকে আমাদের আনন্দের জগৎ করিয়া তুলিতেছে ; সেই দিকেই তাহার গতি। জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার মন ব্যাপ্ত হইবে, কর্মের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার শক্তি ব্যাপ্ত হইবে, এবং সৌন্দর্যবোধের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার আনন্দ ব্যাপ্ত হইবে, মনুষ্যত্বের ইহাই লক্ষ্য। অর্থাৎ জগৎকে জ্ঞানরূপে পাওয়া, শক্তিরূপে পাওয়া ও আনন্দরূপে পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।

কিন্তু পাওয়া না-পাওয়ার বিরোধের ভিতর দিয়া ছাড়া, পাওয়া যাইতেই পারে না ; দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ছাড়া বিকাশ হইতেই পারে না— সৃষ্টির গোড়াকার এই নিয়ম। একের দুই হওয়া এবং দুয়ের এক হইতে থাকাই বিকাশ।

বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখো। মানুষের একদিন এমন অবস্থা ছিল যখন সে গাছে পাথরে মানুষে মেঘে চন্দ্রে সূর্যে নদীতে পর্বতে প্রাণী-অপ্রাণীর ভেদ দেখিতে পাইত না। তখন সবই তাহার কাছে যেন সমানধর্মাবলম্বী ছিল। ক্রমে তাহার বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিতে প্রাণী ও অপ্রাণীর ভেদ একান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে অভেদ হইতে প্রথমে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। তাহা যদি না হইত, তবে প্রাণের প্রকৃত লক্ষণগুলিকে সে কোনোদিন জানিতেই পারিত না। এ দিকে লক্ষণগুলিকে যতই সে সত্য করিয়া জানিতে লাগিল দ্বন্দ্ব ততই দূরে সরিয়া যাইতে থাকিল। প্রথমে প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝখানের গণ্ডিটা ঝাপসা হইয়া আসিল ; কোথায় উদ্ভিদের শেষ ও প্রাণীর আরম্ভ তাহা আর ঠাহর করা যায় না। তাহার পরে আজ ধাতুদ্রব্য, যাহাকে জড় বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি, তাহার মধ্যেও প্রাণের লক্ষণ বিজ্ঞানের চক্ষে ধরা দিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব যে ভেদবুদ্ধির সাহায্যে আমরা প্রাণ জিনিসটাকে চিনিয়াছি, চেনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভেদটা ক্রমেই লুপ্ত হইতে থাকিবে, অভেদ হইতে দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব হইতেই ঐক্য বাহির হইবে এবং অবশেষে বিজ্ঞান একদিন উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে সমান সুরে বলিবে : সর্বং প্রাণ এজতি। সমস্তই প্রাণে কম্পিত হইতেছে।

যেমন সমস্তই প্রাণে কাঁপিতেছে তেমনি সমস্তই আনন্দ, উপনিষদ এ কথাও বলিয়াছেন। জগতের এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরূপ দেখিবার পথে সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা প্রথমে একান্ত হইয়া মাথা তোলে। নহিলে সুন্দরের পরিচয় ঘটা একেবারে অসম্ভব।

আমাদের সৌন্দর্যবোধের প্রথমাবস্থায় সৌন্দর্যের একান্ত স্বাতন্ত্র্য আমাদিগকে যেন ঘা মারিয়া জাগাইতে চায়। এইজন্য বৈপরীত্য তাহার প্রথম অস্ত্র। খুব একটা টকটকে রঙ, খুব একটা গঠনের বৈচিত্র্য, নিজের চারি দিকের ম্লানতা হইতে যেন ফুঁড়িয়া উঠিয়া আমাদিগকে হাঁক দিয়া ডাকে। সংগীত কেবল উচ্চশব্দের উত্তেজনা আশ্রয় করিয়া আকাশ মাত করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। অবশেষে সৌন্দর্যবোধ যতই বিকাশ পায় ততই স্বাতন্ত্র্য নহে, সুসংগতি— আঘাত নহে, আকর্ষণ— আধিপত্য নহে, সামঞ্জস্য, আমাদিগকে আনন্দ দান করে। এইরূপে সৌন্দর্যকে প্রথমে চারি দিক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া সৌন্দর্যকে চিনিবার চর্চা করি, তাহার পরে সৌন্দর্যকে চারি দিকের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া চারি দিককেই সুন্দর বলিয়া চিনিতে পারি।

একটুখানির মধ্যে দেখিলে আমরা অনিয়ম দেখি, চারি দিকের সঙ্গে অখণ্ড করিয়া মিলাইয়া দেখিলেই নিয়ম আমাদের কাছে ধরা পড়ে ; তখন যদিচ ধোঁয়া আকাশে উড়িয়া যায় ও ঢেলা মাটিতে পড়ে, সোলা জলে ভাসে ও লোহা জলে ডোবে, তবু এই-সমস্ত দ্বৈতের মধ্যে ভারাকর্ষণের এক নিয়মের কোথাও বিচ্ছেদ দেখি না।

জ্ঞানকে ভ্রমমুক্ত করিবার এই যেমন উপায় তেমনি আনন্দকেও বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে

খণ্ডতা হইতে ছুটি দিয়া সমগ্রের সহিত যুক্ত করিতে হইবে। যেমন, উপস্থিত যাহাই প্রতীতি হয় তাহাকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে বিজ্ঞানে বাধে, তেমনি উপস্থিত যাহাই আমাদিগকে মুগ্ধ করে তাহাকেই সুন্দর বলিয়া ধরিয়া লইলে আনন্দের বিঘ্ন ঘটে। আমাদের প্রতীতিকে নানা দিক দিয়া সর্বত্র যাচাই করিয়া লইলে তবেই তাহার সত্যতা স্থির হয় ; তেমনি আমাদের অনুভূতিকেও তখনই আনন্দ বলিতে পারি যখন সংসারের সকল দিকেই সে মিশ খায়। মাতাল মদ খাইয়া যতই সুখবোধ করুক, নানা দিকেই সে সুখের বিরোধ ; তাহার আপনার সুখ, অন্যের দুঃখ, তাহার আজিকার সুখ, কালিকার দুঃখ, তাহার প্রকৃতির এক অংশের সুখ, প্রকৃতি অন্য অংশের দুঃখ। অতএব এ সুখে সৌন্দর্য নষ্ট হয়, আনন্দ ভঙ্গ হয়। প্রকৃতির সমস্ত সত্যের সঙ্গে ইহার মিল হয় না।

নানা দ্বন্দ্ব নানা সুখদুঃখের ভিতর দিয়া মানুষ সুন্দরকে আনন্দকে সত্যের সব দিকে ছড়াইয়া বৃহৎ করিয়া চিনিয়া লইতেছে। তাহার এই চেনা কোথায় সঞ্চিত হইতেছে ? জগদ্ব্যাপার সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেক দিন হইতে অনেক লোকের দ্বারা স্মৃতিবদ্ধ হইয়া বিজ্ঞানের ভাণ্ডার ভরিয়া তুলিতেছে ; এই সুযোগে এক জনের দেখা আর-এক জনের দেখার সঙ্গে, এক কালের দেখা আর-এক কালের দেখার সঙ্গে পরখ করিয়া লইবার সুবিধা হয়। এমন নহিলে বিজ্ঞান পাকা হইতেই পারে না। তেমনি মানুষ কর্তৃক সুন্দরের পরিচয় আনন্দের পরিচয় দেশে দেশে কালে কালে সাহিত্যে সঞ্চিত হইতেছে। সত্যের উপরে মানুষের হৃদয়ের অধিকার কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, সুখবোধ কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ক্রমে প্রসারিত হইয়া মানুষের সমস্ত মন ধর্মবুদ্ধি ও হৃদয়কে অধিকার করিয়া লইতেছে ও এমনি করিয়া ক্ষুদ্রকেও মহৎ এবং দুঃখকেও প্রিয় করিয়া তুলিতেছে, মানুষ নিয়তই আপনার সাহিত্যে সেই পথের চিহ্ন রাখিয়া চলিয়াছে। যাঁহারা বিশ্ব-সাহিত্যের পাঠক তাঁহারা সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই রাজপথটির অনুসরণ করিয়া সমস্ত মানুষ হৃদয় দিয়া কী চাহিতেছে ও হৃদয় দিয়া কী পাইতেছে, সত্য কেমন করিয়া মানুষের কাছে মঙ্গলরূপ ও আনন্দরূপ ধরিতেছে, তাহাই সন্ধান করিয়া ও অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, মানুষ কী জানে তাহাতে নয়, কিন্তু মানুষ কিসে আনন্দ পায় তাহাতেই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের সেই পরিচয়ই আমাদের কাছে ঔৎসুক্যজনক। যখন দেখি সত্যের জন্য কেহ নির্বাসন স্বীকার করিতেছে তখন সেই বীরপুরুষের-আনন্দের পরিধি আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেখিতে পাই, সে আনন্দ এতবড়ো জায়গা অধিকার করিয়া আছে যে, নির্বাসনদুঃখ অনায়াসে তাহার অঙ্গ হইয়াছে। এই দুঃখের দ্বারাই আনন্দের মহত্ত্ব প্রমাণ হইতেছে। টাকার মধ্যেই যাহার আনন্দ সে টাকার ক্ষতির ভয়ে অসত্যকে অপমানকে অনায়াসে স্বীকার করে ; সে চাকরি বজায় রাখিতে অন্যায় করিতে কুণ্ঠিত হয় না ; এই লোকটি যত পরীক্ষাই পাস করুক, ইহার যত বিদ্যাই থাক্, আনন্দশক্তির সীমাতেই ইহার যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের কতখানি আনন্দের অধিকার ছিল যাহাতে রাজ্যসুখের আনন্দ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, ইহা যখন দেখে তখন প্রত্যেক মানুষ মনুষ্যত্বের আনন্দপরিধির বিপুলতা দেখিয়া যেন নিজেরই গুপ্তধন অন্যের মধ্যে আবিষ্কার করে, নিজেরই বাধামুক্ত পরিচয় বাহিরে দেখিতে পায়। এই মহৎচরিত্রে আনন্দবোধ করাতে আমরা নিজেকেই আবিষ্কার করি।

অতএব মানুষ আপনার আনন্দপ্রকাশের দ্বারা সাহিত্যে কেবল আপনারই নিত্যরূপ শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করিতেছে।

আমি জানি, সাহিত্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রমাণ আহরণ করিয়া আমার মোট-কথাটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা অত্যন্ত সহজ। সাহিত্যের মধ্যে যেখানে যাহা-কিছু স্থান পাইয়াছে তাহার সমস্তটার জবাবদিহি করিবার দায় যদি আমার উপরে চাপানো হয় তবে সে আমার বড়ো কম বিপদ নয়। কিন্তু মানুষের সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে শত শত আত্মবিরোধ থাকে। যখন বলি, জাপানিরা নির্ভীক সাহসে লড়াই করিয়াছিল, তখন জাপানি সেনাদলের প্রত্যেক লোকটির সাহসের হিসাব লইতে গেলে নানা স্থানেই ত্রুটি দেখা যাইবে ; কিন্তু ইহা সত্য, সেই-সমস্ত ব্যক্তিবিশেষের ভয়কেও সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া

জাপানিদের সাহস যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে। সাহিত্যে মানুষ বৃহৎভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সে ক্রমশই তাহার আনন্দকে খণ্ড হইতে অখণ্ডের দিকে অগ্রসর করিয়া ব্যক্ত করিতেছে— বড়ো করিয়া দেখিলে এ কথা সত্য ; বিকৃতি এবং ত্রুটি যতই থাক্, তবু সব লইয়াই এ কথা সত্য।

একটি কথা আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে, সাহিত্য দুই রকম করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দেয়। এক, সে সত্যকে মনোহররূপে আমাদিগকে দেখায়, আর, সে সত্যকে আমাদের গোচর করিয়া দেয়। সত্যকে গোচর করানো বড়ো শক্ত কাজ। হিমালয়ের শিখর কত হাজার ফিট উঁচু, তাহার মাথায় কতখানি বরফ আছে, তাহার কোন্ অংশে কোন্ শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বলিলেও হিমালয় আমাদের গোচর হয় না। যিনি কয়েকটি কথায় এই হিমালয়কে আমাদের গোচর করিয়া দিতে পারেন তাঁহাকে আমরা কবি বলি। হিমালয় কেন, একটা পানাপুকুরকেও আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে ধরিয়া দিলে আমাদের আনন্দ হয়। পানাপুকুরকে চোখে আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাকেই ভাষার ভিতর দিয়া দেখিলে তাহাকে নূতন করিয়া দেখা হয় ; মন চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়া যেটাকে দেখিতে পায় ভাষা যদি ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া সেইটেকেই দেখাইতে পারে তবে মন তাহাতে নূতন একটা রস লাভ করে। এইরূপে সাহিত্য আমাদের নূতন একটি ইন্দ্রিয়ের মতো হইয়া জগৎকে আমাদের কাছে নূতন করিয়া দেখায়। কেবল নূতন নয়। ভাষার একটা বিশেষত্ব আছে, সে মানুষের নিজের জিনিস, সে অনেকটা আমাদের মন-গড়া ; এইজন্য বাহিরের যে-কোনো জিনিসকে সে আমাদের কাছে আনিয়া দেয় সেটাকে যেন বিশেষ করিয়া মানুষের জিনিস করিয়া তোলে। ভাষা যে ছবি আঁকে সে ছবি যে যথাযথ ছবি বলিয়া আমাদের কাছে আদর পায় তাহা নহে ; ভাষা যেন তাহার মধ্যে একটা মানবরস মিশাইয়া দেয়, এইজন্য সে ছবি আমাদের হৃদয়ের কাছে একটা বিশেষ আত্মীয়তা লাভ করে। বিশ্বজগৎকে ভাষা দিয়া মানুষের ভিতর দিয়া চোলাইয়া লইলে সে আমাদের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।

শুধু তাই নয়, ভাষার মধ্য দিয়া যে ছবি আমাদের কাছে আসে সে সমস্ত খুঁটিনাটি লইয়া আসে না। সে কেবল ততটুকুই আসে যতটুকুতে সে একটি বিশেষ সমগ্রতা লাভ করে। এইজন্য তাহাকে একটি অখণ্ডরসের সঙ্গে দেখিতে পাই ; কোনো অনাবশ্যক বাহুল্য সেই রস ভঙ্গ করে না। সেই সুসম্পূর্ণ রসের ভিতর দিয়া দেখাতেই সে ছবি আমাদের অন্তঃকরণের কাছে এত অধিক করিয়া গোচর হইয়া উঠে।

কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্তের যে বর্ণনা আছে সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড়ো দিক দেখানো হইয়াছে তাহা নহে, এইরকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্তিমান করিতে পারিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষায় এমন একটু কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদেরও হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যক্ষসংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার পক্ষে ভাঁড়ুদত্তের যতটুকু আবশ্যক কবি তাহার চেয়ে বেশি কিছুই দেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষসংসারের ভাঁড়ুদত্ত ঠিক ঐটুকুমাত্র নয় ; এইজন্যই সে আমাদের কাছে অমন করিয়া গোচর হইবার অবকাশ পায় না। কোনো-একটা সমগ্রভাবে সে আমাদের কাছে গোচর হয় না বলিয়াই আমরা তাহাতে আনন্দ পাই না। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্ররসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।

ভাঁড়ুদত্ত যেমন, চরিত্রমাত্রই সেইরূপ। রামায়ণের রাম যে কেবল মহান বলিয়াই আমাদিগকে আনন্দ দিতেছেন তাহা নহে, তিনি আমাদের সুগোচর, সেও একটা কারণ। রামকে যেটুকু দেখিলে একটি সমগ্ররসে তিনি আমাদের কাছে জাগিয়া উঠেন, সমস্ত বিক্ষিপ্ততা বাদ দিয়া রামায়ণ কেবল সেইটুকুই আমাদের কাছে আনিয়াছে ; এইজন্য এত স্পষ্ট তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি, এবং স্পষ্ট

দেখিতে পাওয়াই মানুষের একটি বিশেষ আনন্দ। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া মানেই একটা কোনো সমগ্রভাবে দেখিতে পাওয়া, যেন অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাওয়া। সাহিত্য তেমনি করিয়া একটা সামঞ্জস্যের সুষমার মধ্যে সমস্ত চিত্র দেখায় বলিয়া আমরা আনন্দ পাই। এই সুষমা সৌন্দর্য।

আর-একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, সাহিত্যের একটা বৃহৎ অংশ আছে যাহা তাহার উপকরণবিভাগ। পূর্তবিভাগে কেবল যে ইমারত তৈরি হয় তাহা নহে, তাহার দ্বারা ইঁটের পাঁজাও পোড়ানো হয়। ইঁটগুলি ইমারত নয় বলিয়া সাধারণ লোক অবজ্ঞা করিতে পারে, কিন্তু পূর্তবিভাগ তাহার মূল্য জানে। সাহিত্যের যাহা উপকরণ সাহিত্যরাজ্যে তাহার মূল্য বড়ো কম নয়। এইজন্যই অনেক সময় কেবল ভাষার সৌন্দর্য, কেবল রচনার নৈপুণ্যমাত্রও সাহিত্যে সমাদর পাইয়াছে।

হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মানুষ যে কত ব্যাকুল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হৃদয়ের ধর্মই এই, সে নিজের ভাবটিকে অন্যের ভাব করিয়া তুলিতে পারিলে তবে বাঁচিয়া যায়। অথচ কাজটি অত্যন্ত কঠিন বলিয়া তাহার ব্যাকুলতাও অত্যন্ত বেশি। সেইজন্য যখন আমরা দেখি একটা কথা কেহ অত্যন্ত চমৎকার করিয়া প্রকাশ করিয়াছে তখন আমাদের এত আনন্দ হয়। প্রকাশের বাধা দূর হওয়াটাই আমাদের কাছে একটা দুর্মূল্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে আমাদের শক্তি বাড়িয়া যায়। যে কথাটা প্রকাশ হইতেছে তাহা বিশেষ মূল্যবান একটা-কিছু না হইলেও, সেই প্রকাশ-ব্যাপারের মধ্যেই যদি কোনো অসামান্যতা দেখা যায় তবে মানুষ তাহাকে সমাদর করিয়া রাখে। সেইজন্য যাহা তাহা অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র প্রকাশ করিবার লীলাবশতই প্রকাশ, সাহিত্যে অনাদৃত হয় নাই। তাহাতে মানুষ যে কেবল আপনার ক্ষমতাকে ব্যক্ত করিয়া আনন্দদান করে তাহা নহে ; কিন্তু যে-কোনো উপলক্ষ ধরিয়া শুদ্ধমাত্র আপনার প্রকাশধর্মটাকে খেলানোতেই তাহার যে আনন্দ সেই নিতান্ত বাহুল্য আনন্দকে সে আমাদের মধ্যেও সঞ্চার করিয়া দেয়। যখন দেখি কোনো মানুষ একটা কঠিন কাজ অবলীলাক্রমে করিতেছে তখন তাহাতে আমাদের আনন্দ হয় ; কিন্তু যখন দেখি, কোনো কাজ নয়, কিন্তু যে-কোনো তুচ্ছ উপলক্ষ লইয়া কোনো মানুষ আপনার সমস্ত শরীরকে নিপুণভাবে চালনা করিতেছে তখন সেই তুচ্ছ উপলক্ষের গতিভঙ্গিতেই সেই লোকটার যে প্রাণের বেগ, যে উদ্যমের উৎসাহ প্রকাশ পায় তাহা আমাদের ভিতরকার প্রাণকে চঞ্চল করিয়া সুখ দেয়। সাহিত্যের মধ্যেও হৃদয়ের প্রকাশধর্মের লক্ষ্যহীন নৃত্যচাঞ্চল্য যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে। স্বাস্থ্য শ্রান্তিহীন কর্মনৈপুণ্যেও আপনাকে প্রকাশ করে, আবার স্বাস্থ্য যে কেবলমাত্র স্বাস্থ্য ইহাই সে বিনা কারণেও প্রকাশ করিয়া থাকে। সাহিত্যে তেমনি মানুষ কেবল যে আপনার ভাবের প্রাচুর্যকেই প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা নহে, সে আপনার প্রকাশ-শক্তির উৎসাহমাত্রকেই ব্যক্ত করিয়া আনন্দ করিতে থাকে। কারণ, প্রকাশই আনন্দ। এইজন্যই উপনিষদ বলিয়াছেন : আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। সাহিত্যেও মানুষ কত বিচিত্রভাবে নিয়ত আপনার আনন্দরূপকে অমৃতরূপকেই ব্যক্ত করিতেছে তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়।

বৈশাখ ১৩১৪

সাহিত্যসৃষ্টি

যেমন একটা সুতাকে মাঝখানে লইয়া মিছরির কণাগুলা দানা বাঁধিয়া উঠে তেমনি আমাদের মনের মধ্যেও কোনো-একটা সূত্র অবলম্বন করিতে পারিলেই অনেকগুলা বিচ্ছিন্ন ভাব তাহার চারি দিকে দানা বাঁধিয়া একটা আকৃতিলাভ করিতে চেষ্টা করে। অস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতা, বিচ্ছিন্নতা হইতে সংশ্লিষ্টতার জন্য আমাদের মনের ভিতরে একটা চেষ্টা যেন লাগিয়া আছে। এমন-কি স্বপ্নেও দেখিতে পাই, একটা-কিছু সূচনা পাইবামাত্রই অমনি তাহার চারি দিকে কতই ভাবনা দেখিতে দেখিতে আকারধারণ করিতে থাকে। অব্যক্ত ভাবনাগুলা যেন মূর্তিলাভ করিবার সুযোগ-অপেক্ষায়

নিদ্রায়-জাগরণে মনের মধ্যে প্রেতের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দিনের বেলা আমাদের কর্মের সময়, তখন বুদ্ধির কড়াক্কড় পাহারা, সে আমাদের আপিসে বাজে ভিড় করিয়া কোনোমতে কর্ম নষ্ট করিতে দেয় না। তাহার আমলে আমাদের ভাবনাগুলা কেবলমাত্র কর্মসূত্র অবলম্বন করিয়া অত্যন্ত সুসংগতভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। অবসরের সময় যখন চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি তখনো এই ব্যাপারটা চলিতেছে। হয়তো একটা ফুলের গন্ধের ছুতা পাইবামাত্র অমনি কত দিনের স্মৃতি তাহার চারি দিকে দেখিতে দেখিতে জমিয়া উঠিতেছে। একটা কথা যেমনি গড়িয়া উঠে অমনি তাহাকে আশ্রয় করিয়া যেমন-তেমন করিয়া কত-কী কথা যে পরে পরে আকারধারণ করিয়া চলে তাহার আর ঠিকানা নাই। আর-কিছু নয়, কেবল কোনোরকম করিয়া কিছু-একটা হইয়া উঠিবার চেষ্টা। ভাবনারাজ্যে এই চেষ্টার আর বিরাম নাই।

এই হইয়া উঠিবার চেষ্টা সফল হইলে তার পরে টিকিয়া থাকিবার চেষ্টার পালা। কাঁঠালের গাছে উপযুক্ত সময়ে হুড়াহুড়ি করিয়া ফল তো বিস্তর ধরিল, কিন্তু যে ফলগুলা ছোটো ডালে ধরিয়াছে, যাহার বোঁটা নিতান্তই সরু, সেগুলা কোনোমতে কাঁঠাল-লীলা একটুখানি শুরু করিয়াই আবার অব্যক্তের মধ্যে অন্তর্ধান করে।

আমাদের ভাবনাগুলারও সেই দশা। যেটা কোনো গতিকে এমন-একটা সূত্র পাইয়াছে যাহা টেঁকসই সে তাহার পুরা আয়তনে বাড়িয়া উঠিতে পায়; তাহার সমস্ত কোষগুলি ঠিকমত সাজিয়া ও ভরিয়া উঠিতে থাকে, তাহার হওয়াটা সার্থক হয়। আর যেটা কোনোমতে একটুখানি ধরিবার জায়গা পাইয়াছে মাত্র সেটা নেহাত তেড়াবাঁকা অসংযত-গোছ হইয়া বিদায় লইতে বিলম্ব করে না।

এমন গাছ আছে যে গাছে বোল ধরিয়াই ঝরিয়া যায়, ফল হইয়া ওঠা পর্যন্ত টেঁকে না। তেমনি এমন মনও আছে যেখানে ভাবনা কেবলই আসে-যায়, কিন্তু ভাব-আকার ধারণ করিবার পুরা অবকাশ পায় না। কিন্তু ভাবুক লোকের চিত্তে ভাবনাগুলি পুরাপুরি ভাব হইয়া উঠিতে পারে এমন রস আছে, এমন তেজ আছে। অবশ্য অনেকগুলা ঝরিয়া পড়ে বটে, কিন্তু কতকগুলা ফলিয়াও উঠে।

গাছে ফল যে-ক'টা ফলিয়া উঠে তাহাদের এই দরবার হয় যে, ডালের মধ্যে বাঁধা থাকিলেই আমাদের চলিবে না; আমরা পাকিয়া, রসে ভরিয়া, রঙে রঙিয়া, গন্ধে মাতিয়া, আঁটিতে শক্ত হইয়া, গাছ ছাড়িয়া বাহিরে যাইব— সেই বাহিরের জমিতে ঠিক অবস্থায় না পড়িতে পাইলে আমাদের সার্থকতা নাই। ভাবুকের মনে ভাবনাগুলা ভাব হইয়া উঠিলে তাহাদেরও সেই দরবার। তাহারা বলে, কোনো সুযোগে যদি হওয়া গেল তবে এবার বিশ্বমানবের মনের ভূমিতে নবজন্মের এবং চিরজীবনের লীলা করিতে বাহির হইব। প্রথমে ধরিবার সুযোগ, তাহার পরে ফলিবার সুযোগ, তাহার পরে বাহির হইয়া ভূমিলাভ করিবার সুযোগ, এই তিন সুযোগ ঘটিলে পর তবেই মানুষের মনের ভাবনা কৃতার্থ হয়। ভাবনাগুলা সজীব পদার্থের মতো সেই কৃতার্থতার তাগিদ মানুষকে কেবলই দিতেছে। সেইজন্য মানুষে মানুষে গলাগলি-কানাকানি চলিতেছেই। একটা মন আর-একটা মনকে খুঁজিতেছে, নিজের ভাবনার ভার নামাইয়া দিবার জন্য, নিজের মনের ভাবকে অন্যের মনে ভাবিত করিবার জন্য। এইজন্য মেয়েরা ঘাটে জমে, বন্ধুর কাছে বন্ধু ছোটে, চিঠি আনাগোনা করিতে থাকে, এইজন্যই সভাসমিতি তর্কবিতর্ক লেখালেখি বাদপ্রতিবাদ— এমন-কি এজন্য মারামারি কাটাকাটি পর্যন্ত হইতে বাকি থাকে না। মানুষের মনের ভাবনাগুলি সফলতালাভের জন্য ভিতরে ভিতরে মানুষকে এতই প্রচণ্ড তাগিদ দিয়া থাকে, মানুষকে একলা থাকিতে দেয় না, এবং ইহারই তাড়নায় পৃথিবী জুড়িয়া মানুষ সশব্দে ও নিঃশব্দে দিনরাত কত বকুনিই যে বকিতেছে তাহার আর ঠিকানা নাই। সেই-সকল বকুনি কথায়-বার্তায় গল্পে-গুজবে চিঠিপত্রে মূর্তিতে-চিত্রে গদ্যে-পদ্যে কাজে-কর্মে কত বিচিত্র সাজে, কত বিবিধ আকারে, কত সুসংগত এবং অসংগত আয়োজনে, মানুষের সংসারে ভিড় করিয়া, ঠেলাঠেলি করিয়া চলিতেছে, তাহা মনের চক্ষে দেখিলে স্তব্ধ হইতে হয়।

এই-যে এক মনের ভাবনার আর-এক মনের মধ্যে সার্থকতালাভের চেষ্টা মানবসমাজ জুড়িয়া চলিতেছে, এই চেষ্টার বশে আমাদের ভাবগুলি স্বভাবতই এমন একটি আকার ধারণ করিতেছে যাহাতে

তাহারা ভাবুকের কেবল একলার না হয়। অনেক সময় এ আমাদের অলক্ষিতেই ঘটিতে থাকে। এ কথা বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কোনো বন্ধুর কাছে যখন কথা বলি তখন কথা সেই বন্ধুর মনের ছাঁদে নিজেকে কিছু-না-কিছু গড়িয়া লয়। এক বন্ধুকে আমরা যে-রকম করিয়া চিঠি লিখি আর-এক বন্ধুকে আমরা ঠিক তেমন করিয়া চিঠি লিখিতে পারি না। আমার ভাবটি বিশেষ বন্ধুর কাছে সম্পূর্ণতালাভ করিবার গূঢ় চেষ্টায় বিশেষ মনের প্রকৃতির সঙ্গে কতকটা পরিমাণে আপস করিয়া লয়। বস্তুত আমাদের কথা শ্রোতা ও বক্তা দুইজনের যোগেই তৈরি হইয়া উঠে।

এইজন্য সাহিত্যে লেখক যাহার কাছে নিজের লেখাটি ধরিতেছে, মনে মনে নিজের অজ্ঞাতসারেও, তাহার প্রকৃতির সঙ্গে নিজের লেখাটি মিলাইয়া লইতেছে। দাশুরায়ের পাঁচালি দাশরথির ঠিক একলার নহে; যে সমাজ সেই পাঁচালি শুনিতেছে, তাহার সঙ্গে যোগে এই পাঁচালি রচিত। এইজন্য এই পাঁচালিতে কেবল দাশরথির একলার মনের কথা পাওয়া যায় না; ইহাতে একটি বিশেষ কালের বিশেষ মণ্ডলীর অনুরাগ-বিরাগ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রুচি আপনি প্রকাশ পাইয়াছে।

এমনি করিয়া লেখকদের মধ্যে কেহ বা বন্ধুকে, কেহ বা সম্প্রদায়কে, কেহ বা সমাজকে, কেহ বা সর্বকালের মানবকে আপনার কথা শুনাইতে চাহিয়াছেন। যাঁহারা কৃতকার্য হইয়াছেন তাঁহাদের লেখার মধ্যে বিশেষভাবে সেই বন্ধুর, সম্প্রদায়ের, সমাজের বা বিশ্বমানবের কিছু-না-কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এমনি করিয়া সাহিত্য কেবল লেখকের নহে, যাহাদের জন্য লিখিত তাহাদেরও পরিচয় বহন করে।

বস্তুজগতেও ঠিক জিনিসটি ঠিক জায়গায় যখন আসর জমাইয়া বসে তখন চারি দিকের আনুকূল্য পাইয়া টিকিয়া যায়— এও ঠিক তেমনি। অতএব যে বস্তুটা টিকিয়া আছে সে যে কেবল নিজের পরিচয় দেয় তাহা নয়, সে তাহার চারি দিকের পরিচয় দেয়; কারণ, সে কেবল নিজের গুণে নহে, চারি দিকের গুণে টিকিয়া থাকে।

এখন সাহিত্যের সেই গোড়াকার কথা, সেই দানা বাঁধার কথাটা ভাবিয়া দেখো। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক।

কত নববর্ষার মেঘ, বলাকার শ্রেণী, তপ্ত ধরণীর 'পরে বারিসেচনের সুগন্ধ, কত পর্বত-অরণ্য নদী-নির্ঝর নগর-গ্রামের উপর দিয়া ঘনপুঞ্জগম্ভীর আষাঢ়ের স্নিগ্ধ সঞ্চার কবির মনে কতদিন ধরিয়া কত ভাবের ছায়া, সৌন্দর্যের পুলক, বেদনার আভাস রাখিয়া গেছে। কাহার মনেই বা না রাখে! জগৎ তো দিনরাতই আমাদের মনকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে এবং সেই স্পর্শে আমাদের মনের তারে কিছু-না-কিছু ধ্বনি উঠিতেছেই।

একদা কালিদাসের মনে সেই তাঁহার বহু দিনের বহুতর ধ্বনিগুলি একটি সূত্র অবলম্বন করিবামাত্র একটার পর আর-একটা ভিড় করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া কী সুন্দর দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে! অনেক দিনের অনেক ভাবের ছবি কালিদাসের মনে এই শুভক্ষণটির জন্য উমেদারি করিয়া বেড়াইয়াছে, আজ তাহারা যক্ষের বিরহবার্তার ছুতাটুকু লইয়া বর্ণনার স্তরে স্তরে মন্দাক্রান্তার স্তবকে স্তবকে ঘনাইয়া উঠিল। আজ তাহারা একটির যোগে অন্যটি এবং সমগ্রটির যোগে প্রত্যেকটি রক্ষা পাইয়া গেছে।

সতীলক্ষ্মী বলিতে হিন্দুর মনে যে ভাবটি জাগিয়া ওঠে সে তো আমরা সকলেই জানি। আমরা নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই এমন কোনো-না-কোনো স্ত্রীলোককে দেখিয়াছি, যাঁহাকে দেখিয়া সতীত্বের মাহাত্ম্য আমাদের মনকে কিছু-না-কিছু স্পর্শ করিয়াছে। গৃহস্থঘরের প্রাত্যহিক কাজকর্মের তুচ্ছতার মধ্যে কল্যাণের সেই-যে দিব্যমূর্তি আমরা ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি সেই দেখার স্মৃতি তো মনের মধ্যে কেবল আবছায়ার মতো ভাসিয়াই বেড়াইতেছে।

কালিদাস কুমারসম্ভবের গল্পটাকে মাঝখানে ধরিতেই সতী নারীর সম্বন্ধে যে-সকল ভাব হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল তাহারা কেমন এক হইয়া, শক্ত হইয়া ধরা দিল! ঘরে ঘরে নিষ্ঠাবতী স্ত্রীদের যে-সমস্ত কঠোর তপস্যা গৃহকর্মের আড়াল হইতে আভাসে চোখে পড়ে তাহাই মন্দাকিনীর ধারাধৌত

দেবদারুর বনচ্ছায়ায় হিমালয়ের শিলাতলে দেবীর তপস্যার ছবিতে চিরদিনের মতো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি, অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ, ঐ যেমন বিদ্যাপতির—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর,

সেও আমাদের মনের বহু দিনের অব্যক্ত ভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা। ভরা বাদলে ভাদ্রমাসে শূন্যঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কথা না কহিয়া কতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে ; যেমনি ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহির হইল অমনি সকলেরই এই অনেক দিনের কথাটা মূর্তি ধরিয়া আঁট বাঁধিয়া বসিল।

বাষ্প তো হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু ফুলের পাপড়ির শীতল স্পর্শটুকু পাইবামাত্র জমিয়া শিশির হইয়া দেখা দেয়। আকাশে বাষ্প ভাসিয়া চলিয়াছিল, দেখা যাইতেছিল না, পাহাড়ের গায়ে আসিয়া ঠেকিতেই মেঘ জমিয়া বর্ষণের বেগে নদীনির্ঝরিণী বহাইয়া দিল। তেমনি গীতিকবিতায় একটি মাত্র ভাব জমিয়া মুক্তার মতো টলটল্ করিয়া ওঠে, আর বড়ো বড়ো কাব্যে ভাবের সম্মিলিত সংঘ ঝর্নায় ঝরিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু মূল কথাটা এই যে, বাষ্পের মতো অব্যক্ত ভাবগুলি কবির কল্পনার মধ্যে এমন একটি স্পর্শ লাভ করে যে, দেখিতে দেখিতে তাহাকে ঘেরিয়া বিচিত্রসুন্দর মূর্তি রচনা করিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

বর্ষাঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন এক-একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়া ছিল। তাই দেশে সে-সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।

ফরাসিবিদ্রোহের সময়েও তেমনি মানবপ্রেমের ভাবহিল্লোল আকাশ ভরিয়া তুলিয়াছিল। তাহাই নানা কবির চিত্তে আঘাত পাইয়া কোথাও বা করুণায় কোথাও বা বিদ্রোহের সুরে আপনাকে নানা মূর্তিতে অজস্রভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব কথাটা এই, মানুষের মন যে-সকল বহুতর অব্যক্ত ভাবকে নিরন্তর উচ্ছ্বসিত করিয়া দিতেছে, যাহা অনবরত ক্ষণিক বেদনায় ক্ষণিক ভাবনায় ক্ষণিক কথায় বিশ্বমানবের সুবিশাল মনোলোকের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এক-একজন কবির কল্পনা এক-একটি আকর্ষণকেন্দ্রের মতো হইয়া তাহাদেরই মধ্যে এক-এক দলকে কল্পনাসূত্রে এক করিয়া মানুষের মনের কাছে সুস্পষ্ট করিয়া তোলে। তাহাতেই আমাদের আনন্দ হয়। আনন্দ কেন হয় ? হয় তাহার কারণ এই, আপনাকে আপনি দেখিবার অনেক চেষ্টা সমস্ত মানবমনের মধ্যে কেবলই কাজ করিতেছে ; এইজন্য যেখানেই সে কোনো-একটা ঐক্যের মধ্যে নিজের কোনো-একটা বিকাশকে দেখিতে পায় সেখানেই তাহার এই নিয়তচেষ্টা সার্থক হইয়া তাহাকে আনন্দ দিতে থাকে। কেবল সাহিত্য কেন, দর্শন-ইতিহাসও এইরূপ। দর্শনশাস্ত্রের সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্ত চিন্তা অব্যক্তভাবে সমস্ত মানুষের মনে ছড়াইয়া আছে ; দার্শনিকের প্রতিভা তাহাদের মধ্যে কোনো-একটা দলকে কোনো-একটা ঐক্য দিবামাত্র তাহার একটা রূপ একটা মীমাংসা আমাদের কাছে ব্যক্ত হইয়া উঠে, আমরা নিজেদের মনের চিন্তার একটা বিশেষমূর্তি দেখিতে পাই। ইতিহাস লোকের মুখে মুখে জনশ্রুতি-আকারে ছড়াইয়া থাকে ; ঐতিহাসিকের প্রতিভা তাহাদিগকে একটি সূত্রের চারি দিকে বাঁধিয়া তুলিবামাত্র এত কালের অব্যক্ত ইতিহাসের ব্যক্তমূর্তি আমাদের কাছে ধরা দেয়।

কোন্ কবির কল্পনায় মানুষের হৃদয়ের কোন্ বিশেষ রূপ ঘনীভূত হইয়া আপন অনন্ত বৈচিত্র্যের একটা অপরূপ প্রকাশ সৌন্দর্যের দ্বারা ফুটাইয়া তুলিল তাহাই সাহিত্যসমালোচকের বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। কালিদাসের উপমা ভালো বা ভাষা সরস, বা কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের বর্ণনা

সুন্দর, বা অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ সর্গে করুণরস প্রচুর আছে, এ আলোচনা যথেষ্ট নহে। কিন্তু কালিদাসের সমস্ত কাব্যে মানবহৃদয়ের একটা বিশেষ রূপ বাঁধা পড়িয়াছে। তাঁহার কল্পনা একটা বিশেষ কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আকর্ষণবিকর্ষণ-গ্রহণবর্জনের নিয়মে মানুষের মনোলোকে কোন্ অব্যক্তকে একটা বিশেষ সৌন্দর্যে ব্যক্ত করিয়া তুলিল, সমালোচকের তাহাই বিচার্য। কালিদাস জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া দেখিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, সহিয়াছেন, কল্পনা ও রচনা করিয়াছেন; তাঁহার এই ভাবনা-বেদনা-কল্পনা -ময় জীবন মানবের অনন্তরূপের একটি বিশেষ রূপকেই বাণীর দ্বারা আমাদের কাছে ব্যক্ত করিয়াছে— সেইটি কী? যদি আমরা প্রত্যেকেই অসাধারণ কবি হইতাম তবে আমরা প্রত্যেকেই আপনার হৃদয়কে এমন করিয়া মূর্তিমান করিতাম যাহাতে একটি অপূর্বতা দেখা দিত এবং এইরূপে অন্তহীন বিচিত্রই অন্তহীন এককে প্রকাশ করিতে থাকিত। কিন্তু আমাদের সে ক্ষমতা নাই। আমরা ভাঙাচোরা করিয়া কথা বলি, আমরা নিজেকে ঠিকমত জানিই না; যেটাকে আমরা সত্য বলিয়া প্রচার করি সেটা হয়তো আমাদের প্রকৃতিগত সত্য নহে, তাহা হয়তো দশের মতের অভ্যস্ত আবৃত্তিমাত্র; এইজন্য আমি আমার সমস্ত জীবনটা দিয়া কী দেখিলাম, কী বুঝিলাম, কী পাইলাম, তাহা সমগ্র করিয়া সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইতেই পারি না। কবিরা যে সম্পূর্ণ পারেন তাহা নহে। তাঁহাদের বাণীও সমস্ত স্পষ্ট হয় না, সত্য হয় না, সুন্দর হয় না; তাঁহাদের চেষ্টা তাঁহাদের প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায়কে সকল সময়ে সার্থক করে না; কিন্তু তাঁহাদের নিজের অগোচরে তাঁহাদের চেষ্টার অতীত প্রদেশ হইতে একটা বিশ্বব্যাপী গূঢ় চেষ্টার প্রেরণায় সমস্ত বাধা ও অস্পষ্টতার মধ্য হইতে আপনিই একটি মানসরূপ, যাহাকে 'ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলে আর মেলে না', কখনো অল্প মাত্রায় কখনো অধিক মাত্রায় প্রকাশ হইতে থাকে। যে গূঢ়দর্শী ভাবুক, কবির কাব্যের ভিতর হইতে এই সমগ্ররূপটিকে দেখিতে পান তিনিই যথার্থ সাহিত্যবিচারক।

আমার এ-সকল কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, আমাদের ভাবের সৃষ্টি একটা খামখেয়ালি ব্যাপার নহে, ইহা বস্তুসৃষ্টির মতোই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন। প্রকাশের যে-একটা আবেগ আমরা বাহিরের জগতে সমস্ত অণুপরমাণুর ভিতরেই দেখিতেছি, সেই একই আবেগ আমাদের মনোবৃত্তির মধ্যে প্রবলবেগে কাজ করিতেছে। অতএব যে চক্ষে আমরা পর্বতকানন নদনদী মরুসমুদ্রকে দেখি সাহিত্যকেও সেই চক্ষেই দেখিতে হইবে; ইহাও আমার তোমার নহে, ইহা নিখিল সৃষ্টিরই একটা ভাগ।

তেমন করিয়া দেখিলে সাহিত্যের কেবল ভালোমন্দ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকা যায় না। সেইসঙ্গে তাহার একটা বিকাশের প্রণালী, তাহার একটা বৃহৎ কার্যকারণসম্বন্ধ দেখিবার জন্য আগ্রহ জন্মে। আমার কথাটা একটি দৃষ্টান্ত দিয়া স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

'গ্রাম্যসাহিত্য'[১]-নামক প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি, দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি ভাব টুকরা টুকরা কাব্য হইয়া চারি দিকে ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়। তার পরে একজন কবি সেই টুকরা কাব্যগুলিকে একটা বড়ো কাব্যের সূত্রে এক করিয়া একটা বড়ো পিণ্ড করিয়া তোলেন। হরপার্বতীর কত কথা যাহা কোনো পুরাণে নাই, রামসীতার কত কাহিনী যাহা মূলরামায়ণে পাওয়া যায় না, গ্রামের গায়ক-কথকদের মুখে মুখে পল্লীর আঙিনায় ভাঙা ছন্দ ও গ্রাম্যভাষার বাহনে কত কাল ধরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছে। এমন সময় কোনো রাজসভার কবি যখন, কুটিরের প্রাঙ্গণে নহে, কোনো বৃহৎ বিশিষ্টসভায় গান গাহিবার জন্য আহূত হইয়াছেন, তখন সেই গ্রাম্যকথাগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া মার্জিত ছন্দে গম্ভীর ভাষায় বড়ো করিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া দেখাইলেই সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়া দেখিয়া আনন্দলাভ করে। ইহাতে সে আপনার জীবনের পথে আরো একটা পর্ব যেন অগ্রসর হইয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এইরূপ

১ '**লোকসাহিত্য'-অন্তর্গত**। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী : সুলভ সংস্করণ তৃতীয় খণ্ড

শ্রেণীর কাব্য ; তাহা বাংলার ছোটো ছোটো পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস। এমনি করিয়া একটা বড়ো জায়গায় আপনার প্রাণপদার্থকে মিলাইয়া দিয়া পল্লীসাহিত্য, ফল-ধরা হইলেই ফুলের পাপড়িগুলার মতো, ঝরিয়া পড়িয়া যায়।

পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস, ইংলন্ডের আর্থার-কাহিনী, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সাগা সাহিত্য এমনি করিয়া জন্মিয়াছে ; সেইগুলির মধ্যে লোকমুখের বিক্ষিপ্ত কথা এক জায়গায় বড়ো আকারে দানা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এইরূপ ছড়ানো ভাবের এক হইয়া উঠিবার চেষ্টা মানবসাহিত্যে কয়েক জায়গায় অতি আশ্চর্য বিকাশ লাভ করিয়াছে। গ্রীসে হোমরের কাব্য এবং ভারতবর্ষে রামায়ণ-মহাভারত।

ইলিয়াড এবং অডেসিতে নানা খণ্ডগাথা ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে জোড়া লাগিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে, এ মত প্রায় মোটামুটি সর্বত্রই চলিত হইয়াছে। যে-সময়ে লেখা পুঁথি এবং ছাপা বইয়ের চলন ছিল না এবং যখন গায়কেরা কাব্য গান করিয়া শুনাইয়া বেড়াইত তখন যে ক্রমে নানা কালে ও নানা হাতে একটা কাব্য ভরাট হইয়া উঠিতে থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্যের কথা নাই। কিন্তু যে কাঠামোর মধ্যে এই কাব্যগুলি খাড়া হইবার জায়গা পাইয়াছে তাহা যে একজন বড়ো কবির রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, এই কাঠামোর গঠন অনুসরণ করিয়া নূতন নূতন জোড়াগুলি ঐক্যের গণ্ডি হইতে ভ্রষ্ট হইতে পায় নাই।

মিথিলার বিদ্যাপতির গান কেমন করিয়া বাংলা পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে, স্বভাবের নিয়মে এক কেমন করিয়া আর হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীকে বিদ্যাপতির বলা চলে না। মূল কবির প্রায় কিছুই তাহার অধিকাংশ পদেই নাই। ক্রমেই বাঙালি গায়ক ও বাঙালি শ্রোতার যোগে তাহার ভাষা, তাহার অর্থ, এমন-কি তাহার রসেরও পরিবর্তন হইয়া সে এক নূতন জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রিয়র্সন মূল বিদ্যাপতির যে-সকল পদ প্রকাশ করিয়াছেন বাংলা পদাবলীতে তাহার দুটি-চারটির ঠিকানা মেলে, বেশির ভাগই মিলাইতে পারা যায় না। অথচ নানা কাল ও নানা লোকের দ্বারা পরিবর্তন-সত্ত্বেও পদগুলি এলোমেলো প্রলাপের মতো হইয়া যায় নাই। কারণ, একটা মূলসুর মাঝখানে থাকিয়া সমস্ত পরিবর্তনকে আপনার করিয়া লইবার জন্য সর্বদা সতর্ক হইয়া বসিয়া আছে। সেই সুরটুকুর জোরেই এই পদগুলিকে বিদ্যাপতির পদ বলিতেছি, আবার আগাগোড়া পরিবর্তনের জোরে এগুলিকে বাঙালির সাহিত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রথমে নানামুখে প্রচলিত খণ্ডগানগুলা একটা কাব্যে বাঁধা পড়িয়া সেই কাব্য আবার যখন বহুকাল ধরিয়া সর্বসাধারণের কাছে গাওয়া হইতে থাকে, তখন আবার তাহার উপরে নানা দিক হইতে নানা কালের হাত পড়িতে থাকে। সেই কাব্য দেশের সকল দিক হইতেই আপনার পুষ্টি আপনি টানিয়া লয়। এমনি করিয়া ক্রমশই তাহা সমস্ত দেশের জিনিস হইয়া উঠে। তাহাতে সমস্ত দেশের অন্তঃকরণের ইতিহাস, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মবোধ, কর্মনীতি আপনি আসিয়া মিলিত হয়। যে কবি গোড়ায় ইহার ভিত পত্তন করিয়াছেন তাঁহার আশ্চর্য ক্ষমতাবলেই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। তিনি এমন জায়গায় এমন করিয়া গোড়া ফাঁদিয়াছেন, তাঁহার প্ল্যানটা এতই প্রশস্ত যে, বহুকাল ধরিয়া সমস্ত দেশকে তিনি নিজের কাজে খাটাইয়া লইতে পারেন। এতদিন ধরিয়া এত লোকের হাত পড়িয়া কোথাও যে কিছুই তেড়াবাঁকা হয় না, তাহা বলিতে পারি না— কিন্তু মূল গঠনটার মাহাত্ম্যে সে-সমস্তই অভিভূত হইয়া থাকে।

আমাদের রামায়ণ-মহাভারত, বিশেষভাবে মহাভারত, ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

এইরূপ কালে কালে একটি সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বভিত্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায়।

তাহাকে আমি গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর সঙ্গে তুলনা করি— প্রথমে পর্বতের নানা গোপন গুহা হইতে নানা ঝর্না একটা জায়গায় আসিয়া নদী তৈরি করিয়া তোলে, তার পরে সে যখন আপনার পথে

চলিতে থাকে তখন নানা দেশ হইতে উপনদী তাহার সঙ্গে মিলিয়া তাহার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

কিন্তু ভারতবর্ষের গঙ্গা, মিশরের নীল ও চীনের ইয়াংসিকিয়াং প্রভৃতির মতো মহানদী জগতে অল্পই আছে। এই-সমস্ত নদী মাতার মতো একটি বৃহৎ দেশের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তকে পালন করিয়া চলিয়াছে। ইহারা এক-একটি প্রাচীন সভ্যতার স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর মতো।

তেমনি মহাকাব্যও আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে কেবল চারিটিমাত্র আছে। ইলিয়াড অডেসি রামায়ণ ও মহাভারত। অলংকারশাস্ত্রে কৃত্রিম আইনের জোরেই রঘুবংশ, ভারবি, মাঘ, বা মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট, ভল্‌টেয়ারের আঁরিয়াদ প্রভৃতিকে মহাকাব্যের পঙ্‌ক্তিতে জোর করিয়া বসানো হইয়া থাকে। তাহার পরে এখনকার ছাপাখানার শাসনে মহাকাব্য গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা পর্যন্ত লোপ হইয়া গেছে।

রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে রামচরিত-সম্বন্ধে যে-সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্বসূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে যে-সকল বীরপুরুষ অবতাররূপে গণ্য হইয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই জগতের হিতের জন্য কোনো-না-কোনো অসামান্য কাজ করিয়াছিলেন। রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে দেশে রামচন্দ্রসম্বন্ধে সেইরূপ একটা লোকশ্রুতি নিঃসন্দেহই প্রচলিত ছিল। তিনি যে পিতৃসত্যপালনের জন্য বনে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নীহরণকারীকে বিনাশ করিয়া স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব প্রমাণ করে বটে, কিন্তু যে অসাধারণ লোকহিত সাধন করিয়া তিনি লোকের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিলেন রামায়ণে কেবল তাহার আভাস আছে মাত্র।

আর্যদের ভারত-অধিকারের পূর্বে যে দ্রাবিড়জাতীয়েরা আদিম নিবাসীদিগকে জয় করিয়া এই দেশ দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না। তাহারা আর্যদের কাছে সহজে হার মানে নাই। ইহারা আর্যদের যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইত, চাষের ব্যাঘাত করিত, কুলপতিরা অরণ্য কাটিয়া যে এক-একটি আশ্রম স্থাপন করিতেন সেই আশ্রমে তাহারা কেবলই উৎপাত করিত।

দাক্ষিণাত্যে কোনো দুর্গম স্থানে এই দ্রাবিড়জাতীয় রাজবংশ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদেরই প্রেরিত দলবল হঠাৎ বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আর্য-উপনিবেশগুলিকে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

রামচন্দ্র বানরগণকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগকে দলে লইয়া বহু দিনের চেষ্টায় ও কৌশলে এই দ্রাবিড়দের প্রতাপ নষ্ট করিয়া দেন ; এই কারণেই তাঁহার গৌরবগান আর্যদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। যেমন শকদের উপদ্রব হইতে হিন্দুদিগকে উদ্ধার করিয়া বিক্রমাদিত্য যশস্বী হইয়াছিলেন, তেমনি অনার্যদের প্রভাব খর্ব করিয়া যিনি আর্যদিগকে নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন তিনিও সাধারণের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং পূজ্য হইয়াছিলেন।

এই উপদ্রব কে দূর করিয়া দিবে সেই চিন্তা তখন চারি দিকে জাগিয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বামিত্র, অল্প বয়সেই সুলক্ষণ দেখিয়া রামচন্দ্রকেই যোগ্যপাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিশোরবয়স হইতেই রামচন্দ্র এই বিশ্বামিত্রের উৎসাহে ও শিক্ষায় শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত হন। তখনই তিনি আরণ্য গুহকের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া যে প্রণালীতে শত্রুজয় করিতে হইবে তাহার সূচনা করিতেছিলেন।

গোরু তখন ধন বলিয়া এবং কৃষি পবিত্রকর্মরূপে গণ্য হইত। জনক স্বহস্তে চাষ করিয়াছেন। এই চাষের লাঙল দিয়াই তখন আর্যেরা ভারতবর্ষের মাটিকে ক্রমশ আপন করিয়া লইতেছিলেন। এই লাঙলের মুখে অরণ্য হঠিয়া গিয়া কৃষিক্ষেত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। রাক্ষসেরা এই ব্যাপ্তির অন্তরায় ছিল।

প্রাচীন মহাপুরুষদের মধ্যে জনক যে আর্যসভ্যতার একজন ধুরন্ধর ছিলেন নানা জনপ্রবাদে সে কথার সমর্থন করে। ভারতবর্ষে কৃষিবিস্তারে তিনি একজন উদ্‌যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কন্যারও

নাম রাখিয়াছিলেন সীতা। পণ করিয়াছিলেন, যে বীর ধনুক ভাঙিয়া অসামান্য বলের পরিচয় দিবে তাহাকেই কন্যা দিবেন। সেই অশান্তির দিনে এইরূপ অসামান্য বলিষ্ঠপুরুষের জন্য তিনি অপেক্ষা করিয়াছিলেন। প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে যে লোক দাঁড়াইতে পারিবে তাহাকে বাছিয়া লইবার এই এক উপায় ছিল।

বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অনার্যপরাভবব্রতে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে জনকের পরীক্ষার স্থলে উপস্থিত করিলেন। সেখানে রামচন্দ্র ধনুক ভাঙিয়া তাঁহার ব্রতগ্রহণের শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন।

তার পর তিনি ছোটোভাই ভরতের উপর রাজ্যভার দিয়া মহৎ প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য বনে গমন করিলেন। ভরদ্বাজ অগস্ত্য প্রভৃতি যে-সকল ঋষি দুর্গম দক্ষিণে আর্যনিবাস-বিস্তারে প্রবৃত্ত ছিলেন তাঁহাদের উপদেশ লইয়া অনুচর লক্ষ্মণের সঙ্গে অপরিচিত গহন অরণ্যের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সেখানে বালি ও সুগ্রীব -নামক দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাইয়ের মধ্যে এক ভাইকে মারিয়া অন্য ভাইকে দলে লইলেন। বানরদিগকে বশ করিলেন, তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া সৈন্য গড়িলেন। সেই সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের মধ্যে কৌশলে আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া দিলেন। এই রাক্ষসেরা স্থাপত্যবিদ্যায় সুদক্ষ ছিল। যুধিষ্ঠির যে আশ্চর্য প্রাসাদ তৈরি করিয়াছিলেন ময়দানব তাহার কারিকর। মন্দির নির্মাণে দ্রাবিড়জাতীয়ের কৌশল আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। ইহারাই প্রাচীন ইজিপ্টীয়দের স্বজাতি বলিয়া যে কেহ কেহ অনুমান করেন তাহা নিতান্ত অসংগত বোধ হয় না।

যাহা হউক, স্বর্ণলঙ্কাপুরীর যে প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছিল তাহার একটা কিছু মূল ছিল। এই রাক্ষসেরা অসভ্য ছিল না। বরঞ্চ শিল্পবিলাসে তাহারা আর্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল।

রামচন্দ্র শত্রুদিগকে বশ করিয়াছিলেন, তাহাদের রাজ্য হরণ করেন নাই। বিভীষণ তাঁহার বন্ধু হইয়া লঙ্কায় রাজত্ব করিতে লাগিল। কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যভার বানরদের হাতে দিয়াই চিরদিনের মতো তিনি তাহাদিগকে বশ করিয়া লইলেন। এইরূপে রামচন্দ্রই আর্যদের সহিত অনার্যদের মিলন ঘটাইয়া পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাহারই ফলে দ্রাবিড়গণ ক্রমে আর্যদের সঙ্গে একসমাজভুক্ত হইয়া হিন্দুজাতি রচনা করিল। এই হিন্দুজাতির মধ্যে উভয়জাতির আচারবিচার-পূজাপদ্ধতি মিশিয়া গিয়া ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপিত হয়।

ক্রমে ক্রমে আর্য অনার্যের মিলন যখন সম্পূর্ণ হইল, পরস্পরের ধর্ম ও বিদ্যার বিনিময় হইয়া গেল, তখন রামচন্দ্রের পুরাতন কাহিনী মুখে মুখে রূপান্তর ও ভাবান্তর ধরিতে লাগিল। যদি কোনোদিন ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিপূর্ণ মিলন ঘটে তবে কি ক্লাইবের কীর্তি লইয়া বিশেষভাবে আড়ম্বর করিবার কোনো হেতু থাকিবে? না ম্যুটিনির উট্রাম প্রভৃতি যোদ্ধাদের কাহিনীকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক কোনো উত্তেজনা থাকিতে পারিবে?

যে কবি দেশপ্রচলিত চরিতগাথাগুলিকে মহাকাব্যের মধ্যে গাঁথিয়া ফেলিলেন তিনি এই অনার্যবশ ব্যাপারকেই প্রাধান্য না দিয়া মহৎ চরিত্রের এক সম্পূর্ণ আদর্শকে বড়ো করিয়া তুলিলেন। তিনি করিয়া তুলিলেন বলিলে বোধ হয় ভুল হয়। রামচন্দ্রের পূজ্যস্মৃতি ক্রমে ক্রমে কালান্তর ও অবস্থান্তরের অনুসরণ করিয়া আপনার পূজনীয়তাকে সাধারণের ভক্তিবৃত্তির উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। কবি তাঁহার প্রতিভার দ্বারা তাহাকে এক জায়গায় ঘনীভূত ও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। তখন সর্বসাধারণের ভক্তি চরিতার্থ হইল।

কিন্তু আদিকবি তাহাকে যেখানে দাঁড় করাইয়াছেন সে যে তাহার পর হইতে সেইখানেই স্থির হইয়া আছে, তাহা নহে।

রামায়ণের আদিকবি, গার্হস্থ্যপ্রধান হিন্দুসমাজের যত-কিছু ধর্ম রামকে তাহারই অবতার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, পতিরূপে, বন্ধুরূপে, ব্রাহ্মণধর্মের রক্ষাকর্তারূপে, অবশেষে

রাজারূপে বাল্মীকির রাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি যে রাবণকে মারিয়াছিলেন সেও কেবল ধর্মপত্নীকে উদ্ধার করিবার জন্য ; অবশেষে সেই পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন সেও কেবল প্রজারঞ্জনের অনুরোধে। নিজের সমুদয় সহজ প্রবৃত্তিকে শাস্ত্রমতে কঠিন শাসন করিয়া সমাজরক্ষার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। আমাদের স্থিতিপ্রধান সভ্যতায় পদে পদে যে ত্যাগ ক্ষমা ও আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন হয় রামের চরিত্রে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়া রামায়ণ হিন্দুসমাজের মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে।

আদিকবি যখন রামায়ণ লিখিয়াছিলেন তখন যদিচ রামের চরিতে অতিপ্রাকৃত মিশিয়াছিল তবু তিনি মানুষেরই আদর্শরূপে চিত্রিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু অতিপ্রাকৃতকে এক জায়গায় স্থান দিলে তাহাকে আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে ক্রমেই বাড়িয়া চলে। এমনি করিয়া রাম ক্রমে দেবতার পদবী অধিকার করিলেন।

তখন রামায়ণের মূল সুরটার মধ্যে আর-একটা পরিবর্তন প্রবেশ করিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রামকে দেবতা বলিলেই তিনি যে-সকল কঠিন কাজ করিয়াছিলেন তাহার দুঃসাধ্যতা চলিয়া যায়। সুতরাং রামের চরিত্রকে মহীয়ান করিবার জন্য সেগুলির বর্ণনাই আর যথেষ্ট হয় না। তখন যে ভাবের দিক দিয়া দেখিলে দেবচরিত্র মানুষের কাছে প্রিয় হয়, কাব্যে সেই ভাবটাই প্রবল হইয়া উঠে।

সেই ভাবটি ভক্তবৎসলতা। কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গুহক-চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানের জীবনকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। বিভীষণ তাঁহার ভক্ত। রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার কাছ হইতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।

ভারতবর্ষে এক সময়ে জনসাধারণের মধ্যে এই একটা ঢেউ উঠিয়াছিল। ঈশ্বরের অধিকার যে কেবল জ্ঞানীদিগেরই নহে এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে যে তন্ত্রমন্ত্র ও বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না, কেবল সরল ভক্তির দ্বারাই আপামর চণ্ডাল সকলেই ভগবানকে লাভ করিতে পারে, এই কথাটা হঠাৎ যেন একটা নূতন আবিষ্কারের মতো আসিয়া ভারতের জনসাধারণের দুঃসহ হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল। সেই বৃহৎ আনন্দ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল তখন যে সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহা জনসাধারণের এই নূতন গৌরবলাভের সাহিত্য। কালকেতু, ধনপতি, চাঁদসদাগর প্রভৃতি সাধারণ লোকেই তাহার নায়ক ; ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় নহে, মানীজ্ঞানী সাধক নহে, সমাজে যাহারা নীচে পড়িয়া আছে, দেবতা যে তাহাদেরও দেবতা, ইহাই সাহিত্য নানাভাবে প্রচার করিতেছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও এই ভাবটি ধরা দিয়াছে। ভগবান যে শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনাচারী বানরদেরও বন্ধু, কাঠবিড়ালির অতি সামান্য সেবাও যে তাঁহার কাছে অগ্রাহ্য হয় না, পাপিষ্ঠ রাক্ষসকেও যে তিনি যথোচিত শাস্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া উদ্ধার করেন, এই ভাবটিই কৃত্তিবাসে প্রবল হইয়া ভারতবর্ষে রামায়ণকথার ধারাকে গঙ্গার শাখা ভাগীরথীর ন্যায় আর-একটা বিশেষ পথে লইয়া গেছে।

রামায়ণকথার যে ধারা আমরা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি তাহারই একটি অত্যন্ত আধুনিক শাখা মেঘনাদবধকাব্যের মধ্যে রহিয়াছে। এই কাব্য সেই পুরাতন কথা অবলম্বন করিয়াও বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস হইতে একটি বিপরীত প্রকৃতি ধরিয়াছে।

আমরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকি যে, ইংরেজি শিখিয়া যে সাহিত্য আমরা রচনা করিতেছি তাহা খাঁটি জিনিস নহে। অতএব এ সাহিত্য যেন দেশের সাহিত্য বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য নয়।

যে জিনিসটা একটা-কোনো স্থায়ী বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, যাহার আর কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই যদি খাঁটি জিনিস বলা হয়, তবে সজীব প্রকৃতির মধ্যে সে জিনিসটা কোথাও নাই।

মানুষের সমাজে ভাবের সঙ্গে ভাবের মিলন হয়, এবং সে মিলনে নূতন নূতন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইতে

থাকে। ভারতবর্ষে এমন মিলন কত ঘটিয়াছে, আমাদের মন কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, তাহার কি সীমা আছে! অল্পদিন হইল মুসলমানেরা যখন আমাদের দেশের রাজসিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছিল তাহারা কি আমাদের মনকে স্পর্শ করে নাই? তাহাদের সেমেটিক-ভাবের সঙ্গে হিন্দুভাবের কোনো স্বাভাবিক সম্মিশ্রণ কি ঘটিতে পায় নাই? আমাদের শিল্পসাহিত্য বেশভূষা রাগরাগিণী ধর্মকর্মের মধ্যে মুসলমানের সামগ্রী মিশিয়াছে। মনের সঙ্গে মনের এ মিলন না হইয়া থাকিতে পারে না; যদি এমন হয় যে কেবল আমাদেরই মধ্যে এরূপ হওয়া সম্ভব নহে, তবে সে আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা।

য়ুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিলে নিজের চিত্তবৃত্তির প্রতি অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে। এইরূপ ভাবের মিলনে যে একটা ব্যাপার উৎপন্ন হইয়া উঠিতেছে, কিছুকাল পরে তাহার মূর্তিটা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইবার সময় আসিবে।

য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, এ কথা যখন সত্য, তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু-না-কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোনোমতেই হইতে পারে না; যদি হয় তবে এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।

মেঘনাদবদকাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারি দিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহার স্পর্ধাদ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারি দিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রপৌত্র-আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিককার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটলশক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না,- কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব ঐশ্বর্যে পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘনঘন গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে; এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক কালে রামায়ণকথার একটি নূতন-বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, একি কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে হইল? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে, দুর্বলের অভিমানবশত ইহাকে আমরা স্বীকার করিব না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি— তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরাও ঠেকাইতে পারি নাই।

রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া আমি এই কথাটা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, মানুষের সাহিত্যে যে

একটা ভাবের সৃষ্টি চলিতেছে তাহার স্থিতিগতির ক্ষেত্র অতি বৃহৎ। তাহা দেখিতে আকস্মিক ; এই চৈত্রমাসে যে ঘন ঘন এত বৃষ্টি হইয়া গেল সেও তো আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কত সুদূর পশ্চিম হইতে কারণপরম্পরার দ্বারা বাহিত হইয়া, কোথাও বা বিশেষ সুযোগ কোথাও বা বিশেষ বাধা পাইয়া, সেই বৃষ্টি আমার ক্ষেত্রকে অভিষিক্ত করিয়া দিল। ভাবের প্রবাহও তেমনি করিয়াই বহিয়া চলিয়াছে ; সে ছোটো বড়ো কত কারণের দ্বারা খণ্ড হইতে এক এবং এক হইতে শতধা হইয়া কত রূপরূপান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানসসৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে। তাহার কত রূপ, কত রস, কতই বিচিত্র গতি।

লেখককে যখন আমরা অত্যন্ত নিকটে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখি তখন লেখকের সঙ্গে লেখার সম্বন্ধটুকুই আমাদের কাছে প্রবল হইয়া উঠে ; তখন মনে করি গঙ্গোত্রীই যেন গঙ্গাকে সৃষ্টি করিতেছে। এইজন্য জগতের যে-সকল কাব্যের লেখক কে তাহার যেন ঠিকানা নাই, যে-সকল কাব্য আপনাকেই যেন আপনি সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, অথচ যাহার সূত্র ছিন্ন হইয়া যায় নাই, সেই-সকল কাব্যের দৃষ্টান্ত দিয়া আমি ভাবসৃষ্টির বিপুল নৈসর্গিকতার প্রতি আপনাদের মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

আষাঢ় ১৩১৪

বাংলা জাতীয় সাহিত্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎসভার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত

সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে ভাষায়-ভাষায় গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে ; মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর-কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে ; তাহারা বিচ্ছিন্ন।

পূর্বপুরুষদের সহিতও তাঁহাদের জীবন্ত যোগ নাই। কেবল পূর্বাপরপ্রচলিত জড়প্রথাবন্ধনের দ্বারা যে যোগসাধন হয় তাহা যোগ নহে, তাহা বন্ধন মাত্র। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ব্যতীত পূর্বপুরুষদিগের সহিত সচেতন মানসিক যোগ কখনো রক্ষিত হইতে পারে না।

আমাদের দেশের প্রাচীন কালের সহিত আধুনিক কালের যদিও প্রথাগত বন্ধন আছে, কিন্তু এক জায়গায় কোথায় আমাদের মনের মধ্যে এমন একটা নাড়ীর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে যে, সেকাল হইতে মানসিক প্রাণরস অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইয়া একাল পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতেছে না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেমন করিয়া চিন্তা করিতেন, কার্য করিতেন, নব তত্ত্ব উদ্‌ভাবন করিতেন— সমস্ত শ্রুতি পুরাণ কাব্যকলা ধর্মতত্ত্ব রাজনীতি সমাজতন্ত্রের মর্মস্থলে তাঁহাদের জীবনশক্তি তাঁহাদের চিৎশক্তি জাগ্রত থাকিয়া কী ভাবে সমস্তকে সর্বদা সৃজন এবং সংযমন করিত— কী ভাবে সমাজ প্রতিদিন বৃদ্ধিলাভ করিত, পরিবর্তনপ্রাপ্ত হইত, আপনাকে কেমন করিয়া চতুর্দিকে বিস্তার করিত, নূতন অবস্থাকে কেমন করিয়া আপনার সহিত সম্মিলিত করিত— তাহা আমরা সম্যক্‌রূপে জানি না। মহাভারতের কাল এবং আমাদের বর্তমান কালের মাঝখানকার অপরিসীম বিচ্ছেদকে আমরা পূরণ করিব কী দিয়া ? যখন ভুবনেশ্বর ও কনারক মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া যায় তখন মনে হয়, এই আশ্চর্য শিল্পকৌশলগুলি কি বাহিরের কোনো আকস্মিক আন্দোলনে কতকগুলি প্রস্তরময় বুদ্‌বুদের মতো হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল ? সেই শিল্পীদের সহিত আমাদের যোগ্ কোন্‌খানে ? যাহারা এত অনুরাগ এত ধৈর্য এত নৈপুণ্যের সহিত এই-সকল অভ্রভেদী সৌন্দর্য

সৃজন করিয়া তুলিয়াছিল, আর আমরা যাহারা অর্ধনিমীলিত উদাসীন চক্ষে সেই-সকল ভুবনমোহিনী কীর্তির এক-একটি প্রস্তরখণ্ড খসিতে দেখিতেছি অথচ কোনোটা যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি না এবং পুনঃস্থাপন করিবার ক্ষমতাও রাখি না, আমাদের মাঝখানে এমন কী একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়াছিল যাহাতে পূর্বকালের কার্যকলাপ এখনকার কালের নিকট প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয় ? আমাদের জাতীয়-জীবন-ইতিহাসের মাঝখানের কয়েকখানি পাতা কে একেবারে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল, যাহাতে আমরা তখনকার সহিত আপনাদিগের অর্থ মিলাইতে পারিতেছি না ? এখন আমাদের নিকট বিধানগুলি রহিয়াছে, কিন্তু সে বিধাতা নাই ; শিল্পী নাই, কিন্তু তাহাদের শিল্পনৈপুণ্যে দেশ আচ্ছন্ন হইয়া আছে। আমরা যেন কোন্ এক পরিত্যক্ত রাজধানীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে বাস করিতেছি ; সেই রাজধানীর ইষ্টক যেখানে খসিয়াছে আমরা সেখানে কেবল কর্দম এবং গোময়পঙ্ক লেপন করিয়াছি ; পুরী নির্মাণ করিবার রহস্য আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অবিদিত।

প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সহিত আমাদের এতই বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে যে, তাঁহাদের সহিত আমাদের পার্থক্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও আমরা হারাইয়াছি। আমরা মনে করি, সেকালের ভারতবর্ষের সহিত এখনকার কালের কেবল নূতন-পুরাতনের প্রভেদ। সেকালে যাহা উজ্জ্বল ছিল এখন তাহা মলিন হইয়াছে, সেকালে যাহা দৃঢ় ছিল এখন তাহাই শিথিল হইয়াছে ; অর্থাৎ আমাদিগকেই যদি কেহ সোনার জল দিয়া পালিশ করিয়া কিঞ্চিৎ ঝকঝকে করিয়া দেয় তাহা হইলেই সেই অতীত ভারতবর্ষ সশরীরে ফিরিয়া আসে। আমরা মনে করি, প্রাচীন হিন্দুগণ রক্তমাংসের মনুষ্য ছিলেন না, তাঁহারা কেবল সজীব শাস্ত্রের শ্লোক ছিলেন ; তাঁহারা কেবল বিশ্বজগৎকে মায়া মনে করিতেন এবং সমস্ত দিন জপতপ করিতেন। তাঁহারা যে যুদ্ধ করিতেন, রাজ্যরক্ষা করিতেন, শিল্পচর্চা ও কাব্যালোচনা করিতেন, সমুদ্র পার হইয়া বাণিজ্য করিতেন— তাঁহাদের মধ্যে যে ভালো-মন্দের সংঘাত ছিল, বিচার ছিল, বিদ্রোহ ছিল, মতবৈচিত্র্য ছিল, এক কথায় জীবন ছিল, তাহা আমরা জ্ঞানে জানি বটে কিন্তু অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি না। প্রাচীন ভারতবর্ষকে কল্পনা করিতে গেলেই নূতন পঞ্জিকার বৃদ্ধব্রাহ্মণ সংক্রান্তির মূর্তিটি আমাদের মনে উদয় হয়।

এই আত্যন্তিক ব্যবধানের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দেশে তখন হইতে এখন পর্যন্ত সাহিত্যের মনোময় প্রাণময় ধারা অবিচ্ছেদে বহিয়া আসে নাই। সাহিত্যের যাহা-কিছু আছে তাহা মাঝে মাঝে দূরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। তখনকার কালের চিন্তাস্রোত ভাবস্রোত প্রাণস্রোতের আদিগঙ্গা শুকাইয়া গেছে, কেবল তাহার নদীখাতের মধ্যে মধ্যে জল বাধিয়া আছে ; তাহা কোনো-একটি বহমান আদিম ধারার দ্বারা পরিপুষ্ট নহে, তাহার কতখানি প্রাচীন জল কতটা আধুনিক লোকাচারের বৃষ্টি -সঞ্চিত বলা কঠিন। এখন আমরা সাহিত্যের ধারা অবলম্বন করিয়া হিন্দুত্বের সেই বৃহৎ প্রবল নানাভিমুখ সচল তটগঠনশীল সজীব স্রোত বাহিয়া একাল হইতে সেকালের মধ্যে যাইতে পারি না। এখন আমরা সেই শুষ্কপথের মাঝে মাঝে নিজের অভিরুচি ও আবশ্যক -অনুসারে পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহাকে হিন্দুত্ব নামে অভিহিত করিতেছি। সেই বদ্ধ ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন হিন্দুত্ব আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ; তাহার কোনোটা বা আমার হিন্দুত্ব, কোনোটা বা তোমার হিন্দুত্ব ; তাহা সেই কণ্ব-কণাদ রাঘব-কৌরব নন্দ-উপনন্দ এবং আমাদের সর্বসাধারণের তরঙ্গিত প্রবাহিত অখণ্ডবিপুল হিন্দুত্ব কি না সন্দেহ।

এইরূপে সাহিত্যের অভাবে আমাদের মধ্যে পূর্বাপরের সজীব যোগবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। কিন্তু সাহিত্যের অভাব ঘটিবার একটা প্রধান কারণ, আমাদের মধ্যে জাতীয় যোগবন্ধনের অসদ্ভাব। আমাদের দেশে কনোজ কোশল কাশী কাঞ্চী প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ভাবে আপন আপন পথে চলিয়া গিয়াছে, এবং মাঝে মাঝে অশ্বমেধের ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পরস্পরকে সংক্ষিপ্ত করিতেও ছাড়ে নাই। মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ, রাজতরঙ্গিণীর কাশ্মীর, নন্দবংশীয়দের মগধ, বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী, ইহাদের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের কোনো ধারাবাহিক যোগ ছিল না। সেইজন্য সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের উপর জাতীয় সাহিত্য আপন অটল ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। বিচ্ছিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন কালে গুণজ্ঞ

রাজার আশ্রয়ে এক-এক জন সাহিত্যকার আপন কীর্তি স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কালিদাস কেবল বিক্রমাদিত্যের, চাঁদবর্দি কেবল পৃথ্বীরাজের, চাণক্য কেবল চন্দ্রগুপ্তের। তাঁহারা তৎকালীন সমস্ত ভারতবর্ষের নহেন, এমন-কি তৎপ্রদেশেও তাঁহাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের মধ্যে যখন সাহিত্য আপন উত্তপ্ত সুরক্ষিত নীড়টি বাঁধিয়া বসে তখনই সে আপনার বংশ রক্ষা করিতে, ধারাবাহিক ভাবে আপনাকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিতে পারে। সেইজন্য প্রথমেই বলিয়াছি সহিতত্বই সাহিত্যের প্রধান উপাদান ; সে বিচ্ছিন্নকে এক করে, এবং যেখানে ঐক্য সেইখানে আপন প্রতিষ্ঠাভূমি স্থাপন করে। যেখানে একের সহিত অন্যের, কালের সহিত কালান্তরের, গ্রামের সহিত ভিন্ন গ্রামের বিচ্ছেদ, সেখানে ব্যাপক সাহিত্য জন্মিতে পারে না। আমাদের দেশে কিসে অনেক লোক এক হয় ? ধর্মে। সেইজন্য আমাদের দেশে কেবল ধর্মসাহিত্যই আছে। সেইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল শাক্ত এবং বৈষ্ণব কাব্যেরই সমষ্টি। রাজপুতগণকে বীরগৌরবে এক করিত, এইজন্য বীরগৌরব তাহাদের কবিদের গানের বিষয় ছিল।

আমাদের ক্ষুদ্র বঙ্গদেশেও একটা সাধারণ সাহিত্যের হাওয়া উঠিয়াছে। ধর্মপ্রচার হইতেই ইহার আরম্ভ। প্রথমে যাঁহারা ইংরাজি শিখিতেন তাঁহারা প্রধানত আমাদের বণিক ইংরাজ-রাজের নিকট উন্নতিলাভের প্রত্যাশাতেই এ কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন ; তাঁহাদের অর্থকরী বিদ্যা সাধারণের কোনো কাজে লাগিত না। তখন সর্বসাধারণকে এক শিক্ষায় গঠিত করিবার সংকল্প কাহারও মাথায় উঠে নাই ; তখন কৃতী-পুরুষগণ যে যাহার আপন আপন পন্থা দেখিত।

বাংলার সর্বসাধারণকে আপনাদের কথা শুনাইবার অভাব খৃস্টীয় মিশনরিগণ সর্বপ্রথমে অনুভব করেন, এইজন্য তাঁহারা সর্বসাধারণের ভাষাকে শিক্ষাবহনের ও জ্ঞানবিতরণের যোগ্য করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু এ কার্য বিদেশীয়ের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর নহে। নব্যবঙ্গের প্রথম সৃষ্টিকর্তা রাজা রামমোহন রায়ই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে গদ্যসাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়া দেন।

ইতিপূর্বে আমাদের সাহিত্য কেবল পদ্যেই বদ্ধ ছিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে পদ্য যথেষ্ট ছিল না। কেবল ভাবের ভাষা, সৌন্দর্যের ভাষা, রসজ্ঞের ভাষা নহে ; যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাষা, সর্ববিষয়ের এবং সর্বসাধারণের ভাষা তাঁহার আবশ্যক ছিল। পূর্বে কেবল ভাবুকসভার জন্য পদ্য ছিল, এখন জনসভার জন্য গদ্য অবতীর্ণ হইল। এই গদ্যপদ্যর সহযোগ ব্যতীত কখনো কোনো সাহিত্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। খাস-দরবার এবং আম-দরবার ব্যতীত সাহিত্যের রাজ-দরবার সরস্বতী মহারানীর সমস্ত প্রজাসাধারণের উপযোগী হয় না। রামমোহন রায় আসিয়া সরস্বতীর সেই আম-দরবারের সিংহদ্বার স্বহস্তে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন।

আমরা আশৈশবকাল গদ্য বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু গদ্য যে কী দুরূহ ব্যাপার তাহা আমাদের প্রথম গদ্যকারদের রচনা দেখিলেই বুঝা যায়। পদ্যে প্রত্যেক ছত্রের প্রান্তে একটি করিয়া বিশ্রামের স্থান আছে, প্রত্যেক দুই ছত্র বা চারি ছত্রের পর একটা করিয়া নিয়মিত ভাবের ছেদ পাওয়া যায় ; কিন্তু গদ্যে একটা পদের সহিত আর-একটা পদকে বাঁধিয়া দিতে হয়, মাঝে ফাঁক রাখিবার জো নাই ; পদের মধ্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়াকে এবং পদগুলিকে পরস্পরের সহিত এমন করিয়া সাজাইতে হয় যাহাতে গদ্যপ্রবন্ধের আদ্যন্তমধ্যে যুক্তিসম্বন্ধের নিবিড় যোগ ঘনিষ্ঠরূপে প্রতীয়মান হয়। ছন্দের একটা অনিবার্য প্রবাহ আছে ; সেই প্রবাহের মাঝখানে একবার ফেলিয়া দিতে পারিলে কবিতা সহজে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া চলিয়া যায় ; কিন্তু গদ্যে নিজে পথ দেখিয়া পায়ে হাঁটিয়া নিজের ভারসামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়, সেই পদব্রজ-বিদ্যাটি রীতিমত অভ্যাস না থাকিলে চাল অত্যন্ত আঁকাবাঁকা এলোমেলো এবং টল্‌মলে হইয়া থাকে। গদ্যের সুপ্রণালীবদ্ধ নিয়মটি আজকাল আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গেছে, কিন্তু অনধিককাল পূর্বে এরূপ ছিল না।

তখন যে গদ্য রচনা করাই কঠিন ছিল তাহা নহে, তখন লোকে অনভ্যাসবশত গদ্য প্রবন্ধ সহজে

বুঝিতে পারিত না। দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দতরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল। আমি বোধ করি, কবিতার হ্রস্ব পদ, ভাবের নিয়মিত ছেদ ও ছন্দ এবং মিলের ঝংকার-বশত কথাগুলি অতি শীঘ্র মনে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং শ্রোতাগণ তাহা সত্বর ধারণা করিতে পারে। কিন্তু ছন্দোবন্ধহীন বৃহৎকায় গদ্যের প্রত্যেক পদটি এবং প্রত্যেক অংশটি পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া যাইতে বিশেষ একটা মানসিক চেষ্টার আবশ্যক করে। সেইজন্য রামমোহন রায় যখন বেদান্তসূত্র বাংলায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন গদ্য বুঝিবার কী প্রণালী তৎসম্বন্ধে ভূমিকা রচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। সেই অংশটি উদ্‌ধৃত করিতে ইচ্ছা করি—

> 'এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়।'

অতঃপর কী করিলে গদ্যে বোধ জন্মে তৎসম্বন্ধে লেখক উপদেশ দিতেছেন।—

> 'বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন' ইত্যাদি।

পুরাণ-ইতিহাসে পড়া গিয়াছে, রাজগণ সহসা কোনো ঋষির তপোবনে অতিথি হইলে তাঁহারা যোগবলে মদ্যমাংসের সৃষ্টি করিয়া রাজা ও রাজানুচরবর্গকে ভোজন করাইতেন। বেশ দেখা যাইতেছে, তপোবনের নিকট দোকানবাজারের সংস্রব ছিল না এবং শালপত্রপুটে কেবল হরীতকী আমলকী সংগ্রহ করিয়া রাজযোগ্য ভোজের আয়োজন করা যায় না, সেইজন্য ঋষিদিগকে তপঃপ্রভাব প্রয়োগ করিতে হইত। রামমোহন রায় যেখানে ছিলেন সেখানেও কিছুই প্রস্তুত ছিল না; গদ্য ছিল না, গদ্যবোধশক্তিও ছিল না। যে সময়ে এ কথা উপদেশ করিতে হইত যে, প্রথমের সহিত শেষের যোগ, কর্তার সহিত ক্রিয়া অন্বয়, অনুসরণ করিয়া গদ্য পাঠ করিতে হয়, সেই আদিমকালে রামমোহন পাঠকদের জন্য কী উপহার প্রস্তুত করিতেছিলেন? বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ। তিনি সর্বসাধারণকে অযোগ্য জ্ঞান করিয়া তাহাদের হস্তে উপস্থিতমত সহজপ্রাপ্য আমলকী হরীতকী আনিয়া দিলেন না। সর্বসাধারণের প্রতি তাঁহার এমন একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। আমাদের দেশে অধুনাতন কালের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথমে মানবসাধারণকে রাজা বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বলিয়াছিলেন, সাধারণ নামক এই মহারাজকে আমি যথোচিত অতিথিসৎকার করিব; আমার অরণ্যে ইঁহার উপযুক্ত কিছুই নাই, কিন্তু আমি কঠিন তপস্যার দ্বারা রাজভোগের সৃষ্টি করিয়া দিব।

কেবল পণ্ডিতদের নিকট পাণ্ডিত্য করা, জ্ঞানীদের নিকট খ্যাতি অর্জন করা, রামমোহন রায়ের ন্যায় পরম বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য ছিল। কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্যের নির্জন অত্যুচ্চশিখর ত্যাগ করিয়া সর্বসাধারণের ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং জ্ঞানের অন্ন ও ভাবের সুধা সমস্ত মানবসভার মধ্যে পরিবেশন করিতে উদ্যত হইলেন।

এইরূপে বাংলাদেশে এক নূতন রাজার রাজত্ব এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল। নব্যবঙ্গের প্রথম বাঙালি, সর্বসাধারণকে রাজটিকা পরাইয়া দিলেন এবং এই রাজার বাসের জন্য সমস্ত বাংলাদেশে বিস্তীর্ণ ভূমির মধ্যে সুগভীর ভিত্তির উপরে সাহিত্যকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কালে কালে সেই ভিত্তির উপর নব নব তল নির্মিত হইয়া সাহিত্যহর্ম্য অভ্রভেদী হইয়া উঠিবে এবং অতীত-ভবিষ্যতের সমস্ত বঙ্গহৃদয়কে স্থায়ী আশ্রয় দান করিতে থাকিবে, অদ্য আমাদের নিকট ইহা দুরাশার স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে, বড়ো একটি উন্নত ভাবের উপর বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যখন এই নির্মাণকার্যের আরম্ভ হয় তখন বঙ্গভাষার না ছিল কোনো যোগ্যতা, না ছিল সমাদর ; তখন বঙ্গভাষা কাহাকে খ্যাতিও দিত না অর্থও দিত না ; তখন বঙ্গভাষায় ভাব প্রকাশ করাও দুরূহ ছিল এবং ভাব প্রকাশ করিয়া তাহা সাধারণের মধ্যে প্রচার করাও দুঃসাধ্য ছিল। তাহার আশ্রয়দাতা রাজা ছিল না, তাহার উৎসাহদাতা শিক্ষিতসাধারণ ছিল না। যাঁহারা ইংরাজি চর্চা করিতেন তাঁহারা বাংলাকে উপেক্ষা করিতেন এবং যাঁহারা বাংলা জানিতেন তাঁহারাও এই নূতন উদ্যমের কোনো মর্যাদা বুঝিতেন না।

তখন বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্মুখে কেবল সুদূর ভবিষ্যৎ এবং সুবৃহৎ জনমণ্ডলী উপস্থিত ছিল— তাহাই যথার্থ সাহিত্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি ; স্বার্থও নহে, খ্যাতিও নহে, প্রকৃত সাহিত্যের ধ্রুব লক্ষ্যস্থল কেবল নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথিবী। সেই লক্ষ্য থাকে বলিয়াই সাহিত্য মানবের সহিত মানবকে যুগের সহিত যুগান্তরকে প্রাণবন্ধনে বাঁধিয়া দেয়। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও ব্যাপ্তি -সহকারে কেবল যে সমস্ত বাঙালির হৃদয় অন্তরতম যোগে বদ্ধ হইবে তাহা নহে, এক সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিকেও বঙ্গসাহিত্য আপন জ্ঞানান্নবিতরণের অতিথিশালায়, আপন ভাবামৃতের অবারিত সদাব্রতে আকর্ষণ করিয়া আনিবে তাহার লক্ষণ এখন হইতেই অল্পে অল্পে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

এ পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা একক ভাবেই কাজ করিয়াছেন। একক ভাবে সকল কাজই কঠিন, বিশেষত সাহিত্যের কাজ। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদান সহিতত্ব। যে সমাজে জনসাধারণের মনের মধ্যে অনেকগুলি ভাব সঞ্চিত এবং সর্বদা আন্দোলিত হইতেছে, যেখানে পরস্পরের মানসিক সংস্পর্শ নানা আকারে পরস্পর অনুভব করিতে পারিতেছে, সেখানে সেই মনের সংঘাতে ভাব এবং ভাবের সংঘাতে সাহিত্য স্বতই জন্মগ্রহণ করে এবং চতুর্দিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে। এই মানবমনের সজীব সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবলমাত্র দৃঢ় সংকল্পের আঘাতে সঙ্গিহীন মনকে জনশূন্য কঠিন কর্তব্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চালনা করা, একলা বসিয়া চিন্তা করা, উদাসীনদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার একান্ত চেষ্টা করা, সুদীর্ঘকাল একমাত্র নিজের অনুরাগের উত্তাপে নিজের ভাবপুষ্পগুলিকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস করা এবং চিরজীবনের প্রাণপণ উদ্যমের সফলতা সম্বন্ধে চিরকাল সন্দিহান হইয়া থাকা— এমন নিরানন্দের অবস্থা আর কী আছে ? যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে কেবল যে তাহারই কষ্ট তাহা নয়, ইহাতে কাজেরও অসম্পূর্ণতা ঘটে। এইরূপ উপবাসদশায় সাহিত্যের ফুলগুলিতে সম্পূর্ণ রঙ ধরে না, তাহার ফলগুলিতে পরিপূর্ণমাত্রায় পাক ধরিতে পায় না। সাহিত্যের সমস্ত আলোক ও উত্তাপ সর্বত্র সর্বতোভাবে সঞ্চারিত হইতে পারে না।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, পৃথিবীবেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলের একটি প্রধান কাজ, সূর্যালোককে ভাঙিয়া বণ্টন করিয়া চারি দিকে যথাসম্ভব সমানভাবে বিকীর্ণ করিয়া দেওয়া। বাতাস না থাকিলে মধ্যাহ্নকালেও কোথাও বা প্রখর আলোক কোথাও বা নিবিড়তম অন্ধকার বিরাজ করিত।

আমাদের জ্ঞানরাজ্যের মনোরাজ্যের চারি দিকেও সেইরূপ একটা বায়ুমণ্ডলের আবশ্যকতা আছে। সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া এমন একটা অনুশীলনের হাওয়া বহা চাই যাহাতে জ্ঞান এবং ভাবের রশ্মি চতুর্দিকে প্রতিফলিত, বিকীর্ণ হইতে পারে।

যখন বঙ্গদেশে প্রথম ইংরাজিশিক্ষা প্রচলিত হয়, যখন আমাদের সমাজে সেই মানসিক বায়ুমণ্ডল সৃজিত হয় নাই, তখন শতরঞ্জের সাদা এবং কালো ঘরের মতো শিক্ষা এবং অশিক্ষা পরস্পর সংলিপ্ত না হইয়া ঠিক পাশাপাশি বাস করিত। যাহারা ইংরাজি শিখিয়াছে এবং যাহারা শেখে নাই তাহারা সুস্পষ্টরূপে বিভক্ত ছিল ; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনোরূপ সংযোগ ছিল না, কেবল সংঘাত ছিল। শিক্ষিত ভাই আপন অশিক্ষিত ভাইকে মনের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিত, কিন্তু কোনো সহজ উপায়ে তাহাকে আপন শিক্ষার অংশ দান করিতে পারিত না।

কিন্তু দানের অধিকার না থাকিলে কোনো জিনিসে পুরা অধিকার থাকে না। কেবল ভোগস্বত্ব এবং জীবনস্বত্ব নাবালক এবং স্ত্রীলোকের অসম্পূর্ণ অধিকার মাত্র। এক সময়ে আমাদের ইংরাজি-পণ্ডিতেরা

মস্ত পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পাণ্ডিত্য তাঁহাদের নিজের মধ্যেই বদ্ধ থাকিত, দেশের লোককে দান করিতে পারিতেন না— এইজন্য সে পাণ্ডিত্য কেবল বিরোধ এবং অশান্তির সৃষ্টি করিত। সেই অসম্পূর্ণ পাণ্ডিত্যে কেবল প্রচুর উত্তাপ দিত কিন্তু যথেষ্ট আলোক দিত না।

এই ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ ব্যাপ্তিহীন পাণ্ডিত্য কিছু অত্যুগ্র হইয়া উঠে ; কেবল তাহাই নহে, তাহার প্রধান দোষ এই যে নবশিক্ষার মুখ্য এবং গৌণ অংশ সে নির্বাচন করিয়া লইতে পারে না। সেইজন্য প্রথম-প্রথম যাঁহারা ইংরাজি শিখিয়াছিলেন তাঁহারা চতুষ্পার্শ্ববর্তীদের প্রতি অনাবশ্যক উৎপীড়ন করিয়াছিলেন এবং স্থির করিয়াছিলেন মদ্য মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার মুখ্য উপকরণ।

চালের বস্তার চাল এবং কাঁকর পৃথক পৃথক বাছিতে হইলে একটা পাত্রে সমস্ত ছড়াইয়া ফেলিতে হয় ; তেমনি নবশিক্ষা অনেকের মধ্যে বিস্তারিত করিয়া না দিলে তাহার শস্য এবং কঙ্কর অংশ নির্বাচন করিয়া ফেলা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। অতএব প্রথম-প্রথম যখন নূতন শিক্ষায় সম্পূর্ণ ভালো ফল না দিয়া নানাপ্রকার অসংগত আতিশয্যের সৃষ্টি করে তখন অতিমাত্র ভীত হইয়া সে শিক্ষাকে রোধ করিবার চেষ্টা সকল সময়ে সদ্‌বিবেচনার কাজ নহে। যাহা স্বাধীনভাবে ব্যাপ্ত হইতে পারে তাহা আপনাকে আপনি সংশোধন করিয়া লয়, যাহা বদ্ধ থাকে তাহাই দূষিত হইয়া উঠে।

এই কারণে ইংরাজি শিক্ষা যখন সংকীর্ণ সীমায় নিরুদ্ধ ছিল তখন সেই ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে ইংরাজি সভ্যতার ত্যাজ্য অংশ সঞ্চিত হইয়া সমস্ত কলুষিত করিয়া তুলিতেছিল। এখন সেই শিক্ষা চারি দিকে বিস্তৃত হওয়াতেই তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু ইংরাজি শিক্ষা যে ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিয়া বিস্তৃত হইয়াছে তাহা নহে। বাংলা সাহিত্যই তাহার প্রধান সহায় হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালি এক সময়ে ইংরাজ-রাজ্য স্থাপনের সহায়তা করিয়াছিল ; ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গসাহিত্য আজ ইংরাজি ভাবরাজ্য এবং জ্ঞানরাজ্য -বিস্তারের প্রধান সহকারী হইয়াছে। এই বাংলাসাহিত্যযোগে ইংরাজিভাব যখন ঘরে বাহিরে সর্বত্র সুগম হইল তখনই ইংরাজি সভ্যতার অন্ধ দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের জন্য আমরা সচেতন হইয়া উঠিলাম। ইংরাজি শিক্ষা এখন আমাদের সমাজে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, এইজন্য আমরা স্বাধীনভাবে তাহার ভালোমন্দ তাহার মুখ্যগৌণ বিচারের অধিকারী হইয়াছি ; এখন নানা চিত্ত নানা অবস্থায় তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে ; এখন সেই শিক্ষার দ্বারা বাঙালির মন সজীব হইয়াছে এবং বাঙালির মনকে আশ্রয় করিয়া সেই শিক্ষাও সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের জ্ঞানরাজ্যের চতুর্দিকে মানসিক বায়ুমণ্ডল এমনি করিয়া সৃজিত হয়। আমাদের মন যখন সজীব ছিল না তখন এই বায়ুমণ্ডলের অভাব আমরা তেমন করিয়া অনুভব করিতাম না, এখন আমাদের মানসপ্রাণ যতই সজীব হইয়া উঠিতেছে ততই এই বায়ুমণ্ডলের জন্য আমরা ব্যাকুল হইতেছি।

এতদিন আমাদিগকে জলমগ্ন ডুবারির মতো ইংরাজি-সাহিত্যাকাশ হইতে নলে করিয়া হাওয়া আনাইতে হইত। এখনো সে নল সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু অল্পে অল্পে আমাদের জীবনসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারি দিকে সেই বায়ুসঞ্চারও আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশীয় ভাষায় দেশীয় সাহিত্যের হাওয়া উঠিয়াছে।

যতক্ষণ বাংলাদেশে সাহিত্যের সেই হাওয়া বহে নাই, সেই আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই, যতক্ষণ বঙ্গসাহিত্য এক-একটি স্বতন্ত্র সঙ্গিহীন প্রতিভাশিখর আশ্রয় করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, ততক্ষণ তাহার দাবি করিবার বিষয় বেশি-কিছু ছিল না। ততক্ষণ কেবল বলবান ব্যক্তিগণ তাহাকে নিজ বীর্যবলে নিজ বাহুযুগলের উপর ধারণপূর্বক পালন করিয়া আসিতেছিলেন। এখন সে সাধারণের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করিয়াছে, এখন বাংলাদেশের সর্বত্রই সে অবাধ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন অন্তঃপুরেও সে পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় প্রবেশ করে এবং বিদ্বৎসভাতেও সে সমাদৃত অতিথির ন্যায় আসন প্রাপ্ত হয়। এখন যাঁহারা ইংরাজিতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহারা বাংলা ভাষায় ভাবপ্রকাশ করাকে গৌরব জ্ঞান করেন ; এখন অতিবড়ো বিলাতি-বিদ্যাভিমানীও বাংলাপাঠকদিগের

নিকট খ্যাতি অর্জন করাকে আপন চেষ্টার অযোগ্য বোধ করেন না।

প্রথমে যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবাহ আমাদের সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন কেবল বিলাতি বিদ্যার একটা বালির চর বাঁধিয়া দিয়াছিল ; সে বালুকারাশি পরস্পর অসংসক্ত ; তাহার উপরে না আমাদের স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করা যায়, না তাহা সাধারণের প্রাণধারণযোগ্য শস্য উৎপাদন করিতে পারে। অবশেষে তাহারই উপরে যখন বঙ্গসাহিত্যের পলিমৃত্তিকা পড়িল তখন যে কেবল দৃঢ় তট বাঁধিয়া গেল, তখন যে কেবল বাংলার বিচ্ছিন্ন মানবেরা এক হইবার উপক্রম করিল তাহা নহে, তখন বাংলা হৃদয়ের চিরকালের খাদ্য এবং আশ্রয়ের উপায় হইল। এখন এই জীবনশালিনী জীবনদায়িনী মাতৃভাষা সন্তানসমাজে আপন অধিকার প্রার্থনা করিতেছে।

সেইজন্যই আজ উপযুক্ত কালে এক সময়োচিত আন্দোলন স্বতই উদ্ভূত হইয়াছে। কথা উঠিয়াছে, আমাদের বিদ্যালয়ে অধিকতর পরিমাণে বাংলা শিক্ষা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

কেন আবশ্যক ? কারণ, শিক্ষাদ্বারা আমাদের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা যে অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে বাংলা ভাষা ব্যতীত তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। শিখিয়া যদি কেবল সাহেবের চাকরি ও আপিসের কেরানিগিরি করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম তাহা হইলে কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু শিক্ষায় আমাদের মনে যে কর্তব্যের আদর্শ স্থাপিত করিয়াছে তাহা লোকহিত। জনসাধারণের নিকটে আপনাকে কর্মপাশে বদ্ধ করিতে হইবে, সকলকে শিক্ষা বিতরণ করিতে হইবে, সকলকে ভাবরসে সরস করিতে হইবে, সকলকে জাতীয় বন্ধনে যুক্ত করিতে হইবে।

দেশীয় ভাষা ও দেশীয় সাহিত্যের অবলম্বনব্যতীত এ কার্য কখনো সিদ্ধ হইবার নহে। আমরা পরের হস্ত হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছি দান করিবার সময় নিজের হস্ত দিয়া তাহা বণ্টন করিতে হইবে।

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে সর্বসাধারণের নিকট নিজের কর্তব্য পালন করিবার, যাহা লাভ করিয়াছি তাহা সর্বসাধারণের জন্য সঞ্চয় করিবার, যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহা সাধারণের সমক্ষে প্রমাণ করিবার, যাহা ভোগ করিতেছি তাহা সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু অদৃষ্টদোষে সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার উপায় এখনো আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সুলভ হয় নাই। আমরা ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে উদ্দেশ্য শিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপায় লাভ করিতেছি না।

কেহ কেহ বলেন, বিদ্যালয়ে বাংলা-প্রচলনের কোনো আবশ্যক নাই ; কারণ এ পর্যন্ত ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজের অনুরাগেই বাংলা-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাংলা শিখিবার জন্য তাঁহাদিগকে অতিমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। এখন কেবল ক্ষমতাশালী লেখকের উপর বাংলা সাহিত্য নির্ভর করিতেছে না, এখন তাহা সমস্ত শিক্ষিত-সাধারণের সামগ্রী। এখন প্রায় কোনো-না-কোনো উপলক্ষে বাংলা ভাষায় ভাবপ্রকাশের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই উপর সমাজের দাবি দেখা যায়। কিন্তু সকলের শক্তি সমান নহে ; অশিক্ষা ও অনভ্যাসের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার কর্তব্য-পালন সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। এবং বাংলা অপেক্ষাকৃত অপরিণত ভাষা বলিয়াই তাহাকে কাজে লাগাইতে হইলে সবিশেষ শিক্ষা এবং নৈপুণ্যের আবশ্যক করে।

এখন বাংলা খবরের কাগজ, মাসিক পত্র, সভাসমিতি, আত্মীয়সমাজ, সর্বত্র হইতেই বঙ্গভূমি তাহার শিক্ষিত সন্তানদিগকে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে আহ্বান করিতেছে। যাহারা প্রস্তুত নহে, যাহারা অক্ষম, তাহারা কিছু-না-কিছু সংকোচ অনুভব করিতেছে। অসাধারণ নির্লজ্জ না হইলে আজকাল বাংলা ভাষার অজ্ঞতা লইয়া আস্ফালন করিতে কেহ সাহস করে না। এক্ষণে আমাদের বিদ্যালয় যদি ছাত্রদিগকে আমাদের বর্তমান আদর্শের উপযোগী না করিয়া তোলে, আমাদের সমাজের সর্বাঙ্গীণ হিতসাধনে সক্ষম না করে, যে বিদ্যা আমাদিগকে অর্পণ করে সঙ্গে সঙ্গে তাহার দানাধিকার যদি আমাদিগকে না দেয়, আমাদের পরমাত্মীয়দিগকে বুভুক্ষিত দেখিয়াও সে বিদ্যা পরিবেশন করিবার শক্তি যদি আমাদের না থাকে— তবে এমন বিদ্যালয় আমাদের বর্তমান কাল ও অবস্থার পক্ষে অত্যন্ত

অসম্পূর্ণ তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

যেমন মাছ ধরিবার সময় দেখা যায়, অনেক মাছ যতক্ষণ বঁড়শিতে বিদ্ধ হইয়া জলে খেলাইতে থাকে ততক্ষণ তাহাকে ভারী মস্ত মনে হয়, কিন্তু ডাঙায় টান মারিয়া তুলিলেই প্রকাশ হইয়া পড়ে যত বড়োটা মনে করিয়াছিলাম তত বড়োটা নহে— যেমন রচনাকালে দেখা যায় একটা ভাব যতক্ষণ মনের মধ্যে অস্ফুট অপরিণত আকারে থাকে ততক্ষণ সেটাকে অত্যন্ত বিপুল এবং নূতন মনে হয়, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলেই তাহা দুটো কথায় শেষ হইয়া যায় এবং তাহার নূতনত্বের উজ্জ্বলতাও দেখিতে পাওয়া যায় না— যেমন স্বপ্নে অনেক ব্যাপারকে অপরিসীম বিস্ময়জনক এবং বৃহৎ মনে হয়, কিন্তু জাগরণমাত্রেই তাহা তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে— তেমনি পরের শিক্ষাকে যতক্ষণ নিজের ডাঙায় না টানিয়া তোলা যায় ততক্ষণ আমরা বুঝিতেই পারি না বাস্তবিক কতখানি আমরা পাইয়াছি। আমাদের অধিকাংশ বিদ্যাই বঁড়শিগাঁথা মাছের মতো ইংরাজি ভাষার সুগভীর সরোবরের মধ্যে খেলাইয়া বেড়াইতেছে, আন্দাজে তাহার গুরুত্ব নির্ণয় করিয়া খুব পুলকিত গর্বিত হইয়া উঠিয়াছি। যদি বঙ্গভাষার কূলে একবার টানিয়া তুলিতে পারিতাম তাহা হইলে সম্ভবত নিজের বিদ্যাটাকে তত বেশি বড়ো না দেখাইতেও পারিত ; নাই দেখাক, তবু সেটা ভোগে লাগিত এবং আয়তনে ছোটো হইলেও আমাদের কল্যাণরূপিণী গৃহলক্ষ্মীর স্বহস্তকৃত রন্ধনে, অমিশ্র অনুরাগ এবং বিশুদ্ধ সর্ষপতৈল-সহযোগে পরম উপাদেয় হইতে পারিত।

বাইবেলে কথিত আছে, যাহার নিজের কিছু আছে তাহাকেই দেওয়া হইয়া থাকে। যে লোক একেবারে রিক্ত তাহার পক্ষে কিছু গ্রহণ করা বড়ো কঠিন। জলাশয়েই বৃষ্টির জল বাধিয়া থাকে, শুষ্ক মরুভূমে তাহা দাঁড়াইবে কোথায় ? আমরা নূতন বিদ্যাকে গ্রহণ করিব, সঞ্চিত করিব কোনখানে ? যদি নিজের শুষ্ক স্বার্থ এবং ক্ষণিক আবশ্যক ও ভোগের মধ্যে সে প্রতিক্ষণে শোষিত হইয়া যায় তবে সে শিক্ষা কেমন করিয়া ক্রমশ স্থায়িত্ব ও গভীরতা লাভ করিবে— সরস্বতীর সৌন্দর্যশতদলে প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে— আপনার তটভূমিকে স্নিগ্ধ শ্যামল, আকাশকে প্রতিফলিত, বহুকাল ও বহুলোককে আনন্দে ও নির্মলতায় অভিষিক্ত করিয়া তুলিবে ?

বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে আরো একটি কথা বলিবার আছে। আলোচনা ব্যতীত কোনো শিক্ষা সজীবভাবে আপনার হয় না। নানা মানবমনের মধ্য দিয়া গড়াইয়া না আসিলে একটা শিক্ষার বিষয় মানবসাধারণের যথার্থ ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠে না। যে দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে সে দেশে বিজ্ঞান অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে ভাষায় ভাবে সর্বত্র সংলিপ্ত হইয়া গেছে। সে দেশে বিজ্ঞান একটা অপরিচিত শুষ্ক জ্ঞান নহে, তাহা মানবমনের সহিত মানবজীবনের সহিত সজীবভাবে নানা আকারে মিশ্রিত হইয়া আছে। এইজন্য সে দেশে অতি সহজেই বিজ্ঞানের অনুরাগ অকৃত্রিম হয়, বিজ্ঞানের ধারণা গভীরতর হইয়া থাকে। নানা মনের মধ্যে অবিশ্রাম সঞ্চারিত হইয়া সেখানে বিজ্ঞান প্রাণ পাইয়া উঠে। যে দেশে সাহিত্যচর্চা প্রাচীন ও পরিব্যাপ্ত সে দেশে সাহিত্য কেবল গুটিকতক লোকের শখের মধ্যে বদ্ধ নহে। তাহা সমাজের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত প্রবাহিত, তাহা দিনে নিশীথে মনুষ্যজীবনের সহিত নানা আকারে মিশ্রিত হইয়াছে এইজন্য সাহিত্যানুরাগ সেখানে সহজ, সাহিত্যবোধ স্বাভাবিক। আমাদের দেশে বিদ্বান লোকদের মধ্যে বিদ্যার আলোচনা যথেষ্ট নাই এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকালের পূর্বে অতি যৎসামান্যই ছিল।

কারণ, দেশীয় সাহিত্যের সম্যক বিস্তার-অভাবে অনেকের মধ্যে কোনো বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব, এবং আলোচনা অভাবে বিদ্বান ব্যক্তিগণ চতুর্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল নিজের মধ্যেই বদ্ধ। তাঁহাদের জ্ঞানবৃক্ষ চারি দিকের মানবমন হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জীবনরস আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না।

আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে হাস্যলেশহীন একটা সুগভীর নিরানন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত অভাব তাহার অন্যতম কারণ। কী করিয়া কালযাপন করিতে হইবে আমরা ভাবিয়া পাই না। আমরা সকালবেলায় চুপ করিয়া দ্বারের কাছে বসিয়া তামাক খাই, দ্বিপ্রহরে আপিসে যাই, সন্ধ্যাবেলায়

ফিরিয়া আসিয়া তাস খেলি। সমাজের মধ্যে এমন একটা সর্বব্যাপী প্রবাহ নাই যাহাতে আমাদিগকে ভাসাইয়া রাখে, যাহাতে আমাদিগকে একসঙ্গে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। আমরা যে যার আপন আপন ঘরে উঠিতেছি বসিতেছি গড়াইতেছি এবং যথাকালে, অধিকাংশতই অকালে, মরিতেছি। ইহার প্রধান কারণ, আমরা বিচ্ছিন্ন। আমাদের শিক্ষার সহিত সমাজের, আদর্শের সহিত চরিত্রের, ভাবের সহিত কার্যের, আপনার সহিত চতুর্দিকের সর্বাঙ্গীণ মিশ খায় নাই। আমরা বীরত্বের ইতিহাস জানি কিন্তু বীর্য কাহাকে বলে জানি না, আমরা সৌন্দর্যের সমালোচনা অনেক পড়িয়াছি কিন্তু চতুর্দিকে সৌন্দর্য রচনা করিবার কোনো ক্ষমতা নাই ; আমরা অনেক ভাব অনুভব করিতেছি কিন্তু অনেকের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিব এমন লোক পাইতেছি না। এই-সকল মনোরুদ্ধ ভাব ক্রমশ বিকৃত ও অস্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহা ক্রমে অলীক আকার ধারণ করে। অন্য দেশে যাহা একান্ত সত্য আমাদের দেশে তাহা অন্তঃসারশূন্য হাস্যকর আতিশয্যে পরিণত হইয়া উঠে।

হিমালয়ের মাথার উপর যদি উত্তরোত্তর কেবলই বরফ জমিতে থাকিত তবে ক্রমে তাহা অতি বিপর্যয় অদ্ভুত এবং পতনোন্মুখ উচ্চতা লাভ করিত এবং তাহা ন দেবায় ন ধর্মায় হইত। কিন্তু সেই বরফ নির্ঝররূপে গলিয়া প্রবাহিত হইলে হিমালয়েরও অনাবশ্যক ভার লাঘব হয় এবং সেই সজীব ধারায় সুদূরপ্রসারিত তৃষাতুর ভূমি সরস শস্যশালী হইয়া উঠে। ইংরাজি বিদ্যা যতক্ষণ বদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহা সেই জড় নিশ্চল বরফ-ভারের মতো ; দেশীয় সাহিত্যযোগে তাহা বিগলিত প্রবাহিত হইলে তবে সেই বিদ্যারও সার্থকতা হয়, বাঙালির ছেলের মাথারও ঠিক থাকে এবং স্বদেশের তৃষ্ণাও নিবারিত হয়। অবরুদ্ধ ভাবগুলি অনেকের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়া তাহার আতিশয্যবিকার দূর হইতে থাকে। যে-সকল ইংরাজি ভাব যথার্থরূপে আমাদের দেশের লোক গ্রহণ করিতে পারে, অর্থাৎ যাহা বিশেষরূপে ইংরাজি নহে, যাহা সার্বভৌমিক, তাহাই থাকিয়া যায় এবং বাকি সমস্ত নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের মধ্যে একটা মানসিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়, সাধারণের মধ্যে একটা আদর্শের এবং আনন্দের ঐক্য জাগিয়া উঠে, বিদ্যার পরীক্ষা হয়, ভাবের আদানপ্রদান চলে ; ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে যাহা শেখে বাড়িতে আসিয়া তাহার অনুবৃত্তি দেখিতে পায় এবং বয়স্কসমাজে প্রবেশ করিবার সময় বিদ্যাভারকে বিদ্যালয়ের বহির্দ্বারে ফেলিয়া আসা আবশ্যক হয় না। এই-যে স্কুলের সহিত গৃহের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, ছাত্রবয়সের সহিত কর্মকালের সম্পূর্ণ ব্যবধান, নিজের সহিত আত্মীয়ের সম্পূর্ণ ভিন্ন শিক্ষা, এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা দূর হইয়া যায় ; দেশীয় সাহিত্যের সংযোজনী-শক্তি-প্রভাবে বাঙালি আপনার মধ্যে আপনি ঐক্যলাভ করে— তাহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হইতে পারে, তাহার জীবনও সফলতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এখনো আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা বাঙালি ছাত্রদিগকে অধিকতর পরিমাণে বাংলা শিখাইবার আবশ্যকতা অনুভব করেন না, এমন-কি সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। যদি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায় যে আমরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই দেশের ভাষায় আমাদের নবলব্ধ জ্ঞান বিস্তার করিবার, আমাদের নবজাত ভাব প্রকাশ করিবার, ক্ষমতা ন্যূনাধিক পরিমাণে আমাদের সকলেরই আয়ত্ত থাকা উচিত কি না, তাঁহারা উত্তর দেন 'উচিত' ; কিন্তু তাঁহাদের মতে, সেজন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হইবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহারা বলেন, ইচ্ছা করিলেই বাঙালির ছেলেমাত্রই বাংলা শিখিতে ও লিখিতে পারে।

কিন্তু ইচ্ছা জন্মিবে কেন ? সকলেই জানেন, পরিচয়ের পর যে-সকল বিষয়ের প্রতি আমাদের পরম অনুরাগ জন্মিয়া থাকে পরিচয় হইবার পূর্বে তাহাদের প্রতি অনেক সময় আমাদের বৈমুখভাব অসম্ভব নহে। অনুরাগ জন্মিবার একটা অবসর দেওয়াও কর্তব্য এবং পূর্ব হইতে পথকে কিয়ৎপরিমাণেও সুগম করিয়া রাখিলে কর্তব্যবুদ্ধি সহজেই তদভিমুখে ধাবিত হইতে পারে। সম্মুখে একেবারে অনভ্যস্ত পথ দেখিলে কর্তব্য-ইচ্ছা স্বভাবতই উদ্‌বোধিত হইতে চাহে না।

কিন্তু বৃথা এ-সকল যুক্তি প্রয়োগ করা। আমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক আছেন বাংলার প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ রুচি এবং শ্রদ্ধা নাই ; তাঁহাদিগকে যেমন করিয়া যে দিকে ফিরানো যায় তাঁহাদের

কম্পাসের কাঁটা ইংরাজির দিকে ঘুরিয়া বসে। তাঁহারা অনেকে ইংরাজি আহার ও পরিচ্ছদকে বিজাতীয় বলিয়া ঘৃণা করেন ; তাঁহারা আমাদের জাতির বাহ্যশরীরকে বিলাতী অশনবসনের সহিত সংসক্ত দেখিতে চাহেন না ; কিন্তু সমস্ত জাতির মনঃশরীরকে বিদেশীয় ভাষার পরিচ্ছদে মণ্ডিত এবং বিজাতীয় সাহিত্যের আহার্যে পরিবর্ধিত দেখিতে তাঁহাদের আক্ষেপ বোধ হয় না। শরীরের সহিত বস্ত্র তেমন করিয়া সংলিপ্ত হয় না মনের সহিত ভাষা যেমন করিয়া জড়িত হইয়া যায়। যাঁহারা আপন সন্তানকে তাহার মাতৃভাষা শিখিবার অবসর দেন না, যাঁহারা পরমাত্মীয়দিগকেও ইংরাজি ভাষায় পত্র লিখিতে লজ্জা বোধ করেন না, যাঁহারা 'পদ্মবনে মত্তকরীসম' বাংলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন অথচ ভ্রমক্রমে ইংরাজির ফোঁটা অথবা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলেন, যাঁহাদিগকে বাংলায় হস্তিমূর্খ বলিলে অবিচলিত থাকেন কিন্তু ইংরাজিতে ইগ্নোরেন্ট বলিলে মূর্ছাপ্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে এ কথা বুঝানো কঠিন যে, তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষার সন্তোষজনক পরিণাম নহেন।

কিন্তু ইংরাজি-অভিমানী মাতৃভাষাদ্বেষী বাঙালির ছেলেকে আমরা দোষ দিতে চাহি না। ইংরাজির প্রতি এই উৎকট পক্ষপাত স্বাভাবিক। কারণ, ইংরাজি ভাষাটা একে রাজার ঘরের মেয়ে, তাহাতে আবার তিনি আমাদের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার, তাঁহার আদর যে অত্যন্ত বেশি হইবে তাহাতে বিচিত্র নাই। তাঁহার যেমন রূপ তেমনি ঐশ্বর্য, আবার তাঁহার সম্পর্কে আমাদের রাজপুত্রদের ঘরেও আমরা কিঞ্চিৎ সম্মানের প্রত্যাশা রাখি। সকলেই অবগত আছেন ইঁহার প্রসাদে উক্ত যুবরাজদের প্রাসাদদ্বারপ্রান্তে আমরা কখনো কখনো স্থান পাইয়া থাকি, আবার কখনো কখনো কর্ণপীড়নও লাভ হয়— সেটাকে আমরা পরিহাসের স্বরূপ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি, কিন্তু চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া পড়ে।

আর, আমাদের হতভাগিনী প্রথম পক্ষটি, আমাদের দরিদ্র বাংলা ভাষা, পাকশালার কাজ করেন— সে কাজটি নিতান্ত সামান্য নহে, তেমন আবশ্যক কাজ আর আমাদের আছে কি না সন্দেহ, কিন্তু তাঁহাকে আমাদের আপনার বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করে। পাছে তাঁহার মলিন বসন লইয়া তিনি আমাদের ধনশালী নবকুটুম্বদের চক্ষে পড়েন এইজন্য তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখি ; প্রশ্ন করিলে বলি চিনি না।

সে দরিদ্র ঘরের মেয়ে। তাহার বাপের রাজত্ব নাই। সে সম্মান দিতে পারে না, সে কেবলমাত্র ভালোবাসা দিতে পারে। তাহাকে যে ভালোবাসে তাহার পদবৃদ্ধি হয় না, তাহার বেতনের আশা থাকে না, রাজদ্বারে তাহার কোনো পরিচয়-প্রতিপত্তি নাই। কেবল যে অনাথাকে সে ভালোবাসে সেই তাহাকে গোপনে ভালোবাসার পূর্ণ প্রতিদান দেয়। এবং সেই ভালোবাসার যথার্থ স্বাদ যে পাইয়াছে সে জানে যে, পদমানপ্রতিপত্তি এই প্রেমের নিকট তুচ্ছ।

রূপকথায় যেমন শুনা যায় এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ দেখিতেছি ; আমাদের ঘরের এই নূতন রানী সুয়ারানী নিষ্ফল, বন্ধ্যা। এতকাল এত যত্নে এত সম্মানে সে মহিষী হইয়া আছে, কিন্তু তাহার গর্ভে আমাদের একটি সন্তান জন্মিল না। তাহার দ্বারা আমাদের কোনো সজীব ভাব আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। একেবারে বন্ধ্যা যদি বা না হয় তাহাকে মৃতবৎসা বলিতে পারি, কারণ, প্রথম-প্রথম গোটাকতক কবিতা এবং সম্প্রতি অনেকগুলা প্রবন্ধ জন্মলাভ করিয়াছে— কিন্তু সংবাদপত্র শয্যাতেই তাহারা ভূমিষ্ঠ হয় এবং সংবাদপত্ররাশির মধ্যেই তাহাদের সমাধি।

আর, আমাদের দুয়ারানীর ঘরে আমাদের দেশের সাহিত্য, আমাদের দেশের ভাবী আশাভরসা, আমাদের হতভাগ্য দেশের একমাত্র স্থায়ী গৌরব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই শিশুটিকে আমরা বড়ো একটা আদর করি না ; ইহাকে প্রাঙ্গণের প্রান্তে উলঙ্গ ফেলিয়া রাখি এবং সমালোচনা করিবার সময় বলি, 'ছেলেটার শ্রী দেখো! ইহার না আছে বসন, না আছে ভূষণ ; ইহার সর্বাঙ্গেই ধুলা!' ভালো, তাই মানিলাম। ইহার বসন নাই, ভূষণ নাই, কিন্তু ইহার জীবন আছে। এ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। এ মানুষ হইবে এবং সকলকে মানুষ করিবে। আর, আমাদের ঐ সুয়ারানীর মৃত

সন্তানগুলিকে বসনে ভূষণে আচ্ছন্ন করিয়া যতই হাতে-হাতে কোলে-কোলে নাচাইয়া বেড়াই-না কেন, কিছুতেই উহাদের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে পারিব না।

আমরা যে-কয়েকটি লোক বঙ্গভাষার আহ্বানে একত্র আকৃষ্ট হইয়াছি, আপনাদের যথাসাধ্য শক্তিতে এই শিশু সাহিত্যটিকে মানুষ করিবার ভার লইয়াছি, আমরা যদি এই অভূষিত ধূলিমলিন শিশুটিকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অহংকার করি, ভরসা করি কেহ কিছু মনে করিবেন না। যাঁহারা রাজসভায় বসিতেছেন তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা প্রজাসভায় বসিতেছেন তাঁহাদের জয়জয়কার ; আমরা এই উপেক্ষিত অধীন দেশের প্রচলিত ভাষায় অন্তরের সুখদুঃখ বেদনা প্রকাশ করি, ঘরের কড়ি খরচ করিয়া তাহা ছাপাই এবং ঘরের কড়ি খরচ করিয়া কেহ তাহা কিনিতে চাহেন না— আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া কেবল একটুখানি অহংকার করিতে দিবেন। সেও বর্তমানের অহংকার নহে, ভবিষ্যতের অহংকার ; আমাদের নিজের অহংকার নহে, ভাবী বঙ্গ দেশের, সম্ভবত ভাবী ভারতবর্ষের অহংকার। তখন আমরাই বা কোথায় থাকিব আর এখনকার দিনের উড্ডীয়মান বড়ো বড়ো জয়পতাকাগুলিই বা কোথায় থাকিবে ! কিন্তু এই সাহিত্য তখন অঙ্গদ-কুণ্ডল-উষ্ণীষে ভূষিত হইয়া সমস্ত জাতির হৃদয়সিংহাসনে রাজমহিমায় বিরাজ করিবে এবং সেই ঐশ্বর্যের দিনে মাঝে মাঝে এই বাল্যসুহৃদ্‌দিগের নাম তাহার মনে পড়িবে, এই স্নেহের অহংকারটুকু আমাদের আছে।

আজ আমরা এ কথা বলিয়া অলীক গর্ব করিতে পারিব না যে, আমাদের অদ্যকার তরুণ বঙ্গসাহিত্য পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী বয়স্ক সাহিত্যসমাজে স্থান পাইবার অধিকারী হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের যশস্বিবৃন্দের সংখ্যা অত্যল্প, আজিও বঙ্গসাহিত্যের আদরণীয় গ্রন্থ গণনায় যৎসামান্য, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু স্বীকার করিয়াও তথাপি বঙ্গসাহিত্যকে ক্ষুদ্র মনে হয় না। সে কি কেবল অনুরাগের অন্ধ মোহ-বশত ? তাহা নহে। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি সময় আসিয়াছে যখন সে আপন ভাবী সম্ভাবনাকে আপনি সচেতনভাবে অনুভব করিতেছে। এইজন্য বর্তমান প্রত্যক্ষ ফল তুচ্ছ হইলেও সে আপনাকে অবহেলাযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। বসন্তের প্রথম অভ্যাগমে যখন বনভূমিতলে নবাঙ্কুর এবং তরুশাখায় নবকিশলয়ের প্রচুর উদ্‌গম অনারব্ধ আছে, যখন বনশ্রী আপন অপরিসীম পুষ্পৈশ্বর্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই, তখনো সে যেমন আপন অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে শিরায়-উপশিরায় এক নিগূঢ় জীবনরসসঞ্চার, এক বিপুল ভাবী মহিমা উপলব্ধি করিয়া আসন্ন যৌবনগর্বে সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠে— সেইরূপ আজ বঙ্গসাহিত্য আপন অন্তরের মধ্যে এক নূতন প্রাণশক্তি, এক বৃহৎ বিশ্বাসের পুলক অনুভব করিয়াছে ; সমস্ত বঙ্গহৃদয়ের সুখদুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষার আন্দোলন সে আপনার নাড়ীর মধ্যে উপলব্ধি করিতেছে ; সে জানিতে পারিয়াছে সমস্ত বাঙালির অন্তর-অন্তঃপুরের মধ্যে তাহার স্থান হইয়াছে ; এখন সে ভিখারিনীবেশে কেবল ক্ষমতাশালীর দ্বারে দাঁড়াইয়া নাই, তাহার আপন গৌরবের প্রাসাদে তাহার অক্ষুণ্ণ অধিকার প্রতিদিন বিস্তৃত এবং দৃঢ় হইতে চলিয়াছে। এখন হইতে সে শয়নে স্বপনে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সমস্ত বাঙালির—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

নববঙ্গসাহিত্য অদ্য প্রায় এক শত বৎসর হইল জন্মলাভ করিয়াছে ; আর এক শত বৎসর পরে যদি এই বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্-সভার শততম বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হয় তবে সেই উৎসবভায় যে সৌভাগ্যশালী বক্তা বঙ্গসাহিত্যের জয়গান করিতে দণ্ডায়মান হইবেন, তিনি আমাদের মতো প্রমাণরিক্তহস্তে কেবলমাত্র অন্তরের আশা এবং অনুরাগ, কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষার আবেগ লইয়া, কেবলমাত্র অপরিস্ফুট অনাগত গৌরবের সূচনার প্রতি লক্ষ করিয়া, অতিপ্রত্যুষের অকস্মাৎ-জাগ্রত একক বিহঙ্গের অনিশ্চিত মৃদু কাকলির স্বরে সুর বাঁধিবেন না। তিনি স্ফুটতর অরুণালোকে জাগ্রত

বঙ্গকাননে বিবিধ কণ্ঠের বিচিত্র কলগানের অধিনেতা হইয়া বর্তমানের উৎসাহে আনন্দধ্বনি উচ্ছ্রিত করিয়া তুলিবেন— এবং কোনোকালে যে অমানিশীথের একাধিপত্য ছিল এবং অদ্যকার আমরা যে প্রদোষের অন্ধকারে ক্লান্তি এবং শান্তি, আশা এবং নৈরাশ্যের দ্বিধার মধ্যে সকরুণ দুর্বল কণ্ঠের গীতগান সমাপ্ত করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলাম সে কথা কাহারও মনে থাকিবে না।

বৈশাখ ১৩০২

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দীনেশচন্দ্রবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পুস্তকখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া আমরা দ্বিতীয়বার আনন্দলাভ করিলাম।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এতবড়ো একটা ব্যাপার যে আছে তাহা আমরা জানিতাম না; তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয়স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম।

দ্বিতীয়বার পাঠে গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছি। এবারে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকারদের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত পরিচয়ে বা তুলনামূলক সমালোচনায় আমাদের মন আকর্ষণ করে নাই; আমরা দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্রশাখাপ্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাস-বনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।

যে-সকল গ্রন্থকে বাংলার ইতিহাস বলে তাহাও পড়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বাদশাহদের সহিত নবাবদের, নবাবদের সহিত বিদেশী বণিকদের ও বণিকদের সহিত দেশী ষড়যন্ত্রকারীদের কী খেলা চলিতেছিল তাহার অনেক সত্যমিথ্যা বিবরণ পাওয়া যায়। সে-সকল বিবরণ যদি কোনো দৈবঘটনায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় তবে বাংলাদেশকে চিনিবার পক্ষে অল্পই ব্যাঘাত ঘটে। বাংলাদেশের সহিত নবাবদের কী সম্বন্ধ ছিল তাহার বিবরণ বাংলাসাহিত্যের ইতস্তত যেটুকু পাওয়া যায় তাহাই পর্যাপ্ত; তাহার অতিরিক্ত যাহা পাঠ্যগ্রন্থে আলোচিত হয় তাহা ব্যক্তিগত কাহিনীমাত্র।

কিন্তু দীনেশবাবুর এই গ্রন্থে হুসেন-শা পরাগল-খাঁ ছুটি-খাঁ'র সহিত আমাদের যেটুকু পরিচয় হইয়াছে তাহাতে ইতিহাস আমাদের কাছে অনেকটা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমান ও হিন্দু যে কত কাছাকাছি ছিল, নানা উপদ্রব-উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে যে হৃদ্যতার পথ ছিল, ইহা এমন একটি কথা যাহা যথার্থই জ্ঞাতব্য, যাহা প্রকৃতপক্ষেই ঐতিহাসিক। ইহা দেশের কথা, ইহা লোকবিশেষের সংবাদবিশেষ নহে।

যেমন ভূস্তরপর্যায়ে ভূমিকম্প অগ্নি-উচ্ছ্বাস জলপ্লাবন তুষারসংহতি কালে কালে ভূমিগঠনের ইতিহাস নানা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে এবং বৈজ্ঞানিক সেই লিপি উদ্‌ঘাটন করিয়া বিচিত্র সৃজনশক্তির রহস্যলীলা বিস্ময়ের সহিত পাঠ করেন, তেমনি যে-সকল প্রলয়শক্তি ও সৃজনশক্তি অদৃশ্যভাবে সমাজকে পরিণতি দান করিয়া আসিয়াছে সাহিত্যের স্তরে স্তরে তাহাদের ইতিবৃত্ত আপনি মুদ্রিত হইয়া যায়। সেই নিগূঢ় ইতিহাসটি উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে প্রকৃতভাবে সজীবভাবে আমাদের দেশকে আমরা জানিতে পারি। রাজার দপ্তর ঘাঁটিয়া যে-সকল কীটজর্জর দলিল পাওয়া যায় তাহাতে অনেক সময়ে কেবলমাত্র কৌতূহল পরিতৃপ্ত ও অনেক সময়ে ভুল ইতিহাসের সৃষ্টি হইতে পারে; কারণ, তাহাকে তাহার যথাস্থান ও যথাসময় হইতে, তাহার চারিপাশ হইতে, বিচ্যুত আকারে যখন দেখি তখন কল্পনা ও প্রবৃত্তির বিশেষ ঝোঁকে তাহাকে অসত্যরূপে বড়ো বা অসত্যরূপে ছোটো করিয়া দেখিতে পারি।

বৌদ্ধযুগের পরবর্তী ভারতবর্ষই বর্তমান ভারতবর্ষ। সেই যুগের অন্তিম অবস্থায় যখন গৌড়ের রাজসিংহাসন ক্ষণে ক্ষণে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বের মধ্যে দোলায়মান হইতেছিল তখন প্রজাসাধারণের

মধ্যে সমাজ যে স্থিরভাবে ছিল, তাহা সম্ভব নহে। তখনকার সেই আধ্যাত্মিক অরাজকতার মধ্যে বাংলাদেশে যেন একটা দেবদেবীর লড়াই বাধিয়াছিল ; তখন সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম-সমেত এক দেবতার মন্দির আর-এক দেবতা অধিকার করিয়া পূজার্চনায় নানাপ্রকার মিশ্রণ উৎপন্ন করিতেছিল। তখন এক দেবতার বিগ্রহে আর-এক দেবতার সঞ্চার, এক সম্প্রদায়ের তীর্থে আর-এক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব, এমনি একটা বিপর্যয়ব্যাপার ঘটিতেছিল। ঠিক সেই সময়কার কথা সাহিত্যে আমরা স্পষ্ট করিয়া খুঁজিয়া পাই না।

ইহা দেখিতেছি, বৈদিক কালের দেবতন্ত্রে মহাদেবের আধিপত্য নাই। তাহার পরে দীর্ঘকালের ইতিহাসহীন নিস্তব্ধতা কাটিয়া গেলে দেখিতে পাই, ইন্দ্র ও বরুণ ছায়ার মতো অস্পষ্ট হইয়া গেছে এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দ্বন্দ্ব ও মিলন ঘটিতেছে। এই দৈবসংগ্রামে ব্রহ্মা সর্বপ্রথমেই পূজাগৃহ হইতে দূরে আশ্রয় লইলেন, বিষ্ণু নানা পরিবর্তনের মধ্যে নানা আকারে নিজের দাবি রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং মহেশ্বর এক সময়ে অধিকাংশ ভারত অধিকার করিয়া লইলেন।

এই-সকল দেবদ্বন্দ্বের মূল কোথায় তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। ভারতবর্ষের কটাহে আর্য অনার্য নানা জাতির সম্মিশ্রণ হইয়াছিল। এক-এক সময়ে এক-এক জাতি ফুটিয়া উঠিয়া আপন আপন দেবতাকে জয়ী করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনবরত বিপ্লবের সময় হিন্দুর প্রতিভা সমস্ত বিরোধবিপ্লবের মধ্যে আপনার ঐক্যসূত্র বিস্তার করিয়া নানা বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আর্য-অনার্যের সমন্বয়-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল।

কথাসরিৎসাগরে আছে, একদা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হিমাদ্রিপাদমূলে কঠোর তপস্যা সহকারে ধূর্জটির আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিব তুষ্ট হইয়া বর দিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা শিবকেই নিজের পুত্ররূপে লাভ করিবার প্রার্থনা করিলেন। এই অনুচিত আকাঙ্ক্ষার জন্য তিনি নিন্দিত ও লোকের নিকট অপূজ্য হইলেন। বিষ্ণু এই বর চাহিলেন, যেন আমি তোমারই সেবাপর হইতে পারি। শিব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে নিজের অর্ধাঙ্গ করিয়া লইলেন। সেই অর্ধাঙ্গই শিবের শক্তিরূপিণী পার্বতী।

এক-এক সময়ে এক-এক দেবতা বড়ো হইয়া অন্যান্য দেবতাকে কিরূপে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই গল্পেই তাহা বুঝা যায়। ব্রহ্মা, যিনি চারি বেদের চতুর্মুখ বিগ্রহস্বরূপ, তিনি বেদবিদ্রোহী বৌদ্ধযুগে অধঃকৃত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু, যিনি বেদে ব্রাহ্মণদের দেবতা ছিলেন, তিনিও একসময়ে হীনবল হইয়া এই শ্মশানচারী কপালমালী দিগম্বরের পশ্চাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শিবের যখন প্রথম অভ্যুত্থান হইয়াছিল তখন বৈদিক দেবতারা যে তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে স্থান দিতে চান নাই তাহা দক্ষযজ্ঞের বিবরণেই বুঝা যায়। বস্তুতই তখনকার অন্যান্য আর্যদেবতার সহিত এই বিলোচনের অত্যন্ত প্রভেদ। দক্ষের মুখে যে-সকল নিন্দা বসানো হইয়াছিল তখনকার আর্যমণ্ডলীর মুখে সে নিন্দা স্বাভাবিক। সমস্ত দেবমণ্ডলীর মধ্যে ভূতপ্রেতপিশাচের দ্বারা এই অদ্ভুত দেবতা-কর্তৃক দক্ষযজ্ঞধ্বংশ কেবল কাল্পনিক কথা নহে। ইহা একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের তুল্য। আর্যমণ্ডলীর যে বৈদিক যজ্ঞে প্রাচীন আর্যদেবতারা আহূত হইতেন সেই যজ্ঞে এই শ্মশানেশ্বরকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই এবং তাঁহাকে অনার্য অনাচারী বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছিল ; সেই কারণে তাঁহার সেবকদের সহিত আর্যদেবপূজকদের প্রচণ্ড বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে অনার্য ভূত প্রেত পিশাচের দ্বারা বৈদিক যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় এবং সেই শোণিতাক্ত অপবিত্র যজ্ঞবেদীর উপরে নবাগত দেবতার প্রাধান্য বলপূর্বক স্থাপিত হয়।

আর্যদেবসমাজে এই অদ্ভুতাচারী দেবতা বলপূর্বক প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু ইহাকে অনেক জবাবদিহি করিতে হইয়াছিল। কথাসরিৎসাগরেই আছে, একদা পার্বতী শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নরকপালে এবং শ্মশানে তোমার এমন প্রীতি কেন ?'

এ প্রশ্ন তখনকার আর্যমণ্ডলীর প্রশ্ন। আমাদের আর্যদেবতারা স্বর্গবাসী ; তাঁহারা বিকৃতিহীন, সুন্দর,

সম্পৎশালী। যে দেবতা স্বর্গবিহারী নহে, ভস্ম নৃমুণ্ড রুধিরাক্ত হস্তিচর্ম যাঁহার সাজ, তাঁহার নিকট হইতে কোনো কৈফিয়ত না লইয়া তাঁহাকে দেবসভায় স্থান দেওয়া যায় না।

মহেশ্বর উত্তর করিলেন, 'কল্পাবসানে যখন জগৎ জলময় ছিল তখন আমি উরু ভেদ করিয়া একবিন্দু রক্তপাত করি। সেই রক্ত হইতে অণ্ড জন্মে, সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তৎপরে আমি বিশ্বসৃজনের উদ্দেশে প্রকৃতিকে সৃজন করি। সেই প্রকৃতি-পুরুষ হইতে অন্যান্য প্রজাপতি ও সেই প্রজাপতিগণ হইতে অখিল প্রজার সৃষ্টি হয়। তখন, আমিই চরাচরের সৃজনকর্তা বলিয়া ব্রহ্মার মনে দর্প হইয়াছিল। সেই দর্প সহ্য করিতে না পারিয়া আমি ব্রহ্মার মুণ্ডচ্ছেদ করি— সেই অবধি আমার এই মহাব্রত, সেই অবধিই আমি কপালপাণি ও শ্মশানপ্রিয়।'

এই গল্পের দ্বারা এক দিকে ব্রহ্মার পূর্বতন প্রাধান্যচ্ছেদন ও ধূর্জটির আর্যরীতি-বহির্ভূত অদ্ভুত আচারেরও ব্যাখ্যা হইল। এই মুণ্ডমালী প্রেতেশ্বর ভীষণ দেবতা আর্যদের হাতে পড়িয়া ক্রমে কিরূপ পরমশান্ত যোগরত মঙ্গলমূর্তি ধারণ করিয়া বৈরাগ্যবানের ধ্যানের সামগ্রী হইয়াছিলেন তাহা কাহারও অগোচর নাই। কিন্তু তাহাও ক্রমশ হইয়াছিল। অধুনাতন কালে দেবী চণ্ডীর মধ্যে যে ভীষণচঞ্চল ভাবের আরোপ করা হইয়াছে এক সময়ে তাহা প্রধানত শিবের ছিল। শিবের এই ভীষণত্ব কালক্রমে চণ্ডীর মধ্যে বিভক্ত হইয়া শিব একান্ত শান্তনিশ্চল যোগীর ভাব প্রাপ্ত হইলেন।

কিন্নরজাতিসেবিত হিমাদ্রি লঙ্ঘন করিয়া কোন্ শুভ্রকায় রজতগিরিনিভ প্রবল জাতি এই দেবতাকে বহন করিয়া আনিয়াছে, অথবা ইনি লিঙ্গপূজক দ্রাবিড়গণের দেবতা, অথবা ক্রমে উভয় দেবতায় মিশ্রিত হইয়া ও আর্য উপাসকগণকর্তৃক সংস্কৃত হইয়া এই দেবতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় আর্যদেবতত্ত্বের ইতিহাসে আলোচ্য। সে ইতিহাস এখনো লিখিত হয় নাই। আশা করি, তাহার অন্য ভাষা হইতে অনুবাদের অপেক্ষায় আমরা বসিয়া নাই।

কখনো সাংখ্যের ভাবে, কখনো বেদান্তের ভাবে, কখনো মিশ্রিত ভাবে, এই শিবশক্তি কখনো বা জড়িত হইয়া কখনো বা স্বতন্ত্র হইয়া ভারতবর্ষে আবর্তিত হইতেছিলেন। এই রূপান্তরের কালনির্ণয় দুরূহ। ইহার বীজ কখনো ছড়ানো হইয়াছিল এবং কোন্ বীজ কখন অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সন্ধান করিতে হইবে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই-সকল পরিবর্তনের মধ্যে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বিপুল ভারতসমাজ-গঠনে নানাজাতীয় স্তর যে মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা নিয়তই আমাদের ধর্মপ্রণালীর নানা বিসদৃশ ব্যাপারের বিরোধ ও সমন্বয়চেষ্টায় স্পষ্টই বুঝা যায়। ইহাও বুঝা যায়, অনার্যগণ মাঝে মাঝে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং আর্যগণ তাহাদের অনেক আচারব্যবহার-পূজাপদ্ধতির দ্বারা অভিভূত হইয়াও আপন প্রতিভাবলে সে-সমস্তকে দার্শনিক ইন্দ্রজালদ্বারা আর্য আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া লইতেছিলেন। সেইজন্য আমাদের প্রত্যেক দেবদেবীর কাহিনীতে এত বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা, একই পদার্থের মধ্যে এত বিরুদ্ধ ভাবের ও মতের সমাবেশ।

এক কালে ভারতবর্ষে প্রবলতাপ্রাপ্ত অনার্যদের সহিত ব্রাহ্মণপ্রধান আর্যদের দেবদেবী ক্রিয়াকর্ম লইয়া এই-যে বিরোধ বাধিয়াছিল সেই বহুকালব্যাপী বিপ্লবের মৃদুতর আন্দোলন সেদিন পর্যন্ত বাংলাকেও আঘাত করিতেছিল, দীনেশবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পড়িলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য পড়িলে দেখিতে পাই, শিব যখন ভারতবর্ষের মহেশ্বর তখন কালিকা অন্যান্য মাতৃকাগণের পশ্চাতে মহাদেবের অনুচরীবৃত্তি করিয়াছিলেন। ক্রমে কখন তিনি করালমূর্তি ধারণ করিয়া শিবকেও অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইলেন তাহার ক্রমপরম্পরা নির্দেশ করার স্থান ইহা নহে, ক্ষমতাও আমার নাই। কুমারসম্ভব কাব্যে বিবাহকালে শিব যখন হিমাদ্রিভবনে চলিয়াছিলেন তখন তাঁহার পশ্চাতে মাতৃকাগণ এবং—

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং
কালী কপালাভরণা চকাশে।

তাঁহাদেরও পশ্চাতে কপালভূষণা কালী প্রকাশ পাইতেছিলেন। এই কালীর সহিত মহাদেবের কোনো ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় নাই।

মেঘদূতে গোপবেশী বিষ্ণুর কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু মেঘের ভ্রমণকালে কোনো মন্দির উপলক্ষ করিয়া বা উপমাচ্ছলে কালিকাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্পষ্টই দেখা যায়, তৎকালে ভদ্রসমাজের দেবতা ছিলেন মহেশ্বর। মালতীমাধবেরও করালাদেবীর পূজোপচারে যে নৃশংস বীভৎসতা দেখা যায় তাহা কখনোই আর্যসমাজের ভদ্রমণ্ডলীর অনুমোদিত ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি না।

এক সময়ে এই দেবীপূজা যে ভদ্রসমাজের বহির্ভূত ছিল, তাহা কাদম্বরীতে দেখা যায়। মহাশ্বেতাকে শিবমন্দিরেই দেখি; কিন্তু কবি ঘৃণার সহিত অনার্য শবরের পূজা-পদ্ধতির যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, পশুরুধিরের দ্বারা দেবতার্চন ও মাংসদ্বারা বলিকর্ম তখন ভদ্রমণ্ডলীর কাছে নিন্দিত ছিল। কিন্তু সেই ভদ্রমণ্ডলীও পরাস্ত হইয়াছিলেন। সেই সামাজিক মহোৎপাতের দিনে নীচের জিনিস উপরে এবং উপরের জিনিস নীচে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

বঙ্গসাহিত্যের আরম্ভস্তরে সেই-সকল উৎপাতের চিহ্ন লিখিত আছে। দীনেশবাবু অদ্ভুত পরিশ্রমে ও প্রতিভায় এই সাহিত্যের স্তরগুলি যথাক্রমে বিন্যাস করিয়া বঙ্গসমাজের নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন।

তিনি যে ধর্মকলহব্যাপারের সম্মুখে আমাদিগকে দণ্ডায়মান করিয়াছেন সেখানে বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের দেবতা শিবের বড়ো দুর্গতি। তাঁহার এতকালের প্রাধান্য 'মেয়ে দেবতা' কাড়িয়া লইবার জন্য রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শিবকে পরাস্ত হইতে হইল।

স্পষ্টই দেখা যায়, এই কলহ বিশিষ্ট দলের সহিত ইতরসাধারণের কলহ। উপেক্ষিত সাধারণ যেন তাহাদের প্রচণ্ডশক্তি মাতৃদেবতার আশ্রয় লইয়া ভদ্রসমাজে শান্তসমাহিতনিশ্চেষ্ট বৈদান্তিক যোগীশ্বরকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

এক সময়ে বেদ তাহার দেবতাগণকে লইয়া ভারতবর্ষের চিত্তক্ষেত্র হইতে দূরে গিয়াছিল বটে, কিন্তু বেদান্ত এই স্থাণুকে ধ্যানের আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া জ্ঞানী গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু এই জ্ঞানীর দেবতা অজ্ঞানীদিগকে আনন্দদান করিত না, জ্ঞানীরাও অজ্ঞানীদিগকে অবজ্ঞাভরে আপন অধিকার হইতে দূরে রাখিতেন। ধন এবং দারিদ্র্যের মধ্যেই হউক, উচ্চপদ ও হীনপদের মধ্যেই হউক, বা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যেই হউক, যেখানে এতবড়ো একটা বিচ্ছেদ ঘটে সেখানে ঝড় না আসিয়া থাকিতে পারে না। গুরুতর পার্থক্যমাত্রই ঝড়ের কারণ।

আর্য-অনার্য যখন মেশে নাই তখনো ঝড় উঠিয়াছিল, আবার ভদ্র-অভদ্র-মণ্ডলীতে জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদ যখন অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল তখনো ঝড় উঠিয়াছে।

শঙ্করাচার্যের ছাত্রগণ যখন বিদ্যাকেই প্রধান করিয়া তুলিয়া জগৎকে মিথ্যা ও কর্মকে বন্ধন বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছিলেন তখন সাধারণে মায়াকেই, শান্তস্বরূপের শক্তিকেই, মহামায়া বলিয়া শক্তীশ্বরের ঊর্ধ্বে দাঁড় করাইবার জন্য খেপিয়া উঠিয়াছিল। মায়াকে মায়াধিপতির চেয়ে বড়ো বলিয়া ঘোষণা করা, এই এক বিদ্রোহ।

ভারতবর্ষে এই বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত কবে হইয়াছিল বলা যায় না, কিন্তু এই বিদ্রোহ দেখিতে দেখিতে সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। কারণ, ব্রহ্মের সহিত জগৎকে ও আত্মাকে প্রেমের সম্বন্ধে যোগ করিয়া না দেখিলে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হয় না। তাঁহার সহিত জগতের সম্বন্ধ স্বীকার না করিলেই জগৎ মিথ্যা, সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই জগৎ সত্য। যেখানে ব্রহ্মের শক্তি বিরাজমান সেইখানেই ভক্তের অধিকার, যেখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সেখানে ভক্তির মাৎসর্য উপস্থিত হয়। ব্রহ্মের শক্তিকে ব্রহ্মের চেয়ে বড়ো বলা শক্তির মাৎসর্য, কিন্তু তাহা ভক্তি। ভক্তির পরিচয়কে একেবারেই অসত্য বলিয়া গণ্য করাতে ও তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ হইবার চেষ্টা করাতেই ক্ষুব্ধ ভক্তি যেন আপনার তীর লঙ্ঘন করিয়া উদ্‌বেল হইয়াছিল।

এইরূপ বিদ্রোহ-কালে শক্তিকে উৎকটরূপে প্রকাশ করিতে গেলে প্রথমে তাহার প্রবলতা, তাহার ভীষ্মতাই জাগাইয়া তুলিতে হয়। তাহা ভয় হইতে রক্ষা করিবার সময় মাতা ও ভয় জন্মাইবার সময় চণ্ডী। তাহার ইচ্ছা কোনো বিধিবিধানের দ্বারা নিয়মিত নহে, তাহা বাধাবিহীন লীলা ; কখন কী করে, কেন কী রূপ ধরে, তাহা বুঝিবার জো নাই, এইজন্য তাহা ভয়ংকর।

নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ডতার ঝড়। নারী যেমন স্বামীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের স্বাদবিহীন মৃদুতা অপেক্ষা প্রবল শাসন ভালোবাসে, বিদ্রোহী ভক্ত সেইরূপ নির্‌গুণ নিষ্ক্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছাময়ী শক্তিকে ভীষণতার মধ্যে সর্বান্তঃকরণে অনুভব করিতে ইচ্ছা করিল।

শিব আর্যসমাজে ভিড়িয়া যে ভীষণতা যে শক্তির চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিলেন নিম্নসমাজে তাহা নষ্ট হইতে দিল না। যোগানন্দের শান্ত ভাবকে তাহারা উচ্চশ্রেণীর জন্য রাখিয়া ভক্তির প্রবল উত্তেজনার আশায় শক্তির উগ্রতাকেই নাচাইয়া তুলিল। তাহারা শক্তিকে শিব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া বিশেষভাবে শক্তির পূজা খাড়া করিয়া তুলিল।

কিন্তু কী আধ্যাত্মিক, কী আধিভৌতিক, ঝড় কখনোই চিরদিন থাকিতে পারে না। ভক্তহৃদয় এই চণ্ডীশক্তিকে মাধুর্যে পরিণত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম আশ্রয় করিল। প্রেম সকল শক্তির পরিণাম ; তাহা চূড়ান্ত শক্তি বলিয়াই তাহার শক্তিরূপ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ভক্তির পথ কখনোই প্রচণ্ডতার মধ্যে গিয়া থামিতে পারে না ; প্রেমের আনন্দেই তাহার অবসান হইতে হইবে। বস্তুত মাঝখানে শিবের ও শক্তির যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের মধ্যে সেই শিব-শক্তির কতকটা সম্মিলনচেষ্টা দেখা যাইতেছে। মায়াকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিলে তাহা ভয়ংকরী, ব্রহ্মকে মায়া হইতে স্বতন্ত্র করিলে ব্রহ্ম অনধিগম্য— ব্রহ্মের সহিত মায়াকে সম্মিলিত করিয়া দেখিলেই প্রেমের পরিতৃপ্তি।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এই পরিবর্তনপরম্পরার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগ ও শিবপূজার কালে বঙ্গসাহিত্যের কী অবস্থা ছিল তাহা দীনেশবাবু খুঁজিয়া পান নাই। 'ধান ভানতে শিবের গীত' প্রবাদে বুঝা যায়, শিবের গীত এক সময়ে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে-সমস্তই সাহিত্য হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের যে-সকল চিহ্ন ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় সে-সকলও বৌদ্ধযুগের বহুপরবর্তী। আমাদের চক্ষে বঙ্গসাহিত্যমঞ্চের প্রথম যবনিকাটি যখন উঠিয়া গেল তখন দেখি সমাজে একটি কলহ বাধিয়াছে, সে দেবতার কলহ। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানির পঞ্চম অধ্যায়ে দীনেশবাবু প্রাচীন শিবের প্রতি চণ্ডী বিষহরি ও শীতলার আক্রমণব্যাপার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। এই-সকল স্থানীয় দেবদেবীরা জনসাধারণের কাছে বল পাইয়া কিরূপ দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে, দেবী চণ্ডী নিজের পূজাস্থাপনের জন্য অস্থির। যেমন করিয়া হউক, ছলে বলে কৌশলে মর্তে পূজা প্রচার করিতে হইবেই। ইহাতে বুঝা যায়, পূজা লইয়া একটা বাদবিবাদ আছে। তাহার পর দেখি, যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া দেবী পূজা প্রচার করিতে উদ্যত তাহারা উচ্চশ্রেণীর লোক নহে। যে নীচের তাহাকেই উপরে উঠাইবেন, ইহাতেই দেবীর শক্তির পরিচয়। নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এমন সান্ত্বনা এমন বলের কথা আর কী আছে! যে দরিদ্র দুইবেলা আহার জোটাইতে পারে না সেই শক্তির লীলায় সোনার ঘড়া পাইল ; যে ব্যাধ নীচজাতীয়, ভদ্রজনের অবজ্ঞাভাজন, সেই মহত্ত্বলাভ করিয়া কলিঙ্গরাজের কন্যাকে বিবাহ করিল। —ইহাই শক্তির লীলা।

তাহার পর দেখি, শিবের পূজাকে হতমান করিয়াই নিজের পূজা প্রচার করা দেবীর চেষ্টা। শিব তাঁহার স্বামী বটেন, কিন্তু তাহাতে কোনো সংকোচ নাই। শিবের সহিত শক্তির এই লড়াই। এই লড়াইয়ে পদে পদে দয়ামায়া বা ন্যায়-অন্যায় পর্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে।

কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ব্যাধের গল্পে দেখিতে পাই, শক্তির ইচ্ছায় নীচ উচ্চে উঠিয়াছে! কেন উঠিয়াছে তাহার কোনো কারণ নাই ; ব্যাধ যে ভক্ত ছিল, এমনও পরিচয় পাই না। বরঞ্চ সে দেবীর বাহন সিংহকে মারিয়া দেবীর ক্রোধভাজন হইতেও পারিত। কিন্তু দেবী নিতান্তই যথেচ্ছাক্রমে তাহাকে দয়া করিলেন। ইহাই শক্তির খেলা।

ব্যাধকে যেমন বিনা কারণে দেবী দয়া করিলেন, কলিঙ্গরাজকে তেমনি তিনি বিনা দোষে নিগ্রহ করিলেন। তাহার দেশ জলে ডুবাইয়া দিলেন। জগতে ঝড়-জলপ্লাবন-ভূমিকম্পে যে শক্তির প্রকাশ দেখি তাহার মধ্যে ধর্মনীতিসংগত কার্যকারণমালা দেখা যায় না এবং সংসারে সুখদুঃখ-বিপৎসম্পদের যে আবর্তন দেখিতে পাই তাহার মধ্যেও ধর্মনীতির সুসংগতি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। দেখিতেছি, যে শক্তি নির্বিচারে পালন করিতেছে সেই শক্তিই নির্বিচারে ধ্বংস করিতেছে। এই অহৈতুক পালনে এবং অহৈতুক বিনাশে সাধু-অসাধুর ভেদ নাই। এই দয়ামায়াহীন ধর্মাধর্মবিবর্জিত শক্তিকে বড়ো করিয়া দেখা তখনকার কালের পক্ষে বিশেষ স্বাভাবিক ছিল।

তখন নীচের লোকের আকস্মিক অভ্যুত্থান ও উপরের লোকের হঠাৎ পতন সর্বদাই দেখা যাইত। হীনাবস্থার লোক কোথা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া অরণ্য কাটিয়া নগর বানাইয়াছে এবং প্রতাপশালী রাজা হঠাৎ পরাস্ত হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে। তখনকার নবাব-বাদশাহদের ক্ষমতাও বিধিবিধানের অতীত ছিল; তাঁহাদের খেয়ালমাত্রে সমস্ত হইতে পারিত। ইঁহারা দয়া করিলেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নীচ মহৎ হইত, ভিক্ষুক রাজা হইত। ইঁহারা নির্দয় হইলে ধর্মের দোহাইও কাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। ইহাই শক্তি।

এই শক্তির প্রসন্ন মুখ মাতা, এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী। ইহারই 'প্রসাদোঽপি ভয়ংকরঃ'; সেইজন্য সর্বদাই করজোড়ে বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ ইনি যাহাকে প্রশ্রয় দেন ততক্ষণ তাহার সাত-খুন মাপ; যতক্ষণ সে প্রিয়পাত্র ততক্ষণ তাহার সংগত-অসংগত সকল আবদারই অনায়াসে পূর্ণ হয়।

এইরূপ শক্তি ভয়ংকরী হইলেও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কারণ, ইহার কাছে প্রত্যাশার কোনো সীমা নাই। আমি অন্যায় করিলেও জয়ী হইতে পারি, আমি অক্ষম হইলেও আমার দুরাশার চরমতম স্বপ্ন সফল হইতে পারে। যেখানে নিয়মের বন্ধন, ধর্মের বিধান আছে, সেখানে দেবতার কাছেও প্রত্যাশাকে খর্ব করিয়া রাখিতে হয়।

এই-সকল কারণে যে-সময় বাদশাহ ও নবাবের অপ্রতিহত ইচ্ছা জনসাধারণকে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল এবং ন্যায়-অন্যায় সম্ভব-অসম্ভবের ভেদচিহ্নকে ক্ষীণ করিয়া আনিয়াছিল, হর্ষশোক-বিপদসম্পদের অতীত শান্তসমাহিত বৈদান্তিক শিব সে-সময়কার সাধারণের দেবতা হইতে পারেন না। রাগ-দ্বেষ-প্রসাদ-অপ্রসাদের-লীলা-চঞ্চলা যদৃচ্ছাচারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের চরমাদর্শ। সেইজন্যই তখনকার লোক ঈশ্বরকে অপমান করিয়া বলিত: দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা!

কবিকঙ্কণে দেবী এই-যে ব্যাধের দ্বারা নিজের পূজা মর্তে প্রচার করিলেন, স্বয়ং ইন্দ্রের পুত্র যে ব্যাধরূপে মর্তে জন্মগ্রহণ করিল, বাংলাদেশের এই লোকপ্রচলিত কথার কি কোনো ঐতিহাসিক অর্থ নাই? পশুবলি প্রভৃতির দ্বারা যে ভীষণ পূজা এক কালে ব্যাধের মধ্যে প্রচলিত ছিল সেই পূজাই কি কালক্রমে উচ্চসমাজে প্রবেশলাভ করে নাই? কাদম্বরীতে বর্ণিত শবর-নামক ক্রূরকর্মা ব্যাধজাতির পূজাপদ্ধতিতেও ইহারই কি প্রমাণ দিতেছে না? উড়িষ্যাই কলিঙ্গদেশ। বৌদ্ধধর্মলোপের পর উড়িষ্যায় শৈবধর্মের প্রবল অভ্যুদয় হইয়াছিল, ভুবনেশ্বর তাহার প্রমাণ। কলিঙ্গের রাজারাও প্রবল রাজা ছিলেন। এই কলিঙ্গরাজত্বের প্রতি শৈবধর্মবিদ্বেষীদের আক্রোশ-প্রকাশ ইহার মধ্যেও দূর ইতিহাসের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়।

ধনপতির গল্পে দেখিতে পাই, উচ্চজাতীয় ভদ্রবৈশ্য শিবোপাসক। শুদ্ধমাত্র এই পাপে চণ্ডী তাঁহাকে নানা দুর্গতির দ্বারা পরাস্ত করিয়া আপন মাহাত্ম্য প্রমাণ করিলেন।

বস্তুত সাংসারিক সুখদুঃখ বিপৎসম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারি দিকে জাগিয়া উঠিয়াছে তখন যে দেবতা ইচ্ছাসংযমের আদর্শ তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয় আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ

সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকেরাই কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতিলাভ করিতেছিলেন ? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমারই প্রতি বিশেষ অকৃপা ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক, আমারই প্রতি বিশেষ দয়া ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়। কিন্তু যে দেবতা বলেন 'সুখদুঃখ দুর্গতিসদ্‌গতি— ও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ও দিকে দৃক্‌পাত করিয়ো না' সংসারে তাঁহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে। সংসার মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধনজনমান চায়। ধনপতির মতো ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না ; বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইতে হইল।

কিন্তু তখনকার নানাবিভীষিকাগ্রস্ত পরিবর্তনব্যাকুল দুর্গতির দিনে শক্তিপূজারূপে এই-যে প্রবলতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের মনুষ্যত্বকে চিরদিন পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না। যে ফলের মিষ্ট হইবার ক্ষমতা আছে সে প্রথম অবস্থার তীব্র অম্লত্ব পক্ক অবস্থায় পরিহার করে। যথার্থ ভক্তি সুতীব্র কঠিন শক্তিকে গোড়ায় যদি বা প্রাধান্য দেয়, শেষকালে তাহাকে উত্তরোত্তর মধুর কোমল ও বিচিত্র করিয়া আনে। বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারির গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে— মাতা পত্নী ও কন্যা রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গলসুন্দর রূপে— দরিদ্র বাঙালির ঘরে যে রসসঞ্চার করিয়াছেন চণ্ডীপূজার সেই পরিণাম-রমণীয়তার দৃশ্য দীনেশবাবু তাঁহার এই গ্রন্থে বঙ্গসাহিত্য হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ধার করিয়া দেখান নাই। কালিদাসের কুমারসম্ভব সাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেমকে মহীয়ান করিয়া এই মঙ্গলভাবটিকে মূর্তিমান করিয়াছিল। বাংলাসাহিত্যে এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিস্ফুটতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তথাপি বাঙালির দরিদ্রগৃহের মধ্যে এই মঙ্গলমাধুর্যসিক্ত দেবভাবের অবতারণা কবিকঙ্কণচণ্ডীতে কিয়ৎপরিমাণে আপনাকে অঙ্কিত করিয়াছে, অন্নদামঙ্গলও তাহার উপর রঙ ফলাইয়াছে। কিন্তু মাধুর্যের ভাব গীতি-কবিতার সম্পত্তি। চণ্ডীপূজা ক্রমে যখন ভক্তিতে স্নিগ্ধ ও রসে মধুর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন তাহা মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড গীতে উৎসারিত হইল। এই সকল বিজয়া-আগমনীর গীত ও গ্রাম্য খণ্ডকবিতাগুলি বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। বৈষ্ণবপদাবলীর ন্যায় এগুলি সংগৃহীত হয় নাই। ক্রমে ইহারা নষ্ট ও বিকৃত হইবে, এমন সম্ভাবনা আছে। এক সময়ে 'ভারতী'তে 'গ্রাম্য সাহিত্য'[১] -নামক প্রবন্ধে আমি এই কাব্যগুলির আলোচনা করিয়াছিলাম।

চণ্ডী যেমন প্রচণ্ড উপদ্রবে আপনার পূজা প্রতিষ্ঠা করেন মনসা-শীতলাও তেমনি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। শৈব চাঁদ-সদাগরের দুরবস্থা সকলেই জানেন। বিষহরি, দক্ষিণরায়, সত্যপীর প্রভৃতি আরো অনেক ছোটোখাটো দেবতা আপন আপন বিক্রম প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এমনি করিয়া সমাজের নিম্নস্তরগুলি প্রবল ভূমিকম্পে সমাজের উপরের স্তরে উঠিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিল দীনেশবাবুর গ্রন্থে পাঠকেরা তাহার বিবরণ পাইবেন— এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে।

কিন্তু দীনেশবাবুর সাহায্যে বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, সাহিত্যে বৈষ্ণবই জয়লাভ করিয়াছেন। শঙ্করের অভ্যুত্থানের পর শৈবধর্ম ক্রমশই অদ্বৈতবাদকে আশ্রয় করিতেছিল। বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়, জনসাধারণের ভক্তিব্যাকুল হৃদয়সমুদ্র হইতে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই দ্বৈতবাদের ঢেউ উঠিয়া সেই শৈবধর্মকে ভাঙিয়াছে। এই উভয় ধর্মেই ঈশ্বরকে বিভক্ত করিয়া দেখিয়াছে। শাক্তের বিভাগ গুরুতর। যে শক্তি ভীষণ, যাহা খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমাদিগকে দূরে রাখিয়া স্তব্ধ করিয়া দেয় ; সে আমার সমস্ত দাবি করে, তাহার উপর আমার কোনো দাবি নাই। শক্তিপূজায় নীচকে উচ্চে তুলিতে পারে, কিন্তু উচ্চ-নীচের ব্যবধান সমানই রাখিয়া দেয়,

১ সুলভ সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত

সক্ষম-অক্ষমের প্রভেদকে সুদৃঢ় করে। বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি ; সে শক্তি বলরূপিণী নহে, প্রেমরূপিণী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈতবিভাগ স্বীকার করে তাহা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ। তিনি বল ও ঐশ্বর্য বিস্তার করিবার জন্য শক্তিপ্রয়োগ করেন নাই ; তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে, এই বিভাগের মধ্যে তাঁহার আনন্দ নিয়ত মিলনরূপে প্রতিষ্ঠিত। শাক্তধর্মে অনুগ্রহের অনিশ্চিত সম্বন্ধ, ও বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ ; শক্তির লীলায় কে দয়া পায় কে না পায় তাহার ঠিকানা নাই ; কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে সেখানে সকলেরই নিত্য দাবি। শাক্তধর্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে ; বৈষ্ণবধর্মে এই ভেদকে নিত্যমিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

বৈষ্ণব এইরূপে ভেদের উপরে সাম্যস্থাপন করিয়া প্রেমপ্লাবনে সমাজের সকল অংশকে সমান করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা ছন্দ ভাব তুলনা উপমা ও আবেগের প্রবলতা, সমস্ত বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলংকারশাস্ত্রের পাষাণবন্ধনসকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সংগীত কোথা হইতে আহরণ করিল ? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনে নহে— দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জিত কালোয়াতি সংগীত থই পাইল না ; দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সংগীতপ্রণালী তৈরি করিল, আর-কোনো সংগীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত। মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন, এই মন্ত্র যেমনি উচ্চারিত হইল অমনি দেশের যত পাখি সুপ্ত হইয়া ছিল সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিল।

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে। সেই সময়ে এমন একটি গৌরব সে প্রাপ্ত হইয়াছিল যাহা অলোকসামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলাদেশের, যাহা এ দেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল। শাক্তযুগে তাহার দীনতা ঘোচে নাই, বরঞ্চ নানারূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল ; বৈষ্ণবযুগে অযাচিত-ঐশ্বর্য-লাভে সে আশ্চর্যরূপে চরিতার্থ হইয়াছে।

শাক্ত যে পূজা অবলম্বন করিয়াছিল তাহা তখনকার কালের অনুগামী। অর্থাৎ সমাজে তখন যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, যে শক্তির খেলা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছিল, যে-সকল আকস্মিক উত্থানপতন লোককে প্রবলবেগে চকিত করিয়া দিতেছিল, মনে মনে তাহাকেই দেবত্ব দিয়া শাক্তধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম এক ভাবের উচ্ছ্বাসে সাময়িক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। সাময়িক অবস্থার বন্ধন হইতে এক বৃহৎ আনন্দের মধ্যে সকলকে নিষ্কৃতিদান করিয়াছিল। শক্তি যখন সকলকে পেষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নীচকে দলন করিতেছিল, তখনই সে প্রেমের কথা বলিয়াছিল। তখনই সে ভগবানকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে আপনাদের খেলাঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল, এমন-কি, প্রেমের স্পর্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্যকে উপহাস করিয়াছিল। ইহাতে করিয়া যে ব্যক্তি তৃণাদপি নীচ সেও গৌরব লাভ করিল ; যে ভিক্ষার ঝুলি লইয়াছে সেও সম্মান পাইল ; যে স্লেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইল। তখন সাধারণের হৃদয় রাজার পীড়ন সমাজের শাসনের উপরে উঠিয়া গেল। বাহ্য অবস্থা সমানই রহিল, কিন্তু মন সেই অবস্থার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিখিলজগৎসভার মধ্যে স্থানলাভ করিল। প্রেমের অধিকারে, সৌন্দর্যের অধিকারে, ভগবানের অধিকারে, কাহারও কোনো বাধা রহিল না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই-যে ভাবোচ্ছ্বাস ইহা স্থায়ী হইল না কেন ? সমাজে ইহা বিকৃত ও সাহিত্য হইতে ইহা অন্তর্হিত হইল কেন ? ইহার কারণ এই যে, ভাবসৃজনের শক্তি প্রতিভার, কিন্তু ভাব রক্ষা

করিবার শক্তি চরিত্রের। বাংলাদেশে ক্ষণে ক্ষণে ভাববিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার পরিণাম দেখিতে পাই না। ভাব আমাদের কাছে সম্ভোগের সামগ্রী, তাহা কোনো কাজের সৃষ্টি করে না, এইজন্য বিকারেই তাহার অবসান হয়।

আমরা ভাব উপভোগ করিয়া অশ্রুজলে নিজেকে প্লাবিত করিয়াছি ; কিন্তু পৌরুষ-লাভ করি নাই, দৃঢ়নিষ্ঠা পাই নাই। আমরা শক্তিপূজায় নিজেকে শিশু কল্পনা করিয়া মা মা করিয়া আবদার করিয়াছি এবং বৈষ্ণবসাধনায় নিজেকে নায়িকা কল্পনা করিয়া মান-অভিমানে বিরহ-মিলনে ব্যাকুল হইয়াছি। শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে বীর্যের পথে লইয়া যায় নাই, প্রেমের পূজা আমাদের মনকে কর্মের পথে প্রেরণ করে নাই। আমরা ভাববিলাসী বলিয়াই আমাদের দেশে ভাবের বিকার ঘটিতে থাকে, এবং এইজন্যই চরিতকাব্য আমাদের দেশে পূর্ণ সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। এক দিকে দুর্গায় ও আর-এক দিকে রাধায় আমাদের সাহিত্যে নারীভাবই অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বেহুলা ও অন্যান্য নায়িকার চরিত্র-সমালোচনায় দীনেশবাবু তাহার আভাস দিয়াছেন। পৌরুষের অভাব ও ভাবরসের প্রাচুর্য বঙ্গসাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বঙ্গসাহিত্যে দুর্গা ও রাধাকে অবলম্বন করিয়া দুই ধারা দুই পথে গিয়াছে ; প্রথমটি গেছে বাংলার গৃহের মধ্যে, দ্বিতীয়টি গেছে বাংলার গৃহের বাহিরে। কিন্তু এই দুইটি ধারারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রমণী এবং এই দুইটিরই স্রোত ভাবের স্রোত।

যাহা হউক, বঙ্গসাহিত্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাবের সম্বন্ধে যে আলোচনা করা গেল তাহা হইতে সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা একটি সাধারণ তত্ত্ব লাভ করিতে পারি। সমাজের চিত্ত যখন নিজের বর্তমান অবস্থা-বন্ধনে বদ্ধ থাকে এবং সমাজের চিত্ত যখন ভাবপ্রাবল্যে নিজের অবস্থার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, এই দুই অবস্থার সাহিত্যের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক।

সমাজ যখন নিজের চতুর্দিগ্‌বর্তী বেষ্টনের মধ্যে, নিজের বর্তমান অবস্থার মধ্যেই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ থাকে, তখনো সে বসিয়া বসিয়া আপনার সেই অবস্থাকে কল্পনার দ্বারা দেবত্ব দিয়া মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে। সে যেন কারাগারের ভিত্তিতে ছবি আঁকিয়া কারাগারকে প্রাসাদের মতো সাজাইতে চেষ্টা পায়। সেই চেষ্টার মধ্যে মানবচিত্তের যে বেদনা যে ব্যাকুলতা আছে তাহা বড়ো সকরুণ। সাহিত্যে সেই চেষ্টার বেদনা ও করুণা আমরা শাক্তযুগের মঙ্গলকাব্যে দেখিয়াছি। তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-উৎপীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায় যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ-অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতেছিল এবং দুঃখক্লেশকে ভাঙাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু সমাজ যখন পরিব্যাপ্ত ভাবাবেগে নিজের অবস্থাবন্ধনকে লঙ্ঘন করিয়া আনন্দে ও আশায় উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে তখনই সে হাতের কাছে যে তুচ্ছ ভাষা পায় তাহাকেই অপরূপ করিয়া তোলে, যে সামান্য উপকরণ পায় তাহার দ্বারাই ইন্দ্রজাল ঘটাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় যে কী হইতে পারে ও না পারে তাহা পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে কেহ অনুমান করিতে পারে না।

একটি নূতন আশার যুগ চাই। সেই আশার যুগে মানুষ নিজের সীমা দেখিতে পায় না, সমস্তই সম্ভব বলিয়া বোধ করে। সমস্তই সম্ভব বলিয়া বোধ করিবামাত্র যে বল পাওয়া যায় তাহাতেই অনেক অসাধ্য সাধ্য হয় এবং যাহার যতটা শক্তি আছে তাহা পূর্ণমাত্রায় কাজ করে।

শ্রাবণ ১৩০৯

ঐতিহাসিক উপন্যাস

মানবসমাজের সে বাল্যকাল কোথায় গেল যখন প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, ঘটনা এবং কল্পনা, কয়টি ভাইবোনের মতো একান্নে এবং একত্রে খেলা করিতে করিতে মানুষ হইয়াছিল ? আজ তাহাদের মধ্যে যে এতবড়ো একটা গৃহবিচ্ছেদ ঘটিবে তাহা কখনো কেহ স্বপ্নেও জানিত না।

এক সময়ে রামায়ণ-মহাভারত ছিল ইতিহাস। এখনকার ইতিহাস তাহার সহিত কুটুম্বিতা স্বীকার করিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয় ; বলে, কাব্যের সহিত পরিণীত হইয়া উহার কুল নষ্ট হইয়াছে। এখন তাহার কুল উদ্ধার করা এতই কঠিন হইয়াছে যে, ইতিহাস তাহাকে কাব্য বলিয়াই পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে। কাব্য বলে, ভাই ইতিহাস, তোমার মধ্যে অনেক মিথ্যা আছে, আমার মধ্যেও অনেক সত্য আছে ; এসো আমরা পূর্বের মতো আপস করিয়া থাকি। ইতিহাস বলে, না ভাই, পরস্পরের অংশ বাঁটোয়ারা করিয়া বুঝিয়া লওয়া ভালো। জ্ঞান নামক আমিন সর্বত্রই সেই বাঁটোয়ারাকার্য আরম্ভ করিয়াছে। সত্যরাজ্য এবং কল্পনারাজ্যের মধ্যে একটা পরিষ্কার রেখা টানিবার জন্য সে বদ্ধপরিকর।

ইতিহাসের ব্যতিক্রম করা অপরাধে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে নালিশ উত্থাপিত হইয়াছে তাহাতে বর্তমানকালে সাহিত্যপরিবারের এই গৃহবিচ্ছেদ প্রমাণ হয়।

এ নালিশ কেবল আমাদের দেশে নয়, কেবল নবীনবাবু এবং বঙ্কিমবাবু অপরাধী নহেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস -লেখকদের আদি এবং আদর্শ স্কটও নিষ্কৃতি পান নাই।

আধুনিক ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে ফ্রীম্যান সাহেবের নাম সুবিখ্যাত। উপন্যাসে ইতিহাসের যে বিকার ঘটে সেটার উপরে তিনি আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যাঁহারা য়ুরোপের ধর্মযুদ্ধযাত্রা-যুগ (The Age of the Crusades) সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন স্কটের আইভ্যান্‌হো পড়িতে বিরত থাকেন।

অবশ্য, য়ুরোপের ধর্মযুদ্ধযাত্রা-যুগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানা আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু স্কটের আইভ্যান্‌হোর মধ্যে চিরন্তন মানব-ইতিহাসের যে নিত্যসত্য আছে তাহাও আমাদের জানা আবশ্যক। এমন-কি, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের এত বেশি যে, ক্রুজেড-যুগ সম্বন্ধে ভুল সংবাদ পাইবার আশঙ্কাসত্ত্বেও ছাত্রগণ অধ্যাপক ফ্রীম্যানকে লুকাইয়া আইভ্যান্‌হো পাঠ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিবে না।

এখন আলোচ্য এই যে, ইতিহাসের বিশেষ সত্য এবং সাহিত্যের নিত্যসত্য উভয় বাঁচাইয়াই কি স্কট আইভ্যান্‌হো লিখিতে পারিতেন না ?

পারিতেন কি না সে কথা আমাদের পক্ষে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। দেখিতেছি তিনি সে কাজ করেন নাই।

এমন হইতে পারে, তিনি যে ইচ্ছা করিয়া করেন নাই তাহা নহে। অধ্যাপক ফ্রীম্যান ক্রুজেড-যুগ সম্বন্ধে যতটা জানিতেন স্কট ততটা জানিতেন না। স্কটের সময় প্রমাণ-বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান এতদূর অগ্রসর হয় নাই।

প্রতিবাদী বলিবেন, যখন লিখিতে বসিয়াছেন তখন ভালো করিয়া জানিয়া লেখাই উচিত ছিল।

কিন্তু এ জানার শেষ হইবে কবে ? কবে নিশ্চয় জানিব ক্রুজেড সম্বন্ধে সমস্ত প্রমাণ নিঃশেষ হইয়া গেছে ? কেমন করিয়া বুঝিব অদ্য যে ঐতিহাসিক সত্য ধ্রুব বলিয়া জানিব কল্য নূতনাবিষ্কৃত দলিলের জোরে তাহাকে ঐতিহাসিক সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে না ? অদ্যকার প্রচলিত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া যিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবেন কল্যকার নূতন ইতিহাসবেত্তা তাঁহাকে নিন্দা করিলে কী বলিব ?

প্রতিবাদী বলিবেন, সেইজন্যই বলি, উপন্যাস যত ইচ্ছা লেখো, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়ো না। এমন কথা আজিও এ দেশে কেহ তোলেন নাই বটে, কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যে এ আভাস সম্প্রতি পাওয়া গেছে। সার ফ্রান্সিস প্যালগ্রেভ বলেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন এক দিকে

ইতিহাসের শত্রু তেমনি অন্য দিকে গল্পেরও মস্ত রিপু। অর্থাৎ উপন্যাসলেখক গল্পের খাতিরে ইতিহসকে আঘাত করেন, আবার সেই আহত ইতিহাস তাঁহার গল্পকেই নষ্ট করিয়া দেয় ; ইহাতে গল্প-বেচারার শ্বশুরকুল পিতৃকুল দুই কুলই মাটি।

এমন বিপদ সত্ত্বেও কেন ঐতিহাসিক কাব্য-উপন্যাস সাহিত্যে স্থান পায় ? আমরা তাহার যে কারণ মনে জানি সেটা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করি।

আমাদের অলংকারশাস্ত্রে রসাত্মক বাক্য বলিয়া কাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক সংজ্ঞা আর কোথাও দেখি নাই। অবশ্য, রস কাহাকে বলে সে আর বুঝাইবার জো নাই। যে-কোনো ব্যক্তির আস্বাদনশক্তি আছে রস শব্দের ব্যাখ্যা তাহার নিকট অনাবশ্যক ; যাহার ঐ শক্তি নাই তাহার এ-সমস্ত কথা জানিবার কোনো প্রয়োজনই নাই।

আমাদের অলংকারে নয়টি মূলরসের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু অনেকগুলি অনির্বচনীয় মিশ্ররস আছে, অলংকারশাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই।

সেই-সমস্ত অনির্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ।

ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখ তাহার নিজের পক্ষে কম নহে, জগতের বড়ো বড়ো ঘটনা তাহার নিকট ছায়ায় পড়িয়া যায়, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের অথবা গুটিকতক জীবনের উত্থানপতন-ঘাতপ্রতিঘাত উপন্যাসে তেমন করিয়া বর্ণিত হইলে রসের তীব্রতা বাড়িয়া উঠে ; এই রসাবেশ আমাদিগকে অত্যন্ত নিকটে আসিয়া আক্রমণ করে। আমাদের অধিকাংশেরই সুখদুঃখের পরিধি সীমাবদ্ধ ; আমাদের জীবনের তরঙ্গক্ষোভ কয়েকজন আত্মীয়বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই অবসান হয়। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর বিপদসম্পদ-হর্ষবিষাদ আমরা আপনার করিয়া বুঝিতে পারি ; কারণ, সে-সমস্ত সুখদুঃখের কেন্দ্রস্থল নগেন্দ্রের পরিবারমণ্ডলী। নগেন্দ্রকে আমাদের নিকট প্রতিবেশী বলিয়া মনে করিতে কিছুই বাধে না।

কিন্তু পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাঁহাদের সুখদুঃখ জগতের বৃহৎব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থানপতন, মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা যে সমুদ্রগর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে, সেই মহান্ কলসংগীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে তখন রুদ্রবীণার একটা তারে মূলরাগিণী বাজে এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গম্ভীর, একটা সুদূরবিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে।

এই-যে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে কালের গতি ইহা আমাদের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষগোচর নহে। যদি বা তেমন কোনো জাতীয় ইতিহাসস্রষ্টা মহাপুরুষ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকেন তথাপি কোনো খণ্ড ক্ষুদ্র বর্তমান কালে তিনি এবং সেই বৃহৎ ইতিহাস একসঙ্গে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। অতএব সুযোগ হইলেও এমন-সকল ব্যক্তিকে আমরা কখনো ঠিকমত তাঁহাদের যথার্থ প্রতিষ্ঠাভূমিতে উপযুক্তভাবে দেখিতে পাই না। তাঁহাদিগকে কেবল ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া নহে, পরন্তু মহাকালের অঙ্গস্বরূপ দেখিতে হইলে, দূরে দাঁড়াইতে হয়, অতীতের মধ্যে তাঁহাদিগকে স্থাপন করিতে হয়, তাঁহারা যে সুবৃহৎ রঙ্গভূমিতে নায়কস্বরূপ ছিলেন সেটা-সুদ্ধ তাঁহাদিগকে এক করিয়া দেখিতে হয়।

এই-যে আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ সুখদুঃখ হইতে দূরত্ব, আমরা যখন চাকরি করিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া খাইয়া-দাইয়া কাল কাটাইতেছি তখন যে জগতের রাজপথ দিয়া বড়ো বড়ো সারথিরা কালরথ চালনা করিয়া লইয়া চলিতেছেন, ইহাই অকস্মাৎ ক্ষণকালের জন্য উপলব্ধি করিয়া ক্ষুদ্র পরিধি হইতে মুক্তিলাভ— ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত রসস্বাদ।

এরূপ ব্যাপার আগাগোড়া কল্পনা হইতে সৃজন করা যায় না যে তাহা নহে। কিন্তু যাহা স্বভাবতই আমাদের হইতে দূরস্থ, যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্বর্তী, তাহাকে কোনো-একটা ছুতায় খানিকটা প্রকৃত ঘটনার সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিলে পাঠকের প্রত্যয়-উৎপাদন লেখকের পক্ষে সহজ হয়।

রসের সৃজনটাই উদ্দেশ্য, অতএব সেজন্য ঐতিহাসিক উপকরণ যে পরিমাণে যতটুকু সাহায্য করে সে পরিমাণে ততটুকু লইতে কবি কুণ্ঠিত হন না।

শেক্‌সপীয়রের 'অ্যান্টনি এবং ক্লিয়োপাট্রা' নাটকের যে মূলব্যাপারটি তাহা সংসারের প্রাত্যহিক পরীক্ষিত ও পরিচিত সত্য। অনেক অখ্যাত অজ্ঞাত সুযোগ্য লোক কুহকিনী-নারীমায়ার জালে আপন ইহকাল-পরকাল বিসর্জন করিয়াছে। এইরূপ ছোটোখাটো মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের শোচনীয় ভগ্নাবশেষে সংসারের পথ পরিকীর্ণ।

আমাদের সুপ্রত্যক্ষ নরনারীর বিষামৃতময় প্রণয়লীলাকে কবি একটি সুবিশাল ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহাকে বিরাট করিয়া তুলিয়াছেন। হৃদ্‌বিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর, প্রেমদ্বন্দ্বের সঙ্গে একবন্ধনের দ্বারা বদ্ধ রোমের প্রচণ্ড আত্মবিচ্ছেদের সমরায়োজন। ক্লিয়োপাট্রার বিলাসকক্ষে বীণা বাজিতেছে, দূরে সমুদ্রতীর হইতে ভৈরবের সংহারশৃঙ্গধ্বনি তাহার সঙ্গে এক সুরে মন্দ্রিত হইয়া উঠিতেছে। আদি এবং করুণ রসের সহিত কবি ঐতিহাসিক রস মিশ্রিত করিতেই তাহা এমন-একটি চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইতিহাসবেত্তা মম্‌সেন পণ্ডিত যদি শেক্‌স্‌পীয়রের এই নাটকের উপরে প্রমাণের তীক্ষ্ণ আলোক নিক্ষেপ করেন তবে সম্ভবত ইহাতে অনেক কালবিরোধ-দোষ (anachronism), অনেক ঐতিহাসিক ভ্রম বাহির হইতে পারে। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র পাঠকের মনে যে মোহ উৎপাদন করিয়াছেন, ভ্রান্ত বিকৃত ইতিহাসের দ্বারাও যে-একটি ঐতিহাসিক রসের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের নূতন তথ্য-আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইবে না।

সেইজন্য আমরা ইতিপূর্বে কোনো-একটি সমালোচনায় লিখিয়াছিলাম, 'ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন ; মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই ; কারণ, স্বাদই এ স্থলে, লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষমাত্র।'

অর্থাৎ লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল।

তাই বলিয়া কি রামচন্দ্রকে পামর এবং রাবণকে সাধুরূপে চিত্রিত করিলে অপরাধ নাই ? অপরাধ আছে। কিন্তু তাহা ইতিহাসের বিরুদ্ধে অপরাধ নহে, কাব্যেরই বিরুদ্ধে অপরাধ। সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উলটা করিয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ে। সেই একটা দমকাতেই কাব্য একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়।

এমন-কি, যদি কোনো ঐতিহাসিক মিথ্যাও সর্বসাধারণের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া বরাবর চলিয়া আসে, ইতিহাস এবং সত্যের পক্ষ লইয়া কাব্য তাহার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলে দোষের হইতে পারে। মনে করো আজ যদি নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, সুরাসক্ত অনাচারী যদুবংশ গ্রীকজাতীয় এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীন বনবিহারী বংশীবাদক গ্রীসীয় রাখাল, যদি জানা যায় যে তাঁহার বর্ণ জ্যেষ্ঠ বলদেবের বর্ণের ন্যায় শুভ্র ছিল, যদি স্থির হয় নির্বাসিত অর্জুন এশিয়া-মাইনরের কোনো গ্রীক রাজ্য হইতে যুনানী রাজকন্যা সুভদ্রাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং দ্বারকা সমুদ্রতীরবর্তী কোনো গ্রীক উপদ্বীপ, যদি প্রমাণ হয় নির্বাসনকালে পাণ্ডবগণ বিশেষ রণবিজ্ঞানবেত্তা প্রতিভাশালী গ্রীসীয় বীর কৃষ্ণের সহায়তা লাভ করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহার অপূর্ব বিজাতীয় রাজনীতি যুদ্ধনৈপুণ্য এবং কর্মপ্রধান ধর্মতত্ত্ব বিস্মিত ভারতবর্ষে তাঁহাকে অবতাররূপে দাঁড় করাইয়াছে— তথাপি বেদব্যাসের মহাভারত বিলুপ্ত হইবে না, এবং কোনো নবীন কবি সাহসপূর্বক কালাকে গোরা করিতে পারিবেন না।

আমাদের এইগুলি সাধারণ কথা। নবীনবাবু ও বঙ্কিমবাবু তাঁহাদের কাব্যে এবং উপন্যাসে প্রচলিত

ইতিহাসের বিরুদ্ধে এতদূর গিয়াছেন কি না যাহাতে কাব্যরস নষ্ট হইয়াছে তাহা তাঁহাদের গ্রন্থের বিশেষ সমালোচনা-স্থলে বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে কর্তব্য কী? ইতিহাস পড়িব না আইভ্যান্‌হো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুইই পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভ্যান্‌হো পড়ো। পাছে ভুল শিখি এই সতর্কতায় কাব্যরস হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিলে স্বভাবটা শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া যায়।

কাব্যে যদি ভুল শিখি ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু যে ব্যক্তি ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্যই পড়িবে, সে হতভাগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে, সম্ভবত তাহার ভাগ্য আরো মন্দ।

আশ্বিন ১৩০৫

কবিজীবনী

কবি টেনিসনের পুত্র তাঁহার পরলোকগত পিতার চিঠিপত্র ও জীবনী বৃহৎ দুইখণ্ড পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাচীন কবিদের জীবনের বিস্তৃত বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তখন জীবনীর শখ লোকের ছিল না; তাহা ছাড়া তখন বড়ো-ছোটো সকল লোকেই এখনকার চেয়ে অপ্রকাশ্যে বাস করিত। চিঠিপত্র, খবরের কাগজ, সভাসমিতি, সাহিত্যের বাদবিরোধ এমন প্রবল ছিল না। সুতরাং প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনব্যাপারকে নানা দিক হইতে প্রতিফলিত দেখিবার সুযোগ তখন ঘটিত না।

অনেক ভ্রমণকারী বড়ো বড়ো নদীর উৎস খুঁজিতে দুর্গম স্থানে গিয়াছে। বড়ো কাব্যনদীর উৎস খুঁজিতেও কৌতূহল হয়। আধুনিক কবির জীবনচরিতে এই কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে এমন আশা মনে জন্মে। মনে হয় আধুনিক সমাজে কবির আর লুকাইবার স্থান নাই; কাব্যস্রোতের উৎপত্তি যে শিখরে সে পর্যন্ত রেলগাড়ি চলিতেছে।

সেই আশা করিয়াই পরমাগ্রহে বৃহৎ দুইখণ্ড বই শেষ করা গেল। কিন্তু কবি কোথায়, কাব্যস্রোত কোন্ গুহা হইতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তো খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কবি কবে মানবহৃদয়সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া এত জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসংগীতের সুরগুলি তাঁহার বাঁশিতে অভ্যাস করিয়া লইলেন।

কবি কবিতা যেমন করিয়া রচনা করিয়াছেন জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবন কাব্য নহে; যাঁহারা কর্মবীর তাঁহারা নিজের জীবনকে নিজে সৃজন করেন। কবি যেমন ভাষার বাধার মধ্য হইতে ছন্দকে গাঁথিয়া তোলেন, যেমন সামান্য ভাবকে অসামান্য সুর এবং ছোটো কথাকে বড়ো অর্থ দিয়া থাকেন, তেমনি কর্মবীরগণ সংসারের কঠিন বাধার মধ্যে নিজের জীবনের ছন্দ নির্মাণ করেন এবং চারি দিকের ক্ষুদ্রতাকে অপূর্ব ক্ষমতাবলে বড়ো করিয়া লন। তাঁহারা হাতের কাছে যে-কিছু সামান্য মাল-মসলা পান তাহা দিয়াই নিজের জীবনকে মহৎ করেন এবং তাহাদিগকেও বৃহৎ করিয়া তোলেন। তাঁহাদের জীবনের কর্মই তাঁহাদের কাব্য, সেইজন্য তাঁহাদের জীবনী মানুষ ফেলিতে পারে না।

কিন্তু কবির জীবন মানুষের কী কাজে লাগিবে? তাহাতে স্থায়ী পদার্থ কী আছে? কবির নামের সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাকে উচ্চে টাঙাইয়া রাখিলে, ক্ষুদ্রকে মহতের সিংহাসনে বসাইয়া লজ্জিত করা হয়। জীবনচরিত মহাপুরুষের এবং কাব্য মহাকবির।

কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারে; কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র

করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে। দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে জীবন এবং কাব্যের মর্যাদা বেশি করিয়া দেখা যায়।

টেনিসনের জীবন সেরূপ নহে। তাহা সৎলোকের জীবন বটে, কিন্তু তাহা কোনো অংশেই প্রশস্ত বৃহৎ বা বিচিত্রফলশালী নহে। তাহা তাঁহার কাব্যের সহিত সমান ওজন রাখিতে পারে না। বরঞ্চ তাঁহার কাব্যে যে অংশে সংকীর্ণতা আছে, বিশ্ব-ব্যাপকতার অভাব আছে, আধুনিক বিলাতি সভ্যতার দোকান-কারখানার সদ্য গন্ধ কিছু অতিমাত্রায় আছে, জীবনীর মধ্যে সেই অংশের প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়; কিন্তু যে ভাবে তিনি বিরাট, যে ভাবে তিনি মানুষের সহিত মানুষকে, সৃষ্টির সহিত সৃষ্টিকর্তাকে একটি উদার সংগীতরাজ্যে সমগ্র করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহার সেই বৃহৎ ভাবটি জীবনীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই।

আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো কবির জীবনচরিত নাই। আমি সেজন্য চিরকৌতূহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি। বাল্মীকি সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহাকে ইতিহাস বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। কিন্তু আমাদের মতে তাহাই কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত। বাল্মীকির পাঠকগণ বাল্মীকির কাব্য হইতে যে জীবনচরিত সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন তাহা বাল্মীকির প্রকৃত জীবনের অপেক্ষা অধিক সত্য। কোন্ আঘাতে বাল্মীকির হৃদয় ভেদ করিয়া কাব্য-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল? করুণার আঘাতে। রামায়ণ করুণার অশ্রুনির্ঝর। ক্রৌঞ্চবিরহীর শোকার্ত ক্রন্দন রামায়ণকথার মর্মস্থলে ধ্বনিত হইতেছে। রাবণও ব্যাধের মতো প্রেমিকাযুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধব্যাপার উন্মত্ত বিরহীর পাখার ঝট্‌পটি। রাবণ যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল মৃত্যুবিচ্ছেদের অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। মিলনের পরেও এ বিচ্ছেদের প্রতিকার হইল না।

সুখের আয়োজনটি কেমন সুন্দর হইয়া আসিয়াছিল! পিতার স্নেহ, প্রজাদের প্রীতি, ভ্রাতার প্রণয়, তাহারই মাঝখানে ছিল নবপরিণীত রামসীতার যুগলমিলন। যৌবরাজ্যের অভিষেক এই সুখসম্ভোগকে সম্পূর্ণ এবং মহীয়ান করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছিল। ঠিক এমন সময়েই ব্যাধ শর লক্ষ করিল, সেই শর বিদ্ধ হইল সীতাহরণকালে। তাহার পরে শেষ পর্যন্ত বিরহের আর অন্ত রহিল না। দাম্পত্যসুখের নিবিড়তম আরম্ভের সময়েই দাম্পত্যসুখের দারুণতম অবসান।

ক্রৌঞ্চমিথুনের গল্পটি রামায়ণের মূল ভাবটির সংক্ষিপ্ত রূপক। স্থূল কথা এই, লোকে এই সত্যটুকু নিঃসন্দেহ আবিষ্কার করিয়াছে যে, মহাকবির নির্মল অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃপ্রবাহ করুণার উত্তাপেই বিগলিত হইয়া স্যন্দমান হইয়াছে, অকালে দাম্পত্যপ্রেমের চিরবিচ্ছেদ-ঘটনই ঋষির করুণার্দ্র কবিত্বকে উন্মথিত করিয়াছে।

আবার আর-একটি গল্প আছে, রত্নাকরের কাহিনী। সে আর-এক ভাবের কথা। রামায়ণের কাব্যপ্রকৃতির আর-এক দিকের সমালোচনা। এই গল্প রামায়ণের রামচরিত্রের প্রতি লক্ষ করিয়াছে। এই গল্পে বলিতেছে, রামসীতার বিচ্ছেদদুঃখের অপরিসীম করুণাই যে রামায়ণের প্রধান অবলম্বন তাহা নহে, রামচরিত্রের প্রতি ভক্তিই ইহার মূল। দস্যুকে কবি করিয়া তুলিয়াছে রামের এমন চরিত্র—ভক্তির এমন প্রবলতা! রামায়ণের রাম যে ভারতবর্ষের চক্ষে কতবড়ো হইয়া দেখা দিয়াছেন এই গল্পে যেন তাহা মাপিয়া দিতেছে।

এই দুটি গল্পেই বলিতেছে, প্রতিদিনের কথাবার্তা চিঠিপত্র দেখাসাক্ষাৎ কাজকর্ম শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে কবিত্বের মূল নাই; তাহার মূলে একটি বৃহৎ আবেগের সঞ্চার, যেন একটি আকস্মিক অলৌকিক আবির্ভাবের মতো— তাহা কবির আয়ত্তের অতীত। কবিকঙ্কণ যে কাব্য লিখিয়াছেন তাহাও স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া, দেবীর প্রভাবে।

কালিদাসের সম্বন্ধে যে গল্প আছে তাহাও এইরূপ। তিনি মূর্খ অরসিক ও বিদুষী স্ত্রীর পরিহাসভাজন ছিলেন। অকস্মাৎ দৈবপ্রভাবে তিনি কবিত্বরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। বাল্মীকি নিষ্ঠুর দস্যু ছিলেন এবং কালিদাস অরসিক মূর্খ ছিলেন, এই উভয়ের একই তাৎপর্য। বাল্মীকির রচনায়

দয়াপূর্ণ পবিত্রতা এবং কালিদাসের রচনায় রসপূর্ণ বৈদগ্ধ্যের অদ্ভুত অলৌকিকতা প্রকাশ করিবার জন্য ইহা চেষ্টামাত্র।

এই গল্পগুলি জনগণ কবির জীবন হইতে সংগ্রহ করে নাই, তাঁহার কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। কবির জীবন হইতে যে-সকল তথ্য পাওয়া যাইতে পারিত কবির কাব্যের সহিত তাহার কোনো গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ থাকিত না। বাল্মীকির প্রাত্যহিক কথাবার্তা-কাজকর্ম কখনোই তাঁহার রামায়ণের সহিত তুলনীয় হইতে পারিত না। কারণ সেই-সকল ব্যাপার সাময়িক, অনিত্য ; রামায়ণ তাঁহার অন্তর্গত নিত্যপ্রকৃতির— সমগ্র প্রকৃতির— সৃষ্টি, তাহা একটি অনির্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ. তাহা অন্যান্য কাজকর্মের মতো ক্ষণিকবিক্ষোভজনিত নহে।

টেনিসনের কাব্যগত জীবনচরিত একটি লেখা যাইতে পারে— বাস্তবজীবনের পক্ষে তাহা অমূলক, কিন্তু কাব্যজীবনের পক্ষে তাহা সমূলক। কল্পনার সাহায্য ব্যতীত তাহাকে সত্য করা যাইতে পারে না। তাহাতে লেডি শ্যালট ও রাজা আর্থরের কালের সহিত ভিক্টোরিয়ার কালের অদ্ভুতরকম মিশ্রণ থাকিবে ; তাহাতে মার্লিনের জাদু এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কার একত্র হইবে। বর্তমান যুগ বিমাতার ন্যায় তাঁহাকে বাল্যকালে কল্পনারণ্যে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছিল— সেখানে প্রাচীনকালের ভগ্নদুর্গের মধ্যে একাকী বাস করিয়া কেমন করিয়া আলাদিনের প্রদীপটি পাইয়াছিলেন, কেমন করিয়া রাজকন্যার সহিত তাঁহার মিলন হইল, কেমন করিয়া প্রাচীনকালের ধনসম্পদ বহন করিয়া তিনি বর্তমান কালের মধ্যে রাজবেশে বাহির হইলেন, সেই সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা লেখা হয় নাই। যদি হইত তবে একজনের সহিত আর-একজনের লেখার ঐক্য থাকিত না, টেনিসনের জীবন ভিন্ন ভিন্ন কালে ও ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে নূতন নূতন রূপ ধারণ করিত।

আষাঢ় ১৩০৮

পরিশিষ্ট

কাব্য

আজকাল যাঁহারা সমালোচনা করিতে বসেন তাঁহারা কাব্য হইতে একটা-কিছু নূতন কথা বাহির করিতে চেষ্টা করেন। কবির ভাবের সহিত আপনার মনকে মিশাইবার চেষ্টা না করিয়া কোমর বাঁধিয়া খানাতল্লাশি করিতে উদ্যত হন। অনেক বাজে জিনিস হাতে ঠেকে, কিন্তু অনেক সময়েই আসল জিনিসটা পাওয়া যায় না।

কিন্তু তর্কই তাই, কে কোন্‌টাকে আসল জিনিস মনে করিতে পারে। একটা প্রস্তর-মূর্তির মধ্যে কেহ বা প্রস্তরটাকে আসল জিনিস মনে করিতে পারে, কেহ বা মূর্তিটাকে। সে স্থলে মীমাংসা করিতে হইলে বলিতে হয়, প্রস্তর তুমি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে পারো, তাহার জন্য মূর্তি ভাঙিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু এ মূর্তি আর কোথাও মিলিবে না। তেমনি কবিতা হইতে তত্ত্ব বাহির না করিয়া যাহারা সন্তুষ্ট না হয় তাহাদিগকে বলা যাইতে পারে, তত্ত্ব তুমি দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে পারো, কিন্তু কাব্যরসই কবিতার বিশেষত্ব।

এই কাব্যরস কী তাহা বলা শক্ত। কারণ, তাহা তত্ত্বের ন্যায় প্রমাণযোগ্য নহে, অনুভবযোগ্য। যাহা প্রমাণ করা যায় তাহা প্রতিপন্ন করা সহজ; কিন্তু যাহা অনুভব করা যায় তাহা অনুভূত করাইবার সহজ পথ নাই, কেবলমাত্র ভাষার সাহায্যে একটা সংবাদ জ্ঞাপন করা যায় মাত্র। কেবল যদি বলা যায় 'সুখ হইল' তবে একটা খবর দেওয়া হয়, সুখ দেওয়া হয় না।

যে-সকল কথা সর্বাপেক্ষা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে অথচ যাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা সর্বাপেক্ষা শক্ত তাহা লইয়াই মানবের প্রধান ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা পিঞ্জররুদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় যেন সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে চঞ্চলভাবে পক্ষ আন্দোলন করিতেছে। তত্ত্বপ্রচার করিয়া মানবের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি নাই, আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য তাহার হৃদয় সর্বদা ব্যগ্র হইয়া আছে। কাব্যের মধ্যে মানবের সেই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা কথঞ্চিৎ সফলতা লাভ করে; কাব্যের মর্যাদাই তাই। একটি ক্ষুদ্র প্রেমের কবিতার মধ্যে কোনো তত্ত্বই নাই, কিন্তু চিরকালীন মানবপ্রকৃতির আত্মপ্রকাশ রহিয়া গেছে। এইজন্য মানব চিরকালই তাহার সমাদর করিবে। ছবি-গান-কাব্যে মানব ক্রমাগতই আপনার সেই চিরান্ধকারশায়ী আপনাকে গোপনতা হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে। এইজন্যই একটা ভালো ছবি, ভালো গান, ভালো কাব্য পাইলে আমরা বাঁচিয়া যাই।

আত্মপ্রকাশের অর্থই এই, আমার কোন্‌টা কেমন লাগে তাহা প্রকাশ করা। কোন্‌টা কী তাহার দ্বারা বাহিরের বস্তু নিরূপিত হয়, আমার কোন্‌টা কেমন লাগে তাহার দ্বারা আমি নির্দিষ্ট হই। নক্ষত্র যে অগ্নিময় জ্যোতিষ্ক তাহা নক্ষত্রের বিশেষত্ব, কিন্তু নক্ষত্র যে রহস্যময় সুন্দর তাহা আমার আত্মার বিশেষত্ব-বশত। যখন আমি নক্ষত্রকে জ্যোতিষ্ক বলিয়া জানি তখন নক্ষত্রকেই জানি, কিন্তু যখন আমি নক্ষত্রকে সুন্দর বলিয়া জানি তখন নক্ষত্রলোকের মধ্যে আমার আপনার হৃদয়কেই অনুভব করি।

এইরূপে কাব্যে আমরা আমাদের বিকাশ উপলব্ধি করি। তাহার সহিত নূতন তত্ত্বের কোনো যোগ নাই। বাল্মীকি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বাল্মীকির সময়েও একান্ত পুরাতন ছিল। রামের গুণ বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন ভালো লোককে আমরা ভালোবাসি। কেবলমাত্র এই মান্ধাতার আমলের তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য সাত-কাণ্ড রামায়ণ লিখিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। কিন্তু ভালো যে কত ভালো, অর্থাৎ ভালোকে যে কত ভালো লাগে তাহা সাত-কাণ্ড রামায়ণেই প্রকাশ করা যায়; দর্শনে বিজ্ঞানে কিংবা সুচতুর সমালোচনায় প্রকাশ করা যায় না।

হে বিষয়ী, হে সুবুদ্ধি, ক্ষুদ্র প্রেমের কবিতা দেখিয়া তুমি যে বিজ্ঞভাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছ, বলিতেছ 'উহার মধ্যে নূতন জ্ঞান কী আছে', তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি তোমার সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান লইয়া মানবের এই পুরাতন প্রেমকে এমনি উজ্জ্বল মধুর ভাবে ব্যক্ত করো দেখি। যাহা কিছুতে ধরা দিতে চায় না সে মন্ত্রবলে ইহার মধ্যে ধরা দিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি বিজ্ঞানে দর্শনে আমরা জগৎকে জানি, কাব্যে আমরা আপনাকে জানি। অতএব

যদি কোনো কবিতায় আমরা কেবলমাত্র এইটুকু জানি যে, ফুল আমরা ভালোবাসি, আকাশের তারা আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে, যে আমার প্রিয়জন সে আমার না-জানি কী— যদি তাহাতে জগতের ক্রমবিকাশ বা কোনো ধর্মমতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোনো কথা না'ও থাকে— তথাপি তাহাকে অসম্মান করা যায় না।

যদি বল 'ইহার উপকার কী', ইহার উপকারও আছে। আমরা যতক্ষণ আপনাকে আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া দেখি ততক্ষণ আপনাকে পুরা জানি না। যখন সেই অঙ্গনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় তখনই আপন অধিকারের বিস্তার জানিতে পারি। যখনই একটি ক্ষুদ্র ফুল বাহিরে আমাকে টানিয়া লইয়া যায় তখনই আমি অসীমের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হই। আমার প্রিয় মুখ যখন আমাকে আহ্বান করে তখন সে আমাকে আমার ক্ষুদ্রতা হইতে আহ্বান করে ; যতই অধিক ভালোবাসি ততই আমার ভালোবাসার প্রাবল্যের মধ্যে আপনার বিপুলতা বুঝিতে পারি। প্রেমের মধ্যে সৌন্দর্যের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধনমুক্তি হয়।

কিন্তু কাব্যপ্রসঙ্গে উপকারিতার কথা এইজন্য উত্থাপন করা যায় না যে, কাব্যের আনুষঙ্গিক ফল যাহাই হউক কাব্যের উদ্দেশ্য উপকার করিতে বসা নহে। যাহা সত্য যাহা সুন্দর তাহাতে উপকার হইবারই কথা, কিন্তু সেই উপকারিতার পরিমাণের উপর তাহার সত্যতা ও সৌন্দর্যের পরিমাণ নির্ভর করে না। সৌন্দর্য আমাদের উপকার করে বলিয়া সুন্দর নহে, সুন্দর বলিয়াই উপকার করে। উপকারিতাপ্রসঙ্গে কবিতাকে বিচার করিতে বসিলে সর্বদাই ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। কারণ, উপকার নানা উপায়ে হয় ; কবিতার মধ্যে উপকার-অন্বেষণ যাহাদের স্বভাব তাহারা কাব্যের মধ্যে যে-কোনো উপকার পাইলেই চরিতার্থ হয়, বিচার করে না তাহা যথার্থ কাব্যের প্রকৃতিগত কি না। এমন অনেক পাঠক দেখা গিয়াছে যাহারা ছন্দোবন্ধে অদৃষ্টবাদ অথবা অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে কোনো কথা পাইলেই আনন্দে ব্যাকুল হইয়া উঠে, মনে করে ইহাতে মানবের পরম উপকার হইতেছে। এবং তাহারা কোনো বিশেষ কবিতার সৌন্দর্য স্বীকার করিয়াও তাহার উপকারিতার অভাব লইয়া অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন, ব্যবসায়ী লোক আক্ষেপ করে পৃথিবীর সমস্ত ফুলবাগান তাহার তুলার খেত হইল না কেন। সে স্বীকার করিবে ফুল সুন্দর বটে, কিন্তু কিছুতে বুঝিতে পারিবে না তাহাতে ফল কী আছে।

চৈত্র ১২৯৮

বাংলাসাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা

যাঁহারা অনেক ইংরাজি কেতাব পড়িয়াছেন তাঁহারা অনেকেই আধুনিক বাংলা লেখা ও লেখকদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এইরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা অনেকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বোধ করি ইতর-সাধারণ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া অভিমানে তাঁহারা আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠেন। একটা কথা ভুলিয়া যান যে, পৃথিবীতে বড়ো হওয়া শক্ত, কিন্তু আপনাকে বড়ো মনে করা সকলের চেয়ে সহজ। সমযোগ্য লোককে দূরে পরিহার করিয়া অনেকে স্বকপোলকল্পিত মহত্ত্বলাভ করে, কিন্তু প্রার্থনা করি এরূপ অজ্ঞানকৃত প্রহসন-অভিনয় হইতে আমাদের অন্তর্যামী আমাদিগকে সতত বিরত করুন।

বহুকাল হইতে বহুতর সামাজিক প্লাবনের সাহায্যে স্তর পড়িয়া ইংরাজি সাহিত্য উচ্চতা কঠিনতা এবং একটা নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যে সম্প্রতি পলি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার কোথাও জলা, কোথাও বালি, কোথাও মাটি। সুতরাং ইহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারে, কাহারও প্রতিবাদ করিবার সাধ্য নাই। ইহার ইতিহাস নাই, আবহমান-কাল-প্রচলিত প্রবাহ নাই, বহুকালসঞ্চিত রত্নভাণ্ডার নাই, ইহার বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে এখনো এক সমালোচনার নিয়মে বাঁধিবার সময় হয় নাই। সুতরাং ইংরাজি সমালোচনা গ্রন্থ হইতে মুখগহ্বর পূর্ণ করিয়া লইয়া যখন কোনো প্রবল প্রতিপক্ষ ইহার প্রতি মুহুর্মুহু ফুৎকার প্রয়োগ করিতে

থাকেন তখন বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষীণ আশার আলোকটুকু একান্ত কম্পিত ও নির্বাপিতপ্রায় হইয়া আসে। কিন্তু তথাপি বলা যাইতে পারে, ফুৎকার যতই প্রবল হউক শীর্ণ দীপশিখা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বর্তমান বাংলালেখকেরা বঙ্গসাহিত্যের প্রথম ভিত্তি-নির্মাণে প্রবৃত্ত আছেন। সুতরাং যাঁহারা ইংরাজি গ্রন্থস্তূপশিখরের উপর চড়িয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করেন তাঁহারা ইঁহাদিগকে ছোটো বলিয়া মনে করিতে পারেন। ইঁহারা মাটির উপরে দাঁড়াইয়া খাটিয়া মরিতেছেন, তাঁহারা উচ্চচূড়ায় বসিয়া কেবল হাওয়া খাইতেছেন ; এরূপ স্থলে উভয়ের মধ্যে সমকক্ষতার ভাব রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়ে।

এই দুই দলের মধ্যে যদি প্রকৃত উচ্চনীচতা থাকে তবে আর কোনো কথাই নাই। কিন্তু তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাঁহারা শুদ্ধমাত্র পরের চিন্তালব্ধ ধন সঞ্চয় করিয়া জীবনযাপন করেন তাঁহারা জানেন না নিজে কোনো বিষয় আনুপূর্বিক চিন্তা করা এবং সেই চিন্তা ভাষায় ব্যক্ত করা কী কঠিন। অনেক বড়ো বড়ো কথা পরের মুখ হইতে পরিপক্ব ফলের মতো অতি সহজে পাড়িয়া লওয়া যায়, কিন্তু অতি ছোটো কথাটিও নিজে ভাবিয়া গড়িয়া তোলা বিষম ব্যাপার। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র পাঠ করিয়া শিখিয়াছে, সঞ্চয় করা ছাড়া বিদ্যাকে আর কোনোপ্রকার ব্যবহারে লাগায় নাই, সে নিজে ঠিক জানে না সে কতটা জানে এবং কতটা জানে না।

যে শ্রেণীর সমালোচকের কথা বলিতেছি তাঁহারা যখন বাংলা পড়েন তখন মনে মনে বাংলাকে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া লন, সুতরাং সমালোচ্য গ্রন্থের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। বাংলাভাষার প্রাণের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করেন নাই, প্রবেশ করিবার অবসর পান নাই। মাতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সকল সাহিত্যই ম্লান নির্জীব ভাব ধারণ করে, তখন তাহার প্রতি সমালোচনশর প্রয়োগ করা কেবল 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দেওয়া মাত্র।

যাঁহারা বাংলা লেখেন তাঁহারাই বাংলা ভাষার বাস্তবিক চর্চা করেন ; অগত্যাই তাঁহাদিগকে বাংলাচর্চা করিতে হয়। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ শ্রদ্ধা অবশ্যই আছে। বঙ্গভাষা রাজভাষা নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা নহে, সম্মানলাভের ভাষা নহে, অর্থোপার্জনের ভাষা নহে, কেবলমাত্র মাতৃভাষা। যাঁহাদের হৃদয়ে ইহার প্রতি একান্ত অনুরাগ ও অটল ভরসা আছে তাঁহাদেরই ভাষা। যাঁহারা উপেক্ষাভরে দূরে থাকেন তাঁহারা বাংলা ভাষার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে কোনো সুযোগই পান নাই। তাঁহারা তর্জমা করিয়া বাংলার বিচার করেন। অতএব সভয়ে নিবেদন করিতেছি এরূপস্থলে তাঁহাদের মতের অধিক মূল্য নাই।

বৈশাখ ১২৯৯

পত্রালাপ

লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লিখিত

১

লেখা সম্বন্ধে তুমি যে প্রস্তাব করেছ সে অতি উত্তম। মাসিক-পত্রে লেখা অপেক্ষা বন্ধুকে পত্র লেখা অনেক সহজ। কারণ, আমাদের অধিকাংশ ভাবই বুনো হরিণের মতো, অপরিচিত লোক দেখলেই দৌড় দেয়। আবার পোষা ভাব এবং পোষা হরিণের মধ্যে স্বাভাবিক বন্যশ্রী পাওয়া যায় না।

কাজটা দু রকমে নিষ্পন্ন হতে পারে। এক, কোনো একটা বিশেষ বিষয় স্থির করে দু জনে বাদপ্রতিবাদ করা— কিন্তু তার একটা আশঙ্কা আছে, মীমাংসা হবার পূর্বেই বিষয়টা ক্রমে একঘেয়ে হয়ে যেতে পারে। আর-এক, কেবল চিঠি লেখা— অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য না রেখে লেখা, কেবল লেখার জন্যেই লেখা। অর্থাৎ ছুটির দিনে দুই বন্ধুতে মিলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া ; তার পরে যেখানে গিয়ে পড়ি তাতে কিছু আসে যায় না, এবং পথ হারালেও কোনো মনিবের কাছে কৈফিয়ত দেবার নেই।

দস্তুরমত রাস্তায় চলতে গেলে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবার জো থাকে না। কিন্তু প্রাপ্য জিনিসের চেয়ে ফাউ যেমন বেশি ভালো লাগে তেমনি অধিকাংশ সময়েই অপ্রাসঙ্গিক কথাটায় বেশি আমোদ পাওয়া যায় ; মূল কথাটার চেয়ে তার আশপাশের কথাটা বেশি মনোরম বোধ হয় ; অনেক সময়ে রামের চেয়ে হনুমান এবং লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠিরের চেয়ে ভীষ্ম এবং ভীম, সূর্যমুখীর চেয়ে কমলমণি বেশি প্রিয় বলে বোধ হয়।

অবশ্য, সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক কথা বললে একেবারে পাগলামি করা হয় ; কিন্তু তাই বলে নিজের নাসাগ্রভাগের সমসূত্র ধরে ভূমিকা থেকে উপসংহার পর্যন্ত একেবারে সোজা লাইনে চললে নিতান্ত কলে-তৈরি প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়, মানুষের হাতের কাজের মতো হয় না। সেরকম আঁটা-আঁটি প্রবন্ধের বিশেষ আবশ্যক আছে এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না ; কিন্তু সর্বত্র তারই বড়ো বাহুল্য দেখা যায়। সেগুলো পড়লে মনে হয় যেন সত্য তার সমস্ত সুসংলগ্ন যুক্তিপরম্পরা নিয়ে একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোথা থেকে আবির্ভূত হল। মানুষের মনের মধ্যে সে যে মানুষ হয়েছে, সেখানে তার যে আরো অনেকগুলি সমবয়সী সহোদর ছিল, একটি বৃহৎ বিস্তৃত মানসপুরে যে তার একটি বিচিত্র বিহারভূমি ছিল, লেখকের প্রাণের মধ্যে থেকেই সে যে প্রাণ লাভ করেছে, তা তাকে দেখে মনে হয় না ; এমন মনে হয় যেন কোনো ইচ্ছাময় দেবতা যেমন বললেন 'অমুক প্রবন্ধ হউক' অমনি অমুক প্রবন্ধ হল : লেট দেয়ার বি লাইট অ্যান্ড দেয়ার ওআজ লাইট। এইজন্য তাকে নিয়ে কেবল আমাদের মাথার খাটুনি হয়, কেবলমাত্র মগজ দিয়ে সেটাকে হজম করবার চেষ্টা করা হয় ; আমাদের মানসপুরে যেখানে আমাদের নানাবিধ জীবন্ত ভাব জন্মাচ্ছে খেলছে এবং বাড়ছে সেখানে তার স্বর পরিচিতভাবে প্রবেশ করতে পারে না ; প্রস্তুত হয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে হয়, সাবধান হয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে হয় ; তার সঙ্গে কেবল আমাদের একাংশের পরিচয় হয় মাত্র, ঘরের লোকের মতো সর্বাংশের পরিচয় হয় না।

ম্যাপে এবং ছবিতে অনেক তফাত। ম্যাপে পার্সপেকটিভ থাকতে পারে না ; দূর নিকটের সমান ওজন, সর্বত্রই অপক্ষপাত ; প্রত্যেক অংশকেই সূক্ষ্মবিচারমত তার যথাপরিমাণ স্থান নির্দেশ করে দিতে হয়। কিন্তু ছবিতে অনেক জিনিস বাদ পড়ে ; অনেক বড়ো ছোটো হয়ে যায় ; অনেক ছোটো বড়ো হয়ে ওঠে। কিন্তু তবু ম্যাপের চেয়ে তাকে সত্য মনে হয়, তাকে দেখবামাত্রই এক মুহূর্তে আমাদের সমস্ত চিত্ত তাকে চিনতে পারে। আমরা চোখে যে ভুল দেখি তাকে সংশোধন করতে গেলে ছবি হয় না, ম্যাপ হয়, তাকে মাথা খাটিয়ে আয়ত্ত করতে হয়। কিন্তু এইরকম আংশিক চেষ্টা ভারি শ্রান্তিজনক। যাতে আমাদের সমস্ত প্রকৃতি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেয় না, পরস্পরের ভার লাঘব করে না, নিজ নিজ অংশ বন্টন করে নেয় না, তাতে আমাদের তেমন পরিপুষ্টি-সাধন হয় না। যে কারণে খনিজ পদার্থের চেয়ে প্রাণিজ পদার্থ আমরা শীঘ্র গ্রহণ এবং পরিপাক করতে পারি, সেই কারণে একেবারে অমিশ্র খাঁটি সত্য কঠিন যুক্তি-আকারে আমাদের অধিকাংশ পাকযন্ত্রের পক্ষেই গুরুপাক। এইজন্য সত্যকে মানবের জীবনাংশের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিলে সেটা লাগে ভালো।

সেই কাজ করতে গেলেই প্রথমত একটা সত্যকে এক দমে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়া দেওয়া যায় না। কারণ, অধিকাংশ সত্যই আমরা মনের মধ্যে আভাসরূপে পাই এবং তার পশ্চাতে আমাদের মাথাটাকে প্রেরণ ক'রে গ'ড়ে পিটে তার একটা আগা-গোড়া খাড়া করে তুলতে চেষ্টা করি। সেটাকে বেশ একটা সংগত এবং সম্পূর্ণ আকার না দিলে একটা চলনসই প্রবন্ধ হল না, মনে করি। এইজন্যে নানাবিধ কৃত্রিম কাঠ খড় দিয়ে তাকে নিয়ে একটা বড়োগোছের তাল পাকিয়ে তুলতে হয়।

আমি ইংরিজি কাগজ এবং বইগুলো যখন পড়ি তখন অধিকাংশ সময়েই আমার এই কথা মনে হয় যে, একটা কথাকে একটা প্রবন্ধ কিংবা একটা গ্রন্থে পরিণত করতেই হবে এই চেষ্টা থাকাতে প্রতিদিনকার ইংরাজি সাহিত্যে যে কত বাজে বকুনির প্রাদুর্ভাব হয়েছে তার আর সংখ্যা নেই— এবং সত্যটুকুকে খুঁজে বের করা কত দুঃসাধ্য হয়েছে! যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা আসলে কত সহজ এবং

সংক্ষিপ্ত, সেটাকে না-হক কত দুরূহ এবং বৃহৎ করে তোলা হয় ! আমার বোধ হয় ইংরাজি সাহিত্যের মাপকাঠিটা বড়ো বেশি বেড়ে গেছে— তিন ভল্যুম না হলে নভেল হয় না এবং মাসিক-পত্রের এক-একটা প্রবন্ধ দেখলে ভয় লাগে। আমার বোধ হয় 'নাইন্টিন্থ্ সেনচুরি' যদি অত বড়ো আয়তনের কাগজ না হত তা হলে ওর লেখাগুলো ঢের বেশি পাঠ্য এবং খাঁটি হত।

আমার তো মনে হয়, বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলি ঠিক নভেল যত বড়ো হওয়া উচিত তার আদর্শ। ভাগ্যে তিনি ইংরাজি নভেলিস্টের অনুকরণে বাংলায় বৃহদায়তনের দস্তুর বেঁধে দেন নি ! তা হলে বড়ো অসহ্য হয়ে উঠত, বিশেষত সমালোচকের পক্ষে। এক-একটা ইংরাজি নভেলে এত অতিরিক্ত বেশি কথা, বেশি ঘটনা, বেশি লোক যে, আমার মনে হয় ওটা একটা সাহিত্যের বর্বরতা। সমস্ত রাত্রি ধরে যাত্রাগান করার মতো। প্রাচীনকালেই ওটা শোভা পেত। তখন ছাপাখানা এবং প্রকাশকসম্প্রদায় ছিল না, তখন একখানা বই নিয়ে বহুকাল জাঁওর কাটবার সময় ছিল। এমন-কি, জর্জ্ এলিয়টের নভেল যদিও আমার খুব ভালো লাগে, তবু এটা আমার বরাবর মনে হয় জিনিসগুলো বড়ো বেশি বড়ো— এত লোক, এত ঘটনা, এত কথার হিজিবিজি না থাকলে বইগুলো আরো ভালো হত। কাঁঠাল ফল দেখে যেমন মনে হয়— প্রকৃতি একটা ফলের মধ্যে ঠেসাঠেসি করে বিস্তর সারবান কোষ পুরতে চেষ্টা করে ফলটাকে আয়তনে খুব বৃহৎ এবং ওজনে খুব ভারী করেছেন বটে এবং একজন লোকের সংকীর্ণ পাকযন্ত্রের পক্ষে কম দুঃসহ করেন নি, কিন্তু হাতের কাজটা মাটি করেছেন। এরই একটাকে ভেঙে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা ফল গড়লে সেগুলো দেখতে ভালো হত। জর্জ্ এলিয়টের এক-একটি নভেল এক-একটি সাহিত্যকাঁঠাল-বিশেষ। ক্ষমতা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয় বটে, কিন্তু সৌন্দর্য দেখে মানুষ খুশি হয়। স্থায়িত্বের পক্ষে সহজতা সরলতা সৌন্দর্য যে প্রধান উপকরণ তার আর সন্দেহ নেই।

সত্যকে যথাসাধ্য বাড়িয়ে তুলে তাকে একটা প্রচলিত দস্তুরমত আকার দিয়ে সত্যের খর্বতা করা হয়, অতএব তায় কাজ নেই। তা ছাড়া সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করা যাক যাতে লোকে অবিলম্বে জানতে পারে যে সেটা আমারই বিশেষ মন থেকে বিশেষভাবে দেখা দিচ্ছে। আমার ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, আমার সন্দেহ এবং বিশ্বাস, আমার অতীত এবং বর্তমান তার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাক্ ; তা হলেই সত্যকে নিতান্ত জড়পিণ্ডের মতো দেখাবে না।

আমার বোধ হয়, সাহিত্যের মূল ভাবটাই তাই। যখন কোনো-একটা সত্য লেখক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়, যখন সে জন্মভূমির সমস্ত ধূলি মুছে ফেলে এমন ছদ্মবেশ ধারণ করে যাতে ক'রে তাকে একটা অমানুষিক স্বয়ম্ভূ সত্য বলে মনে হয়, তখন তাকে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি নানা নাম দেওয়া হয়। কিন্তু যখন সে সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্মভূমির পরিচয় দিতে থাকে, আপনার মানবাকার গোপন করে না, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং জীবনের আন্দোলন প্রকাশ করে, তখনই সেটা সাহিত্যের শ্রেণীতে ভুক্ত হয়। এইজন্যে বিজ্ঞান দর্শন সবই সাহিত্যের মধ্যে মিশিয়ে থাকতে পারে এবং ক্রমেই মিশিয়ে যায়। প্রথম গজিয়ে তারা দিন-কতক অত্যন্ত খাড়া হয়ে থাকে, তার পরে মানবজীবনের সঙ্গে তারা যতই মিলে যায় ততই সাহিত্যের অন্তর্ভূত হতে থাকে, ততই তার উপর সহস্র মনের সহস্র ছাপ পড়ে এবং আমাদের মনোরাজ্যে তাদের আর প্রবাসীভাবে থাকতে হয় না।

এইরকম সাহিত্য-আকারে যখন সত্য পাই তখন সে সর্বতোভাবে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী হয়।

কিন্তু সাধারণের সহজে ব্যবহারোপযোগী হয় বলেই সাধারণের কাছে অনেক সময় তার বিশেষ গৌরব চলে যায়। যেন সত্যকে মানবজীবন দিয়ে মণ্ডিত করে প্রকাশ করা কম কথা। সেটাকে সহজে গ্রহণ করা যায় বলে যেন সেটাকে সৃজন করাও সহজ। তাই আমাদের সারবান সমালোচকেরা প্রায়ই আক্ষেপ করে থাকেন, বাংলায় রাশি রাশি নাটক-নভেল-কাব্যের আমদানি হচ্ছে। কই হচ্ছে ! যদি হত তা হলে আমাদের ভাবনা কী ছিল !

আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না আমরা জ্ঞানত কিংবা অজ্ঞানত মানুষকেই সব চেয়ে বেশি গৌরব দিয়ে থাকি ? আমরা যদি কোনো সাহিত্যে অনেকগুলো ভ্রান্ত মতের সঙ্গে একটা জীবন্ত মানুষ পাই

সেটাকে কি চিরস্থায়ী করে রেখে দিই নে ? জ্ঞান পুরাতন এবং অনাদৃত হয়, কিন্তু মানুষ চিরকাল সঙ্গদান করতে পারে। সত্যকার মানুষ প্রতিদিন যাচ্ছে এবং আসছে ; তাকে আমরা খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখি এবং ভুলে যাই, এবং হারাই। অথচ মানুষকে আয়ত্ত করবার জন্যেই আমাদের জীবনের সর্বপ্রধান ব্যাকুলতা। সাহিত্যে সেই চঞ্চল মানুষ আপনাকে বদ্ধ করে রেখে দেয় ; তার সঙ্গে আপনার নিগূঢ় যোগ চিরকাল অনুভব করতে পারি। জীবনের অভাব সাহিত্যে পূরণ করে। চিরমনুষ্যের সঙ্গ লাভ ক'রে আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব অলক্ষিতভাবে গঠিত হয়— আমরা সহজে চিন্তা করতে, ভালোবাসতে এবং কাজ করতে শিখি। সাহিত্যের এই ফলগুলি তেমন প্রত্যক্ষগোচর নয় ব'লে অনেকে একে শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে নিকৃষ্ট আসন দিয়া থাকেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সাধারণত দেখলে বিজ্ঞান-দর্শন-ব্যতীতও কেবল সাহিত্যে একজন মানুষ তৈরি হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-ব্যতিরেকে কেবল বিজ্ঞান-দর্শনে মানুষ গঠিত হতে পারে না।

কিন্তু আমি তোমাকে কী বলছিলুম, সে কোথায় গেল ! আমি বলছিলেম, কোনো-একটা বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে তার আগাগোড়া তর্ক নাই হল। তার মীমাংসাই বা নাই হল। কেবল দুজনের মনের আঘাত-প্রতিঘাতে চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে বিবিধ ঢেউ তোলা, যাতে করে তাদের উপর নানা বর্ণের আলোছায়া খেলতে পারে, এই হলেই বেশ হয়। সাহিত্যে এরকম সুযোগ সর্বদা ঘটে না, সকলেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মত প্রকাশ করতেই ব্যস্ত— এইজন্যে অধিকাংশ মাসিক পত্র মৃত মতের মিউজিয়াম বললেই হয়। মত-সকল জীবিত অবস্থায় যেখানে নানা ভঙ্গিতে সঞ্চরণ করে সেখানে পাঠকদের প্রবেশলাভ দুর্লভ। অবশ্য, সেখানে কেবল গতি নৃত্য এবং আভাস দেখা যায় মাত্র, জিনিসটাকে সম্পূর্ণ হাতে তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায় না, কিন্তু তাতে যে একরকমের জ্ঞান এবং সুখ পাওয়া যায় এমন অন্য কিছুতে পাবার সুবিধে নেই।

ফাল্গুন ১২৯৮

২

তুমি আমাকে খানিকটা ভুল বুঝেছ সন্দেহ নেই। আমিও বোধ করি কিঞ্চিৎ ঢিলে রকমে ভাব প্রকাশ করেছিলুম। কিন্তু সেজন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই। কারণ, ভুল না বুঝলে অনেক সময় এক কথায় সমস্ত শেষ হয়ে যায়, অনেক কথা বলবার অবসর পাওয়া যায় না। খাবার জিনিস মুখে দেবামাত্র মিলিয়ে গেলে যেমন তার সম্পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করা যায় না তেমনি ভুল না বুঝলে, শোনবামাত্র অবাধে মতের ঐক্য হলে, কথাটা এক দমে উদরস্থ হয়ে যায়— র'য়ে ব'সে তার সমস্তটার পুরো আস্বাদ পাওয়া যায় না।

তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, সে যে তোমার দোষ তা আমি বলতে চাই নে। আপনার ঠিক মতটি নির্ভুল করে ব্যক্ত করা ভারি শক্ত। এক মানুষের মধ্যে যেন দুটো মনুষ্য আছে, ভাবুক এবং লেখক। যে লোকটা ভাবে সেই লোকটাই যে সব সময় লেখে তা ঠিক মনে হয় না। লেখক-মনুষ্যটি ভাবুক-মনুষ্যটির প্রাইভেট সেক্রেটারি। তিনি অনেক সময় অনবধানতা কিংবা অক্ষমতা -বশত ভাবুকের ঠিক ভাবটি প্রকাশ করেন না। আমি মনে করছি আমার যেটি বক্তব্য আমি সেটি ঠিক লিখে যাচ্ছি এবং সকলের কাছেই সেটা পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠছে, কিন্তু আমার লেখনী যে কখন পাশের রাস্তায় চলে গেছেন আমি হয়তো তা জানতেও পারি নি।

কিন্তু তার ভুলের জন্যে আমিই দায়ী ; তার উপরে দোষারোপ করে আমি নিষ্কৃতি পেতে পারি নে। এইজন্যে অনেক সময়ে দায়ে পড়ে তার পক্ষ সমর্থন করতে হয়। যেটা ঠিক আমার মত নয় সেইটেকেই আমার মত বলে ধরে নিয়ে প্রাণপণে লড়াই করে যেতে হয়। কারণ, আমার নিজের মধ্যে যে-একটা গৃহবিচ্ছেদ আছে সেটা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে না।

সাহিত্য যে কেবল লেখকের আত্মপ্রকাশ, আমার চিঠিতে যদি এই কথা বেরিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে অগত্যা যতক্ষণ পারা যায় তার হয়ে লড়তে হবে এবং সে কথাটার মধ্যে যতটুকু সত্য আছে তা

সমস্তটা আদায় করে নিয়ে তার পরে তাকে ইক্ষুর চর্বিত অংশের মতো ফেলে দিলে কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা যেভাবে চলেছি তাতে তাড়াতাড়ি একটা কথা সংশোধন করবার কোনো দরকার দেখি নে।

তুমি বলেছ, সাহিত্য যদি লেখকের আত্মপ্রকাশই হবে, তবে শেক্স্পীয়রের নাটককে কী বলবে। সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া অসম্ভব, অতএব একটু খোলসা করে বলি।

আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষা এই দুই নিয়ম জীবজগতে কার্য করে। এক হিসাবে দুটোকেই এক নাম দেওয়া যেতে পারে। কারণ, বংশরক্ষা প্রকৃতপক্ষে বৃহৎভাবে ব্যাপকভাবে সুদূরভাবে আত্মরক্ষা। সাহিত্যের কার্যকে তেমনি দুই অংশে ভাগ করা যেতে পারে। আত্মপ্রকাশ এবং বংশপ্রকাশ। গীতিকাব্যকে আত্মপ্রকাশ এবং নাট্যকাব্যকে বংশপ্রকাশ নাম দেওয়া যাক।

আত্মপ্রকাশ বলতে কী বোঝায় তার আর বাহুল্য বর্ণনার আবশ্যক নেই। কিন্তু বংশপ্রকাশ কথাটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক।

লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি আছে এবং লেখকের বাহিরে সমাজে একটি মানবপ্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রীতিসূত্রে এবং নিগূঢ় ক্ষমতা বলে এই উভয়ের সম্মিলন হয় ; এই সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নূতন নূতন প্রজা জন্মগ্রহণ করে। সেই-সকল প্রজার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি দুইই সম্বদ্ধ হয়ে আছে, নইলে কখনোই জীবন্ত সৃষ্টি হতে পারে না। কালিদাসের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা এবং মহাভারতকারের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা এক নয়, তার প্রধান কারণ কালিদাস এবং বেদব্যাস এক লোক নন, উভয়ের অন্তরপ্রকৃতি ঠিক এক ছাঁচের নয় ; সেইজন্য তাঁরা আপন অন্তরের ও বাহিরের মানবপ্রকৃতি থেকে যে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা গঠিত করেছেন তাদের আকারপ্রকার ভিন্ন রকমের হয়েছে। তাই বলে বলা যায় না যে, কালিদাসের দুষ্মন্ত অবিকল কালিদাসের প্রতিকৃতি ; কিন্তু তবু এ কথা বলতেই হবে তার মধ্যে কালিদাসের অংশ আছে, নইলে সে অন্যরূপ হত। তেমনি শেক্স্পীয়রের অনেকগুলি সাহিত্যসন্তানের এক-একটি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে বলে যে তাদের মধ্যে শেক্স্পীয়রের আত্মপ্রকৃতির কোনো অংশ নেই তা আমি স্বীকার করতে পারি নে। সে-রকম প্রমাণ অবলম্বন করতে গেলে পৃথিবীর অধিকাংশ ছেলেকেই পিতৃ-অংশ হতে বিচ্যুত হতে হয়। ভালো নাট্যকাব্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি এমনি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য রক্ষা করে মিলিত হয় যে উভয়কে স্বতন্ত্র করা দুঃসাধ্য।

অন্তরে বাহিরে এইরকম একীকরণ না করতে পারলে কেবলমাত্র বহুদর্শিতা এবং সূক্ষ্ম বিচারশক্তি -বলে কেবল রস্‌ফুকো প্রভৃতির ন্যায় মানবচরিত্র ও লোকসংসার সম্বন্ধে পাকা প্রবন্ধ লিখতে পারা যায়। কিন্তু শেক্স্পীয়র তাঁর নাটকের পাত্রগণকে নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, অন্তরের নাড়ীর মধ্যে প্রবাহিত প্রতিভার মাতৃরস পান করিয়েছিলেন, তবেই তারা মানুষ হয়ে উঠেছিল ; নইলে তারা কেবলমাত্র প্রবন্ধ হত। অতএব এক হিসাবে শেক্স্পীয়রের রচনাও আত্মপ্রকাশ কিন্তু খুব সম্মিশ্রিত বৃহৎ এবং বিচিত্র।

সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মানবজীবনের সম্পর্ক। মানুষের মানসিক জীবনটা কোন্‌খানে ? যেখানে আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয়, বাসনা এবং অভিজ্ঞতা সবগুলি গলে গিয়ে মিশে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ঐক্যলাভ করেছে। যেখানে আমাদের বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিতভাবে কাজ করে। এক কথায়, যেখানে আদত মানুষটি আছে। সেইখানেই সাহিত্যের জন্মলাভ হয়। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ পায়। সেই খণ্ড অংশগুলি বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি রচনা করে। পর্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে, এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।

গেটে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে বই লিখেছেন। তাতে উদ্ভিদ্‌রহস্য প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু গেটের কিছুই প্রকাশ পায় নি অথবা সামান্য এক অংশ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গেটে যে-সমস্ত সাহিত্য রচনা করেছেন তার মধ্যে মূল মানবটি প্রকাশ পেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক গেটের অংশও অলক্ষিত মিশ্রিত ভাবে তার মধ্যে আছে। যিনি যাই বলুন শেক্স্পীয়রের কাব্যের কেন্দ্রস্থলেও একটি অমূর্ত ভাবশরীরী

শেক্‌স্‌পীয়রকে পাওয়া যায় যেখান থেকে তাঁর জীবনের সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস বিরাগ অনুরাগ বিশ্বাস অভিজ্ঞতা সহজ জ্যোতির মতো চতুর্দিকে বিচিত্র শিখায় বিবিধ বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে ; যেখান থেকে ইয়াগোর প্রতি বিদ্বেষ, ওথেলোর প্রতি অনুকম্পা, ডেস্‌ডিমোনার প্রতি প্রীতি, ফল্‌স্টাফের প্রতি সকৌতুক সখ্য, লিয়ারের প্রতি সসম্ভ্রম করুণা, কর্ডেলিয়ার প্রতি সুগভীর স্নেহ শেক্‌স্‌পীয়রের মানবহৃদয়কে চিরদিনের জন্য ব্যক্ত ও বিকীর্ণ করছে।

সাহিত্যের সত্য কাকে বলা যেতে পারে এইবার সেটা বলবার অবসর হয়েছে।

লেখাপড়া দেখাশোনা কথাবার্তা ভাবাচিন্তা সবসুদ্ধ জড়িয়ে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সমগ্র জীবন দিয়ে নিজের সম্বন্ধে, পরের সম্বন্ধে, জগতের সম্বন্ধে একটা মোট সত্য পাই। সেইটেই আমাদের জীবনের মূল সুর। সমস্ত জগতের বিচিত্র সুরকে আমরা সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিই, এবং আমাদের সমস্ত জীবনসংগীতকে সেই সুরের সঙ্গে বাঁধি। সেই মূলতত্ত্ব অনুসারে আমরা সংসারে বিরক্ত অথবা অনুরক্ত, স্বদেশবদ্ধ অথবা সার্বভৌমিক,পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক, কর্মপ্রিয় অথবা চিন্তাপ্রিয়। আমার জীবনের সেই মূলতত্ত্বটি, জগতের সমস্ত সত্য আমার জীবনের মধ্যে সেই-যে একটি জীবন্ত ব্যক্তিগত পরিণতি লাভ করেছে, সেইটি আমার রচনার মধ্যে প্রকাশ্যে অথবা অলক্ষিতভাবে আত্মা-স্বরূপে বিরাজ করবেই। আমি গীতিকাব্যই লিখি আর যাই লিখি কেবল তাতে যে আমার ক্ষণিক মনোভাবের প্রকাশ হয় তা নয়, আমার মর্মসত্যটিও তার মধ্যে আপনার ছাপ দেয়। মানুষের জীবনকেন্দ্রগত এই মূলসত্য সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে নানা আকারে প্রতিষ্ঠিত করে ; এইজন্যে একেই সাহিত্যের সত্য বলা যেতে পারে, জ্যামিতির সত্য কখনো সাহিত্যের সত্য হতে পারে না। এই সত্যটি বৃহৎ হলে পাঠকের স্থায়ী এবং গভীর তৃপ্তি হয়, এই সত্যটি সংকীর্ণ হলে পাঠকের বিরক্তি জন্মে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলতে পারি, ফরাসি কবি গোতিয়ে রচিত 'মাদ্‌মোয়াজেল্‌ দ্য মোপ্যাঁ' পড়ে (বলা উচিত আমি ইংরাজি অনুবাদ পড়েছিলুম) আমার মনে হয়েছিল, গ্রন্থটির রচনা যেমনই হোক তার মূলতত্ত্বটি জগতের যে অংশকে সীমাবদ্ধ করেছে সেইটুকুর মধ্যে আমরা বাঁচতে পারি নে। গ্রন্থের মূল-ভাবটা হচ্ছে, একজন যুবক হৃদয়কে দূরে রেখে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেশদেশান্তরে সৌন্দর্যের সন্ধান করে ফিরছে। সৌন্দর্য যেন প্রস্ফুটিত জগৎ-শতদলের উপর লক্ষ্মীর মতো বিরাজ করছে না, সৌন্দর্য যেন মণিমুক্তার মতো কেবল অন্ধকার খনিগহ্বরে ও অগাধ সমুদ্র-তলে প্রচ্ছন্ন ; যেন তা গোপনে আহরণ করে আপনার ক্ষুদ্র সম্পত্তির মতো কৃপণের সংকীর্ণ সিন্ধুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবার জিনিস। এইজন্য এই গ্রন্থের মধ্যে হৃদয় অধিকক্ষণ বাস করতে পারে না— রুদ্ধশ্বাস হয়ে তাড়াতাড়ি উপরে বেরিয়ে এসে যখন আমাদের প্রতিদিনের শ্যামল তৃণক্ষেত্র, প্রতিদিনের সূর্যালোক, প্রতিদিনের হাসিমুখগুলি দেখতে পাই তখনই বুঝতে পারি সৌন্দর্য এই তো আমাদের চারি দিকে, সৌন্দর্য এই তো আমাদের প্রতিদিনের ভালোবাসার মধ্যে। এই বিশ্বব্যাপী সত্যকে সংকীর্ণ করে আনাতে পূর্বোক্ত ফরাসী গ্রন্থে সাহিত্যশিল্পের প্রাচুর্য-সত্ত্বেও সাহিত্য-সত্যের স্বল্পতা হয়েছে বলা যেতে পারে। মাদ্‌মোয়াজেল দ্য মোপ্যাঁ এবং গোতিয়ে সম্বন্ধে আমার সমালোচনা ভ্রমাত্মক হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে, কিন্তু এই দৃষ্টান্তদ্বারা আমার কথাটা কতকটা পরিষ্কার করা গেল। শেলি বলো, কীট্‌স্‌ বলো, টেনিসন বলো, সকলের লেখাতেই রচনার ভালো-মন্দর মধ্যেও একটা মর্মগত মূল-জিনিস আছে— তারই উপর ঐ-সকল কবিতার ধ্রুবত্ব ও মহত্ত্ব নির্ভর করে। সেই জিনিসটাই ঐ-সকল কবিতার সত্য। সেটাকে যে আমরা সকল সময়ে কবিতা বিশ্লেষণ করে সমগ্র বের করতে পারি তা নয়, কিন্তু তার শাসন আমরা বেশ অনুভব করতে পারি।

গোতিয়ের সহিত ওআর্ডস্‌ওআর্থের তুলনা করা যেতে পারে। ওআর্ডস্‌ওআর্থের কবিতার মধ্যে যে সৌন্দর্যসত্য প্রকাশিত হয়েছে তা পূর্বোক্ত ফরাসিস সৌন্দর্যসত্য অপেক্ষা বিস্তৃত। তাঁর কাছে পুষ্পপল্লব নদীনির্ঝর পর্বতপ্রান্তর সর্বত্রই নব নব সৌন্দর্য উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছে। কেবল তাই নয়— তার মধ্যে তিনি একটা আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখতে পাচ্ছেন, তাতে করে সৌন্দর্য অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গভীরতা লাভ করেছে। তার ফল এই যে, এরকম কবিতায় পাঠকের শ্রান্তি তৃপ্তি বিরক্তি নেই ;

ওআর্ডস্‌ওআর্থের কবিতার মধ্যে সৌন্দর্যের এই বৃহৎ সত্যটুকু থাকাতেই তার এত গৌরব এবং স্থায়িত্ব।

বৃহৎ সত্য কেন বলছি, অর্থাৎ বৃহৎই বা কেন বলি, সত্যই বা কেন বলি, তা আর-একটু পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করি। পরিষ্কার হবে কি না বলতে পারি না, কিন্তু যতটা বক্তব্য আছে এই সুযোগে সমস্তটা বলে রাখা ভালো।

একটি পুষ্পের মধ্যে আমাদের হৃদয়ের প্রবেশ করবার একটিমাত্র পথ আছে, তার বাহ্য সৌন্দর্য। ফুল চিন্তা করে না, ভালোবাসে না, ফুলের সুখদুঃখ নেই, সে কেবল সুন্দর আকৃতি নিয়ে ফোটে। এইজন্য সাধারণত ফুলের সঙ্গে মানুষের আর-কোনো সম্পর্ক নেই, কেবল আমরা ইন্দ্রিয়যোগে তার সৌন্দর্যটুকু উপলব্ধি করতে পারি মাত্র। এইজন্য সচরাচর ফুলের মধ্যে আমাদের সমগ্র মনুষ্যত্বের পরিতৃপ্তি নেই, তাতে কেবল আমাদের আংশিক আনন্দ ; কিন্তু কবি যখন এই ফুলকে কেবলমাত্র জড় সৌন্দর্য ভাবে না দেখে এর মধ্যে মানুষের মনোভাব আরোপ করে দেখিয়েছেন তখন তিনি আমাদের আনন্দকে আরো বৃহত্তর গাঢ়তর করে দিয়েছেন।

এ কথা একটা চিরসত্য যে, যাদের কল্পনাশক্তি আছে তারা সৌন্দর্যকে নির্জীব ভাবে দেখতে পারে না। তারা অনুভব করে যে, সৌন্দর্য যদিও বস্তুকে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়, কিন্তু তা যেন বস্তুর অতীত, তার মধ্যে যেন একটা মনের ধর্ম আছে। এইজন্য মনে হয় সৌন্দর্যে যেন একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা আনন্দ, একটা আত্মা আছে। ফুলের আত্মা যেন সৌন্দর্যে বিকশিত প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, জগতের আত্মা যেন অপার বহিঃসৌন্দর্যে আপনাকে প্রকাশ করে। অন্তরের অসীমতা যেখানে বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করতে পেরেছে সেইখানেই যেন সৌন্দর্য ; সেই প্রকাশ যেখানে যত অসম্পূর্ণ সেইখানে তত সৌন্দর্যের অভাব, রূঢ়তা, জড়তা, চেষ্টা, দ্বিধা ও সর্বাঙ্গীণ অসামঞ্জস্য। সে যাই হোক, সামান্যত ফুলের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ আত্মপরিতৃপ্তি জন্মে না। এইজন্য কেবল ফুলের বর্ণনামাত্র সাহিত্যে সর্বোচ্চ সমাদর পেতে পারে না। আমরা যে কবিতায় একত্রে যত অধিক চিত্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ করি তাকে ততই উচ্চ শ্রেণীর কবিতা বলে সম্মান করি। সাধারণত যে জিনিসে আমাদের একটিমাত্র বা অল্পসংখ্যক চিত্তবৃত্তির তৃপ্তি হয় কবি যদি তাকে এমনভাবে দাঁড় করাতে পারেন যাতে তার দ্বারা আমাদের অধিকসংখ্যক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয় তবে কবি আমাদের আনন্দের একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করে দিলেন ব'লে তাঁকে সাধুবাদ দিই। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে আত্মার সৌন্দর্য সংযোগ করে দিয়ে কবি ওআর্ডস্‌ওআর্থ্‌ এই কারণে আমাদের নিকট এত সম্মানাস্পদ হয়েছেন। ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থ্‌ যদি সমস্ত জগৎকে অন্ধ যন্ত্রের ভাবে মনে করে কাব্য লিখতেন, তা হলে তিনি যেমনই ভালো ভাষায় লিখুন-না কেন, সাধারণ মানবহৃদয়কে বহুকালের জন্যে আকর্ষণ করে রেখে দিতে পারতেন না। জগৎ জড় যন্ত্র কিংবা আধ্যাত্মিক বিকাশ এ দুটো মতের মধ্যে কোন্‌টা সত্য সাহিত্য তা নিয়ে তর্ক করে না ; কিন্তু এই দুটো ভাবের মধ্যে কোন্‌ ভাবে মানুষের স্থায়ী এবং গভীর আনন্দ সেই সত্যটুকুই কবির সত্য, কাব্যের সত্য।

কিন্তু, যতদূর মনে পড়ে, আমার প্রথম পত্রে এ সত্য সম্বন্ধে আমি কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নি। কী বলেছি মনে নেই, কিন্তু যা বলতে চেয়েছিলুম তা হচ্ছে এই যে, যদি কোনো দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সত্যকে সাহিত্যের অন্তর্গত করতে চাই তবে তাকে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা আমাদের সন্দেহ-বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত করে আমাদের মানসিক প্রাণপদার্থের মধ্যে নিহিত করে দিতে হবে ; নইলে যতক্ষণ তাকে স্বপ্রকাশ সত্যের আকারে দেখাই ততক্ষণ তার অন্য নাম। যেমন নাইট্রোজেন তার আদিম আকারে বাষ্প, উদ্ভিদ অথবা জন্তুশরীরে রূপান্তরিত হলে তবেই সে আমাদের খাদ্য ; তেমনি সত্য যখন মানবজীবনের সঙ্গে মিশে যায় তখনই সাহিত্যে ব্যক্ত হতে পারে।

কিন্তু আমি যদি বলে থাকি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যের উপযোগিতা নেই তবে সেটা অত্যুক্তি। আমার বলবার অভিপ্রায় এই যে, সাহিত্যের উপযোগিতা সব চেয়ে বেশি। বসন না হলেও চলে (অবশ্য লোকে অসভ্য বলবে,) কিন্তু অশন না হলে চলে না। হার্বার্ট্‌ স্পেন্‌সর উল্টো বলেন। তিনি

বলেন সাহিত্য বসন এবং বিজ্ঞান অশন।

বিজ্ঞানশিক্ষা আমাদের প্রাণরক্ষা এবং জীবনযাত্রার অনেক সাহায্য করে স্বীকার করি, কিন্তু সে সাহায্য আমরা পরের কাছ থেকে নিতে পারি। ডাক্তারের কাছ থেকে স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ, কেমিস্টের কাছ থেকে ওষুধপত্র, যান্ত্রিকের কাছ থেকে যন্ত্র আমরা মূল্য দিয়ে নিতে পারি। কিন্তু সাহিত্য থেকে যা পাওয়া যায় তা আর-কারও কাছ থেকে ধার করে কিংবা কিনে নিতে পারি নে। সেটা আমাদের সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে আকর্ষণ করে নিতে হয়, সেটা আমাদের সমস্ত মনুষ্যত্বের পুষ্টিসাধন করে। আমাদের চতুর্দিগ্‌বর্তী মনুষ্যসমাজ তার সমগ্র উত্তাপ প্রয়োগ করে আমাদের প্রত্যেককে প্রতিক্ষণে ফুটিয়ে তুলছে, কিন্তু এই মানবসমাজের বিচিত্র জটিল ক্রিয়া আমরা হিসাব করে পরিষ্কার জমাখরচের মধ্যে ধরে নিতে পারি নে ; অথচ একজন ডাক্তার আমার যে উপকারটা করে তা খুব স্পষ্ট ধারণাগম্য। এইজন্যে হঠাৎ মনে হতে পারে, মনুষ্যসমাজ আমাদের বিশেষ কিছু করে না, ডাক্তার তার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করে। কিন্তু সমাজের অন্যান্য সহস্র উপকার ছেড়ে দিয়ে ; কেবলমাত্র তার সান্নিধ্য, মনুষ্য-সাধারণের একটা আকর্ষণ, চারি দিকের হাসিকান্না ভালোবাসা বাক্যালাপ না পেলে আমরা যে মানুষ হতে পারতুম না সেটা আমরা ভুলে যাই। আমরা ভুলে যাই সমাজ নানারকম দুষ্পাচ্য কঠিন আহারকে পরিপাক করে সেটাকে জীবনরসে পরিণত করে আমাদের প্রতিনিয়ত পান করাচ্ছে। সাহিত্য সেইরকম মানসিক সমাজ। সাহিত্যের মধ্যে মানুষের হাসিকান্না, ভালোবাসা, বৃহৎ মনুষ্যের সংসর্গ এবং উত্তাপ, বহুজীবনের অভিজ্ঞতা, বহুবর্ষের স্মৃতি, সবসুদ্ধ মানুষের একটা ঘনিষ্ঠতা, পাওয়া যায়। সেইটেতে বিশেষ কী উপকার করে পরিষ্কার করে বলা শক্ত ; এই পর্যন্ত বলা যায়, আমাদের সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বকে পরিস্ফুট করে তোলে।

প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়া প্রথম দরকার। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের যে লক্ষ লক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে, যার দ্বারা প্রতিনিয়ত আমরা শিকড়ের মতো বিচিত্র রসাকর্ষণ করছি, সেইগুলোর জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তোলা, তার নূতন নূতন ক্ষমতা আবিষ্কার করা, চিরস্থায়ী মনুষ্যত্বের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ-সাধন করে ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ করে তোলা— সাহিত্য এমনি করে আমাদের মানুষ করছে। সাহিত্যের শিক্ষাতেই আমরা আপনাকে মানুষের এবং মানুষকে আপনার বলে অনুভব করছি। তার পরে আমরা ডাক্তারি শিখে মানুষের চিকিৎসা করি, বিজ্ঞান শিখে মানুষের মধ্যে জ্ঞান প্রচার করতে প্রাণপণ করি। গোড়ায় যদি আমরা মানুষকে ভালোবাসতে না শিখতুম তা হলে সত্যকে তেমন ভালোবাসতে পারতুম কি না সন্দেহ। অতএব সাহিত্য যে সব-গোড়াকার শিক্ষা এবং সাহিত্য যে চিরকালের শিক্ষা আমার তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।

এই তো গেল মোট কথাটা। ইংরিজি ম্যাগাজিন সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ সে কথা ঠিক। তাদের নিতান্ত দরকারি কথা এত বেশি বেড়ে গেছে যে রসালাপের আর বড়ো সময় নেই। বিশেষত সাময়িক পত্রে সাময়িক জীবনের সমালোচনাই যুক্তিসংগত ; চিরস্থায়ী সাহিত্যকে ওরকম একটা পত্রিকার প্রবাহের মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া ঠিক শোভা পায় কি না বলা শক্ত।

কিন্তু বড়ো লেখা যে বড়ো বেশি বাড়ছে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। আজকাল ইংরিজিতে বেশ একটু আঁটসাঁট ছিপ্‌ছিপে লেখা দেখলে আশ্চর্য বোধ হয়। ওরা বোধ হয় সময় পায় না। কাজের অতিরিক্ত প্রাচুর্যে ওদের সাহিত্য যেন অপরিচ্ছন্ন মোটাসোটা ঢিলেঢালা প্রৌঢ়া গিন্নির মতো আকার ধারণ করেছে। হৃদয়ের গাঢ়তা আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে সৌন্দর্যের হ্রাস এবং বলের শৈথিল্য প্রকাশ পায়। যত বয়স বাড়ছে ওরা ততই যেন ওদের আদিম জর্মানিক প্রকৃতির দিকে ঝুঁকছে। আমার একটা অন্ধ সংস্কার আছে যে, সত্যকে যে অবস্থায় যতদূর পাওয়া সম্ভব তাকে তার চেয়ে ঢের বেশি পাবার চেষ্টা করে জর্মানেরা তার চার দিকে বিস্তর মিথ্যা স্তূপাকার করে তোলে। ইংরাজেরও হয়তো সে রোগের কিঞ্চিৎ অংশ আছে। বলা বাহুল্য, এটা আমার একটা প্রাইভেট প্রগল্‌ভতা মাত্র, গম্ভীরভাবে প্রতিবাদযোগ্য নয়।

বৈশাখ ১২৯৯

৩

একটিমাত্র গাছকে প্রকৃতি বলা যায় না। তেমনি কোনো একটিমাত্র বর্ণনাকে যদি সাহিত্য বলে ধর তা হলে আমার কথাটা বোঝানো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বর্ণনা সাহিত্যের অন্তর্গত সন্দেহ নেই, কিন্তু তার দ্বারা সাহিত্যকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। একটিমাত্র সূর্যাস্তবর্ণনার মধ্যে লেখকের জীবনাংশ এত অল্প থাকতে পারে যে, হয়তো সেটুকু বোধগম্য হওয়া দুরূহ। কিন্তু উপরি-উপরি অনেকগুলি বর্ণনা দেখলে লেখকের মর্মগত ভাবটুকু আমরা ধরতে পারতুম। আমরা বুঝতে পারতুম লেখক বাহ্যপ্রকৃতির মধ্যে একটা আত্মার সংস্রব দেখেন কি না; প্রকৃতিকে তিনি মানবসংসারের চারিপার্শ্ববর্তী দেয়ালের ছবির মতো দেখেন না মানবসংসারকে এই প্রকাণ্ড রহস্যময়ী প্রকৃতির একান্তবর্তীস্বরূপ দেখেন— কিংবা মানবের সহিত প্রকৃতি মিলিত হয়ে, প্রাত্যহিক সহস্র নিকটসম্পর্কে বদ্ধ হয়ে, তাঁর সম্মুখে একটি বিশ্বব্যাপী গার্হস্থ্য দৃশ্য উপস্থিত করে।

সেই তত্ত্বটুকুকে জানানোই যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য তা নয়, কিন্তু সে অলক্ষিত ভাবে আমাদের মনের উপর কার্য করে— কখনো বেশি সুখ দেয়, কখনো অল্প সুখ দেয়; কখনো মনের মধ্যে একটা বৃহৎবৈরাগ্যের আভাস আনে, কখনো-বা অনুরাগের প্রগাঢ় আনন্দ উদ্রেক করে। সন্ধ্যার বর্ণনায় কেবল যে সূর্যাস্তের আভা পড়ে তা নয়, তার সঙ্গে লেখকের মানবহৃদয়ের আভা কখনো ম্লান শ্রান্তির ভাবে কখনো গভীর শান্তির ভাবে স্পষ্টত অথবা অস্পষ্টত মিশ্রিত থাকে এবং সেই আমাদের হৃদয়কে অনুরূপ ভাবে রঞ্জিত করে তোলে। নতুবা, তুমি যেরকম বর্ণনার কথা বলেছ সেরকম বর্ণনা ভাষায় অসম্ভব। ভাষা কখনোই রেখাবর্ণময় চিত্রের মতো অমিশ্র অবিকল প্রতিরূপ আমাদের সম্মুখে আনয়ন করতে পারে না।

বলা বাহুল্য, যেমন-তেমন লেখকের যেমন-তেমন বিশেষত্বই যে আমরা প্রার্থনীয় জ্ঞান করি তা নয়। মনে করো, পথ দিয়ে মস্ত একটা উৎসবের যাত্রা চলেছে। আমার এক বন্ধুর বারান্দা থেকে তার একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ দেখতে পাই, আর-এক বন্ধুর বারান্দা থেকে বৃহৎ অংশ এবং প্রধান অংশ দেখতে পাই— আর-এক বন্ধু আছেন তাঁর দোতলায় উঠে যেদিক থেকেই দেখতে চেষ্টা করি কেবল তাঁর নিজের বারান্দাটুকুই দেখি। প্রত্যেক লোক আপন আপন বিশেষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে জগতের এক-একটা দৃশ্য দেখছে— কেউ-বা বৃহৎ ভাবে দেখছে, কেউ-বা কেবল আপনাকেই দেখছে। যে আপনাকে ছাড়া আর-কিছুই দেখাতে পারে না সাহিত্যের পক্ষে সে বাতায়নহীন অন্ধকার কারাগার মাত্র।

কিন্তু এ উপমায় আমার কথাটা পুরো বলা হল না এবং ঠিকটি বলা হল না। আমার প্রধান কথাটা এই— সাহিত্যের জগৎ মানেই হচ্ছে মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশ্রিত জগৎ। সূর্যাস্তকে তিনরকম ভাবে দেখা যাক। বিজ্ঞানের সূর্যাস্ত, চিত্রের সূর্যাস্ত এবং সাহিত্যের সূর্যাস্ত। বিজ্ঞানের সূর্যাস্ত হচ্ছে নিছক সূর্যাস্ত ঘটনাটি; চিত্রের সূর্যাস্ত হচ্ছে কেবল সূর্যের অন্তর্ধানমাত্র নয়, জল স্থল আকাশ মেঘের সঙ্গে মিশ্রিত করে সূর্যাস্ত দেখা; সাহিত্যের সূর্যাস্ত হচ্ছে সেই জল স্থল আকাশ মেঘের মধ্যবর্তী সূর্যাস্তকে মানুষের জীবনের উপর প্রতিফলিত করে দেখা— কেবলমাত্র সূর্যাস্তের ফোটোগ্রাফ তোলা নয়, আমাদের মর্মের সঙ্গে তাকে মিশ্রিত করে প্রকাশ। যেমন, সমুদ্রের জলের উপর সন্ধ্যাকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে একটা অপরূপ সৌন্দর্যের উদ্ভব হয়, আকাশের উজ্জ্বল ছায়া জলের স্বচ্ছ তরলতার যোগে একটা নূতন ধর্মপ্রাপ্ত হয়, তেমনি জগতের প্রতিবিম্ব মানবের জীবনের মধ্যে পতিত হয়ে সেখান থেকে প্রাণ ও হৃদয়বৃত্তি লাভ করে। আমরা প্রকৃতিকে আমাদের নিজের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা দান করে একটা নূতন কাণ্ড করে তুলি; অভ্রভেদী জগৎসৌন্দর্যের মধ্যে একটা অমর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি— এবং তখনই সে সাহিত্যের উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃতিক দৃশ্যে দেখা যায়, সূর্যোদয় সূর্যাস্ত সর্বত্র সমান বৈচিত্র্য ও বিকাশ লাভ করে না। বাঁশতলার পানাপুকুর সকলপ্রকার আলোকে কেবল নিজেকেই প্রকাশ করে, তাও পরিষ্কাররূপে নয়,

নিতান্ত জটিল আবিল অপরিচ্ছন্নভাবে ; তার এমন স্বচ্ছতা এমন উদারতা নেই যে, সমস্ত প্রভাতের আকাশকে সে আপনার মধ্যে নূতন ও নির্মল করে দেখাতে পারে। সুইজরল্যাণ্ডের শৈলসরোবর সম্বন্ধে আমার চেয়ে তোমার অভিজ্ঞতা বেশি আছে, অতএব তুমিই বলতে পার সেখানকার উদয়াস্ত কিরকম অনির্বচনীয়শোভাময়। মানুষের মধ্যেও সেইরকম আছে। বড়ো বড়ো লেখকেরা নিজের উদারতা-অনুসারে সকল জিনিসকে এমন করে প্রতিবিম্বিত করতে পারে যে, তার কতখানি নিজের কতখানি বাহিরের, কতখানি বিম্বের কতখানি প্রতিবিম্বের নির্দিষ্টরূপে প্রভেদ করে দেখানো কঠিন হয়। কিন্তু সংকীর্ণ কূনো কল্পনা যাকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করুক-না কেন, নিজের বিশেষ আকৃতিটাকেই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

অতএব লেখকের জীবনের মূলতত্ত্বটি যতই ব্যাপক হবে, মানবসমাজ এবং প্রকৃতির প্রকাণ্ড রহস্যকে যতই সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্তে টুকরো টুকরো করে না ভেঙে ফেলবে, আপনার জীবনের দশ দিক উন্মুক্ত করে নিখিলের সমগ্রতাকে আপনার অন্তরের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে একটি বৃহৎ চেতনার সৃষ্টি করবে, ততই তার সাহিত্যের প্রকাণ্ড পরিধির মধ্যে তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। সেইজন্যে মহৎ রচনার মধ্যে একটি বিশেষ মত একটি ক্ষুদ্র ঐক্য খুঁজে বার করা দায় ; আমরা ক্ষুদ্র সমালোচকেরা নিজের ঘর-গড়া মত দিয়ে যদি তাকে ঘিরতে চেষ্টা করি তা হলে পদে পদে তার মধ্যে স্বতোবিরোধ বেধে যায়। কিন্তু একটা অত্যন্ত দুর্গম কেন্দ্রস্থানে তার একটা বৃহৎ মীমাংসা বিরাজ করছে, সেটি হচ্ছে লেখকের মর্মস্থান— অধিকাংশ স্থলেই লেখকের নিজের পক্ষেও সেটি অনাবিষ্কৃত রাজ্য। শেক্‌স্‌পীয়রের লেখার ভিতর থেকে তাঁর একটা বিশেষত্ব খুঁজে বার করা কঠিন এইজন্যে যে, তাঁর সেটা অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষত্ব। তিনি জীবনের যে মূলতত্ত্বটি আপনার অন্তরের মধ্যে সৃজন করে তুলেছেন তাকে দুটি-চারটি সুসংলগ্ন মতপাশ দিয়ে বদ্ধ করা যায় না। এইজন্যে ভ্রম হয় তাঁর রচনার মধ্যে যেন একটি রচয়িতৃ-ঐক্য নেই।

কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেইটে যে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা চাই আমি তা বলি নে ; কিন্তু সে যে অন্তঃপুরলক্ষ্মীর মতো অন্তরালে থেকে আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে সাহিত্যরস বিতরণ করবে তার আর সন্দেহ নেই।

যেমন করেই দেখি, আমরা মানুষকেই চাই, সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে। মানুষের সম্বন্ধে কাটাছেঁড়া তত্ত্ব চাই নে, মূল মানুষটিকেই চাই। তার হাসি চাই, তার কান্না চাই ; তার অনুরাগ বিরাগ আমাদের হৃদয়ের পক্ষে রৌদ্রবৃষ্টির মতো।

কিন্তু, এই হাসিকান্না অনুরাগ-বিরাগ কোথা থেকে উঠছে ? ফল্‌স্টাফ ও ডগবেরি থেকে আরম্ভ করে লিয়র ও হ্যামলেট পর্যন্ত শেক্‌স্‌পীয়র যে মানবলোক সৃষ্টি করেছেন সেখানে মনুষ্যত্বে চিরস্থায়ী হাসি-অশ্রুর গভীর উৎসগুলি কারও অগোচর নেই। একটা সোসাইটি নভেলের প্রাত্যহিক কথাবার্তা এবং খুচরো হাসিকান্নার চেয়ে আমরা শেক্‌স্‌পীয়রের মধ্যে বেশি সত্য অনুভব করি। যদিচ সোসাইটি নভেলে যা বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অবিকল অনুরূপ চিত্র। কিন্তু আমরা জানি আজকের সোসাইটি নভেল কাল মিথ্যা হয়ে যাবে, শেক্‌স্‌পীয়র কখনো মিথ্যা হবে না। অতএব একটা সোসাইটি নভেল যতই চিত্রবিচিত্র করে রচিত হোক, তার ভাষা এবং রচনাকৌশল যতই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হোক, শেকসপীয়রের একটা নিকৃষ্ট নাটকের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সোসাইটি নভেলে বর্ণিত প্রাত্যহিক সংসারের যথাযথ বর্ণনার অপেক্ষা শেকসপীয়রে বর্ণিত প্রতিদিনদুর্লভ প্রবল হৃদয়াবেগের বর্ণনাকে আমরা কেন বেশি সত্য মনে করি সেইটে স্থির হলে সাহিত্যের সত্য কাকে বলা যায় পরিষ্কার বোঝা যাবে।

শেক্‌স্‌পীয়রে আমরা চিরকালের মানুষ এবং আসল মানুষটিকে পাই, কেবল মুখের মানুষটি নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্যন্ত আলোড়িত করে শেক্‌স্‌পীয়র তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে অবারিত করে দিয়েছেন। তার অশ্রুজল চোখের প্রান্তে ঈষৎ বিগলিত হয়ে রুমালের প্রান্তে শুষ্ক হচ্ছে না, তার হাসি ওষ্ঠাধরকে ঈষৎ উদ্ভিন্ন করে কেবল মুক্তা-দন্তগুলিকে মাত্র বিকাশ করছে না— কিন্তু বিদীর্ণ

প্রকৃতির নির্ঝরের মতো অবাধে ঝরে আসছে, উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির ক্রীড়াশীল উৎসের মতো প্রমোদে ফেটে পড়ছে। তার মধ্যে একটা উচ্চ দর্শনশিখর আছে যেখান থেকে মানবপ্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

গোতিয়ের গ্রন্থ সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলুম সে হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত। গোতিয়ে যেখানে তাঁর রচনার মূল পত্তন করেছেন সেখান থেকে আমরা জগতের চিরস্থায়ী সত্য দেখতে পাই নে। যে সৌন্দর্য মানুষের ভালোবাসার মধ্যে চিরকাল বদ্ধমূল, যার শ্রান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, যে সৌন্দর্য ভালোবাসার লোকের মুখ থেকে প্রতিফলিত হয়ে জগতের অনন্ত গোপন সৌন্দর্যকে অবারিত করে দেয়, মানুষ চিরকাল যে সৌন্দর্যের কোলে মানুষ হয়ে উঠছে, তার মধ্যে আমাদের স্থাপন না করে তিনি আমাদের একটা ক্ষণিক মায়ামরীচিকার মধ্যে নিয়ে গেছেন ; সে মরীচিকা যতই সম্পূর্ণ ও সুনিপুণ হোক, ব্যাপক নয়, স্থায়ী নয়, এইজন্যই সত্য নয়। সত্য নয় ঠিক নয়, অল্প সত্য। অর্থাৎ সেটা একরকম বিশেষ প্রকৃতির বিশেষ লোকের বিশেষ অবস্থার পক্ষে সত্য, তার বাইরে তার আমল নেই। অতএব মনুষ্যত্বের যতটা বেশি অংশ অধিকার করতে পারবে সাহিত্যের সত্য ততটা বেশি বেড়ে যাবে।

কিন্তু অনেকে বলেন, সাহিত্যে কেবল একমাত্র সত্য আছে, সেটা হচ্ছে প্রকাশের সত্য। অর্থাৎ যেটি ব্যক্ত করতে চাই সেটি প্রকাশ করবার উপায়গুলি অযথা হলেই সেটা মিথ্যা হল এবং যথাযথ হলেই সত্য হল।

এক হিসাবে কথাটা ঠিক। প্রকাশটাই হচ্ছে সাহিত্যের প্রথম সত্য। কিন্তু ঐটেই কি শেষ সত্য ?

জীবরাজ্যের প্রথম সত্য হচ্ছে প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম্‌, কিন্তু শেষ সত্য মানুষ। প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম্‌ মানুষের মধ্যে আছে কিন্তু মানুষ প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম্‌'এর মধ্যে নেই। এখন, এক হিসাবে প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম্‌কে জীবের আদর্শ বলা যেতে পারে, এক হিসাবে মানুষকে জীবের আদর্শ বলা যায়।

সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশমাত্র, কিন্তু তার পরিণাম-সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ। ছেলেভুলানো ছড়া থেকে শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্যের উৎপত্তি। এখন আমরা আদিম আদর্শকে দিয়ে সাহিত্যের বিচার করি নে, পরিণাম-আদর্শ দিয়েই তার বিচার করি। এখন আমরা কেবল দেখি নে প্রকাশ পেলে কি না, দেখি কতখানি প্রকাশ পেলে। দেখি, যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, না ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির তৃপ্তি হয়, না ইন্দ্রিয় বুদ্ধি এবং হৃদয়ের তৃপ্তি হয়। সেই অনুসারে আমরা বলি— অমুক লেখায় বেশি অথবা অল্প সত্য আছে। কিন্তু এটা স্বীকার্য যে, প্রকাশ পাওয়াটা সাহিত্যমাত্রেরই প্রথম এবং প্রধান আবশ্যক। বরঞ্চ ভাবের গৌরব না থাকলেও সাহিত্য হয়, কিন্তু প্রকাশ না পেলে সাহিত্য হয় না। বরঞ্চ মুড়োগাছও গাছ, কিন্তু বীজ গাছ নয়।

আমার পূর্বপত্রে এ কথাটাকে বোধ হয় তেমন আমল দিই নি। তোমার প্রতিবাদেই আমার সমস্ত কথা ক্রমে একটা আকার ধারণ করে দেখা দিচ্ছে।

কিন্তু যতই আলোচনা করছি ততই অধিক অনুভব করছি যে, সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ। তাই তুমি যদি একটা টুকরো সাহিত্য তুলে নিয়ে বলো 'এর মধ্যে সমস্ত মানুষ কোথা', তবে আমি নিরুত্তর। কিন্তু সাহিত্যের অধিকার যতদূর আছে সবটা যদি আলোচনা করে দেখ তা হলে আমার সঙ্গে তোমার কোনো অনৈক্য হবে না। মানুষের প্রবাহ হু হু করে চলে যাচ্ছে ; তার সমস্ত সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর-কোথাও থাকছে না— কেবল সাহিত্যে থাকছে। সংগীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এইজন্যই সাহিত্যের এত আদর। এইজন্যই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার। এইজন্যই প্রত্যেক জাতি আপন আপন সাহিত্যকে এত বেশি অনুরাগ ও গর্বের সহিত রক্ষা করে।

আমার এক-একবার আশঙ্কা হচ্ছে তুমি আমার উপর চটে উঠবে, বলবে— লোকটাকে কিছুতেই তর্কের লক্ষ্যস্থলে আনা যায় না। আমি বাড়িয়ে-কমিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কেবল নিজের মতটাকে

নানারকম করে বলবার চেষ্টা করছি, প্রত্যেক পুনরুক্তিতে পূর্বের কথা কতকটা সম্মার্জন পরিবর্তন করে চলা যাচ্ছে— তাতে তর্কের লক্ষ্য স্থির রাখা তোমার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু তুমি পূর্ব হতেই জান, খণ্ড খণ্ড ভাবে তর্ক করা আমার কাজ নয়। সমস্ত মোট কথাটা গুছিয়ে না উঠতে পারলে আমি জোর পাই নে। মাঝে মাঝে সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় তুমি যেখানটা ছিন্ন করছ সেখানকার জীর্ণতা সেরে নিয়ে দ্বিতীয়বার আগাগোড়া ফেঁদে দাঁড়াতে হচ্ছে।— তার উপরে আবার উপমার জ্বালায় তুমি বোধ হয় অস্থির হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমার এ প্রাচীন রোগটিও তোমার জানা আছে। মনের কোনো একটা ভাব ব্যক্ত করবার ব্যাকুলতা জন্মালে আমার মন সেগুলোকে উপমার প্রতিমাকারে সাজিয়ে পাঠায়, অনেকটা বকাবকি বাঁচিয়ে দেয়। অক্ষরের পরিবর্তে হাইরোগ্লিফিক্‌স ব্যবহারের মতো। কিন্তু এরকম রচনাপ্রণালী অত্যন্ত বহুকেলে; মনের কথাকে সাক্ষাৎভাবে ব্যক্ত না করে প্রতিনিধিদ্বারা ব্যক্ত করা। এরকম করলে যুক্তিসংসারের আদানপ্রদান পরিষ্কাররূপে চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। যা হোক, আগে থাকতে দোষ স্বীকার করছি, তাতে যদি তোমার মনস্তুষ্টি হয়।

তুমি লিখেছ, আমার সঙ্গে এ তর্ক তুমি মোকাবিলায় চোকাতে চাও। তা হলে আমার পক্ষে ভারি মুশকিল। তা হলে কেবল টুকরো নিয়েই তর্ক হয়, মোট কথাটা আজ থেকে-মৃত্যুকাল পর্যন্ত তোমাকে বোঝাতে পারি নে। নিজের অধিকাংশ মতের সঙ্গে নিজের প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে না। তারা যদিচ আমার আচারে ব্যবহারে লেখায় নিজের কাজ নিজে করে যায়, কিন্তু আমি কি সকল সময়ে তাদের খোঁজ রাখি? এইজন্যে তর্ক উপস্থিত হলে বিনা নুটিসে অকস্মাৎ কাউকে ডাক দিয়ে সামনে তলব করতে পারি নে— নামও জানি নে, চেহারাও চিনি নে। লেখবার একটা সুবিধে এই যে, আপনার মতের সঙ্গে পরিচিত হবার একটা অবসর পাওয়া যায়; লেখার সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজের মতটাকে যেন স্পর্শদ্বারা অনুভব করে যাওয়া যায়— নিজের সঙ্গে নূতন পরিচয়ে প্রতি পদে একটা নূতন আনন্দ পাওয়া যায়, এবং সেই উৎসাহে লেখা এগোতে থাকে। সেই নূতন আনন্দের আবেগে লেখা অনেক সময় জীবন্ত ও সরস হয়। কিন্তু তার একটা অসুবিধাও আছে। কাঁচা পরিচয়ে পাকা কথা বলা যায় না। তেমন চেপে ধরলে ক্রমে কথার একটু-আধটু পরিবর্তন করতে হয়। চিঠিতে আস্তে আস্তে সেই পরিবর্তন করবার সুবিধা আছে। প্রতিবাদীর মুখের সামনে মতিস্থির থাকে না এবং অত্যন্ত জিদ বেড়ে যায়। অতএব মুখোমুখি না করে কলমে কলমেই ভালো।

আষাঢ় ১২৯৯

৪

তুমি লিখছ যে, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব ছিল না। তখন সাহিত্য অখণ্ডভাবে দেখা দিত, তাকে দ্বিধাবিভক্ত করে তার মধ্যে থেকে তত্ত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ত না। সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তুমি বলতে চাও যে, সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের মূলতত্ত্বের কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই, ওটা কেবল আকস্মিক সম্বন্ধ।

এর থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে, তোমাতে আমাতে কেবল ভাষা নিয়ে তর্ক চলছে। আমি যাকে মূলতত্ত্ব বলছি তুমি সেটা ঠিক গ্রহণ কর নি— এবং অবশেষে সেজন্য আমাকেই হয়তো ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। যদিও মূলতত্ত্ব শব্দটাকে বারংবার ব্যাখ্যা করতে আমি ত্রুটি করি নি। এবারকার চিঠিতে ঐ কথাটা পরিষ্কার করা যাক।

প্রাচীন কালের লোকেরা প্রকৃতিকে এবং সংসারকে যেরকম ভাবে দেখত আমরা ঠিক সে ভাবে দেখি নে। বিজ্ঞান এসে সমস্ত জগৎসংসারের মধ্যে এমন একটা দ্রাবক পদার্থ ঢেলে দিয়েছে যাতে করে সবটা ছিঁড়ে গিয়ে তার ক্ষীর এবং নীর, ছানা এবং মাখন স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। সুতরাং বিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের মনের ভাব যে অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে তার আর সন্দেহ নেই; বৈদিক কালের ঋষি যে ভাবে উষাকে দেখতেন এবং স্তব করতেন আমাদের কালে উষা সম্বন্ধে সে ভাব সম্পূর্ণ সম্ভব নয়।

প্রাচীন কাল এবং বর্তমান কালে প্রধান প্রভেদ হচ্ছে এই যে, প্রাচীন কালে সর্বসাধারণের মধ্যে মতের এবং ভাবের একটা নিবিড় ঐক্য ছিল ; গোলাপের কুঁড়ির মধ্যে তার সমস্ত পাপড়িগুলি যেমন আঁট বেঁধে একটিমাত্র সূচ্যগ্র বিন্দুতে আপনাকে উন্মুখ করে রেখে দেয় তেমনি। তখন জীবনের সমস্ত বিশ্বাস টুকরো টুকরো হয়ে যায় নি। তখনকার অখণ্ডজীবনের মধ্যে দিয়ে সাহিত্য সূর্যকিরণের মতো শুভ্র নিরঞ্জনভাবে ব্যক্ত হত। এখনকার বিদীর্ণ সমাজ এবং বিভক্ত মনুষ্যত্বের ভিতর দিয়ে সাহিত্যের শুভ্র সম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় না। তার সাত রঙ ফেটে বার হয়েছে। ক্লাসিসিজ্‌ম্‌ এবং রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ -এর মধ্যে সেইজন্য প্রভেদ দাঁড়িয়ে গেছে। ক্লাসিক শুভ্র এবং রোমান্টিক পাঁচ-রঙা।

কিন্তু প্রাচীন পিতামহদের অবিশ্লিষ্ট মনে সংসারের সাত রঙ কেন্দ্রীভূত হয়ে যে এক-একটি সুসংহত শুভ্র মূর্তিরূপে প্রকাশ পেত তার একটা কারণ ছিল। তখন সন্দেহ প্রবল ছিল না। সন্দেহের প্রথম কাজ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করা। আদিম কালে বিশ্বাসের কনিষ্ঠ ভাই সন্দেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেইজন্যে তখন বিশ্বসংসার বিশ্বাস এবং সন্দেহের মধ্যে তুল্যাংশে ভাগ হয়ে যায় নি। কিংবা সন্দেহ তখন এমনি নাবালক অবস্থায় ছিল যে, সংসারের প্রত্যেক জিনিসের উপর নিজের দাবি উত্থাপন করবার মতো তার বয়স ও বুদ্ধি হয় নি। বিশ্বাসের তখন একাধিপত্য ছিল। তার ফল ছিল এই যে, তখন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভিন্নতা ছিল না। উষাকে আকাশকে চন্দ্রসূর্যকে আমরা আমাদের থেকে স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলে মনে করতে পারতুম না। এমন-কি, যে-সকল প্রবৃত্তির দ্বারা আমরা চালিত হতুম, যারা মনুষ্যত্বের এক-একটি অংশমাত্র, তাদের প্রতিও আমরা স্বতন্ত্র পূর্ণ মনুষ্যত্ব আরোপ করতুম। এখন আমরা এই মনুষ্যত্ব আরোপ করাকে রূপক অলংকার বলে থাকি, কিন্তু তখন এটা অলংকারের স্বরূপ ছিল না। বিশ্বাসের সোনার কাঠিতে তখন সমস্তই জীবন্ত হয়ে জেগে উঠত। বিশ্বাস কোনোরকম খণ্ডতা সহ্য করতে পারে না। সে আপনার সৃজনশক্তির দ্বারা সমস্ত বিচ্ছেদ বিরোধ পূর্ণ ক'রে, সমস্ত ছিদ্র আচ্ছাদন ক'রে ঐক্য-নির্মাণের জন্যে ব্যস্ত।

অনেকে বলেন পূর্বোক্ত কারণেই প্রাচীন সাহিত্যে বেশি মাত্রায় সাহিত্য-অংশ ছিল। অর্থাৎ মানুষ তখন আপনাকেই সর্বত্র সৃজন করে বসত। তখন মানুষ আপনারই সুখদুঃখ বিরাগ-অনুরাগ বিস্ময়-আনন্দে সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। আমি বরাবর বলে আসছি, মানুষের এই আত্মসৃজনপদ্ধতিই সাহিত্যের পদ্ধতি। অনেকের মতে পুরাকালে এইটে কিছু অধিক ছিল। তখন মানবকল্পনার স্পর্শমাত্রে সমস্ত জিনিস মানুষ হয়ে উঠত। এইজন্যই সাহিত্য অতি সহজেই সাহিত্য হয়ে উঠেছিল।

এখন বিজ্ঞান যতই প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছে ততই প্রকৃতি প্রাকৃতভাবে আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে উঠছে। মানুষের সৃজনশক্তি সেখানে আপনার প্রাচীন অধিকার হারিয়ে চলে আসছে। নিজের যে-সকল হৃদয়বৃত্তি তার মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছিলুম সেগুলো ক্রমেই নিজের মধ্যে ফিরে আসছে। পূর্বে মানবত্বের যে অসীম বিস্তার ছিল, দ্যুলোকে ভূলোকে যে একই হৃৎস্পন্দন স্পন্দিত হত, এখন তা ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র মানবসমাজটুকুর মধ্যেই বদ্ধ হচ্ছে।

যাই হোক, মানবের আত্মপ্রকাশ তখনকার সাহিত্যেও ছিল, মানবের আত্মপ্রকাশ এখনকার সাহিত্যেও আছে। বরঞ্চ প্রাচীন সাহিত্যের দৃষ্টান্তেই আমার কথাটা অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

কিন্তু 'তত্ত্ব' শব্দটা ব্যবহার করেই আমি বিষম মুশকিলে পড়েছি। যে মানসিক শক্তি আমাদের চেতনার অন্তরালে বসে কাজ করছে তাকে ঠিক তত্ত্ব নাম দেওয়া যায় না— যেটা আমাদের গোচর হয়েছে তাকেই তত্ত্ব বলা যেতে পারে— সেই মানসিক পদার্থকে কেউ-বা আংশিকভাবে জানে, কেউ-বা জানে না অথচ তার নির্দেশানুসারে জীবনের সমস্ত কাজ করে যায়। সে জিনিসটা ভারি একটা মিশ্রিত জিনিস ; তত্ত্বের সিদ্ধান্তের মতো ছাঁটাছোঁটা চাঁচাছোলা আটঘাট-বাঁধা নয়। সেটা জ্ঞানের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কল্পনার সঙ্গে একটা অবিচ্ছেদ্য মিশ্রণ। অন্তরের প্রকৃতি, বাহিরের জ্ঞান এবং আজন্মের সংস্কার আমাদের জীবনের মূলদেশে মিলিত হয়ে একটি অপূর্ব ঐক্য লাভ করেছে ;

সাহিত্য সেই অতিদুর্গম অন্তঃপুরের কাহিনী। সেই ঐক্যকে আমি মোটামুটি জীবনের মূলতত্ত্ব নাম দিয়েছি। কারণ, সেটা যদিও লেখক এবং সাহিত্যের দিক থেকে তত্ত্ব নয়, কিন্তু সমালোচকের দিক থেকে তত্ত্ব। যেমন জগতের কার্যপরম্পরা কতকগুলি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখনই তার নিত্যতা দেখতে পান তখনই তাকে 'নিয়ম' নাম দেন।

আমি যে মিলনের কথা বললুম সেটা যত মিলিত ভাবে থাকে মনুষ্যত্ব ততই অবিচ্ছিন্ন সুতরাং আত্মসম্বন্ধে অচেতন থাকে। সেগুলোর মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয় তখনই তাদের পরস্পরের সংঘাতে পরস্পর সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র চেতনা জন্মায়। তখনই বুঝতে পারি, আমার সংস্কার এক জিনিস, বাস্তবিক সত্য আর-এক জিনিস, আবার আমার কল্পনার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। তখন আমাদের একান্নবর্তী মানসপরিবারকে পৃথক করে দিই এবং প্রত্যেকের স্ব স্ব প্রাধান্য উপলব্ধি করি।

কিন্তু শিশুকালে যেখানে এরা একত্র জন্মগ্রহণ করে মানুষ হয়েছিল পৃথক হয়েও সেইখানে এদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সাহিত্য সেই আনন্দসংগমের ভাষা। পূর্বের মতো সাহিত্যের সে আত্মবিস্মৃতি নেই; কেননা এখনকার এ মিলন চিরমিলন নয়, এ বিচ্ছেদের মিলন। এখন আমরা স্বতন্ত্রভাবে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস আলোচনা করি; তার পরে এক সময়ে সাহিত্যের মধ্যে, মানসিক ঐক্যের মধ্যে, আনন্দ লাভ করি। পূর্বে সাহিত্য অবশ্যম্ভাবী ছিল, এখন সাহিত্য অত্যাবশ্যক হয়েছে। মনুষ্যত্ব বিভক্ত হয়ে গেছে, এইজন্যে সাহিত্যের মধ্যে সে আপনার পরিপূর্ণতার আস্বাদলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। এখনই সাহিত্যের বড়ো বেশি আবশ্যক এবং তার আদরও বেশি।

এখন এই পূর্ণমনুষ্যত্বের সংস্পর্শ সচরাচর কোথাও পাওয়া যায় না। সমাজে আমরা আপনাকে খণ্ডভাবে প্রকাশ করি। বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে যতটা দূর যাওয়া যায় তার বেশি অগ্রসর হতে পারি নে। চুটকি হাসি এবং খুচরো কথার মধ্যে আপনাকে আবৃত করে রাখি। মানুষ সামনে উপস্থিত হবামাত্রই আমরা এমনি সহজে স্বভাবতই আত্মসম্বৃত হয়ে বসি যে, একটা গুরুতর ঘটনার দ্বারা অকস্মাৎ অভিভূত না হলে কিংবা একটা অতিপ্রবল আবেগের দ্বারা সর্ববিস্মৃত না হলে আমরা নিজের প্রকৃত আভাস নিজে পাই নে। শেক্‌স্‌পীয়রের সময়েও এরকম সব আকস্মিক ঘটনা এবং প্রবল আবেগ সচরাচর উদ্ভূত হতে পারত এবং বিদ্যুৎ-আলোকে মানুষের সমগ্র আগাগোড়া এক পলকে দৃষ্টিগোচর হত; এখন সুসভ্য সুসংযত সমাজে আকস্মিক ঘটনা ক্রমশই কমে আসছে এবং প্রবল আবেগ সহস্র বাঁধে আটকা পড়ে পোষ-মানা ভাল্লুকের মতো নিজের নখদন্ত গোপন করে সমাজের মনোরঞ্জন করবার জন্যে কেবল নৃত্য করে— যেন সে সমাজের নট, যেন তার একটা প্রচণ্ড ক্ষুধা এবং রুদ্ধ আক্রোশ ঐ বহুরোমশ আচ্ছাদনের নীচে নিশিদিন জ্বলছে না।

সাহিত্যের মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে, জর্জ এলিয়টের নভেলে, সুকবিদের কাব্যে সেই প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব মুক্তিলাভ করে দেখা দেয়। তারই সংঘাতে আমাদের আগাগোড়া জেগে ওঠে; আমরা আমাদের প্রতিহত হাড়গোড়-ভাঙা ছাইচাপা অঙ্গহীন জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি।

এইরূপ সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। এইজন্যে শেক্‌স্‌পীয়র অশ্লীল নয়, রামায়ণ মহাভারত অশ্লীল নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র অশ্লীল, জোলা অশ্লীল; কেননা তা কেবল আংশিক অনাবরণ।

আর-একটু খোলসা করে বলা আবশ্যক।

সাহিত্যে আমরা সমগ্র মানুষকে প্রত্যাশা করি। কিন্তু সব সময়ে সবটাকে পাওয়া যায় না, সমস্তটার একটা প্রতিনিধি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিনিধি কাকে করা যাবে? যাকে সমস্ত মানুষ বলে মানতে আমাদের আপত্তি নেই। ভালোবাসা স্নেহ দয়া ঘৃণা ক্রোধ হিংসা এরা আমাদের মানসিক বৃত্তি; এরা যদি অবস্থানুসারে মানবপ্রকৃতির উপর একাধিপত্য লাভ করে তাতে আমাদের অবজ্ঞা অথবা ঘৃণার উদ্রেক করে না। কেননা এদের সকলেরই ললাটে রাজচিহ্ন আছে; এদের মুখে একটা দীপ্তি প্রকাশ পায়। মানুষের ভালো এবং মন্দ সহস্র কাজে এরা আপনার চিহ্নাঙ্কিত রাজমোহর মেরে দিয়েছে। মানব-ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এদের সহস্রটা করে সই আছে। অথচ ঔদরিকতাকে যদি সাহিত্যের

মধ্যে কোথাও রাজসিংহাসন দেওয়া যায় তবে তাকে কে মানবে ? কিন্তু পেটুকতা কি পৃথিবীতে অসত্য ? সেটা কি আমাদের অনেকানেক মহৎবৃত্তির চেয়ে অধিকতর সাধারণব্যাপী নয় ? কিন্তু তাকে আমাদের সমগ্র মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি করতে আমাদের একান্ত আপত্তি, এইজন্যে সাহিত্যে তার স্থান নেই। কিন্তু কোনো 'জোলা' যদি পেটুকতাকে তাঁর নভেলের বিষয় করেন এবং কৈফিয়ত দেবার বেলায় বলেন যে, পেটুকতা পৃথিবীতে একটা চিরসত্য, অতএব ওটা সাহিত্যের মধ্যে স্থান না পাবে কেন, তখন আমরা উত্তর দেব : সাহিত্যে আমরা সত্য চাই নে, মানুষ চাই।

যেমন পেটুকতা, অন্য অনেক শারীরিক বৃত্তিও তেমনি। তারা ঠিক রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় নয়, তারা শূদ্র দাস ; তারা দুর্বল দেশে মাঝে মাঝে রাজসিংহাসন হরণ করে নেয়, কিন্তু মানব-ইতিহাসে কখনো কোথাও কোনো স্থায়ী গৌরব লাভ করে নি— সমাজে তাদের চরম এভোল্যুশন হচ্ছে কেবল ফরাসি রান্না এবং ফরাসি নভেল।

সমগ্রতাই যদি সাহিত্যের প্রাণ না হত তা হলে জোলার নভেলের কোনো দোষ দেখতুম না। তার সাক্ষী, বিজ্ঞানে কোনো অশ্লীলতা নেই। সে খণ্ড জিনিসকে খণ্ড ভাবেই দেখায়। আর, সাহিত্য যখন মানবপ্রকৃতির কোনো-একটা অংশের অবতারণা করে তখন তাকে একটা বৃহতের, একটা সমগ্রের প্রতিনিধিস্বরূপে দাঁড় করায় ; এইজন্যে আমাদের মানসগ্রামের বড়ো বড়ো মোড়লগুলিকেই সে নির্বাচন করে নেয়।

কথাটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ঠিক সমরেখায় পড়ল কি না জানি নে। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা এর দ্বারা কতকটা পরিস্ফুট হবে বলেই এর অবতারণা করা গেছে।

অতএব আমার বক্তব্য এই যে, সাহিত্য মোট মানুষের কথা।

শেক্‌স্‌পীয়র এবং প্রাচীন কবিরা মানুষ দেখতে পেতেন এবং তাদের প্রতিকৃতি সহজে দিতে পারতেন। এখন আমরা এক-একটা অর্ধচেতন অবস্থায় নিজের অন্তস্তলে প্রবেশ করে গুপ্তমানুষকে দেখতে পাই। সচেতন হলেই চির-অভ্যাস-ক্রমে সে লুকিয়ে পড়ে। এইজন্যে আজকালকার লেখায় প্রায় লেখকের বিশেষত্বের মধ্যেই মনুষ্যত্ব দেখা দেয়। কিংবা খণ্ড খণ্ড আভাসকে কল্পনাশক্তির দ্বারা জুড়ে এক করে গড়ে তুলতে হয়। অন্তররাজ্যও বড়ো জটিল হয়ে পড়েছে, পথও বড়ো গোপন। যাকে ইংরাজিতে ইন্‌স্‌পিরিশন বলে সে একটা মুগ্ধ অবস্থা ; তখন লেখক একটা অর্ধচেতন শক্তির প্রভাবে কৃত্রিম জগতের শাসন অনেকটা অতিক্রম করে এবং মনুষ্যরাজার যেখানে খাস দরবার সেই মর্মসিংহাসনের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়।

কিন্তু নিজের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক আর অন্যের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক, প্রকৃতির বর্ণনা করেই হোক আর মনুষ্যচরিত্র গঠিত করেই হোক, মানুষকে প্রকাশ করতে হবে। আর-সমস্ত উপলক্ষ।

প্রকৃতিবর্ণনাও উপলক্ষ ; কারণ, প্রকৃতি ঠিকটি কিরূপ তা নিয়ে সাহিত্যের কোনো মাথাব্যথাই নেই, কিন্তু প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ে, মানুষের সুখদুঃখের চারি দিকে, কিরকম ভাবে প্রকাশিত হয় সাহিত্য তাই দেখায়। এমন-কি, ভাষা তা ছাড়া আর-কিছু পারে না। চিত্রকর যে রঙ দিয়ে ছবি আঁকে সে রঙের মধ্যে মানুষের জীবন মিশ্রিত হয় নি ; কিন্তু কবি যে ভাষা দিয়ে বর্ণনা করে তার প্রত্যেক শব্দ আমাদের হৃদয়ের দোলায় লালিত পালিত হয়েছে। তার মধ্যে থেকে সেই জীবনের মিশ্রণটুকু বাদ দিয়ে ভাষাকে জড় উপাদানে পরিণত করে নিছক বর্ণনাটুকু করে গেলে যে কাব্য হয় এ কথা কিছুতে স্বীকার করা যায় না।

সৌন্দর্যপ্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র। হ্যাম্‌লেটের ছবি সৌন্দর্যের ছবি নয়, মানবের ছবি ; ওথেলোর অশান্তি সুন্দর নয়, মানবস্বভাবগত।

কিন্তু সৌন্দর্য কী গুণে সাহিত্যে স্থান পায় বলা আবশ্যক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানবহৃদয়ের একটা নিত্য মিশ্রণ আছে। তার মধ্যে প্রকৃতির জিনিস যতটা আছে তার চেয়ে মানবের চিত্ত বেশি। এইজন্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে মানব আপনাকেই অনুভব করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্বন্ধে যতই সচেতন হব প্রকৃতির মধ্যে আমারই হৃদয়ের ব্যাপ্তি তত বাড়বে।

কিন্তু কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্যই তো কবির বর্ণনার বিষয় নয়। প্রকৃতির ভীষণত্ব, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা, সে তো বর্ণনীয়। কিন্তু সেও আমাদের হৃদয়ের জিনিস, প্রকৃতির জিনিস নয়। অতএব, এমন কোনো বর্ণনা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না যা সুন্দর নয়, শান্তিময় নয়, ভীষণ নয়, মহৎ নয়, যার মধ্যে মানবধর্ম নেই কিংবা যা অভ্যাস বা অন্য কারণে মানবের সঙ্গে নিকটসম্পর্কে বদ্ধ নয়।

আমার বোধ হচ্ছে, আমার প্রথম চিঠিতে লেখকেরই নিজত্ব-প্রকাশের উপর এতটা ঝোঁক দিয়েছিলুম যে সেইটেই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য এইরকম বুঝিয়ে গেছে। আমার সেই সামান্য আদিম অপরাধ তুমি কিছুতেই মার্জনা করতে পারছ না ; তার পরে আমি যে কথাই বলি-না কেন তোমার মন থেকে সেটা আর যাচ্ছে না ; আদম যেমন প্রথম পাপে তাঁর সমস্ত মানববংশ-সমেত স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন তেমনি আমার সেই প্রথম ত্রুটি ধরে আমার সমস্ত সংস্কার ও যুক্তি -পরম্পরাসুদ্ধ আমাকে মতচ্যুত করবার চেষ্টায় আছ।

আমার বলা উচিত ছিল, লেখকের নিজত্ব নয়, মনুষ্যত্ব-প্রকাশই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। (আমার মনের মধ্যে নিদেন সেই কথাটাই ছিল) কখনো নিজত্বদ্বারা কখনো পরত্বদ্বারা। কখনো স্বনামে কখনো বেনামে। কিন্তু একটা মনুষ্য-আকারে। লেখক উপলক্ষ মাত্র, মানুষই উদ্দেশ্য। আমার গোড়াকার চিঠিতে যদি এ কথা প্রকাশ হয়ে না থাকে তা হলে জেনো সেটা আমার অনিপুণতাবশত। একে তত্ত্ব, সাহিত্যের তত্ত্ব, তাতে আবার আমার মতো লোক তার ব্যাখ্যাকারক ! কথা আছে একে বোবা, তাতে আবার বোলতায় কামড়েছে— একে গোঁ গোঁ করা বৈ আর-কিছু জানে না, তার উপরে কামড়ের জ্বালায় গোঁগাঁনি কেবল বাড়িয়ে তোলে।

আমি যে এই আলোচনা করছি, এ যেন মানসিক মৃগয়া করছি। একটা জীবন্ত জিনিসের পশ্চাতে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি ; পদে পদে স্থান পরিবর্তন করছি, কখনো পর্বতের শিখরে, কখনো পর্বতের গুহায়। এইজন্য আমার সমস্ত আলোচনায় যদিও লক্ষ্যের ঐক্য আছে, কিন্তু হয়তো পথের অনৈক্য পাবে। কিন্তু সে-সমস্ত মার্জনা করে তুমিও যদি আমার সঙ্গে যোগ দাও, যদি আমার পাশাপাশি ছোট, তা হলে আমার মৃগটি যদি-বা সম্পূর্ণ ধরা না পড়ে নিদেন তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ আমার প্রার্থনা এই যে, আমি যদি তোমাকে বোঝাতে ভুল করে থাকি তুমি নিজে ঠিকটা বোঝো। অর্থাৎ আমি যদি তোমাকে মাছটা ধরে দিতে না পারি, আমার পুকুরটা ছেড়ে দিচ্ছি, তুমিও জাল ফেলো। কিন্তু কিছু উঠবে কি ? সে কথা বলতে পারি নে— সে তোমার অদৃষ্ট কিংবা আমার অদৃষ্ট যা'ই বল।

কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার একটা নালিশ আছে। তুমি আমারই কথাটাকে কেবল ঝুঁটি ধরে টেনে টেনে বের করছ ; নিজের কথাটিকে বরাবর বেশ ঢেকেঢুকে সামলে রেখেছ। আমি যেন কেবল একটি জীবন্ত তলোয়ারের সঙ্গে লড়াই করছি— কেবল খোঁচা খাচ্ছি, কাউকে খোঁচা ফিরিয়ে দিতে পারছি নে। আমি বার বার যতই বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে দাঁড়াচ্ছি তোমার ততই আঘাত করবার সুবিধে হচ্ছে। কিন্তু এটাকে কি ন্যায়যুদ্ধ বলে ?

আমি ব্রাহ্মণ, কেবলমাত্র যুদ্ধের উৎসাহে আনন্দ পাই নে। আসল কথাটা কী তাই জানতে পারলেই চুপ করে যাই। আমি তো বলি সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমগ্র মানুষকে গঠিত করে তোলা। তুমি কী বল ?

কিন্তু তুমি শুনছি কলকাতায় আসছ ; আমিও সেখানে যাচ্ছি। তা হলে তর্কটা মোকাবিলায় নিষ্পত্তি হবার সম্ভাবনা দেখছি। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে মোকাবিলায় নিষ্পত্তি কুইনাইন দিয়ে জ্বর ঠেকানোর মতো। হয়তো চট করে ছেড়ে যেতে পারে, নয় তো গুমরে গুমরে থেকে যায়— আবার কিছুদিন বাদে কেঁপে কেঁপে দেখা দেয়। ইতি।

ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯

বঙ্গভাষা

শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন -প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এই শ্রেণীয় বাংলা পুস্তকের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পুস্তকখানি সাধারণের নিকট সমাদর লাভ করিয়া প্রথম সংস্করণের প্রান্তশেষে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিদ্যোৎসাহী উদারহৃদয় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজা এই গ্রন্থ-মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভার বহন করেন। রোগশয্যাশায়ী লেখক মহাশয় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য উৎসুক হইয়াছেন। আশা করি অর্থসাহায্য-অভাবে তাঁহার এই ইচ্ছা নিষ্ফল হইবে না।

এই গ্রন্থের আরম্ভভাগে বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে লেখকের চিন্তাশীলতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাহার দ্বারা পদে পদে পাঠকেরও চিন্তাশক্তির উদ্রেক করিয়া থাকে। সেইসঙ্গে মনে এই খেদটুকুও জন্মে যে বাঙালার ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা যথোচিত বিস্তৃত হয় নাই। বিষয়টির কেবল অবতারণা হইয়াছে. তাহাকে আরো খানিকটা অগ্রসর দেখিলে মনের ক্ষোভ মিটিত।

কিন্তু বাঙালির ক্ষোভের কারণ, খেদের বিষয় বিস্তর আছে। অনেক জিনিস হওয়া উচিত ছিল যাহা হয় নাই, এবং সেজন্য আমরা প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু দায়ী। অথচ যে ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া অনিবার্য কারণে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই সমালোচকের উচ্চ আসন হইতে বিশেষ করিয়া তাঁহারই কৈফিয়ত তলব করা শক্ত নহে। কিন্তু আমাদের সে অভিপ্রায় নাই। এবং এ কথাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সমালোচ্য গ্রন্থে বঙ্গভাষা সম্বন্ধে অধ্যায় কয়েকটি পাঠ করিয়া এই বিষয়ে আমাদের কৌতূহল বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত এবং চেষ্টা নূতন পথে ধাবিত হইয়াছে। পাঠকের মনকে এইরূপে প্রবুদ্ধ করাই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

সাময়িক রাজকীয় ব্যাপার ব্যতীত আর-কোনো বিষয়ে আমাদের শিক্ষিতসমাজে আলোচনা নাই। বাংলাভাষার উৎপত্তি প্রকৃতি এবং ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে দুটা কথা আন্দোলন করেন এমন দুইজন বাঙালি ভদ্রলোক আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। অতএব বাংলা ভাষাতত্ত্বের নিগূঢ় কথা যিনি সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত তাঁহাকে সাহায্য বা সংশোধন করিবার উপায় দেশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাকে একাকী উপক্রমণিকা হইতে উপসংহার পর্যন্ত সমস্তই স্বচেষ্টায় সমাধা করিতে হইবে। তিনিই যন্ত্র তৈরি করিবেন, তার চড়াইবেন, সুর বাঁধিবেন, বাজাইবেন, এবং সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে শ্রোতার কার্যও তাঁহাকে একলাই সারিতে হইবে। এমন অবস্থায় এ কথা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না যে তাঁহার সকল কাজ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় নাই।

কিন্তু অদৃষ্টক্রমে যেখানে আমাদের সকল আশার প্রতিষ্ঠা আমাদের মাতৃভাষা-তত্ত্ব-নির্ণয়ের আশাও সেই বিদেশীয়ের কাছে। আমরা যাঁহাদের নিকটে স্বায়ত্তশাসন, কৌন্‌সিলের আসন, যথেচ্ছভাষণ দাবি করি, তাঁহাদেরই নিকটে অসংকোচে বেদের ভাষ্য, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত এবং অবশেষে নিজ ভাষার রহস্য-ব্যাখ্যার জন্য হাত জোড় করিয়া উপস্থিত হইতে হইবে।

এক্ষণে বাংলা ভাষাতত্ত্ব যিনি আলোচনা করিতে চান বীম্‌স্‌ সাহেবের তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং হ্যর্‌ন্‌লে সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ তাঁহার পথ অনেকটা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে দুটো-একটা ভুল-ত্রুটি বা স্খলন বাহির করা গৌড়ীভাষীদের পক্ষে অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি ও নম্রতার সহিত তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না।

সংসারে জড়পদার্থের রহস্য যথেষ্ট জটিল এবং দুর্গম, কিন্তু সজীব পদার্থের রহস্য একান্ত দুরূহ। ভাষা একটা প্রকাণ্ড সজীব পদার্থ। জীবনধর্মের নিগূঢ় নিয়মে তাহার বিচিত্র শাখাপ্রশাখা কত দিকে কত প্রকার অভাবনীয় আকার ধারণ করিয়া ব্যাপ্ত হইতে থাকে তাহার অনুসরণ করিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন। বীম্‌স্‌ সাহেব, হ্যর্‌ন্‌লে সাহেব, হিন্দিব্যাকরণকার কেলগ সাহেব, মৈথিলীভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রিয়র্‌স্‌ন্‌ সাহেব বিদেশী হইয়া ভারতবর্ষপ্রচলিত আর্যভাষার পথলুপ্ত অপরিচিত জটিল মহারণ্যতলে

প্রবেশপূর্বক অশ্রান্ত পরিশ্রম এবং প্রতিভার বলে যে-সকল প্রচ্ছন্ন তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন তাহা লাভ করিয়া এবং বিশেষত তাঁহাদের আশ্চর্য অধ্যবসায় ও সন্ধানপরতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের স্বদেশী-ভাষার-সহিত-সম্পর্কশূন্য স্বদেশহিতৈষী-আখ্যাধারীদের লজ্জা ও বিনতি অনুভব করা উচিত।

প্রাকৃত ভাষার সহিত বাংলার জন্মগত যোগ আছে, সে সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্রবাবু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল এবং ডাক্তার হ্যর্ন্‌লের সহিত একমত।

হ্যর্ন্‌লে সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে কথিত প্রাকৃত ভাষা দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। শৌরসেনী ও মাগধী। মহারাষ্ট্রী লিখিত ভাষা ছিল মাত্র এবং প্রাকৃত ভাষা ভারতবর্ষীয় অনার্যদের মুখে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া যে ভাষায় পরিণত হইয়াছিল তাহার নাম ছিল পৈশাচী।

প্রাচীন ব্যাকরণকারগণ যে-সকল ভাষাকে অপভ্রংশ ভাষা বলিতেন তাহাদের নাম এই— আভীরী (সিন্ধি, মাড়োয়ারি), আবন্তী (পূর্ব রাজপুতানি), গৌর্জরী (গুজরাটি), বাহ্লিকা (পঞ্জাবি), শৌরসেনী (পাশ্চাত্য হিন্দি), মাগধী অথবা প্রাচ্যা (প্রাচ্য হিন্দি), ওড্রী (উড়িয়া), গৌড়ী (বাংলা), দাক্ষিণাত্যা অথবা বৈদর্ভিকা (মারাঠি) এবং সৈপ্পলী (নেপালি ?)।

উক্ত অপভ্রংশ তালিকার মধ্যে শৌরসেনী ও মাগধী নাম আছে, কিন্তু মহারাষ্ট্রী নাম ব্যবহৃত হয় নাই। মহারাষ্ট্রী যে ভারতবর্ষীয় কোনো দেশবিশেষের কথিত ভাষা ছিল না তাহা হ্যর্ন্‌লে সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিশেষত আধুনিক মহারাষ্ট্রদেশ-প্রচলিত ভাষার অপেক্ষা পাশ্চাত্য হিন্দিভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্য আছে। প্রাকৃত নাটকে দেখা যায় শৌরসেনী গদ্যাংশে এবং মহারাষ্ট্রী পদ্যাংশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; ইহা হইতেও কতকটা প্রমাণ হয় মহারাষ্ট্রী সাহিত্যভাষা ছিল, কথায়-বার্তায় তাহার ব্যবহার ছিল না।

কিন্তু আমাদের মতে, ইহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, মহারাষ্ট্রী কোনো কালেই কথিত ভাষা ছিল না এবং তাহা সাহিত্যকারদের রচিত কৃত্রিম ভাষা। সর্বদা ব্যবহারের ঘর্ষণে চলিত কথায় ভাষার প্রাচীন রূপ ক্রমশ পরিবর্তিত হইতে থাকে, কিন্তু কাব্যে তাহা বহুকাল স্থায়িত্ব লাভ করে। বাহিরের বিচিত্র সংস্রবে পুরুষসমাজে যেমন ভাষা এবং প্রথার যতটা দ্রুত রূপান্তর ঘটে অন্তঃপুরের স্ত্রীসমাজে সেরূপ ঘটে না ; কাব্যেও সেইরূপ। আমাদের বাংলা কাব্যের ভাষায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। বাংলা কাব্যে 'ছিল' শব্দের স্থলে 'আছিল', প্রথম পুরুষ 'করিল' শব্দের স্থলে 'করিলা', 'তোমাদিগকে' স্থলে 'তোমা সবে' প্রভৃতি যে-সকল রূপান্তর প্রচলিত আছে তাহাই যে কথিত বাংলার প্রাচীন রূপ ইহা প্রমাণ করা শক্ত নহে। এই দৃষ্টান্ত হইতেই সহজে অনুমান করা যায় যে, প্রাকৃত সাহিত্যে মহারাষ্ট্রী-নামক পদ্য ভাষা শৌরসেনী-অপভ্রংশ অপেক্ষা প্রাচীন-আদর্শ-মূলক হওয়া অসম্ভব নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শৌরীসেনী-অপভ্রংশ প্রাকৃত সাহিত্যের গদ্য ভাষা। সাহিত্য-প্রচলিত গদ্য ভাষার সহিত কথিত ভাষার সর্বাংশে ঐক্য থাকে না তাহাও বাংলাভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায়। একটা ভাষা যখন বহুবিস্তৃত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তখন তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেই ; কিন্তু লিখিবার ভাষা নিয়মে এবং স্থায়ী আকারে বদ্ধ হইয়া দেশান্তর ও কালান্তরের বিকৃতি অনেকটা প্রত্যাখ্যানপূর্বক নানাস্থানীয় পণ্ডিতসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ও বোধগম্য হইয়া থাকে এবং তাহাই স্বভাবত ভদ্রসমাজের আদর্শ ভাষারূপে পরিণত হয়। চট্টগ্রাম হইতে ভাগলপুর এবং আসামের সীমান্ত হইতে বঙ্গসাগরের তীর পর্যন্ত বাংলাভাষার বিচিত্ররূপ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাহিত্যভাষায় স্বতই একটি স্থির আদর্শ রক্ষিত হইয়া থাকে। সুন্দররূপে, সুশৃঙ্খলরূপে, সংহতরূপে ও গভীররূপে ও সূক্ষ্মরূপে ভাবপ্রকাশের অনুরোধে এ ভাষা যে কতক পরিমাণে কৃত্রিম হইয়া উঠে তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই সাহিত্যগত ভাষাকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক অপভাষার মূল আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে এইরূপ এক দিকে মাগধী ও অন্য দিকে শৌরসেনী-মহারাষ্ট্রী এই দুই মূল প্রাকৃত ছিল। অদ্য ভারতবর্ষে যত আর্য ভাষা আছে তাহা এই দুই প্রাকৃতের শাখাপ্রশাখা।

এই দুই প্রাকৃতের মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর। এমন-কি, হ্যর্‌ন্‌লে সাহেবের মতে এক সময়ে ভারতবর্ষে মাগধীই একমাত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল। তাহা পশ্চিম হইতে ক্রমে পূর্বাভিমুখে পরিব্যাপ্ত হয়। শৌরসেনী আর-একটি দ্বিতীয় ভাষাপ্রবাহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পশ্চিমদেশ অধিকার করে। হ্যর্‌ন্‌লে সাহেব অনুমান করেন, ভারতবর্ষে পরে পরে দুইবার আর্য ঔপনিবেশিকগণ প্রবেশ করে। তাহাদের উভয়ের ভাষায় মূলগত ঐক্য থাকিলেও কতকটা প্রভেদ ছিল।

প্রাকৃত-ব্যাকরণকারগণ নিম্নলিখিত ভাষাগুলিকে মাগধী-প্রাকৃতের শাখারূপে বর্ণনা করিয়াছেন— মাগধী, অর্ধমাগধী, দাক্ষিণাত্যা, উৎকলী এবং শাবরী। বেহার এবং বাংলার ভাষাকে মাগধীরূপে গণ্য করা যায়। মাগধীর সহিত শৌরসেনী বা মহারাষ্ট্রী মিশ্রিত হইয়া অর্ধমাগধীরূপ ধারণ করিয়াছে ; ইহা যে মগধের পশ্চিমের ভাষা অর্থাৎ ভোজপুরী তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদর্ভ অর্থাৎ বেরার ও তাহার নিকটবর্তী প্রদেশের ভাষা দাক্ষিণাত্যা নামে অভিহিত। অতএব ইহাই বর্তমান মরাঠি-স্থানীয়। উৎকলী উড়িষ্যার ভাষা এবং এক দিকে দাক্ষিণাত্যা ও অন্য দিকে মাগধী ও উৎকলীর মাঝখানে শাবরী।

দেখা যাইতেছে, প্রাচ্যহিন্দি, মৈথিলী, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রী এবং আসামি এইগুলিই বাংলার স্বজাতীয় ভাষা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কাফিরিস্থানের কাফিরি ভাষা এবং আফগানিস্থানের পুশ্‌তু মাগধী-প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত এবং সে হিসাবে বাংলার কুটুম্বশ্রেণীয়। শৌরীসেনী-প্রাকৃত মাঝে পড়িয়া মাগধী-প্রাকৃতের বিস্তারকে খণ্ডীকৃত করিয়া দিয়াছে।

এক্ষণে বাংলার ভাষাতত্ত্ব প্রকৃতরূপে নিরূপণ করিতে হইলে প্রাকৃত, পালি, প্রাচ্যহিন্দি, মৈথিলী, আসামি, উড়িয়া এবং মহারাষ্ট্রী ব্যাকরণ পর্যালোচনা ও তুলনা করিতে হয়।

কথাটা শুনিতে কঠিন, কিন্তু বাংলার ভাষাতত্ত্বনির্ণয় জীবনের একটা প্রধান আলোচ্যবিষয়রূপে গণ্য করিয়া লইলে এবং প্রত্যহ অন্তত দুই-এক ঘণ্টা নিয়মিত কাজ করিয়া গেলে এ কার্য একজনের পক্ষে অসাধ্য হয় না। বিশেষত উক্ত ভাষা কয়টির তুলনামূলক এবং স্বতন্ত্র ব্যাকরণ অনেকগুলিই পাওয়া যায়। এবং এইরূপ সম্পূর্ণ একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের গুটিকতক দৃষ্টান্ত না থাকিলে আমাদের বঙ্গসাহিত্য যথোচিত গৌরব লাভ করিতে পারিবে না।

বাংলার ভাষাতত্ত্ব-সন্ধানের একটি ব্যাঘাত— প্রাচীন পুঁথির দুষ্প্রাপ্যতা।

কবিকঙ্কণচণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগুলি জনসাধারণের সমাদৃত হওয়াতে কালে কালে অল্পে অল্পে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন আদর্শ পুঁথি কোনো-এক পুস্তকালয়ে যথাসম্ভব সংগৃহীত থাকিলে অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে সুবিধার বিষয় হয়। সাহিত্যপরিষদের অধিকারে এইরূপ একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইতে পারিবে ইহাই আমরা আশা করি।

এই-সকল গুরুতর বিঘ্নসত্ত্বে কোনো চিন্তাশীল সন্ধানতৎপর ব্যক্তি যদি বাংলা ভাষাতত্ত্ব-নির্ণয়ে নিযুক্ত হন তবে তাঁহার কার্য অসম্পূর্ণ হইলেও ভবিষ্যতের পথ খনন করিয়া রাখিবে। রোগের তাপ, জীবিকার চেষ্টা এবং কর্মান্তরের অনবকাশের মধ্যেও দীনেশচন্দ্রবাবু সেই দুঃসাধ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া মহৎ অনুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি আমাদের সম্মান এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

দীনেশচন্দ্রবাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বৈশাখ ১৩০৫

সাহিত্যসম্মিলন

সকলেই জানেন, গত বৎসর চৈত্রমাসে বরিশাল সাহিত্যসম্মিলনসভা আহ্বান করিয়াছিল। সেই আহ্বানের মধ্যে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশের হৃদয়বেদনা ছিল। সে আহ্বানকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি নাই।

তার পর হঠাৎ অকালে ঝড় উঠিয়া সেই সভাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল তাহাও সকলে জানেন। সংসারে শুভকর্ম সকল সময়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় না। বিঘ্নই অনেক সময়ে শুভকর্মের কর্মকে রোধ

করিয়া শুভকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে। ফলের বীজ যেখানে পড়ে সেইখানেই অঙ্কুরিত হইতে যদি না পায়, ঝড়ে যদি তাহাকে অন্যত্র উড়াইয়া লইয়া যায়, তবু সে ব্যর্থ হয় না, উপযুক্ত সুযোগে ভালোই হইয়া থাকে।

কিন্তু কলিকাতা বড়োই কঠিন স্থান। এ তো বরিশাল নয়। এ যে রাজবাড়ির শান-বাঁধানো আঙিনা। এখানে কেবল কাজ, কৌতুক ও কৌতূহল, আনাগোনা এবং উত্তেজনা। এখানে হৃদয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইবে কোথায়? জিজ্ঞাসা করি, এখানে হৃদয় দিয়া মিলনসভাকে আহ্বান করিতেছে কে? এ সভার কোনো প্রয়োজন কি কেহ বেদনার সহিত নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছে? এখানে ইহা নানা আয়োজনের মধ্যে একটিমাত্র, সর্বদাই নানাপ্রকারে জনতা-মহারাজের মন ভুলাইয়া রাখিবার এক শত অনাবশ্যক ব্যাপারের মধ্যে এটি এক-শত-এক।

জনতা-মহারাজকে আমিও যথেষ্ট সম্মান করি, কিন্তু কিঞ্চিৎ দূর হইতে করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার সেবক-পরিচারকের অভাব নাই। আমিও মাঝে মাঝে তাঁহার দ্বারে হাজিরা দিয়াছি, হাততালির বেতনও আদায় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু সত্য কথাই বলিতেছি, সে বেতনে চিরদিন পেট ভরে না; এখন ছুটি লইবার সময় হইয়াছে।

বর্তমান সভার কর্তৃপক্ষদের কাছে কাতরকণ্ঠে ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমার পূর্বেকার নোক্‌রি স্মরণ করিয়া দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছেন। তাঁহারা কেহ-বা আমার প্রিয় আত্মীয়, কেহ-বা আমার মান্য ব্যক্তি; তাঁহাদের অনুরোধের উত্তরে 'না' বলিবার অভ্যাস এখনো পাকে নাই বলিয়া যেখানেই তাঁহারা আমাকে দাঁড় করাইয়া দিলেন সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াইলাম।

কিন্তু সকলেরই তো আমি প্রিয় ব্যক্তি এবং আত্মীয় ব্যক্তি নহি; অতএব এখানে দাঁড়াইবার আমার অধিকার কী আছে, পক্ষপাতহীন বিচারকদের কাছে তাহারও জবাবদিহি আমাকে করিতে হইবে। জনতা-মহারাজের চাপরাস বহন করিবার এও একটা বিভ্রাট।

বরিশালের যজ্ঞকর্তারা আমাকে সম্মানের পদে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই আহ্বান অস্বীকার করাটাকেই আমি বিনয় বলিয়া মনে করি নাই। অতএব আমি যে প্রথম সাহিত্যসম্মিলনসভার সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলাম, সে সম্মান আমার পক্ষে আনন্দের সহিত শিরোধার্য। জীবনে যাচিত এবং অযাচিত সৌভাগ্য তো মাঝে মাঝে ঘটে, নিজের যোগ্যতা বিচার করিয়া সেই সৌভাগ্য গ্রহণ করিবার ভার যদি নিজেরই উপরে থাকে. তবে পৃথিবীতে কয়জন ধনী অসংকোচে ধন ভোগ করিতে এবং কয়জন মানী নির্বিচারে মানের দাবি করিতে পারেন? তবে তো পৃথিবীর বিস্তর বড়ো বড়ো পদ ও পদবী কুলীনকন্যার মতো উপযুক্ত পাত্রের অপেক্ষায় অনাথ অবস্থাতেই দিনযাপন করিতে বাধ্য হয়। এমন-সকল দৃষ্টান্তসত্ত্বেও আমিই যে কেবল সম্মান ছাড়িয়া দিয়া বিনয় প্রদর্শন করিব এত বড়ো অলোকসামান্য ন্যায়ভীরুতা আমার নাই।

যেমন করিয়াই হউক, বরিশালের সভায় যে অধিকার পাইয়াছি সেই অধিকারের জোরেই আজ কলিকাতার মতো স্থানেও এখানে দাঁড়াইতে সংকোচ দূর করিলাম। আজিকার এই সভাকে আমি বরিশালের সেই সম্মিলনসভারই অনুবৃত্তি বলিয়া গণ্য করিতেছি। বরিশালের সেই আহ্বান ও আতিথ্যকেই সর্বাগ্রে স্বীকার করিয়া লইয়া আজিকার কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

তার পরে কথা এই, কাজটা কী? বরিশালের নিমন্ত্রণপত্রে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, সভার উদ্দেশ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রীতিস্থাপন ও মাতৃভাষার উন্নতিসাধন। এই দুটি উদ্দেশ্যের দিকে হাল বাগাইয়া চলিতে হইবে। কিন্তু পথটি তো সোজা নয়। সভাস্থাপন করিয়া প্রীতিস্থাপন হয়, বাংলাদেশে তাহার প্রমাণ তো সর্বদা পাওয়া যায় না; বরঞ্চ উলটা হয় এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেখানো যাইতে পারে। প্রীতিবিধান ও উন্নতিসাধন, জগতে এ দুটি বৈ আর তো সাধু উদ্দেশ্য নাই। এ দুটির সহজপথ-আবিষ্কার-চেষ্টায় ধরাতল বারংবার অশ্রু এবং রক্তে অভিষিক্ত হইয়াছে, তবু আজও এক ব্রতের ব্রতী, এক ব্যবসায়ের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈর্ষা-কলহের অন্ত নাই— আজও উন্নতি-অবনতি চাকার মতো আবর্তিত হইতেছে এবং সংসারের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে অগণ্য লোক এবং

তাহার ফল ভোগ করিতেছে কয়েকজন ভাগ্যবান মাত্র।

কিন্তু আসল কথা, অনেক বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি ব্যাপারের যেমন বড়ো বড়ো নামধারী মুরুব্বি থাকেন, অনুষ্ঠানপত্রের সর্বোচ্চে তাঁহাদের নামটা ছাপা থাকে, কিন্তু কোনো কাজেই তাঁহারা লাগিবেন বলিয়া কেহ আশাও করে না, তেমনি কোনো অনুষ্ঠানের গোড়ায় উদ্দেশ্য বলিয়া মস্ত বড়ো কোনো-একটা কথা সকলের উপরে আমরা লিখিয়া রাখি, মনে মনে জানা থাকে ওটা ঐখানে অমনি লেখাই রহিল। প্রীতি-স্থাপনের উদ্দেশ্যটাকেও তেমনি সর্বোচ্চে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার পরে তাহার প্রতি মনোযোগ না করিলেও বোধ করি কেহই লক্ষ করিবে না।

অতএব এই সম্মিলনসভার উদ্দেশ্য কী তাহা লইয়া বৃথা আলোচনা না করিয়া, ইহার কারণটা কী, সেটা দেখা যাইতে পারে।

সাহিত্যসম্মিলনের নামে বাংলার নানা প্রদেশের লোক বরিশালে আহূত হইয়াছিল। এত কাল পরে আজই এমনতরো একটা ব্যাপার যে ঘটিল, তাহার তাৎপর্য কী ? বাংলাসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ যে হঠাৎ বন্যার মতো এক রাত্রে বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা নহে। আসল কথাটা এই যে, সমস্ত বাংলাদেশে একটা মিলনের দক্ষিণ-হাওয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বাংলাদেশে চারি দিকে কত সমিতি কত সম্প্রদায় যে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। আজ আমরা যত রকম করিয়া পারি মিলিতে চাই। আমরা যে-কোনো একটা উদ্দেশ্য খাড়া করিয়া দিয়া যে-কোনো একটা সূত্র লইয়া পরস্পরকে বাঁধিতে চাই। কত কাল ধরিয়া আমাদের দেশের প্রধান পক্ষেরা বলিয়া আসিয়াছেন এক না হইতে পারিলে আমাদের রক্ষা নাই, কবিরা ছন্দোবন্ধে ঐক্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন, নীতিজ্ঞেরা বলিয়াছেন তৃণ একত্র করিয়া পাকাইলে হাতিকে বাঁধা যায়— তবু দীর্ঘকাল হাতি বাঁধিবার জন্য কাহারও কোনো উদ্‌যোগ দেখা যায় নাই। কিন্তু শুভলগ্নে ঐক্যের দানা বাঁধিবার যখন সময় আসিল তখন হঠাৎ একটা আঘাতেই সমস্ত দেশে একটা কী টান পড়িয়া গেল— যে যেখানে পারে সেইখানেই একটা-কোনো নাম লইয়া একটা-কিছু সংহতির মধ্যে ধরা দিবার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিতে লাগিল। এখন এই আবেগ থামাইয়া রাখা দায়। স্বদেশের মাঝখান হইতে মিলনের টান পড়িতেই মাতৃকক্ষের ছোটোবড়ো সমস্ত দরজা-জানালা খুলিয়া গেছে। কে আমাদিগকে চলিতে বলিতেছে ? উদ্দেশ্য কী ? উদ্দেশ্য তো পরিষ্কার করিয়া কিছুই বলিতে পারি না। যদি বানাইয়া বলিতে বল তবে বড়ো বড়ো নামওয়ালা উদ্দেশ্য বানাইয়া দেওয়া কিছুই শক্ত নয়। কুঁড়ি যে কেন বাধা ছিঁড়িয়া ফুল হইয়া ফুটিতে চায় তাহা ফুলের বিধাতাই নিশ্চয় জানেন, কিন্তু দক্ষিণে হাওয়া দিলে সাধ্য কী সে চুপ করিয়া থাকে। তাহার কোনো কৈফিয়ত নাই, তাহার একমাত্র বলিবার কথা : আমি থাকিতে পারিলাম না। বাংলাদেশের এমনি একটা খ্যাপা অবস্থায় আজ রাজনীতিকের দল তাঁহাদের গড়ের বাদ্য বাজাইয়া চলিয়াছেন, বিদ্যার্থীর দলও কলরবে যাত্রাপথ মুখরিত করিয়াছেন, ছাত্রগণও স্বদেশী ব্যবসায়ের রথের রশি ধরিয়া উঁচুনিচু পথের কাঁকরগুলা দলিয়া পা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন— আর, আমরা সাহিত্যিকের দলই কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি ! যজ্ঞে কি আমাদেরই নিমন্ত্রণ নাই ?

সেকি কথা ! নাই তো কী ! এ যজ্ঞে আমরাই সকলের বেশি মর্যাদা দাবি করিব। দেশলক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্ত হইতে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা আমরাই সকলের আগে আদায় করিয়া ছাড়িব। ইহাতে কেহ ঝগড়া করিতে আসিলে চলিবে না। আমাদের অন্য ভাইরা, যাঁহারা সুদীর্ঘকাল পশ্চিমমুখে আসন করিয়া পাষাণদেবতার বধির কানটার কাছে কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে ডান হাতটাকে একেবারে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারাই যে আমাদিগকে পিছনে ঠেলিয়া আজ প্রধান হইয়া দাঁড়াইবেন, এ আমরা সহ্য করিব কেন ? স্বদেশের মিলনক্ষেত্রে একদিন যখন কাহারও কোনো সাড়াশব্দ ছিল না, যখন ইহাকে শ্মশান বলিয়া ভ্রম হইত, তখন সাহিত্যই কোদাল কাঁধে করিয়া ইহার পথ পরিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছিল। সেই পথ বাংলার উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়াছে। সেই পথকে ক্রমশই চওড়া করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য বড়ো বড়ো পণ্যপ্রবাহী রাজপথগুলির সঙ্গে মিলাইয়া দিবার

আয়োজন কে করিয়াছিল ?

একবার ভাবিয়া দেখুন, বাঙালিকে আমরা যে বাঙালি বলিয়া অনুভব করিতেছি তাহা মানচিত্রে কোনো কৃত্রিম রেখার জন্য নহে। বাঙালির ঐক্যের মূলসূত্রটি কী ? আমরা এক ভাষায় কথা কই। আমরা দেশের এক প্রান্তে যে বেদনা অনুভব করি ভাষার দ্বারা দেশের অপর সীমান্তে তাহা সঞ্চার করিয়া দিতে পারি ; রাজা তাঁহার সমস্ত সৈন্যদল খাড়া করিয়া তাঁহার রাজদণ্ডের সমস্ত বিভীষিকা উদ্যত করিয়াও ইহা পারেন না। শতবৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষ যে গান গাহিয়া গিয়াছেন শতবৎসর পরেও সেই গান বাঙালির কণ্ঠ হইতে উৎপাটিত করিতে পারে এত বড়ো তরবারি কোনো রাজাস্ত্রশালায় আজও শানিত হয় নাই। একি সামান্য শক্তি আমাদের প্রত্যেক বাঙালির হাতে আছে ! এ শক্তি ভিক্ষালব্ধ নহে। ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণ হইতেই জননীর সুধাকণ্ঠ হইতে স্নেহবিগলিত এই শক্তি আমরা আনন্দের সহিত সমস্ত মন প্রাণ দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়াছি এবং এই চিরন্তন শক্তিযোগে সমস্ত দূরত্ব লঙ্ঘন করিয়া, অপরিচয়ের সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া, আজ এই সভাতলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের, উপস্থিত ও অনাগতের, সমস্ত বাঙালিকে আপন উদ্‌বেল হৃদয়ের সম্ভাষণ জানাইবার অধিকারী হইয়াছি।

বাঙালির সঙ্গে বাঙালিকে গাঁথিবার জন্য কত কাল ধরিয়া বঙ্গসাহিত্য হৃদয়তন্তুনির্মিত নানা রঙের একটা বিপুল মিলনজাল রচনা করিয়া আসিয়াছে। আজ তাহা আমাদের এত বেশি অঙ্গীভূত হইয়া গেছে যে, তাহা আমাদের শিরা পেশী প্রভৃতির মতো আমাদের চোখেই পড়িতে চায় না। এ দিকে রাজকীয় মন্ত্রণাসভায় দুই-এক জন দেশীয় মন্ত্রী -নিয়োগ বা পৌরসভায় দুই-চারি জন দেশীয় প্রতিনিধি -নির্বাচনের শূন্যগর্ভ বিড়ম্বনাকেই আমরা পরম সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করি। ঔষধ যতই কটু হয় তাহাকে ততই হিতকর বলিয়া ভ্রম হয় ; যে চেষ্টায় যত বেশি ব্যর্থ কষ্ট তাহার ফলটুকুকে ততই অধিক বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ, ভাঙা পথে তৈলহীন গোরুর গাড়ির চাকার মতো পণ্ডশ্রমই সব চেয়ে বেশি শব্দ করিতে থাকে— তাহার অস্তিত্ব এক মুহূর্ত ভুলিয়া থাকা কঠিন।

কিন্তু কাজের সময় হঠাৎ দেখিতে পাই যাহা সত্য, যাহা কষ্টকল্পনা নহে, তাহার শক্তি অধিক, অথচ তাহা নিতান্ত সহজ। আমরা বিদেশী ভাষায় পরের দরবারে এত কাল যে ভিক্ষা কুড়াইলাম তাহাতে লাভের অপেক্ষা লাঞ্ছনার বোঝাই বেশি জমিল, আর দেশী ভাষায় স্বদেশীর হৃদয়-দরবারে যেমনি হাত পাতিলাম অমনি মুহূর্তের মধ্যেই মাতা যে আমাদের মুঠা ভরিয়া দিলেন। সেইজন্য আমি বিবেচনা করি অদ্যকার বাংলাভাষার দল যদি গদিটা দখল করিয়া বসে তবে আর-সকলকে সেটুকু স্বীকার করিয়া যাইতে হইবে ; মনে রাখিতে হইবে এই মিলনোৎসবের 'বন্দেমাতরং' মহামন্ত্রটি বঙ্গসাহিত্যেরই দান।

এ কথা বিশেষরূপে মনে রাখিবেন যে, সাহিত্যই মানুষের যথার্থ মিলনের সেতু। কেন যে, তাহার কারণ এখানে বিবৃত করিয়া বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমাদের দেশে বলিয়াছেন : বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বস্তুত কাব্যের সংজ্ঞা আর-কিছুই হইতে পারে না। রস জিনিসটা কী ? না যাহা হৃদয়ের কাছে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রকাশ পায় তাহাই রস, শুদ্ধ জ্ঞানের কাছে যাহা প্রকাশ পায় তাহা রস নহে। কিন্তু সকল রসই কি সাহিত্যের বিষয় ? তাহা তো দেখিতে পাই না। ভোজনব্যাপারে যে সুখসঞ্চার হয় তাহার মতো ব্যাপক রস মানবসমাজে আর নাই, শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সর্বত্রই ইহার অধিকার। তবু তো রসনাতৃপ্তির আনন্দ সাহিত্যে কেবলমাত্র বিদূষককে আশ্রয় করিয়া নিজেকে হাস্যকর করিয়াছে। গীতিকাব্যের ছন্দে তাহার রসলীলা প্রকাশ পায় নাই, মহাকাব্যের মহাসভা হইতে সে তিরস্কৃত। অথচ গোপনে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, কবিজাতি স্বভাবতই ভোজনে অপটু বা মিষ্টান্নে অরসিক— শত্রুপক্ষেও এমন অপবাদ দেয় না।

ইহার একটা কারণ আছে। ভোজনের তৃপ্তিটুকু উদরপূরণের প্রয়োজনে প্রায়ই নিঃশেষ হইয়া যায়। তাহা আর উদ্‌বৃত্ত থাকে না। যে রস উদ্‌বৃত্ত থাকে না সে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়

না। যেটুকু বৃষ্টি মাটির মধ্যেই শুষিয়া যায় তাহা তো আর স্রোতের আকারে বহিয়া যাইতে পারে না। এই কারণেই রসের সচ্ছলতায় সাহিত্য হয় না, রসের উচ্ছলতায় সাহিত্যের সৃষ্টি।

কতকগুলি রস আছে যাহা মানুষের প্রয়োজনকে অনেক দূর পর্যন্ত ছাপাইয়া উৎসারিত হইয়া উঠে। তাহার মুখ্যধারা আমাদের আবশ্যকে নিঃশেষ হয় এবং গৌণধারা নানাপ্রকার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতে চায়। বীরপুরুষ মুখ্যভাবে তরবারিকে আপনার অস্ত্র বলিয়া জানে ; কিন্তু বীরত্বগৌরব সেইটুকুতেই তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই, সে তরবারিতে কারুকার্য ফলাইয়াছে। কলু নিজের ঘানিকে কেবলমাত্র কাজের ঘানি করিয়াই সন্তুষ্ট ; তাহার মধ্যে গৌণপ্রকাশ কিছুই নাই। ইহাতে প্রমাণ হয়, ঘানি কলুর মনে সেই ভাবের উদ্রেক করিতে পারে নাই যাহা আবশ্যক শেষ করিয়াও অনাবশ্যকে আপনার আনন্দ ব্যক্ত করে। এই রসের অতিরিক্ততাই সংগীতকে ছন্দকে নানাপ্রকার ললিতকলাকে আশ্রয় করিতে চায়। তাহাই ব্যবহারের-অতীত অহেতুক হইয়া অনির্বচনীয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। নায়ক-নায়িকার যে প্রেম কেবলমাত্র দর্শনস্পর্শনের মধ্যেই গাহিয়া উঠে—

'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয় জুড়ন না গেল'

তার সে মুহূর্তকালের দেখাশুনা কেবল সেই মুহূর্তটুকুর মধ্যে নিজেকে ধারণ করিতে পারে না বলিয়াই লক্ষ লক্ষ যুগের আকাঙ্ক্ষা সংগীতের মধ্যে সৃষ্টি না করিয়া বাঁচে না।

অতএব যে রস মানবের সর্বপ্রকার প্রয়োজনমাত্রকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত হয় তাহাই সাহিত্যরস। এইরূপ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদকেই আমরা ঐশ্বর্য বলিয়া থাকি। সাহিত্য মানবহৃদয়ের ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যেই সকল মানুষ সম্মিলিত হয় ; যাহা অতিরিক্ত তাহাই সর্বসাধারণের।

ময়ূরশরীরের যে উদ্যমটা অতিরিক্ত তাহাই তাহার বিপুল পুচ্ছে অনাবশ্যক বর্ণচ্ছটায় বিচিত্র হইয়া উঠে ; এই কলাপশোভা ময়ূরের একলার নহে, তাহা বিশ্বের। প্রভাতের আলোকে পাখির আনন্দ যখন তাহার আহারবিহারের প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে তখনই সেই গানের অপরিমিত ঐশ্বর্যে পাখি বিশ্বসাধারণের সহিত নিজের যোগস্থাপন করে। সাহিত্যেও তেমনি মানুষ আষাঢ়ের মেঘের মতো যে রসের ধারা এবং যে জ্ঞানের ভার নিজের প্রয়োজনের মধ্যে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না তাহাকেই বিশ্বমানবের মধ্যে বর্ষণ করিতে থাকে। এই উপায়েই সাহিত্যের দ্বারাই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়, মনের সঙ্গে মন, মিলিত হইয়া মানুষ ক্রমাগত স্বকীয়, এমন-কি স্বজাতীয়, স্বাতন্ত্র্যের ঊর্ধ্বে বিপুল বিশ্বমানবে পরিণত হইবার অভিমুখে চলিয়াছে। এই কারণেই আমি মনে করি আমাদের ভাষায় 'সাহিত্য' শব্দটি সার্থক। ইহাতে আমরা নিজের অত্যাবশ্যককে অতিক্রম করিয়া উদারভাবে মানুষের ও বিশ্বপ্রকৃতির সাহিত্য লাভ করি।

কোনো দেশে যখন অতিমাত্রায় প্রয়োজনের কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায় তখন সেখানে সাহিত্য নির্জীব হইয়া পড়ে। কারণ, প্রয়োজন পরকে আঘাত করে, পরকে আকর্ষণ করে না। জর্মনিতে যখন লেসিং, গ্যেটে, শিলর, হাইনে, হেগেল, কান্ট্‌, হুম্‌বোল্‌ড সাহিত্যের অমরাবতী সৃজন করিয়াছিল তখন জর্মনির বাণিজ্যতরী-রণতরী ঝড়ের মেঘের মতো পাল ফুলাইয়া পৃথিবী আচ্ছন্ন করিতে ছুটে নাই। আজ বৈশ্যযুগে জর্মনির যতই মেদবৃদ্ধি হইতেছে ততই তাহার সাহিত্যের হৃৎপিণ্ড বলহীন হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজও আজ নিজের ভাণ্ডার পূরণ করা, দুর্বলকে দুর্বলতর করা এবং সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র অ্যাংলোস্যাক্‌শন মহিমাকেই গণ্ডারের নাসাগ্রস্থিত একশৃঙ্গের মতো ভীষণভাবে উদ্যত রাখাকেই ধর্ম বলিয়া গণ্য করিয়াছে ; তাই সেখানে সাহিত্যরঙ্গভূমিতে 'একে একে নিবিছে দেউটি' এবং আজ প্রায় 'নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী'।

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, যে-সকল ভাব বিশ্বমানবের অভিমুখীন তাহাই সাহিত্যকে জীবনদান

করে। বৈষ্ণবধর্মপ্লাবনের সময় বিশ্বপ্রেম যেদিন বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে সমস্ত কৃত্রিম সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙিয়া দিয়া উচ্চনীচ শুচি-অশুচি সকলকেই এক ভগবানের আনন্দলোকে আহ্বান করিল সেইদিনকার বাংলাদেশের গান বিশ্বের গান হইয়া জগতের নিত্যসাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু শুষ্কধর্ম যখন সর্বমানবের মহেশ্বরকে দূরে রাখিয়া মানুষের মধ্যে কেবল বাছ-বিচার এবং ভেদ-বিভেদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সীমাবিভাগ করিতে ব্যগ্র হয় তখন সাহিত্যের রসপ্লাবন শুষ্ক হইয়া যায়, কেবল তর্কবিতর্ক-বাদবিবাদের ধুলা উড়িয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

বৈষ্ণবকাব্যই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সংকীর্ণ আশ্রয় হইতে বৃহৎভাবে জনসমাজের মধ্যে বাহির করিয়া আনিল। পর্বতের গুহা ভেদ করিয়া ঝর্না বাহির হইল। কিন্তু নানা দিক হইতে নানা ধারা আসিয়া না জুটিলে নদী হয় না। আজ বাংলায় গদ্যে-পদ্যে-সম্মিলিত সাহিত্য বাঙালি-জনসাধারণের হৃদয় হইতে বিচিত্র ভাবস্রোত বিবিধ জ্ঞানপ্রবাহ অহরহ আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই সাহিত্যেই বাংলার উত্তরদক্ষিণ পূর্বপশ্চিম সমস্ত প্রদেশ নিরন্তর আপনাকে মিলিত করিতেছে। নিখিল বাঙালির এই হৃদয়সংগমস্থলই বাঙালির সর্বপ্রধান মিলনতীর্থ। এই তীর্থেই আমাদের জাগ্রত দেবতার নিত্য অধিষ্ঠান হইবে এবং এইখানেই আমরা আমাদের সমস্ত যত্ন প্রীতি ও নৈপুণ্যের দ্বারা এমন ধর্মশালা নির্মাণ করিব যেখানে চিরদিন আমাদের উত্তরকালীন যাত্রিগণ আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে।

সাহিত্যের নামে আমরা আজ এই-যে মিলনের সভা আহ্বান করিয়াছি এই মিলনের বিশেষ সার্থকতা প্রমাণ করিবার জন্য সাহিত্যের মূলতত্ত্বের প্রতি আপনাদের মনোযোগ প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। রাজনৈতিক মিলনের মধ্যে বিরোধের বীজ আছে, তাহাতে পরজাতির সহিত সংঘাত আছে ; কিন্তু আমাদের সাহিত্যের মিলন বিশুদ্ধ মিলন, তাহাতে পরের প্রতি বিরোধদৃষ্টি দিবার কোনো প্রয়োজন নাই— তাহা একান্তভাবে স্বজাতির কল্যাণকর। বঙ্গসাহিত্যে বাঙালি নিজের যে পরিচয় পাইয়াছে তাহা তাহার আত্মশক্তি হইতেই উদ্ভূত, এই কারণে সাহিত্যসম্মিলনে আমরা ক্ষুণ্ণ অভিমানের দর্পে অন্যের প্রতি তর্জন গর্জন করিয়া তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করিব না। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে আমাদের এমন সময় আসিয়াছে যখন নানা পীড়নে নানা তাড়নায় আমরা পরসংঘাতের বেদনা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারিতেছি না— এরূপ অবস্থা ব্যাধির অবস্থা। এমন অবস্থায় আমাদের প্রকৃতি তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে না। কিন্তু পরজাত বেদনা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া নিজের মধ্যে আমরা যদি শান্তি ও প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে চাই, যদি নানা দুর্যোগের মধ্যেও আশার ধ্রুবতারাকে উজ্জ্বলরূপে দেখিয়া আমরা বরলাভ করিতে ইচ্ছা করি, তবে এই সাহিত্যের সম্মিলনই তাহার উপায়। যেখানে বেদনা সেইখানেই স্বভাবত বারংবার হাত পড়ে বটে, কিন্তু ব্যথাকে বারংবার স্পর্শদ্বারা ব্যথিততর করিয়া তোলাই আরোগ্যের উপায় নহে। সেই বিশেষ বেদনাকে ভুলিয়া সমস্ত দেহের আভ্যন্তরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন প্রয়োগ করিলে যথাসময়ে এই বেদনা ক্ষীণ হইয়া আসে। আমাদিগকেও এইরূপ চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হইবে ; দিনরাত্রি কেবল অসুখের প্রতিই সমস্ত লক্ষ নিবদ্ধ রাখিলে আমাদের কল্যাণ হইবে না। যেখানে আমাদের বল, যেখানে আমাদের গৌরব, সেখানেই সর্বপ্রযত্নে আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলে তবেই আমাদের মধ্যে প্রকৃত স্বাস্থ্যসঞ্চার হইতে থাকিবে।

কিন্তু এ-সব তো গেল ভাবের কথা। কাজের কথা কি আমাদের সভার মধ্যে পাড়িবার কোনো স্থান নাই ?

সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে পরস্পর প্রীতিস্থাপন কল্যাণকর সন্দেহ নাই, সাহিত্যিকদের মধ্যেও প্রীতিবন্ধন যদি ঘনিষ্ঠ হয় সে তো ভালো কথা, কিন্তু বিশেষভাবে সাহিত্যিকদের মধ্যেই প্রীতিবিস্তারের যে বিশেষ ফল আছে তাহা মনে করি না। অর্থাৎ লেখকগণ পরস্পরকে ভালোবাসিলেই যে তাঁহাদের রচনাকার্যের বিশেষ উপকার ঘটে এমন কথা বলা যায় না। ব্যবসায় হিসাবে সাহিত্যিকগণ বিচ্ছিন্ন, স্ব-স্ব-প্রধান ; তাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া জোট করিয়া সাহিত্যের যৌথ-কারবার করেন না।

তাঁহারা প্রত্যেকে নিজের প্রণালীতে নিজের মন্ত্রে নিজের সরস্বতীর সেবা করিয়া থাকেন। যাঁহারা দশের পন্থা অনুসরণ করিয়া পুঁথিগত বাঁধা মন্ত্রে কাজ সারিতে চান দেবী কখনোই তাঁহাদিগকে অমৃতফল দান করেন না। সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা অনিষ্টকর।

কার্যগতিকে যাঁহারা এইরূপ একাধিপত্য দ্বারা পরিবেষ্টিত, কোনো কোনো স্থলে তাঁহাদের মধ্যে পরিচয় ও প্রীতির অভাব, এমন-কি, ঈর্ষাকলহের সম্ভাবনা ঘটে। এক ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার ভাব দূর করা দুঃসাধ্য। মনুষ্যস্বভাবে অনেক সংকীর্ণতা ও বিরূপতা আছে, তাহার সংশোধন প্রত্যেকের আন্তরিক ব্যক্তিগত চেষ্টার বিষয়— কোনো কৃত্রিম প্রণালীদ্বারা তাহার প্রতিকার সম্ভবপর হইলে আমাদের অদ্যকার উদ্‌যোগের অনেক পূর্বে সত্যযুগ ফিরিয়া আসিত।

দ্বিতীয় কথা, মাতৃভাষার উন্নতি। গৃহের উন্নতি বলিলেই গৃহস্থের উন্নতি বুঝায়, তেমনি ভাষার উন্নতির অর্থই সাহিত্যের উন্নতি, সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই ভাষা সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু কী করিলে সাহিত্যের উন্নতিবিধান হইতে পারে সে ভাবনা মনে উদয় হইলেও ভাবিয়া তাহার কিনারা পাওয়া কঠিন। অনাবৃষ্টির দিনে কী করিলে মেঘের আবির্ভাব হইবে সে চিন্তা মনে আসে ; কিন্তু কী করিলে মেঘের সৃষ্টি হইতে পারে তাহার সিদ্ধান্ত করা যায় না। কয়েক জনে দল বাঁধিয়া কেবল কয়েকটা রশারশিতে টান মারিলেই যে প্রতিভার রঙ্গক্ষেত্রে ঠিক আমাদের ইচ্ছামত সময়েই যবনিকা উঠিয়া যাইবে, এমনতরো আশা করা যায় না।

তবে একটা কথা আছে। যেমন আমরা মানুষ গড়িতে পারি না বটে, কিন্তু তাহার বসনভূষণ গড়িতে পারি, তেমনি সাহিত্যের গঠনকার্যে পরামর্শপূর্বক হস্তক্ষেপ করা যায় না বটে, কিন্তু তাহার আয়োজনকার্য একেবারে আমাদের আয়ত্তাতীত নহে। ব্যাকরণ অভিধান ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি সংগ্রহ করা দলবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা সাধ্য।

চেষ্টার সূত্রপাত পূর্ব হইতেই হইয়াছে ; অনুকূল সময় উপস্থিত হইলেই এই উদ্‌যোগের গৌরব একদিন সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ যে স্বদেশের কত অন্তরঙ্গ ও অন্যান্য বহুতর লোকখ্যাত মুখর অনুষ্ঠানের অপেক্ষা যে কত মহৎ এবং সত্য, একদিন তাহা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হইবে।

আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি সমস্তই এ পর্যন্ত বিদেশী পণ্ডিতেরা সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন।

বিদেশী বলিয়া তাঁহাদের চেষ্টা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমসংকুল হইতে পারে, এই কারণেই যে আমি আক্ষেপ করিতেছি তাহা নহে। দেশে থাকিয়া দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদাসীন, এমন লজ্জা আর নাই। ইহা আমাদের পক্ষে কতবড়ো একটা গালি তাহা আমরা অনুভব করি না। বেদনা সম্বন্ধে সংজ্ঞা না থাকা যেমন রোগের চরম অবস্থা তেমনি যখন হীনতার লক্ষণগুলি সম্বন্ধে আমাদের চেতনাই থাকে না তখনই বুঝিতে হইবে, দুর্গতিপ্রাপ্ত জাতির এই লজ্জাহীনতাই চরম লজ্জার বিষয়। আমাদের দেশে এই একান্ত অসাড়তার ছোটোবড়ো প্রমাণ সর্বদাই দেখিতে পাই। বাঙালি হইয়া বাঙালিকে, পিতাভ্রাতা-আত্মীয়স্বজনকে ইংরেজিতে পত্র লেখা যে কতবড়ো লাঞ্ছনা তাহা আমরা অনুভবমাত্র করি না ; আমরা যখন অসংযত করতালিদ্বারা স্বদেশী বক্তাকে এবং হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে ধ্বনিতে স্বদেশী মান্যব্যক্তিকে উৎসাহ জানাইয়া থাকি তখন সেই কর্ণকটু বিজাতীয় বর্বরতায় আমরা কেহ সংকোচমাত্র বোধ করি না ; যে-সকল অশ্রদ্ধাপরায়ণ পরদেশীর কোনোপ্রকার আমোদ-আহ্লাদে সমাজকৃত্যে আমাদের কোনোদিন কোনো আদর কোনো আহ্বান নাই তাহাদিগকে আমাদের দেবপূজায় ও বিবাহাদি শুভকর্মে গড়ের বাদ্য -সহকারে প্রচুর মদ্যমাংস সেবন করানোকে উৎসবের অঙ্গ বলিয়া আমরা গণ্য করি— ইহার বীভৎসতা আমাদের হৃদয়ের কোথাও বাজে না। তেমনি আমরা আজ অন্তত বিশ-পঁচিশ বৎসর পরের সিংহদ্বারে মুষ্টিভিক্ষার জন্য প্রতিদিন নিষ্ফল যাত্রা করিয়া নিজেকে দেশহিতৈষী বলিয়া নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছি, অথচ দেশের দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাই না, ইহাও একটা অজ্ঞানকৃত প্রহসন। দেশের বিবরণ জানিতে— তাহার ভাষা

ভূগোল ইতিবৃত্ত জীবজন্তু উদ্ভিদ মনুষ্য— তাহার কথাকাহিনী ধর্মসাহিত্য সম্বন্ধে সমস্ত রহস্য স্বচেষ্টায় উদ্‌ঘাটন করিতে লেশমাত্র উৎসাহ বা কৌতূহল অনুভব করি না। যে দেশকে আক্রমণ করিতে হইবে সে দেশের সমস্ত তথ্যানুসন্ধান করা শত্রুপক্ষের কত আবশ্যক তাহা আমরা জানি ; আর, যে দেশের হিতসাধন করিতে হইবে সেই দেশকেই কি জানার কোনো প্রয়োজন নাই ?

কিন্তু প্রয়োজনের কথা কেন তুলিব ? যাঁহারা দেশ শাসন করেন তাঁহারা প্রয়োজনের গরজে দেশের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন, আর যাঁহারা দেশকে ভালোবাসেন বলিয়া থাকেন তাঁহাদের কি ভালোবাসার গরজ নাই ? তাঁহারা কি দেশের অন্তঃপুরে নিজে প্রবেশ করিবেন না ? সেখানকার সমস্ত সংবাদের জন্য থরন্‌টন-হান্টারের মুখের দিকে নিতান্ত নির্লজ্জভাবে নিরুপায় নির্বোধের মতো তাকাইয়া থাকিবেন ?

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ স্বদেশের ভাষাতত্ত্ব প্রাচীনসাহিত্য কথা এবং সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। দেশের হিতসাধনের ইহাই স্থায়ীভিত্তিস্থাপন। এই কারণেই, সাহিত্যপরিষদের অস্তিত্ব সর্বসাধারণের নিকট উৎকটরূপে প্রকাশমান না হইলেও এই সভাকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। এক-এক বৎসরে পর্যায়ক্রমে বাংলার এক-এক প্রদেশে এই সভার সাংবৎসরিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিবার জন্য আমি কিছুকাল হইল প্রস্তাব করিয়াছিলাম ; সে প্রস্তাব পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্য বরিশাল সাহিত্যসম্মিলনের আহ্বানে সাহিত্যপরিষদের সেই প্রাদেশিক অধিবেশনের প্রথম আরম্ভ হওয়াতে আমি আশান্বিত হইয়াছি।

যে প্রদেশে সাহিত্যপরিষদের সাংবৎসরিক অধিবেশন হইবে প্রধানত সেই প্রদেশের উপভাষা ইতিহাস প্রাকৃতসাহিত্য লোকবিবরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ ও আলোচনা হইতে থাকিলে অধিবেশনের উদ্দেশ্য প্রচুররূপে সফল হইবে। সেখানকার প্রাচীন দেবালয় দিঘি ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের ফোটোগ্রাফ এবং প্রাচীন-পুঁথি পুরালিপি প্রাচীন-মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে তাহা বলা বাহুল্য। এই উপলক্ষে স্থানীয় লোকপ্রচলিত যাত্রাগান প্রভৃতির আয়োজন করা কর্তব্য হইবে।

কিন্তু সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এক দিনেই কাজ শেষ করিলে চলিবে না। বাংলাদেশের প্রত্যেক প্রদেশেই সাহিত্যপরিষদের একটি করিয়া শাখা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এই-সকল শাখাসভা অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের আলোচনা ছাড়া প্রধানত তন্নতন্নরূপে স্থানীয় সমস্ত বিবরণ এবং রক্ষণযোগ্য প্রাচীন পুঁথি ও ঐতিহাসিক সামগ্রী সংগ্রহ করিবেন।

স্বদেশী বিবরণ -সংগ্রহে আমি একদিন সাহিত্যপরিষদে ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়াছিলাম। এইরূপে স্বচেষ্টায় দেশের হিতসাধনের উদ্দেশে স্বদেশের আবেদন ছাত্রশালার দ্বারে উপস্থিত করিবার জন্য সাহিত্যপরিষদের ন্যায় প্রবীণমণ্ডলীকে অনুরোধ করিতে আমি সাহস করিয়াছিলাম। তখনো স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নাই।

সেদিনকার অভিভাষণের[১] উপসংহারে বলিয়াছিলাম, 'জননী, সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, স্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙিয়াছে, এইবার তোমার কুটিরপ্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার ক্ষুধিত সন্তানের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে, এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ— তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোটো বড়ো সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রুগদগদ আশীর্বচনের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকো।'

তখন আমাদের সময় যে কত নিকটবর্তী হইয়াছিল তাহা আমাদের ভাগ্যবিধাতাই নিশ্চিতরূপে জানিতেছিলেন। কিন্তু এখনো আমাদের গর্ব করিবার দিন আসে নাই, চেষ্টা করিবার দিন দেখা দিয়াছে মাত্র। যে-সকল কাজ প্রতিদিন করিবার এবং প্রতি মুহূর্তে বাহির হইতে যাহার পুরস্কার পাইবার নহে— যাহার প্রধান বাধা বাহিরের প্রতিকূলতা নহে, আমাদেরই জড়ত্ব, দেশের প্রতি আমাদেরই

১ দ্রষ্টব্য 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' : আত্মশক্তি : সুলভ সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের সভাপতিরূপে। ১৩১৪

আন্তরিক ঔদাসীন্য— সেই-সকল কাজেই আশাপথে নূতনপ্রবৃত্ত তরুণ জীবনগুলিকে উৎসর্গ করিতে হইবে। সেইজন্য বিশেষ করিয়া আজ ছাত্রদের দিকে চাহিতেছি। এ সভায় ছাত্রসম্প্রদায়ের যাঁহারা উপস্থিত আছেন আমি তাঁহাদিগকে বলিতে পারি, প্রৌঢ়বয়সের শিখরদেশে আরোহণ করিয়াও আমি ছাত্রগণকে সুদূর প্রবীণত্বের চক্ষে একদিনও ছোটো করিয়া দেখি নাই।

বয়স্কমণ্ডলীর মধ্যে যখন দেখিতে পাই তাঁহারা পুঁথিগত বিদ্যা লইয়াই আছেন, প্রত্যক্ষ ব্যাপারের সজীব শিক্ষাকে তাঁহারা আমল দেন না— যখন দেখি চিরাভ্যস্ত একই চক্রপথে শতসহস্রবার পরিভ্রান্ত হইবার এবং চিরোচ্চারিত বাক্যগুলিকেই উচ্চকণ্ঠে পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিবার প্রতি তাঁহাদের অবিচলিত নিষ্ঠা— তখন ছাত্রদিগের জ্যোতিঃপিপাসু বিকাশোন্মুখ তারুণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই আমি চিত্তের অবসাদ দূর করিয়াছি। দেশের ভবিষ্যৎকে যাঁহারা জীবনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বহন করিয়া অম্লানতেজে শনৈঃ শনৈঃ উদয়পথে অধিরোহণ করিতেছেন তাঁহাদিগকে অনুনয়-সহকারে বলিতেছি, অন্যান্য শিক্ষার সহিত স্বদেশের সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষপরিচয়ের শিক্ষা যদি তাঁহাদের না জন্মে তবে তাঁহারা কেবল পণ্ডপাণ্ডিত্য লাভ করিবেন, জ্ঞানলাভ করিবেন না। এ দেশ হইতে কৃষিজাত ও খনিজ দ্রব্য দূরদেশে গিয়া ব্যবহার্য পণ্য-আকারে রূপান্তরিত হইয়া এ দেশে ফিরিয়া আসে ; পণ্যসম্বন্ধে এইরূপ দুর্বল পরনির্ভরতা পরিত্যাগ করিবার জন্য সমাজ দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। বস্তুত ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতা -বশত দেশের বিধাতৃদত্ত সামগ্রীকে যদি আমরা ব্যবহারে না লাগাইতে পারি তবে দেশের দ্রব্যে আমাদের কোনো অধিকারই থাকে না, আমরা কেবল মজুরি মাত্র করি। আমাদের এই লজ্জাজনক দৈন্য দূর করার সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে কোনো দ্বিধা নাই। কিন্তু জ্ঞানের সম্বন্ধেও ছাত্রদিগকে এই একই ভাবে সচেতন হইতে হইবে। দেশের বিষয়ে আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষণীয় বিদেশীর হাত দিয়া প্রস্তুত হইয়া বিদেশীর মুখ দিয়া উচ্চারিত হইলে তবেই তাহা আমরা কণ্ঠস্থ করিব, দেশের জ্ঞানপদার্থে আমাদের স্বায়ত্ত অধিকার থাকিবে না, দেবী ভারতীকে আমরা বিলাতি স্বর্ণকারের গহনা পরাইতে থাকিব, এ দৈন্য আমরা আর কত দিন স্বীকার করিব ! আজ আমাদের যে ছাত্রগণ দেশী মোটা কাপড় পরিতেছেন ও স্বহস্তে তাঁত বোনা শিখিতেছেন, তাঁহাদিগকে দেশের সমস্ত বৃত্তান্তসংগ্রহেও স্বদেশী হইতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্র অবকাশকালে নিজের নিবাসপ্রদেশের ধর্মকর্ম ভাষাসাহিত্য বাণিজ্য লোকব্যবহার ইতিহাস জনশ্রুতির বিবরণ সাধ্যমত আহরণ করিতে চেষ্টা করিবেন। এ কথা মনে রাখিতে হইবে, ইঁহাদের সকলেরই সংগ্রহ যে আমাদের সাহিত্যে ব্যবহারযোগ্য হইবে তাহা নহে, কিন্তু এই উপায়ে স্বাধীন জ্ঞানার্জনের উদ্যম তাঁহাদের গ্রন্থভারক্লিষ্ট মনের জড়তা দূর করিয়া দিবে এবং দেশের কোনো পদার্থকেই তুচ্ছজ্ঞান না করিবার এবং দেশী সমস্ত জিনিসই নিজে দেখিবার শুনিবার ও বুঝিবার চেষ্টা তাঁহাদিগকে যথার্থ স্বদেশপ্রীতির দিকে অগ্রসর এবং স্বদেশসেবার জন্য প্রস্তুত করিবে। কোনো প্রীতিই সম্পূর্ণ অকৃত্রিম ও পরিপক্ক হইতেই পারে না, যদি তাহা প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হয়। ভালোবাসা অক্লান্ত যত্নে জানিতে ইচ্ছা করে এবং জানা হইলে ভালোবাসা আরো সত্য ও সুগভীর হয়। আমাদের স্বদেশপ্রেমের সেই ভিত্তির অভাব আছে এবং আমাদের মনে সেই ভিত্তিরচনার জন্য যদি দুর্নিবার আগ্রহ উপস্থিত না হয় তবে যেন আমরা স্বদেশপ্রেমের অভিমান না করি। যদি এই প্রেমের অভিমানী হইবার প্রকৃত অধিকার আমরা না লাভ করিতে পারি তবে স্বদেশ আমাদের স্বদেশ নহে। জ্ঞানের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, সেবার দ্বারা, পরিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারাই অধিকার লাভ করা যায়। জগতে যে জাতি দেশকে ভালোবাসে সে অনুরাগের সহিত স্বদেশের সমস্ত সন্ধান নিজে রাখে, পরের পুঁথির প্রত্যাশায় তাকাইয়া থাকে না ; স্বদেশের সেবা যথাসাধ্য নিজে করে, কেবল পরের কর্তব্যবোধকে জাগ্রত করিবার উপায় সন্ধান করে না ; এবং দেশের সমস্ত সম্পদ্‌কে নিজের সম্পূর্ণ ব্যবহারে আনিতে চেষ্টা করে, বিদেশী ব্যবসায়ীর অশুভাগমনের প্রতীক্ষায় নিজেকে পথের কাঙাল করিয়া রাখে না। তাই আজ আমি আমাদের ছাত্রগণকে বলিতেছি, দেশের উপরে সর্বাগ্রে সর্বপ্রযত্নে জ্ঞানের অধিকার বিস্তার করো, তাহার পরে প্রেমের এবং কর্মের অধিকার সহজে প্রশস্ত হইতে থাকিবে।

আজ আমি বাংলাদেশের দুই বিভিন্ন কালের উদয়াস্তসন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, হে ছাত্রগণ, কবির বাণী স্মরণ করিতেছি—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্।
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ ॥

এখন আমাদের কালের সিতরশ্মি চন্দ্রমা অস্তমিত হইতেছে, তোমাদের কালের তেজ-উদ্‌ভাসিত সূর্যোদয় আসন্ন— তোমরা তাহারই অরুণসারথি। আমরা ছিলাম দেশের সুপ্তিজালজড়িত নিশীথে; অন্যত্র হইতে প্রতিফলিত ক্ষীণজ্যোতিতে আমরা দীর্ঘরাত্রি অপরিস্ফুট ছায়ালোকের মায়া বিস্তার করিতেছিলাম। আমাদের সেই কর্মহীন কালে কত অলীক বিভ্রম এবং অকারণ আতঙ্ক দিগন্তব্যাপী অস্পষ্টতার মধ্যে প্রেতের মতো সঞ্চরণ করিতেছিল। আজ তোমরা পূর্বগগনে নিজের আলোকে দীপ্তিমান হইয়া উঠিতেছ। এখনো জল স্থল আকাশ নিস্তব্ধ হইয়া নবজীবনের পূর্ণবিকাশের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে; অনতিকাল পরেই গৃহে গৃহে, পথে পথে কর্মকোলাহল জাগ্রত হইয়া উঠিবে। এই কর্মদিনের প্রখরদীপ্তি দেশের সমস্ত রহস্য ভেদ করিবে; ছোটোবড়ো সমস্তই তোমাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিবে। তখন তোমাদের কবিবিহঙ্গগণ আকাশে যে গান গাহিবে তাহাতে অবসাদের আবেশ ও সুপ্তির জড়িমা থাকিবে না; তাহা প্রত্যক্ষ আলোকের আনন্দে, তাহা করতললব্ধ সত্যের উৎসাহে, সহস্র জীবন হইতে সহস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। এই জ্যোতির্ময় আশাদীপ্ত প্রভাতকে সুমহান্ সুন্দর পরিণামে বহন করিয়া লইবার ভার তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা বিদায়ের নেপথ্যপথে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলাম। তোমাদের উদয়পথ মেঘনির্মুক্ত হউক, এই আমাদের আশীর্বাদ।

ফাল্গুন ১৩১৩

সাহিত্যপরিষৎ

বাংলাদেশের স্থানে স্থানে সাহিত্যপরিষদের শাখাস্থাপন ও বৎসরে বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় পরিষদের বাৎসরিক মিলনোৎসব -সাধনের প্রস্তাব অন্তত দুইবার আমার মুখ দিয়া প্রচার হইয়াছে। তাহাতে কী উপকারের আশা করা যায় এবং তাহার কার্যপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত তাহাও সাধ্যমত আলোচনা করিয়াছি। অতএব তৃতীয়বারে আমাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত ছিল। একই জমিতে একই ফসল বার বার চাষ করিতে গেলে ফলন ভালো হয় না, নিঃসন্দেহই আমার সুহৃদগণ সে কথা জানেন; কিন্তু তাঁহারা যে ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াও আমাকে সভাস্থলে পুনশ্চ আকর্ষণ করিলেন এর কারণ তো আর কিছু বুঝি না, এ কেবল আমার প্রতি পক্ষপাত। এই অকারণ পক্ষপাত ব্যাপারটার অপব্যয় অন্যের সম্বন্ধে সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সেটা তেমন অত্যুগ্র অন্যায় বলিয়া ঠেকে না— মনুষ্যস্বভাবের এই আশ্চর্যধর্মবশত আমি বন্ধুদের আহ্বান অমান্য করিতে পারিলাম না। ইহাতে যদি আমার অপরাধ হয় ও আমাকে অপবাদ সহ্য করিতে হয় তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্বে আমাদের দেশে পাল-পার্বণ অনেক রকমের ছিল; তাহাতে আমাদের একঘেয়ে একটানা জীবনের মাঝে মাঝে নাড়া দিয়া ঢেউ তুলিয়া দিত। আজকাল সময়াভাবে অন্নাভাবে ও শ্রদ্ধার অভাবে সে-সকল পার্বণ কমিয়া আসিয়াছে। এখন সভা-সমিতি-সম্মিলন সেই-সকল পার্বণের জায়গা দখল করিতেছে। এইজন্য শহরে-মফস্বলে কতরকম উপলক্ষে কতপ্রকার নাম ধরিয়া কত সভাস্থাপন হইতেছে সেই-সকল সভায় দেশের বক্তাদের বক্তৃতার পালা জমাইবার জন্য কত চেষ্টা ও কত আয়োজন হইয়া থাকে তাহা সকলেই জানেন।

অনেকে এই-সকল চেষ্টাকে নিন্দা করেন ও এই-সকল আয়োজনকে হুজুগ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া

থাকেন। বাংলাভাষায় এই হুজুগ শব্দটা কোথা হইতে আসিল তাহা আমাদের পরিষদের শব্দতাত্ত্বিক মহাশয়গণ স্থির করিবেন ; কিন্তু এটা যে আমাদের সমাজের শনিগ্রহের রচনা, আমার তাহাতে সন্দেহ নাই। নিজের জড়ত্বকে অন্য লোকের উৎসাহের চেয়ে বড়ো পদবী দিবার জন্যই প্রায় অচল লোকেরা এই শব্দটা ব্যবহার করিয়া দেশের সমস্ত উদ্যমের মূলে হুল ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

দেশের মধ্যে কিছুকাল হইতেই এই-যে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে এটা যদি হুজুগ হয় তো হোক। আমাদিগকে ভুল করিতে দাও, গোল করিতে দাও, বাজে কাজ করিতে দাও, পাঁচজন লোককে ডাকিতে ও পাঁচ জায়গায় ঘুরিতে দাও। এই নড়াচড়া চলুক। এই নড়াচড়ার দ্বারাই যেটা যে ভাবে গড়িবার সেটা ক্রমে গড়িয়া ওঠে, যেটা বাহুল্য সেটা আপনি বাদ পড়ে, যেটা বিকৃতি সেটার সংশোধন হইতে থাকে। বিবেচকভাবে চুপচাপ করিয়া থাকিলে তাহার কিছু হয় না। আমাদের মনটা যে স্থির হইয়া নাই, দেশের নানা স্থানেই যে ছোটোবড়ো ঘূর্ণাবেগ আজকাল কেবলই প্রকাশ পাইতেছে, ইহাতে বুঝা যাইতেছে একটা সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলিতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে জ্যোতির্বাষ্পই যে কেবল আকার ধারণ করে তাহা নহে, মানুষের মনগুলি যখন গতির বেগ পায় তখন তাহারা জমাট বাঁধিয়া একটা-কিছু গঠন না করিয়া থাকিতে পারে না। অন্তত, আমরা যদি কিছু গড়িয়া তুলিতে চাই তবে এই প্রকার বেগবান অবস্থাই তাহার পক্ষে অনুকূল। কুমোরের চাকা যখন ঘুরিতে থাকে তখনই কুমোর যাহা পারে গড়িয়া লয় ; যখন তাহা স্থির থাকে তখন তাহার কাছে প্রত্যাশা করিবার কিছুই থাকে না।

আজ দেশের মধ্যে চারি দিকে যে একটা বেগের সঞ্চার দেখা যাইতেছে তাহাতেই হঠাৎ দেশের কাছে আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাই বাড়িয়া গেছে। আমাদের যাহার মনে যে উদ্দেশ্য আছে এই বেগের সুযোগে তাহা সিদ্ধ করিয়া লইবার জন্য আমরা সকলেই চকিত হইয়া উঠিয়াছি। আজ আমরা দশজনে যে-কোনো উপলক্ষে একত্র হইলেই তাহার মধ্য হইতে কিছু-একটা মথিয়া উঠিবে, এমন ভরসা হয়। এইরকম সময়ে যাহা অনপেক্ষিত তাহাও দেখা দেয়, যাহাকে আশা করিবার কোনো কারণ ছিল না তাহাও হঠাৎ সম্ভব হইয়া উঠে, আমাদের প্রত্যেকের শক্তি সামান্য হইলেও সমস্ত সমাজের বেগে ক্ষণে ক্ষণে অসাধ্যসাধন হইতে থাকে।

আজ আমাদের সাহিত্যপরিষদেরও আশা বাড়িয়া গেছে। এই-যে এখানে নানা জেলা হইতে আমরা বাঙালি একত্র হইয়াছি, এখানে শুধু একটা মিলনের আনন্দেই এই সম্মিলনকে শেষ করিয়া দিয়া যাইব এমন আমরা মনে করি না ; হয়তো এইবারেই, ফল যেমন যথাসময়ে ডাল ছাড়িয়া ঠিকমত জমিতে পড়ে ও গাছ হইবার পথে যায়, সাহিত্যপরিষদও সেইরূপ নিজেকে বৃহৎ বাংলাদেশের মধ্যে রোপিত করিবার অবসর পাইবে। এবার হয়তো সে বৃহত্তর জন্ম লাভ করিবার জন্য বাহির হইয়াছে। আপনাদের আহ্বান শুধু সমাদরের আহ্বান নহে, তাহা সফলতার আহ্বান। আমরা তো এইমতই আশা করিয়াছি।

যদি আশা বৃথাই হয়, তবু মিলনটা তো কেহ কাড়িয়া লইবে না ; বুদ্ধিমান কবি তো বলিয়াছেন যে, মহাবৃক্ষের সেবা করিলে ফল যদি-বা না পাওয়া যায়, ছায়াটা পাওয়া যাইবেই। কিন্তু ঐটুকু নেহাৎপক্ষের আশা লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিব না। আমরা এই কথাই বলিব, আচ্ছা, আজ যদি বা শুধু ছায়াই জুটিল, নিশ্চয়ই কাল ছায়াও পাইব, ফলও ধরিবে ; কোনোটা বাদ দিব না। সফলতা সম্বন্ধে আধা-আধি রফানিষ্পত্তি করা কোনোমতেই চলিবে না। বহরমপুরের ডাকে আজ আমরা সাহিত্যপরিষদ অত্যন্ত লোভ করিয়াই এখানে আসিয়া জুটিয়াছি ; শুধু আহার দিয়া বিদায় করিলে নিন্দার বিষয় হইবে, দক্ষিণা চাই। সেই দক্ষিণার প্রস্তাবটাই আজ আপনাদের কাছে পাড়িব।

আমার দেশকে আমি যত ভালোবাসি তার দশগুণ বেশি ভালোবাসা ইংরেজের কর্তব্য এ কথা আমরা মুখে বলি না, আমাদের ব্যবহারে তাহাই প্রকাশ পায়। এইজন্য ভারতবর্ষের হিতসাধনে বিদেশীর যত-কিছু ত্রুটি তাহা ঘোষণা করিয়া আমাদের শ্রান্তি হয় না, আর দেশীলোকের যে ঔদাসীন্য সে সম্বন্ধে আমরা একেবারেই চুপ। কিন্তু এ কথাটার আলোচনা বিস্তর হইয়া গেছে, এমন-কি আমার আশঙ্কা হয়, কথাটা আপনার অধিকারের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়াছে-বা। কথা-জিনিসটার দোষই

ঐ— সেটা হাওয়ার জিনিস কিনা, তাই উক্তি দেখিতে দেখিতে অত্যুক্তি হইয়া উঠে। এখন যেন আমরা একটু বেশি তারস্বরে বলিতেছি ইংরেজের কাছ হইতে আমরা কিছুই লইব না। কেন লইব না? দেশের হিতের জন্য যেখানে যাহা পারি সমস্ত আদায় করিব। কেবল এইটুকু পণ করিব, সেই লওয়ার পরিবর্তে নিজেকে বিকাইয়া দিব না। যাহা বিশেষভাবে ইংরেজ গবর্মেন্টের কাছ হইতেই পাইবার তাহা ষোলো-আনাই সেইখান হইতেই আদায় করিবার পুরা চেষ্টাই করিতে হইবে। না করিলে সে তো নিতান্তই ঠকা। নির্বুদ্ধিতাই বীরত্ব নহে।

কিন্তু এই আদায় করিবার কোনো জোর থাকে না, আমরা যদি নিজের দায় নিজে স্বীকার না করি। দেশের যে-সকল কাজ আমরা নিজে করিতে পারি তাহা নিজেরা সাধ্যমত করিলে তবেই আদায় করাটা যথার্থ আদায় করা হয়, ভিক্ষা করা হয় না। এ নহিলে অন্যের কাছে দাবি করার আব্রুই থাকে না। কিছুকাল হইতে আমাদের সেই আব্রু একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছিল; সেইজন্যই লজ্জাবোধটাকে এত জোর করিয়া জাগাইবার একটা একান্ত চেষ্টা চলিতেছে। সকলেই জানেন, জামেকায় ভূমিকম্পের উৎপাতের পর সেখানকার কিংস্টন শহরে ভারি একটা সংকট উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সংকটের সময় আমেরিকার রণতরীর কাপ্তেন ডেভিস তাঁহার মানোয়ারি গোরার দল লইয়া উপকার করিবার উৎসাহবশত কিছু অতিশয় পরিমাণে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা সেখানকার ঘোরতর দুর্যোগেও জামেকাদ্বীপের ইংরেজ অধ্যক্ষ সহ্য করিতে পারেন নাই। ইহার ভাবখানা এই যে, অত্যন্ত দুঃসময়েও পরের কাছে সাহায্য লইবার কালে নিজের ক্ষমতার অপমান করা চলে না; তা যদি করি তবে যাহা পাই তাহার চেয়ে দিই অনেক বেশি। পরের কাছে আনুকূল্য লওয়া নিতান্ত নিশ্চিত মনে করিবার নহে।

এইরূপ দান পাইয়া যদি ক্ষমতা বিক্রয় করি, আমার দেশের কাজ আমি করিবই এবং আমিই করিতে পারি এই পুরুষোচিত অভিমান যদি অনর্গল আবেদনের অজস্র অশ্রুজলধারায় বিসর্জন দিই, তবে তেমন করিয়া পাওয়ার ধিক্‌কার হইতে ঈশ্বর যেন আমাদিগকে নৈরাশ্যদ্বারাই রক্ষা করেন।

বস্তুত এমন করিয়া কখনোই আমরা কোনো আসল জিনিস পাইতেই পারি না। গ্রামে কোনো উৎপাত ঘটিলে আমরা রাজ-সরকারে প্রার্থনা করিয়া দুজন পুলিসের লোক বেশি পাইতে পারি, কিন্তু নিজেরাই যদি সমবেত হইয়া আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারি তবে রক্ষাও পাই, রক্ষার শক্তিও হারাইতে হয় না। বিচারের সুযোগের জন্য দরখাস্ত করিয়া আদালত বাড়াইয়া লইতে পারি, কিন্তু নিজেরা যদি নিজের সালিসি-সভায় মকদ্দমা মিটাইবার বন্দোবস্ত করি তবে অসুবিধারও জড় মরিয়া যায়। মন্ত্রণাসভায় দুইজন দেশী লোক বেশি করিয়া লইলেই কি আমরা রেপ্রেজেন্টেটিভ গবর্মেন্ট পাইলাম বলিয়া হরির লুট দিব? বস্তুত আমাদের নিজের পাড়ার, নিজের গ্রামের, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অশন-বসন-সম্বন্ধীয় সমস্ত শাসনব্যবস্থা আমরা যদি নিজেরা গড়িয়া তুলিতে পারি তবেই যথার্থ খাঁটি জিনিসটি আমরা পাই। অথচ এই-সমস্ত অধিকার গ্রহণ করা পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে না। এ আমাদের নিজের ইচ্ছা চেষ্টা ও ত্যাগ-স্বীকারের অপেক্ষা করে। আমাদের দেশ-জোড়া এই-সমস্ত কাজই আমাদের পথ চাহিয়া বসিয়া আছে; কিন্তু সে পথও আমরা মাড়াই না, পাছে সেই কর্তব্যের সঙ্গে চোখে চোখেও দেখা হয়। যাহাদের এমনি দুরবস্থা তাহারা পরের কাছ হইতে কোনো দুর্লভ জিনিস চাহিয়া লইয়া সেটাকে যথার্থভাবে রক্ষা করিতে পারিবে, এমন দুরাশা কেন তাহাদের মনে স্থান পায়? যে কাজ আমাদের হাতের কাছেই আছে এবং যাহা আমরা ছাড়া আর-কেহই ঠিকমত সাধন করিতে পারে না, তাহাকেই সত্যরূপে সম্পন্ন করিতে থাকিলে তবেই আমরা সেই শক্তি পাইব— যে শক্তির দ্বারা পরের কাছ হইতে নিঃসংকোচে আমাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া তাহাকে কাজে খাটাইতে পারি। এইজন্যই বলিতেছি, যাহা নিতান্তই আমাদের নিজের কাজ তাহার যেটাতেই হাত দিব সেটার দ্বারাই আমাদের মানুষ হইয়া উঠিবার সহায়তা হইবে এবং মানুষ হইয়া উঠিলে তবেই আমাদের দ্বারা সমস্তই সম্ভব হইতে পারিবে।

আমরা যখন প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব লইয়া স্বদেশাভিমান অনুভব

করিতে শুরু করিয়াছিলাম তখন সেই প্রাচীন বিবরণের জোগান পাইবার জন্য আমরা বিদেশের দিকেই অঞ্জলি পাতিয়াছিলাম ; এমন কোনো পণ্ডিত পাইলাম না যিনি স্বদেশের ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য জর্মান পণ্ডিতের মতো নিজের সমস্ত চেষ্টা ও সময় এই কাজে উৎসর্গ করিতে পারিলেন। আজ আমরা স্বদেশপ্রেম লইয়া কম কথা বলিতেছি না ; কিন্তু আজও এই স্বদেশের সামান্য একটি বৃত্তান্তও যদি জানিতে ইচ্ছা করি তবে ইংরেজের রচিত পুঁথি ছাড়া আমাদের গতি নাই। এমন অবস্থায় পরের দরবারে দাবি লইয়া দাঁড়াই কোন্ মুখে, সম্মানই বা চাই কোন্ লজ্জায়, আর সফলতাই বা প্রত্যাশা করি কিরূপে ? যাহার ব্যাবসা চলিতেছে বাজারে তাহারই ক্রেডিট থাকে, সুতরাং অন্য ধনীর কাছ হইতে সে যে সাহায্য পায় তাহাতে তাহার লজ্জার কারণ ঘটে না। কিন্তু যাহার সিকি পয়সার কারবার নাই সে যখন ধনীর দ্বারে দাঁড়ায় তখন কি সে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়ায় না ? এবং তখন যদি সে আঁজলা ভরিয়া কড়ি না পায় তবে তাহা লইয়া বকাবকি করা কি তাহার পক্ষে আরো অবমানকর নহে ?

সেইজন্য আমি এই কথা বার বার বলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, নিজের দেশের কাজ যখন আমরা নিজেরা করিতে থাকিব তখনই অন্যের কাছ হইতেও যথোচিত কাজ আদায় করিবার বল পাইব। নিজেরা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া কেবলমাত্র গলার জোরে যাহা পাই সেই পাওয়াতে আমাদের গলার জোর ছাড়া আর-সকল জোরই কমিয়া যায়।

আমার অদৃষ্টক্রমে এই কথাটা আমাকে অনেক দিন হইতে অনেক বার বলিতে হইয়াছে এবং বলিতে গিয়া সকল সময় সমাদরও লাভ করি নাই ; এখন না বলিলেও চলে, কারণ এখন অনেকেই এই কথাই আমার চেয়ে অনেক জোরেই বলিতেছেন। কিন্তু কথা-জিনিসটার এই একটা মস্ত দোষ যে, তাহা সত্য হইলেও অতি শীঘ্রই পুরাতন হইয়া যায় এবং বরঞ্চ সত্যের হানি লোকে সহ্য করে— তবু পুরাতনত্বের অপরাধ কেহ ক্ষমা করিতে পারে না। কাজ-জিনিসটার মস্ত সুবিধা এই যে, যতদিনই তাহা চলিতে থাকে ততদিনই তাহার ধার বাড়িয়া ওঠে।

এইজন্যই বাংলাদেশের ভাষাতত্ত্ব পুরাবৃত্ত গ্রাম্যকথা প্রভৃতি দেশের সমস্ত ছোটোবড়ো বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার জন্য সাহিত্যপরিষদ যখন দেশের সভার একটি ধারে আসিয়া আসন লইল আমরা আনন্দে ও গৌরবে তাহার অভিষেককার্য করিয়াছিলাম।

যদি বলেন 'সাহিত্যপরিষদ এত দিনে কী এমন কাজ করিয়াছে' তবে সে কথাটা ধীরে বলিবেন এবং সংকোচের সহিত বলিবেন। আমাদের দেশের কাজের বাধা যে কোথায় তাহা আমরা তখনই বুঝিতে পারি যখনই আমরা নিজেরা কাজ হাতে লই ; সে বাধা আমরা নিজেরা, আমরা প্রত্যেকে। যে কাজকে আমরা আমাদের কাজ বলিয়া বরণ করি তাহাকে আমরা কেহই আমার কাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে এখনো শিখি নাই। সেইজন্য আমরা সকলেই পরামর্শ দিতে অগ্রসর হই, কেহই সাহায্য করিতে প্রস্তুত হই না ; ত্রুটি দেখিলে কর্মকর্তার নিন্দা করি, অকর্মকর্তার অপবাদ নিজের উপর আরোপ করি না ; ব্যর্থতা ঘটিলে এমনভাবে আস্ফালন করি যেন কাজ নিষ্ফল হইবে পূর্বেই জানিতাম এবং সেইজন্যই অত্যন্ত বুদ্ধিপূর্বক নির্বোধের উদ্‌যোগে যোগ দিই নাই। আমাদের দেশে জড়তা লজ্জিত নহে, অহংকৃত ; আমাদের দেশে নিশ্চেষ্টতা নিজেকে গোপন করে না, উদ্‌যোগকে ধিক্কার দিয়া এবং প্রত্যেক কাজের খুঁত ধরিয়া সে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে চায়। এইজন্য আমাদের দেশে এ দৃশ্য সর্বদাই দেখিতে পাই যে, দেশের কাজ একটিমাত্র হতভাগ্য টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, হাওয়া এবং স্রোত দুই উলটা, এবং দেশের লোক তীরে বসিয়া দিব্য হাওয়া খাইতে খাইতে কেহ-বা প্রশংসা করিতেছে, কেহ-বা লোকটার অক্ষমতা ও বিপত্তি দেখিয়া নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিতেছে।

এমন অবস্থায় দেশের অতি ক্ষুদ্র কাজটিকেও গড়িয়া তোলা কত কঠিন সে কথা আমরা যেন প্রত্যেকে বিবেচনা করিয়া দেখি। একটা ছোটো ইস্কুল, একটা সামান্য লাইব্রেরি, একটা আমোদ করিবার দল বা একটা অতি ছোটো রকমেরও কাজ করিবার ব্যবস্থা আমরা জাগাইয়া রাখিতে পারি না। সমুদ্রে জল থই-থই করিতেছে, তাহার এক ফোঁটা মুখে দিবার জো নাই ; আমাদের দেশেও ষষ্ঠীর প্রসাদে মানুষের অভাব নাই, কিন্তু কর্তব্য যখন তাহার পতাকা লইয়া আসিয়া শঙ্খধ্বনি করে তখন

চারি দিকে চাহিয়া একটি মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই-যে আমাদের দেশে কোনোমতেই কিছুই আঁট বাঁধে না, সংকল্পের চারি দিকে জল জমিয়া উঠে না, কোনো আকস্মিক কারণে দল বাঁধিলেও সকালের দল বিকাল বেলায় আলগা হইয়া আসে, এইটি ছাড়া আমাদের দেশে আর দ্বিতীয় কোনো বিপদ নাই। আমাদের এই একটিমাত্র শত্রু। নিজের মধ্যে এই প্রকাণ্ড শূন্যতা আছে বলিয়াই আমরা অন্যকে গালি দিই। আমরা কেবলই কাঁদিয়া বলিতেছি : আমাদিগকে দিতেছে না। বিধাতা আমাদের কানে ধরিয়া বলিতেছেন : তোমরা লইতেছ না। আমরা একত্র হইব না, চেষ্টা করিব না, ত্যাগ করিব না, কষ্ট সহিব না কেবলই চাহিব এবং পাইব— কোনো জাতির এতবড়ো সর্বনেশে প্রশ্রয়ের দৃষ্টান্ত জগৎসংসারের ইতিহাসে তো আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। তবু কেবল আমাদেরই জন্য বিশ্ববিধাতার একটি বিশেষ বিধির অপেক্ষায় আকাশে চাহিয়া বসিয়া আছি। সে বিধি আমাদের দেশে কবে চলিবে জানি না, কিন্তু বিনাশ তো সবুর করিবে না। সবুর করেও নাই ; অনশন মহামারী অপমান গৃহবিচ্ছেদ চারি দিকে জাগিয়া উঠিয়াছে। রুদ্রদেব বজ্র-হাতে আমাদের অনেক কালের পাপের হিসাব লইতে আসিয়াছেন ; খবরের কাগজে মিথ্যা লিখিতে পারি, সভাস্থলে মিথ্যা বলিতে পারি, রাজার চোখে ধুলা দিতে পারি, এমন-কি, নিজেকে ফাঁকি দেওয়াও সহজ ; কিন্তু তাঁহাকে তো ভুল বুঝাইতে পারিলাম না। যাহার উপরেই দোষারোপ করি-না কেন, রাজাই হোক বা আর যেই হোক, মরিতেছি তো আমরাই ; মাথা তো আমাদেরই হেঁট হইতেছে এবং পেটের ভাত তো আমাদেরই গেল। পরের কর্তব্যের ত্রুটি অন্বেষণ করিয়া আমাদের শ্মশানের চিতা তো নিবিল না।

আরামের দিনে নানাপ্রকার ফাঁকি চলে, কিন্তু মৃত্যুসহচর বিধাতা যখন স্বয়ং দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তখন আজ আর মিথ্যা দিয়া হিসাব-পূরণ হইবে না। এখন আমাদের কঠোর সত্যের দিন আসিয়াছে। আজ আমরা যে-কোনো কাজকেই গ্রহণ করি-না কেন, সকলে মিলিয়া সে কাজকে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে। দেশের যে-কোনো যথার্থ মঙ্গল-অনুষ্ঠানকে আমরা উপবাসী করিয়া ফিরাইব সেই আমাদের পৃথিবীর মধ্যে মাথা তুলিবার ও বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার কিছু-না-কিছু কাড়িয়া লইয়া চলিয়া যাইবে। ছোটো হউক বড়ো হউক, নিজের হাতে দেশের যে-কোনো কাজকে সত্য করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব সেই কাজই রুদ্রের দরবারে আমাদের উকিল হইয়া দাঁড়াইবে, সেই আমাদের রক্ষার উপায় হইবে।

কেবল সংকল্পের তালিকা বাড়াইয়া চলিলে কোনো লাভ নাই ; কিন্তু যেমন করিয়া হউক, দেশের যথার্থ স্বকীয় একটি-একটি কাজকে সফল করিয়া তুলিতেই হইবে। সে কেবল সেই একটি বিশেষ কার্যের ফললাভ করিবার জন্য নহে ; সকল কার্যেই ফললাভের অধিকার পাইবার জন্য। কারণ সফলতাই সফলতার ভিত্তি। একটাতে কৃতকার্য হইলেই অন্যটাতে কৃতকার্য হইবার দাবি পাকা হইতে থাকে, এই কথা মনে রাখিয়া দেশের কাজগুলিকে সফল করিবার দায় আমাদের প্রত্যেককে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহার টাকা আছে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া টাকা ভোগ করিবেন না ; যাঁহার বুদ্ধি আছে তিনি কেবল অন্যের প্রয়াসকে বিচার করিয়া দিনযাপন করিবেন না ; দেশের কাজগুলিকে সফল করিবার জন্য যেখানেই আমাদের সকলের চেষ্টা মিলিত হইতে থাকিবে সেখানেই আমাদের স্বদেশ সত্য হইয়া উঠিবে।

দেশ-জিনিসটা তো কাহাকেও নিজের শক্তিতে উপার্জন করিয়া আনিতে হয় নাই। আমরা যে পৃথিবীতে এত জায়গা থাকিতে এই বাংলাদেশেই জন্মিতেছি ও মরিতেছি সে তো আমাদের নিজগুণে নহে, এবং বাংলাদেশেরও বিশেষ পুণ্যপ্রভাবে এমনও বলিতে পারি না। দেশ পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গেরও আছে। কিন্তু স্বদেশকে নিজে সৃষ্টি করিতে হয়। সেইজন্যেই স্বদেশে কেহ হাত দিতে আসিলে স্বদেশীমাত্রেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে ; কেননা, সেটা যে বহুকাল হইতে তাহাদের নিজের গড়া— সেখানে যে তাহাদের বহু যুগের আহরিত মধু সমস্ত সঞ্চিত হইয়া আছে। যে-সকল দেশের লোক তাহাদের নিজের শরীর-মন-বাক্যের সমস্ত চেষ্টার দ্বারা জ্ঞানে প্রেমে কর্মে স্বদেশকে আপনি গড়িয়া

তুলিতেছে, দেশের অন্নবস্ত্রস্বাস্থ্যজ্ঞানের সমস্ত অভাব আপনি পূরণ করিয়া তুলিতেছে, দেশকে তাহারাই স্বদেশ বলিতে পারে এবং স্বদেশ-জিনিসটা যে কী তাহাদিগকে বক্তৃতা করিয়া বুঝাইতেও হয় না ; মৌমাছিকে আপন চাকের মর্যাদা বুঝাইবার জন্য বড়ো বড়ো পুঁথির দোহাই পাড়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমরা দেশের কোনো সত্যকর্মে নিজেরা হাত না লাগাইয়াও আজ পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর ইংরেজি ও বাংলায়, গদ্যে ও পদ্যে, স্বদেশের গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই স্বদেশের স্ব'টা যে কোথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া গোল্ডস্টুকর ম্যাক্সমূলর মুয়রের প্রত্নতত্ত্ব খুঁজিয়া হয়রান হইতে হইয়াছে। শাণ্ডিল্যমুনির আশ্রমের জায়গাটার যদি আজ হঠাৎ আবিষ্কার হয় তবে আমি শাণ্ডিল্যগোত্রের দোহাই দিয়া সেটা দখল করিতে গেলে আইনের পেয়াদা তো মানিবে না। পাঁচ-সাত হাজার বৎসর পূর্বের উপর স্বদেশের স্বকীয়ত্বের বরাত দিয়া গৌরব করিতে বসিলে কেবল গলা ভাঙাই সার হয়। স্বকীয়ত্বকে অবিচ্ছিন্ন নিজের চেষ্টায় রক্ষা করিতে হয়। আজ আমাদের পক্ষে স্বদেশ কোথায় ? সমস্ত দেশের মধ্যে যেখানেই আমরা নিজের শক্তিতে দেশবাসীদের জন্য কিছু-একটা গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছি কেবলমাত্র সেইখানেই আমাদের স্বদেশ। এমনি করিয়া যাহা-কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিব তাহাতেই আমাদের স্বদেশের বিস্তার ঘটিতে থাকিবে, সেই স্বদেশের উপর আমাদের সমস্ত প্রাণের দাবি জন্মিতে থাকিবে ; অন্যে যাহা দয়া করিয়া দিবে তাহাতেও নহে এবং বহু হাজার বৎসর পূর্বে যে দলিল পাকা হইয়াছিল তাহাতেও না।

অদ্যকার সভায় আমার নিবেদন এই, সাহিত্যপরিষদের মধ্যে আপনারা সকলে মিলিয়া স্বদেশকে সত্য করিয়া তুলুন। বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক বাঙালি সাহিত্যপরিষদের মধ্যে নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টাকে একত্রে জাগ্রত করিয়া আজ যাহা অস্ফুট আছে তাহা স্পষ্ট করুন, যাহা ক্ষুদ্র আছে তাহাকে মহৎ করুন। কোন্‌খানে এই পরিষদের কী অসম্পূর্ণতা আছে তাহা লইয়া প্রশ্ন করিবেন না, ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়া প্রত্যেকে গৌরবলাভ করুন। দেবপ্রতিমা ঘরে আসিয়া পড়িলে গৃহস্থকে তাহার পূজা সারিতেই হয় ; আজ বাঙালির ঘরে তিনটি দেবপ্রতিমা আসিয়াছে— সাহিত্যপরিষৎ, শিক্ষাপরিষৎ ও শিল্পবিদ্যালয়। ইহাদিগকে ফিরাইয়া দিলে দেশে যে অমঙ্গল ঘটিবে তাহার ভার আমরা বহন করিতে পারিব না।

অনেকের মনে এ প্রশ্ন উঠিবে, দেশের কাজ হিসাবে সাহিত্যপরিষদের কাজটা এমনি কী একটা মস্ত ব্যাপার ! এইরূপ প্রশ্ন আমাদের দেশের একটা বিষম বিপদ। য়ুরোপ-আমেরিকা তাহার প্রকাণ্ড কর্মশালা লইয়া আমাদের চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই দেখিয়া আমাদের অবস্থা বড়ো হইবার পূর্বেই আমাদের নজর বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে কাজ দেখিতে ছোটো তাহাতে উৎসাহই হয় না ; এইজন্য বীজরোপণ করা হইল না, একেবারে আস্ত বনস্পতি তুলিয়া আনিয়া পুঁতিয়া অন্য দেশের অরণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এ তো প্রেমের লক্ষণ নহে, এ অহংকারের লক্ষণ। প্রেমের অসীম ধৈর্য, কিন্তু অহংকার অত্যন্ত ব্যস্ত। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, ইংরেজ নানামতে আমাদিগকে অবজ্ঞা দেখাইয়া আমাদের অহংকারকে অত্যন্ত রাঙা করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের এই কথাই কেবল বলিবার প্রবৃত্তি হইতেছে, আমরা কিছুতেই কম নই। এইজন্য আমরা যাহা-কিছু করি সেটাকে খুবই বড়ো করিয়া দেখাইতে না পারিলে আমাদের বুক ফাটিয়া যায়। একটা কাজ ফাঁদিবার প্রথমেই তো একটা খুব মস্ত নামকরণ হয় ; নামের সঙ্গে 'ন্যাশনাল' শব্দটা কিংবা ঐরকমের একটা বিদেশী বিড়ম্বনা জুড়িয়া দেওয়া যায়। এই নামকরণ-অনুষ্ঠানেই গোড়ায় ভারি একটি পরিতৃপ্তি বোধ হয়। তার পরে বড়ো নামটি দিলেই বড়ো আয়তন না দিলে চলে না ; নতুবা বড়ো নাম ক্ষুদ্র আকৃতিকে কেবলই বিদ্রূপ করিতে থাকে। তখন নিজের সাধ্যকে লঙ্ঘন করিতে চাই। তক্‌মাওয়ালা লাগামের খাতিরে ওয়েলারের জুড়ি না হইলে মুখরক্ষা হয় না— এ দিকে 'অদ্যভক্ষ্যোধনুর্গুণঃ'। যেমন করিয়া হউক, একটা প্রকাণ্ড ঠাট গড়িয়া তুলিতে হয় ; ছোটোকে ক্রমে ক্রমে বড়ো করিয়া তুলিবার, কাঁচাকে দিনে দিনে পাকা করিয়া তুলিবার যে স্বাভাবিক প্রণালী তাহা বিসর্জন দিয়া যত বড়ো প্রকাণ্ড স্পর্ধা খাড়া করিয়া তুলি তত বড়োই প্রকাণ্ড ব্যর্থতার আয়োজন করা

যায়। যদি বলি 'গোড়ার দিকে সুর আর-একটু নামাইয়া ধরো-না কেন' তবে উত্তর পাওয়া যায়, তাহাতে লোকের মন পাইব না। হায় রে লোকের মন ! তোমাকে পাইতেই হইবে বলিয়া পণ করিয়া বসাতেই তোমাকে হারাই। তোমাকে চাই না বলিবার জোর যাহার আছে সেই তোমাকে জয় করে। এইজন্যই যে ছোটো সেই বড়ো হইতে থাকে ; যে গোপনে শুরু করিতে পারে সেই প্রকাশ্যে সফল হইয়া উঠে।

সকল দেশেরই মহত্ত্বের ইতিহাসে যেটা আমাদের চক্ষুর গোচর তাহা দাঁড়াইয়া আছে কিসের উপরে ? যেটা আমাদের চক্ষুর গোচর নহে তাহারই উপর। আমরা যখন নকল করিতে বসি, তখন সেই দৃষ্টিগোচরটারই নকল করিতে ইচ্ছা যায় ; যাহা চোখের আড়ালে আছে তাহা তো আমাদেব মনকে টানে না। এ কথা ভুলিয়া যাই, যাহাদের নামধাম কেহই জানে না দেশের সেই শতসহস্র অখ্যাত লোকেরাই নিজের জীবনের অজ্ঞাত কাজগুলি দিয়া যে স্তর বাঁধিয়া দিতেছে তাহারই উপরে নামজাদা লোকেরা বড়ো বড়ো ইমারত বানাইয়া তুলিতেছে। এখন যে আমাদিগকে ভিত কাটিয়া গোড়াপত্তন করিতে হইবে— সে ব্যাপারটা তো আকাশের উপরকার নহে, তাহা মাটির নীচেকার, তাহার সঙ্গে ওয়েস্ট্‌মিনিস্টার হলের তুলনা করিবার কিছুই নাই। গোড়ায় সেই গভীরতা, তার পরে উচ্চতা। এই গভীরতার রাজ্যে স্পর্ধা নাই, ঘোষণা নাই ; সেখানে কেবল নম্রতা অথচ দৃঢ়তা, আত্মগোপন এবং আত্মত্যাগ। এই-সমস্ত ভিতের কাজে, ভিতরের কাজে, মাটির সংস্রবের কাজে আমাদের মন উঠিতেছে না ; আমরা একদম চূড়ার উপর জয়ডঙ্কা বাজাইয়া ধ্বজা উড়াইয়া দিতে চাই। স্বয়ং বিশ্বকর্মাও তেমন করিয়া বিশ্বনির্মাণ করেন নাই। তিনিও যুগে যুগে অপরিস্ফুটকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন।

তাই বলিতেছি, সকল দেশেই গোড়ার কাজটা ঠিকমত চলিতেছে বলিয়াই ডগার কাজটা রক্ষা পাইতেছে ; নেপথ্যের ব্যবস্থা পাকা বলিয়াই রঙ্গমঞ্চের কাজ দিব্য চলিয়া যাইতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষা অন্ন-উপার্জন জ্ঞানশিক্ষার কাজে দেশ ব্যাপিয়া হাজার-হাজার লোক মাটির নীচেকার শিকড়ের মতো প্রাণপণে লাগিয়া আছে বলিয়াই সে-সকল দেশে সভ্যতার এত শাখাপ্রশাখা, এত পল্লব, এত ফুলফলের প্রাচুর্য। এই গোড়াকার অত্যন্ত সাধারণ কাজগুলির মধ্যে যে-কোনো একটা কাজ করিয়া তোলাই যে আমাদের পক্ষে অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোককে শিখাইতে হইবে, তাহার উদ্‌যোগ করিতেই প্রাণ বাহির হইয়া যায় ; খাওয়াইতে হইবে, তাহার সংগতি নাই ; রোগ দূর করিতে হইবে, সাহেব এবং বিধাতার উপর ভার দিয়া বসিয়া আছি। মাট্‌সীনি গারিবাল্ডি হ্যাম্প্‌ডেন ক্রমোয়েল হইয়া উঠাই যে একমাত্র বড়ো কাজ তাহা নহে ; তাহার পূর্বে গ্রামের মোড়ল, পাঠশালার গুরুমশায়, পাড়ার মুরুব্বি, চাষাভুষার সর্দার হইতে না পারিলে বিদেশের ইতিবৃত্তকে ব্যঙ্গ করিবার চেষ্টা একান্তই প্রহসনে পরিণত হইবে। আগে দেশকে স্বদেশ করিতে হইবে, তার পরে রাজ্যকে স্বরাজ্য করিবার কথা মুখে আনিতে পারিব। অতএব পরিষদের কাজ কী হিসাবে বড়ো কাজ, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না। এ-সমস্ত গোড়াকার কাজ। ইহার ছোটোবড়ো নাই।

দেশকে ভালোবাসিবার প্রথম লক্ষণ ও প্রথম কর্তব্য দেশকে জানা, এই কথাটা আমাদের দেশ ছাড়া আর-কোনো দেশে উল্লেখমাত্র করাই বাহুল্য। পৃথিবীর অন্যত্র সকলেই আপনার দেশকে বিশেষ করিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া, জানিতেছে। না জানিলে দেশের কাজ করা যায় না। শুধু তাই নয়, এই জানিবার চর্চাই ভালোবাসার চর্চা। দেশের ছোটোবড়ো সমস্ত বিষয়ের প্রতি সচেতন দৃষ্টি প্রয়োগ করিলেই তবে সে আমার আপন ও আমার পক্ষে সত্য হইয়া উঠে। নইলে দেশহিত সম্বন্ধে পুঁথিগত শিক্ষা লইয়া আমরা যে-সকল বড়ো বড়ো কথা বার্ক্‌-মেকলের ভাষায় আবৃত্তি করিতে থাকি সেগুলো বড়োই বেসুরো শোনায়।

তাই দেশের ভাষা পুরাবৃত্ত সাহিত্য প্রভৃতি সকল দিক দিয়া দেশকে জানিবার জন্য সাহিত্যপরিষৎ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাংলাদেশের সকল জেলাই যদি তাঁহার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ দেন তবেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। সফলতা দুই দিক দিয়াই হইবে— এক, যোগের সফলতা ; আর-এক, সিদ্ধির

সফলতা। আজ বরিশাল ও বহরমপুর যে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহাতে মনে মনে আশা হইতেছে আমাদের বহু দিনের চেষ্টার সার্থকতা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে।

দীপশিখা জ্বালিবার দুইটা অবস্থা আছে। তাহার প্রথম অবস্থা চক্‌মকি ঠোকা। সাহিত্যপরিষৎ কাজ আরম্ভ করিয়া প্রথম কিছুদিন চক্‌মকি ঠুকিতেছিল, তাহাতে বিচ্ছিন্নভাবে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। দেশে বুঝি তখনো পলিতা পাকানো হয় নাই, অর্থাৎ দেশের হৃদয়গুলি এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত এক সূত্রে পাকাইয়া ওঠে নাই। তার পরে স্পষ্টই দেখিতেছি, আমাদের দেশে হঠাৎ একটা শুভদিন আসিয়াছে— যেমন করিয়াই হউক, আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে একটা যোগ হইয়াছে— তাহা হইবামাত্র দেশের যেখানে যে-কোনো আশা ও যে-কোনো কর্ম মরো-মরো হইয়াছিল তাহারা সকলেই যেন একসঙ্গে রস পাইয়া নবীন হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যপরিষদ্‌ও এই অমৃতের ভাগ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এইবার তাহার বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ যদি শুভদৈবক্রমে পলিতার মুখে ধরিয়া উঠে তবে একটি অবিচ্ছিন্ন শিখারূপে দেশের অন্তঃপুরকে সে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারিবে।

অতএব বিশেষ করিয়া বহরমপুরের প্রতি এবং সেইসঙ্গে বাংলাদেশের সমস্ত জেলার কাছে আজ আমাদের নিবেদন এই যে, সাহিত্যপরিষদের চেষ্টাকে আপনারা অবিচ্ছিন্ন করুন, দেশের হৃদয়-পলিতাটির একটা প্রান্ত ধরিয়া উঠিতে দিন, তাহা হইলে একটি ক্ষুদ্র সভার প্রয়াস সমস্ত দেশের আধারে তাহার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অমর হইয়া উঠিবে। আমাদের অদ্যকার এই মিলনের আনন্দ স্থায়ী যোগের আনন্দে যদি পরিণত হয় তবে যে চিরন্তন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে সেখানে ভাগীরথীর তীর হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীর পর্যন্ত, সমুদ্রকূল হইতে হিমাচলের পাদদেশ পর্যন্ত, বাংলাদেশের সমস্ত প্রদেশ আপন উদ্‌ঘাটিত প্রাণভাণ্ডারের বিচিত্র ঐশ্বর্য -বহন-পূর্বক এক ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে পুণ্যক্ষেত্র করিয়া তুলিবে। আপনারা মনে করিবেন না, আমাদের এ সভা কেবল বিশেষ একটি কার্যসাধন করিবার সভামাত্র। দেশের অদ্যকার পরম দুঃখদারিদ্র্যের দিনে যে-কোনো মঙ্গলকর্মের প্রতিষ্ঠান আমরা রচনা করিয়া তুলিতে পারিব তাহা শুদ্ধমাত্র কাজের আপিস হইবে না, তাহা তপস্যার আশ্রম হইয়া উঠিবে; সেখানে আমাদের প্রত্যেকের নিঃস্বার্থ সাধনার দ্বারা সমস্ত দেশের বহুকালসঞ্চিত অকৃতকর্তব্যের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইতে থাকিবে। এই-সমস্ত পাপের ভরা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আজ দেশের অতি ছোটো কাজটিও আমাদের পক্ষে এত একান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছে। আজ হইতে কেবলই কর্মের দ্বারাই কর্মের এই-সমস্ত কঠিন বাধা ক্ষয় করিবার জন্য আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। হাতে হাতে ফল পাইব এমন নহে, বারংবার ব্যর্থ হইতে হইবে— কিন্তু তবু অপরাধমোচন হইবে, বাধা জীর্ণ হইবে, দেশের ভবিতব্যতার রুদ্রমুখচ্ছবি প্রতিদিন প্রসন্ন হইয়া আসিবে।

চৈত্র ১৩১৩

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, অন্যান্য বিশেষ সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রবীন্দ্র-রচনাবলী-সংস্করণ, ইহাদের পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন গ্রন্থে ভূমিকা ও সূচনাগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলীর জন্য কবি-কর্তৃক নূতন লিখিত।

বিশ্বভারতী-প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইল।

কথা ও কাহিনী

কথা ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধ কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই-একটি ইংরাজি শিখ-ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে— আশা করি সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্য-নীতি-বিধানমতে দণ্ডনীয় গণ্য হইব না।

'বিজ্ঞাপন'। কথা। প্রথম সংস্করণ

মোহিতচন্দ্র সেন -কর্তৃক সম্পাদিত, বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত কাব্যগ্রন্থে (১৩১০) কথার কবিতাগুলি দুই অংশে প্রকাশিত হয়— 'কাহিনী' ও 'কথা'। কথার প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত 'দেবতার গ্রাস' ও 'বিসর্জন', সোনার তরীর 'গানভঙ্গ', চিত্রার 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি', মানসীর 'নিষ্ফল উপহার', তা ছাড়া কোনো গ্রন্থে অপ্রকাশিত 'দীনদান' (ভারতী, ১৩০৭) কাহিনী অংশের অন্তর্গত হয়। কথার অবশিষ্ট কবিতাগুলি ও চিত্রার 'ব্রাহ্মণ' এবং মানসীর 'গুরুগোবিন্দ' কবিতা কথা অংশে মুদ্রিত হয়। পরে এই দুই অংশের কবিতা লইয়া ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে স্বতন্ত্রভাবে 'কথা ও কাহিনী' নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। তদবধি এই গ্রন্থ এইভাবেই পরিচিত ও প্রচলিত।

কথা ও কাহিনীর পরবর্তী কোনো সংস্করণে কল্পনার 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতাটি কাহিনী অংশে যোগ করা হইয়াছিল। কাহিনীতে সংকলিত অন্য কবিতাগুলির সহিত সামঞ্জস্য না থাকায় রচনাবলী-সংস্করণে উহা কাহিনী হইতে বর্জিত এবং যথাপূর্ব কল্পনাতে মুদ্রিত হইয়াছে।

কথার 'পূজারিনী' ও 'পরিশোধ' কবিতার গল্পাংশ অবলম্বনে কবি পরবর্তী কালে যথাক্রমে 'নটীর পূজা' নাটক (১৩৩৩) ও 'নৃত্যনাট্য শ্যামা' (১৩৪৬) রচনা করিয়াছেন।

'নিষ্ফল উপহার' কবিতাটির পাঠ 'কথা ও কাহিনী'তে বহুশঃ পরিবর্তিত হইয়াছে ; 'মানসী' হইতে উহার মূল পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছল ছল করতালি দেয় অনিবার।

বরষার নির্ঝরে অঙ্কিতকায়
দুই তীরে গিরিমালা কতদূর যায় !
স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে,
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে ।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি হস্ত বাড়ায়ে ।
তৃণহীন সুকঠিন বিদীর্ণ ধরা,
রৌদ্র-বরন ফুলে কাঁটাগাছ ভরা ।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে
পথহীন, জনহীন, শব্দবিহীন ।
ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন ।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা,
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা ।
রঘু কহিলেন নমি চরণে তাঁহার,
'দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার !'

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায় কুশল
আশিসিলা মাথায় পরশি করতল ।
কনকে হীরকে গাঁথা বলয় দুখানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি দুই পাণি ।

ভূমিতল হতে বালা লইলেন তুলে,
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে আঙুলে ।
হীরকের সূচিমুখ শতবার ঘুরি
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি ।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,
আবার সে পুঁথি-'পরে নিবেশিলা আঁখি ।
সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে ।

'আহা আহা' চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু হাত ।
আগ্রহে যেন তার প্রাণমন কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায় ।

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠসুখ ।

কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছল-ভরা সুগভীর চুরির মতন।

দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু।
যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু।
সিক্ত বসন লয়ে শ্রান্ত শরীরে
রঘুনাথ গুরু-কাছে আসিলেন ফিরে।

'এখনো উঠাতে পারি' করজোড়ে যাচে,
'যদি দেখাইয়া যাও কোন্‌খানে আছে।'
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি দিয়া জলে
গুরু কহিলেন, 'আছে ওই নদীতলে।'

উভয় পাঠে ছন্দের যে ভিন্নতা সে সম্পর্কে 'মানসী'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নিম্নলিখিত অংশ প্রণিধানযোগ্য—

এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর-স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে। সেরূপ স্থলে সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে ছন্দ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। যথা—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল ;
ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।

'নিম্নে' 'স্বচ্ছ' এবং 'ঊর্ধ্বে' এই কয়েকটি শব্দে তিন মাত্রা গণনা না করিলে পয়ার ছন্দ থাকে না। আমার বিশ্বাস, যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর-স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ; কেবল বাঙ্গালা ছন্দ পাঠ করিয়া বিকৃত অভ্যাস হওয়াতেই সহসা তা দুঃসাধ্য মনে হইতে পারে। শব্দের আরম্ভ-অক্ষর যুক্ত হইলেও তাহাকে যুক্তাক্ষর-স্বরূপে গণনা করা যায় নাই— পাঠকেরা এইরূপ আরো দুই-একটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন।...

—গ্রন্থকার

'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা, ১৯ ফাল্গুন ১৩৩০) রবীন্দ্রনাথ 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' কবিতাটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

যারা তথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে তাদের হাতে কবিদের কী দুর্গতি ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমি কবিতায় একটি বৌদ্ধকাহিনী লিখেছিলেম। বিষয়টি হচ্ছে এই : একদা প্রভাতে অনাথপিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধের নামে শ্রাবস্তী নগরের পথে ভিক্ষা মেগে চলেছেন। ধনীরা এনে দিল ধন, শ্রেষ্ঠীরা এনে দিল রত্ন, রাজঘরের বধূরা এনে দিলে হীরামুক্তার কণ্ঠী। সব পথে পড়ে রইল, ভিক্ষার ঝুলিতে উঠল না। বেলা যায়, নগরের বাহিরে পথের ধারে গাছের তলায় অনাথপিণ্ডদ দেখলেন এক ভিক্ষুক মেয়ে। তার আর কিছুই নেই, গায়ে একখানি জীর্ণ চীর। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মেয়ে সেই চীরখানি প্রভুর নামে দান করলে। অনাথপিণ্ডদ বললেন, অনেকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু সব তো কেউ দেয় নি। এতক্ষণে আমার প্রভুর যোগ্য দান মিলল, আমি ধন্য হলুম।

একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধার্মিক খ্যাতিমান্ লোক এই কবিতা পড়ে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলেন ; বলেছিলেন, এ তো ছেলেমেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়। এমনি আমার ভাগ্য, আমার খোঁড়া কলম খানার মধ্যে পড়তেই আছে। যদি-বা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে

আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আবরু নষ্ট হল ! নীতিনিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড়ো হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল। হায় রে কবি, একে তো ভিখারিনীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই তথ্য হিসাবে অধর্ম, তার পরে নিতান্ত নিতেই যদি হয় তা হলে তার পাতার কুঁড়ের ভাঙা ঝাঁপটা কিংবা একমাত্র মাটির হাঁড়িটা নিলে তো সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হতে পারত। তথ্যের দিক থেকে এ কথা নতশিরে মানতেই হবে। এমন-কি, আমার মতো কবিও যদি তথ্যের জগতে ভিক্ষা করতে বেরোত তবে কখনোই এমন গর্হিত কাজ করত না, এবং তথ্যের জগতে পাগলাগারদের বাইরে এমন ভিক্ষুক মেয়ে কোথাও মিলত না রাস্তার ধারে নিজের গায়ের একখানিমাত্র কাপড় যে ভিক্ষা দিত। কিন্তু সত্যের জগতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এমন ভিক্ষা নিয়েছেন এবং ভিখারিনী এমন অদ্ভুত ভিক্ষা দিয়েছে ; এবং তার পরে সে মেয়ে যে কেমন করে রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে সে তর্ক সেই সত্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের এতবড়ো অপলাপ ঘটে ও সত্যের কিছুমাত্র খর্বতা হয় না— সাহিত্যের ক্ষেত্রটা এমনি। রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়। তথ্যজগতের যে আলোকরশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায় রসজগতে সে রশ্মি স্থূলকে ভেদ করে অনায়াসে পার হয়ে যায়, তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয় না। রসজগতে ভিখারির জীর্ণ চীরখানা থেকেও নেই, তার মূল্যও তেমনি লক্ষপতির সমস্ত ঐশ্বর্যের চেয়ে বড়ো।

—সাহিত্যের পথে

'গানভঙ্গ' কবিতার রচনাকাল : ২৪ আষাঢ় ১২৯৯। সাধনা পত্রে ১২৯৯ চৈত্রে 'সভাভঙ্গ' নামে ইহা প্রথম প্রচারিত, ছিন্নপত্রে বা ছিন্নপত্রাবলীতে ৩ জুলাই ১৮৯২ (২০ আষাঢ় ১২৯৯) তারিখের চিঠিতে যে স্বপ্নের উল্লেখ তাহা এই কবি-কল্পনার মূলে— প্রথমাবধি মুদ্রিত '১৩০০' সাল ছাপার ভুল ছিল সন্দেহ নাই।

কল্পনা

কল্পনা ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর নিকট কল্পনার অনেকগুলি কবিতার পাণ্ডুলিপি দৃষ্ট হইয়াছে। 'চৌরপঞ্চাশিকা' 'পিয়াসী' ও 'প্রকাশ' কবিতার পাঠান্তর উক্ত পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত হইল।

চৌরপঞ্চাশিকা

বহু বর্ষ হতে তব বিপুল প্রণয়
বেদনাবিহীন !
দীপ্তশিখাসম তব স্পন্দিত হৃদয়
স্তব্ধ বহু দিন !

ওগো চৌর কবি !
বিদ্যা তব কনকচম্পকগৌরছবি
মধ্যাহ্নে-খসিয়া-পড়া চম্পকের মতো
ধূলিশয্যাগত
বহু বর্ষ শত !
বিরহের মিলনের সুতীব্র তাপন
চিরসমাপন।

তোমাদের সুনির্জন শয়নমন্দিরে
দীপানলশিখা
কবে যে নিবিয়া গেছে নিশীথসমীরে
নাহি তাহা লিখা।
তোমাদের দ্বারপ্রান্তে সখীবক্ষোলীনা
নাহি বাজে বীণা,
নাহি সেই বাতায়নে মালতীর লতা
পুষ্পভারনতা!

প্রত্যুষে নিকুঞ্জ হতে বন্দিনীর গান
কোথা অবসান!
ভেরী নাহি বেজে ওঠে প্রহরে প্রহরে
সিংহদ্বার-'পরে!
যবনীরা নবনীনির্মলশুভ্ররূপে
অলিন্দে বসিয়া
না কহে স্বদেশকথা অতি চুপে চুপে
দীর্ঘনিশ্বসিয়া।

দূর হতে কঞ্চুকীর পদশব্দ শুনি
আচম্বিতে উঠি
বসন সম্বরি যত সলজ্জা তরুণী
নাহি যায় ছুটি!
শুধু দূর সেকালের বহি এক শোক
জপি এক নাম,
কেঁদে কেঁদে বিশ্বে তব পঞ্চাশটি শ্লোক
ফিরে অবিশ্রাম।
[অনন্ত অধীর,
দেখে না শোনে না, তারা অন্ধ ও বধির!
নাহি জানে কোথা রাজা কোথা রাজশালা,
কোথা তুমি কোথা তব প্রিয় কণ্ঠমালা
মুগ্ধা রাজবালা।
বিস্মৃত কাহিনী তব বিস্মিত জগতে
নব রাজপথে—
পুরাতন দিবসের একটি কাকলি
গাহিছে কেবলি!]

পঞ্চাশটি শুক যেন গোপনে পালিত
রাজভবনের,
ছিল তারা তোমাদের সোহাগে লালিত
শুধু দুজনের।

পেত তারা অহরহ রাজবালিকার
 ললিত চুম্বন,
শুনিত নয়ন মুদি করতালি তার
 কণিতকঙ্কণ !
ষোড়শীর ওষ্ঠ হতে দাড়িম্বের গুটি
 খেত খুঁটি খুঁটি ।
 ওগো কবি চোর,
প্রেমলীলা-অবকাশে বসি বক্ষে তোর
গান শিখেছিল তারা চাঁদের আলোতে
 তব মুখ হতে !

আজি সেই পঞ্চাশটি শুক শুকনারী
 বসি সারি সারি,—
তোমাদের অনন্ত শয়নগৃহদ্বারে
 চির অন্ধকারে—
তোমারি রচিত স্বর্ণ ছন্দের পিঞ্জরে
 বাঁধা চিরদিন
শতবর্ষ এক গান গাহে এক স্বরে
 বিশ্রামবিহীন—
 ওগো কবি চোর,
নাহি ভাঙে তোমাদের চিরঘুমঘোর ।[১]

পিয়াসী

এখনো ভোরের অলস নয়নে তন্দ্রা ভাঙে নি ভালো
আকাশের কোণে বনের আড়ালে জাগিছে ধূসর আলো ।
এখনো বাতাসে রয়েছে শিশির, ফোটে নি সকল কুঁড়ি—
মেলি দুটি আঁখি পাখা ঝাড়ি পাখি করিতেছে উড়ি-উড়ি ।
নূতন তৃণের উঠিছে গন্ধ মন্দ প্রভাত-বায়ে,
তুমি একাকিনী কুটিরবাহিরে বসিয়া অশথছায়ে
নবীননবনীনিন্দিত করে দোহন করিছ দুগ্ধ—
শূন্যপাত্র হাতে লয়ে আমি দাঁড়ায়ে তৃষিত মুগ্ধ !

আম্রকাননে ধরেছে মুকুল ঝরি পড়ে পথপাশে—
গুঞ্জনস্বরে দুয়েকটি করে মৌমাছি উড়ে আসে !
কাঁঠালের গাছে একটি কোকিল ডাকিছে করুণা-মাখা
আঁধার পথের দু ধারে কাঁপিছে তরুণ বাঁশের শাখা !

সরোবর-পারে খুলিছে দুয়ার শিবমন্দিরঘরে,
সন্ন্যাসী গাহে ভোরের ভজন শান্ত গভীর স্বরে ।

১ প্রচল স্বতন্ত্র গ্রন্থের গ্রন্থপরিচয় অংশে ভারতী পত্রের পাঠ (ভাদ্র ১৩০৬) সংকলিত ; তাহাতে যে ৯টি ছত্র বর্জিত, তাহা (পৃ· ৭৩৫) বন্ধনী-যোগে চিহ্নিত করা হইল ।

ঘট লয়ে কোলে বসি তরুতলে দোহন করিছ দুগ্ধ—
কাননের কোণে আমি একমনে দাঁড়ায়ে রয়েছি লুব্ধ !

ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল দেউলে, আকাশ উঠিল জাগি—
ধরণী চাহিল উর্ধ্বগগনে দেবতা-আশিস মাগি।
যত বনতলে যত পাখি ছিল গাহিল কণ্ঠ তুলি,
গ্রামপথ হতে প্রভাত-আলোতে উড়িল গোখুরধূলি।
শিশুকলরব ধ্বনিয়া উঠেছে গৃহঅঙ্গনতলে,
কোমল বাহুতে কলস আঁকড়ি বধূরা চলেছে জলে।
তোমার কাঁকন বাজে ঘন ঘন, ফেনায়ে উঠিছে দুগ্ধ—
পিয়াসী নয়ানে চেয়ে চেয়ে তাই পরান হতেছে ক্ষুব্ধ !

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

ধরা পড়া [প্রকাশ]

চাঁদের সাথে চকোরীর
নলিনী-সাথে তপনের
মেঘের সাথে বিজুরির
প্রণয় শুধু স্বপনের—
সে-সব চোখে চোখে কথা,
সে-সব মহাগোপনতা,
লুকানো কত ছল-ভরা—
কাহার কাছে কবে কোথা
প্রথম পড়েছিল ধরা !

তখন মহাত্রিভুবন
ছিল না এত সাবধানে—
খসিয়া যেত আবরণ
আকারে ভাবে গীতে গানে !
তখন যদি রজনীতে
করিত খেলা তরুলতা
পরের দিনে কবিগীতে
রটিয়া যেত সে বারতা !
ভ্রমর যদি পথ ভুলে
বসিত কভু কেয়া ফুলে
অমনি ঘরে ঘরে তাহা
নিমেষে হত জানাজানি।
জগৎ পুরাকালে, আহা
ছিল না এত সাবধানী !

একদা কবে মধুরাতি
মলয় উঠেছিল মাতি।

ভ্রমর গুনগুন গানে
বলিয়া গেল কানে কানে,
চতুর পিক দিকে দিকে
রটায়ে দিল কুহুতানে,
পাপিয়া তারি কাছে শিখে
বনের সভা-মাঝখানে
গাহিল মহা কলরবে—
'শুন গো, শুন, শুন সবে
চাঁদের সাথে চকোরীর
নলিনী-সাথে তপনের
মেঘের সাথে বিজুরির
প্রণয় অতি গোপনের।'

শুনিয়া যত নরনারী
উঠিল হাসি সারি সারি—
কহিল, 'বৃথা ছল করা,
সবাই পড়িয়াছে ধরা।'
কহিল চোখে চোখে চাহি,
'গোপন আর কিছু নাহি!'
কহিল আসি কাছে কাছে,
'কত যে কথা রটিয়াছে!'
পুলকে হাতে হাত রাখি
কহিল, 'বৃথা ঢাকাঢাকি!'
মালাটি করি অরপন
কহিল সুখে মুখ চুমি,
'পড়িল ধরা ত্রিভুবন,
পড়িনু ধরা আমি তুমি!'[২]

১০ জ্যৈষ্ঠ [১৩০৪]

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী' জাহ্নবীর তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা হইতে "স্বদেশ" শিরোনামের কবিতাটি সংকলিত হইল। ইহার রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি আজও অনাবিষ্কৃত; সুতরাং ইহা যে "ভারতলক্ষ্মী" কবিতার পূর্বপাঠ তাহা আমাদের অনুমান। কবিতাটি পুনরায় 'সাহিত্য' পত্রিকার 'মাসিক সাহিত্য সমালোচন' অংশে (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪) সংকলিত হয়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে এক চিঠিতে এ কবিতা পাঠাইবার সময় রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন: অকিঞ্চিৎকর বলে আমার কোনো বইয়ে স্থান পায় নি। কিন্তু ... ঐতিহাসিকের দফতরে এর স্থান থাকতে পারে।... ৩১ আশ্বিন ১৩২৮ (দ্রষ্টব্য দেশ, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২, পৃ. ২৫৫):

স্বদেশ

আমার ভারতভূমি!
ডালা ভরি লয়ে ষড়ঋতুদল

২ মানসী পত্রের ১৩১৮ আশ্বিন সংখ্যায় ক্রোড়পত্র রূপে মুদ্রিত।

অঞ্চলে তব ঢালে ফুলফল,
নীরবে আশিষ করে হিমাচল
তব মস্তক চুমি।
সিন্ধু তোমার পায়ের ধুলায়
নিত্য তাহার ললাট বুলায়,
চরণে মলয় চামর দুলায়,—
আমার জননী তুমি
হে মোর ভারতভূমি !

তব কোলে বাস মম।
ধন্য সে কোল ঋষির পরশে,
দেবতাপূজার পুষ্প-বরষে,
গঙ্গাধারার পুলক-হরষে
সে কোল পুণ্যতম।
দেবমানবের আনন্দধাম
যে কোলে জনম লভিয়াছে রাম,
যে কোলে ভীষ্ম লভিলা বিরাম
সেই কোলে নমোনমঃ—
সেই কোলে বাস মম।

—জাহ্নবী। বৈশাখ ১৩১৪। পৃ. ৪৪

অমলচন্দ্র হোম ও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সৌজন্যে কল্পনার অন্য অনেকগুলি কবিতারও পাণ্ডুলিপি দেখিবার সুযোগ হইয়াছে এবং ঐ পাণ্ডুলিপির সাহায্যে অনেক কবিতা -রচনার কাল ও স্থান গ্রন্থে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে 'অশেষ' ও 'বর্ষশেষ' কবিতা-প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

এর ['এবার ফিরাও মোরে' রচনার] পর থেকে বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত, যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের, তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়।... এ আহ্বান এ তো শক্তিকেই আহ্বান ; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক ; রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়।...

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্বজীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বিরোধবিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল ? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কী রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল, এই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।

—আত্মপরিচয়

'বর্ষশেষ' কবিতা সম্বন্ধে কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি। এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে—ঝড় এসে শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনিভাবে চিরনবীন যিনি তিনি

প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্যে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থামল। বললুম, অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই-যে এতদিন কাটালুম, এতে তো চিত্ত প্রসন্ন হল না। যে আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায় তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতায় বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিৎকে নাড়া দিয়ে গেল; আমি বুঝলুম, বেরিয়ে আসতে হবে।

—শান্তিনিকেতন পত্র

'বৈশাখ' কবিতা সম্বন্ধে অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ, কিম্বা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত-কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। তুমি আমার 'বৈশাখ' কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছ। বলা বাহুল্য এটা শেষ-জাতীয় কবিতা। এর সঙ্গে জড়িত আছে রচনাকালের সমস্ত-কিছু।··· 'বৈশাখ' কবিতার মধ্যে মিশিয়ে আছে শান্তিনিকেতনের রুদ্রমধ্যাহ্নের দীপ্তি। যেদিন লিখেছিলুম সেদিন চারি দিক থেকে বৈশাখের যে তপ্তরূপ আমার মনকে আবিষ্ট করেছিল সেইটেই ওই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই দিনটিকে যদি ভূমিকা-রূপে ওই কবিতার সঙ্গে তোমাদের চোখের সামনে ধরতে পারতুম তা হলে কোনো প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠত না।

তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নীচের দুটি লাইন নিয়ে—

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে!

খোলা জানালায় বসে ওই ছায়ামূর্তি অনুচরদের স্বচক্ষে দেখেছি শুষ্করিক্ত দিগন্ত-প্রসারিত মাঠের উপর দিয়ে প্রেতের মতো হু হু করে ছুটে আসছে ঘূর্ণানৃত্যে, ধুলোবালি শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে দিয়ে। পরবর্তী শ্লোকেই ভৈরবের অনুচর এই প্রেতগুলোর বর্ণনা আরো স্পষ্ট করেছি, পড়ে দেখো।

তার পরে এক জায়গায় আছে—

সকরুণ তব মন্ত্র-সাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-'পরে।

এই দুটো লাইনেরও ব্যাখ্যা চেয়েছ।

সেদিনকার বৈশাখ-মধ্যাহ্নের সকরুণতা আমার মনে বেজেছিল বলেই ওটা লিখতে পেরেছি। ধুধু করছে মাঠ, ঝাঁঝাঁ করছে রোদ্‌দুর, কাছে আমলকী গাছগুলোর পাতা ঝিল্‌মিল্ করছে, ঝাউ উঠছে নিশ্বসিত হয়ে, ঘুঘু ডাকছে স্নিগ্ধ সুরে—গাছের মর্মর, পাখিদের কাকলি, দূর আকাশে চিলের ডাক, রাঙা মাটির ছায়াশূন্য রাস্তা দিয়ে মন্থরগমন ক্লান্ত গোরুর গাড়ির চাকার আর্তস্বর, সমস্তটা জড়িয়ে মিলিয়ে যে একটি বিশ্বব্যাপী করুণার সুর উঠতে থাকে, নিঃসঙ্গ বাতায়নে বসে সেটি শুনেছি, অনুভব করেছি, আর তাই লিখেছি।

বৈশাখের অনুচরীর যে ছায়ানৃত্য দেখি সেটা অদৃশ্য নয় তো কী? নৃত্যের ভঙ্গী দেখি, ভাব দেখি, কিন্তু নটী কোথায়? কেবল একটা আভাস মাঠের উপর দিয়ে ঘুরে যায়। তুমি বলছ, তুমি তার ধ্বনি শুনেছ। কিন্তু যে দিগন্তে আমি তার ঘূর্ণিগতিটাকে দেখেছি সেখান থেকে কোনো শব্দই পাই নি। বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে তরুরিক্ত বিশাল প্রান্তরে যে চঞ্চল আবির্ভাব ধূসর আবর্তনে দেখা যায় তার রূপ নয় তার গতিই অনুভব করি, তার শব্দ তো শুনিই নে। এ স্থলে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার জো নেই।

—পত্র। ৪ কার্তিক ১৩৩৯

কল্পনা কাব্যের গান-কবিতার সাময়িক পত্রে প্রচারের তালিকা, যতদূর জানা যায়, পৃষ্ঠাঙ্ক-সহ নিম্নে সংকলন করা গেল—

অশেষ	ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬। ৯৭
আশা	উৎসাহ। আশ্বিন ?/১৩০৫। ২০১
উন্নতিলক্ষণ	ভারতী। অগ্রহায়ণ ১৩০৬। ৬৭৩
কাল্পনিক	ভারতী। কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৪। ৪২৫
চৈত্ররজনী [চৈত্রপূর্ণিমা]	ভারতী। চৈত্র ১৩০৬। ১০৫৯
★চৌরপঞ্চাশিকা	ভারতী। ভাদ্র ১৩০৬। ৩৮৫
জগদীশচন্দ্র বসু [অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি]	প্রদীপ। মাঘ ১৩০৪। ৭১
জুতা-আবিষ্কার	ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫। ১০৩
দুঃসময়	ভারতী। বৈশাখ ১৩০৫। ১
★ধরা পড়া	মানসী। আশ্বিন ১৩১৮। প্রবেশক
পসারিণী	ভারতী। কার্তিক ১৩০৬। ৬১৭
প্রকাশ	ভারতী। অগ্রহায়ণ ১৩০৬। ৭৬৫
বঙ্গলক্ষ্মী	প্রদীপ। অগ্রহায়ণ ১৩০৫। ৩৭৫
বর্ষশেষ	ভারতী। চৈত্র ১৩০৫। ১১১৬
বর্ষামঙ্গল	ভারতী। আষাঢ় ১৩০৫। ২০৬
বসন্ত	ভারতী। চৈত্র ১৩০৬। ১০৯০
বিদায়	প্রদীপ। বৈশাখ ১৩০৫। ১৪৭
বিদায় [বিদায়কাল : ক্ষমা করো ধৈর্য ধরো ইত্যাদি]	ভারতী। চৈত্র ১৩০৫। ১১১৪
বৈশাখ	ভারতী। বৈশাখ ১৩০৭। ২
ভারতলক্ষ্মী	ভারতী। মাঘ ১৩০৩। ৬৫৯
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ	ভারতী। আষাঢ় ১৩০৫। ২৩৭
ভিখারি	উৎসাহ। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫। ৪১
ভ্রষ্ট লগ্ন	প্রদীপ। আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬। ৩২৩
মদনভস্মের পর	ভারতী। আশ্বিন ১৩০৫। ৫০০
মদনভস্মের পূর্বে	ভারতী। আশ্বিন ১৩০৫। ৪৯৮
মাতার আহ্বান	উৎসাহ। আষাঢ় ১৩০৫। ৮১
মানসপ্রতিমা + স্বরলিপি	বীণাবাদিনী। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫। ৩১৩ ভারতী। আষাঢ় ১৩০৬। ২৭০
মার্জনা	প্রদীপ। অগ্রহায়ণ ১৩০৬। ৩৯৬
যাচনা	প্রদীপ। শ্রাবণ ১৩০৫। ২৪৭
শরৎ	প্রদীপ। অগ্রহায়ণ ১৩০৫। ৩৭৫
সে আমার জননী রে	উৎসাহ। বৈশাখ ১৩০৫। ১৩
★স্বদেশ	জাহ্নবী। বৈশাখ ১৩১৪। ৪৪
স্বপ্ন	ভারতী। মাঘ ১৩০৫। ৯২৩
হতভাগ্যের গান	ভারতী। শ্রাবণ ১৩০৫। ২৯৯

★ গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত।

'ভ্রষ্ট লগ্ন' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য আবৃত্তি করেন। ঐ আবৃত্তিতে মুদ্রিত পাঠ হইতে কতকগুলি অনৈক্য দেখা যায় ; সেগুলি হইল— প্রত্যেক স্তবকের শেষছত্রে 'সেই' স্থলে 'এই', দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় ছত্রে 'পরিতেছিলেম' ও অষ্টম ছত্রে 'গিয়েছে'।

'অশেষ' কবিতার রচনাকাল '২৫ বৈশাখ ১৩০৬' ; ইহা শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত এক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে জানা যায়।

ক্ষণিকা

ক্ষণিকা ১৩০৭ সালের শ্রাবণ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ক্ষণিকার শেষাংশের এক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। তাহার সাহায্যে বহু কবিতার রচনার কাল ও স্থান প্রভৃতি নির্দিষ্ট হইয়াছে।

'আবির্ভাব' কবিতা সম্বন্ধে কবি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিয়াছেন—

কাব্যের একটা বিভাগ আছে যা গানের সহজাতীয়। সেখানে ভাষা কোনো নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে না, একটা মায়া রচনা করে, যে মায়া ফাল্গুন মাসের দক্ষিণ হাওয়ায়, যে মায়া শরৎ ঋতুতে সূর্যাস্তকালের মেঘপুঞ্জে। মনকে রাঙিয়ে তোলে ; এমন কোনো কথা বলে না যাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

ক্ষণিকার 'আবির্ভাব' কবিতায় একটা কোনো অন্তরগূঢ় মানে থাকতে পারে ; কিন্তু সেটা গৌণ ; সমগ্র ভাবে কবিতাটার একটা স্বরূপ আছে— সেটা যদি মনোহর হয়ে থাকে তা হলে আর কিছু বলবার নেই।

তবু 'আবির্ভাব' কবিতায় কেবল সুর নয়, একটা কোনো কথা বলা হয়েছে ; সেটা হচ্ছে এই যে, এক সময়ে মনপ্রাণ ছিল ফাল্গুন মাসের জগতে, তখন জীবনের কেন্দ্রস্থলে একটি রূপ দেখা দিয়েছে আপন বর্ণ গন্ধ গান নিয়ে, সে বসন্তের রূপ, যৌবনের আবির্ভাব— তার আশা-আকাঙ্ক্ষায় একটি বিশেষ বাণী ছিল। তার পরে জীবনের অভিজ্ঞতা প্রশস্ততর হয়ে এল। তখন সেই প্রথম-যৌবনের বাসন্তী রঙের আকাশে ঘনিয়ে এল বর্ষার সজল শ্যাম সমারোহ— জীবনে বাণীর বদল হল, বীণায় আর-এক সুর বাঁধতে হবে ; সেদিন যাকে দেখেছিলুম এক বেশে এক ভাবে, আজ তাকে দেখছি আর-এক মূর্তিতে, খুঁজে বেড়াচ্ছি তারই অভ্যর্থনার নূতন আয়োজন। জীবনের ঋতুতে ঋতুতে যার নূতন প্রকাশ, সে এক হলেও তার জন্যে একই আসন মানায় না।

—পত্র। ৪ অক্টোবর ১৯৩৩

মোহিতচন্দ্র সেন -কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের 'লীলা' খণ্ডে ক্ষণিকার 'ভীরুতা' 'মাতাল' প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতা স্থান পাইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কাব্যগ্রন্থের (১৩১০) ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—

ভালোবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে, অলীককে— সংগতকে নহে, অসংগতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্নেহ আদর করিয়া সুন্দর মুখকে পোড়ারমুখী বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্টু বলিয়া মারে, ছলনাপূর্বক ভর্ৎসনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, ভালোবাসার ধনকে ভালোবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সেইজন্য সত্যকে সত্যকথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তাহাদের বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয় ; তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক-পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে। প্রেমলীলার এই অঙ্গটি এই গ্রন্থাবলীর 'লীলা' খণ্ডে পাঠকেরা পাইবেন। ইহা ছাড়া লীলার মধ্যে আর-একটি জিনিস আছে তাহা বিদ্রোহ। প্রতিকূলতার কাছে বেদনা স্পর্ধাপূর্বক

আপনাকে বিরূপ মূর্তিতে প্রকাশ করিতেছে। 'মাতাল' যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া গায়ের জোরের কথা। বিদ্রোহী অভিমান বলে, আমি সমাজসংগত ভব্যতার ধার ধারি না ; বিদ্রোহী প্রেম বলে, আমি ক্ষণকালের খেলামাত্র, আমি চিরস্থায়ী একনিষ্ঠতার ধার ধারি না। একান্ত বেদনাকে স্পর্ধিত অত্যুক্তির মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবার এই আড়ম্বর। এই-সকল কথার যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সময়ে ইহাদিগকে উল্টা করিয়া বুঝিতে হয়।

নৈবেদ্য

নৈবেদ্য ১৩০৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়' কবিতাটির প্রসঙ্গে, 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে প্রকাশিত, পরে 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে সংকলিত, রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিখিত নিম্নমুদ্রিত অংশ উদ্ধারযোগ্য—

প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি-মন তাহার স্নেহ-প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে— সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না। সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে ; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া-টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণ-পাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। কেহ-বা দ্রুত চলিতেছে বলিয়া সে আপন গতিসম্বন্ধে সচেতন ; কেহ-বা মন্দগমনে চলিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে, বুঝি-বা সে এক জায়গায় বাঁধা'ই পড়িয়া আছে। কিন্তু সকলকেই চলিতে হইতেছে, সকলই এই জগৎসংসারের নিরন্তর টানে প্রতিদিনই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার দিক হইতে ব্রহ্মের দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। আমরা যেমনই মনে করি, আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয়, আমাদের পুত্র আমাদিগকে একটি জায়গায় বাঁধিয়া রাখে নাই। যে জিনিসটাকে সন্ধান করিতেছি দীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিসটাকে প্রকাশ করে তাহা নহে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে ; প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া, ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন— আর-কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।

> বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
> অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।

—আত্মপরিচয় (১৩৫০), পৃ ২২-২৩

নৈবেদ্যের অনেকগুলি কবিতা গানরূপে ব্যবহৃত হইবার সময় সেগুলির অনেক পাঠ-পরিবর্তন হইয়াছে।

স্মরণ

১৩০৯ সালে ৭ই অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী দেহত্যাগ করেন। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাগুলি রচনা করেন তাহার অধিকাংশই বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়) মাসিক পত্রের ১৩০৯ অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে সেগুলি মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে (১৩১০) সংকলিত হয়— অধিকাংশ 'স্মরণ' বিভাগে, এবং বর্তমান

স্মরণ গ্রন্থের প্রথম তিনটি কবিতা 'মরণ' বিভাগে। স্মরণ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আরো অনেক পরে, ১৩২১ বঙ্গাব্দে। কাব্যগ্রন্থাবলীর 'মরণ' বিভাগ হইতে নিম্নমুদ্রিত কবিতাটি এখানে উদ্ধারযোগ্য—

সবাই যাহারে ভালোবেসেছিল তারে তুমি কোল দিলে,
কারো ভালোবাসা পায় নি যে জন তুমি তারে পরশিলে।
ইহসংসারে ভিখারির মতো
বঞ্চিত ছিল যে জন সতত
করুণ হাতের মরণে তাহারে বরণ করিয়া নিলে।
শিরে দিলে তার শীতল হস্ত ঘুচিল সকল জ্বালা।
তাপিত বক্ষে পরালে তাহার জীবন-জুড়ানো মালা।
রাজা মহারাজ যেথা ছিল যারা,
নদী গিরি বন রবি শশী তারা,
সকলের সাথে সমান করিয়া নিলে তারে এ নিখিলে।

পূর্বে সংকলিত হয় নাই, রচনার স্থানকাল সম্পর্কে এরূপ কতকগুলি তথ্য শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার -সংরক্ষিত একখানি পাণ্ডুলিপি হইতে এই গ্রন্থে উদ্‌ধৃত হইল। অধুনা-মুদ্রিত ও প্রচলিত 'স্মরণ' কাব্যখানিও দ্রষ্টব্য।

স্মরণ-গ্রন্থের কবিতাগুলির বঙ্গদর্শনে শিরোনাম-সহ প্রকাশের সূচী সংকলিত হইল :

সংখ্যা	নাম	বঙ্গদর্শন। পৃষ্ঠা
৩	প্রতীক্ষা	অগ্রহায়ণ। ৪৪০
৪	শেষ কথা	অগ্রহায়ণ। ৪৪৯
৫	প্রার্থনা	অগ্রহায়ণ। ৪৫৪
৬	আহ্বান	অগ্রহায়ণ। ৪৫৫
৭	পরিচয়	অগ্রহায়ণ। ৪৫৫
৮	মিলন	অগ্রহায়ণ। ৪৫৬
৯	লক্ষ্মী-সরস্বতী	মাঘ। ৫৬৫
১০	কথা	মাঘ। ৫৬৫
১১	নব পরিণয়	মাঘ। ৫৬৬
১২	পূর্ণতা	মাঘ। ৫৬৬
১৩	সার্থকতা	মাঘ। ৫৬৭
১৪	সঞ্চয়	মাঘ। ৫৬৮
১৫	রচনা	মাঘ। ৫৬৮
১৬	সন্ধান	মাঘ। ৫৬৯
১৭	অশোক	মাঘ। ৫৬৯
১৮	জীবনলক্ষ্মী	মাঘ। ৫৭০
১৯	বসন্ত	ফাল্গুন। ৫৮২
২০	উৎসব	ফাল্গুন। ৫৮৭
২১	প্রেম	ফাল্গুন। ৫৮৮
২২	দ্বৈতরহস্য	ফাল্গুন। ৬২১

২৩	সন্ধ্যাদীপ	ফাল্গুন। ৬০৩
২৪	গোধূলি	ফাল্গুন। ৬০৩
২৫	জাগরণ	ফাল্গুন। ৫৭৩
২৬	পূজা	ফাল্গুন। ৫৯৩
২৭	সম্ভোগ	ফাল্গুন। ৬১২

ব্যঙ্গকৌতুক

ব্যঙ্গকৌতুক ১৩১৪ সালে গদ্যগ্রন্থাবলীর সপ্তম ভাগ রূপে প্রকাশিত হয়।

রচনাবলীতে ব্যঙ্গকৌতুকের নাট্য-ভাগ ও প্রবন্ধ-ভাগ বিভিন্ন অংশে প্রকাশিত হইল।

ব্যঙ্গকৌতুকের বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে (১৩৪৫) 'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক' নামে একটি নূতন রচনা সংকলিত আছে। ইহা প্রথম সংস্করণের বহু পরবর্তী রচনা বলিয়া রচনাবলী-সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। প্রচল রচনাবলীর অষ্টাবিংশ খণ্ডে এবং সুলভ সংস্করণ চতুর্দশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

শারদোৎসব

শারদোৎসব ১৩১৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কবি স্বয়ং বিভিন্ন উপলক্ষে শারদোৎসবের মর্মব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিম্নে তাহা সংকলিত হইল।

১৩২৬ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমে শারদোৎসব অভিনয় উপলক্ষে কবি এই নাটকের 'ভিতরের কথাটি' শান্তিনিকেতন পত্রে মুদ্রিত একটি প্রবন্ধে এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেন—

আগামী ছুটির পূর্বরাত্রে আশ্রমে শারদোৎসব অভিনয়ের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার আয়োজনও চলিতেছে। শারদোৎসব নাটকটি বিশেষভাবে ছেলেদের উপযোগী করিয়াই তৈরি হইয়াছিল ; তাহার বাহিরের ধারাটি ছেলেদের বুঝিবার পক্ষে কঠিন নহে, কেবল তাহার ভিতরের কথাটি হয়তো ছেলেরা ঠিক বোঝে না।

সমস্ত নাটককে ব্যাপ্ত করিয়া যে ভাবটা আছে সেটা আমাদের আশ্রমের বালকদের পক্ষে সহজ। বিশেষ বিশেষ ফুলে-ফলে হাওয়ায়-আলোকে আকাশে-পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ঋতুর উৎসব চলিতেছে। সেই উৎসব মানুষ যদি অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ না করে তবে সে পার্থিব জীবনের একটি বিশুদ্ধ এবং মহৎ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের নানা কাজে নানা খেলায় মিলনের নানা উপলক্ষ আছে। মিলন ঠিকমত ঘটিলেই, অর্থাৎ তাহা কেবলমাত্র হাটের মেলা বাটের মেলা না হইলে সেই মিলন নিজেকে কোনো-না-কোনো উৎসব-আকারে প্রকাশ করে। আমরা এই সংখ্যার শান্তিনিকেতনে অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, মিলন যেখানেই ঘটে, অর্থাৎ বহুর ভিতরকার মূল ঐক্যটি যেখানেই ধরা পড়ে, যাহারা বাহিরে পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান তাহাদের অন্তরের নিত্য সম্বন্ধ যেখানেই উপলব্ধ হয়, সেখানেই সৃষ্টির অহেতুক অনির্বচনীয় লীলা প্রকাশ পায়। বহুর বিচিত্র ঐক্যসম্বন্ধই সৃষ্টি। মানুষ যেখানে বিচ্ছিন্ন সেখানে তাহার সৃজনকার্য দুর্বল ; সভ্যতা শব্দের অর্থই এই, মানুষের মিলনজাত একটি বৃহৎ জগৎ— এই জগতে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট বিধিব্যবস্থা ধর্মকর্ম শিল্পসাহিত্য আমোদ-আহ্লাদ সমস্তই একটি বিরাট সৃষ্টি। এই সৃজনের মূলশক্তি মানুষের সত্য সম্বন্ধ। মানুষ যেখানে বিচ্ছিন্ন, যেখানে বিরুদ্ধ, সেখানে তাহার সৃজনকার্য নিস্তেজ। সেখানে সে কেবল কলে-চালানো পুতুলের মতো চিরাভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করিয়া চলে, আপন জ্ঞান প্রাণ প্রেমকে নব নব আকারে প্রকাশ করে না। মিলনের শক্তিই সৃজনের শক্তি।

মানুষ যদি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিত তবে লোকালয়ই মানুষের একমাত্র মিলনের ক্ষেত্র হইত। কিন্তু মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিশ্বে তাহার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাহার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে রসে জাগিয়া উঠিতেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলিতেছে। কিন্তু মানুষের প্রধান সৃজনের ক্ষেত্র তাহার চিত্তমহলে। এই মহলে যদি দ্বার খুলিয়া আমরা বিশ্বকে আহ্বান করিয়া না লই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ মিলন ঘটে না। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্তের মিলনের অভাব আমাদের মানবপ্রকৃতির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড অভাব।

যে মানুষের মধ্যে সেই মিলন বাধা পায় নাই সেই মানুষের জীবনের তারে তারে প্রকৃতির গান কেমন করিয়া বাজে, ইংরেজ কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ Three Years She Grew নামক কবিতায় অপূর্ব সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত অবাধ মিলনে ল্যুসি'র দেহমন কী অপরূপ সৌন্দর্যে গড়িয়া উঠিবে তাহারই বর্ণনা উপলক্ষে কবি লিখিতেছেন—

'প্রকৃতির নির্বাক্‌ ও নিশ্চেতন পদার্থের যে নিরাময় শান্তি ও নিঃশব্দতা তাহাই এই বালিকার মধ্যে নিশ্বসিত হইবে। ভাসমান মেঘ-সকলের মহিমা তাহারই জন্য এবং তাহারই জন্য উইলো বৃক্ষের অবনম্রতা, ঝড়ের গতির মধ্যে যে একটা শ্রী তাহার কাছে প্রকাশিত তাহারই নীরব আত্মীয়তা আপন অবাধ ভঙ্গিতে এই কুমারীর দেহখানি গড়িয়া তুলিবে। নিশীথরাত্রির তারাগুলি হইবে তাহার ভালোবাসার ধন ; আর, যে-সকল নিভৃতনিলয়ে নির্ঝরিণীগুলি বাঁকে বাঁকে উচ্ছলিত হইয়া নাচিয়া চলে সেইখানে কান পাতিয়া থাকিতে থাকিতে কলধ্বনির মাধুর্যটি তাহার মুখশ্রীর উপরে ধীরে সঞ্চারিত হইতে থাকিবে।'

পূর্বেই বলিয়াছি ফুল ফল ফসলের মধ্যে প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য কেবলমাত্র এক-মহলা ; মানুষ যদি তাহার দুই মহলেই আপন সঞ্চয়কে পূর্ণ না করে তবে সেটা তাহার পক্ষে বড়ো লাভ নহে। হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করিলে তবেই প্রকৃতির সহিত তাহার মিলন সার্থক হয়, সুতরাং সেই মিলনেই তাহার প্রাণমন বিশেষ শক্তি বিশেষ পূর্ণতা লাভ করে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো অনেক বড়ো হইয়া উঠে। তখন আমরা আকাশ-বাতাস গাছপালা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মিলি ; অর্থাৎ, যে প্রকৃতির মধ্যে আমরা মানুষ তাহার সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ আমরা অন্তরের মধ্যে স্বীকার করি। সেই স্বীকার কখনোই নিষ্ফল নহে। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, সম্বন্ধেই সৃষ্টির প্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যে যখন কেবল আছি মাত্র তখন তাহা না থাকারই শামিল, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের প্রাণমনের সম্বন্ধ-অনুভবেই আমরা সৃজনক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করি ; চিত্তের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে আপনার মধ্যে এই সৃজনশক্তিকে কাজ করিবার বাধা দেওয়া হয়।

তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারি দিক হইতে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে— সেই হৃদয়ে যদি কোনো রঙ না লাগে, কোনো গান না জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই নাটকের পালা। নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে ? লক্ষেশ্বর— সেই বণিক আপনার স্বার্থ লইয়া, টাকা উপার্জন লইয়া, সকলকে সন্দেহ করিয়া, ভয় করিয়া, ঈর্ষা করিয়া সকলের কাছ হইতে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন করিয়া বেড়াইতেছে। এই উৎসবের পুরোহিত কে ? সেই রাজা যিনি আপনাকে ভুলিয়া সকলের সঙ্গে মিলিতে বাহির হইয়াছেন, লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্মটিকে যিনি চান। সেই পদ্ম যে চায়, সোনাকে সে তুচ্ছ করে ; লোভকে সে বিসর্জন দেয়

বলিয়াই লাভ সহজ হইয়া সুন্দর হইয়া তাহার হাতে আপনি ধরা দেয়।

কিন্তু এই যে সুন্দরকে খুঁজিবার কথা বলা হইল সে কী ? সে কোথায় ? সে কি একটা পেলব সামগ্রী, একটা শৌখিন পদার্থ ? এই কথারই উত্তরটি এই নাটকের মাঝখানে রহিয়াছে।

শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসিয়া উপনন্দ তার প্রভুর ঋণ শোধ করিতেছে ; রাজসন্ন্যাসী এই প্রেমঋণ-পরিশোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখিতে পাইলেন। তাঁর তখনই মনে হইল, শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য। শরতে এই যে নদী ভরিয়া উঠিল কূলে কূলে, এই যে খেত ভরিয়া উঠিল শস্যের ভারে, ইহার মধ্যে একটি ভাব আছে, সে এই : প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেটাকে বাহিরে নানা রূপে নানা রসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয় সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা হয় ; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য।

দেবতা আপনাকেই কি মানুষের মধ্যে দেন নাই ? সেই দানকে যখন অক্লান্ত তপস্যার অকৃপণ ত্যাগের দ্বারা মানুষ শোধ করিতে থাকে তখনই দেবতা তাহার মধ্য হইতে আপনার দান অর্থাৎ আপনাকে নূতন আকারে ফিরিয়া পান, আর তখনই কি তাহার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না ? সেই প্রকাশ যতই বাধা কাটাইয়া উঠিতে থাকে ততই কি তাহা সুন্দর উজ্জ্বল হয় না ? বাধা কোথায় কাটে না ? যেখানে আলস্য, যেখানে বীর্যহীনতা, যেখানে আত্মাবমাননা। যেখানে মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্মে দেবতা হইয়া উঠিতে সর্বপ্রযত্নে প্রয়াস না পায় সেখানে নিজের মধ্যে সে দেবত্বের ঋণ অস্বীকার করে। যেখানে ধনকে সে আঁকড়িয়া থাকে, স্বার্থকেই চরম আশ্রয় বলিয়া মনে করে, সেখানে দেবতার ঋণকে সে নিজের ভোগে লাগাইয়া একেবারে ফুঁকিয়া দিতে চায়— তাহাকে যে অমৃত দেওয়া হইয়াছিল, যে অমৃতের উপলব্ধিতে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অবজ্ঞা করিতে পারে, দুঃখকে গলার হার করিয়া লয়, জীবনের প্রকাশের মধ্য দিয়া সেই অমৃতকে তখন সে শোধ করিয়া দেয় না। বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবপ্রকৃতিতে এই অমৃতের প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য : আনন্দরূপমমৃতম্।

রাজসন্ন্যাসী উপনন্দকে দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, এই ঋণশোধেই যথার্থ ছুটি, যথার্থ মুক্তি। নিজের মধ্যে অমৃতের প্রকাশ যতই সম্পূর্ণ হইতে থাকে ততই বন্ধন মোচন হয় ; কর্মকে এড়াইয়া, তপস্যায় ফাঁকি দিয়া, পরিত্রাণলাভ হয় না। তাই তিনি উপনন্দকে বলিয়াছেন, 'তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখছ আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ।'

এই লইয়া সন্ন্যাসীতে ঠাকুরদাদাতে যে কথাবার্তা হইয়াছে নীচে তাহা উদ্‌ধৃত করিলাম—

সন্ন্যাসী। আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন ?... আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে করছে।... কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা। এক দিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন আর-এক দিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চলছে।... এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী...

ঠাকুরদাদা। সেইখানেই যে এক পক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।

সন্ন্যাসী। লক্ষ্মী যখন মানবের মর্তলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন ; তাঁর সেই তপস্বিনীরূপেই ভগবান মুগ্ধ। শত দুঃখের দলে তাঁর পদ্ম সংসারে ফুটেছে।[৩]

৩ কবি-কর্তৃক মূল নাটকের কয়েকটি বাক্য বর্জিত ; সংকলিত অংশেও সামান্য পাঠভেদ আছে।

লক্ষ্মী সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী ; গৌরী যেমন তপস্যা করিয়া শিবকে পাইয়াছিলেন, মর্তলোকে লক্ষ্মীও তেমনি দুঃখের সাধনার দ্বারাই ভগবানের সহিত মিলন লাভ করেন। যে মানুষ বা যে জাতির মধ্যে এই ত্যাগ নাই, তপস্যা নাই, দুঃখস্বীকারের জড়তা, সেখানে লক্ষ্মী নাই, সুতরাং সেখানে ভগবানের প্রেম আকৃষ্ট হয় না।

উপনন্দ তাহার প্রভুর নিকট হইতে প্রেম পাইয়াছিল, ত্যাগস্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের পথ বাহিয়া সে যতই সেই প্রেমদানের সমান ক্ষেত্রে উঠিতেছে ততই সে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিতেছে। দুঃখই তাহাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণের সহিত ঋণশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তাহাই কুশ্রীতা।

—শান্তিনিকেতন পত্র। আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৬

শারদোৎসবের 'ভিতরকার ধুয়ো' সম্বন্ধে সবুজ পত্রে 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথি। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল— উপনন্দ— সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথি মিলেছে, কেননা ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ ; ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে : সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত ; অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করছে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে। এই-যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন, এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে একে খেলা মনে হয়, কিন্তু এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এইজন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে ; ভয়ে কিংবা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই— ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।

—সবুজ পত্র। আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৪

ভানুসিংহের পত্রাবলীতে প্রকাশিত একটি চিঠিতে (২৪ ভাদ্র ১৩২৯) কবি শারদোৎসব সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর-কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হচ্ছে— 'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা'। ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ করছে, কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।

—ভানুসিংহের পত্রাবলী। পত্রসংখ্যা ৫২

১৩২৯ ভাদ্রে কলিকাতায় শারদোৎসব-অভিনয়ের সময় উহার একটি 'ভূমিকা' কবি রচনা করেন। অভিনয়পত্রী হইতে নিম্নে তাহা যথাযথ মুদ্রিত হইল—

শারদোৎসবের
ভূমিকা

রাজা। আমাদের সব প্রস্তুত তো ?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ, এক রকম প্রস্তুত, কিন্তু—

রাজা। কিন্তু ! কিন্তু আবার কিসের ! আমাদের শারদ-উৎসবের ভিতরেও কিন্তু এসে পড়ে ! এ তো রাষ্ট্রনীতি নয়।

মন্ত্রী। উৎসবের আয়োজনের মধ্যে একটি কবি আছেন যে, কাজেই কিন্তুর অভাব হয় না।

রাজা। আমাদের কবিশেখরের কথা বলছ ? তা, তাঁর উপরে তো ভার ছিল উৎসব উপলক্ষে একটা যাত্রার পালা তৈরি করবার জন্যে।

মন্ত্রী। আপনি তো তাঁকে জানেন ; সুবিধা অসুবিধা, স্থান কাল পাত্র, এ-সবের দিকে তাঁর একেবারেই দৃষ্টি নেই। তিনি আপন খেয়ালমতই চলেন।

রাজা। তা, হয়েছে কী ? লোকটা পালিয়েছে নাকি ?

মন্ত্রী। এক রকম পালানোই বৈকি। সভাপণ্ডিত-মশায় ঠিক করে দিয়েছিলেন, এবারকার উৎসবের জন্যে শুম্ভনিশুম্ভ-বধের পালা তৈরি করে দিতে হবে। এ কথা হয়েছিল সেই মহাদ্বাদশীর দিনে। কাল শুনি কবি সে পালা তৈরিই করে নি।

রাজা। কী সর্বনাশ ! এ মানুষকে নিয়ে দেখছি আর চলল না। সখা, তুমি কেনারাম পাঁচালিওয়ালার উপর ভার দিলে না কেন, তা হলে তো এ বিভ্রাট ঘটত না। পুরবাসীরা সবাই এসে জুটেছেন, এখন উপায় ?

মন্ত্রী। কবি বলছেন, তিনি তাঁর মনের মতো ছোটো একটা পালা লিখেছেন।

রাজা। তাতে আছে কী ?

মন্ত্রী। তা তো বলতে পারি নে। সংক্ষেপে যা বর্ণনা করলেন তাতে ভাবটা কিছুই বুঝতে পারলেম না। বললেন যে, সেটা গানেতে গন্ধেতে রঙেতে রসেতে মিশিয়ে একটা কিছুই-না গোছের জিনিস।

রাজা। কিছুই-না গোছের জিনিস ! এ কি পরিহাস নাকি ?

মন্ত্রী। শুধু পরিহাস নয় মহারাজ, এ দুর্দৈব।

রাজা। তাতে গল্প কিছু আছে ?

মন্ত্রী। নেই বললেই হয় !

রাজা। যুদ্ধ ?

মন্ত্রী। না।

রাজা। কোনো রকমের রক্তপাত ?

মন্ত্রী। না।

রাজা। আত্মহত্যা ? পতন ও মূর্ছা ?

মন্ত্রী। একেবারেই না।

রাজা। আদিরস ? বীররস ? করুণরস ?

মন্ত্রী। না, কোনোটাই না। কবি বলেন, তিনি যা রচনা করেছেন তা শরৎকালের উপযোগী খুব হালকা রকমের ব্যাপার। তার মধ্যে ভার একটুও নেই।

রাজা। তাকে শরৎকালের উপযোগী বলবার মানে কী হল ?

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের মেঘ যে হালকা, তার কোনো প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী।

রাজা। এ কথা সত্য বটে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের শিউলিফুলের মধ্যে যেন কোনো আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝরে পড়ে।

রাজা। এ কথা মানতে হয়।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের কাশের স্তবক না বাগানের না বনের; সে হেলাফেলায় মাঠে ঘাটে নিজের অকিঞ্চনতার ঐশ্বর্য বিস্তার করে বেড়াচ্ছে। সে সন্ন্যাসী।

রাজা। এ কথা কবি বেশ বলেছে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরতে কাঁচা ধানের যে খেত দেখি কেবল আছে তার রঙ, কেবল আছে তার দোলা। আর-কোনো দায় যদি তার থাকে সে কথা সে একেবারে লুকিয়েছে।

রাজা। ঠিক কথা।

মন্ত্রী। তাই কবি বলেন, তাঁর শারদোৎসবের যে পালা সে ওই রকমই হালকা, ওই রকমই নিরর্থক। সে পালায় কাজের কথা নেই, সে পালায় আছে ছুটির খুশি।

রাজা। বাঃ, এ তো মন্দ শোনাচ্ছে না। ওর মধ্যে রাজা কেউ আছে?

মন্ত্রী। একজন আছেন। কিন্তু তিনি কিছু দিনের জন্যে রাজত্ব থেকে ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসীবেশে মাঠে ঘাটে বিনা কাজে দিন কাটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। বাঃ বাঃ, শুনে লোভ হয় যে! আর কে আছে?

মন্ত্রী। আর আছে সব ছেলের দল।

রাজা। ছেলের দল? তাদের নিয়ে কী হবে?

মন্ত্রী। কবি বলেন, ওই ছেলেদের প্রাণের মধ্যেই তো আসল ছুটির চেহারা। তারা কাঁচা ধানের খেতের মতোই নিজে না জেনে, কাউকে না জানিয়ে, ছুটির ভিতরেই ফসলের আয়োজন করছে।

রাজা। তা, ওই ছেলের দলকে ভালো করে শেখানো হয়েছে?

মন্ত্রী। একেবারেই না।

রাজা। কী সর্বনাশ! তা হলে—

মন্ত্রী। কবি বলেন, বুড়োরা ছেলেদের যদি শেখাতে যায় তা হলে তো ছেলেরা পেকে যাবে— ছেলেই থাকবে না। সেইজন্যে ওদের নাট্য শেখানোই হয় নি। কবি বলেন, সহজে খুশি হবার বিদ্যে ওদের কাছ থেকে আমরাই শিখব।

রাজা। কিন্তু, মন্ত্রী, সহজে খুশি হবার বিদ্যা তো পুরবাসীদের বিদ্যা নয়। এই-সব হালকা, এই-সব কাঁচা, এই-সব না-শেখা ব্যাপারের মূল্য কি তাঁদের কাছে আছে?

মন্ত্রী। সে কথা আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বললেন, ওজন যার কিছু নেই তার আবার মূল্য কিসের? হেমন্তের পাকা ধানেরই মূল্য আছে, ভাদ্রের কাঁচা খেতের আবার মূল্য কী? একটুখানি হাসি, একটুখানি খুশি, এই হলেই দেনাপাওনা চুকে যাবে।

রাজা। আচ্ছা বেশ, শুম্ভনিশুম্ভ তা হলে এখন থাক্‌— আসুক ছেলের দল, আসুক সন্ন্যাসীবেশে রাজা। তা হলে কবিকে একবার ডেকে দাও-না, তার সঙ্গে একবার কথা কয়ে নিই।

মন্ত্রী। তাঁকে ডাকব কি মহারাজ, তিনি নিজেই যে এই পালায় সাজছেন।

রাজা। বল কী, তার শিক্ষা হল কোথায়?

মন্ত্রী। তার শিক্ষা হয়ই নি।

রাজা। তবে? সে কি হাত পা নেড়ে, গলা ছেড়ে দিয়ে আসর জমাতে পারবে? সে যে আনাড়ি।

মন্ত্রী। পাছে যারা হাত পা নাড়তে শিক্ষা পেয়েছে তাদের ডাকা হয় এই ভয়েই সে নিজেই সন্ন্যাসী সাজবার ভার নিয়েছে। সে বলে, পালার বিষয়টা যেমন অনর্থক— পালার নটের দলও

তেমনি অশিক্ষিত।

রাজা। তা, এ নিয়ে এখন পরিতাপ করে কোনো লাভ নেই। তা হলে আরম্ভ করে দাও। একটা সুবিধে এই যে, বেশি-কিছু আশা করব না, সুতরাং বেশি-কিছু নৈরাশ্যের আশঙ্কা থাকবে না। গোড়ায় একটা গান হবে তো?

মন্ত্রী। হবে বৈকি। এই যে, গানের দল আপনার পাশেই বসে।

—অনুষ্ঠানপত্র। শারদোৎসব। ভাদ্র ১৩২৯

শান্তিনিকেতনে শারদোৎসবের প্রথম অভিনয় (১৩১৫) উপলক্ষে কবি এই নাটকের জন্য একটি নান্দী রচনা করিয়াছিলেন। উহা গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই, নিম্নে সংকলিত হইল—

শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্যধারে যাঁহার আনন্দ বহি যায়
সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভ'রে দিন সবাকার মন।
প্রফুল্ল শেফালিকুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি,
কাশের মঞ্জরীরাশি যাঁর পানে উঠিছে চঞ্চলি—
স্বর্ণদীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধ হাস্যে সেই রসময়
নির্মল শারদরূপে কেড়ে নিন সবার হৃদয়।

—ভারতী। কার্তিক ১৩১৫, পৃ. ৩৩৫

শারদোৎসব নানা স্থানে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া, নূতন ভূমিকা ও চরিত্র লইয়া, ১৩২৮ আশ্বিনের পূর্বে 'ঋণশোধ' নাটকে রূপান্তরিত হয়। ঋণশোধ প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ত্রয়োদশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ সপ্তম খণ্ড) সংকলিত; বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত নাই।

মুকুট

মুকুট ১৯০৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে কয়টি গল্পের নাট্যরূপ দিয়াছেন 'মুকুট' তাহার মধ্যে প্রথম। 'ক্ষুদ্র উপন্যাস' বলিয়া কথিত এই গল্প ১২৯২ বঙ্গাব্দের 'বালক' পত্রে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

চতুরঙ্গ

চতুরঙ্গ ১৩২১ সালের সবুজ পত্রে 'জ্যাঠামশাই' শচীশ' 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' এইরূপ নামে ও ক্রমে প্রকাশিত হয়। ১৩২৩ সালে চতুরঙ্গ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সবুজ পত্রে প্রকাশিত অথচ প্রথম সংস্করণে বর্জিত অনেক অংশ ১৩৪১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়। ঐ পরিবর্জিত অংশ হইতে কয়েকটি বাক্য আখ্যানের পূর্বাপর সংগতি-রক্ষার জন্য বর্তমান রবীন্দ্র-রচনাবলীর ৪৪৮ পৃষ্ঠার উনশেষ পঙ্‌ক্তি হইতে ৪৪৯ পৃষ্ঠার ৭ম পঙ্‌ক্তিতে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রচলিত গ্রন্থেও রবীন্দ্র-রচনাবলীরই অনুসৃতি লক্ষ্য করা যাইবে।

ঘরে-বাইরে

ঘরে-বাইরে ১৩২২ সালে (বৈশাখ-ফাল্গুন) সবুজ পত্রে মুদ্রিত হয় এবং ১৩২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসখানি যখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছিল তখনই ইহার নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে থাকে। ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে এরূপ একখানি চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ সবুজ পত্রে লেখেন—

টীকাটিপ্পনি

লেখার উদ্দেশ্য

আমি যা লিখে থাকি তা অনেকের ভালো লাগে না। এই কথাটি আমাকে সাধারণত যে ভাষায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা হয় নানা স্বাভাবিক কারণে সে ভাষায় আমার দখল নেই। এইজন্য যথারীতি তার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য।

এমন অবস্থায় হঠাৎ একখানি চিঠি পেলুম, সেই চিঠিতে অভিযোগ আছে কিন্তু অবমাননা নেই। চিঠিখানি কোনো মহিলার লেখা, তিনি আমার অপরিচিত। এই চিঠিতে তাঁর স্ত্রীজনোচিত সংযম ও সৌজন্য এবং মাতৃজনোচিত করুণা প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি দুঃখবোধ করেছেন, কিন্তু দুঃখ দিতে চান নি।

তিনি নিজের কোনো ঠিকানা দেন নি, অথচ কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন— এর থেকে অনুমান করছি যে, এই প্রশ্ন তিনি সাধারণের হয়ে পাঠিয়েছেন এবং সাধারণের ঠিকানাতেই এর জবাব চান।

অতএব তাঁর ভর্ৎসনার উত্তরে যে-কটি কথা বলবার আছে সে আমি এই সবুজ পত্রযোগে তাঁর কাছে সবিনয়ে নিবেদন করি। এই উপলক্ষে সাধারণত আমাদের দেশে যে ভাবে সাহিত্যবিচার হয়ে থাকে প্রসঙ্গত সে সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করব।

প্রথমত তিনি কিছু ক্ষোভের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করেছেন— ঘরে-বাইরে উপন্যাসখানি লেখবার উদ্দেশ্য কী?

এর সত্য উত্তরটি এই যে, উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্যই উপন্যাস লেখা। সাদা কথায়, গল্প লিখব আমার খুশি।

কিন্তু একে উদ্দেশ্য বলা যায় না। কেননা 'খুশি' বলাই উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করা। এবং যখন কোনো-একটা উদ্দেশ্যই লোকে প্রত্যাশা করছে তখন সেটা নেই বললেই কথাটা স্পর্ধার মতো শুনতে হয়।

কিন্তু অনেক সময় উদ্দেশ্য বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যায়। হরিণের গায়ে চিহ্ন আছে কেন হরিণ তা জানে না, কিন্তু হরিণ সম্বন্ধে যাঁরা বই লেখেন তাঁরা বলেন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই-সমস্ত চিহ্নের দ্বারা বনের আলোছায়ার সঙ্গে সে বেমালুম মিশিয়ে থাকতে পারবে। এই আন্দাজ সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্যটা যে হরিণের মনের নয় সে কথা সকলকেই মানতে হবে।

উদ্দেশ্য হরিণের নয়, কিন্তু হরিণের ভিতর দিয়ে বিশ্বকর্মার একটা উদ্দেশ্য তো প্রকাশ পাচ্ছে। তা হয়তো পাচ্ছে। তেমনি যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি, এ কথা বলা চলে যে, লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে।

আমি বলছি এ কাজও শিল্পকাজ, শিক্ষাদানের কাজ নয়। কাল আমাদের মনের মধ্যে তার নানা রঙের সুতোয় জাল বুনছে, সেই তার সৃষ্টি, আমি তার থেকে যদি কিছু আদায় করতে চাই তবে সে উদ্দেশ্য আমারই।

আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যে-সব রেখাপাত করেছে ঘরে-বাইরে গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়েছে। কিন্তু এই ছাপার কাজ শিল্পকাজ। এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়।

পৃথিবীর খুব একজন বড়ো লেখকের লেখা সামনে ধরা যাক। শেক্‌স্‌পীয়রের ওথেলো। কবিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাঁর উদ্দেশ্য কী, তিনি মুশকিলে পড়বেন। ভেবে চিন্তে যদি-বা

কোনো উত্তর দেন নিশ্চয়ই সেটা ভুল উত্তর হবে।

আমি যদি ব্রাহ্মণসভার সভ্য হই তবে আমি ঠিক করব, কবির উদ্দেশ্য বর্ণভেদ বাঁচিয়ে চলা সম্বন্ধে জগৎকে সদুপদেশ দেওয়া। যদি স্বাধীন জেনেনার বিরুদ্ধপক্ষ হই তা হলে বলব, পরপুরুষের মুখদর্শন পরিহার করতে বলাই কবির পরামর্শ।

কিংবা কবির বুদ্ধি বা ধর্মজ্ঞানের প্রতি যদি আমার সন্দেহ থাকে তা হলে বলব, একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের নিদারুণ পরিণাম দেখিয়ে তিনি সতীত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন, কিংবা ইয়াগোর চাতুরীকেই শেষ পর্যন্ত জয়ী করে তুলে সরলতার প্রতি নিষ্ঠুর বিদ্রূপ প্রকাশ করাই তাঁর মতলব।

কিন্তু সোজা কথা হচ্ছে, তিনি নাটক লিখেছেন। সেই নাটকে কবির ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, এমন-কি, কবির দেশ-কালও প্রকাশ পায়, কিন্তু সেটা তত্ত্ব বা উপদেশ -রূপে নয়, শিল্পরূপেই। অর্থাৎ সমস্ত নাটকের অবিচ্ছিন্ন প্রাণ এবং লাবণ্যরূপে। যেমন একজন বাঙালিকে যখন দেখি তখন মানুষটার সঙ্গে তার জাতিকে তার বাপ-দাদাকে সম্মিলিত করে দেখি, তার ব্যক্তি এবং তার জাতি দুইয়ের মাঝখানে কোনো জোড়ের চিহ্ন থাকে না ; এও তেমনি। কবির কাব্যে স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে আর তার দেশকালের সঙ্গে একটা প্রাণগত সম্মিলন আছে।

তাই বলছিলুম, ঘরে-বাইরে গল্প যখন লেখা যাচ্ছে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়েছে এবং লেখকের ভালোমন্দ লাগাটাও বোনা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই রঙিন সুতোগুলো শিল্পেরই উপকরণ। তাকে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় তবে সে উদ্দেশ্য লেখকের নয়, পাঠকের। শৌখিন লোকে চমরীর পুচ্ছ থেকে চামর তৈরি করে ; কিন্তু চমরী জানে তার পুচ্ছটা তার প্রাণের অন্তর্গত, ওটাকে কেটে নিয়ে চামর করা অন্তত তার উদ্দেশ্য নয়— যে করে তারই।

গল্পের মত

তার পরে কথা হচ্ছে, আমার হৃদয়ভাবের সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ভাবের যখন বিরোধ ঘটল তখন পাঠক আমাকে দণ্ড দিতে বাধ্য।

মাটির উপর পড়ে গেলে শিশু যেমন মাটিকে মারে তেমনি এমন স্থলে সাধারণ পাঠকে দণ্ড দিয়ে থাকে, এ কথা আমার বিশেষরূপ জানা। তাই বলে দণ্ড যে দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। ভূতকে না ভয় করতে পারি, এমন-কি, ভূতের ভয় অনিষ্টকর মনে করতেও পারি, তবু ভূতের ভয়ের গল্প পড়বার সময়ে সে কথা মনে রাখবার দরকার নেই। এখানে মতামতের কথা নয়, রসের অনুভূতির কথা। খৃস্টান রসিক যখন কোনো হিন্দু আর্টিস্টের আঁকা দেবীমূর্তির বিচার করেন তখন যদি তিনি ভুলতে পারেন যে তিনি মিশনারি তা হলেই ভালো, যদি না পারেন তবে সেজন্যে হিন্দু আর্টিস্টকে দোষ দেওয়া চলবে না। কারণ, হিন্দু আর্টিস্ট্ স্বভাবতই আপন মত বিশ্বাস সংস্কার -অনুসারে ছবি আঁকবেই ; কিন্তু যেহেতু সেটা ছবি সেইজন্যেই তার মধ্যে মত বিশ্বাস সংস্কারের অতীত একটি জিনিস থাকবে, সেটি হচ্ছে রস ; সে রস যদি অহিন্দুর অগ্রাহ্য হয় তবে, হয় রসবোধের অভাবে সেটা অহিন্দুর দোষ, নয় রসের অভাবে সেটা হিন্দু আর্টিস্টের দোষ। কিন্তু দোষটা মত-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। প্রদীপ ইংরেজের একরকম এবং ডীট্‌জ্‌লণ্ঠন চলতি হবার পূর্বে হিন্দুর অন্যরকম ছিল, তবু আলো জিনিসটা আলোই।

দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে আমার সঙ্গে পাঠকের মতভেদ থাকা সম্ভব ; কিন্তু গল্পকে মত বলে দেখবার তো দরকার নেই, গল্প বলেই দেখতে হবে।

গল্পের খাতির

কিন্তু মত যখন এমন বিষয় নিয়ে যেটা দেশের একেবারে মর্মের কথা তখন পাঠকের কাছ থেকেও অতটা বেশি নিরাসক্ত রসানুভূতি দাবি করা যায় না। তখন পাঠকের নিজের ব্যথা গল্পের ব্যথাকে ছাড়িয়ে ওঠে। অতএব সে জায়গায় রসের বিচারের চেয়ে রসের বিষয় বিচারটা স্বভাবতই বড়ো না হয়ে থাকতে পারে না।

আচ্ছা বেশ, তাই মানলুম। তা হলে এ স্থলে লেখকের প্রতি উপদেশটা কী? নিজে যেটাকে ভালো মনে করি পাঠকের খাতিরে চেষ্টা করব সেটাকে মন্দ মনে করতে? পাঠক যদি গল্পের খাতিরে সে কাজ করতে না পারেন তা হলে লেখকই বা পাঠকের খাতিরে এমন কাজ কী করে করবেন?

বস্তুত খাতিরটা গল্পের; লেখকেরও নয়, পাঠকেরও নয়। সেই গল্পের খাতিরেই নিজের হৃদয়ভাব সম্বন্ধে লেখককে নিজের হৃদয় অনুসরণ করতে হবেই এবং সেই গল্পের খাতিরেই পাঠককে গল্পের রস অনুসরণ করতে হবে।

যদি বলা যায় গল্পের খাতিরের চেয়ে দেশের খাতির বড়ো, তবে সে কথা পাঠক সম্বন্ধেও যেমন খাটে লেখক সম্বন্ধেও তেমনি। তাঁর সাময়িক একদল পাঠক তাঁকে বাহবা দেবে এ কথা লেখকের ভাববার নয়, তিনি ভাববেন তাঁর গল্পটি ঠিকমত হওয়া চাই; তাও যদি তাঁকে ভাবতে দেওয়া না যায় তবে দেশের ভালো হয় এই কথাই যেন তিনি ভাবেন, দেশ তাঁকে ভালো বলে এ কথা নয়।

আখ্যায়িকা

লেখিকার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এই উপন্যাসের আখ্যায়িকা কি আমার কল্পনাপ্রসূত না বাস্তবে কোথাও তার আভাস পাওয়া গেছে। যদি পেয়ে থাকি তবে সে কি আধুনিক 'পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী বিলাসী সম্প্রদায়ে না প্রাচীন হিন্দুপরিবারে'?

উত্তর এই: আখ্যায়িকাটি অধিকাংশ গল্পের আখ্যায়িকার মতোই আমার কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু এইটুকুমাত্র বললেই লেখিকার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া হয় না। ঐ প্রশ্নের মধ্যে একটি কথা চাপা আছে যে, এমন ঘটনা প্রাচীন হিন্দুপরিবারে অসম্ভব।

ঠিক একটা গল্পের ঘটনা সেই গল্পের অনুরূপ অবস্থার মধ্যেই ঘটতে পারে, আর কোথাও ঘটতে পারে না— প্রাচীন বা নবীন, হিন্দু বা অহিন্দু কোনো পরিবারেই না। অতএব কোনো বিশেষ পরিবারে কী ঘটেছে সে কথা স্মরণ করে গুজব করাই চলে, গল্প লেখা চলে না। মানবচরিত্রে যে সমস্ত সম্ভবপরতা আছে সেইগুলিকেই ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে গল্পে নাটকে বিচিত্র করে তোলা হয়। মানবচরিত্রের মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে কিন্তু ঘটনার মধ্যে নেই। ঘটনা নানা আকারে নানা জায়গায় ঘটে, একই ঘটনা দুই জায়গায় ঠিক একই রকম ঘটে না। কিন্তু তার মূলে যে মানবচরিত্র আছে সে চিরকালই নিজেকে প্রকাশ করে এসেছে। এইজন্য সেই মানবচরিত্রের প্রতিই লেখক দৃষ্টি রাখেন, কোনো ঘটনার নকল করার প্রতি নয়।

সাহিত্যবিচার

তা হলে প্রশ্ন এই যে, প্রাচীন হিন্দুপরিবারে সর্বত্রই মানবচরিত্র কি মনুসংহিতার রাশ মেনে চলে? কখনো লাগাম ছিঁড়ে খানার মধ্যে গিয়ে পড়ে না?

আমরা বৈদিক পৌরাণিক কাল থেকে এইটেই দেখে আসছি যে, বুনো ওলের সঙ্গে বাঘা তেঁতুলের লড়াইয়ের অন্ত নেই। এক দিকে শাসনও কড়া, অন্য দিকে মানবের প্রকৃতিও উদ্দাম। তাই কখনো শাসন জেতে, কখনো প্রকৃতি। এই লড়াই যদি প্রাচীন হিন্দুপরিবারে

সম্পূর্ণ অসম্ভব হয় তবে সেই প্রাচীন হিন্দুপরিবারের ঠিকানা এখনো পাওয়া যায় নি। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক যেখানে মন্দ একেবারেই নেই সেখানে ভালোও নেই। প্রাচীন হিন্দুপরিবারে কারও পক্ষে মন্দ হওয়া যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে সে পরিবারের লোক ভালোও নয়, মন্দও নয়, তারা সংহিতার কলের পুতুল। ভালোমন্দর দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে মানুষ ভালোকে বেছে নেবে বিবেকের দ্বারা, প্রথার দ্বারা নয়, এই হচ্ছে মনুষ্যত্ব।

প্রাচীন সংস্কৃত উদ্ভট কবিতায় যে-সকল কুৎসিত স্ত্রীনিন্দা দেখতে পাই বর্তমান কোনো পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানীর লেখায় তার আভাসমাত্র পাওয়া যায় না। তার কারণ, আধুনিক কবিরা স্ত্রীজাতিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে থাকেন। এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, সেই-সকল প্রাচীন স্ত্রীনিন্দাগুলি স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে মিথ্যা, কিন্তু যদি স্ত্রীবিশেষ সম্বন্ধেও মিথ্যা হয় তবে সেই কবিতাগুলির উদ্‌ভব হ'ল কোথা হতে ?

তা হলে বোধ হয় তর্কটা এইরকম দাঁড়াবে মানবপ্রকৃতির মধ্যে নিয়ম লঙ্ঘন করবার একটা বেগ আছে, কিন্তু সেটা কি সাহিত্যে বর্ণনা করবার বিষয় ? এ তর্কের উত্তর আবহমান কালের সমস্ত সাহিত্যই দিচ্ছে, অতএব আমি নিরুত্তর থাকলেও ক্ষতি হবে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে অধিকাংশ সমালোচকের হাতে সাহিত্যবিচার স্মৃতি-শাস্ত্রবিচারের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমের কোন্ নায়িকা হিন্দুরমণী হিসাবে কতটা উৎকর্ষ প্রকাশ করেছে তাই নিয়ে সমালোচক-মহলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ চলে থাকে। ভ্রমর তার স্বামীর প্রতি অভিমান করেছিল সেটাতে তার হিন্দুসতীত্বে কতটা খাদ ধরা পড়েছে, সূর্যমুখী স্বামীর প্রেয়সী সতিনকে নিজেরও প্রেয়সী করতে না পারাতে তার হিন্দুরমণীত্বের কতটা লাঘব হয়েছে, শকুন্তলা কী আশ্চর্য হিন্দুনারী, দুষ্যন্ত কী আশ্চর্য হিন্দুরাজা, এই-সকল বিচারপ্রহসন আমাদের দেশে সাহিত্যবিচারের নাম ধরে নিজের গাম্ভীর্য বাঁচিয়ে চলতে পারে— জগতে আর-কোথাও এমন দেখা যায় না। শেক্‌স্‌পীয়র অনেক নায়িকার সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে ইংরেজ-রমণীত্ব কতটা প্রকট হয়েছে এ নিয়ে কেউ চিন্তা করে না, এমন-কি, তাদের খৃস্টানির মাত্রা নিক্তির ওজনে পরিমাপ করে পয়লা দোসরা মার্কা দেওয়া খৃস্টান পাদ্রিদের দ্বারাও ঘটা সম্ভব নয়।

আমি হয়তো এ কথা বলে ভালো করলুম না। কেননা, জগতে যা কোথাও নেই সেইটেই ভারতে আছে, এই হচ্ছে আধুনিক বাঙালির গর্ব। কিন্তু ভারত তো বাঙালির সৃষ্টি নয়, আমরা সাহিত্যসমালোচনা শুরু করবার পূর্বেও ভারতবর্ষ ছিল। সেই ভারতের অলংকারশাস্ত্রে নায়িকাবিচার মনুপরাশরের সঙ্গে মিলিয়ে করা হয় নি, মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য অনুসারেই তাদের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা হয়েছিল। আমি এরকম শ্রেণীবিভাগ ভালো বলি নে ; কারণ, সাহিত্য তো বিজ্ঞান নয়, সাহিত্যে শ্রেণীর ছাঁচে নায়ক-নায়িকার ঢালাই হতে থাকলে সেটা পুতুলের রাজ্য হয়, প্রাণের রাজ্য হয় না। তবু যদি নিতান্তই শ্রেণীবিভাগের শখ সাহিত্যেও মেটাতে হয় তাহলে ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট হিন্দু ও অহিন্দু এই দুই শ্রেণী না ধরে যথাসম্ভব মানবস্বভাবের বৈচিত্র্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা কর্তব্য।

স্বদেশপ্রেম

লেখিকার কাছে আমার শেষ নিবেদন এই যে, গল্পের ভিতর থেকে গল্পের চেয়ে বেশি কিছু যদি আদায় করতেই হয় তা হলে অন্তত গল্পের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর-একটি কথা এই যে, আমিও দেশকে ভালোবাসি, তা যদি না হত তা হলে দেশের লোকের কাছে লোকপ্রিয় হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হত না। সত্য প্রেমের পথ আরামের নয়, সে পথ দুর্গম। সিদ্ধিলাভ সকলের শক্তিতে নেই এবং সকলের ভাগ্যেও ফলে না, কিন্তু দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ্য করি তা হলে মনে এই সান্ত্বনা থাকবে যে কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনায় মিথ্যাচরণ করি নি। দুঃখ পাই তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমার সকলের চেয়ে বেদনার বিষয় এই

যে, যা সত্য মনে করি তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে লেখিকার মতো অনেক সরল, শ্রদ্ধাবান, স্বদেশবৎসল ও সকরুণ হৃদয়ে বেদনা দিয়েছি। সে আমার দুর্ভাগ্য কিন্তু সে আমার অপরাধ নয়।

—সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২২

ঘরে-বাইরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার পর বহুকাল পর্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে নানা জনের নানারূপ সমালোচনা চলিয়াছিল। প্রবাসীতে 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করেন ; নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

সাহিত্যবিচার

ঘরে-বাইরে উপন্যাসখানা লইয়া বাংলার পাঠকমহলে এখনো কথা চলিতেছে। হৃদয়াবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল হয় তখন মানুষ গদ্য ছাড়িয়া পদ্য ধরে। সম্প্রতি তাহারও সূচনা প্রকাশ পাইতেছে। এক জায়গায় দেখিলাম, ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে ক্ষোভ চোদ্দ অক্ষরের লাইনে লাইনে রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়াছে। ইহাতে পদ্যসাহিত্যের বিপদ চিন্তা করিয়া উদ্‌বিগ্ন হইলাম। পাছে ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে সেইজন্যে এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিলাম না।

পছন্দ লইয়া মানুষের সঙ্গে তর্ক চলে না। ভর্তৃহরির অনেক পূর্ব হইতেই কবিরা এ সম্বন্ধে অবস্থাবিশেষে হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন। স্বয়ং কালিদাসও কবিতাই লিখিয়াছেন, কিন্তু দিঙ্‌নাগাচার্যের সহিত বাদপ্রতিবাদ করেন নাই। সাধারণত কবিদের নিন্দা-অসহিষ্ণু বলিয়া খ্যাতি আছে ; কিন্তু সেই অসহিষ্ণুতা লইয়া (দুই-একজন ছাড়া) তাঁহারা নিজেরাই ক্ষোভ অনুভব করিয়াছেন, সাহিত্যকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলেন নাই। যখন তাঁহাদের লেখার প্রতি কেহ কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন তখন সেই কলঙ্কভঞ্জনের ভার তাঁহারা কালের হস্তেই সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ভাগ্যবান তাঁহাদের লেখা সম্বন্ধে ইহাই প্রমাণ হইয়া গেছে যে, তাঁহাদের রচনার কলসে আলংকারিক ছিদ্র, একটা কেন, একশোটা থাকিতে পারে, কিন্তু তবু তাহা হইতে রস বাহির হইয়া যায় নাই। সাহিত্যে এই কলঙ্কভঞ্জনের পালা অনেক দিন হইতে অনেক বার অভিনীত হইয়াছে, যাঁহারা আলংকারিক তাঁহাদের গঞ্জনা হইতে কবিরা বারবার রক্ষা পাইয়াছেন।

ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে রসবোধ লইয়া যদি কথা উঠিত তবে সে কথা যতই কটু হউক নীরব থাকিতাম। কিন্তু যে কথা উঠিয়াছে তাহা সাহিত্যসীমানার বাহিরের জিনিস। তাহা যুক্তির অধিকারের মধ্যে, সুতরাং তাহা লইয়া তর্ক চলে এবং তর্ক না চালাইলে কর্তব্যপালন করা হয় না। কারণ, যাহা অন্যায় তাহাকে সহ্য করিয়া গেলে সাধারণের প্রতি অন্যায় করা হয়।

ঘরে-বাইরে বাহির হইবার পরেই আমার বিরুদ্ধে একটা নালিশ শোনা গেল যে, আমি এই উপন্যাসে সীতার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিয়াছি। কথাটা এতই অদ্ভুত যে আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এমন-কি, আমাদের দেশেও ইহা গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু দেখিলাম, লোকে উৎসাহের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়াছে ; এবং জনগণের নিন্দায় একদা সীতা যেরূপ নির্বাসিত হইয়াছিলেন এ গ্রন্থও সেইরূপ গণ্যমান্যদের সভা ও লাইব্রেরিঘরের টেবিল হইতে নির্বাসিত হইতে থাকিল।

এটাকে সামান্য ব্যক্তিগত হিসাবে দেখিলে ইহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু যে-কোনো প্রভাবে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে বিকৃত করে সেই প্রভাব যদি ব্যাপক হইয়া উঠিতে থাকে তবে সেটাকে সাধারণের পক্ষে ক্ষতিজনক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অতএব ঘরে-বাইরে গ্রন্থের যে অপরাধ বানাইয়া তুলিয়া আমার প্রতি কেবলই আক্রোশবর্ষণ চলিতেছে সেই অপরাধের অভিযোগটাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার।

মহাকাব্যে নাটকে বা নভেলে যে আখ্যানবস্তু পাওয়া যায় তাহার নানা বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু সকল বৈচিত্র্যসত্ত্বেও সেই-সমস্ত আখ্যানে একটি সাধারণ উপাদান দেখিতে পাই ; সেটি আর কিছু নয়, সংসারে ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব। তাই রামায়ণে দেখিয়াছি রাম-রাবণের যুদ্ধ, মহাভারতে দেখিয়াছি কুরু-পাণ্ডবের বিরোধ। কেবলই সমস্তই একটানা ভালো, কোথাও মন্দের কোনো আভাসমাত্র নাই, এমনতরো নিছক চিনির শরবত দিয়াই সাহিত্যের ভোজ সম্পন্ন করা অন্তত কোনো বড়ো যজ্ঞে দেখি নাই।

এতবড়ো মোটা কথাও যে আমাকে আজ বিশেষ করিয়া বলিতে হইতেছে সেজন্য আমি সংকোচ বোধ করিতেছি। শিশুরা যে রূপকথা শোনে সেই রূপকথাতেও রাক্ষস আছে ; সেই রাক্ষস শুদ্ধ সংযত হইয়া কেবলই মনুসংহিতা আওড়ায় না, সে বলে 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ'। ধর্মনীতির দিক হইতে দেখিলে তাহার পক্ষে এমন কথা বলা নিঃসন্দেহই গুরুতর অপরাধ ; আশা করি যাহারা এই-সকল গল্প রচনা করিয়াছিল তাহারা নরমাংসাশী ছিল না এবং যাহারা এই-সব গল্প শোনে নরমাংসে তাহাদের স্পৃহা বাড়ে না। তাই বলিতেছি, মানুষের গন্ধে গল্পের রাক্ষসের লুব্ধতা উদ্রেক হওয়া ধর্মশাস্ত্রমতে অপরাধ সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষের গন্ধে গল্পের রাক্ষসের ভ্রাতৃপ্রেম যদি জাগিয়া উঠিত এবং সে যদি সুমধুর স্বরে বলিয়া উঠিত 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' তবে সাহিত্যরসনীতি অনুসারে রাক্ষসের সে অপরাধ কিছুতে ক্ষমা করা চলিত না। কোনো শিশুর কাছে ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই এক মুহূর্তেই আমার কথা সপ্রমাণ হইবে। কিন্তু সেই শিশুই কি বড়ো হইয়া এম. এ. পাস করিবামাত্র গল্পের রাক্ষসটা মরাল্ ফিলজফির নীচে চাপা পড়িয়া সরু সুরে শান্তিশতক আওড়াইতে থাকিবে ?

যাই হউক, সকল ভাষার সকল সাহিত্যেই ভালোমন্দ দুইরকম চরিত্রেরই মানুষ আসরে স্থান পায়। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেও সেইরূপ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। এইজন্যই ঘরে-বাইরে নভেলে যখন সন্দীপের অবতারণা করিয়াছিলাম তখন মুহূর্তের জন্যও আশঙ্কা করি নাই যে সেটা লইয়া আমাদের দেশের উপাধিধারী এত গণ্যমান্য লোকের কাছে আমাকে এমন জবাবদিহির দায়ে পড়িতে হইবে। এখন হইতে ভবিষ্যতে এই আশঙ্কা মনে রাখিব, কিন্তু স্বভাব সংশোধন করিতে পারিব না ; কেননা আমাদের দেশের বর্তমান কাল ছাড়াও কাল আছে, এবং গণ্যমান্য লোক ছাড়াও লোক আছে, তাহারা নিশ্চয়ই রাক্ষসের মুখ হইতে এই অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ কথা শুনিতে চায় : হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ ! চন্দ্রবিন্দুর বাহুল্য প্রয়োগেও তাহারা বাংলাভাষা সম্বন্ধে উদ্‌বিগ্ন হইবে না।

জানি আমাকে প্রশ্ন করা হইবে, সন্দীপ যত বড়ো মন্দ লোকই হউক তাহাকে দিয়া সীতাকে অপমান কেন ? আমি কৈফিয়ত-স্বরূপে বাল্মীকির দোহাই মানিব, তিনি কেন রাবণকে দিয়া সীতার অপমান ঘটাইলেন। তিনি তো অনায়াসেই রাবণকে দিয়া বলাইতে পারিতেন যে, মা লক্ষ্মী, আমি বিশ হাতে তোমার পায়ের ধুলা লইয়া দশ ললাটে তিলক কাটিতে আসিয়াছি। বেদব্যাস কেন দুঃশাসনকে দিয়া জয়দ্রথকে দিয়া দ্রৌপদীকে অপমানিত করিয়াছেন ? রাবণ রাবণের যোগ্যই কাজ করিয়াছে ; দুঃশাসন জয়দ্রথ যাহা করিয়াছে তাহা তাহাদিগকেই সাজে। তেমনি আমার মতে সন্দীপ সীতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা সন্দীপেরই যোগ্য, অতএব সে কথা অন্যায় কথা বলিয়াই তাহা সংগত হইয়াছে। এবং সেই সংগতি সাহিত্যে নিন্দার বিষয় নহে।

যদি আধুনিক কালের কোনো উপাধিধারী এমন কথা গদ্যে বা পদ্যে বলিতে পারিতেন যে, রাবণের পক্ষে সীতাহরণ কাজটা অসংগত, মন্থরার পক্ষে রামের প্রতি ঈর্ষা অযথা, সূর্পণখার পক্ষে লক্ষ্মণের প্রতি অনুরাগের উদ্রেক অসম্ভব, তাহা হইলে নিশ্চয় কবিগুরু বিচারসভায় হাজির থাকিলেও নিরুত্তর থাকিতেন ; কেননা এমন সকল আলোচনা সাহিত্যসভায় চলিতে পারে। কিন্তু তাহা না বলিয়া ইঁহারা যদি বলিতেন এ-সকল বর্ণনা নিন্দনীয় কারণ ইহাতে সীতাকে রামকে

লক্ষ্মণকে অপমানিত করা হইয়াছে এবং এই অপমান স্বয়ং কবিকৃত অপমান, ধর্মশাস্ত্র অনুসারে এই-সকল ভালোমানুষের প্রতি সকলেরই সাধু ব্যবহার করাই উচিত, তবে যে কবি সর্বাঙ্গে কীটের উৎপাত স্তব্ধ হইয়া সহ্য করিয়াছিলেন তিনিও বোধ হয় বিচলিত হইয়া উঠিতেন।

আমি অন্য দেশের কবি ও লেখকের গ্রন্থ হইতে কোনো দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করিলাম না। কেননা এমন কথা আমাদের দেশে প্রচলিত যে, অন্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের কোনো অংশে মিল নাই, সেই অমিলটাকেই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া থাকা আমাদের ন্যাশনাল সাহিত্যের লক্ষণ— অর্থাৎ, ন্যাশনাল সাহিত্য কূপমণ্ডূকের সাহিত্য।

—প্রবাসী। চৈত্র ১৩২৬

অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে (২৯ ফাল্গুন ১৩২২) ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'প্রমথ চৌধুরী এই গল্পটিকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু সে বোধ হয় কতকটা লীলাচ্ছলেই করে থাকবেন। এর মধ্যে কোনো জ্ঞানকৃত রূপকের চেষ্টা নেই, এ কেবলমাত্রই গল্প। মানুষের অন্তরের সঙ্গে বাইরের এবং একের সঙ্গে অন্যের ঘাতপ্রতিঘাতে যে হাসিকান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এর মধ্যে তারই বর্ণনা আছে। তার চেয়ে বেশি যদি কিছু থাকে সেটা অবান্তর এবং আকস্মিক।'

ঘরে-বাইরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার সময়, সবুজ পত্রে প্রকাশিত অনেক অংশ বর্জিত হয়। পরবর্তী ১৯২০ খৃস্টাব্দের পরিবর্ধিত সংস্করণে এই-সকল বর্জিত অংশ পুনরায় গৃহীত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে সেই পাঠই সংকলিত।

সাহিত্য

সাহিত্য গদ্যগ্রন্থাবলীর চতুর্থ ভাগ রূপে ১৩১৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ও অন্য গ্রন্থে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ রচনাবলীতে সাহিত্যের পরিশিষ্টরূপে সংকলিত। (প্রবন্ধগুলির সাময়িক পত্রাদিতে প্রথম প্রকাশকাল প্রবন্ধশেষে মুদ্রিত।) দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সমালোচনা 'ভারতী' হইতে এই পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল ; উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' পত্রে তাহার সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্রের মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হয় তাহা বিশ্বভারতী-প্রকাশিত চিঠিপত্র ১০ম খণ্ডের অন্তর্গত। সমালোচনাটি মূলগ্রন্থেই সন্নিবিষ্ট আছে— গ্রন্থে প্রবন্ধের যে অংশ বর্জিত তাহা এ স্থলে দেওয়া গেল—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (শেষাংশ)

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যও হঠাৎ একদিন অভাবনীয় উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিবে, এরূপ আশা করি। কখন উঠিবে ? যখন একমাত্র ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার প্লাবনের দ্বারা নানাকে এক করিয়া দিবে, সকলের হৃদয়কে সকলের সম্মুখে আনিয়া দিবে, কাহারও কাহাকেও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। যখন বিভাগের মধ্যে এককে পাইব, বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন পাইব। যখন অনুগ্রহের দ্বারা পীড়িত হইব না, যেখানে আমাদের গৌরব আছে সেই জায়গাটা সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিব। যখন আমরা বর্তমানের বন্ধন ছেদন করিয়া তাহার বাহিরে একটা অনন্ত আশার ক্ষেত্র বিস্তৃত দেখিব। এখন ইংরাজের সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান রাষ্ট্রতন্ত্র আমাদিগকে চারি দিকে নীরন্ধ্রভাবে বেষ্টন করিয়া আছে, আমরা তাহার বাহিরে কিছুই দেখিতে পাই না। পরের জিনিস আমাদিগকে একেবারে গ্রাস করিয়াছে। যখন কোনো প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী আসিয়া এই

বেষ্টনকে ভেদ করিয়া আমাদিগকে মুক্তি দিবেন, যখন হঠাৎ আমরা অনুভব করিব অনুকরণই আমাদের একমাত্র গৌরব নয়, আবিষ্কার করিব আমাদের নিজের মধ্যে এমন এক বিশেষ শক্তি আছে যাহা অন্য-কোনো জাতির নাই, যখন চেতনা হইবে ইংরাজি গ্রন্থের অর্থপুস্তক না মুখস্থ করিয়াও আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে, যখন আমাদের নিজের গৌরবের আনন্দে আমাদিগকে এক করিয়া দিবে, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধস্বীকারে আমাদের কোনো লজ্জা থাকিবে না, তখন সেই আনন্দের দিনে, আশার দিনে, গৌরবের দিনে, মিলনের দিনে, যে সৌভাগ্যবান কবি বাংলাদেশে গান ধরিবেন তাঁহার গান জগতের মধ্যে সার্থক হইবে। বঙ্গদেশ যখন নিজের অমরত্ব নিজের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিবে, নিজের সম্বন্ধে যখন তাহার কোনো সংশয় কোনো সংকোচ থাকিবে না, তখন নির্ভীক বঙ্গসাহিত্য সমস্ত সমালোচকের সমস্ত বাঁধি বোল, সমস্ত ইস্কুলের সমস্ত মুখস্থ গৎ অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া নিজের অন্তরের মহান্ আদর্শ অবলম্বন করিয়া অপূর্ব কারুকৌশলে আপন নবীন দেবমন্দিরকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিবে এবং মুহূর্তের মধ্যে তাহাকে প্রাচীনের চিরন্তন মহিমা সমর্পণ করিবে। আমরা নিজের অবস্থা-গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হইয়া যাহা পারিয়াছি তাহাই করিয়াছি, যাহা শিখিয়াছি তাহাই বকিয়াছি, যাহা সম্মুখে পাইয়াছি তাহাই বিহিত নিয়মে সাজাইয়া গেছি। আমাদের রচনা বাংলার বর্তমান ভিত্তির মধ্যে এখনো কোনো নূতন গবাক্ষ কাটিয়া কোনো নূতন আলোক আনে নাই, কোনো নূতন আশায় দেশকে প্লাবিত করে নাই, সাহিত্যকে এমন একটি প্রাণশক্তি দেয় নাই যে শক্তিবলে আমাদের সাহিত্য দেশের ও বিদেশের পক্ষে চিরকালের জন্য প্রাণের সৌন্দর্যের ও কল্যাণের অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া থাকে।

কিন্তু অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছি, সেদিন দূরে নাই। সমস্ত অনুকরণ-অনুসরণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া নিজেকে নিজে লাভ করিবার জন্য আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তীব্র বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। মরুভূমির মধ্যে ক্ষুধাতুর তৃষার্তের স্কন্ধে টাকার থলি যেমন কেবল ভারমাত্র তেমনি বিদেশের যে-সমস্ত বহুমূল্য বোঝা আমরা মাথায় চাপাইয়াছি, বুঝিতে পারিতেছি, তাহার মূল্য যতই হোক, তাহা আমাদের বল অপহরণ করিতেছে ; এখন মন কেবলই বলিতেছে : চাহি না, চাহি না, এ-সমস্ত কিছুই চাহি না। তবে কী চাই ? হৃদয়ের মধ্য হইতে এই প্রার্থনা উর্ধ্বস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেছে : আপনাকে চাই ! চাই আপনার শক্তিকে ! প্রচুর হইলেও উপকরণমাত্রে কোনো লাভ নাই, তাহা আবর্জনা। সভা সমিতি দরখাস্ত ও কন্‌গ্রেসে যে আমাদিগের হীনতা হইতে মুক্তি দিতে পারে এ মোহ আমাদের মন হইতে চলিয়া যাইতেছে, গবর্মেন্ট অনুগ্রহপূর্বক উচ্চ আসনে চড়াইয়া আমাদিগকে বড়ো করিতে পারে এই মিথ্যা আশাও শিথিল হইয়া আসিয়াছে। এখনি যথার্থ সময়। এখনি মনে হইতেছে, কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে— যিনি ভারতবর্ষের সম্মুখে ভারতবর্ষের পথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবেন ; যিনি আমাদের অন্তরের মধ্যে এই কথা ধ্বনিত করিয়া তুলিবেন যে, আমরা ভারতবাসী, আমরা ফিরিঙ্গি নই, আমরা বর্বর নই, আমাদের লজ্জার কোনো কারণ নাই ; যিনি আমাদের মনকে, আমাদের হৃদয়কে, আমাদের কল্পনাকে স্বাধীন করিয়া দিবেন ; যিনি আমাদের শিক্ষার বন্ধন মোচন করিবেন, আমাদের বিদেশী সংস্কারের সমস্ত কুহেলিকা অপসারিত করিয়া দিবেন। তখন আমাদের বর্তমান অবস্থা যেমনি থাক্, আমাদের চিত্ত তাহার বহু উর্ধ্বে উঠিয়া সমস্ত বিশ্বজগৎকে প্রত্যক্ষ আপনার সম্মুখে প্রসারিত দেখিবে। এমন মুক্তি আছে যাহাকে রাজার শাসন, প্রবলের পীড়ন, অবস্থার পেষণ্ স্পর্শ করিতে পারে না। সেই মুক্তিই ভারতবর্ষের লক্ষ্যস্থল ছিল এবং সকল ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থচেষ্টার আক্রমণ হইতে সেই রত্নকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াই ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষে গৌরব লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই রত্ন হারাইয়াই ব্রাহ্মণ ও ভারতবর্ষ রসাতলে গেছে। সেই মুক্তির আশা ও আনন্দ যখন অরুণালোকের ন্যায় আমাদের মাতৃভূমির উদয়াচল স্পর্শ করিবে তখন যে অপরূপ সংগীত চতুর্দিক হইতে ধ্বনিত উদ্‌গীত

হইয়া উঠিবে তাহা আমার অন্তরে বাজিতেছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য আমার নাই। সেইদিনকার বঙ্গসাহিত্যের জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া আছি, ততদিন যাহা করিতেছি তাহা ক্রীড়াচ্ছলে সময়যাপন মাত্র।

—বঙ্গদর্শন। শ্রাবণ ১৩০৯

'সাহিত্যসম্মিলন' প্রবন্ধ 'ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনীক্ষেত্রে সাহিত্যসম্মিলন উপলক্ষে পঠিত' হয়। 'সাহিত্যপরিষৎ' প্রবন্ধ 'বহরমপুরের প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলনের জন্য লিখিত হইয়াছিল।' বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিবরণ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রতিবেদন ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -সংকলিত 'পরিষৎপরিচয়' হইতে উদ্‌ধৃত হইল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসম্মিলন 'অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা সর্বপ্রথম পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন'।—

জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য জাতীয় ঐক্যবন্ধন রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। বঙ্গবিভাগের পর এই কথাটা অনেকের মনে স্পষ্টভাবে উঠিয়াছিল। এই বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন নগরে সাহিত্যসম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্যসেবীদিগের মিলনসাধন এবং বাংলার প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্য ভূগোল ইতিহাস ও বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা চলিতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভে গত ভাদ্র মাসে টাউন হলে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'অবস্থা ও ব্যবস্থা'[১] নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি ঐ প্রস্তাব সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সাহিত্যপরিষৎকে ঐরূপ বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন করিতে অনুরোধ করেন। প্রস্তাবকর্তার সহিত কথাবার্তায় বুঝা গিয়াছিল যে, বিলাতের British Association for the Advancement of Science তাঁহার প্রস্তাবের আদর্শ ছিল। ঐ সমাজ কেবল বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করেন, পরিষৎ এই উপলক্ষে বঙ্গের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের আলোচনা করিবেন, এই মাত্র প্রভেদ ছিল। তৎপরে এই প্রস্তাব পরিষদে আলোচিত হয় ও কর্মের গুরুত্ব-বিবেচনায় পরিষৎ এ বিষয়ে সাবধানে অগ্রসর হইতেছিলেন।

বৎসরের শেষভাগে রংপুরের শাখা-পরিষদের সংস্থাপক ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় শাখা-সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে পরিষৎকে নিমন্ত্রণ করেন।... এই

১ 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের অন্তর্গত। প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড ; সুলভসংস্করণ দ্বিতীয় খণ্ড :

'এই-যে স্বাধীন বাংলা সাহিত্য, যাহার মধ্যে বাঙালি নিজের প্রকৃত শক্তি যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছে, এই সাহিত্যই নাড়িজালের মতো বাংলার পূর্বপশ্চিম-উত্তরদক্ষিণকে এক বন্ধনে বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে এক চেতনা এক প্রাণ সঞ্চার করিয়া রাখিতেছে ; যদি আমাদের দেশে স্বদেশী সভা স্থাপন হয় তবে বাংলা সাহিত্যের অভাবমোচন, বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন সভ্যগণের একটি বিশেষ কার্য হইবে। বাংলা ভাষা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস বিজ্ঞান অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দেশে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বাংলা সাহিত্য যত উন্নত, সতেজ, যতই সম্পূর্ণ হইবে, ততই এই সাহিত্যই বাঙালিজাতিকে এক করিয়া ধারণ করিবার অনশ্বর আধার হইবে।...

'আমরা এই সময়ে এই উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎকে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না তাকাইয়া, নিজেকে পরের কাছে প্রচার না করিয়া নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয় লাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পূরণ করিতেছেন। এই পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে এবং পর্যায়ক্রমে এক-একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার— এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্যপরিষদ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।'

সুযোগে রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইবে বুঝিয়া পরিষৎ কর্তব্যনিরূপণের পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময়ে··· শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী বরিশালবাসীর পক্ষ হইতে সাহিত্যপরিষৎকে সাহিত্যসম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ১লা ও ২রা বৈশাখ (১৩১৩) বরিশালে বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতি (Bengal Provincial Conference) বসিবার কথা ছিল।··· এই সুযোগ বুঝিয়া ওই সময়েই বরিশালবাসীরা সাহিত্যসম্মিলন প্রস্তাব করেন।··· ৩রা বৈশাখ তারিখে এই সম্মিলনের দিন স্থির হয়। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই সভাপতির আসন দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। এই সাহিত্যসম্মিলনের সহিত রাজনীতির কোনো সম্পর্ক থাকিবে না, ইহাও বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

বরিশালের এই নিমন্ত্রণ পরিষৎ সাদরে গ্রহণ করেন··· তৎপরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।···

১লা বৈশাখ তারিখে প্রাদেশিক সমিতির সভ্যগণ পুলিসের হস্তে নিগৃহীত হন এবং ২রা বৈশাখ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে পুলিস-কর্তৃক প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন ভাঙিয়া দেওয়া হয়। যে মণ্ডপে প্রাদেশিক সমিতি বসিয়াছিল, সেই মণ্ডপেই ৩রা বৈশাখ সাহিত্যসম্মিলন বসিবে এইরূপ নির্ধারিত ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ হইল যে, ওই মণ্ডপে বা বরিশালের অন্যত্র কোনো সভা হইতে পারিবে না··· অন্যান্য কার্যের মধ্যে বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ 'গোলমালজনক কার্যের' মধ্যে গণ্য হইবে এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। বন্দেমাতরম্ উচ্চারণের সহিত রাজনীতিরই সম্পর্ক আছে, সাহিত্যচর্চার কোনো সম্পর্ক নাই, ইহা স্বীকার করিতে কোনো সাহিত্যসেবীই সম্মত হইলেন না।··· পরম্পরায় শুনা গিয়াছিল, রাজপুরুষেরা স্থানীয় রাজকর্মচারীদিগকে ও রাজকীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সাহিত্যসম্মিলনে উপস্থিত হইতে নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। ২রা বৈশাখ সন্ধ্যার পর রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় ও নিমন্ত্রিত সাহিত্যসেবীদের সহিত পরামর্শ করিলেন। অতঃপর বরিশালে আর সাহিত্যসম্মিলন হওয়া সম্ভবপর নহে— বহু বিবেচনার পর ইহাই স্থির হইল। বরিশালবাসীরা ক্ষুণ্নমনে ও ভগ্নহৃদয়ে সমবেত প্রতিনিধিগণকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে সাহিত্যসম্মিলনের প্রথম অভিনয়ে সূত্রধার প্রবেশের পূর্বেই যবনিকাপাত ঘটিল।

···১৩১৩ সালে বহরমপুরে প্রাদেশিক রাজনৈতিক অধিবেশনের সময় সাহিত্যসম্মিলনের পুনরায় উদ্যোগ হইয়াছিল।··· মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই সম্মিলনের প্রধান উদ্যোগকারী ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার পুত্রবিয়োগে বহরমপুরের অভ্যর্থনা সমিতি ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ একযোগে সাহিত্যসম্মিলন আপাতত স্থগিত রাখা উচিত বিবেচনা করেন।

—বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বার্ষিক বিবরণ

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের প্রথম অধিবেশন মুর্শিদাবাদে, ১৩১৪ সালের কার্তিকে। চতুর্দশ বার্ষিক বিবরণ হইতে এই সম্মিলনের কিঞ্চিৎ বিবরণ উদ্‌ধৃত হইল—

শ্যামাপূজার অব্যবহিত পূর্বে ১৭ই এবং ১৮ই কার্তিক দুই দিনে সম্মিলনের অধিবেশন ধার্য হয়।···

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের এই প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করিয়াছিলেন, ইহা সর্বতোভাবে সংগতই হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুই প্রথমে এইরূপ সাহিত্যসম্মিলনের আবশ্যকতা পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বে সাহিত্যসম্মিলন যে সুপথে চালিত হইয়াছে তাহা বলা অনাবশ্যক।

—বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের চতুর্দশ বার্ষিক বিবরণ

'সাহিত্যপরিষৎ' প্রবন্ধ এবং পরিষদের কর্তব্য ও কর্মক্ষেত্র প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের একাদশ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণীর নিম্নলিখিত অংশ সংকলন করা যাইতে পারে—

পরিষদের কর্মক্ষেত্রের পরিধিবিস্তার : এই বৎসর পরিষদের জীবনে নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে পরিষৎ বিস্তৃততর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এতদিন পরিষদের কার্য মুখ্যত ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় আবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি বঙ্গদেশের পুরাতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ভৌগোলিকতত্ত্ব প্রভৃতিও যাহাতে পরিষদের আলোচ্য হয়, তজ্জন্য চেষ্টার আরম্ভ হইয়াছে।...

...৬ চৈত্র তারিখে কার্যনির্বাহকসমিতির বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। উহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া পরিষদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি-বিস্তারের জন্য প্রস্তাব করেন। পরিষৎ এপর্যন্ত মুখ্যত বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের বিবিধ তত্ত্ব -আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন ; রবীন্দ্রবাবুর অভিপ্রায় যে, অতঃপর বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি সম্বন্ধে যাহা-কিছু জ্ঞাতব্য আছে তাহাই পরিষদের আলোচ্য হউক ; যেন পরিষদের কার্যালয়ে আসিলে বাংলাদেশের সম্বন্ধে যে-কোনো জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ বৃহৎ আয়োজন আবশ্যক। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অনুসন্ধানদ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংকলন করিতে হইবে। পরিষদের তদনুরূপ ধনবল ও লোকবল নাই। আপাতত পরিষৎ মফস্বলবাসী ছাত্রগণের সাহায্যে এই অনুসন্ধান ও তথ্যসংকলন কার্যে প্রবৃত্ত হইলে অল্প ব্যয়ে অধিক ফলের প্রত্যাশা আছে। রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল যে, পরিষদের ছাত্রসভ্য নামে নূতন শ্রেণীর সভ্য নির্বাচিত করা হউক। তাঁহারা চাঁদা দিবেন না, বাংলাদেশের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিবেন। তাঁহারা পরিশ্রমের বিনিময়ে সভ্যগণের কতক অধিকার পাইবেন।... আরো স্থির হইয়াছিল যে, সম্প্রতি মফস্বল হইতে আগত পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে ও শহরের ছাত্রগণকে এক বিশেষ সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিষদের সহিত সম্পর্কস্থাপনার্থ ও পরিষদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে সাহায্য করিবার জন্য উৎসাহিত করা হইবে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই সভায় ছাত্রদিগের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।[১] তদনুসারে ক্লাসিক থিয়েটারে [১৭ই চৈত্র] সাহিত্যপরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া ছাত্রবর্গকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

—বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের একাদশ বার্ষিক বিবরণ

'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধ ১৩০১ সালের '২৫শে চৈত্র রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সাংবৎসরিক উৎসব-সভায় পঠিত হয়'। ১৩১৫ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বর্তমান-গৃহ-প্রবেশ-সভায় রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা 'পরিষৎপরিচয়' হইতে নিম্নে মুদ্রিত হইল। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৩০৬ সালে পরিষদের কার্যালয় বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবন হইতে সাধারণ প্রকাশ্য স্থানে স্থানান্তরিত করিবার আন্দোলনে উদ্যোগীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম ছিলেন এবং মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী যখন পরিষৎকে গৃহনির্মাণের জন্য ভূমি দান করেন তখন রবীন্দ্রনাথ পরিষদের পক্ষে অন্যতম ন্যাসরক্ষক নির্বাচিত হইয়াছিলেন।)—

কিছুকাল হইল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় তাঁহার কোনো একটি প্রবন্ধে পাণিনির ব্যাকরণ প্রভৃতি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে পুত্রশব্দের অর্থ ছিল, যে পুর্ণ

১ দ্রষ্টব্য প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড ; সুলভ সংস্করণ দ্বিতীয় খণ্ড, 'আত্মশক্তি'র অন্তর্গত 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'

করে সেই পুত্র। পুংনামক কোনো-একটি নরক হইতে ত্রাণ করে এই ব্যাখ্যাটি পরবর্তী কালে আমাদের পুরাণে স্থান পাইয়াছে।

পিতাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলে বলিয়াই পুত্রের গৌরব। পুত্র পিতার অকৃত কর্মগুলিকে সম্পন্ন করে, তাঁহার ভারকে বহন করে, তাঁহার ঋণকে পরিশোধ করিয়া দেয়। এই কারণেই, কেবলমাত্র স্নেহপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য নহে, কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য, অকৃতার্থতা ও অসমাপ্তি হইতে মুক্তিলাভের জন্যই, পুত্রকে আমাদের দেশে দেবতার বিশেষ প্রসাদলাভের মতোই গণ্য করিত।

আমাদের দেশ বহুকাল হইতে পুত্রহীন হইয়া শোক করিতেছে। সে যাহা আরম্ভ করে তাহা কোনো-একটি ব্যক্তিকেই আশ্রয় করিয়া দেখা দেয় এবং সেই একটি ব্যক্তির সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়— তাহার সংকল্পকে বিচিত্র সার্থকতার পরম্পরার মধ্য দিয়া ভাবী পরিণামের দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার কোনো উপায় নাই। ক্ষুদ্রতা, বিচ্ছিন্নতা, অসমাপ্তি কেবলই দেশের ঋণের বোঝা বাড়াইয়াই চলিয়াছে ; কোনোটাই পরিশোধ হইবার কোনো সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

এই সম্পূর্ণতাহীন খণ্ডতাশাপগ্রস্ত বন্ধ্যদশা ঘুচাইবার জন্য আমাদের অভাগা দেশ কামনা করিতেছিল। কারণ, বন্ধ্যাত্বমাত্রই বন্ধন। যে ব্যক্তি নিজের ফল ফলাইতে পারিল না সে নিষ্কৃতি পাইল কই ? আমাদের দেশের অভ্যন্তরে যে অভিপ্রায় রহিয়াছে সেই অভিপ্রায় যদি চারি দিকে সফলতার বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া উঠিতে না থাকে, যদি তাহা কেবল গুপ্তই থাকিয়া যায়, যদি তাহা অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইতে থাকে, তবে এমন কোনো অকৃত্রিম উপায় নাই যাহার সাহায্যে দেশ মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। যাহারা নিরন্তর কালের মধ্য দিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সংকল্পকে সিদ্ধির পথে, মুক্তির পথে লইয়া যাইবে তাহারাই দেশের পুত্র। দুঃখিনী বঙ্গভূমি সেই পুত্র কামনা করিতেছিল।

আমাদের দেশমাতাকে বহু পুত্রবতী হইতে হইবে। এই পুত্রদের কেহ-বা দেশের জ্ঞানকে, কেহ-বা দেশের ভাবকে, কেহ-বা দেশের কর্মকে অনুবৃত্তি দান করিয়া তাহাকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। তাহারা নানা লোকের উদ্যমকে এক স্থানে আকর্ষণ করিয়া লইবে, তাহারা নানা কালের চেষ্টাকে একত্রে বাঁধিয়া চলিবে। তাহারা দেশের চিত্তকে নানা ব্যক্তির মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে এবং অনাগত কালের মধ্যে বহন করিয়া চলিবে। এমনি করিয়াই দেশের বন্ধ্যা অবস্থার সংকীর্ণতা ঘুচিয়া যাইবে, সে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

এইরূপ পুত্রের জন্য বঙ্গভূমির কামনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, পুত্রেষ্টিযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎকে আমি দেশমাতার এইরূপ একটি পুত্র বলিয়া অনুভব করিয়া অনেক দিন হইতে আনন্দ পাইতেছি। ইহা একটি বিশেষ দিকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতা ঘুচাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহা বাংলাদেশের আত্মপরিচয়চেষ্টাকে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ব্যাপ্ত করিয়া দিবে, এক কাল হইতে অন্য কালে বহন করিয়া চলিবে— তাহার এক নিত্যপ্রসারিত জিজ্ঞাসা সূত্রের দ্বারা অদ্যকার বাঙালির চিত্তের সহিত দূরকালের বাঙালিচিত্তকে মালায় গাঁথা চলিবে— দেশের সঙ্গে দেশের, কালের সঙ্গে কালের যোগসাধন করিয়া পরিপূর্ণতা বিস্তার করিতে থাকিবে। পুত্র পিতৃবংশকে, পিতৃকীর্তিকে, পিতৃসাধনকে এইরূপে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া অতীতের সহিত অনাগতকে এক করিয়া মানুষকে কৃতার্থ করে ; দেশপুত্রও দেশের চিত্তকে, দেশের চেষ্টাকে, বৃহৎ দেশে বৃহৎ কালে ঐক্য দান করিয়া তাহাকে সত্য করে— তাহাকে চরিতার্থ করে। সাহিত্যপরিষৎও বাংলাদেশের চিত্তকে এইরূপ নিত্যতা দান করিয়া তাহাকে মহৎরূপে সত্য করিয়া তুলিবার আশা বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়াই আমরা তাহার অভ্যুদয়কে বাংলাদেশের পুণ্যফল বলিয়া গণনা করিতেছি।

আমাদের এই সাহিত্যপরিষৎ এতদিন গর্ভবাসে ছিল। সে অল্পে অল্পে রসে রক্তে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তাহার সুহৃদ্‌গণ তাহাকে নানা আঘাত-অপঘাত হইতে সযত্নে বাঁচাইয়া

আসিয়াছেন। তাহার দশমাস কাটিয়া গিয়াছে, আজ সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

কবি বলিয়াছেন : শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। ধর্মসাধনের গোড়াতেই শরীরের প্রয়োজন হয়। সাহিত্যপরিষদের সেই আদ্য প্রয়োজন আজ সম্পূর্ণ হইয়াছে ; এখন হইতে তাহার ধর্মসাধনা সবলে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে এইরূপ আশা করা যাইতেছে।

ইতর জন্তুর অপেক্ষা মানুষের গর্ভবাসকালও দীর্ঘ ; তাহার শৈশব অবস্থাও অচির নহে। শ্রেষ্ঠতালাভের মূল্যস্বরূপ মানুষকে এই বিলম্ব স্বীকার করিতে হয়।

সাহিত্যপরিষৎকেও তাহার বাহ্যশরীর পূর্ণ করিতে বিলম্ব সাধিত হইয়াছে। অনেক দিন ধরিয়া নিজের প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়া দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে স্থানলাভ করিয়া তবে তাহার এই স্থূলদেহটি আজ প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই স্বাভাবিক বিলম্বই আমাদের পক্ষে আশার কারণ। ইহা ভোজবাজির খেলার মতো অকস্মাৎ কোনো খামখেয়ালির শ্রদ্ধাহীন টাকার জোরে এক রাত্রে সৃষ্ট হয় নাই। অনেক দিন দেশের হৃৎসঞ্চারিত রক্তের দ্বারা পুষ্ট হইয়া, তাহার জীবন হইতে জীবনলাভ করিয়া, তবেই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির নিয়মে পরিষদের শারীরিক আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

কিন্তু এখনো আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইবার সময় আসে নাই। এখনো এ শিশু অনেক দিন জননীর সতর্ক স্নেহের অপেক্ষা রাখে। তাহার পরে বড়ো হইয়া বলিষ্ঠ হইয়া জননীকে নির্ভর দান করিবে।

অদ্যকার উৎসবে এই নবদেহপ্রাপ্ত সাহিত্যপরিষদের মুখ দেখিয়া সমস্ত দেশের স্নেহ ও আশীর্বাদ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, এই আমরা আশা করিয়া আছি। যে পর্যন্ত ইহার শৈশবের দুর্বলতা কিছুমাত্র থাকিবে সে-পর্যন্ত বাঙালি ইহাকে পোষণ করিবে, রক্ষা করিবে, ইহার অভাব দূর করিয়া নিজের অভাবমোচনের পন্থা করিবে, এই অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রত্যাশা লইয়া আজ আমরা আনন্দ করিতে আসিয়াছি।

তবু মন হইতে ভয় দূর হয় না। কারণ, যাহারা দুর্ভাগা তাহারা স্বভাব হইতেই ভ্রষ্ট হয়। যে পুত্র পূর্ণতা দান করে সকলে তাহাকে স্বভাবতই পূর্ণ করিতে চায় ; কেবল ভাগ্যে যাহার দুর্গতি আছে সে আপন ভাবী আশাস্পদকেও অন্নদান করিতে বিমুখ হয়।

বাংলাদেশের ঘরেও মাঝে মাঝে দেবলোক হইতে মঙ্গল নানা আকার ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। আমরা তাহার সকলটিকে পালন করি নাই। এমনি করিয়া অনেক নবীন আগন্তুককেই আমরা অনাদরে অভুক্ত রাখিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি। সেই-সকল অপমানিত মঙ্গলের অভিসম্পাত অনেক জমা হইয়া উঠিয়াছে ; তাহারাই আমাদের উন্নতিপথের এক-একটি বড়ো বড়ো বাধা রচনা করিয়া রহিয়াছে। বাংলাদেশের ক্রোড়ে আজ যে কল্যাণের কমনীয় শৈশব সাহিত্যপরিষৎরূপে আমাদের দর্শনগোচর হইল, ইহার প্রতি আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হউক, আনন্দের আনুকূল্য প্রসারিত হউক— বিধাতাপুরুষ এই সভাতলে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অলক্ষ্য লেখনী দিয়া অদ্য এই শিশুর ললাটে যে অদৃশ্যলিপি লিখিতেছেন তাহাতে বাঙালির গৌরব, বাঙালির কীর্তি, বাঙালির চরিতার্থতা কালে কালে সপ্রমাণ হইয়া উঠুক, অন্তরের এই কামনা প্রকাশ করিয়া আমি আসন গ্রহণ করিতেছি।

—পরিষৎপরিচয় (ফাল্গুন ১৩৫৬)

সাহিত্যের কয়েকটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক 'জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে পঠিত', ইহা প্রথম প্রকাশ-কালে বঙ্গদর্শন পত্রে বিজ্ঞাপিত ; অপর-একটি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রজীবনীকার ; সেই প্রবন্ধ কয়টি— সৌন্দর্যবোধ, বিশ্বসাহিত্য, সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্যসৃষ্টি। অপিচ দ্রষ্টব্য, সাহিত্য, প্রচলিত তৃতীয় (১৩৬১) ও চতুর্থ (১৩৮৮) সংস্করণ।

প্রচলিত অষ্টম খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর

প্রথমমুদ্রণ-কালীন

নিবেদন

রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হইল।

যাঁহার রচনা এই প্রয়াসের উপজীব্য, যাঁহার স্নেহদৃষ্টি ও পরিচালনা ইহার উদ্যোগ-কর্তাদের সহায় ছিল, তিনি আর আমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষগোচর হইয়া রহিলেন না। রবীন্দ্র-রচনাবলী সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে উপহার দিবার যে একান্ত বাসনা ছিল তাহা আর পূর্ণ হইল না।

রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগী দেশবাসীর আনুকূল্য ও সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, নানাভাবে সকলে আমাদের আনুকূল্য করিয়াছেন। এই ব্রত-উদ্‌যাপনে আজ পুনরায় দেশবাসীর সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি। ২৮ ভাদ্র ১৩৪৮

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

বর্ণানুক্রমিক সূচী